

পতঞ্জলি যোগদর্শন

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Rajyoga* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

যোগদর্শনের উৎস

বেদই ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার একমাত্র ভিত্তি। বেদের বক্তব্যের উপর ভারতীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভারতের ঋষি, মুনি, যোগী, সাধকরা কখন বেদ বহির্ভূত কোন বাক্য বিচার করবেন না। যদি বিচার করতে হয়, যদি চিন্তন মনন করতে হয় সব সময় তাঁরা বেদবাক্যই বিচার করবেন। যখন একটি শব্দ বা কোন একটি চিন্তা বা ভাবকে অবলম্বন করে গভীরে চলে গিয়ে শুধু তাতেই পুরো মনকে কেন্দ্রীভূত করা হয় তখন তাকে আমরা বলি ধ্যান। ধ্যানের গভীরে ধ্যানের বিষয়ের বাইরে মনে আর কোন চিন্তা ভাবনা উঠবে না। যে তত্ত্বের উপর এই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে, ধ্যানের গভীরে সেই তত্ত্বগুলি ধ্যানের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। ধ্যানের গভীরে তাই বিচার করে কিছু জানতে হয় না, তত্ত্ব নিজেই ভেসে ওঠে। এইভাবে ধ্যানের গভীরে যাঁর কাছে একটি তত্ত্ব একবার ভেসে উঠেছে, তাঁর কাছে এবার শত শত তত্ত্ব ভেসে উঠবে। মন তখন এমন ভাবে তৈরী হয়ে যায় যে, তিনি তখন যে কোন তত্ত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন। ধ্যানের গভীরে ঋষিরা এই ভাবে যত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পেয়েছিলেন সেই তত্ত্বগুলিকে তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের বলে গেছেন, শিষ্যরাও সেই তত্ত্বের মনন চিন্তন করতে করতে তাঁরাও হয়তো ধ্যানের গভীরে আরও কিছু কিছু নতুন তত্ত্ব পেয়ে গেলেন। অন্য দিকে অন্যান্য অনেক ঋষিরাও এইভাবে নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। সমস্ত তত্ত্বগুলিকে এক জায়গায় সংগ্রহিত হতে হতে সেটাই হয়ে গেল বেদ। বেদ আবার এত পবিত্র যে বেদের কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করা হতো না, সবাই শিষ্য পরম্পরাতে মুখস্ত করে সমগ্র বেদকে ধরে রেখেছিলেন। পরের দিকে ব্যাসদেবের মনে হল বেদের কলেবর যেভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, মানুষের পক্ষে সমগ্র বেদকে মুখস্ত করে ধরে রাখার কাজটা খুবই দুরূহ হয়ে উঠবে। ব্যাসদেব তাই সেখানেই একটা লাইন টেনে দিয়ে বলে দিলেন এখানেই শেষ, এরপর যা কিছু তত্ত্ব আসবে সেটা আর বেদে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

বর্তমান যুগে এসে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মত এক দুর্লভ গ্রন্থ পেলাম। বেদে যা কিছু বলা হয়েছে এবং তার যে সার, ভাগবতে যে সব ঈশ্বরীয় তত্ত্ব বলা হয়েছে, অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতার উপদেশ দিচ্ছেন, সবই কথামৃতে রয়েছে। একদিকে উপনিষদের তত্ত্বও যেমন কথামৃতে রয়েছে আবার অন্য দিকে তন্ত্রের তত্ত্বও রয়েছে। তন্ত্রের তত্ত্ব আবার উপনিষদের সঙ্গে মিলবে না আবার পুরাণের সঙ্গেও মিলবে না, কিন্তু তন্ত্রের তত্ত্বও কথামৃতে পাওয়া যাবে। এমন কি আরও যে অন্যান্য পথের কথা আমাদের পরম্পরাতে বলা আছে, সেই সব পথের তত্ত্ব কথাও কথামৃতে বলা হয়েছে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ সব কিছুকে ঠাকুর কোথাও যেন সমন্বয় করে দিচ্ছেন। ঠাকুরের ঠিক কি মতাদর্শ ছিল, ঠাকুরের নিজস্ব দর্শন কি ছিল, ঠাকুর ঠিক কি বলতে চাইছেন এই নিয়ে এখনও সেই রকম কোন যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হয়নি। শ্রীমা অবশ্য বলছেন ‘তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈতী ছিলেন তাই তোমরাও অদ্বৈতী’। ঠাকুর কখন মায়াকে মায়া রূপেই বলছেন, যেমন বলছেন ‘এই দেখো গামছা দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দিলাম, আমাকে আর দেখতে পাচ্ছে না, আবার গামছা সরিয়ে দিলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ’। আবার বলছেন ‘যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি থাকে’। আবার প্রকৃতি তত্ত্বের কথা বলছেন, কখন আবার অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে বলছেন ‘সব নারী সেই সীতা আর সব পুরুষ সেই রাম’। কিন্তু তত্ত্বতঃ আবার পুরুষ নারীতে তো কোন তফাৎ নেই। কিন্তু এটাও একটা চিন্তা ভাবনা। ঠাকুর যখন কিছু বলছেন তখন আমাদের মত কিছু না বুঝে তিনি বলে চলে যাচ্ছেন না। তিনি যখন জানছেন এটা সত্য তখনই তিনি নিজের ভক্ত বা শিষ্যদের বলছেন। অন্য গ্রন্থ থেকে তিনি বলতে পারেন, অন্য কেউ বলে থাকতে পারেন কিন্তু ঠাকুর যখন কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা নিজে বলছেন তখন বুঝেই নিতে হবে এটা সত্য। ঠাকুরের দেড়শ বছরে এখনও ঠাকুরের সমস্ত রকম কথাকে সমন্বয় করে একটা

নিজস্ব দর্শন তৈরী হতে পারলো না। সত্যিই খুব কঠিন কাজ। কারণ যেখানে এত জন ঋষি মুনিরা এত কিছু দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিয়ে গেছেন তার সব কিছুকে একটি মাত্র দর্শনে দাঁড় করানো কত কঠিন কাজ আমরা ধারণাই করতে পারবো না।

বেদের পরবর্তি কালে আমাদের ঋষি মুনিরা বেদ কি বলতে চাইছে এর উপর বিচার করতে শুরু করলেন। ঋষিরা তাঁদের নিজের নিজের মত দিলেন, সেই মতগুলিকে আমাদের আগেকার পণ্ডিতরা আস্তিক দর্শন নাম দিলেন, যার উপর ভিত্তি করে ভারতে প্রধান ছয়টি দর্শন জন্ম নিল। ছয়টি দর্শনের বক্তব্য পুরোপুরি আলাদা, কারুর বক্তব্যের সাথে কোন মিল নেই কিন্তু সবাই এক বাক্যে মানছেন বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় মানে কোন মানুষের দ্বারা বেদ রচিত হয়নি। কিন্তু ঋষিরাও তো মানুষই ছিলেন। তাহলে অপৌরুষেয় কেন বলছেন? কারণ, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন সেখানে চিন্তা ভাবনা দিয়ে, বিশ্লেষণ দিয়ে আর কিছু করা যায় না। সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিজেই যেন ভেসে ওঠে। যেমন বিশ্বামিত্র যখন গায়ত্রী মন্ত্র বললেন তখন তিনি কি চিন্তা ভাবনা করে কবিতার মত গায়ত্রী মন্ত্র রচনা করলেন? ধ্যানের গভীরে বিশ্বামিত্রের সামনে গায়ত্রী মন্ত্র ভেসে উঠেছে। এই ছয়টি ভারতীয় দর্শন হল সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাখিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। এই ছয়টি দর্শনেই ভারতীয় দর্শন শেষ হয়ে যায় না, এর বাইরেও আমাদের আরও অনেক দর্শন আছে যেমন, শাক্ত দর্শন, পাশুপত দর্শন, শৈব দর্শন ইত্যাদি। এনারা সবাই নিজেদের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তেরই অঙ্গ বলে মনে করেন। কিন্তু বেদান্ত আবার এদের মানবে না। এর বাইরে আবার তন্ত্রও হিন্দু ধর্মে ভালো মত জায়গা করে নিয়েছে, যদিও তন্ত্রকে এরা কেউ মানবে না আর তন্ত্র বেদকেও মানে না। কিন্তু পরবর্তি কালে তন্ত্রের যত শাখা বেরিয়ে এসেছে তারা আবার বেদের অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে।

প্রত্যেকটি দর্শনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যে কোন দর্শন, তা পাশ্চাত্য দর্শনই হোক, ভারতীয় দর্শনই হোক, নাস্তিক দর্শন হোক আর বেদই হোক, সবাইকে চার থেকে পাঁচটি জিনিষকে ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে দিতে হবে। সব দর্শনকেই প্রথমে জীব নিয়ে আলোচনা করতে হবে আর দ্বিতীয় আলোচনা করতে হবে জগৎকে নিয়ে। আস্তিক দর্শন তৃতীয় আরেকটি জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করবে, নাস্তিকরাও আলোচনা করে, সেটা হল ঈশ্বর। অস্তিত্ব নিয়ে যখন আলোচনা করবে তখন এই তিনটে জিনিষকেই নিয়েই করবে – জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। চতুর্থ যেটা ভারতীয় দর্শন বেশী আলোচনা করে তা হল সৃষ্টি তত্ত্ব, আমাদের ভাষায় মায়া। সৃষ্টির আলোচনা এসে গেলে সেখানে সৃষ্টির সংহারের আলোচনাও এসে যাবে। বিজ্ঞানকেও সৃষ্টি ও সংহারকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তাকেও বলতে হবে জীব কী, জগৎ কী আর ঈশ্বর কী। যদিও বিজ্ঞান ঈশ্বরের ব্যাপারে বলে দেবে ঈশ্বর হল মনের একটি কল্পনা। ষড়দর্শন, অর্থাৎ আস্তিক দর্শন এই কটি জিনিষকেই আলোচনা করেছে। এর বাইরে আর কিছু আলোচনা নেই, সমস্ত আলোচনা মোটামুটি এই চারটে জিনিষের মধ্যেই ঘুরতে থাকবে। দর্শনের বেশী আলোচনা আবার অন্য দর্শনের মতকে খণ্ডন করতে আর নিজের মতকে দাঁড় করাতেই চলে যায়।

ষড়দর্শনের মধ্যে একটি দর্শন হল যোগদর্শন। যোগদর্শনে আবার সাংখ্যযোগের একটা বিশেষ স্থান আছে। যোগ শব্দ যুজ্ ধাতু থেকে এসেছে। যুজ্ মানে জুড়ে দেওয়া। যখনই একটা জিনিষকে আরেকটা জিনিষের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তখন তাকে যোগ বলা হয়। সাধক যখন নিজেকে সমষ্টি থেকে ক্ষুদ্র মনে করে কর্মের মাধ্যমে সমষ্টির সাথে নিজেকে যোগ করে দেয় তখন সেটাই হয়ে যায় কর্মযোগ। সাধক যখন প্রথমে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করে নিজের ক্ষুদ্র আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করে দেয় তখন সেটাই হয়ে যায় রাজযোগ। আত্মা আর পরমাত্মার মিলনই রাজযোগ। আধ্যাত্মিক সাধনায় সবাই নিজেকে যোগী বলে, কর্মের মাধ্যমে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির যোগ হচ্ছে তাই কর্মযোগের সাধক নিজেকে যোগী বলে। আত্মার সাথে যখন পরমাত্মার মিলন হয়, বিন্দু যখন সিঙ্কুতে মিলে গেলে তখন সেটাকে বলছেন রাজযোগ। ভক্তের যখন ঈশ্বরের সাথে মিলন হয় তখন তাকে বলছেন ভক্তিযোগ। যখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপের সাথে সগুণ সাকারের একাত্ম বোধ হয় তখন তাকে বলছেন জ্ঞানযোগ। এখন কর্মযোগ যাকে সমষ্টি বলছে, রাজযোগ যাকে পরমাত্মা বলছে, ভক্ত ঈশ্বর

বলছে আর জ্ঞানযোগ ব্রহ্ম বলছে, এগুলো এক কিনা এই বিচারে আমরা যাচ্ছি না। তবে ঠাকুর বলছেন এক। কথামতেই ঠাকুর বলছেন, যোগীরা যাঁকে পরমাত্মা বলছে, জ্ঞানীরা তাঁকেই ব্রহ্ম বলছে ভক্তরা তাঁকে ঈশ্বর বলছে। আমরা এই বিচারে যাচ্ছি না, কিন্তু এটা ঠিক যে, যে পথ দিয়ে এদের মিলন হচ্ছে সেটাকেই বলছেন যোগ।

আমরা যে পতঞ্জলি যোগসূত্র অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি, অনেকে মনে করেন এই পতঞ্জলি যোগ-দর্শন যিশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়েছে। কেউ বলে এডি কেউ বলে বিসি। মনু যেমন তাঁর সময়ে এবং পরম্পরাতে আগে থেকে যা কিছু আচার আচরণ অনুসৃত হয়ে আসছিল সেগুলোকে একটা জায়গায় জড়ো করে সঙ্কলন করে দিয়েছিলেন, যাকে আমরা মনুস্মৃতি বলছে, ঠিক তেমনি পতঞ্জলি হলেন যোগ-দর্শনের codifier বা সঙ্কলক। যোগের অনেক কিছু বেদে আগে থেকেই এসে গিয়েছিল, উপনিষদেও যোগদর্শনের অনেক কিছু পাওয়া যাবে। মহাভারতে তো রীতিমত যোগের উপর অনেক নিরূপণ আছে। ভাগবতে অষ্টাঙ্গ যোগের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকে অনেক যোগীরা ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন ভাবে যোগ সাধনা করতেন। তাঁরা আবার নিজেদের অনুভূতির কথা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের শিষ্যদের বলে গেছেন। যোগের যা কিছু চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পতঞ্জলি সেগুলোকে সংগ্রহ করে গ্রন্থে সঙ্কলন করে দিলেন।

হঠযোগ

যোগের একটা বড় কাজ যখন হয়ে গেল, তখন স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তী কালে এর উপর আরও অনেক কাজ হবে। আরও অনেক কাজ হতে গিয়ে যোগের আবার দুটো অঙ্গ হয়ে গেল। কিছু কিছু যোগী মনের গতিবিধি ও ধর্মের ব্যাপার নিয়ে বেশী চিন্তা ভাবনা করলেন আবার কিছু যোগী শরীরের ধর্মের উপর বেশী জোর দিলেন। যোগের ব্যাপারকে যাঁরা শরীরের উপর বেশী প্রয়োগ করলেন তাঁরা হয়ে গেলেন হঠযোগী। হঠযোগের খুব নামকরা গ্রন্থ হল হঠযোগ-প্রদীপিকা। হঠযোগের ক্রিয়াকলাপ আবার অনেকে মানতে চাইলেন না, অনুশীলন করতেও চাইতেন না। ঠিক ঠিক যোগশাস্ত্র হল যেখানে মনের কার্যকলাপ আর তার নিয়ন্ত্রণের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য এই যোগকে বলা হয় হিন্দু মনোবিজ্ঞান। হিন্দু মনোবিজ্ঞানই পতঞ্জলি যোগ। কিন্তু বর্তমানে চারিদিকে আমরা যে মনোবিজ্ঞানকে জানি পতঞ্জলি যোগ ঠিক এই মনোবিজ্ঞান নয়। হিন্দু মনোবিজ্ঞান মনের সব কিছুকে নিয়ে চলে আর এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কোন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে গেলে তাঁরা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অনেক নেতিমূলক আচরণের দিকে আলোকপাত করে সেই অনুসারে তার উপর ওষুধ প্রয়োগ করবেন। কিন্তু হিন্দু যোগদর্শনে এসবের কোন ব্যাপারই নেই। এখানে সরাসরি বলে দিচ্ছে নিজেই কীভাবে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন করতে হবে। এছাড়া যোগদর্শনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, সেইজন্য এর উদ্দেশ্যকে মহৎ বলা হয়।

রাজযোগ হল Psycho Physical, অর্থাৎ দেহ মনের ব্যাপার। আমরা আগে মনকে নিয়ে আলোচনা করব। রাজযোগে স্থূলশরীরকে নিয়ে খুব সামান্যই বলা হয়েছে, যেটা না বলার মতই। রাজযোগ থেকেই এর একটা শাখা বেরিয়েছে, যাকে বলা হয় হঠযোগ। হঠযোগ আবার পুরোটাই স্থূলশরীরকে কেন্দ্র করে চলে। হঠযোগের সবচেয়ে যেটা গোলমাল, তা হল, রাজযোগ যেখানে একটা কি দুটো সূত্রে কোন একটা জিনিষকে বলে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, হঠযোগ সেটাকেই ধরে তার মধ্যে সব কিছু ঢেলে দিয়েছে। যেমন রাজযোগে প্রাণায়াম, আসনের কথা একটা সূত্রে বলে দিয়েছে, কিন্তু এই দুটোকে নিয়েই হঠযোগ একটা বিরাট বিজ্ঞান বানিয়ে দিয়েছে। আর যা কিছুই হঠযোগ করুক না কেন, এরা মন, চিন্তাবৃত্তি বা মনের কার্যাবলীর উপর কোন আলোচনাকেই গুরুত্ব দেয় না। ওদের কাছে একটাই বক্তব্য, যতক্ষণ তোমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণে না আনছ, ততদিন তোমার মনও নিয়ন্ত্রণে আসবে না। হঠযোগের সাথে রাজযোগের বিরাট পার্থক্য তা হল হঠযোগ আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে কোন গুরুত্বই দেয় না। এই সব কারণে হঠযোগকে হিন্দু ধর্ম তার মূল দর্শনের অঙ্গ হিসাবে কখনই স্বীকার করবে না। কিন্তু যাদের আসন প্রাণায়ামাদি সম্বন্ধে জানার খুব আগ্রহ আছে তারা হঠযোগের বিখ্যাত বই

‘হঠযোগপ্রদীপিকা’ দেখতে পারেন। কিন্তু রাজযোগের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এই বই এর কোন গুরুত্বই নেই।

রাজযোগে সব পথের সাধকদের পরীক্ষা হয়ে যায়

পতঞ্জলি যোগদর্শন বাস্তব নিয়ম-প্রণালী ও বিজ্ঞান সম্মত বলিষ্ঠ যৌক্তিকতার দ্বারা পরিপুষ্ট অত্যন্ত সুসংবদ্ধ একটি দর্শন, কোথাও এতটুকু ফাঁক ফোকর পাওয়া যাবে না। এসবের জন্যই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে রাজযোগকে পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধক তার সাধনায় কিভাবে এগোবে তার জন্য ধাপে ধাপে সব কিছু নির্দিষ্ট করা আছে। অন্যান্য যত মত, যত পথ আছে সেই সব পথে বা মতে সাধনা করে সাধক আধ্যাত্মিকতার স্তরে কতটা উন্নতি করেছে বা করছে রাজযোগ হচ্ছে তার মাপকাঠি। সে যে পথের সাধকই হোক না কেন, বৈষ্ণব, শাক্ত, ভক্ত, জ্ঞানী যেই হোন না কেন, যে মুহূর্তে তাকে যোগের নিরিখে বিচার করা হবে তখনই ধরা পড়ে যাবে কে কত বড় সাধক। সেইজন্য দেখা যায় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যারা দুর্বল প্রকৃতির, প্রথমেই তারা যোগ থেকে সরে যাবে। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে থাকে তখন তার কি কি পরিবর্তন হয় তার সুন্দর বর্ণনা কথামতে অনেক জায়গায় আছে, সেই জিনিষগুলি আমাদের মধ্যেও এসেছে কিনা তার মাপকাঠি রাজযোগ। হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে যখন Water Molecule তৈরী হয় তখন তার একটা নির্দিষ্ট ৬৭ ডিগ্রির কাছাকাছি angle আছে। এখন যদি কেউ বলে আমাদের এখানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ৮০ ডিগ্রিতে দাঁড়ায়, তাহলে বুঝতে হবে সে পরিষ্কার বোকা বানাতে চাইছে। ঠাকুরের কথায় ‘আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে’। সেইজন্যে বেশীর ভাগ লোক রাজযোগকে এড়িয়ে চলতে চায়, আর রাজযোগে আসতেও চায় না। কারণ রাজযোগ হল আত্মানুভূতি লাভের রাজকীয় মার্গ, এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। রাজযোগ একেবারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেবে আপনার মনে এই এই জিনিষ হয়। রাজযোগ সাধকদের জন্য যে পথ ও সাধনার পদ্ধতির কথা বলে দিচ্ছে, তার জন্য যে আমাকে হিন্দু মতেই যেতে হবে সেরকম কিছু নেই। যে কোন ধর্মের মানুষই এর পথ বা সাধনাকে অবলম্বন করতে পারে, এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যও রাজযোগের পথ খোলা আছে। আপনি যে কোন ধর্মের হতে পারেন, ধর্মে আপনার বিশ্বাস নাও থাকতে পারে, রাজযোগ অনুশীলনের জন্য আপনার দরজা সব সময়ই খোলা। রাজযোগের কাছে গেলে সে আপনার মন যেমনটি ঠিক তেমনটি কাঁটাছেঁড়া করে সামনে রেখে দেবে। এবার আপনি নিজের মত গুছিয়ে যেমন ভাবে নিয়ে যেতে চান নিয়ে যেতে পারেন।

যোগদর্শনকে কেন রাজযোগ বলা হয়

যোগদর্শনকে আবার রাজযোগও বলা হয়। স্বামীজীও রাজযোগ শব্দটাই গ্রহণ করেছেন, যদিও পতঞ্জলি কোথাও রাজযোগ শব্দটা ব্যবহার করেননি। গীতাতে বলা হচ্ছে – *রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং*। রাজা বলার অর্থ, এখানে যা কিছু আছে সব রাজকীয়। যোগে লুকোচুরির কিছু নেই, তত্ত্ব যতটুকু আছে তার সবটাই হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করে নেওয়ার ব্যাপার। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখেছি একটা কিছু বলার পর বলছে এর সার্বিক অর্থ এই রকম কিন্তু এর আসল অর্থ অন্য রকম, রাজযোগে এ ধরণের কোন কথার মারপ্যাঁচ নেই। রাজযোগ একেবারে সরাসরি যা বলার বলে দেবে, যেটা যে রকম তাকে ঠিক সেই রকমই বলে দেবে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে মেলানো হয় তাহলে জল তৈরী হবে। আমেরিকার ল্যাবরেটরিতেও জল হবে, ভারতের ল্যাবরেটরিতেও জল হবে। যোগের ক্ষেত্রে ঠিক একই জিনিষ হবে, যোগ কখন ব্যক্তি সাপেক্ষ নয়, সাধক সাপেক্ষ নয়, সবার ক্ষেত্রে একই রকম, একই পদ্ধতিতে চলবে। রাজযোগে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কোন ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যাঁরাই রাজযোগের অনুশীলন করবেন তাঁদের সবার একই রকম অভিজ্ঞতা হতে থাকবে, তার অন্যথা কোন কিছু হবে না। সেইজন্য যোগদর্শনকে বলা হয় রাজযোগ। যারাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবিক স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, তাদের সবাইকে অবশ্যই প্রথমে যোগদর্শন জানতে হবে। যে ধর্ম নিজেকে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, সেই ধর্মকে অবশ্যই যোগদর্শনকে শুধু স্বীকারই নয়,

পুরোপুরি ধর্মের অনুশীলনে ও চর্চার মধ্যে যোগকে রাখতে হবে, তবেই সেই ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

প্রশ্ন হতে পারে যোগদর্শনকেই কেন রাজযোগ বলা হয়। সব যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে যোগদর্শনকে রাজযোগ বলা হয় না। কেননা যে যে পথে আছেন সে তাঁর নিজের পথকেই শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। একটা নামকরণ করতে হয়, তাই এনারা এই নামটা বেছে নিয়েছেন। তবে কি, ধর্মের যে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আর ধর্মের চমৎকারীত্বের দিক, এই দুটোকে রাজযোগ একেবারে অকাটা যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আপনি আপনার আত্মোপলব্ধির দিকে যে পথ দিয়ে হাঁটবেন সেই পথকেই বলা হচ্ছে রাজপথ। রাজপথ দিয়ে সবাই চোখ বন্ধ করে চলতে পারেন, চলার সময় এখানে খানাখন্দ আছে, ওখানে বাঁক আছে এসব কোন কিছু ভাবতে হবে না। যদি সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে কেউ চান তাহলে তাঁকে এই রাজপথ দিয়েই হাঁটতে হবে। সেইজন্য এর নাম হয়ে গেল রাজযোগ। প্রথম দিকে এর আসল নাম ছিল পতঞ্জলি যোগসূত্র। পরের দিকে রাজযোগ নামটা কোনভাবে এসে গেছে। স্বামীজী এসে এই রাজযোগ শব্দটা বেশি প্রচলিত করে দিলেন। তবে প্রথম কে এবং কবে থেকে রাজযোগ কথাটা চালু করেছেন আমাদের জানা নেই।

একজন অবতার এসে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে মানুষের মনে যেমন যেমন কামনা-বাসনা জাগতে থাকে সেই অনুসারে ধর্মের সেই আগের পবিত্রতা তেমন তেমন নষ্ট হতে থাকে, ধর্মেরও সেই ভাবে পতন হতে থাকে। রাজযোগে এসব কোন ঝামেলা নেই। রাজযোগ প্রথমেই বলে দেবে তোমাকে এই আটটি ধাপ বলে দেওয়া হল, প্রথম থেকে এক এক করে এই আটটি ধাপ অনুশীলন করতে থাক। অনুশীলনের ফল তুমি অবশ্যই পাবে, ফল যদি না পাও তো ছেড়ে দেবে। কিন্তু ভক্তিরোগে কি বলবে? তুমি প্রভুকে ভক্তি করে যাও মৃত্যুর সময় প্রভু তোমার গতি করে দেবেন। আরে ভাই! প্রভু আছেন কিনা তাতেই বিশ্বাস নেই, তিনি আবার গতি করে দেবেন! যখন দুঃখ-কষ্ট আসবে ভক্তিরোগ আবার বলবে, ঠাকুর কষ্ট দিচ্ছেন ঠাকুরই আবার কষ্ট দূর করবেন। আমার তো ঠাকুরেই বিশ্বাস নেই, সারা জীবনে যে ঠাকুর নিজের কষ্টই মেটাতে পারলেন তিনি আবার অপরের কষ্ট কী দূর করবেন! কর্মযোগ বলছে জগতের সেবা কর। আরে ভাই! আমার নিজেরই খাবার জুটছে না, আমাকে দেখাশোনার কেউ নেই, আমি যাবো জগতকে দেখতে! জ্ঞানযোগ বলছে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ভাই! আমি যেটা সামনে দেখছি সেটাকেই তো আমি বিশ্বাস করব! আমি জানি আমি আছি, আমার বন্ধুরা সত্য, আমার পরিবারের সবাই সত্য। কিন্তু তুমি সবটাকে মিথ্যা বলে বাদ দিতে বলছ আর যে জিনিষটা নেই সেটাকে বিশ্বাস করতে বলছ। কিন্তু রাজযোগ বলবে, তোমাকে কোন কিছু বিশ্বাস করতে হবে না। তুমি নিজে আছ এটা মানছো তো? হ্যাঁ মানছি। তোমার একটা মন আছে মানছো তো? অবশ্যই মানছি। ব্যস্ এটুকুতেই হবে, এবার চল রাজযোগ শুরু করা যাক। এখানে যা কিছু হবে সব হাতেনাতে হবে। এখানে কোন ধারণা করার কিছু নেই, কোন কিছুকে মেনে নেওয়ারও ব্যাপার নেই। শুধু তোমার মনকে আমি বিশ্লেষণ করে তোমার সামনে রেখে দিচ্ছি, এরপর বাকিটা তুমি নিজে করে নাও। সেইজন্য আমাদের পথ হল Royal road towards realisation। গীতার নবম অধ্যায়ের নামও রাজযোগ, কিন্তু সেখানে এই রাজযোগের কথা বলা হচ্ছে না, সেখানে অধ্যাত্ম বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে রাজবিদ্যা হল অধ্যাত্ম-বিদ্যা, আর সমস্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যার মধ্যে রাজা হল এই রাজযোগ। এখানে তোমাকে আগে থেকে কিছু কল্পনা করে নিতে হবে না, কোন কিছু ছাড়তেও হবে না। তুমি যে অবস্থায় আছ ওই অবস্থাতেই তুমি রাজযোগে নেমে পড়, নেমে পড়ার এক ধাপ, দু ধাপ যেতে না যেতেই বুঝতে পারবে ‘তাইতো! যা বলেছিল ঠিক তাই হচ্ছে’। যেমন স্বামীজীও তাঁর সরল রাজযোগে বলছেন – যদি কেউ নাসাগ্রে ধ্যান করে তাহলে কদিন পর থেকেই তার নাকে সুগন্ধ আসতে শুরু হবে। এই ধরণের কিছু সিদ্ধাই আপনা থেকেই চলে আসে। সিদ্ধাই এলে তোমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে, বিশ্বাস দৃঢ় হলে আরও জোর কদমে এগোতে থাকবে।

যোগদর্শন যতক্ষণ না বোঝা যাবে, ততক্ষণ ধর্মের ব্যবহারিক ও অতিদ্রিয়তার প্রকৃত স্বরূপকে ঠিক বোঝা যাবে না। যোগে কল্পনা বা ধারণা বলে কিছু হয় না। দর্শনের তত্ত্ব সমুদয়কে নানা ভাবে যুক্তি-বিচার করে, তর্কিক ভাবে বিচার করার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পরই সেটাকে সবাই সর্বসম্মত বলে মানতে বাধ্য হই। কিন্তু যোগের ক্ষেত্রে এসব কিছুর প্রয়োজন হয় না, যোগদর্শন বলবে আমি এই এই ভাবে সাধনা করেছি, সাধনার জন্য এই এই তার প্রাথমিক কিছু শর্ত ও নিয়ম পদ্ধতি আছে, এগুলিকে অনুসরণ করে আমি এই এই ফল পেয়েছি, তুমিও এই ভাবে সাধনা কর তুমিও একই ফল পাবে। এই কারণে এই যোগকে বলা হয় রাজযোগ।

যোগ ও অন্যান্য ধর্ম

যে কোন ধর্মে যদি যোগকে ধর্মের একটি অঙ্গ রূপে না রাখা হয় তাহলে কিন্তু সেই ধর্মে প্রচুর সমস্যা আসতে বাধ্য। ইসলাম ধর্মে সুফিরাও যোগের ব্যাপারটা মানেন। সুফিদের সাধনায় অনেক যোগের অঙ্গ দেখা যায়, যেখানে তাঁরা মনকে নিয়ে বিচার করার কথা বলছেন। সুফি সম্প্রদায়ে অনেক বড় বড় মহাত্মাদের মধ্যে আল গাজালী বলে একজন বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে রাজা, খলিফাদের সাথে তাঁর অনেক বিরোধ হয়ে যেত বলে তাঁকে বেশির ভাগ সময়েই কারাগারে রুদ্ধাবস্থায় থাকতে হত। যখনই কোথাও যেতেন সেখান থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা তিনি গ্রহণ করতেন, যেখানে শেখার কিছু থাকত না সেখানে তিনি বসে চুপচাপ বই পড়তেন। আর যখন তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখা হত, জেলের মধ্যে তিনি সুফি পদ্ধতিতে ধ্যান করতেন। আল গাজালী তাঁর সাধনা ও উপলব্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যার সাথে যোগদর্শনের অনেক মিল পাওয়া যায়। খ্রিস্টান ধর্মেও যাঁরা মরমী সাধক ছিলেন আর যাঁরা Desert Fatherরা ছিলেন তাঁরাও যে ধরনের সাধনার কথা বলেছেন – তুমি প্রার্থনা কিভাবে করবে, ধ্যান কিভাবে করবে, যখন ধ্যান করবে তখন তার প্রথমে দিকে কি হবে, তার পরের দিকে কি হবে, এগুলোকে যেভাবে তাঁরা বলছেন তার সাথে যোগদর্শনের অনেক কিছুই মিলে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম তো পুরোপুরি যোগের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। যোগ হল Psycho Physical Science, শরীর ও মনের বিজ্ঞান। শরীর আর মন এই দুটো গ্রন্থি মিলে মিশে এক হয়ে থাকে। যে বিজ্ঞান এই দুটোকে এক সঙ্গে নিয়ে চলে এবং চলার পর দুটোর উপরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, সেই বিজ্ঞানকেই আধুনিক ভাষায় বলছেন Psycho Physical Science। মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার পর যোগী দেখেন আমি সেই আত্মা, সেখান থেকে পরমাত্মার সাথে মিলন হয়ে যায়, এটাই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা। যোগ মানে তাই, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। যোগে যোগীর পরমাত্মার সাথে মিলনের কথা ঠাকুরও কথামতে বলছেন।

হিন্দু ধর্মে সাংখ্য দর্শনের গুরুত্ব

যোগের দুটো দিক – একটা হল মন ও মনের কার্যের বিশ্লেষণ করা আর দ্বিতীয় হল এর তত্ত্ব যা কিনা আবার সাংখ্য দর্শনের উপর বেশী আধার করে চলে। রাজযোগের মূল দর্শন সাংখ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই সাংখ্য দর্শন ঠিক মত জানা না থাকলে যোগদর্শনকে সম্যক ভাবে বোঝা যাবে না। সাংখ্য দর্শন আমাদের হিন্দু ধর্মের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। ষড়দর্শনের মধ্যে প্রথম যে দর্শন তা হল সাংখ্য, কপিল মুনি যার উদ্ভাবক। স্বামীজী কপিল মুনিকে বলছেন Father of all philosophy। কপিল মুনিকে বলা হয় সমস্ত দর্শনের জনক, কারণ পুরো বিশ্বে সাংখ্য দর্শনই প্রথম এবং প্রাচীনতম দর্শন। সাংখ্য দর্শন থেকেই পরবর্তী কালে ভারতের সমস্ত দর্শন একে একে বেরিয়ে এসেছে। ভাগবত-পুরাণে কপিল-দেবাহুতি সংবাদে প্রথম সাংখ্য দর্শনের কথা বলা হয়েছে। কপিল মুনি সাংখ্যে যেটা বিচার দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যোগ সেটাকেই ক্রিয়াশক্তি রূপে নিয়ে গেছে। শুধু প্রথম দর্শনই নয়, সমস্ত দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ হল কপিলের এই সাংখ্য দর্শন, সাংখ্য ছাড়া ভারতবর্ষে কোন দর্শনের কথা ভাবাই যায় না। আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে সাংখ্য দর্শন কখনই বেদ ও উপনিষদের বাইরে নয়।

সাংখ্যের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনের প্রধান পার্থক্য হল, সাংখ্য ঈশ্বর মানে না। হিন্দুকরা হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে বলে হিন্দুরা চিরকাল শুধু ভগবান, ঈশ্বর আর দেবতা ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু

হিন্দুদের প্রথম যে দর্শন সেখানে ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত নেই, শুধু যে নাম নেই তা নয়, সাংখ্য ঈশ্বরকেই মানে না। কিন্তু হিন্দুদের যত পূজা পদ্ধতি, ঘটনা নাড়া থেকে ছাগ বলি দেওয়া সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে সাংখ্যের উপর। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে কালীঘাটে যে ছাগ বলি দেওয়া হয়, এর সাথে সাংখ্যের কি সম্পর্ক? এর সব কিছুই সাংখ্যের সাথে সরাসরি যুক্ত। কালীঘাটে কার কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে? মা কালীর কাছে। মা কালী কে? শক্তি। শক্তি কোথা থেকে এসেছে? প্রকৃতি থেকে। আর প্রকৃতি মানেই সাংখ্য। হিন্দু ধর্মে যত দর্শন আছে, যত রকম চিন্তা-ভাবনা আছে, প্রত্যেকটি দর্শন, প্রত্যেকটি ভাবধারা, তাদের প্রত্যেকে কোন না কোন ভাবে সাংখ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। সব থেকে যেটা গুরুত্ব, তা হল, যখনই কেউ ধর্মের কথা বলবে তখনই তাকে হয় জীবাত্মা, নয় আত্মা, নতুবা পরমাত্মাকে নিয়ে বলতে হবে। কিন্তু আত্মার ধারণাই এসেছে একমাত্র সাংখ্য থেকে, তবে সাংখ্যে আত্মা শব্দটা ব্যবহার না করে ‘পুরুষ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

পুরুষ, প্রকৃতি ও চব্বিশ তত্ত্ব

সাংখ্য দর্শন মোটামুটি তিনটি জিনিষের উপর দাঁড়িয়ে আছে – পুরুষ, প্রকৃতি ও চব্বিশ তত্ত্ব। প্রথম হল পুরুষ, পরের দিকে অন্যান্য দর্শনে পুরুষকেই আত্মা বলা হয়েছে। পুরুষ মানে যিনি চৈতন্য সত্তা। বেদান্তে যখন আত্মার কথা বলা হয় বা বিজ্ঞান যাকে চৈতন্য বলছে তখন কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি এই আত্মা বা চৈতন্যটা কি বা কে? আমি যে নিজেকে আমি বলছি, অন্যকে আপনি বা তুমি বলে সম্বোধন করছি, অন্য দিকে বোতল, গ্লাস, টেবিল, চেয়ারকে তুমি বলে সম্বোধন করছি না। অপরকে তুমি বা আপনি বলতে হবে, নিজেকে দেখাবার সময় আমি বলতে হবে আর জড় বস্তুকে এটা ওটা বলতে হবে, এগুলো আমাদের কে শিখিয়ে দিয়েছে? নাকি ছোটবেলা থেকে আমাদের কেউ ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে? নাকি আমি তুমির ব্যাপারটা মানুষের সহজাত বোধ? আমি আছি, তুমি আছো আর এটি আছে, এই তিনটে সত্তাকে নিয়েই প্রকৃতি চলছে। আমার ভেতরে যিনি আমি তিনিই আমার অন্তর্যামী, তিনিই পুরুষ, তোমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী যাঁকে তুমি বা আপনি বলে সম্বোধন করা হচ্ছে, তিনিও সেই পুরুষ। এর বাইরে একটি আলাদা সত্তা রয়েছে সেটি এই বোতলের সত্তা, যাকে বলছে ইদম্। অহম্ আর ইদম্ এবং তুমি বা আপনি সেটাও পুরুষ, সেটাও চৈতন্য সেইজন্য সত্তার দিক থেকে এর আলাদা কোন সত্তা নেই। মনে করুন এখানে অনেক রকম ফল রাখা আছে, আমাকে বলা হল সব রকম ফলকে আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে। আমাকে তখন আমগুলোকে আমার জায়গায় রাখতে হবে, লিচু লিচুর জায়গায়, লেবু লেবুর জায়গায় সাজিয়ে রাখতে হবে। সেই রকম যখন সত্তাকে সাজাতে বলা হয় তখন পুরুষ সত্তা পুরুষের জায়গাতেই যাবে। আমি, তুমি, সে যাই বলা হোক না কেন এর একটাই থাক হবে, এই থাককে বলা হচ্ছে পুরুষ। তাহলে কত পুরুষ আছে? সাংখ্য মতে পুরুষ অনন্ত। কীভাবে অনন্ত? অনু রূপে অনন্ত। এখন অনু রূপেই থাকুক, বৃহৎ রূপেই থাকুক চৈতন্য চৈতন্যই।

চৈতন্যের অন্য দিকে রয়েছে দ্বিতীয় সত্তা প্রকৃতি, যাকে ইদম্ বলছি, ইংরাজীতে বলা যেতে পারে nature or matter, বা বলা যেতে পারে শক্তি অথবা মায়ী। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির সাথে অন্যান্য দর্শন যাকে প্রকৃতি বা শক্তি বা মায়ী বলছে, তার সাথে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটা যদি ঠিক মত না ধরতে পারা যায় তাহলে একটা দর্শন বুঝতে গিয়ে অন্য দর্শনে ঢুকে পড়ব। যদি পৃথিবী থেকে চাঁদে বন্দুক থেকে একটা গুলি ছোঁড়া হয় তখন বন্দুকের নলটা সামান্য একটু যদি বেঁকে যায় তাহলে যে গুলিটা ছোঁড়া হবে সেটা চাঁদে না গিয়ে মঙ্গল গ্রহে চলে যাবে। হিন্দু ধর্মের দর্শনে এই সমস্যা হয়। যদি বোঝার একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে যে দর্শনকে জানতে চাইছি তার বদলে অন্য আরেকটি দর্শনের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ব।

জীবন কী? জগৎ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলছে চিৎশক্তি আর জড়শক্তি এই দুটোর যখন মিলন হয়, তখন সেটাই হয়ে যায় চিৎ-জড়-গ্রন্থি বা চিৎজড়গ্রন্থি। শুধু চিৎ থাকলে সৃষ্টি হবে না আবার শুধু জড় থাকলেও সৃষ্টি হবে না। শক্তি হলেন চৈতন্যময়ী, যিনি জীবের মধ্যে চিতি শক্তি রূপে অবস্থান করে জীবকে চালাচ্ছেন। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে জড়, তার কোন চৈতন্য নেই, তার মানে

প্রকৃতির নিজস্ব কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। তন্ত্রের মতে যে কোন ধরণের শক্তিই হোক না কেন, এর মূলা হলেন আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি, পরিদৃশ্যমান এই জগতের সমস্ত শক্তি তাঁরই প্রকাশ। কিন্তু সাংখ্যে এই শক্তিই হয়ে যায় প্রকৃতি। সৃষ্টির আদিতে যা কিছু বেরিয়ে আসছে সবই এই প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন দর্শন প্রকৃতিকে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু মূল হচ্ছে প্রকৃতি। সাংখ্যবাদীর মূল বক্তব্য হল পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেই জীব ও জগতের সৃষ্টি হয়, এই দুটোর মিলন না হলে সৃষ্টি হবে না। এই পুরুষ আর প্রকৃতি মানে নারী আর ব্যাটাছেলে নয়, পুরুষ মানে চৈতন্য সত্তা আর প্রকৃতি মানে জড় সত্তা। স্বামীর মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেই চৈতন্য সত্তা তার স্ত্রীর মধ্যেও আছে, এই চৈতন্য সত্তাকে সাংখ্যবাদীরা বলছে পুরুষ। স্বামী ও স্ত্রী দুজনের মধ্যেই পুরুষ আছেন আর তাদের দুজনের শরীরটা প্রকৃতির উপাদান দ্বারা নির্মিত। সেইজন্য নারী আর পুরুষে শরীরের অঙ্গ ছাড়া আর কোথাও কোন ভেদ নেই। হিন্দুদের যে প্রথম দর্শন সেই সাংখ্য দর্শনে পুরুষ আর নারীর কোন পার্থক্য নেই। সেই আত্মা বা পুরুষ ব্যাটাছেলের মধ্যেও আবদ্ধ আবার সেই আত্মা নারীর মধ্যেও আবদ্ধ। আত্মাকে এই আবদ্ধতা কে করে রেখেছে? প্রকৃতি। প্রকৃতি আবার জড়, মাইক্রোফোন যতটা জড় এই শরীরও ঠিক ততটাই জড়।

পুরুষ আর নারীর ধারণা সাংখ্যের পরবর্তী কালের দর্শন গুলিতেও আসে। অধ্যাত্ম রামায়ণে, তন্ত্রে, পুরানে এই নারী-পুরুষের ধারণা দেখতে পাই। অধ্যাত্ম রামায়ণে দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – হে রাম যা কিছু পুংবাচক সব আপনার অংশে আর যা কিছু স্ত্রীবাচক সব সীতার অংশে। এখন এই আত্মা বা পুরুষ জড়ের সাথে নিজেকে এক করে সে প্রকৃতিকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে করছে। প্রকৃতির সাথে পুরুষ নিজেকে এক করে নেওয়ার পরেই ভোগের ব্যাপার এসে যাবে, আর ভোগ যেখানে থাকবে সেখানে ভালো আর মন্দ এই দুটোও থাকবে। ভালো হলে খুব খুশি হয়ে আরো প্রকৃতির সাথে এক হয়ে থাকতে চাইবে। যেমন যারা মদ খায়, নেশা করে তারা প্রথম প্রথম খুব আনন্দ পায়, তারপরে যখন রোগ-ব্যাদি হতে থাকে, আর টাকা পয়সা বেরিয়ে যেতে থাকে তখন বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। পুরুষ ঠিক তেমনি এই প্রকৃতির থেকে যখন চড় থাপ্পড় খেতে শুরু করে, তখন পুরুষ বলে ‘আর না, আর না’। যখন ‘আর না’ বলে তখন সে প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। মিলন আর ছাড়াছাড়ির এই ব্যাপারটাই চলতে থাকে। কতদিন চলে? অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকে। কালের এই পরিধিকে মাপা যায় না।

সাংখ্যে প্রকৃতি খুবই একটা তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব, জগতে যা কিছু আছে সব প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতি সম্বন্ধে আরকটি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাই তা হল প্রকৃতি জড়। এই টেবিল, চেয়ার, গ্লাসকে যেমন জড় বলা হয়, সেই রকম প্রকৃতিও জড়। পরে আইনস্টাইনের Theory of Relativityতে আমরা পেলাম জড় আর শক্তি অভিন্ন, যা কিনা কপিল মুনি অনেক আগে তাঁর সাংখ্য তত্ত্বে বলে গেছেন। সাংখ্যে আকাশ আর প্রাণ দুটোই প্রকৃতি। আকাশ সমস্ত জড় পদার্থের মূল, প্রাণ সমস্ত শক্তির উৎস। কিন্তু এই দুটোই প্রকৃতির অন্তর্গত। কিছু দিন আগে আইনস্টাইন যেটা অঙ্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন, আর যাকে ভিত্তি করে কিছুদিন আগে আণবিক বোমা আবিষ্কার হল, সেই তত্ত্বটাই সাংখ্য দর্শন হাজার হাজার বছর আগে যুক্তি আর অনুভূতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল।

গীতায় পুরুষ বা চৈতন্য এবং প্রকৃতিকে খুব সুন্দর ভাবে সমন্বয় করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলছেন আমার দুটি প্রকৃতি – পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। পরা মানে উচ্চ আর অপরা মানে নিম্ন বা নিকৃষ্ট। গীতার পরা প্রকৃতিই সাংখ্যের পুরুষ আর অপরা প্রকৃতিই সাংখ্যের প্রকৃতি। সাংখ্যের পুরুষের উপর বেদান্ত যেখানে ঈশ্বরকে নিয়ে আসে সেখানেই পুরো ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্ম হয়ে যায়। যিনি চৈতন্য, যিনি পুরুষ তাঁর সব কিছুই অনন্ত, তাঁর মধ্যে যে জ্ঞান আগে থেকেই বিদ্যমান সেই জ্ঞানও অনন্ত। অন্য দিকে সাংখ্যবাদীদের কাছে পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। কিন্তু সংখ্যা শব্দটাকে সরিয়ে দিলে পুরুষ হয়ে যাবেন অনন্ত। এটাই তখন বেদান্তের পুরুষ হয়ে যাবে। সেইজন্য সাংখ্যে আর বেদান্তে বিশেষ কোন তফাৎ থাকছে না। স্বামীজীও সাংখ্য আর বেদান্তকে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। আচার্যের ভাষ্যও সাংখ্য ও

বেদান্ত মতেই চলে। তফাৎ হল সাংখ্যবাদীদের কাছে পুরুষের সত্তা সংখ্যায় অনন্ত কিন্তু বেদান্ত বলে পুরুষই আছেন, পুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই, তিনি অনন্ত। সাংখ্যে পুরুষকে সংখ্যায় অনন্ত বলছে আর বেদান্ত পুরুষকেই অনন্ত বলছে। এই জায়গাটুকু ছাড়া সাংখ্য আর বেদান্তে খুব বেশী পার্থক্য নেই। তাহলে তো দুটোকে এক করে দিলেই হল। কিন্তু না, এক করা যাবে না। এই যে পুরুষ আর প্রকৃতিকে সাংখ্য আলাদা করে দিয়েছে, শুধু আলাদাই নয়, এই দুটো স্বভাবেই আলাদা, এদের দুজনের মধ্যে কোন মিল নেই – এটাকেই বলে দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদে দুটো সত্তা, পুরুষের সত্তা আর প্রকৃতির সত্তা, আর এই দুটো সত্তা পরস্পর থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। কিন্তু যখন এই দুটোকে বেদান্তে নিয়ে আসা হয়, গীতার মতেও নিয়ে এলে দুটো কিন্তু মিলে যায়। কীভাবে মিলে যায়? ভগবান বলছেন – পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি কার? ভগবানের। তাহলে অপরা প্রকৃতি কার? এটাও ভগবানের। তাহলে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। সাংখ্য এই তত্ত্ব কখনই হবে না, সাংখ্যে পুরুষ চিরদিন প্রকৃতি থেকে আলাদা, প্রকৃতি চিরদিন পুরুষ থেকে আলাদা। পুরুষ আর প্রকৃতিকে উপমা দিয়ে বলা হয় – দুটো নদী যেন পাশাপাশি বয়ে চলেছে – একটা পুরুষের নদী আরেকটা প্রকৃতির নদী। পাশাপাশি চলতে চলতে মাঝে মাঝে তাদের মিলন হয়ে যায়, মিলন হওয়া মানেই সৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়া। দুটো নদী কিছু কাল এক হয়ে চলতে চলতে আবার যখন আলাদা হয়ে যাবে তখন সৃষ্টির লয় হয়ে যাবে। এই দুটো নদী অনন্ত কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে আর অনন্ত কাল ধরে প্রবাহিত হতে থাকবে। গীতায় ভগবানও বলছেন *প্রকৃতিং পুরুষধৈব বিদ্যানাদী উভাবপি* – প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে।

মজার ব্যাপার হল পুরুষের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি নেই। পুরুষই একমাত্র চৈতন্য কিনা, ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন পদার্থের। কোন কিছুর উপর ক্রিয়াশক্তিকে কাজ করতে হলে সেগুলোকে ভৌতিক পদার্থ হতে হবে। অন্য দিকে প্রকৃতি হল জড় তাই তার মধ্যে জ্ঞানশক্তি নেই। সাংখ্য বিরোধীরা তাই সাংখ্যবাদীদের আক্রমণ করে বলে ‘ভাই! তোমাদের দুজনের মিলন কীভাবে হয়? একজনের ক্রিয়াশক্তি নেই আরেকজনের জ্ঞানশক্তি নেই’। সাংখ্যবাদীরা এর উত্তরে বলে অন্ধখঞ্জবৎ। অন্ধ যে সে খঞ্জকে কাঁধে তুলে নিয়েছে, খঞ্জ চোখে দেখতে পায়, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর অন্ধ সেই পথ অনুসরণ করে চলছে। খঞ্জ হাঁটতে পারে না কিন্তু অন্ধ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গন্তব্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। উপমার সমস্যা হল, উপমা দিয়ে একটা তত্ত্বকে উপস্থাপিত করা যায় না। বেদান্তীরা তাই বলছেন ‘অন্ধ আর খঞ্জের মিলনটা হল কী করে?’ অন্ধ একটা পাহাড়ের চটিতে পড়ে আছে, খঞ্জ অন্য এক পাহাড়ের চটিতে পড়ে আছে, এবার এদের মিলন হবে কি করে? এরা কি তাহলে বাঘের মত ডাক ছেড়েছিল, বাঘিনী যেমন বাঘের জন্য ডাক দেয়? আর যে অন্ধ সেতো ডাক দিতেই পারবে না, কারণ তার তো চৈতন্য সত্তাই নেই। মনে করা যাক ঘরের এক কোণে ইলেক্ট্রিকসিটির তার পড়ে আছে, আর ঘরের অন্য এক কোণে একটা মোটর পাষ্প রাখা আছে। মোটর ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়া চলবে না। এই তার পর্যন্ত ইলেক্ট্রিসিট আছে, এবার এই ইলেক্ট্রিসিটি মোটর পাষ্প পর্যন্ত যাবে কি করে? ইলেক্ট্রিসিটি নিজে চলে মোটরের কাছে আসতে পারবে না। মোটর আবার ইলেক্ট্রিসিট ছাড়া চলবে না, চলবে কিন্তু তার জন্য ইলেক্ট্রিসিট দরকার। এদের মিলন হবে কীভাবে? এরজন্য তাহলে একটা তৃতীয় সত্তার দরকার। সাংখ্য দর্শনের বিরুদ্ধে এটাই সব থেকে বড় আপত্তি। সাংখ্যবাদীদের কাছে ওদের মত উত্তর আছে, কিন্তু উত্তরগুলো পরিষ্কার নয়।

কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতি পরস্পর একবার কাছাকাছি এসে গেলে প্রকৃতি একেবারে চাপা হয়ে উঠবে, কারণ পুরুষের চৈতন্যের আলো প্রকৃতির উপর প্রতিফলিত হয়ে গেছে। এরপর প্রকৃতির খেলা পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে, আর কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না। সিনেমার প্রজেক্টরে রীল ভরা আছে, প্রজেক্টরও চলছে, কিন্তু আলো নেই। সিনেমা হবে না। প্রজেক্টরে আলো চলে এসেছে এবার সিনেমা পুরোদমে চলতে থাকবে। সাংখ্যের ওই জায়গাটাকে কোন রকমে মেনে নিলে পরে আর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু দর্শন তো এভাবে কখনই মানবে না। বেদান্ত এই ব্যাপারে পরিষ্কার, বেদান্ত বলছে ঈশ্বর আছেন, তিনি কোন কাজ করেন না ঠিকই কিন্তু তিনি আছেন বলেই পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন হয়ে যায়। ঈশ্বরকে নিয়ে এলে আর কোন সমস্যা হয় না। সেইজন্য সাংখ্য দু রকমের হয়ে যায়।

একটা হল নিরীশ্বর সাংখ্য, যে সাংখ্যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আরেকটি সাংখ্য বলছে ঈশ্বর আছেন কিন্তু তিনি কোন কাজ করেন না। যোগদর্শন হল সেরীশ্বর সাংখ্য, যোগের ঈশ্বর ঠুটো জগন্নাথ, ঈশ্বর কোন কাজ করবেন না। তিনি আছেন। তিনি আছেন বলেই পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন হয়। এই পুরুষ আবার বোকা বরের মত। ঠাকুর সাংখ্যের পুরুষের উপমা দিচ্ছেন – বিয়ে বাড়িতে গিন্গী সব কাজ করে বেড়াচ্ছে আর স্বামী বসে বসে তামাক খেয়ে যাচ্ছে, গিন্গী মাঝে মাঝে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে কাজের বাড়ীর সব খবর দিয়ে যাচ্ছে আর স্বামী হুঁ হুঁ করে মাথা নেড়ে আবার তামাক খেতে থাকে। সাংখ্যে প্রকৃতিই সব কাজ করে, বেদান্তেও প্রকৃতিই কাজ করে। বেদান্ত প্রকৃতিকে মায়া বলছে, তার কাছে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। এই জীব, জগৎ, পুরুষ, প্রকৃতি, এদের মিলন, সৃষ্টি, সংহার, পাপ-পুণ্য যা কিছু দেখাচ্ছে সব কিছু ব্রহ্মের উপর মায়ার আবরণের জন্য দেখাচ্ছে। সাংখ্য বেদান্তের এই তত্ত্ব কিছুতেই মানবে না। সাংখ্যের কাছে আছে শুধু পুরুষ আর প্রকৃতি।

সাংখ্যের তৃতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তা হল – চব্বিশ তত্ত্ব, অর্থাৎ চব্বিশ রকমের তত্ত্ব। প্রকৃতি একটা জায়গায় জড় হয়ে বসে আছে, আর সে যখন নিজেকে সম্প্রসারিত করতে শুরু করে, বুড়ির চুলের মত নিজেকে ছড়াতে আরম্ভ করে, তখন প্রকৃতি এই চব্বিশ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে থাকে।

তত্ত্ব আর শব্দ বা নাম দুটো পৃথক, তত্ত্ব একটা ধারণা, যেমন এটা জল, জল একটা শব্দ, এই জলকেই বিভিন্ন ভাষায় বলবে ওয়াটার, পানি, এ্যাকোয়া, কিন্তু যখনই এটা তত্ত্ব হয়ে যাবে তখন জল তত্ত্বকে আর বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করা যাবে না। আত্মা, ঈশ্বর, পুরুষ, প্রকৃতি একটা ধারণা বা ভাব, এগুলিকে ব্যাখ্যা করে বোঝান হয় এর তত্ত্বটা কি, কিন্তু এগুলিকে অনুবাদ করা যায় না। এখানে চব্বিশ তত্ত্বের অর্থ হল, যখন প্রকৃতি নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করে তখন তার চব্বিশটা তত্ত্বের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় প্রকৃতি আসলে কি রকম? তখন বলছেন প্রকৃতি হল ত্রিগুণাত্মিকা। জগতে যে এত রঙ দেখছি, চারিদিকে যে এত রঙের বাহার, আসলে জগতে মাত্রটি তিনটে রঙই আছে – লাল, সবুজ ও নীল। সাদা ও কালো বলে কোন রঙ হয় না। সাতটা রঙ মিলে গেলে সেটা সাদা হয়ে যায় আর সাতটা রঙ চলে গেলে সেটা কালো দেখায়। জগতে মাত্র তিনটে রঙ, অথচ কী আশ্চর্যের কাণ্ড, এই তিনটে রঙের মিশ্রণে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রঙে রাঙায়িত বর্ণময় জগতের সৃষ্টি। আসলে আছে তিনটে রঙ আর বাকি সব রঙ এই তিনটের রঙের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক তেমনি প্রকৃতিও তিনটে জিনিষ সত্ত্ব, রজো আর তমো। এই তিনটে শুধু গুণ। গুণ বলতে ঠিক কি বোঝায়? এনারা তখন অনেক কিছু উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু যত ভাবেই বোঝান হোক যারা বুঝবার তারাই বোঝে, যারা বোঝে না তারা কোন দিন বুঝতে পারবে না। যেমন কোন জিনিষের মধ্যে কিছু গুণ থাকে, আপনি খুব বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানটা আপনার গুণ। সত্ত্ব, রজো আর তমো ঠিক তেমনি তিনটে গুণ। যেখানে যে কোন জিনিষে যা কিছু গুণ আছে সেই গুণটা এই তিনটে গুণের মধ্যে থাকতেই হবে – সত্ত্ব, রজো ও তমো। যে জিনিষটা একেবারে নির্জীব, ভোঁতা হয়ে পড়ে আছে সেটাই তমোগুণ। যেখানে প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য সেখানে রজোগুণ আর যেখানে এই দুটো গুণের সাম্য অবস্থা, শান্ত হয়ে আছে সেটাই সত্ত্বগুণ। এই গুণ সব ক্ষেত্রেই থাকবে, ভোগের ক্ষেত্রে থাকবে, ব্যবহারের ক্ষেত্রে থাকবে, দর্শনের ক্ষেত্রে থাকবে, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা সব ক্ষেত্রে থাকবে। যেখানে যা কিছু আছে, যা কিছু থাকতে পারে সবেতেই এই সত্ত্ব, রজো আর তমোর খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি জলকে এই তিনটে গুণ দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় তখন বরফ যে তমো হবে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাহলে জল সত্ত্ব হবে নাকি রজো হবে? বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বাষ্প রজোর মধ্যে আসবে। বাষ্প হল free molecules তাই বাষ্পের মধ্যে অনেক বেশী activity হবে। তাহলে জল সেদিক থেকে সত্ত্বই হবে কারণ জল বাষ্প আর বরফের সাম্য অবস্থা। সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটেই বিশুদ্ধ গুণ।

এই তিনটে গুণ প্রথম অবস্থায় একেবারে সাম্য ভাবে থাকে, তিনটে বাচ্চা যেন ঘুমিয়ে আছে। তিনটে গুণ যেন তিনটে টিপি হয়ে আছে, সত্ত্বগুণের টিপি, রজোগুণের টিপি আর তমোগুণের টিপি। এবার পুরুষ প্রকৃতির কাছে চলে এল, যেন চুম্বক পাথর লোহার টুকরোর কাছে এসে গেল। চুম্বকের শক্তিতে লোহাগুলো নড়ে উঠল। পুরুষও প্রকৃতির কাছে চলে আসতেই এই তিনটে গুণের টিপি গুলোর মধ্যে নড়াচড়া শুরু হতেই পুরোদমে সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এবার আর প্রকৃতিকে আর কোন ভাবেই আটকানো যাবে না। আটকানোর একটাই মাত্র পথ, পুরুষ যদি প্রকৃতি থেকে সরে আসে।

সাংখ্যের এই ঘটনাকে বিভিন্ন রকম উপমার সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। যেমন বলবে যেমনি প্রকৃতি পুরুষকে দেখে ফেলে তখনি প্রকৃতি তার নৃত্য দেখাতে শুরু করে দেয়। প্রকৃতির নাচ দেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। যখন পুরুষ মুগ্ধ হয়ে যায় তখন সে ভেবে পায় না আমি কি ছিলাম, সম্পূর্ণ ভাবে সে নিজের স্বরূপকে হারিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলে প্রকৃতি থেকে অভিন্ন মনে করতে থাকে। অথচ প্রকৃতির কাছে কিছুই নেই, শুধু এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো। জগৎ সংসার মানে এই তিনটে গুণের খেলা, পুরুষ এখন এই জগৎ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ঠাকুর বলছেন – রসগোল্লাই হোক আর সন্দেশই হোক, এর স্বাদ কত দূর যাবে! গলা পর্যন্তই। গলার নীচে চলে গেলে কোন স্বাদ নেই। যখন সব কিছু সংযমিত হয়ে সাম্য অবস্থায় রয়েছে তখন তাকে বলছে প্রকৃতি। সংযম নষ্ট হয়ে গেলে, যে তিনটে গুণ সাম্য অবস্থায় ছিল, সেই সাম্য অবস্থাটা ভেঙে গেলে প্রথমে সত্ত্বগুণের আধিক্য এসে যাবে। এই তিনটে একই জিনিষ, প্রকৃতিই সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে রূপে বিভাসিত। সাম্য নষ্ট হয়ে গেলে সত্ত্ব এবার রজোতে পাল্টে যেতে পারে, রজো তমোতে আর তমো সত্ত্বতে পাল্টাতে পারে।

তিনটে গুণ সব সময় সমান পরিমাণে থাকে আর তিনটির যোগফলও সব সময় এক হবে। তার মানে কোন কিছুতে যদি সত্ত্বগুণ বেড়ে যায় তাহলে হয় তার রজো গুণ কমে যাবে, আর তা নাহলে তমোগুণ কমে যাবে। সেইজন্য কোন মানুষ বা সমাজ বা দেশ যদি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাহলে তাকে প্রথমে রজোগুণে নিয়ে আসতে হবে। রজোগুণে নিয়ে আসার জন্য কি তাকে অনেক কিছু করতে হবে? কিছুই করতে হবে না, ওই তমোগুণ যেটা আছে সেটাকেই রজোগুণে রূপান্তরিত করতে হবে। রজোগুণ এসে গেলে তাকে সত্ত্বগুণে রূপান্তরিত করা অনেক সহজ। তমোগুণকে সত্ত্বগুণে পাল্টানো অনেক কঠিন। তিনটে গুণের যোগফল সব সময় একই থাকবে। আর এটা কখনই হবে না যে, তিনজন এক সঙ্গে নেই, তিনটে সব সময় একসাথেই থাকবে। আবার পুরোটাই সত্ত্বগুণ অর্থাৎ শতকরা একশ ভাগ সত্ত্বগুণ কারুর মধ্যে থাকবে না। ৯৯.৯% হতে পারে কিন্তু ১০০% কখনই হবে না। তাহলে ঠাকুরকে আমরা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার বলছি কীভাবে? তাহলে কি ঠাকুরের মধ্যে রজো আর তমো গুণ ছিল না? এ জিনিষ কখন হতেই পারে না, হলে তত্ত্ব বিরোধী হয়ে যাবে। ঠাকুরের মধ্যে যদি তমোগুণ না থাকতো তাহলে তিনি ঘুমোতেন কী করে? রজোগুণের লক্ষণ লোভ, অহঙ্কারাদি। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান নিদ্রা। ঠাকুরের মধ্যে তাহলে তমোগুণ রজোগুণ কীভাবে ছিল? খুব সামান্য ছিল। কারণ যেখানে সত্ত্বগুণ থাকবে সেখানেই রজো আর তমো থাকবেই। সেইজন্য মুক্তির অবস্থা হল প্রকৃতির বাইরে, প্রকৃতির বাইরে মানে এই তিনটে গুণের পারে। কোন বিরাট সন্ন্যাসী, কোন জ্ঞানী পুরুষ, কোন অত্যন্ত ভালো মানুষ, অত্যন্ত সেবাপরায়ণ, ধর্মপরায়ণ তার মানে এনারা সবাই সত্ত্বগুণে বাঁধা আছেন। সত্ত্বগুণে বাঁধা মানেই এঁদের মধ্যে রজোগুণও আছে, রজোগুণ আছে মানেই তমোগুণও থাকতে হবে। এর ফল কী হতে পারে? কালই যদি দেখি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রচণ্ড অধর্মপরায়ণ হয়ে গেছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর জ্ঞানীর ভেতর অজ্ঞান এসে তার মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়াতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, নিজেই হয়তো বলবে আমার সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেছে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে। জ্ঞানী মানে তিনি এখনও সত্ত্বগুণে অবস্থিত কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ তিনটে গুণের পারের অবস্থায় যেতে পারেননি।

প্রকৃতি যখন নিজেকে ছড়াতে শুরু করে তখন প্রথম তার যে রূপান্তর হয় তাকে বলছেন মহৎ, মহৎএর ইংরাজী অনুবাদ Cosmic Intelligence, মহৎ হল সমষ্টি মন। বিজ্ঞান বলছে বুদ্ধিই চৈতন্য,

কিন্তু এখানে এসেই বোঝা যায় আমাদের ঋষিরা কীভাবে সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে একটা সত্যে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এখানে বুদ্ধি হল মহৎএর এলাকায়, মহৎ আবার প্রকৃতির এলাকায় রয়েছে, প্রকৃতি নিজে জড়। তাই বুদ্ধিও জড়, অথচ বিজ্ঞানীরা বলছে বুদ্ধিই চৈতন্য। আমরা এই টিউব লাইটের আলো দেখে বলছি টিউব লাইটের আলোতে আমরা পরস্পর সবাইকে দেখতে পারছি। কিন্তু টিউবের নিজস্ব আলো বলে কিছু নেই। টিউবটা একটা কাঁচের জিনিষ, তাতে একটা গ্যাসের কোটিন্ দেওয়া আছে, এবার ইলেক্ট্রিক স্পার্ক গিয়ে সেই গ্যাসটাকে আলোকিত করে দিচ্ছে, সেই আলো টিউবের সাদা কাঁচে রিফ্লেক্ট হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে, আমরা বলছি টিউবের আলোতে সবাই কাজ করছি। প্রকৃতি নিজে জড়, প্রকৃতির এক ধাপ নীচে মহৎ, তারও নীচে বুদ্ধি। মহৎ হল সমষ্টি মন, বেদান্তে এই মহৎকেই বলে হিরণ্যগর্ভ, পুরাণ মতে বলে ব্রহ্মা। যদিও এগুলো সব সময় পুরোপুরি মেলে না, কিন্তু এগুলো এক একটা মত, কিন্তু কাছাকাছি যায়।

যাই হোক মহৎ হল প্রকৃতির ঠিক পরেই। মহৎ এসে যাওয়া মানে সৃষ্টি এবার পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। পুরুষ এখন প্রকৃতির খেলা দেখছে। স্বামী-স্ত্রী যেমন নিজেদের মনে করে আমি আর তুমি এক, পুরুষেরও ঠিক একই দুরবস্থা হয়, সেও মনে করে আমি আর প্রকৃতি এক। এখানে প্রকৃতির নিজের হারাবার কিছু নেই, এতে প্রকৃতিরই মজা। পুরুষ হলেন নির্গুণ নিরাকার, যেমনি প্রকৃতির কাছে এসে গেল পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে শুরু করে আমি গুণময়, যিনি নিরাকার তিনি এখন নিজেকে সাকার মনে করতে শুরু করেন। নিরাকার থেকে সাকার হয়ে যাওয়ার পর সেই পুরুষের মধ্যে কতকগুলি ঐশ্বর্য এসে যায়, আচার্য এটাই বলছেন তিনি হলেন জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য, তেজ ও শক্তিতে সদা সম্পন্ন। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, তিনিই এখন প্রকৃতির আবরণ ধারণ করে নিজেকে গুণময়, ঐশ্বর্য সম্পন্ন মনে করছেন। আমরা কিন্তু এগুলো বেদান্তের দিক থেকে বলছি, সাংখ্যে এসবের কোন স্থান নেই, তাঁরা কোন ঈশ্বর, ভগবানের ধার ধারেন না। ভক্ত বলবে নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কি করব! যাকে আমি আশ্বাদ করতে পারবো না, যাকে আমি ভক্তি করতে পারবো না, তাঁকে নিয়ে আমি কি করব! আমার চাই শ্রীকৃষ্ণ, যাকে আমার বুকে লাগাতে পারবো, যাঁর নুপুরের ধ্বনি শুনতে পাবো, যাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আমার চাই গুণময়। গুণ আসবে কোথা থেকে, তাঁর মধ্যে তো কোন গুণ নেই। তাই তাঁকে প্রকৃতির আশ্রয় নিতে হবে। প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে নিলে তখন প্রকৃতি হয়ে গেল আরেকটি পৃথক সত্তা। এখানে এসে বেদান্তের আবার কঠিন সমস্যা হয়ে যায়। বেদান্ত তো প্রকৃতিকে মানেই না, তাঁরা বলেন মায়া। মায়াকে আবার ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু সাংখ্য প্রকৃতিকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দেবে, প্রকৃতি গুণময়, সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ অনন্ত কাল ধরে চলছে। এখন আমাদের দেখতে হবে কোনটা মানলে সুবিধা হবে। মায়াকে যদি মেনে নিই তখন দর্শনে এক রকম সমস্যা হবে, প্রকৃতিকে মেনে নিলেও দর্শনে সমস্যা এসে যাবে। সেইজন্য কখনই বলা যায় না যে সাংখ্য ঠিক বলছে, না বেদান্ত যেটা বলছে সেটা ঠিক। আমাদের মনে হবে বেদান্তই ঠিক বলছে। কিন্তু সাংখ্য কোন ভাবেই বেদান্তের মতকে ঠিক বলবে না, তাঁদেরও নিজস্ব অনেক যুক্তি আছে।

আমরা যে এই টেবিল, গ্লাস দেখছি এগুলো যে জড় আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আর আমি আপনি, পশু, পাখি যে জড় নয় সেটাও পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সাংখ্যই প্রথম দ্বৈতবাদ, যেখানে দুটো সত্তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম সত্তা পুরুষ বা চৈতন্য সত্তা, আর দ্বিতীয় সত্তা প্রকৃতি বা জড় সত্তা। প্রকৃতি যখন নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করল তখন প্রথম সে নিজেকে মনে করে আমি হলাম জ্ঞানময়, মহতে প্রকৃতি পুরো শুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে আছে বলে প্রকৃতি নিজেকে জ্ঞানময় ভাবে। প্রকৃতির সম্পর্কে এসে পুরুষের আমি-তুমির ভেদটা মিটে যায়, প্রকৃতির কিন্তু কোন ভেদ-টেদ মেটে না। তাই মহতে এসেই কিন্তু প্রকৃতি থেমে থাকে না, পুরুষকে বাঁধার জন্য মহতের ঠিক পরেই সে অহঙ্কারকে নিয়ে আসে।

অহঙ্কার (Cosmic Ego) আসা মানে আমি বোধ, আমি আছি এই অনুভব। অহঙ্কারের বাঁধন হল রজোগুণের বাঁধন, সত্ত্বগুণ কমে গিয়ে এবার রজোগুণের আধিক্য বেড়ে গেল। এখান থেকে প্রকৃতির

বেগ তীব্র আকার ধারণ করে নেয়। অহঙ্কারের পর প্রকৃতি পাঁচটি তন্মাত্রাতে ভেঙে যায়। তন্মাত্রা মানে তৎ মাত্রা। প্রথমে সত্ত্ব, রজো আর তমো ছিল শুদ্ধ গুণ। এখান থেকে এদের বাড়া কমা চলতে থাকে, কখন সত্ত্বগুণ বেড়ে যাচ্ছে, কখন আবার রজো বেড়ে গিয়ে সত্ত্ব আর তমো কমে যাচ্ছে, কখন তমো কমে গিয়ে বাকি দুটো কমে যাচ্ছে, কিন্তু তিনটে গুণের মোট পরিমাণ (sum total) একই থাকে। এই তিনটে গুণ পঞ্চ তন্মাত্রায় পাঁচটি আকার ধারণ করে। এই পাঁচটা আকার কী গুণ, নাকি পার্টিকেলস্ বোঝা খুব মুশকিল। পদার্থ বিজ্ঞানে ইলেক্ট্রন প্রোটনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, এগুলোকে কখন পার্টিকেলের মত আচরণ করতে দেখা যায় আবার কখন ওয়েটের মত আচরণ করে। ঠিক তেমনি এই তন্মাত্রাকে কখন মনে হবে খুব সূক্ষ্ম পার্টিকেল আবার কখন মনে হবে শুদ্ধ গুণ। পঞ্চ তন্মাত্রাকে বলা যেতে পারে শুদ্ধ গুণ আর পার্টিকেলের একটা মাঝামাঝি অবস্থা। স্বামীজী বলছেন ফুলের গন্ধ যেমন আমরা দেখতে পাই না কিন্তু ড্রাণে অনুভব হয়, এটাই তন্মাত্রা। তবে একেও ঠিক তন্মাত্রা বলা যাবে না। গন্ধ মানেই এর মধ্যে একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া থাকবে, আর রাসায়নিক মানেই তাতে মলিক্যুলের বড় স্ট্রীকচার থাকবে। কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রা এরও অনেক নীচে থাকে, মানে আরও মৌলিক।

এই পাঁচটি তন্মাত্রার নাম – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। শব্দ কখন বস্তু হতে পারে না, শব্দ, স্পর্শ আসলে গুণ, সেই রকম রূপ, রস, গন্ধ সবটাই গুণ। কিন্তু আবার একেবারে শুদ্ধ গুণও বলা যায় না, এগুলোকে আবার বলা হয় খুব সূক্ষ্মতর, যার জন্য এর আরেকটা নাম পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, আবার অনেক সময় পঞ্চ মহাভূতও বলে। এর বিভিন্ন নাম হওয়ার কারণ এগুলোকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না, একদিকে মনে হবে এর মধ্যে দ্রব্যের গুণ আছে আবার অন্য দিকে মনে হবে কেবল শুদ্ধ গুণ। এই পাঁচটা তন্মাত্রা এবার এক অপরের সাথে মিশ্রণ হতে শুরু করে। এদের মিশ্রণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, একটা নেবে নিজের অর্ধেক আর বাকি চারটে থেকে নেবে আট ভাগের এক ভাগ করে। যেমন শব্দের সাথে যখন মিশ্রণ হয় তখন শব্দের অর্ধেক নেবে, আট ভাগের এক ভাগ করে স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ থেকে নেবে। ঠিক তেমনি স্পর্শই এই ভাবে স্পর্শের অর্ধেক নিয়ে বাকি চারটে থেকে আট ভাগের এক ভাগ করে নেবে। এইভাবে এই পাঁচটা থেকে আবার পাঁচটা জিনিষ তৈরী হয় – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এগুলোকে বলা হয় পঞ্চভূত বা পঞ্চ স্থূলভূত। এই পঞ্চ তন্মাত্রা দু রকমের সৃষ্টি করে – একটা করছে পদার্থ আর অন্যটা হল পদার্থকে ধরার ক্ষমতা। শুধু পদার্থ তৈরী করলে তো হবে না, ওই জিনিষগুলোকে ধরারও ক্ষমতা থাকা চাই। তাই তন্মাত্রা একটা তৈরী করছে এগারোটা ইন্দ্রিয় আর দ্বিতীয় তৈরী করছে এগারোটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এটাই সৃষ্টি তত্ত্ব, এখানে এসেই সৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওপরের দিকে তিনটি – প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কার, মাঝখানে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্রা) আর পঞ্চ স্থূলভূত আর নীচের দিকে দশটা ইন্দ্রিয় আর মন (৩ + ৫ + ৫ + ১০ + ১ = ২৪)। পুরাণাদিতে এগুলোকে বলে প্রকৃতি আর বাকিগুলিকে বলে বিকৃতি, আসলে বাকি গুলো প্রকৃতিরই বিকার। প্রথম যে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের কথা বলছে এটাই একেবারে সূক্ষ্ম অবস্থা (pure state) এরপর হয় পঞ্চীকরণ। সেখান থেকে আবার স্থূলভূত তৈরী হয়। দশটি ইন্দ্রিয়কে ভাগ করা হয় পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়তে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছয় নম্বর শ্লোকটা মুখস্ত রাখলে এই চব্বিশ তত্ত্বকে মনে রাখতে খুব সুবিধা হবে। শ্লোকটি হল মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ। এই হল সাংখ্যের চব্বিশ তত্ত্ব, সৃষ্টি কিভাবে হয় তার ব্যাখ্যা। বেদান্তের কাছে এর আবার তেমন কিছু গুরুত্ব নেই। শাস্ত্র অধ্যয়নেও এর সেই রকম কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। তবে আমাদের জেনে রাখা ভালো।

সাংখ্যের পঁচিশ নম্বর হল পুরুষ, পুরুষ আবার কোন তত্ত্ব নয়। আমরা তত্ত্ব বলতে বুঝি আসল জিনিষকে, যেমন বেদান্ত তত্ত্ব। বেদান্ত তত্ত্ব বললে বোঝাবে বেদান্ত দর্শনের মূল বক্তব্য। কিন্তু সাংখ্যে তত্ত্ব মানে নিকৃষ্ট। সাংখ্যের তত্ত্ব কতকটা বাংলার ‘মাল’এর মত। কেউ যদি বাংলায় বলে ‘কিছু মাল আছে’? এর অর্থ হল ভালো কিছু আছে কিনা জানতে চাওয়া হচ্ছে। আবার ‘মাল’ নোংরা অর্থেও ব্যবহার করা হয়, ‘ওই লোকটি একট মাল’। সংস্কৃতে তত্ত্বটাও ঠিক তাই, কখন বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয় আবার কখন নিকৃষ্ট অর্থেও ব্যবহার হয়। সাংখ্যে তত্ত্ব শব্দকে নিকৃষ্ট অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

বেদান্তে তত্ত্ব মানে সার। এই সব কারণে শাস্ত্র অধ্যয়ন খুব কষ্ট সাধ্য। কথামতেই আছে, হাজার চব্বিশ তত্ত্বের তালিকা দিতে গিয়ে ষড়রিপুকেও চব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। হাজার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় বসে থাকতেন আর উনি কত বড় জ্ঞানী দেখাবার জন্য লোকেদের সামনে শাস্ত্রের অনেক ভুলভাল কথা বলতেন। চব্বিশ তত্ত্বের হিসাব মেলাতে না পেরে তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলোকেও চব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। হাজার কথা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন ‘দ্যাখো! হাজার কাণ্ড, ষড়রিপুকে তত্ত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে’। আমরা বলি ঠাকুর শাস্ত্র পড়েননি, কিন্তু তিনি বলতেন ‘আমি শুনেছি কত’। শাস্ত্রের কথা তিনি যেটা জানতেন সেটা ঠিক ঠিক জানতেন। সাংখ্যের চব্বিশ তত্ত্বের কথাও তাঁর জানা ছিল। চব্বিশ তত্ত্বের মত শাস্ত্রের কিছু কিছু জিনিষ আমাদের জেনে রাখা ভালো।

এইভাবে প্রকৃতি যখন বিভিন্ন ভাগে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে যায় তখন রজোগুণ তমোগুণ এগুলোর আধিক্যটা কমতে কমতে নীচে নেমে যায়। শব্দের স্থান হল আকাশ, শব্দের পরে আসে স্পর্শ। স্পর্শের স্থান বায়ু, বায়ু না থাকলে স্পর্শ হবে না। রূপের স্থান অগ্নি, রসের স্থান জল আর গন্ধের স্থান পৃথিবী। পৃথিবীর মধ্যে অর্ধেক রয়েছে গন্ধ আর আট ভাগের এক ভাগ করে বাকি চারটে রয়েছে। এভাবেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়। তার মানে জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটার মধ্যে সব কিছু নেই। যেমন পেট্রল, পেট্রলে জল তত্ত্ব আছে, জল তত্ত্ব না থাকলে তরল হবে না, আর পৃথিবী তত্ত্ব না থাকলে পেট্রলের কোন গন্ধ নাকে আসবে না, তার থেকেও বড় হল অগ্নি তত্ত্ব আছে, অগ্নি তত্ত্ব না থাকলে পেট্রল জ্বলবে না। শুধু জলের মধ্যেও এই তিনটে জিনিষ আছে, কিন্তু অনুপাতের তারতম্য থাকবে। যেমন পেট্রলের মধ্যে অগ্নি তত্ত্ব অনেক বেশী পরিমাণে আছে, জলে আবার অগ্নি তত্ত্ব অনেক কম। এগুলো সাংখ্যদের মত। এটাই সাংখ্যের চব্বিশ তত্ত্ব।

চব্বিশ তত্ত্ব দিয়ে এবার জগৎ দাঁড়িয়ে গেছে। জগৎকে ভোগ করার জন্য ইন্দ্রিয়রা এসে গেছে। ইন্দ্রিয়গুলোকে চালনা করার জন্য মন দাঁড়িয়ে গেছে। নর্তকী এখন মঞ্চে এসে গেছে, দর্শকরাও এসে গেছে আর আপনি শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষ দুটোর সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলেছেন। ব্যস্, এবার পুরো জগতের খেলা চলতে শুরু করে দেবে – সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, পূণ্য, পাপ, ধর্ম, অধর্ম সবাই এসে আপনাকে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে যাচ্ছে।

এই তত্ত্বের বাইরে যেটা আসল তিনিই হলেন পুরুষ, তিনিই চৈতন্য। তাহলে প্রকৃতি কি নকল? কখনই নকল নয়, প্রকৃতি আছে বলেই তো এত মজা। ঠাকুর বলছেন জটীলা-কুটীলা না থাকলে লীলা পোষ্টাই হবে না। প্রকৃতি যদি না থাকত তাহলে এই সৃষ্টির কোন খেলাই হতো না। বিজ্ঞানও আজ বলছে সৃষ্টিতে পুরুষের কোন দরকারই লাগে না, শুধু নারী থাকলেই সৃষ্টি হয়ে যাবে। সৃষ্টিতে শুধু বৈচিত্র্য আনার জন্য পুরুষের দরকার। ক্লোনিং পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে এই ব্যাপারটা কারুর জানা ছিল না। ক্লোনিং পদ্ধতিতে সমস্যা হল যার ক্লোনিং করা হবে ঠিক তারই ডুপ্লিকেট সৃষ্টি হবে, সেখানে কোন বৈচিত্র্য আসবে না। সৃষ্টিতে এই বৈচিত্র্য আনার জন্য পুরুষের দরকার। সাংখ্যের পুরুষের আবার কোন বৈচিত্র্য নেই, সেখানে প্রকৃতি বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে। একবার একটি অবিবাহিত যুবক ভক্তকে তার পরিচিত এক মহারাজ বোঝাচ্ছেন ‘দেখো বাপু! বিয়ে-খা অত্যন্ত বাজে জিনিষ, বিয়ে করলে দু-তিন বছরেই যা সুখ পাওয়ার পাবে, এরপর বাকি জীবনটা শুধু মাথা ব্যাথা নিয়ে কাটাতে হবে’। বলার পর মহারাজ ভাবলেন ছেলেটিকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পেরেছেন। সব শুনে ছেলেটি বলছে ‘মহারাজ! ওই দু-তিন বছরে যা আনন্দ আছে না, ওই আনন্দের জন্য সারা জীবন কষ্ট সহ্য করা যায়’। এই হল প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতি প্রথমে খুব সুখ, আনন্দ দিয়ে আশ্চর্যপুষ্টে বেঁধে ফেলে। যৌবনে মানুষ সুখের সন্ধান দৌড়ে মরে, আর বার্ধক্যে একটু শান্তি পাওয়ার জন্য হাঁকপাঁক করতে থাকে। তারপর যখন মানুষ কষ্ট পেতে শুরু করে, এমন এমন আঘাত আসতে থাকে তখন সে বুঝতে পারে যারাই সুখ চায় তাদের দুঃখও পেতে হয়, যারাই শান্তি চায় তাকে অশান্তি ভোগ করতে হয়। আসল সুখ কোথায়? সুখ-দুঃখের পারেই সুখ। শান্তি কোথায়? শান্তি-অশান্তির পারে। সন্ন্যাসী বলছে ‘শান্তি লাভের জন্য সব কিছু

ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু তাও শান্তি পেলাম না’। গৃহস্থ বলছে ‘বিয়ে করলে একটা শান্তির আশ্রয় পাবো, জুড়োবার জায়গা হবে’। কিন্তু কোথায় শান্তি, কোথায় জুড়োবে, সংসারে তো দাবানল জ্বলছে। জাগতিক অর্থে আমাদের শাস্ত্র কোথাও বলছে না যে তোমাকে আমি শান্তি দেব। শাস্ত্র বলছে তুমি প্রকৃতির এই খেলা থেকে নিজেকে আলাদা করে ওখান থেকে বেরিয়ে এস। ঠাকুর গলায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে পড়ে আছেন। বাড়ি ভাড়া টাকা জোটানো যাচ্ছে না, ঠাকুরের সেবা, তার উপর এতগুলো লোকের খাওয়া-দাওয়ার পয়সা জুটছে না। লোকের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। তাই বলে কি তখন অশান্তি ছিল না! যিনি অবতার, সাক্ষাৎ ভগবান তাঁর সেবার জন্য এর ওর কাছ থেকে চাঁদা তুলতে হচ্ছে। সাক্ষাৎ ভগবানের শরীরের এমন যন্ত্রণা যে সেই দেখে অন্যরা বিগলিত হয়ে যাচ্ছেন। অশান্তি তো তাঁরও ছিল। যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে, সেটাকে কী কেউ শান্তি বলতে পারবে! ঠাকুর ও যিশুর কাছে শান্তি কোথায়? তাঁরা প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। এগুলো শরীরের খেলা। কে খেলা করছে? প্রকৃতি, প্রকৃতি প্রকৃতির মত খেলা করে যাচ্ছে, আমি প্রকৃতি থেকে আলাদা। আমরা যে অর্থে শান্তি জানি, ওই অর্থে কারুরই শান্তি হয় না। সুখ মানেই দুঃখ পেছনে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, শান্তি মানেই অশান্তি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই আসা-যাওয়া কোন দিন থামবে না। অর্জুনকে তাই ভগবান বলছেন – অর্জুন! তুমি নির্দ্বন্দ্বো হও। সুখ-দুঃখের পারে, শান্তি-অশান্তির পারে যে সুখ শান্তির কথা শাস্ত্র বলছে, সেটা অন্য ধরণের সুখ-শান্তি, আমি আপনি যে জাগতিক সুখ-শান্তির কথা ভাবছি তার কথা শাস্ত্র কখনই বলবে না।

পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছ থেকে মার খেতে শুরু করে তখন তার একটু একটু করে চেতনা আসতে থাকে, তখন তার শাস্ত্রের দিকে মন যাবে, শাস্ত্র পাঠের ফলে পুরুষ আত্মচিন্তন করতে থাকবে, তখন সে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকৃতি থেকে আলাদা ভাবে শুরু করে। যেমন যেমন সে নিজেকে আলাদা করতে থাকে তেমন তেমন তাঁর যে আত্মশক্তি, পুরুষ বা চৈতন্যের যে অনন্ত শক্তি, সেটা ধীরে ধীরে জাগতে থাকে, আর ততই নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করে। প্রকৃতির জালে বদ্ধ হয়ে থাকা পুরুষ যত পরিমাণে বড় হতে থাকে অন্য দিকে প্রকৃতিও তখন সেই অনুপাতে ছোট হতে থাকে। কিভাবে এই ব্যবধাণটা কমে? ধ্যানের মাধ্যমে হয়। সাধক যত ধ্যানের গভীরে যাবে ততই তার চৈতন্য শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে, চৈতন্য শক্তির প্রকাশ যত বাড়তে থাকে প্রকৃতিও তত ছোট হতে থাকে। এখান থেকে যোগীর আর ব্রহ্মাণ্ডের আকারের মধ্যে যে তুলনামূলক পার্থক্যটা ছিল সেটা ক্রমাগত কমেতে থাকে। এইভাবে চলতে চলতে একটা সময় আসবে যখন পুরুষ আর প্রকৃতির আকার সমান হয়ে যাবে।

পুরুষ প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলে কি করে? এটাই রহস্য, এই রহস্যভেদ কোন দিন করা যাবে না, কেউ করতেও পারবে না। আমরা শুধু মাত্র জানি – আমার এই দেহ আছে, আমার এই মন আছে কিন্তু আমার শরীর আমার কথা মত চলে না আর আমার মন সदा সর্বদা চঞ্চল, আর শরীরে নানান ধরণের ব্যাধি লেগেই আছে। রাজযোগ বলছে – ঠিক আছে, তুমি এটুকু বুঝতে পেরেছ যে তোমার একটি শরীর আছে আর তোমার একটি মন আছে যারা তোমার কথা মত চলে না। তুমি কী চাও তোমার শরীর আর মনকে তোমার মত চালাতে? তাহলে তুমি আমার কাছে এসো, তোমার মন আর শরীরকে কিভাবে তোমার ইচ্ছামত চালাবে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। যদি আমার কাছে শিক্ষা পেতে চাও, তাহলে আমার কথা মত অভ্যাস শুরু করে দাও। যদি বল এখানে তো অনেক উঁচু উঁচু কথা বলা হচ্ছে, এগুলো কি আমি বুঝতে পারব? রাজযোগ বলবে – তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না, তুমি যদি চাও তাহলে আমার কথা মত অনুশীলন আর অভ্যাস শুরু করে দাও। অনুশীলন করতে থাকলেই তুমি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্যগুলি একটু একটু করে ধরতে পারবে, যখন সামান্য একটু পার্থক্য ধরতে পারবে তখন তোমার বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ করবে, যখন বিশ্বাস হতে শুরু করবে, তখন তুমি আরো জোর কদমে অভ্যাস করতে থাকবে। যতই তুমি সাধনা করতে থাকবে ততই তুমি অনভূতির রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকবে।

সাংখ্য ও যোগ ষড়দর্শনের প্রথম দুটি দর্শন। ষড়দর্শনের তৃতীয় ও চতুর্থ দর্শন ন্যায় আর বৈশাখিক। ন্যায় আবার ভগবান মানে, বৈশাখিক ভগবানের উপর বেশি জোর দেয় না। ঈশ্বর লাভের

ক্ষেত্রে এই দুটো দর্শনকে আজকাল অপ্রচল বলেই ধরা হয়। বৈশাধিকের কিছু কিছু ধারণা অন্যান্য দর্শনে মিশে গেছে। কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বৈশাধিক দর্শনকে ইদানিং কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না।

তারপর আসে পঞ্চম ও ষষ্ঠ – দুটোই কর্মকাণ্ডের উপরে – এই দুটো দর্শনকে বলা হয় পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা বা পরবর্তি কালে যা বেদান্ত নামেই বেশি পরিচিত। এর মধ্যে পূর্বমীমাংসাও বর্তমানে অচল, যেখানে বেদের বিভিন্ন যাগ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, এই যজ্ঞ করলে স্বর্গে যাবে, এই যজ্ঞ করলে সন্তান হবে বা যুদ্ধে জয় পাবে। কর্মকাণ্ডীদের কিছু কিছু প্রথা পদ্ধতি চলে গেছে পুরানে, আর কিছু গেছে তন্ত্রে। বর্তমানে এগুলোই তাদের নিজস্ব ক্রিয়া পদ্ধতি রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। বেদান্ত এই পাঁচটি দর্শনের মূল্যবান তত্ত্বগুলিকে, যেগুলো মানবজাতির আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সার্বজনীন ভাবে প্রযোজ্য, সেগুলোকে একত্র করে একটা আলাদা দর্শনের জন্ম দিল। কিন্তু বেদান্তের নিজস্বতা হল উপনিষদ, উপনিষদই আসল বেদান্ত।

শঙ্করাচার্যকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ সমণ্ডকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর মত এত বড় সমণ্ডকারী আচার্য ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত পায়নি। শঙ্করাচার্য সাংখ্য থেকে সৃষ্টিতত্ত্বটা নিলেন, কেননা সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এত পরিষ্কার, যুক্তিযুক্ত আর বিস্তৃত ভাবে সাংখ্যের মত কেউ এর আগে দিতে পারেনি। যোগ থেকে তিনি নিলেন সাধনার অঙ্গগুলি। বেদান্ত মতে যেভাবে সাধনা করে অদ্বৈত জ্ঞানানুভূতির দিকে এগোবে তার পুরোটাই আচার্য নিলেন যোগ থেকে। ন্যায় থেকে নিলেন যুক্তি দিয়ে তোমাকে একটা তত্ত্বকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বৈশাধিকদের থেকে তিনি কিছু সূক্ষ্ম জিনিষ বেদান্তে নিয়ে এলেন। আর কর্মকাণ্ডীদের তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন তুমি এখনও বেদান্ত ও অদ্বৈত জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত নও, সেইজন্য তুমি এখনও কাজ করে যাও। কর্ম না করলে কক্ষণ কর্মমুক্তি হবে না। শঙ্করাচার্য কর্মযোগকেও গ্রহণ করছেন, কিন্তু তিনি বলছেন – ঠিক ঠিক কর্মযোগ করার পর যখন কর্মকে ছেড়ে দেবে তখনই তোমার প্রকৃত শান্তি আসবে, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবার যদি কাজ করতে হয় তখন পুনরায় কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মূল কথা কাজ করছে কি করছে না তাতে তার কিছু আসে যায় না, কতটা অনাসক্ত হয়ে করছে সেটাই আসল। শঙ্করাচার্য সব কটি দর্শনকে সমণ্ড করে বর্তমান বেদান্তের মূল দর্শনকে অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষের জন্য উপস্থাপন করে দিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূল আদর্শ যদিও বেদান্ত, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারাতে সাংখ্য ও যোগদর্শনেরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কারণ সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য ছাড়া হবে না, আর যোগের অনুশীলন ছাড়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে কখনই অগ্রসর হওয়া যাবে না। স্বামীজী নিজেই ভারী কালের সাধকদের জন্য সম্পূর্ণ নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-ভাবনা দিয়ে রাজযোগের ওপর অমূল্য কাজ করে গেছেন।

অঙ্ক করার সময় যে যোগ বিয়োগের কথা বলা হয়, আর এখানে যে যোগের কথা বলা হচ্ছে, এই দুটো যোগ শব্দ সেই একই ধাতু, যুজ্ ধাতু থেকে এসেছে। যুজ্ ধাতুর মূল অর্থ যুক্ত করা, দুটো জিনিষকে জুড়ে দেওয়া। যুজ্ ধাতু থেকে বিভিন্ন অর্থ হয়, অঙ্কে এর অর্থ দুই বা ততোধিক সংখ্যাকে জুড়ে দেওয়া। কর্মযোগ মানে নিজের মনুষ্যত্বের সঙ্গে অপরের মনুষ্যত্বকে এক করে দেওয়া। যখন বলা হয় গরীবের জন্য কিছু কর, গরীবের জন্য দুঃখ প্রকাশ কর, তখন আমরা কর্মযোগের কথাই বলছি। ভক্তি যোগে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক নিয়ে যুক্ত করার কথা বলছে। যখন জ্ঞানযোগের কথা বলছি তখন ক্ষুদ্র আমিকে বা জীবাত্মাকে পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের সাথে এক করার কথাই বলছি। যখন রাজযোগে আসছি তখন আমরা এই প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমার সেই প্রকৃত স্বভাব শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে বা পুরুষের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাই বলছি। সব পথ একই কথা বলছে তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও আকারে বলছে। যোগের একমাত্র লক্ষ্য – আমার প্রকৃত যে স্বরূপ সেই স্বরূপের সাথে নিজেকে অভিন্ন দেখা, জগতে যা কিছু আছে, সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নিজের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বর্তমানে আমরা এই শরীর, মন, অহঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছি, কিন্তু এই শরীর, মন ও অহঙ্কারের থেকে নিজেদের আলাদা করে যখন সেই উচ্চ অবস্থায় চলে যাব তখন আমরা আমাদের সেই উচ্চ সত্ত্বার সাথে এক হয়ে যাব। এটাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য।

যোগদর্শনের উপাদান গুলি আমরা উপনিষদেও পাই, উপনিষদে থাকা মানে এগুলো আগে থেকেই বেদে ছিল। মহাভারতেও অনেক যোগের কথা পাওয়া যায়, পুরাণেও যোগদর্শনের উপর অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। মহর্ষী পতঞ্জলিকে আমরা যোগের মূল প্রবক্তা বলি। পতঞ্জলি ছিলেন বিরাট জ্ঞানী এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ। ঈশামুসার জন্ম নেওয়ার তিনশ বছর আগে আজকের এই যোগ শাস্ত্রকে তিনি একটি সুসংবদ্ধ ও প্রণালিবদ্ধ দর্শনের স্তম্ভ রূপে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যোগদর্শনের কাছে খ্রিস্টানরা নেহাতই শিশু। যোগ দর্শনকে একটা পুরোপুরি ছকের মধ্যে দাঁড় করাতে গিয়ে পতঞ্জলি একবারও কোথাও তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার কথা উল্লেখ করেননি। যোগের উপাদানগুলি বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তিনি শুধু সেগুলিকে সংগ্রহ করে সূত্রাকারে ঠিক সেইভাবে উপস্থাপন করে দিলেন। সূত্রের বৈশিষ্ট্য হল, একটা গভীর তত্ত্বকে কয়েকটি শব্দের মধ্যে বলে দেওয়া হয়। এটাই পরে পরে গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরায় চলতে থাকে।

আগেকার দিনে গুরুর কাছে যখন কোন শিষ্য জ্ঞানার্জনের জন্য যেত, গুরু অনেক বছর ধরে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিষ্যের মনকে আগে পরিশুদ্ধ করে নিতেন। কেননা যতক্ষণ মনের শুদ্ধিকরণ না হচ্ছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক উচ্চ তত্ত্বের কোন ধারণাই সে করতে পারবে না। শুদ্ধিকরণের প্রাথমিক প্রক্রিয়াই হল হাড়ভাঙা কায়িক শ্রম। তাই শিষ্য, সে যে বয়সেরই হোক না কেন, প্রথমেই গুরু বলতেন ‘আশ্রমে থাকতে এসেছ, খুব ভালো, থাকো’। শিষ্য হয়তো জানতে চাইছে তাকে কি করতে হবে। প্রথমেই গুরু তাকে গরু চড়াতে মাঠে ঘাটে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর বেশ কয়েক বছর যখন গরু চড়াল, গরুর সংখ্যা বেড়ে গেছে, তখন বলতেন ‘ঠিক আছে এখন আশ্রমে রোজ বাঁটা দাও’। এখন আশ্রমে বাঁটা দিয়ে যাচ্ছে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আসছে। এই কাজগুলিও বেশ কয়েক বছর ধরে করার পর এবার তাকে ঘরের ভেতরে প্রবেশের অধিকার দিয়ে বললেন ‘আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে গুরুমাতা আছেন, তাঁর কাজে সাহায্য করো গিয়ে’। এইভাবে গুরুগৃহে দশ বারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এবার গুরু শিষ্যকে মাঝে মাঝে দু চারটে কথা বলতে শুরু করলেন। সন্ধ্যা বেলায় বসে আছেন, কোন কাজকর্ম নেই, অথবা খাওয়া দাওয়ার পর গুরু শুয়ে আছেন, শিষ্যরা গুরুর পদসেবা করছে, তখন গুরু শুয়ে শুয়েই এই কাহিনী, সেই কাহিনী শোনাতেন। এই ভাবে গুরু শিষ্যদের মন বুদ্ধিকে পরিষ্কার করতেন। এবারে মন যখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন গুরু একটু একটু করে খুব ছোট করে তত্ত্ব কথা দিতে শুরু করলেন। এইভাবে মন যখন আরো শুদ্ধ হয়ে গেল তখন গুরু শিষ্যকে একটা সূত্র, কিংবা দুটো সূত্র বলতেন। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা সহজে কাউকে বিদ্যা দান করতে চাইতেন না, শিষ্যকে কতভাবে যাচাই করে, পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণরা নিজেদের শিষ্য করতেন।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রের উপরে কত রকম ডিগ্রী কোর্স তৈরী হওয়ার ফলে অনেকেই শাস্ত্র পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এখন এটা ভালো না খারাপ? এই ভালো খারাপটা নির্ভর করবে ছাত্রের মানসিক গঠন ও তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর, সে এই বিদ্যাটা কিভাবে বিচার করছে আর কাজে লাগাচ্ছে। সর্বত্রই দেখা যায় যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চ জ্ঞানের প্রসার হতে শুরু করে তখন সংখ্যার দিক দিয়ে জ্ঞানের অনেক প্রসার হচ্ছে ঠিকই কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান অনেক নিম্নমুখী হয়ে যায়। যখন নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হয় তখন গুরুর শক্তিটা একটা জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকার ফলে শক্তির অপচয়টা বন্ধ হয়ে যায়, আর শিক্ষার গুণগত মান অনেক বেড়ে যায়। স্কুলে যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে কলেজে তার তুলনায় কিছু কম পড়তে যায়। আবার কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরো কমে যায়। আবার যখন পিএইচডি করতে যাচ্ছে তখন শিক্ষক আর ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত এক এক হয়ে যায়।

পতঞ্জলি যোগকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। সূত্র মানে যখন একটা গভীর তত্ত্বকে দু-চারটে শব্দের মাধ্যমে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়। বড় বড় মোটা মোটা গ্রন্থ পড়ে মনে রাখা খুব কঠিন। কিন্তু মূল তত্ত্বগুলোকে দুটো-তিনটে শব্দে বলে দিলে সেগুলো খুব সহজে মনে রাখা যায়। ছাত্ররা এই সূত্রগুলো মুখস্ত করে নিত। মুখস্ত করে নিলে পুরো শাস্ত্রটাই তার জানা হয়ে গেল। এরপর ছাত্র গুরুর

কাছে সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা শুনে নিত। আগেকার দিনের গুরুরা বেছে বেছে শিষ্য করতেন আর দর্শনের তত্ত্বগুলিকে সূত্রাকারে ব্যবহার করা হত, যাতে করে একদিকে শিষ্যের বুদ্ধির চর্চা যেমন হত, অন্য দিকে অযোগ্য লোকের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভবনা কম হওয়াতে এর ভাব ও তত্ত্বগুলি বিকৃত হতে পারত না।

জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া

এই বহির্জগত আমার বাইরে কিন্তু বহির্জগতের জ্ঞান কীভাবে আমরা অর্জন করছি? পদার্থ বিজ্ঞানের কাছে এটি একটি বিরাট সমস্যা, নিউরো বিজ্ঞানের কাছেও বিরাট বড় সমস্যা আর আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে আরও বড় সমস্যা। এই প্রশ্ন সরাসরি চৈতন্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কারণ জ্ঞান অর্জনের এলাকাতে একমাত্র চৈতন্যের ভূমিকাই কাজ করে। কিন্তু নিউরো বিজ্ঞান বলবে বস্তুর উপর আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখের রেটিনাতে গিয়ে বস্তুর একটা ইমেজ তৈরী করছে, সেই ইমেজকে অপ্টিক নার্ভস বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্ক এমন ভাবে তৈরী যে, সে বুঝতে পারছে আমার উপর একটা ইমেজ এসে পড়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছে আমাদের মস্তিষ্কে প্রায় একশ বিলিয়ন নিউরোন আছে। এতগুলি নিউরনের মধ্যে মাত্র আট শতাংশ নিউরোন কাজ করে, বাকি নব্বুই বা বিরানব্বুই শতাংশ প্রসেসিং কাজে লাগে। কম্পিউটারেও পুরো মেমরি আমরা ব্যবহার করতে পারি না, কিছু মেমরি রাখা থাকে তার নিজস্ব কাজ করার জন্য। মস্তিষ্কও ৯০% থেকে ৯২% রেখে দেয় নিজের কাজ করার জন্য। খুব বিরল কয়েকজন আছেন যাঁদের ১১% নিউরোন কাজ করে। আইনস্টাইনের সম্বন্ধে বলা হয় তিনি নাকি ১২% থেকে ১৩% ব্যবহার করতেন। ১৪% এর উপরে যেতেই পারবে না। এই নিউরোন গুলোর মাধ্যমে নানান রকমের যে সার্কিটস আছে তাতে বিভিন্ন রকমের ইলেক্ট্রিক্যাল ইম্পালস্ যাচ্ছে, সেই ইম্পালস্ থেকে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল রিয়েকশান হচ্ছে, এই কেমিক্যাল রিয়েকশান থেকে কোথাও একটা আমি আছি এই বোধ হচ্ছে। আর ‘আমি আছি’ এই বোধ থেকে এই জিনিষটা আমার এখানে হয়েছে আর depth, texture, colour মিলিয়ে তার বহির্জগতের ধারণা তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হল, যা কিছু হওয়ার সব আমার মস্তিষ্কের ভেতরেই হচ্ছে কিন্তু জগতকে দেখছি বাইরে। সমস্ত রকমের প্রসেসিং আমার ভেতরেই হচ্ছে কিন্তু জগতের সব কিছুকে বাইরে দেখছি আর জানছি আমি আর এই জগৎ আলাদা। কিন্তু এই দুটোকে মেলাবে কীভাবে? বেদান্তের কাছেও এই এক সমস্যা। কিন্তু বেদান্তের নিজস্ব একটা যুক্তি আছে আর সেই যুক্তিতে তাঁরা একেবারে অনড়, ওখান থেকে কেউ বেদান্তকে নাড়াতে পারবে না। বেদান্তের যুক্তি খুব সাধারণ।

বিজ্ঞান বলছে এই বোতলের উপর আলো পড়েছে, সেই আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখের রেটিনাতে পড়ল, অপ্টিক নার্ভস দিয়ে সেটা গেল মস্তিষ্কে, সেখানে মস্তিষ্কের উপর যেন একটা নাড়া পড়ে গেল। এরপরে বিজ্ঞান বলছে, বিচিত্র এক পদ্ধতিতে মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি উৎপন্ন হয় যার জন্য মনে করে আমি দেখছি আর বস্তুকে বস্তুর জায়গায় দেখছি। বেদান্ত ও যোগে বলবে আমাদের কাছে এর কোন সমস্যাই নেই। সহজ করে বলে দেবে, সব কিছুর পেছনে আছেন শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি পুরুষ। আমাদের ভেতরে যিনি অন্তরাত্মা তিনি কতটুকু আকারে, কি পরিমাণে আছেন, তিনি কি ভগবান, নাকি শুদ্ধ আত্মা, এগুলোকে নিয়ে এনারা বেশী কিছু আলোচনা করবেন না। শুধু বলে দিলেন পুরুষ রয়েছেন। এর আগে যে বলা হল ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ এই যে গোচর, যেখানে ইন্দ্রিয়রা চরে বেড়ায়, দশটি ইন্দ্রিয় আর মন একসাথে আমাদের মস্তিষ্কে বসে আছে। মজার ব্যাপার হল, স্বামীজী যেটা প্রথম বলেছিলেন মস্তিষ্কে দশটি ইন্দ্রিয় ও মন বসে আছে, আজকে নিউরো বিজ্ঞানীরা রীতিমত এগারোটা ইন্দ্রিয়ের সেন্টার মস্তিষ্কে খুঁজে বার করে নিয়েছে। মস্তিষ্কে আমরা ঘিলু বলতে যেটাকে বলছি, তার মধ্যে সব ভাগ ভাগ করা আছে, এর এই অংশটা নাকের জন্য, এই অংশ কানের জন্য। ইন্দ্রিয়ের সব সেন্টারগুলো পাশাপাশি আছে। একটা সেন্টারের স্পেস যদি কমে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের সেন্টারটা টেনে নেয়। যেমন আমাদের চোখ, রেটিনা থেকে যে নার্ভ মস্তিষ্কে যাচ্ছে, সেখানে সে মস্তিষ্কের নার্ভ সেন্টারের শতকরা আশি ভাগ জায়গা দখল করে বসে আছে। বাকি চারটে মিলে কুড়ি শতাংশ নেয়। যদি কেউ অন্ধ হয়ে যায় তখন চোখের আশি ভাগ ফাঁকা জায়গাটা ওর পাশের

ইন্দ্রিয়গুলো টেনে নেবে। হাতের যে অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে তার ঠিক পাশেই গালের অনুভূতির কেন্দ্র অবস্থিত। কারণ হাত যদি কেটে বাদ হয়ে যায়, তখন গাল হাতের মস্তিষ্কের ফাঁকা জায়গাটা দখল করে নিজের দিকে টেনে নেয়। মজার ব্যাপার হল, হাতের যে জায়গাটা গাল টেনে নিয়েছে তার মধ্যে তখনও হাতের মেমরি রয়ে গেছে। কোন কারণে যদি গালে মাছি বসে যায়, সে তখন চোঁচাবে আমার হাতে মাছি বসেছে। কিন্তু তার তো হাত নেই, অথচ বলছে হাতে মাছি বসেছে। সবাই ভাববে হাতটা কেটে গেছে বলে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। নিউরো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বলে দিলেন, এখানে পাগলামোর কিছু নেই, আসলে হাতের জায়গাটা গাল টেনে নিয়েছে বলে এই জিনিষ হচ্ছে।

খুব বিখ্যাত নিউরো বিজ্ঞানী ডাঃ ভি এস রামচন্দ্রনের এর উপর লেখা অনেক বই আছে, তার মধ্যে ‘ফ্যান্টমস্ ইন দা ব্রেন’ খুব নামকরা বই। বিজ্ঞানীরা এখন রীতিমত ম্যাপিং করে দিয়েছে। তাতে এমন সব বর্ণনা আছে পড়লে হাসি আর থামবে না। একটা অঙ্গ চলে গেছে সেটা অন্য অঙ্গ নিয়ে নিচ্ছে। তার ফলে তার যে কী দুরবস্থা হচ্ছে, এমন এমন কাণ্ড হচ্ছে মনে হবে যেন কোন হাসির উপন্যাস পড়ছি। এগুলো কোন কল্পনা নয়, এটাই বাস্তব। অথচ এমন কতকগুলো জিনিষ উল্লেখ করছে যেগুলো বিশ্বাস করা যায় না, রামচন্দ্রন এমনিতেই খুব কৌতুকপ্রিয়, মজা করবার জন্য মিথ্যে করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন কিনা ভগবানই জানেন। এক জায়গায় বলছেন, একটা লোকের হাত কাটা গেছে। কদিন পর লোকটি এসে বলছে আমার হাতে পোকা কিলবিল করছে আমাকে বাঁচান। লোকটি চিৎকার করে সব ডাক্তারদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। তারপর রামচন্দ্রনের কাছে এসেছে। তত দিনে নিউরো বিজ্ঞানে বেরিয়ে গেছে হাতকে তার গাল টেনে নেয়। ডাক্তার তার গাল চুলকে দিয়েছেন। চুলকে দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করছেন সেরে গেছে কিনা। তাতেও সারলো না। তখন কী ব্যাপার হতে পারে এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে ডাক্তারের কি মনে হতেই হঠাৎ করে বললেন – এর হাত যখন কেটে গিয়েছিল তখন সেই হাতটাকে কি করা হয়েছিল? বলা হল হাতটাকে তো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বললেন হাসপাতালে ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখ তো ঠিক কি করা হয়েছিল। তখন হাসপাতাল থেকে বলল, এই পেশেন্টের যখন হাত কাটা হয়েছিল তখন আমাদের ইনসুলেটরটা খারাপ ছিল বলে মাটিতে হাতটা পুতে দেওয়া হয়েছিল। বিদেশে সব ব্যাপার সব কিছু রেকর্ড রাখা হয়। কোথায় পোতা হয়েছিল জায়গাটা বার কর। সেই জায়গাটা বার করা হল, সেখানে মাটি খুঁড়ে হাতটা বার করা হল, দেখা গেল গোটা হাতে এক গাদা পোকা লেগে আছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে তুলে আঙনে পুড়িয়ে দিল। তারপর দিন থেকে লোকটি বলছে আমার হাতে পোকা হাটা বন্ধ হয়ে গেছে। রামচন্দ্রন এই ঘটনা উল্লেখ করার পর বলছেন, আমাদের কাছে এই জিনিষের কোন ব্যাখ্যা নেই, ভবিষ্যতে যদি কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন তখন জানা যাবে। অথচ তিনি বিশ্বের একজন প্রথম সারির নিউরো বিজ্ঞানী আর ওনার পুরো বইতে আমাদের শাস্ত্রের ধারণাগুলোকে তুলোধুনো করে গেছেন। কোন ভাবে তার মনের সাথে হাতের একটা যোগ থেকে গেছে। আমরা এগুলো প্রথম দিন থেকে মেনে আসছি, আমাদের কাছে এর কোন সমস্যাই নেই, সমস্যা বিজ্ঞানীদের কাছে।

আমাদের মস্তিষ্কে সব ইন্দ্রিয়গুলো বসে আছে। ইন্দ্রিয়গুলো যুক্ত হয়ে আছে বিভিন্ন নার্ভের সঙ্গে, যেমন চোখ থেকে বেরিয়েছে আমাদের অপ্টিক্যাল নার্ভ। সেই নার্ভ আবার মস্তিষ্কে চোখের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত। ইন্দ্রিয়কে বিদেশীরা অর্গান্স বলছে অথচ ওরা আমাদের স্থূল হাত, পা, চোখগুলোকেই অর্গান্স বলছে। কিন্তু আমাদের কাছে হাত, পা এগুলো ইন্দ্রিয় নয়, এগুলো করণ, করণ মানে যেটা দিয়ে ইন্দ্রিয়ের কাজ করা হয়। করণের আরেকটা নাম গোলক। আমাদের অনেকে প্রায়ই ভুল করে মনে করে, যে চোখ দিয়ে দেখছি, যে কান দিয়ে শুনছি এগুলোই ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলতে বোঝায় মস্তিষ্কের ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রগুলোকে। হাত দিয়ে আমরা কাজ করছি, কিন্তু হস্তেন্দ্রিয়টা রয়েছে মস্তিষ্কে। হস্তেন্দ্রিয় যার সাহায্যে কাজ করছে তাকে বলছে করণ। আমাদের বাইরে যে হাত, পা, চোখ কান ইত্যাদি দশটি ইন্দ্রিয় আছে এগুলো সব করণ। যেমন দূরবীণ দিয়ে আমি দূরের জিনিষ দেখছি, আর মাইক্রোস্কোপে অতি সূক্ষ্ম জিনিষ দেখতে পারছি। ঠিক তেমনি এই করণগুলো বা গোলকগুলো জিনিষটাকে বাড়িয়ে দেয়। তাহলে টেলিস্কোপ যদি না থাকে, মাইক্রোস্কোপ যদি না থাকে তাহলে আমরা কি জিনিষগুলো

দেখতে পারবো না? অবশ্যই দেখতে পারবো, এই যন্ত্রগুলো দেখতে সাহায্য করছে। আমাদের চোখ, কান একই কাজ করে। তাহলে আমাদের চোখের দরকার আছে কি নেই? আসলে কোন দরকারই নেই। যেমন হৃৎস্পন্দন শোনার জন্য স্টেথো দরকার, ঠিক তেমনি আপনার কথা শোনার জন্য কান দরকার। কিন্তু যোগীদের কি দরকার? যোগীদের কোন কিছুই দরকার পড়ে না। যোগীদের ইন্দ্রিয়গুলো এত শক্তিশালী হয়ে যায় যে, গোলকগুলো বা করণগুলোর সাহায্য ছাড়াও তাঁরা ইচ্ছা করলে শুনতে পারেন বা দেখতে পারেন। এই যে দূরদৃষ্টির কথা বলা হয়, কলকাতায় বসে দিল্লীতে কি হচ্ছে যোগীরা সব বলে দিতে পারেন। যে কাজটা টেলিস্কোপের করার কথা, সেই কাজ যোগীর ইন্দ্রিয়গুলো করে দিচ্ছে।

যতগুলো করণ আছে ঠিক ততগুলো ইন্দ্রিয় আছে। চোখের সামনে বস্তু আছে, বস্তুতে আলো পড়ছে, সেই আলো বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসছে। চোখ সেটাকে চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে যে চোখের স্নায়ু কেন্দ্র আছে সেখানে পাঠিয়ে দিল। এইভাবে চোখের মাধ্যমে, কানের মাধ্যমে, ত্বকের মাধ্যমে যা কিছু নিজের নিজের স্নায়ু কেন্দ্রে আসছে মন সব কিছুকে সাজাতে থাকে। এত যা কিছু হচ্ছে সব প্রকৃতির রাজ্যেই হচ্ছে, আসলে এটাই প্রকৃতির রাজ্য। মন হল মহৎএর ছোট ভাই, মন গিয়ে মহৎকে রিপোর্ট করে। যেমন সেনাপতি গিয়ে রাজাকে বলে – জাঁহাপনা! শত্রু দেখা গেছে। জাঁহাপনা বলে – সৈন্য মোতায়ন কর। পুরুষও সাথে সাথে বলে সৈন্য মোতায়ন কর। মন আর তার দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যেন প্রধানমন্ত্রী আর বাকিরা সব মন্ত্রী। মন্ত্রীরাও সঙ্গে সঙ্গে বলল এক্ষুণি ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন চোখ একটা সাপ দেখল। চোখ সাথে সাথে খবর পাঠিয়ে দিল। প্রধানমন্ত্রীও খবর পাঠালো – স্যার! সাপ। স্যার হয় বলবে লাঠি নিয়ে মারো, আর না হয় বলবে পালাও। মন হল কোর্ডিনেটর, মন তখন পায়ের ইন্দ্রিয়কে বলল পা পালিয়ে যাও। পা এবার নিজের নার্ভ সেন্টারকে বলবে পালাও। এই কাজগুলো মাইক্রো সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। সবটাই ইলেক্ট্রিক্যাল ইমপালস্, তাই ইলেক্ট্রিক যে গতিতে চলে এদের কাজও সেই গতিতে চলে। এখন আমাদের দেখতে হবে এই লম্বা প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান আর বেদান্তে কোথায় তফাৎ। এত দূর পর্যন্ত বিজ্ঞান একই কথা বলছে। বিজ্ঞান শুধু বলবে, এখানেই একটা বিচিত্র প্রক্রিয়াতে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র প্রক্রিয়াতে হয়ে যাচ্ছে বলে বেদান্ত তখন অনেক গুলো প্রশ্ন নিয়ে আসবে। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন হল, যদি তাই হয় তাহলে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন কি হয়, মানুষ যখন অচেতন হয়ে যায় বা মারা যায় তখন কেন কাজ করে না? পুরুষ যখন শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায় তখন শরীরে বাকি সব কিছুই আছে কিন্তু তাও দেখার কাজ, শোনার কাজ হচ্ছে না কেন? শরীরে সবই আছে, সেই কান, সেই চোখ, সেই মস্তিষ্ক সবই তো আছে কিন্তু তাও মারা যাওয়ার পর তার প্রিয়জনরা এত বিলাপ করছে তাও সে সাড়া দিচ্ছে না কেন? বলবে মৃত্যুর আগে সে অচেতন হয়ে যাচ্ছে। আসলে এসব কথার কোন দাম নেই, শব্দজালের পেছনে নিজের অজ্ঞতাকে আড়াল করছে। বেদান্তের কাছে পরিষ্কার – যিনি পুরুষ তিনি এই ইন্দ্রিয়গুলোর সাথে মনকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। করণগুলো এখন পড়ে রয়েছে, দশটি ইন্দ্রিয় আর মন এই শরীরে নিবাস করে। এগারোটা ইন্দ্রিয় পুরুষের সাথে বেরিয়ে গেল। গীতায় যেমন বলছেন *বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ*, বাতাস যেমন গন্ধকে বহন করে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি পুরুষ ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ে চলে যায়। এই এগারোটা ইন্দ্রিয় নিয়েই সূক্ষ্ম শরীর, পুরুষ এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে নিজেকে ইন্দ্রিয়গুলোর সাথে জড়িয়ে রেখেছে।

বিষয় যদি না থাকে আমরা কিছু দেখতে পারবো না, চোখ যদি খারাপ থাকে দেখতে পারবো না, চোখের স্নায়ু যদি খারাপ থাকে তাও কিছু দেখা যাবে না। আর দশটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটা ইন্দ্রিয় যদি দুর্বল থাকে তাহলেও দেখতে পারবো না, মনও যদি সচল না থাকে তাও দেখতে পারবো না। পুরুষ যদি না থাকে তাও দেখতে পারবো না। তাহলে ভেবে দেখুন কত লম্বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা জিনিষকে দেখার কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই লম্বা প্রক্রিয়া যে শুধু দেখা বা শোনার ক্ষেত্রেই হচ্ছে তা নয়, চলার ক্ষেত্রে, বলার ক্ষেত্রে সব কিছুর ক্ষেত্রে এই একই প্রক্রিয়া চলছে। চোখে রেটিনা যদি কারুর দুর্বল থাকে তাহলে চোখে কাঁচ লাগিয়ে নিলে সে ঠিক হয়ে যাবে। নার্ভস্ গুলো যদি দুর্বল থাকে, ওষুধ প্রয়োগ করলে সেটাও ঠিক হয়ে যাবে। মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়ের নার্ভ সেন্টার যদি ঠিক না থাকে তাহলে আর কোন কিছু দিয়েই করণকে ঠিক করা যাবে না। অনেক সময় ডাক্তাররা বলেন, সবই তো ঠিক আছে

দেখছি, রেটিনা, নার্ভস্ সবই ঠিক আছে তাও চোখের কেন সমস্যা হচ্ছে ধরা যাচ্ছে না। শুধু তাই না, অনেক সময় বাচ্চাদের আমরা বলি – হ্যাঁরে! খেলার সময় খুব মন থাকে, দুষ্টুমি করার সময় তোর সব বুদ্ধি আছে কিন্তু পড়ার সময় তোর মন বুদ্ধি কোথায় থাকে? তার কারণ, তার ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল হয়ে আছে বা মনটাও দুর্বল। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবই জড়, সবই প্রকৃতির উপাদান দিয়ে নির্মিত। তাহলে জড় কীভাবে কাজ করছে? বেদান্ত বলছে, এই যে পুরুষ, এই পুরুষের চৈতন্যের আলোতে দশটা ইন্দ্রিয় আলোকিত হয়ে যায়। যেমন ইলেক্ট্রিকের মোটরে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে তখন একটু হাত লাগলেই এমন শক্ মারবে যে ছিটকে ফেলে দেবে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার পর হাত দিলে কিছুই হবে না। ঋষিদের সময়ে বিদ্যুৎ ছিল না, কিন্তু ঋষিরা এই সত্যগুলো ধ্যানের গভীরে নিজেরা দেখেছিলেন আর দেখার পর সেটাকে অভিব্যক্ত করেছেন, ভাবলেও আশ্চর্য লাগে।

আপনারা বলবেন, সমস্যা তো সেই থেকেই গেল, আমি আপনাকে দেখছি কীভাবে? এই জায়গাতে এসে ব্যাপারটা বোঝানো খুব কঠিন হয়ে যায়। স্বামীজী অবশ্য পুরো ব্যাপারটা খুব সহজ করে বুঝিয়েছেন। আজ নিউরো বিজ্ঞানীরা যে কথা বলছেন, একশ বছর আগে স্বামীজীও ঠিক ওই একই কথা বলছেন। বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রে যেতেই সেখানে একটা ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মস্তিষ্ক তখন উল্টো দিক থেকে একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়। স্বামীজী বিনুকের উপমা দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। বিনুকের মধ্যে যখন কোন ভাবে একটা বালিকণা ঢুকে যায় তখন বিনুক নিজের প্রতিক্রিয়া ছুঁড়তে শুরু করে। সেই প্রতিক্রিয়া আস্তে আস্তে একটা মুক্তিতে পরিণত হয়। এখানে পুরুষের আলোকে ইন্দ্রিয়গুলো আলোকিত হয়ে আছে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এদের decision নেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। এগুলো আবার মস্তিষ্কের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। মস্তিষ্ক তখন নিজে একটা ইমেজ তৈরী করে নেয়। এই ইমেজটাই আমাদের নিজের নিজের জগৎ। দর্শনের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয় হয়ে যায়। কিন্তু এই জায়গাটা না বুঝতে পারলে যোগদর্শনে আমরা এক ধাপও এগোতে পারবো না, সাধনার জগতেও এগোতে পারবো না। মুক্তোটা আসলে বিনুকই, বিনুকটাই মুক্তো হয়েছে। বালিকণা যাওয়ার পর বিনুকের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তৈরী হচ্ছে তাতে বিনুকের ভেতর থেকে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক রস নির্গত হতে থাকে। এই রসটাই জমে মুক্তো হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে যখন কোন আওয়াজ আসছে বা বাইরের একটা দৃশ্যকে যখন দেখছি, এটা হল আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর একটা আক্রমণ। মন তখন তার উপর একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়তে থাকে, এই প্রতিক্রিয়াটাই আমার আপনার জগৎ। তার মানে, আপনি আর আপনার জগৎ এক এবং আমি আর আমার জগৎ এক। আমি আর আমার জগৎ এবং আপনি আর আপনার জগৎ কিন্তু পুরোপুরি আলাদা। আপনি বলতে পারেন, আপনার হাতে যে কলমটা রয়েছে, এই কলমকে আপনি আর আমরা সবাই কি আলাদা দেখছি? অবশ্যই, পুরোপুরি আলাদা দেখছি। আপনার এবং আমার মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া চলছে দুটো আলাদা। তাহলে এই কলমটা কী? স্বামীজী বারবার বলছেন এই কলমটা হল বহির্জগতের একটা উত্তেজনা। বাইরে থেকে যেন একটা উত্তেজনা এসে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একটা নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ভেতরে যা কিছু হচ্ছে সেটা যার যার ব্যক্তিগত ও নিজের। স্বামীজী বলছেন All knowledge is within you। পূর্ণ জ্ঞান তোমার ভেতরেই। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র হয় পুরুষের। পুরুষ ছাড়া আর কারুর পূর্ণ জ্ঞান হয় না। ইদানিং কত রকম বিদেশী খাবার বাজারে আসছে, যেমন পিৎজা। অনেকে পিৎজার নামই শোনেনি। যদি All knowledge within me হয়, তাহলে পিৎজাটা কি জিনিষ হবে? কোথা থেকে পিৎজা এল? পিৎজাও একটা বহির্জাগতিক উত্তেজনা। এই জায়গাতে এসে আমরা একটা জিনিষ কীভাবে জানি, এই ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়।

Phenomenology নামে বিজ্ঞানের একটা শাখা আছে, বস্তু সমূহকে দেখে তার একটা ব্যাখ্যা করা। এবার আমরা পেছনের দিকে যাবো। যখন আমরা বাচ্চা ছিলাম, প্রথম পড়তে লিখতে শিখছি। বাচ্চাকে শেখানো হচ্ছে – বলো ‘বাবা’, বল ‘মা’। শিশুর মুখে ‘বা’ ‘মা’ এই শব্দগুলো খুব সহজে বেরোয়। ‘ম’ শব্দে ঠোঁট দুটো খুলছে আর বাচ্চা মায়ের কাছে বেশী সময় থাকে বলে মায়ের

ইমেজটা বাচ্চার মধ্যে সব সময় যেতে থাকে। আর সহজে যে শব্দটা বলতে পারছে তা হল ‘মা’। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের বাচ্চা প্রথম ‘মা’ শব্দটা শেখে। সব দেশের মা শব্দে ‘ম’ থাকবেই। মাদার, আম্মা, মা, মাস্টারী, ম্যাম্। এমনকি ছাগলও ম্যা বলছে গরুও হান্না বলে। ঠোঁট খুলে যে আওয়াজটা বেরোচ্ছে সেটা ‘মা’। এখন বাচ্চার কাছে মায়ের একটা ইমেজ যাচ্ছে, আর বাচ্চাকে শেখানো হচ্ছে ‘বলো ‘মা’। ইতিমধ্যে ঘরে বাবা এসে গেলো। ওই বয়সে সে বাবা আর মায়ের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। বাচ্চার কাছে মা যেমন একটা ছবি বাবাও একটা ছবি। বাচ্চার মনে সব সময় সংশয় হবে এ আমার মা না বাবা। চেহারাতে কোন সংশয় হচ্ছে না, বাচ্চার কাছে পরিষ্কার এটা মায়ের চেহারা আর এটা বাবার চেহারা। কিন্তু মা কাকে বলা হবে এই ব্যাপারে বাচ্চার মন পুরো সংশয়ে থাকে।

এখন বেদান্ত মতে আমাদের কীভাবে জ্ঞান হয় সেটা ভালো করে বোঝা দরকার। যখনই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে একটা ছবি ভেতরে মস্তিষ্কে গেল, মস্তিষ্ক থেকে মন পুরুষের কাছে ছবিটা নিয়ে গেল, পুরুষ তখনই একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়। এই প্রতিক্রিয়াটা একটা কাঠামোর মত, এই কাঠামোর একটা অনুভূতি হচ্ছে। অনুভূতিটা কী? আকৃতিটা মা। এরপর বাবার আকৃতি এসে গেলে বুঝতে পারে না বলে তাকেও মনে করে মা। যখন বাচ্চাকে বোঝান হল এ তোমার মা নয়, তোমার বাবা। এবার বাচ্চার মস্তিষ্ক ওর নিজের মত একটা কাঠামো বানিয়ে তার মধ্যে নিজস্ব একটা অনুভূতি তৈরী করতে শুরু করে দেবে। এই রকম চেহারা হলে বাবা, এই রকম চেহারা হলে মা। কোন সন্ন্যাসী একজন গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে এসেছেন। ভদ্রলোক তার তিন চার বছরের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীকে ঘরে বসতে দিয়েছেন। সন্ন্যাসীকে দেখে বাচ্চা বলছে ‘নমস্তে আঙ্কেল!’ সন্ন্যাসী বলছে ‘আমি তোমার আঙ্কেল নই বাবা, বলতে হয় ‘নমস্তে স্বামীজী’। বাবা সন্ন্যাসীকে বলছে ‘মহারাজ! ওকে বললে এখন বুঝবে না, ওকে ওর মত বলতে দিন। পরে ধীরে ধীরে ওকে বোঝানো হবে’। বাচ্চার কাছে যে কোন পুরুষ মানুষ, সে বাইরে থেকে এসেছে, তাকে সে চেনে না, বাবা তাকে বসতে দিয়েছেন, বাচ্চাকে এত দিন ধরে শেখানো হয়েছে ‘হাতজোড় করে বল নমস্তে আঙ্কেল’। বাচ্চার মনের ভেতরে একটা কাঠামো তৈরী হয়ে তার মধ্যে একটা অনুভূতি তৈরী হয়ে গেল। এরপর বাচ্চাকে একটা নতুন কাঠামো তৈরী করতে হবে – গেরুয়া পড়া, মাথা ন্যাড়া হলে তাঁকে স্বামীজী বলতে হবে। বাবার এখন সমস্যা হয়ে যাবে। কারণ বাচ্চাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে, স্বামীজী কে হয়। এই স্বামীজী শব্দটা নিজেও একটা কাঠামো। সেই কাঠামোর মধ্যে অনুভূতি যেতে শুরু হবে। এরা সন্ন্যাসী, বিয়েথা করে না, মাথা ন্যাড়া থাকে। হঠাৎ একদিন দেখলো স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় খুব সুন্দর চুল। তার মধ্যে প্রশ্ন হবে, এই স্বামীজীর মাথায় চুল কেন? বাচ্চার নিজস্ব কাঠামোর সাথে নতুন অনুভূতিটা মিলছে না। খুব মজার ব্যাপার হয় বাচ্চাদের প্রথম যখন কলকাতায় ট্রামে চাপানো হয়। বাচ্চা এতদিন ট্রেনে চেপেছে। সে দেখেছে রেললাইন, রেললাইনের উপর দিয়ে ট্রেন যায় আর প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায়। তাকে এখন কলকাতায় ট্রামে চাপানো হয়েছে। একটু পরে পরেই যখন ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়াচ্ছে, বাচ্চা তখন বলছে ‘মা! এটা কোন স্টেশন?’ বাচ্চার কাঠামো আর ধারণা পরিষ্কার হয়ে আছে, লোহার চাকা, ইলেক্ট্রিসিটি, রেললাইন মানে এটা ট্রেন। ট্রেন আর ট্রামের তফাৎটা সে ধরতে পারে না। বাচ্চাকে মা ফিস্ ফিস্ করে বলছে ‘চুপ কর! এটা ট্রেন নয়, এটা ট্রাম, লোকেরা ভাববে আমরা গৈয়ো’।

বড়দের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা হয়। বাড়িতে তাঁরা এতদিন যে ধর্মটা শিখেছেন, এটাও একটা কাঠামো এবং এই কাঠামোর মধ্যে তাঁদের একটা ধারণা তৈরী হয়ে আছে। এই কাঠামো নিয়ে যখন তাঁরা কোন আচার্যের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন তখন আচার্যের কথা তাঁদের ধারণার সাথে মিলছে না। তখন শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে ঘুম পেয়ে যাবে, অনেক সময় বিরক্তির ভাব আসবে। এই যে কাঠামো আর তার মধ্যে যে ধারণা তৈরী হচ্ছে এটাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে উপমান প্রমাণ। উপমান প্রমাণ হল একটার সাথে আরেকটার তুলনা করে বোঝা। আমরা নীলগাই দেখিনি, আমাদের বলা হল নীলগাই হল গরুর মত আর দৌড়ায় হরিণের মত আর এর রঙ একটু অন্য রকম। আমরা এমন কোন জায়গায় গেছি যেখান নীলগাই আছে। এখানে গরু দেখে আমাদের কোন সংশয় হবে না, কারণ মন গরুর ইমেজ পাওয়ার পর একবার যে প্রতিক্রিয়া ফেরত পাঠাচ্ছে তাতেই সে বুঝে যাবে এটা গরু।

একবার প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেওয়ার পর যদি কোন জিনিষকে বুঝে নেওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেই জিনিষের জ্ঞানের উপর তার পুরো দখল হয়ে গেছে। কিন্তু পড়ে বা কারুর কাছে শুনে অন্য ধরণের যেসব তথ্য ভেতরে ঢুকছে, এই তথ্যগুলো ভেতরে কাঠামোটাকে ঠিক ভাবে দাঁড় করাতে পারে না। কিন্তু একবার যদি নীলগাই দেখে নেয়, তখন মনে করবে ‘তাইতো! এই রকমই বলেছিল, এটাই নীলগাই’। এবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোটা পাকা হয়ে গেল। কাঠামো পাকা হয়ে গেলে এবার আর সেটা সে কোন মতেই পাল্টাবে না।

আমাদের সবারই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। ঠাকুরের ছবি দেখছি, ঠাকুরের প্রতি ভক্তি আছে। তার উপর এখন ওখান থেকে দুটো চারটে শাস্ত্রের কথা শুনছি, ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক তথ্যই ভেতরে ঢুকে চলেছে। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারে যে কাঠামোটা তৈরী হয়ে আছে সেটা কোন ভাবে পাল্টাচ্ছে না। কেন পাল্টাচ্ছে না? কারণ ঈশ্বর দর্শন যত দিন না হচ্ছে ওই কাঠামো কোন দিন পাল্টাবে না। এখন বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের মধ্যে যত ঈশ্বরীয় জ্ঞান ঢুকছে, এই জ্ঞান থেকে আমাদের মস্তিষ্ক অনবরত প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের ছবি দেখছি, মূর্তি দেখছি, বই পড়ছি, ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুনে যাচ্ছি, এই সব কিছুকে মিলিয়ে আমাদের নিজের মত করে অবধারণা করে চলে যাচ্ছি, কারণ ঈশ্বরকে তো আমরা সরাসরি দেখিনি। সেইজন্য ঠাকুর বারবার বলছেন – ঈশ্বরকে বই পড়ে এক রকম জানা যায়, তাঁর চিন্তা-ভাবনা করে এক রকম জানা যায় আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শন হলে আরেক রকম জানা হয়। যারা নীলগাই দেখেনি, তাকে আগে নীলগাইয়ের ধারণা তৈরী করার জন্য যে জিনিষটাকে সে জানে তার সঙ্গে উপমান প্রমাণ করে অর্থাৎ জানা জিনিষের সাথে তুলনা করে অজানা জিনিষের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে দেবে। তাই ঈশ্বরকে জানার ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। কারণ এই জগতে ঈশ্বরের কোন উপমা নেই। জগতে এমন কোন জিনিষ আছে কি যার উপমা দিয়ে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বোঝানা যাবে? সেইজন্য জগতের দশটা জিনিষকে জানার মত ঈশ্বরকে কখন জানা যায় না। জগতের সব কিছুর শিক্ষা দিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারে কোন শিক্ষা দেওয়া যায় না। নীলগাইয়ের বর্ণনা দিতে হলে গরুর বর্ণনা দিয়ে বোঝান যাবে, সিংহের বর্ণনা দিতে হলে বাঘের বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে হবে, বাঘও যদি না দেখে থাকে তাহলে কুকুরের বর্ণনা দিয়েও বোঝান যাবে, কুকুর সবাই দেখেছে। বাঘ কুকুরের মত, কিন্তু সেটা আরও বড়, কুকুর যেমন ঘেউ ঘেউ করে বাঘ হালুম করে। এবার যখন সে চিড়িয়াখানায় যাবে তখন একবার বাঘ দেখলেই তার স্পষ্ট হয়ে যাবে। এতক্ষণ যখন গরু বা কুকুরের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছিল, তখনও কিন্তু তার মস্তিষ্ক প্রতিক্রিয়া ছাড়ছিল, কিন্তু সঠিক কাঠামো দাঁড় করাতে পারছিল না। যেমনি নীলগাই বা বাঘ একবার দেখে নিল সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নীলগাই বা বাঘের সঠিক কাঠামো তৈরী হয়ে যাবে। ঈশ্বরের কোন উপমা নেই বলে আমরাও ঈশ্বরের কোন সঠিক কাঠামো তৈরী করতে পারছি না।

তাহলে প্রতিভাবান কাকে বলা হবে? স্বামীজী বলছেন একবার কোন জিনিষের একটু কিছু একবার বলা হলে সঙ্গে সঙ্গে যে পুরো জিনিষটার সঠিক ধারণা তৈরী করে নিতে পারে সেই প্রতিভাবান। প্রতিভাবানের কাঠামো একেবারে মজবুত, এই কাঠামোতে আর কোন গোলমাল থাকবে না। কোন জিনিষের থিয়োরিটিক্যাল ব্যাপারটা পড়ে নিয়ে একটা ধারণা করে যাঁরা সেটাকে আবার অপরকেও বুঝিয়ে দিতে পারেন তাঁরা সত্যিই আরও মহৎ প্রতিভাবান। আমাদের পণ্ডিতরা সব কিছু মুখস্ত করে নিত, মুখস্ত করে সেই বিষয়ের একটা ধারণার কাঠামো তৈরী করে নিত, কিন্তু সেই বিষয়ের বাইরে একটু ডানদিক বামদিক করলে সঙ্গে সঙ্গে ধপাস্ করে পড়ে যাবে। কারণ তাঁদের কাঠামোতে কিছুতেই অন্য কিছুকে খাপে খাপে বসাতে পারবে না। অনুমান প্রমাণের জ্ঞান তাই কখনই ঠিক হয় না। জিনিয়াস সব সময় অনুমান প্রমাণকে প্রত্যক্ষের কাছাকাছি নিয়ে চলে যায়। প্রত্যক্ষের কাছাকাছি গিয়ে একটু অপেক্ষা করে, তারপর বাস্তবিক দেখে নিলেই কাঠামো মজবুত হয়ে গেল, এবার একটুও ডানদিক বামদিক যাবে না। এখানে মনে হতে পারে তাহলে শাস্ত্র পড়ার তো আর কোন দরকার নেই। কিন্তু তা নয়, শাস্ত্র পড়া সব সময় দরকার কারণ শাস্ত্র যত পড়া হবে শাস্ত্রের উচ্চ ভাবগুলো তত পুরনো ধ্যান ধারণার কাঠামোটাকে ভাঙতে থাকবে, একটা মাটির ঢেলাকে ভেঙে ভেঙে আকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া

চলতে শুরু হয়। এইভাবে হতে হতে যুক্তি দিয়ে, শ্রুতি দিয়ে, বিচার করে, দেখে, আলোচনা করার পর যখন নিদিধ্যাসন করে করে সেটার প্রতি মনকে একেবারে একাগ্র করে দিচ্ছে তখন তার পরিপক্ব বুদ্ধির কাঠামোটা পাকাপোক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর আচার ব্যবহারও সব সেই অনুযায়ী হয়ে যাবে। এরপর বাকি থেকে যায় শুধু প্রত্যক্ষ উপলব্ধিটুকু। আচরণে জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীতে খুব বেশী তফাৎ থাকে না। বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ দেখেছেন, জ্ঞানী এখন অনুমান প্রমাণের উপর চলছেন, তার মানে শাস্ত্র পড়া বিদ্যা। শাস্ত্র পড়া বিদ্যা মানে অনুমান প্রমাণ।

বৃত্তি কাকে বলে

এই যে একটা বালিকণার উপর ঝিনুক তার ভেতর থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়া দিয়ে আবরণ তৈরী করছে, যখন মন বাইরে থাকে আসা কোন কিছু উত্তেজনার উপর একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ছে, এরই পরিভাষা হল বৃত্তি। বৃত্তির কথা দিয়েই যোগদর্শন শুরু হয়। জগতে আমাদের সবার চোখের সামনে অনবরত নানা রকম দৃশ্য ভেসে উঠছে, কানে শব্দ আসছে, নাকে গন্ধ আসছে, ত্বকে স্পর্শ হচ্ছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনের ভেতরে অনবরত বাইরে থেকে উত্তেজনা ঢুকেই চলেছে। আর মনও এই উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে একটার পর একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে যাচ্ছে। যা কিছু হওয়ার সব প্রকৃতির জগতে হয়ে চলেছে। পুরুষ হলেন চৈতন্য, তাঁর তো এসবে কিছু হেলদোল হওয়ার কথা নয়, তাঁকে কোন পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না। পুরুষ এই টিউব লাইটের আলোর মত। টিউব লাইটের আলোতে আমরা যত বই পড়ি, যত কাজ করি, যত মারামারি করি যাই করি না কেন, আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে যাব কিন্তু টিউব লাইট কখন পরিশ্রান্ত হবে না। প্রকৃতির এত নৃত্য হচ্ছে কারণ তার পেছনে পুরুষ আছে বলে, প্রকৃতি কিন্তু কাউকে নিয়ে নৃত্য করছে না, সে নিজেকে নিয়েই নৃত্য করে চলেছে। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত বস্তু আছে সবটাই প্রকৃতি, আর ইন্দ্রিয় ও মনও প্রকৃতি, একমাত্র পুরুষ ছাড়া সব এই চক্ষিণ তত্ত্বের মধ্যেই বাঁধা। বাইরের প্রকৃতি থেকে অনবরত নানা রকমের উত্তেজনা ভেতরে অন্তঃপ্রকৃতি মনের মধ্যে ঢুকছে। যেমন একটা নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে একটা পাথর ছুঁড়লে জলের উপরিভাবে একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি বাইরের প্রকৃতির উত্তেজনাগুলো পাথর আর মন হল নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের উপমা। অনবরত উত্তেজনা আসার ফলে মনের মধ্যে অনবরত তরঙ্গ তৈরী হয়ে চলেছে। মন বা চিন্তের উপর এই তরঙ্গকেই বলা হচ্ছে বৃত্তি। বৃত্তি হল মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হওয়া। এখানে মনে রাখতে হবে বৃত্তি আর কার্যের মধ্যে কোন যোগ নেই। যেমন আমাকে যদি কেউ গাধা বলে তাতে আমার মন খারাপ হবে, এরপর ইচ্ছে করলে আমি উল্টে তাকে বানর বলতে পারি অথবা কিছু নাও বলতে পারি, কিন্তু মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া একটা হবেই, এটাই বৃত্তি।

প্রথমে বাইরে থেকে একটা উত্তেজনা (suggestion)এল, এই উত্তেজনাটা কিন্তু বৃত্তি নয়। ‘আমাকে গাধা বলেছে’ পুরুষের কাছে খবর গেল, পুরুষ এবার বলল ‘অমুক এই রকমটি’, এই যে পুরুষের থেকে প্রতিক্রিয়া এল এটাই বৃত্তি। এই বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বৃত্তি আসবে ‘ওকে কিছু বলো না কিন্তু’। এরপর আমি সোজা হয়ে বসব, চোখটা লাল হয়ে যাবে, ঠোঁট কাঁপবে, হাত-পা নিশপিশ করতে থাকবে, কিন্তু কিছুই বলবো না। এই রকম দৃশ্য আমাদের সবারই জীবনে প্রায়ই দেখতে পাই। অনেকে নিজেকে স্বাভাবিক দেখাবার জন্য একটু হাল্কা করে হাসি দেবে, কিন্তু ভেতরে রাগে কড়মড় করছে। এখানে বৃত্তিটা হল ক্রোধ বৃত্তি। তার সঙ্গে আরেকটা বৃত্তি কাজ করছে ‘বড়দের সামনে কিছু বলতে নেই’ বা ‘এখানে কিছু বলে দিলে তোমার বিপদ হতে পারে’ এইভাবে একই সঙ্গে দুটো তিনটে বৃত্তি চলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সব সময় দেখা যায় যে বৃত্তিটা সব থেকে শক্তিশালী থাকবে সেই অনুসারে সে ঠিক করে নেবে এর প্রতিক্রিয়া ফেরত আসবে কি আসবে না। আমি কান দিয়ে শুনলাম আপনি আমাকে ‘গাধা’ বললেন। এবার আমার ক্রোধ বৃত্তি যখন আসবে তখন ঠিক করবে প্রতিক্রিয়াটা বাইরে আসতে দেব কি দেব না। যদি বাইরে প্রতিক্রিয়া করার বৃত্তিটা প্রবল হয়ে আসে তখন আমিও আপনাকে মুখ দিয়ে দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম। কি মজার ব্যাপার! শব্দটা গেল কান দিয়ে কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা বেরোল মুখ দিয়ে। আসলে উত্তেজনা, প্রতিক্রিয়া যেখানে হচ্ছে সেই জায়গাটা

তো একটাই, আমাদের মস্তিষ্কেই সব কিছু হচ্ছে। আমার কাছে যে কথাটা কান দিয়ে গেল তার ক্রিয়া তো মস্তিষ্কে হচ্ছে আর তার প্রতিক্রিয়াও মস্তিষ্কেই হচ্ছে, এখন সেটা কান দিয়ে গেল, নাকি হাত দিয়ে, পা দিয়ে গেল তাতে কী আর আসে যায়। স্মৃতিশাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় তোমার বৃত্তিগুলোকে ভেতরে দমন কর, তাকে বাইরে বেরোতে দিও না।

মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা

বৃত্তির এই প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াতে আরেকটি জিনিষ বোঝার আছে। এবার আমরা দশটি ইন্দ্রিয়কে একেবারেই মাথা থেকে নামিয়ে দেব, শুধু মন থাকলেই আমাদের সব কাজ হয়ে যাবে। এরপর থেকে আমরা যখনই বৃত্তি বলবো তখনই আমাদের মাথায় রাখতে হবে বৃত্তি মানে reaction of the mind against some impulse/suggestion from outside। মন হল দশটি ইন্দ্রিয়ের রাজা, ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করাই তার কাজ আবার এদের দ্বারাই মন সব খবর নেয় আর এই দশটি ইন্দ্রিয়কে মনই আদেশ দেয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় যে জিনিষ দিয়ে তৈরী হয়েছে মনও সেই একই জিনিষ দিয়ে তৈরী। শুধু তফাৎ এটুকু যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি মহাভূতের সত্ত্বগুণ দিয়ে এক একটা ইন্দ্রিয় নির্মিত হয়েছে, কিন্তু মন পাঁচটি মহাভূতের সবার সত্ত্ব অংশকে মিলিয়ে তৈরী হয়েছে। সেইজন্য মনকে রাজা বলা হয়। প্রকৃতি আসলে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ। তাহলে পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকটিতে এই তিনটে গুণ মিলে মিশে থাকবে। সত্ত্ব অংশ মানে সত্ত্ব প্রাধান্য, শব্দের যে সত্ত্ব অংশ সেটা দিয়ে তৈরী হয় কর্ণেন্দ্রিয়। তেমনি স্পর্শের সত্ত্ব অংশ দিয়ে তৈরী হয় ত্বক। রূপের সত্ত্ব অংশ দিয়ে তৈরী হয় চোখ অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়। তেমনি রসের সত্ত্ব অংশ দিয়ে জিহ্বা আর গন্ধের সত্ত্ব অংশ দিয়ে স্রোত্রেন্দ্রিয় তৈরী হয়। আর এই পাঁচটি মহাভূতের সত্ত্ব অংশ দিয়েই তৈরী হয় মন। সেইজন্য কোন কারণে কোন একটা ইন্দ্রিয়ের কিছু যদি হয়ে যায়, মন নিজে সরাসরি সেই ইন্দ্রিয়ের কাজ করে নিতে পারে। এই কারণেই মনকে প্রচণ্ড শক্তিশালী বলা হয়, শক্তিশালী হওয়ার জন মন অনেক কিছু করতে পারে। পঞ্চ মহাভূতের রজো অংশ দিয়ে আমাদের করণ অর্থাৎ হাত, পা, চোখ, নাক, কান ও জিহ্বা তৈরী হয়। রজোগুণ দিয়ে তৈরী বলে এরা সব সময় কাজ করতে পারে।

মন সব সময় মস্তিষ্কের সাহায্যে তার কাজ করে যাচ্ছে, এই চোখ যেমন দৃষ্টির দর্শনেন্দ্রিয় যন্ত্রের কাজ করে। মস্তিষ্ক থেকে বেশি গুরুত্ব দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কেন্দ্র, যত দিন না একজনের মুক্তি লাভ হচ্ছে এই দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কেন্দ্রটির কখনই বিনাশ হবে না, এটিও সব সময় সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে শরীরে চলতে থাকবে। আর এই কেন্দ্রটি যে কোন কিছুকেই ব্যবহার করে নিজের কাজ চালিয়ে নিতে পারে। এই ব্যাপারটা ভালো বোঝা যায় গাছপালাতে ও পশুপাখি বা কীট পতঙ্গের মধ্যে। এদের স্নায়ু কেন্দ্রটি একেবারে অন্য পদ্ধতিতে তাদের কাজ করে। প্রত্যেক প্রাণীরই এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় থাকতে হবে, আমরা যেমন করণের সাহায্যে কাজ করি পশু-পাখিরা একেবারে অন্য পদ্ধতিতে তাদের করণ গুলিকে ব্যবহার করে। পশু-পাখিদের মধ্যে কারুর ড্রাণ শক্তি ভালো, কারুর দৃষ্টি শক্তি ভালো, কারণ তাদের ইন্দ্রিয়গুলি কয়েকটা বিশেষ করণের মাধ্যমে বেশি সক্রিয়। সব কটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে মনের ব্যবহার বেশি হয়। এর ফলে মানুষের মনের ক্ষমতা সব থেকে বেশি, তাই মানুষ ছাড়া অন্য যে কোন প্রাণীর মুক্তির সুযোগও খুব কম। মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই বলা হয় মনই সব কিছু। সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান ইন্দ্রিয়।

মনের চারটি বিভাগ

রাজযোগের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল মন যখন কোন কার্য করে, একই মন চিন্তা, মনস, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই চারটি অংশ দিয়ে চার ভাবে কাজ করে। আগেকার দিনে দার্শনিকরা অনেক সময় সাংখ্যের মহৎ বা অহঙ্কারকে বুদ্ধির সঙ্গে এক করে দেখতেন। পরবর্তি কালে তারা বুদ্ধিকে আলাদা করে দিলেন। মন কখন কিভাবে কাজ করে বোঝানর জন্য একটা উপমা দিয়ে বুঝলে খুব সুবিধা হবে।

আপনি একটা অঙ্কার রাষ্ট্র দিয়ে যাচ্ছেন। আলো আঁধারিতে যেতে যেতে হঠাৎ করে আপনার চোখে একটা জিনিষ পড়ল। চোখ যন্ত্রের মাধ্যমে সেই বস্তুটা আপনার মস্তিষ্কে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু

কেন্দ্র রয়েছে সেখানে পৌঁছাল। ইন্দ্রিয় তাকে আবার মনের কাছে পাঠিয়ে দিল। একটা কিছু যে দেখছি সেটা কি জিনিষ? কারণ বাইরের বস্তুকে স্থূল চোখ ও তার ইন্দ্রিয় কখনই বুঝতে পারেনা। ইন্দ্রিয় শুধু মাত্র বাহকের ভূমিকা পালন করে। এই দশটা ইন্দ্রিয়ের কাজই হল যা কিছু সে গ্রহণ করবে তারা সেটাকে চিত্তের কাছে পাঠিয়ে দেবে। চিত্ত হল আমাদের মনের সমস্ত কিছুর সংগ্রহকারী – data collecting faculty of mind সংস্কৃতে বলে **সংগ্রহণাত্মিকা**। এরপর ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলোর আর কোন কাজ নেই, এদের খেলা এখানেই শেষ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আসছে মনস। মনের কাজ হল **সঙ্কল্পাত্মিকা ও বিকল্পাত্মিকা**। আমাদের মস্তিষ্কে যে নিওরোন গুলো রয়েছে সেগুলোর সাহায্যে মনের মধ্যে অতীত বর্তমান মিলিয়ে যত স্মৃতি জমা আছে সেখানে সার্চিং করে মেলাতে থাকে, এই জিনিষটা স্মৃতিতে কোন জিনিষের সাথে মিলছে কিনা। এত দ্রুত সব কিছু হতে থাকে যে, এর কাছে কম্পিউটার কিছুই নয়। এই যে বহির্জগত থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে একটা উত্তেজনা ভেতরে গেল সেটাকে এবার ফ্রেমের সঙ্গে ফিটিং করাতে শুরু করে দিচ্ছে। এইভাবে যা কিছু উত্তেজনা মনের কাছে আসছে সেটাকেই মন তার স্মৃতির সাথে মেলাবার জন্য অনুসন্ধান করতে থাকবে – এই জিনিষটা কি হতে পারে? অর্থাৎ মন এই জিনিষটার সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। রাতের অন্ধকারে পথে যেতে যেতে একটা আলো এলো, মনের কাছে তথ্য পাঠানো হল, মন তখন অনুসন্ধান করতে থাকবে, এটা মানুষ না অন্য কিছু, এটা চোর না পুলিশ, এটা বন্ধু না শত্রু। এটাকেই বলে মনের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ কার্য বা সঙ্কল্প-বিকল্প বা অনেক সময় বলে সংশয়াত্মিকা, সংশয় করছে জিনিষটা কি হতে পারে। বাচ্চারা যখন চেষ্টা করে চেষ্টা করে পড়া মুখস্ত করে তখন তার ভেতরে শব্দগুলো যাচ্ছে, তখন তাদের চিত্ত কাজ করছে তাই চিত্ত চঞ্চল হয়ে আছে। মন করে কি, পোষ্ট অফিসে যেমন খোপ খোপ দেওয়া বাস্ক থাকে, সেই খোপে খোপে চিঠিগুলো ফেলতে থাকে, মনও ঠিক সেই রকম সব কিছু খোপে খোপে ঢোকাতে থাকে। যখন কোন খাপ খুঁজে না পায় তখন মন সেটাকে ঢোকাতে কোথায়? যাদের মস্তিষ্ক খুব তীক্ষ্ণ তারা খট খট করে নতুন নতুন খাপ তৈরী করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। যেমন যেমন মাল আসতে থাকে তেমন তেমন তারা নতুন নতুন খাপ তৈরী করে নেবে। আমাদের মত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্নরা বলবে ‘আচ্ছা এখন থাক, পরে দেখা যাবে’। কিন্তু জিনিষটা খুব স্লিপারী, খোপে যদি না রাখা হয় তাহলে কর্পূরের মত উবে যাবে, অর্থাৎ স্মৃতির গভীরে তলিয়ে যাবে। অনেক সময় কখন কখন দেখা যায় কেউ হয়ত একটা কিছু মনে করতে পারছে না, তখন তাকে একটা চড় মেরে বলা হল ‘এই সামান্য জিনিষটা মনে থাকে না’! সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিটা ফিরে আসে।

এরপর আসছে বুদ্ধি। কোন ফ্রেমে কোনটা যাবে বুঝে নিয়ে ফটাফট বসিয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি বলে দিচ্ছে কি করতে হবে – **determinative faculty of mind** – **নিশ্চয়াত্মিকা**, নিশ্চিত করে দেয়। অন্ধকারে যে জিনিষটি দেখা গিয়েছে, সেই জিনিষটিকে এখন যে নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছে ‘এটা মানুষ’, সেই হচ্ছে বুদ্ধি। তোমাকে এটা করতে হবে, তুমি এটা করতে যেও না, এইভাবে নিশ্চিত করে বুদ্ধি সর্বদা বলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ আর অসাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এই বুদ্ধি। সাধারণ মানুষ সর্বদা মনের দ্বিতীয় অবস্থাতেই থেকে যায়, সব সময় দোদুল্যমানতা আর সংশয়, করব কি করব না। বুদ্ধি যদিও বা বলে দেয় তুমি এটা করবে, তবুও সে করতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করে। যারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তাঁরা সব সময় বুদ্ধিকেই আশ্রয় করে চলেন। আর সাধারণ মানুষরা মন থেকে বেরোতেই পারে না, করব কি করব না, আচ্ছা দেখছি কি করা যায়, আচ্ছা অন্য কোন পথ আছে কিনা ভাবছি, এই ভাবনাগুলিই এদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সব শেষে আসছে অহঙ্কার, অহম্। তথ্য সংগ্রহ হয়ে গেল, অনুসন্ধান হয়ে গেল, তারপর নিশ্চিত হওয়া গেল। এবারে আসছে যে জিনিষটাকে জানা হল, এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। অন্ধকারে যাকে দেখলাম, দেখে ভেবেছিলাম সে পুরুষ না নারী, পুলিশ না চোর। বুদ্ধি বলে দিল ঐ লোকটি একজন পুরুষ। অহঙ্কার এবার বলে দিচ্ছে আমার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক – ও আমার বন্ধু না শত্রু। এই অহঙ্কারকে বলে **অভিমানাত্মিকা**। দেখেই বলছে – আরে ভাই একা অন্ধকারে যেতে ভয় করছিল,

ভাগ্যিস তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল। যখনই মন কোন কাজ করে তখন মন এই চারটে অবস্থার যে কোন একটা অবস্থাতেই কাজ করে।

আমার আর একজন বড় যোগী বা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কোথায় তফাৎ? তফাৎ হল, রাশ্ত্রা দিয়ে যেতে যেতে স্বামীজী মন যদি চায় আমার মনে কোন দৃশ্য আসতে দেবো না, তখন স্বামীজীর চোখ বাইরের কোন দৃশ্য নেবে না, ওনার কান কোন শব্দ গ্রহণ করবে না। যোগী মানেই চিত্তের উপর তাঁর পুরোপুর নিয়ন্ত্রণ চলে এসেছে। চিত্তের উপর যাঁর নিয়ন্ত্রণ এসে গেছে স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের উপর নিয়ন্ত্রণ এসে যাবে। ভুল বশতঃ বা দৈবাৎ চিত্ত যদি কোন ভুল করে বসে তখন নিমেষে যোগী সেই ভুলটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সব কটিকে আবার সঠিক রাশ্ত্রায় তুলে দেবে। স্বামীজী প্যারিসে থাকার সময় রাশ্ত্রা দিয়ে যেতে যেতে খুব সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখলেন। স্বামীজী নিজেই বর্ণনা করছেন, এত রূপসী মেয়ে তিনি কোন দিন নাকি দেখেননি। যখন রাশ্ত্রা দিয়ে এত মেয়ে যাচ্ছে তখন কোন মেয়ের ছবিই স্বামীজীর চোখে পড়ছে না, কিন্তু এই মেয়েটি এতই রূপসী যে স্বামীজীর চোখেও ধরা পড়ে গেল। তার মানে কি দাঁড়াল? চিত্ত বলল মেয়ে, মন বলল সুন্দরী নাকি সুন্দরী নয়, বুদ্ধি বলল সুন্দরী। অহঙ্কার এবার জুড়ে দেওয়ার জন্য আরেকবার তাকাতে চাইবে। ততক্ষণে অহঙ্কার মেয়েটির মুখকে একটা বাঁদরের মুখে পাল্টে দিয়েছে। এখানেই খেলা শেষ।

যোগীর মন এমন ভাবে তৈরী যে, মনের এই চারটির কোন একটি অঙ্গ যদি দৈবাৎ ভুল করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে মনের অন্য অঙ্গ তাকে শুধরে দেবে। কাঁচা যোগীরা একটা নিয়মের মধ্যে চিত্তকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করে ধরে রাখে। নিয়মের ফাঁস একবার আলগা হয়ে গেলে তিনিও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন না। এর থেকে যাঁরা একটু উচ্চ স্তরে আছেন, অথচ সমাধিবান নয়, ঠাকুর বা স্বামীজীর মত নন, তাঁদের কাছেও অনেক রকম তথ্য আসছে, সেখানে তাঁদের চোখ কান খোলা তো খোলাই, কিন্তু মনের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ আছে। আমাদের মত যারা যোগী হবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একবার কি দুবার ভাববেন, ওই সুন্দর মুখের দিকে কি একবার তাকাবো, না থাক তাকাবো না, তাকালে কেউ যদি কিছু মনে করে। তাহলে এই ধরনের লোকেরা কীভাবে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ করবে? এদের জন্য দরকার প্রথমে বুদ্ধিকে শক্তিশালী করা। বুদ্ধি সব সময় বলবান হয় নিজের অনুভূতি, শাস্ত্র জ্ঞান আর গুরু বাক্যে। আঙনে হাত দিতে নেই, এই বুদ্ধি আমাদের এসেছে আমাদের অনুভব থেকে। শাস্ত্র বলেছে পরস্ত্রীর দিকে তাকাবে না, গুরু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেছেন – এই ভাবগুলো যত দৃঢ় ভাবে বসবে বুদ্ধিও তত শক্তিমান হয়ে উঠবে। চিত্ত আমাদের চঞ্চল হবে, মন ছটফট করবেই, তখন এই বুদ্ধি গিয়ে এদের নিয়ন্ত্রণ করবে। আমরা যখন বলছি মনের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, এখানে মনের শক্তি মানেই বুদ্ধির শক্তি। বুদ্ধি মনকে বলে দিচ্ছে, আর তাকাবে না, মন বলছে খুব সুন্দর, বুদ্ধি বলছে সুন্দর হতে পারে কিন্তু আমার সুন্দর লাগবে না।

সমস্যা হয় অহঙ্কারকে নিয়ে, যাকে অভিমান বলছে, যার কাজ সব কিছুর সাথে নিজেকে জুড়ে দেওয়া। এই অহঙ্কারের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। চিত্ত, মন, বুদ্ধি এরা খুব বেশী গোলমাল পাকায় না, সব গোলমাল পাকায় অহঙ্কার। কি রকম গোলমাল পাকায়? আপনার হয়তো একটা মেয়েকে ভালো লেগেছে, বুদ্ধি বলে দিচ্ছে ভালোবাসা করা যাবে না, কিন্তু অহঙ্কার মেয়েটির নামে মিষ্টি মিষ্টি কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে। একটা খুব মজার গল্প আছে। একজন লোক এক পাগলা গারদ দেখতে গেছে। সেখানে একটা পাগল খুব মিষ্টি করে কোকিল স্বরে কুহু কুহু করে যাচ্ছে। লোকটি জিজ্ঞেস করছে পাগলটি এই রকম কুহু কুহু কেন করছে। তাকে বলছে, কুহু নামে একটি মেয়েকে এই লোকটি ভালোবাসতো, মেয়েটি ধোকা দেওয়ার পর থেকে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লোকটি কথা শুনে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেখান থেকে আরেকটা সেলে গিয়ে দেখছে আরেকটি পাগল কুহু কুহু করছে আর দেওয়ালে শুধু মাথা ঠুকে যাচ্ছে। লোকটি তখন বলছে কুহু মেয়েটি তো আচ্ছা বদমাইস, একেও ধোকা দিল! সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলা হচ্ছে – না না! কুহুকে এই লোকটি বিয়ে করেছিল। দুটো ক্ষেত্রেই অহঙ্কার মানে অভিমানাত্মিকা কাজ করছে – একটা ক্ষেত্রে তাকে মিষ্টি মিষ্টি

করে কুছ কুছ করাচ্ছে, আরেকটি ক্ষেত্রে তাকে মাথা ঠুকিয়ে যাচ্ছে। মন নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক অবস্থায় চিন্তের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা নয়, দৃশ্য তাদের কাছে আসবেই, শব্দ তাদের কাছে আসবেই। তারা জানে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। দুর্যোধনও বলছে ‘আমি জানি কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম, কিন্তু ধর্ম করতে ইচ্ছে করে না আর অধর্ম করা থেকে মন সরতে চায় না’। আমাদের সবার মনেরই দুর্যোধনের মত অবস্থা। সেইজন্য রাজযোগে সব সময় বলবে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যখন শুরু হয় তখন প্রথমে বুদ্ধির শক্তিকে বাড়াতে হয়। যত শাস্ত্র শুনবে, যত সাধুসঙ্গ করতে থাকবে, যত শুভ চিন্তন করতে থাকবে বুদ্ধি তত শক্তিশালী হতে থাকবে, তার সাথে প্রধান কাজ হল অহঙ্কারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, identification যত কম রাখা যায়। একটা মেয়েকে আপনার ভালো লেগেছে, ভালো লাগতেই পারে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়েছে, তা লিখুন। চিঠিটা লেখা হয়ে গেলে পোষ্ট না করে ছিঁড়ে ফেলুন। অভিমান বা অহঙ্কারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিযান এখান থেকে শুরু হয়।

মনের এই চারটে কাজ। মনের মধ্যে যত বৃত্তি তৈরী হচ্ছে, সব বৃত্তি মনের এই চারটে আকারে কাজ করে – চিন্তা, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার। শান্ত জলাশয়ে একটা টিল ছুঁড়লে এক সঙ্গে অনেক তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে জলাশয়ের শান্ত ভাবকে নষ্ট করে দেবে। ঠিক তেমনি, বাইরে থেকে যখন একটা উত্তেজনা আসছে যেমন মিষ্টির উস্কানি আসছে। দারুণ মিষ্টি, আমার ডায়বেটিস আছে, ডাক্তার মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছে আবার বাড়িতে জানলে বকাবকি করবে। আমিও জানি মিষ্টি আমার শরীরের পক্ষে বিষতুল্য। কিন্তু মিষ্টির সাথে এমন জোর identification হয়ে গেছে যে আমাকে ভাবতে হচ্ছে আমি এখন কি করব? তখন বুদ্ধির শক্তি যেটা শাস্ত্র পড়ে হয়েছে, এখানে ডাক্তার নিষেধ করেছে, বাড়িতে বলে দিয়েছে মিষ্টি খেলে তোমার শরীরের ক্ষতি হবে, বুদ্ধির এই শক্তিই তখন আমাকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি যদি খুব দুর্বল থাকে তখন সে অহঙ্কারকে আর সামলাতে পারবে না। তাই প্রথমে অহঙ্কারকে আগে কোপ মারতে হয়। কীভাবে অহঙ্কারকে কোপ মারবে? সন্ন্যাসীরা যেমন প্রথমেই মা-বাবার স্নেহ-মমতাকে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে, সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে বউ বাচ্চার পাল্লায় পড়তে হলো না, টাকা-পয়সার ব্যাপারটা এমনিতেই বেরিয়ে গেল। যে যে জায়গা থেকে অহঙ্কার এসে বাঁধতে পারে, সেই জায়গাগুলোকেই সন্ন্যাসীরা প্রথমে কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে সন্ন্যাসীদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ হয়ে যায়। তাই বলে ঘর-সংসার করা কি খারাপ? কখনই তা বলছে না, ঘর-সংসার বুদ্ধিকে অনেক নিয়ন্ত্রণে রাখে। নিজের প্রয়োজন না থাকলেও বউ বাচ্চার জন্য তাকে বাইরে বড় বৃত্তির মধ্যেই বেরতে হবে বাজার করার জন্য, টাকা রোজগার করার জন্য, কিন্তু সন্ন্যাসী কিছু না জুটলে এক গ্লাস জল খেয়েই শুয়ে পড়বে।

মন যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য আহরণ করে আনছে তখন তাকে চিন্তা বলছে, যখন তথ্যগুলোকে বাছাই করে তখন তাকে মন বলছে, বাছাই করতে করতে যখন একটা তথ্যকে ধরে ঠিক করে নিল তখন তাকে বুদ্ধি বলছে, এবার সেই তথ্যকে নিয়ে যখন কার্য চলে তখন তাকে অহঙ্কার বলছে। যোগশাস্ত্রে মনের এই চারটি বিভাগের ভূমিকাকে পুরো যৌক্তিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মনের ব্যাপারে এখানে অনেক কিছু বলা হল, যোগ কিন্তু এত কথা বলতে যাবে না। যোগ শুধু বলবে, মন আছে আর মনে বৃত্তি উঠছে। সেতো আমরা সবাই জানি। যোগ শুরুই করবে এখান থেকে – মন আছে তুমি মানছ তো? হ্যাঁ মানছি। বহির্জগৎ দেখছো তো? হ্যাঁ দেখছি। বহির্জগৎ তো তোমার মস্তিষ্কের বাইরে নেই? হ্যাঁ মস্তিষ্কের বাইরে নেই। তোমার মস্তিষ্কে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ওটাই তো তোমার জগৎ? হ্যাঁ তাও মানছি। এই যে মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া এটাই বৃত্তি। এটুকু বুঝে নিয়েছ? হ্যাঁ বুঝে নিয়েছি। এরপর তোমাকে বাকিটুকুও বুঝিয়ে দিচ্ছি। আগাগোড়া যোগ তাই খুব যৌক্তিকতা নিয়ে চলে।

এই অহঙ্কারই আবার সমস্ত কিছুর অশান্তির মূল। এই অহঙ্কার থেকেই জন্ম নেয় রাগ আর দ্বেষ। আমরা কোন জিনিষকে সব সময় পেতে চাইছি আর কিছু কিছু জিনিষের থেকে সব সময় দূরে থাকতে চাইছি। রাগ মানে কোন জিনিষের প্রতি আমার আকর্ষণ আর দ্বেষ হল কিছু কিছু জিনিষ থেকে আমি দূরে থাকতে চাইছি। যাকে বেশি ভালোবাসি তাকে দেখলেই আনন্দ হবে। আবার কিছু মানুষ আছে

যাদের পছন্দ করি না, তাদের দেখলেই আমার বিরক্তি আসবে। যখনই দেখবো ঐদিক থেকে পছন্দের লোক আসছে আর অন্য দিক থেকে অপছন্দের লোক আসছে, তখন স্বাভাবিক ভাবে পছন্দের লোকের দিকে ঘুরে যাবে। যেই মুহুর্তে সে ঘুরে গেল তখনই প্রকৃতি তাকে একটা বন্ধনে ফেলে দিল।

আমরা বাংলায় যেটা বলি – কি, তোমার খুব অহঙ্কার হয়েছে তাই না। এখানে কিন্তু এই অহঙ্কারের কথা বলা হচ্ছে না। যোগের অহঙ্কার মানে নিজেকে কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে জুড়ে দেওয়া। অবশ্য বাংলায় যে অহঙ্কারের কথা বলা হয় এটিও এই অহঙ্কারেরই পরিণত রূপ। কোন জিনিষের প্রতি মায়া, মমতা এত বেশি হয়ে গেছে, যার ফলস্বরূপ সব সময় ওগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। যার প্রচুর টাকা পয়সা হয়ে গেছে তার ধনের অহঙ্কার হয়, মানে সে নিজের সত্তাকে অর্থ-সম্পদের সঙ্গে এক করে ফেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ঠাকুরের গল্প আছে – একটা ব্যাঙ কোন ভাবে একটা টাকা পেয়ে গিয়েছিল। একটা হাতি ব্যাঙের গর্তটাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে দেখে সে হাতিকে লাথি দেখিয়ে বলছে ‘তোরা এত দুঃসাহস আমার বাড়িকে ডিঙিয়ে যাওয়া হচ্ছে’। এই অহঙ্কারের সঙ্গে রাজযোগের যে অহঙ্কারের কথা বলা হয় তার একটা যোগ আছে।

বেদান্ত আর যোগের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক তফাৎ

আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতি হল জড়, তার নিজস্ব কোন চৈতন্য বা আলো নেই। পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে এসে পড়ে তখন প্রকৃতিতে পুরুষের চৈতন্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে প্রকৃতিকে চৈতন্য বলে মনে হয়। সিনেমা হলে যে বিরাট পর্দা লাগানো থাকে, এখন পর্দার কি কোন নিজস্ব আলো আছে? পর্দা একটি সম্পূর্ণ জড় বস্তু। কিন্তু যখনই প্রোজেক্টরটা চালু হয়ে গেল তখনই পর্দা আলোময় হয়ে গেল। প্রকৃতিও ঠিক এই সিনেমার পর্দার মত। প্রকৃতির কিছু নেই, হঠাৎ পুরুষের আলো এসে পড়ল, যেমনি পুরুষের আলো এসে পড়ল প্রকৃতি চনমনিয়ে উঠল। পর্দা পর্দাই আছে, তার নিজস্ব কোন আলো নেই।

হাজার হাজার, কোটি কোটি জন্ম ধরে এই প্রকৃতিকেই মানুষ সত্য বলে বদ্ধ ধারণা করে আসছে। কলকাতার একটা ছেলে গ্রামের ক্ষেতের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখছে ক্ষেতের মাঝখানে ফুলকপি, বেগুন, টমেটো ফলে রয়েছে। ছেলোট চেষ্টা করে বলছে ‘মা, দ্যাখো দ্যাখো গ্রামের দেশে সজী গুলো মাঠে হয়’! ছেলোট এতদিন ধরে দেখে এসেছে পার্ক স্ট্রীটের বাজারে দোকানের শো-কেসের মধ্যেই সজীগুলো জন্মায়। এই প্রথম সে মাঠে সজী দেখছে। একবার রাজস্থানে বারো বছর বৃষ্টি হয়নি। বারো বছর পর যেদিন প্রথম বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সেই সময় যে বাচ্চাদের বয়স দশ এগারো, আকাশ থেকে জল পড়ছে দেখে চিৎকার করে পালিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেছে। বাচ্চারা এত দিন জানত জল কুয়োর গভীরে থাকে। বাচ্চাদের মত মানুষও প্রকৃতিকে জড় ভাবে একেবারেই প্রস্তুত নয়। বেদান্ত বলবে পুরুষ, যিনি আত্মা, তিনিই এগুলো কল্পনা করতে থাকেন। কল্পনাটা কোথায় প্রতিফলিত হয়, প্রকৃতিরূপ ঐ সিনেমার পর্দাতে গিয়ে পড়ে। প্রকৃতিটা কি? বলছে প্রকৃতিও কল্পিত। তাহলে আমার চোখের সামনে যা কিছু হচ্ছে এগুলো কি? বেদান্ত বলছে সবই কল্পনা। কিসের কল্পনা? প্রোজেক্টর থেকে যখন আলো আসে, সেটাতো রিলের মধ্য দিয়ে আসছে, তখন রিলের মধ্যে যে ছবিটা আছে সেই ছবিকে আলো পর্দার মধ্যে প্রতিফলিত করছে। সিনেমাতে যে ছবি দেখছি, তা তো আলো ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মার আলোটা একটা জায়গায় গিয়ে বাধা পাচ্ছে। বাধাটা কি? বাধাটাই মন। কোথায় গিয়ে আত্মার আলোটা পড়ে? এই বহির্জগতে। তাহলে দাঁড়াল, আসলে কিছুই নেই। পর্দা বলে কিছুই নেই, মন বলে কিছুই নেই। তুমি আসলে শুদ্ধ আত্মা কিন্তু নিজের স্বরূপকে ভুলে গিয়ে নিজেকে সব কিছুর মধ্যে নিষ্কোপ করে কল্পনা করে যাচ্ছে। তাহলে এই যে সবাইকে দেখছি আলাদা আলাদা, এগুলি কি? এগুলো কিছুই নয়, সবই তোমার মনের কল্পনা। সাংখ্য আর বেদান্তের মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। রাজযোগ বলবে – পুরুষের আলো প্রকৃতির মধ্যে পড়ছে, প্রকৃতি নাচ করে করে তার খেলা দেখাতে শুরু করে। রাজযোগের মূল দর্শনের আলোচনার সময় এই ব্যাপারটাই আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হবে।

মনে করুন এখানে যদু বাবু আছেন, বেদান্তের মত রাজযোগ বলবে না যে এখানে যদু বাবু নেই, কল্পনা বলে রাজযোগ কোন কিছুই উড়িয়ে দেবে না, রাজযোগ এও বলবে না যদু বাবু এখানে আছেন। সূর্যের আলো যদু বাবুর উপর পড়ছে, তার কাছ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে পড়ছে। চোখ সেই আলোর সঙ্কেত পাঠিয়ে দিল ইন্দ্রিয়ের কাছে। ইন্দ্রিয় সেটাকে আবার মনের কাছে পাঠিয়ে দিল। যেহেতু মনের উৎপত্তি প্রকৃতি থেকে, প্রকৃতি নিজে জড়, তাই মনও জড়। যেহেতু প্রকৃতি থেকে জন্ম তাই ওর নিজস্ব কোন বুদ্ধি নেই। ঠিক এইভাবে বুদ্ধিও জড়। ভারতীয় আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সাথে পাশ্চাত্য আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের এটিই প্রধান পার্থক্য। পাশ্চাত্য দর্শন মনকেও চৈতন্য বলে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে মন পুরোপুরি জড় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত। মন ও বুদ্ধি পুরুষের সব থেকে কাছে অবস্থান করে বলে দুটোকে বেশি চৈতন্যময় মনে হয়।

বেদান্ত মতে মন এই চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে তার বিষয়কে নিয়ে পুরুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য হাজির হয়। এখানে আবার যোগ দর্শনে তফাৎ হয়ে যায়। যোগদর্শনে বলছে করণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের কাছে তথ্য আসছে। ইন্দ্রিয় এগুলো সংগ্রহ করে মনের কাছে পাঠিয়ে দিল। Processor যন্ত্রের মত মন এই তথ্যগুলিকে প্রসেস করে পুরুষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাড়িতে যেমন কর্তাকে গিল্লী এসে বলল ‘বাজার থেকে মাছ আনতে হবে’ কর্তা ‘হুঁ’ করে অনুমোদন করলেন। কেন করলেন? কারণ কর্তা গিল্লীর সঙ্গে নিজেকে এক করে রেখেছে। গিল্লী আবার তার বাচ্চাদের সাথে নিজেকে এক করে রেখেছে। বাচ্চারা আবার তাদের ক্ষিদের সাথে এক হয়ে আছে। এখন বাজার থেকে মাছ আনতে হবে। কর্তাকে হয়তো যেতে হবে না, কর্তা যদি রাজা হন তাহলে তো যাওয়ার কোন প্রশ্নই হয় না। মন্ত্রী সেনাপতি সবাই এসে রাজার হয়ে কাজ করে দেবে। সাংখ্য দর্শনের মতে যে কোন কর্ম এভাবেই হয়ে থাকে। জড়ের মধ্য দিয়েই সব হচ্ছে, কিন্তু সবার শেষে গিয়ে হাজির হচ্ছে চৈতন্যের কাছে। কোথাও চৈতন্যকে রাখতেই হবে, চৈতন্য যদি না থাকে তাহলে প্রকৃতির কোন কার্যই হবে না।

মন আর ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তিকরণের গুরুত্ব

রাজযোগের দু তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষকে আগে ভালো করে বুঝে নিতে হবে। সবার আগে যোগে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র বা গোলক বলতে কাকে বোঝাচ্ছে আর এদের মধ্যে কি সম্পর্ক সেই ব্যাপারে পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমাদের এই শরীর আছে, এর মধ্যে ইন্দ্রিয় বলতে আমরা সাধারণ ভাবে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটিকে বুঝি। কিন্তু কেউ হয়তো কথা বলছে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি, তার কথা শুনছি, তার ঠোঁট নড়ছে দেখছি, কিন্তু তার কথা গুলো আমার কানে যাচ্ছে না। এটা কেন হচ্ছে? আমি চোখটা খুলেই রেখেছি, দৃষ্টিটাও বজ্রের দিকে আছে, কিন্তু মনের সঙ্গে চোখের যোগ হচ্ছে না বলে তার কোন কথাই আমি শুনতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে জিনিষটা পড়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এখন চোখের মধ্যে ঐ জিনিষটা কি কোন ছবি পাঠাচ্ছে না? চোখের বদলে যদি ক্যামেরা থাকত, ক্যামেরাটা যদি ক্লিক করত তাহলে ক্যামেরাতে ছবিটা উঠতই। ক্যামেরার মত চোখও কখনই ভুল করে না, চোখে সিগনাল যাবেই, কিন্তু চোখ হাজারবার ভুল করে বসে। শার্লক হোমসের কাহিনীতে একটা বিখ্যাত উক্তি আছে – you are looking but you are not seeing. যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি খুব বেশি থাকে তাদের নজরে সব সময়ই সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি জিনিষ ধরা পড়ে। বিখ্যাত যাদুকর ভুদিনি একবার যদি কিছু দেখে নিতেন, তাহলে পরে তিনি ঐ জিনিষের সব ঠিক ঠিক বর্ণনা করে দিতে পারতেন। একটা দোকানে নানান ধরণের জিনিষ রাখা আছে, সাধারণ লোককে শুধু এক নজর দোকানটা দেখানোর পর চোখ বন্ধ করে দিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে দোকানের দশটার বেশি জিনিষের নাম করতে পারবে না। কিন্তু ভুদিনি পঁচিশটা জিনিষের বর্ণনা করে দিতেন। ওনার আট বছরের ছেলে প্রায় পঞ্চাশটা বলে দিতে পারত। এই কারণে মন আর চোখের সংযুক্তিকরণের উপর সব থেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

তিনটে জিনিষকে মনে রাখতে হবে – মন, চোখ আর চোখের দৃষ্টিটা মস্তিষ্কের যেখানে পড়বে সেই স্নায়ুকেন্দ্র (mind, eye and vision centre)। চোখের ঐ স্নায়ু-কেন্দ্রটি যদি না কাজ করে

তাহলে যতই চোখ খোলা থাকুক না কেন আমাদের নজরে কিছুই আসবে না। রাজযোগে স্থূল চোখ যন্ত্রটির তথ্য সংগ্রহ ছাড়া কোন ভূমিকাই নেই, যোগে চোখের এই স্নায়ু-কেন্দ্রটিই (vision centre) প্রধান। চোখ, কান, নাক ইত্যাদিকে যোগের ভাষায় বলা হয় করণ বা গোলক, অর্থাৎ যাদের সাহায্যে এই জগৎকে জানা যায়। স্থূল চোখ ঐ স্নায়ুকেন্দ্রেরই সম্প্রসারিত যন্ত্র মাত্র। তাহলে যে অন্ধ, বোবা বা কালা তাদের কি একটা ইন্দ্রিয় কমে যাবে? তাই যদি হয় তাহলে যোগদর্শন সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যাবে। যোগ চক্রিশ তত্ত্বের কথাই বলছে, যা কিছু আছে সব এই চক্রিশ তত্ত্বের মধ্যেই আছে। এই চোখ কান ইত্যাদি যন্ত্রগুলো হল ঐ স্নায়ুকেন্দ্রের সম্প্রসারিত অংশ মাত্র। প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই চক্রিশ তত্ত্ব থাকতে হবে। এই চোখে যখন টেলিস্কোপ লাগিয়ে দিচ্ছি তখন সেটাই আবার এই চোখেরই সম্প্রসারিত যন্ত্র হয়ে গেল। আবার সেই টেলিস্কোপকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে উপগ্রহে। টেলিস্কোপটা যেমন আমাদের ইন্দ্রিয় নয়, তেমনি স্থূল চোখ, কান এগুলোকেও ইন্দ্রিয় বলা যায় না। আমাদের আসল ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কে, এ যদি খারাপ হয়ে যায় তখন টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করেও কোন কাজ হবে না। কারণ এই সম্প্রসারিত যন্ত্র আর মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রের সাথে কোন যোগ আর হবে না। এই সংযোগটাই সব থেকে গুরুত্ব। এটাই ইন্দ্রিয় আর করণের মধ্যে পার্থক্য। রাজযোগ বলবে তুমি তোমার মস্তিষ্কের ঐ স্নায়ু কেন্দ্রগুলিকে আগে ঠিক কর তখন করণ স্বাভাবিক ভাবেই কাজ করবে। যোগ দর্শনের এই জটিল ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হবে।

চক্রিশটি যে তত্ত্ব আছে তার মধ্যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ই সর্বশেষ তত্ত্ব, এই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা জগতের যা কিছু জানছি, দেখছি, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি যদি ইচ্ছে করে সে যে কোন যন্ত্রকে তার দরকারে কাজে লাগাতে পারে। এমন কি এরা ইচ্ছে করলে কোন যন্ত্র ছাড়াই কাজ করতে পারে। কোন কারণে যদি ইন্দ্রিয়গুলি বলে আমার এই করণের কোন দরকার নেই, তখন সে স্থূল যন্ত্র ব্যতিরেকেই জগতের যে কোন ধরণের জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে। যোগীদের ক্ষেত্রে এ ধরণের জিনিষ সত্যি সত্যিই হয়ে থাকে। তাঁরা ইন্দ্রিয় আর করণকে পরিষ্কার ভাবে আলাদা করে দেখেন। যখন এই দুটোকে আলাদা করে দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে তখন এই দুটোর আর কোন সংযোগ থাকবে না। এখন আমরা এই চোখ, কান, নাক দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ করছি, কিন্তু এই দুটোকে যখন আলাদা করে দেওয়া হবে তখন এই চোখ, কান, নাক ছাড়াই আমরা ইচ্ছে করলে যে কোন জ্ঞান লাভ করতে পারব। রাজযোগকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে আমাদের এই দুটো জিনিষকে পরিষ্কার ভাবে আগে বুঝে নেওয়া দরকার। ইন্দ্রিয়কে ভাষায় বোঝাবার জন্য আমাদের বলতে হয় এটি মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র, কিন্তু প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বস্তু। মানুষ যখন মারা যায় তখন এই ইন্দ্রিয়গুলিও তার সঙ্গে যায়। এগুলো যদি মস্তিষ্কের স্থূল কেন্দ্র হত তাহলে কখনই মরে যাওয়ার পর সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে যেতে পারত না। মস্তিষ্ক স্থূল শরীরেরই একটি অঙ্গ, আর ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম, মস্তিষ্কের সাথেও এর কোন সম্পর্কই নেই। মস্তিষ্কও মনেরই একটা যন্ত্র বিশেষ। Brain Centre বলা হয় বোঝাবার জন্য, কিন্তু এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা।

রাজযোগের চারটি অধ্যায় – (১) সমাধি-পাদ, (২) সাধন-পাদ, (৩) বিভূতি-পাদ এবং (৪) কৈবল্য-পাদ। যাদের যোগের উপর আগ্রহ আছে, তাদের জন্য একটা কথাই বার বার বলতে হয়, তা হলো তাদের অবশ্যই স্বামীজীর রাজযোগ বইটি খুব গভীর মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। স্বামীজীর রাজযোগে দুটো ভাগ আছে, প্রথম ভাগে আছে ‘সরল রাজযোগ’, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম ঠিক কি, সেই বিজ্ঞান সম্মত ধর্মকে জানতে হলে অবশ্যই স্বামীজীর ‘সরল রাজযোগ’ অধ্যায়টি পড়া থাকলে পরের দিকে মূল রাজযোগ অধ্যয়ন করার সময় অনেক সহজ লাগবে। স্বামীজীর রাজযোগ একবার দুবার নয়, বেশ কয়েকবার পড়তে হবে, অধ্যয়নের সাথে সাথে সাধনা করতে থাকলে অর্থের অনুধ্যানও হয়ে যাবে। আমরাও এখন স্বামীজীর মূল রাজযোগকে অবলম্বন করে যোগশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলোকে অধ্যায় অনুসারে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

সমাধি-পাদ

পতঞ্জলি যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য আর ভোজবৃত্তি নামে দুটি বিখ্যাত ভাষ্য পাওয়া যায়। বৃত্তিতে সূত্রের শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করেই ছেড়ে দেওয়া হয় কিন্তু ভাষ্য কোন সূত্রকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। শঙ্করাচার্য যা কিছু লিখেছেন সেগুলি সবই ভাষ্যাকারে লিখেছেন। ভাষ্যকে প্রথম থেকেই সবার উঁচুতে রাখা হয়। কেউ যদি কোন দর্শনের ভাষ্য রচনা করতে চান তাহলে তাঁকে আগাগোড়া সেই দর্শনের সামগ্রিক ভাবকে বজায় রেখে নিজের পাণ্ডিত্য ও যুক্তির দ্বারা সেই দর্শনের বক্তব্যকে নিজস্ব দর্শনের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। টীকা হল শুধু সূত্রের অর্থকে সহজ করে বলে যাওয়া। যেমন গীতার উপর শ্রীধর স্বামীর খুব বিখ্যাত টীকা আছে। শ্রীধর টীকাতে গীতার অর্থকে খুব সহজ করে বলে দেওয়া হয়েছে। টীকার উপরে হল বৃত্তি। বৃত্তিতে আরেকটু বেশি ব্যাখ্যা করা হয়।

রাজযোগ লেখার সময় স্বামীজী ব্যাসভাষ্যটা পাননি, ভোজবৃত্তিটাই তিনি পেয়েছিলেন। যদিও স্বামীজী ভোজবৃত্তির উপর ভিত্তি করে লিখেছেন কিন্তু পুরোটাই তিনি তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা নিয়েই একটা স্বতন্ত্র যোগশাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান যুগে স্বামীজীর রাজযোগকেই যোগদর্শনের সব থেকে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়। স্বামীজীর রচিত রাজযোগের গুরুত্ব ব্যাসভাষ্য বা ভোজবৃত্তিকে অতিক্রম করে গেছে কারণ তিনি রাজযোগকে অনেক যুগোপযোগি করে লিখেছেন আর অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষকে বাদ দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথম সূত্র – *অথ যোগানুশাসনম্ ॥১॥* এর অর্থ আমরা এখন যোগ দর্শনের কথা বলা শুরু করছি। এটাই রাজযোগের প্রথম সূত্র। সূত্র-ধর্মীয় শাস্ত্রে প্রথমেই বলে দেওয়া হয় কি বিষয়ে বলতে যাওয়া হচ্ছে। এখানে বলছেন – *অথ যোগ অনুশাসনম্*, আমরা এখন যোগের কথা বলতে যাচ্ছি। ব্রহ্মসূত্রেও প্রথমেই বলছে ‘*অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা*’- মানে, আমরা এখন ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করছি।

যোগের দ্বিতীয় সূত্রে বলছেন – *যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥২॥* যোগ মানে চিন্তবৃত্তির নিরোধ। চিন্তা কি আমরা আলোচনা করেছি, বৃত্তি কি তার উপরও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে আর নিরোধ মানে আটকে দেওয়া। এই সূত্রের সরল বাংলা করে দাঁড়ায় – চিন্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলা হয়।

ভারতীয় শাস্ত্রের এটি একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রথমেই বলে দেওয়া হল আমরা কি আলোচনা করতে যাচ্ছি। যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমি তোমাকে কি শেখাতে যাচ্ছি? শুরুতেই বলে দেওয়া হল আমি তোমাকে চিন্তবৃত্তি নিরোধ শেখাতে যাচ্ছি। এখানেই কেউ যদি বলে দেয় – এই ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। তাহলে ভাই এই শাস্ত্র তোমার জন্য নয়। কিছু কিছু শাস্ত্র আরও পরিষ্কার করে বলে দেবে – এই বই কার জন্য। সেখানে তারা পরিষ্কার শর্ত ঠিক করে বলে দেবে পাঠকের কি কি গুণ থাকলে তবেই সে এই শাস্ত্র পাঠ করার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে। যোগের ক্ষেত্রে এইভাবে অধিকারী নিরূপণ করে দেওয়া হয় না। যোগ সবার জন্য দরজা খুলে রেখেছে, যে কেউই যোগদর্শনকে অধ্যয়ন করতে চাইলে সে অধ্যয়ন করতে পারে। এবার যদি কেউ জিজ্ঞেস করে চিন্তবৃত্তি করলে কি হবে? তখন বলবে চিন্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেলে সে স্বরূপে অবস্থান করবে।

প্রথমে বলে দিল এটা কি বিষয়, দ্বিতীয় সূত্রে বলে দিচ্ছে আমি তোমাকে কি শেখাতে যাচ্ছি। প্রথম সূত্রে শুরু হল আর দ্বিতীয় লাইনে এসে সব কাহিনী শেষ করে দিল। মারের যে বিষয়বস্তু, সেটা নিয়েই বাকীটা চলতে থাকবে। এটাই ভারতীয় শাস্ত্রের অনন্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে বলবে অমুক জায়গায় জন্ম হল। আর শেষ পাতায় বলা হবে অমুক জায়গায় মৃত্যু হল। মাঝখানে পুরো কাহিনীটা। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে প্রথম লাইনেই বলে দেবে অমুক জায়গায় জন্ম হল, আর দ্বিতীয় লাইনে বলে দেবে অমুক জায়গায় মৃত্যু হল, আর কোন রহস্য নেই।

চিত্তবৃত্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা

যোগ কি? চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্ত কি আমাদের জানা হয়ে গেছে। পরের শব্দটা হচ্ছে বৃত্তি। একটা পুকুর আছে, পুকুরটা শান্ত আছে, এই শান্ত পুকুরে একটা পাথর পড়ল, এবার পাথরের আকৃতি আর কতটা জোরে ওই পাথরটা পড়ল সেই অনুসারে পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ বা তরঙ্গ হত শুরু করবে। এখানে বৃত্তিটা হল ripples এর মত, ছোট ছোট ঢেউ, wave বললে বড় ঢেউ হয়ে যাবে, বৃত্তি সব সময় ছোট ছোট ঢেউ।

আমি চুপচাপ বসে আছি। আমার মন এখন একটা বিশেষ অবস্থায় আছে। আমার মনের মধ্যে কটা বৃত্তি আছে অথবা কোন বৃত্তিই নেই, এসব এখন আলোচনা করছি না। তবুও আমরা বোঝার জন্য ধরে নিচ্ছি মন পুরোপুরি শান্ত অবস্থায় আছে, যদিও মন কখনই শান্ত থাকে না, যেটা আমরা একটু পরেই বুঝতে পারব। হঠাৎ এখানে কেউ এল। আমি কি করে জানলাম? আমার চোখ খোলা রয়েছে, যদি চোখ খোলা না থাকে কান খোলা রয়েছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন, দরজায় ঠক ঠক করে টোকা পড়ল। কানের কাছে খবর এলো, কান তার ইন্দ্রিয়ের কাছে সেই খবর পাঠিয়ে দিল। কিন্তু মনে করুন আমি জানলার ধারে বসে আছি, আকাশে একটা চিল উড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার মনে এই নিয়ে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। সকালে খবরের কাগজে দেখলেন আমাদের মহাকাশে অনেক দূরে একটা তারা বিস্ফোরণ হয়ে মহাজগতে বিলীন হয়ে গেছে, এটাও আমার মনে কোন রেখাপাত করবে না। আবার ধরুন আমি বসে আছি হঠাৎ খবর এলো আমার কোন প্রিয়জন মারা গেছে, খবরটা কানে আসা মাত্রই দেখা গেল সমস্ত শরীর যেন অসার হয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে মন ভীষণ ভাবে অস্থির হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আর সেই প্রতিক্রিয়াটাকে বাইরে ছুড়ে দিচ্ছে।

মনের এই বাইরে প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেওয়াকে স্বামীজী তুলনা করছেন ঝিনুকের মুক্তার সাথে। বাইরে থেকে এক বিন্দু বালুকণা বা কীটাণু ঐ সূক্তির ভিতরে চলে গেল। সূক্তি বাইরের ঐ বস্তুটিকে সহ্য করতে পারে না বলে তার ভেতরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তখন সে ঐ ক্ষুদ্র বস্তুটির চারপাশে এনামেলের মত আবরণ দিতে থাকে, আর এই এনামেলের আবরণটাই ধীরে ধীরে বালুকণাকে মুক্তাতে রূপান্তরিত করে দেয়। এই জগতে যা কিছু আছে আমাদের কাছে সব ঐ বালুকণার মত। রাজযোগের মতে বন্ধন কি আর মুক্তি কি, এই পুরো ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে আছে এই সূত্রের উপরে – যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

আরও পরিষ্কার বোঝার জন্য আমরা কিছু উপমার সাহায্য নিচ্ছি। রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন সকাল বিকেল দু বেলা একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বাড়িটা আমার মনে কোন দাগ ফেলে না, আর পাঁচটা বাড়ির মতই মনে হয়। একদিন একটা মোটা টাকার লোভনীয় চাকরির নিয়োগপত্র আমার হাতে এল। আমার এই চাকরির ইন্টারভিউটা ঐ বাড়িতেই হয়েছিল। তারপর থেকে ঐ বাড়িটা, যেটা এত দিন আমার কাছে কোন গুরুত্ব ছিল না, এখন সেই বাড়িটাই আমার কাছে আলাদা গুরুত্ব পেয়ে গেল। কারণ এই বাড়িতে আমার ইন্টারভিউ হয়েছিল আর সেই ইন্টারভিউর জন্য আজকে এই লোভনীয় চাকরিটা পেয়েছি। বাড়িটা আগেও ছিল আর বাড়িটা এখনও আছে কিন্তু বাড়িটার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা এখন পাল্টে গেল। কোন্ জিনিষটা পাল্টেছে? আমার মনের একটা ভাব বাড়িটার প্রতি নিষ্ফেপ করেছি। সূক্তি যে ভাবে এনামেল দিয়েছিল ঠিক সেইভাবে এখানেও এনামেল দেওয়া হচ্ছে। এই যে এনামেল দেওয়া হচ্ছে এই এনামেলটাই আমাদের জগৎ। সংসারটা কি? সংসার হল বাইরের বস্তুতে যে অনুভূতি নিষ্ফেপ করা হচ্ছে সেই অনুভূতিটাই এই সংসার। এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আমাদের যে অনুভূতি হচ্ছে এই অনুভূতিটাই সংসার। বাইরের কোন বস্তুরই পরিবর্তন হচ্ছে না, বাড়িটা যেমন ছিল তেমনই আছে। পরিবর্তন হয়েছে আমার মনের মধ্যে বৃত্তি রূপে। কি ভাবে পরিবর্তন আসে? রাগ ও দ্বেষের মাধ্যমে। যখন বাইরের কোন বস্তু বা ঘটনা মনের ভেতরে গিয়ে কার্য করে তখনই মনে বৃত্তি তৈরী হয়, বৃত্তি মানে মনের মধ্যে তখন কম্পন হতে থাকে। এই কম্পন কোন কোন সময় খুব মৃদু আবার কোন কোন সময় বিরাটাকার ধারণ করে। ইন্দ্রিয়ের করণগুলির মাধ্যমে জগতের সব কিছু আমাদের সর্বদা ভোগ হয়ে

যাচ্ছে, আমি দেখছি, আমি শুনছি, এগুলো অনবরত হয়েই চলেছে, আর এই কারণে মন ক্ষণে ক্ষণে এক এক সময় এক এক ধরনের রূপ নিচ্ছে। মনের এই আকার ধারণকে (mental modification or mental transformation) বলা হয় বৃত্তি। চিত্তবৃত্তি মানে চিত্ত যে আকার বা রূপ ধারণ করছে।

আমরা এর আগেও বলেছি, যোগদর্শন জানার জন্য আমাদের কোন কিছুই মানতে হবে না, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছেন, ব্রহ্মই সব, ঈশ্বরে ভক্তি করতে হবে এই ধরনের কোন কথাই যোগদর্শন আমাদের বলতে যাবে না, আর মানতেও বলবে না। যোগদর্শন শুরুই করবে তোমার তুমি বোধ আর তোমার জগতের বোধ নিয়ে। কিন্তু এর পরে যোগদর্শন বোঝার জন্য, বিশেষ করে যোগদর্শন যে আধ্যাত্মিক জগতের কথা বলছে এবং আধ্যাত্মিক জগতে উত্থানের যে পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা করছে সেটাকে বোঝার জন্য ক্ষুরধার বুদ্ধি দরকার। যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি যে কোন দর্শনকেই বুঝে নিতে পারবেন, তা সে দ্বৈত দর্শনই হোক কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা একেশ্বরবাদ যেটাই হোক বুদ্ধি থাকলে সব দর্শনকেই বুঝে নেওয়া যাবে। আসলে বোকা মানুষের জগতে কোন জ্ঞান নেই। বোকা মানুষদের দ্বারা কোন দর্শনই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু অদ্বৈত দর্শন বুদ্ধি থাকলেও বুঝতে পারবে না। অদ্বৈত দর্শন বোঝার জন্য একটা অন্য ধরনের বুদ্ধির দরকার। রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনারা সবাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিশাল পণ্ডিত, সেখানে কিছু বলার নেই। তাঁরাও অদ্বৈতকে শুধু অস্বীকারই করতেন না, অদ্বৈত তত্ত্বের বিরুদ্ধে যত রকম যুক্তি তর্ক হতে পারে সব দাঁড় করিয়ে অদ্বৈত দর্শনকে নস্যাত্ন করে দিয়েছেন। আবার ঠাকুর অদ্বৈত তত্ত্ব ছাড়া কোন কথা বলেননি। অদ্বৈত দর্শনের প্রধান প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর যা কিছু বলেছেন তার বাইরে ঠাকুর কিছু বলেননি। অথচ আজও এমন অনেক বিদ্বজ্জন সাধু সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা অদ্বৈতকে কিছুতেই মানতে চান না। আসলে কোথাও একটা বিশেষ ধরনের বুদ্ধির দরকার, যে বুদ্ধি দিয়ে বলতে পারবে অদ্বৈত তত্ত্বই সত্য, সেই বুদ্ধি না হলে কোন দিন অদ্বৈত তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারবে না। বিরাট বড় সাধক হতে পারেন, বড় যোগী হতে পারেন, বিরাট পণ্ডিত হতে পারেন কিন্তু সবারই অদ্বৈত বোধ হওয়া কখনই সম্ভব নয়। অদ্বৈত দর্শন তাই ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন।

যোগদর্শন প্রথমে খুব সহজ জিনিষ দিয়ে শুরু করে – তুমি আছ, তোমার মন আছে আর তোমার জগৎ আছে। কিন্তু এখান থেকে খুব সহজ প্রক্রিয়ায় তিন চারটে ধাপ নিয়ে যাওয়ার পরই আমাদের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করবে। তারপর বলতে শুরু করবেন, আমাদের আগের আগের যোগীরা যোগ সাধনা করে কিছু কিছু জিনিষ উপলব্ধি করেছেন। তখন যোগ তাঁদের সেই উপলব্ধি জিনিষ বা তত্ত্বগুলিকে সামনে নিয়ে আসবেন। আমরা সেই কথাগুলো যদি বিশ্বাস নাও করি তাতে যোগদর্শনের কিছুই যায় আসে না, কারণ আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস যোগদর্শনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। যোগ শুধু বলে যাবে – তুমি এই ভাবে সাধনা কর তাহলে এই জিনিষ তোমারও প্রত্যক্ষ হবে, এটা কর ওটা দেখবে, ওটা কর সেটা দেখবে ইত্যাদি। এখানেও যোগ বলবে না যে তোমাকে এগুলো মেনে নিতে হবে। কোথাও কোথাও এই রকম দর্শন বা উপলব্ধি না হওয়ার কারণটাও স্পষ্ট করে বলে দেবে – তোমার হচ্ছে না তো, ঠিক আছে, এই এই কারণে তোমার উপলব্ধি হচ্ছে না। যদি সেটাকে আমরা না মানি তাহলেও আমাদের যে সাধনা, আমাদের যার যার জীবনদর্শন তাতে কোন হেরফের হবে না। আর শেষে বলে দেবে সাধনার শেষে তুমি এই অবস্থায় চলে যাবে। বিজ্ঞান যে ভাবে দুইয়ে দুইয়ে চার দিয়ে চলে, যোগও ঠিক সেই ভাবে চলে।

যা কিছু আমরা চোখের সামনে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, এগুলো কি সব বাইরে দেখছি না ভেতরে দেখছি? এই প্রশ্ন শুনে স্বাভাবিক ভাবে বোকাদের মত প্রশ্ন বলে মনে হবে। কেন বোকাদের মত প্রশ্ন? কারণ আমিতো আপনাকে স্পষ্ট বাইরেই দেখছি, ভেতরে দেখার কোন প্রশ্নই হতে পারে না। কিন্তু যখন প্রখর বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা হবে তখন বোঝা যাবে প্রশ্নের ভেতরই বেদান্তের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত লুকিয়ে আছে। স্বামীজী তাঁর রাজযোগে বলছেন Ordinary mind will never understand it, সাধারণ মানুষের মন এই ব্যাপারটা কখনই ধরতে পারবে না। স্বামীজী বলছেন – external world is a suggestion, বাইরের জগৎ যেন আমাদের একটা সূচনা দিচ্ছে। আমার

সামনে একজন এসে দাঁড়াল, দাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের মধ্যে একটা সূচনা এল, মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মন আসলি কি? বাচ্চা বয়স থেকেই জানি আমাদের একটা মন আছে। মনকে বেশী ব্যাখ্যা করা উচিতও নয়, কারণ যেমনি মনকে ব্যাখ্যা করতে নেমে যাব – মন কী? চৈতন্য কী? এবার বুঝে নিন আমরা দর্শনের জালে ফেঁসে গেলাম, এই জাল থেকে আর বেরোতে পারবো না। এটা statement of fact আমরা জানি আমাদের মন কি, ব্যাস্ এবার এগিয়ে চলুন। মন চঞ্চল হয়ে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে মন একটা আকার ধারণ করে। এই আকার ধারণ করাকেই বলে বৃত্তি। তাহলে এবার তিনটে জিনিষ এসে গেল, বাইরের জগৎ, আমার মন আর মনের আকার ধারণ করা। মনের এই আকার ধারণকে স্বামীজী বলছেন enameling। ঝিনুকের পেটে একটা বালির কণা চলে এল, ঝিনুকের পেট সব থেকে নরম জায়গা। বালির কণা যাওয়া মানে সূচনা যাওয়া। ঝিনুক এখন তার ভেতর থেকে জৈব রস ছাড়তে শুরু করে দিল, বালির কণার উপর একটা enameling হয়ে গেল, তৈরী হয়ে গেল একটি মুক্তা। জিনিষটা বোঝানোর জন্য এটা একটা উপমা। আমার মন শান্ত ছিল, সামনে একজন এসে দাঁড়াল এটা একটা সূচনা, দাঁড়াতেই মনের সেই শান্ত ভাব ভেঙে চাঞ্চল্যতা তৈরী হয়ে গেল। আমি এখন যে কথা বলছি এই কথাগুলো শ্রোতাদের কাছে একটা সূচনা। শ্রোতাদের মন আমার কথার শব্দকে নিয়ে একটা আকার ধারণ করছে, এবার একটা বৃত্তি তৈরী হয়ে গেল।

যোগের প্রথম লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া

পরের পরের দার্শনিকরা বৃত্তিকে প্রচণ্ড মূল্য দিয়েছেন। মধুসূদন সরস্বতী তাঁর ভাষ্যে কথায় কথায় বৃত্তি শব্দের ব্যবহার করেছেন। আমি কাউকে কটু কথা বলাতে তিনি রেগে গেলেন। যোগ কখন বলবে না তিনি রেগে গেছেন, বলবে তাঁর মনে ক্রোধ বৃত্তি জাগল। প্রবাদে যেমন বলে সেদিনের যোগী ভাতকে বলে অন্ন, তার মানে সন্ন্যাসীদের ভাষাটা পুরো পাল্টে যায়। ঠিক তেমনি যোগী, যাঁরা মন নিয়ে কাজ করে উপরে উঠে গেছেন তাঁদেরও ভাষাটা পাল্টে যায়। তখন তাঁরা শুধু ক্রোধ বলবেন না, বলবেন ক্রোধ বৃত্তি। কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন বলবেন সে এখন নিদ্রা বৃত্তিতে চলে গেছে। বৃত্তি নিয়ে এর আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বৃত্তিগুলোকে যখন বিশেষ ভাবে বর্গীকরণ করি তখন সেটাকে বলছে চিত্ত, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার, এগুলো নিয়েও আমরা সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করেছি।

আমাদের মন সারাদিন চার ধরণের বৃত্তির মধ্যেই ঘোরাফেরা করি। কখন চিত্ত বৃত্তিতে থাকবে, চিত্তবৃত্তিতে থাকা মানে মনটা চঞ্চল, কখনও আবার মনোবৃত্তিতে আছে, মনোবৃত্তিতে মনটা স্থির, অহঙ্কার বৃত্তিতে চোখ মুখের চেহারা কখন হর্ষোল্লিসিত কখন বিষাদগ্রস্ত, কখন আবার ভয়গ্রস্ত। যোগী বা সন্ন্যাসী সব সময় বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যাঁরা উচ্চতম যোগী বা সন্ন্যাসী তাঁদের মন সব সময় ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে থাকে। যদিও ব্রহ্ম বৃত্তির মধ্যে নয়, কারণ ব্রহ্ম বুদ্ধির বিষয় নন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার আগে শেষ যে অবস্থা পর্যন্ত মন যেতে পারে, মন সেখানে ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে চলে যায়। অথবা ঈশ্বর বৃত্তিতে, সর্বভূতে ঈশ্বরই আছেন, এই বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি থাকে না। যাঁরা যোগী, ভগবান বুদ্ধের মত যোগীরা সব সময় নির্বিকার, জগতের কোন কিছুই তাঁদের মনে চাঞ্চল্য তৈরী করতে পারবে না, নিজের যে স্বরূপ সেখানে তিনি অবস্থান করে আছেন, নিজের স্বরূপের বাইরে কোন কিছুর দিকে তাঁর আর দৃষ্টি থাকে না। সেইজন্য যাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে, চাঞ্চল্য আছে তাদের প্রথম কাজ হল নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করা। বুদ্ধিবৃত্তি কোথা থেকে আসে? গুরু উপদিষ্ট বেদান্ত বাক্য থেকে। বেদান্ত বাক্য, যেটা গুরু বলে দিয়েছেন, শুধু বেদান্ত বাক্য হলে হবে না, গুরু যেটা বলে দিয়েছেন সেটাকে আশ্রয় করে রাখা। যেমন গুরু বলে দিয়েছেন জপ করতে, এবার নিজের ইষ্টের নাম ও ইষ্ট চিন্তন সব সময় করে যেতে হবে, ইষ্ট চিন্তন আর ইষ্ট নামের জপ ছাড়া আর কোন দিকে মন যাবে না।

মনে করুন, কর্মক্ষেত্রে একজনের কাছে ঘুষ নেওয়ার সুযোগ এসে গেল, সে এবার চিন্তা করছে – এই ঘুষটা নেবো কি নেবো না, নিয়ে নিলেই হয়। এই প্রশ্নটা উঠছে কোথা থেকে? যে সন্ন্যাসী নিজেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত মনে করছেন, সেই সন্ন্যাসীকে যদি কোন মেয়ে বলে আপনাকে আমি ভালোবাসি। এবার সন্ন্যাসীর মনে যদি প্রশ্ন আসে এই মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে কিনা।

তখন তাঁকে বলতে হবে বন্ধুত্ব করা যাবে কিনা সেতো পরের ব্যাপার, তার আগে আপনার মনে এই প্রশ্নটা এলো কোথা থেকে? এই প্রশ্ন একজন চাকুরীজীবী বা সন্ন্যাসীর মনে কেন এসেছে? কারণ, দুজনই তখন বুদ্ধিবৃত্তিকে ছেড়ে মনোবৃত্তিতে চলে গেছেন। মনোবৃত্তিতে নেমে গেলে চিন্তাবৃত্তিতে নামতে আর বেশী সময় লাগবে না। চিন্তাবৃত্তিতে নেমে এসে খোঁজ নিতে শুরু করবে ঘুষে কত টাকা পাওয়া যাবে, মেয়েটির বাড়িতে কে কে আছে ইত্যাদি। যার মনে একবার প্রশ্ন এসেছে ঠিক হবে কি হবে না, নব্বুই থেকে পঁচানব্বুই শতাংশ এবার সে ডুববেই, বাঁচার কোন পথ নেই, ঈশ্বরের অত্যন্ত কৃপা যার উপর আছে একমাত্র সেই বেরিয়ে আসতে পারবে। সন্ন্যাসী যদি বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন তাঁর মনে এই ধরনের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

ঠাকুরকে একবার একজন কয়েকটি টাকা দিয়েছিল। ঠাকুর রাত্রিবেলা হিসাব করতে বসেছেন এই টাকাটা কাকে কাকে দেওয়া যাবে। তখন ভাবছেন দুখওয়ালার দেনা আছে, দেনাটা মেটানো যেতে পারে। ঠাকুরেরও দেনা থাকত। চিন্তাবৃত্তিতে এসে ঠাকুরের এবার রাতের ঘুম মাথায় উঠে গেছে। অবতার পুরুষ কিনা! ওই মাঝ রাত্তি উনি রামলালকে ডেকে বললেন এক্ষুণি টাকা ফেরত দিয়ে আয়। রামলাল বললেন এখন মাঝ রাত, সকাল হলে যাওয়া যাবে। রাত কি, বেরাত ঠাকুর এসব কথা শোনার লোকই নন। একেই বলে রোখ, ঠাকুরও বারবার বলছেন রোখ করতে হয়। অবতারও শক্তির আশুরে, যিনি অবতার তাঁরও টাকার দরকার, টাকা এসেছে, বসে হিসেব করছেন, একে দিতে হবে তাকে দিতে হবে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য, তারপরই বুদ্ধিবৃত্তি এসে সব কটাকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করে দিলেন, এক্ষুণি এই মুহূর্তে ফেরত দিয়ে আসতে হবে। এখানেই সাধারণ মানুষ আর যোগীর মধ্যে বিরাট তফাৎ, যোগী বুদ্ধিবৃত্তি থেকে কখন সরবে না। যদিও ক্ষণিকের জন্য সরে যায়, বুদ্ধিবৃত্তির কাজই হল মনোবৃত্তিতে নামিয়ে দেবে আর মনোবৃত্তি সব সময় চিন্তাবৃত্তিতে নামবেই নামবে। মনোবৃত্তি আর চিন্তাবৃত্তির যৌথ খেলা যখন শুরু হয়ে যায় সেখানে এবার অহঙ্কার অর্থাৎ অভিমানাত্মিকা বৃত্তি সেও জড়িয়ে পড়ে, মাঝখান থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বেচারী একা হয়ে পড়ে। দুর্বল মন মানে তাই, দুর্বল মন মানে সে কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো জানে না তা নয়, তার বুদ্ধিবৃত্তির শক্তিটা কম। আমাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় ব্যয় হয় শুধু এই চিন্তাবৃত্তির জন্য। এই কাজটা করবো কি করবো না, করলে কি কি জিনিষ আমার অনুকূলে যাবে আর না করলে তার কি লাভ হবে, কি ক্ষতি হতে পারে, এইভাবে চিন্তার তথ্য সংগ্রহ চলতেই থাকে। এই চারটেই মনের ধর্ম। চিন্তার অন্যতম প্রধান কার্য হল তথ্য সংগ্রহ করা, মন দোনামনা করতে থাকে, করবো কি করবো না, আর বুদ্ধি নিশ্চিত থাকে আমি এটাই করবো। আর অহঙ্কার একটা জিনিষের সাথে নিজেকে কোন একটা সম্পর্ক দিয়ে জুড়ে কখন হাঙ্গে, কখন কাঁদে আবার কখন ভয় পায়। গুরু যে বেদান্ত বাক্যের উপদেশ দিয়েছেন বা গুরুজনরা যেটা বলে দিয়েছে তার উপর যখন মন একমাত্র চলে তখন সেটাই বুদ্ধিবৃত্তি। করণ, ইন্দ্রিয়, মন, মনের ধর্ম আর অধ্যাত্মকে বোঝার জন্য স্বামীজীর রাজযোগের দুই ও সাত নম্বর সূত্র অত্যন্ত মূল্যবান। এই দুটো সূত্রকে একবার নয় অন্তত দশ বারো বার প্রত্যেকটি লাইনকে ধরে ধরে পড়ে বুঝতে হয়।

চিন্তাও একটা শক্তি

এখানে স্বামীজী একটা জায়গায় বলছেন Thought is a force as is gravitation or repulsion। এই মন্তব্য একমাত্র স্বামীজীই করছেন, এই ধরনের কথা আর কোথাও পাওয়া যাবে না – আমাদের চিন্তাও একটা শক্তি। স্বামীজীর এই বক্তব্য রাজযোগে এসে আলাদা একটা গুরুত্ব পেয়ে যায়। এর উপর আমরা বিশদ আলোচনা করছি। উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর যে চৌম্বক শক্তি তার ধর্ম হল বিপরীত ধর্মী জিনিষ যত কাছে থাকবে তত শক্তিতে সে কাছে টানবে আর সমান ধর্মীকে সব সময় ঠেলে সরিয়ে দেবে। উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে সব সময় ঠেলে সরিয়ে দেবে আর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে সব সময় কাছে টানবে। ইলেক্ট্রিক্যাল চার্জেও সমান ধর্মীকে ঠেলে দেয় আর বিপরীত ধর্মীকে টেনে নেয়। চৌম্বক আর ইলেক্ট্রিক্যাল শক্তি দুটো একই নিয়মে চলে। মজার ব্যাপার হল মধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে কোন জিনিষকে ঠেলে দেয় না, নির্বিকার ভাবে সব কিছুকে নিজের দিকে টেনে

নেবে, যদি তার নিজের জিনিষ হয়। যেমন যা কিছুই উপরের দিকে থাকে সব কটাকে নীচে টেনে নামিয়ে আনবে। ওর টানার যে শক্তি হবে সেটাও একই নিয়মে চলবে। ইলেক্ট্রিসিটি, চুম্বক ও মাধ্যাকর্ষণের একই ইকুয়েশান। কি ইকুয়েশান? এর শক্তি গুণিতক এর শক্তি ভাগ দূরত্ব।

চিন্তাও যদি শক্তি হয়, স্বামীজী বলছেন চিন্তাও একটা শক্তি, তাহলে এই শক্তি কীভাবে কাজ করে? ইলেক্ট্রিসিটি আর চুম্বকের ক্ষেত্রে সমান সমানকে ঠেলে দেয় আর মাধ্যাকর্ষণের কাছে সমান বা বিপরীত বলে কিছু নেই, সে সবাইকে টেনে নেয়। চিন্তার ক্ষেত্রে কিন্তু বিচিত্র জিনিষ হয়। সমান চিন্তা সমান চিন্তাকে টেনে নেয় আর বিষম চিন্তাকে ঠেলে দেয়। চিন্তার জগতে এটাই বৈচিত্র্য। যেমন ঠাকুর নরেনকে টেনে নিলেন, যারা নিউট্রাল তাকে বরঞ্চ টেনে নেবেন কিন্তু যারা বিষয়ী লোক তাদের কখনই টানতে পারবেন না। কত জোরে টানেন? একেবারে ওই একই ইকুয়েশানে, যত দূরে যাবে তার টান তত কম হবে, যত কাছে থাকবে তার টান তত বেশী হবে। সেইজন্য নরেনকে ঠাকুর বলছেন – এখন নবানুরাগ ঘন ঘন আসিস। কাছে এলে কী হবে? ঠাকুরের যে চিন্তা-ভাবনা সেগুলো বেশী নরেনের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। যার ফলে টানটা বাড়বে, টানটা বাড়তে বাড়তে এত বেশী টান হয়ে যাবে যে দুটো এক হয়ে যাবে। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন তখন সেখানে ঠাকুরের চিন্তা-ভাবনা গুলো অত্যন্ত জোরাল ছিল, তিনি নিজে ওখানে রয়েছেন কিনা। বর্তমানে ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে আছেন, সূক্ষ্ম শরীরের সেই জোরাল আর থাকবে না। স্বামীজী যত দিন জীবিত ছিলেন তাঁর প্রভাবের জোর অনেক বেশী ছিল, তিনি চলে যাওয়ার পর সেই জোর কমে গেল।

বিজ্ঞানীরা এখন আবিষ্কার করেছেন মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অনেক দূরের দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে, কিন্তু যত দূরে চলে যাবে তত তার শক্তি কমে যাবে। ঠিক তেমনি চিন্তা শক্তিও অনেক লম্বা দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে। এখানে বসে আমার মন যদি কোন উচ্চ চিন্তা ভাবনা করতে থাকে, আর দশ হাজার মাইল দূরত্বে কোন লোক যদি এই একই চিন্তা ভাবনা করে, তখন এই চিন্তার শক্তি তাকেও টানবে কিন্তু টানটা হালকা হবে। ওই লোকটি ভাববে – আমার মন বলছে আমি ঠিকই ভাবছি। কারণ অনেক দূরে আরেকজনও ঠিক এই একই চিন্তা নিয়ে ভাবছে কিনা। স্বামীজী তাই বলছেন – গুহায় বসেও তুমি জগতের হিত করতে পার। কীভাবে করতে পারে? গুহায় বসে তুমি যে সৎ চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহ ছাড়ছ, সেই চিন্তা প্রবাহ ইলেক্ট্রিক্যাল ফোর্সের মত, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত, চুম্বকের শক্তির মত চিন্তার শক্তিও ছড়িয়ে যাবে। আর বিশ্বের কোথাও যদি কেউ এই ধরনের সৎ চিন্তনের উপর কাজ করতে থাকে তাদের এই সৎ চিন্তা প্রভাবিত করবেই করবে। প্রভাবিত করলে কি হবে? তার চিন্তার সেই শক্তি আরও বেড়ে যাবে, কারণ দুটো একই শক্তি এসে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু যত কাছে থাকবে চিন্তা শক্তি তার তত জোরে বাড়বে। ইলেক্ট্রিক্যাল, চুম্বক ও মাধ্যাকর্ষণের এই নিয়মকে বিজ্ঞানীরা বাস্তবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু চিন্তা শক্তির এই নিয়মকে পরীক্ষা করার অবস্থায় আমরা এখন পৌঁছাইনি।

কিন্তু স্বামীজী এই নিয়মকে জগতের সামনে ছেড়ে দিয়েছেন, আর এটাও নিশ্চিত যেদিন পরীক্ষা করে ওরা প্রমাণ করতে পারবে তখন এই নিয়মটাই পাবে $(T=T1 \times T2/D)$ । আমরা এখন একটা ঘরের মধ্যে এতজন একসাথে বসে সৎ চিন্তন করছি, এখানেও একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী চিন্তার কম্পন তৈরী হচ্ছে। কিসের চিন্তা স্রোত? ভাদ্র সংস্কৃতি। এখানে এসে যে ভাদ্র সংস্কৃতি করতে চাইবে সে কিন্তু ভালো লোক হয়ে যাবে। কিন্তু একটা সিনেমা হলে গিয়ে চোখ বন্ধ করে আমি যদি জপ করার চেষ্টা করি, কিছুতেই আমার জপ হবে না। কারণ সিনেমা হল ভোগের জায়গা, ওখানে চিন্তার স্রোতগুলো সব ভোগের চিন্তা দিয়ে ভরে আছে।

এক বিদেশী মহারাজের কাছে একটা খুব সুন্দর ঘটনার বর্ণনা বেলুড় মঠের মহারাজরা শুনেছেন। বেলুড় মঠে তখন স্বামী শান্তানন্দ থাকতেন। সেই বিদেশী মহারাজের খুব ইচ্ছা হয়েছিল স্বামী শান্তানন্দের একটু সেবা করার। তিনি বিকেলের দিকে স্বামী শান্তানন্দের ঘরে গিয়ে মহারাজের মাথায় ম্যাসেজ করে দেওয়ার অনুমতি পেলেন। বিদেশী মহারাজ বলছেন ‘মহারাজের মাথায় ম্যাসেজ করার সময় যেমনি আমার মাথায় কোন সাংসারিক চিন্তা আসত সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ ‘উঁহু’ ‘উঁহু’ করে ম্যাসেজ

করা থামিয়ে দিতেন। বার বার একই জিনিষ হওয়াতে আমি ভয় পেয়ে গেছি, ভয়েতে এরপর থেকে আমি শুধু জপ করতে থাকতাম। কোন কারণে যদি এক সেকেণ্ডের জন্য জপ বন্ধ হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে উনি ঘাড়টা নাড়িয়ে আমার হাত থেকে মাথাটা সরিয়ে নিতেন। ভয়ের চোটে আমি আবার জপ করতে থাকতাম'। একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন উনি মহারাজকে সেবা করে গেছেন আর এই ঘটনা তিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন। যে বিদেশী মহারাজ এই ঘটনা বলছেন তাঁর মিথ্যা কথা বলার তো কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, আর উনি নিজের দুর্বলতার কথাই বলছেন। এক সেকেণ্ডের জন্য যদি তাঁর মন চঞ্চল হয়ে এটা সেটা ভাবতে শুরু করতেন স্বামী শান্তানন্দ ঘাড়টা জোর করে নেড়ে ওনাকে সজাগ করে দিতেন। তার মানে এটা কি হতে পারে? স্বামী শান্তানন্দের চিন্তা শক্তি এত ক্ষমতা সম্পন্ন যে যেমনি নেতিবাচক কোন চিন্তা আসছে বা অন্য চিন্তা আসছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তাতে এসে ধাক্কা মারতেই তাঁকে সচেতন করে দিচ্ছে এটা আমার বিপরীত চিন্তা।

এটাই $T=T_1 \times T_2 / D$, T মানে force of thought। একজনের চিন্তা গুণিতক অন্য জনের চিন্তা ভাগ দূরত্ব (আমার চিন্তাশক্তি x আপনার চিন্তাশক্তি ÷ আমার আপনার মাঝখানের দূরত্ব)। যত দূরে থাকবে চিন্তাশক্তির প্রভাব তত দুর্বল হবে, যত কাছে থাকবে তত চিন্তাশক্তির প্রভাব শক্তিশালী হবে। আমাদের সবাইকে যে এত সাধুসঙ্গ করার কথা বলা হয়, ঠাকুর বারে বারে যে সাধুসঙ্গের কথা বলছেন, আসলে সাধুসঙ্গে এই ইকুয়েশনটাই প্রযোজ্য হয়। সাধুকে যত দূর থেকে দেখবে সাধুর প্রভাব তত কম পড়বে, সাধুর কাছাকাছি যত থাকবে সাধুর সৎ চিন্তাশক্তির প্রভাব তত তোমাকে প্রভাবিত করবে।

আমাদের মনের মধ্যে যে enameling তৈরী হচ্ছে সেটাও ঠিক এই প্রক্রিয়াতেই হয়। মনের কাজ হল চিন্তা করা, চিন্তা ছাড়া মন আর কিছু করতে পারে না। বাহ্য জগৎ যখন কোন সূচনা দিচ্ছে মন সেই সূচনাকে একটা চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। চিন্তা প্রক্রিয়াও একটা শক্তি, এই প্রক্রিয়াও ঠিক ওই একই ইকুয়েশনে কাজ করে। যেভাবে বিদ্যুৎ শক্তিকে আমরা বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগাতে পারি, চিন্তাশক্তিকেও আমরা অনেক কাজে লাগাতে পারি। সেইজন্য আমরা বাইরে যা কিছু দেখছি, বাইরে কিছু নেই, সব আমাদের ভেতরেই রয়েছে। আমি যাকে ভালোবাসি সেও আমার ভেতরে, যাকে আমি অপছন্দ করি সেও আমার ভেতরে। স্বামীজী এই জায়গাতে বলছেন, বোধগম্য এই যে জগৎ, যেটাকে আমরা দেখছি, শুনছি, অনুভব করছি এটাই আমাদের ব্যক্তিগত এনামেলিং। আমার এনামেলিং আর আপনার এনামেলিং কোন দিন সমান হতে পারবে না। আমি যখন এই বইটি দেখছি তখন সেটা আমার নিজস্ব এনামেলিং, আপনি যখন এই একই বই দেখছেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত এনামেলিং। আমি জানি এটা আমার বই, আর আপনি জানেন এটা আপনার বই নয়, মহারাজের বই। এই বইয়ের সাথে আমার হাজারটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি আমরা সবাই জগতের যা কিছু দেখছি, অনুভব করছি এগুলো সবই আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত এনামেলিং। বাহ্য জগৎ আমাকে যা সূচনা দিচ্ছে, তাতে আমি যে এনামেলিং করছি এটাই আমার জগৎ। কবিরা যখন কবিতার ভাষায় সুন্দর সবুজ ক্ষেত, রঙ বেরঙের পাখি, বাহারি ফুল, তাতে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, নদীর প্রবাহ, সমুদ্রের গর্জন বর্ণনা করছেন, যোগের কাছে এগুলো হল কবির নিজস্ব এনামেলিং করা জগৎ। আমার এনামেলিং, আপনার এনামেলিং, কবির এনামেলিং, বিজ্ঞানীর এনামেলিং কখনই মিলবে না। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদকে প্রেমিক পুরুষ মনে করে আমার প্রেমিকার মুখ, এই চাঁদকেই কবি দেখছেন বলসানো রুটি, বিজ্ঞানী অন্য ভাবে দেখছেন, ধর্মপরায়ণ লোক পূর্ণিমার চাঁদ দেখে বলে আমাকে অমুক ব্রত করতে হবে, সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিয়ে চাঁদকে দেখে যাচ্ছে। এটাই সবার আলাদা আলাদা এনামেলিং।

স্বামীজী বলছেন – অনুভূতির এই জগৎ যেন আমাদের নিজেদের এনামেল স্বরূপ; বাস্তব জগৎ ঐ বালুকণা বা অন্য কিছু। সাধারণ মানুষ কখনই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। আমরা যদি বুঝে নিই যাকে আমি ভালোবাসি সে আমার মনের ব্যাপার আর যাকে আমি অপছন্দ করি সেও আমার মনেরই ব্যাপার, তখন আমি কাকে আর ভালোবাসব আর কাকেই বা অপছন্দ করব! তাই স্বামীজী বলছেন এই জিনিষটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এখানে আরও মুশকিল ব্যাপার হল, এর উপর দু রকমের

দর্শন চলে, একটা হল subjectivity আরেকটি objectivity। Subjectivity বলছে আমি আছি তাই এই রকম হচ্ছে, আর objectivity বলছে আমার বাইরেও এই objective জগৎ আছে। আবার অনেকে দুটোক নিয়েই চলেন। স্বামীজী যোগে দুটোকেই subjective জগৎকেও নিচ্ছেন আবার objective জগৎকেও নিচ্ছেন। বাহ্য জগৎ একটা সূচনা দিচ্ছে আর অন্তর জগৎ তাকে এনামেলিং করছে। এই এনামেলিংটাই আমার জগৎ। বাইরে কোথাও এই জগৎ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু এটাই একমাত্র বোঝা দরকার – একটা জিনিষের উপর আমার যে এনামেলিং হচ্ছে এটাই আমার জগৎ। আমি যখন কাউকে ভালোবাসছি এটাই হল আমার এনামেলিং। এই ব্যাপারটা যে বুঝে নিয়েছে সে যোগদর্শনে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বেদান্ত যোগদর্শনকে পুরোপুরি মানবে না, কিন্তু যোগের কিছু কিছু জিনিষ বেদান্ত গ্রহণ করেছে, যেমন এই এনামেলিংটাই যে আমার নিজস্ব জগৎ এটা বেদান্তও মানছে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় বাহ্য জগতের কোন মূল্যই নেই। ‘কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে’, খেলা তো বাইরে কোথাও হচ্ছে না, সব খেলা আমাদের মনের ভেতরেই হচ্ছে।

আবার অনেক সময় বলা হয় আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে চৈতন্য জ্যোতি বেরিয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে আবৃত করে নেয়, তখন সেই চৈতন্য জ্যোতি দিয়ে বিষয়কে জানা যায়। যেমন চৈতন্য জ্যোতি আমার চোখ থেকে বেরিয়ে আপনাকে ঘিরে ফেলছে, সেখান থেকে আমার মস্তিষ্কে আপনাকে বোধ করতে পারছি। এটাও বেদান্তের একটা বড় তত্ত্ব, আমরা এই বিষয়ে ঢুকছি না। তবে রাজযোগের তত্ত্ব অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত, স্বামীজী তাই এর উপর বেশী জোর দিয়েছেন।

আমাদের মন একটা জলাশয়ের মত, আর বাইরের সূচনাগুলো যেন সেই জলাশয়ে পাথর ছোঁড়া হচ্ছে। জলে পাথর ছুঁড়লে জলের উপরিভাবে তরঙ্গ উঠবে, বাইরের জগৎ থেকে যখন কোন সূচনা আসে তখন আমাদের মনেও তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, মন তখন প্রতিক্রিয়া করছে। মনের এই প্রতিক্রিয়াটাই বৃত্তি। মন প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ছে মানে মন একটা আকার ধারণ করে নেয়, এই আকারটাই বৃত্তি। বৃত্তি কি, বৃত্তি কীভাবে উৎপন্ন হয়, এগুলো না বুঝলে যোগ সাধনা শুরুই হবে না।

ভল্টায়ারের একটা কাহিনীতে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও মুর্খ ব্রাহ্মণীর কথা বলতে গিয়ে বলছেন, এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিল, অনেক শাস্ত্র পড়েছে, অনেক কিছু জানতো কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না। সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির সামনেই এক বিধবা বয়স্ক ব্রাহ্মণী থাকত যে রোজ তুলসী পাতা খায়, গঙ্গাজল পান করে। সেই ব্রাহ্মণীকে একদিন ভল্টায়ার জিজ্ঞেস করছেন ‘মা! তুমি শান্তিতে আছ’? ‘হ্যাঁ বাবা! আমি খুব শান্তিতে আছি’। ‘তুমি ধর্মটর্ম কিছু কর’? ‘রোজ তুলসী পাতা খাচ্ছি আর গঙ্গাজল খাই, এটাই তো ধর্ম’। ভল্টায়ার এবার পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করছেন ‘ওই বুড়ি ব্রাহ্মণী তোমার থেকে বেশী শান্তিতে আছে না’? ব্রাহ্মণ বলছে ‘হ্যাঁ! ও আমার থেকে অনেক বেশী শান্তিতে আছে। কিন্তু আমি মরে গেলেও ওই বুড়ি ব্রাহ্মণীর সাথে আমার স্থান পরিবর্তন করতে যাবো না। ঐ বুড়ির মত আমি কোন দিন হতে চাই না, কারণ সে একটা পাথর’। এবার ঠাকুর যে মাঝি আর পণ্ডিতের গল্প বলছেন সেটাও দেখা যাক। নদী পারাপার করতে গিয়ে এক পণ্ডিত মাঝিকে জিজ্ঞেস করছে ‘কি গো! তোমার দর্শন-টর্শন কিছু জানা আছে’। মাঝি উত্তর দিচ্ছে ‘আজ্ঞে না’। ‘তাহলে তো তোমার এক চতুর্থাংশ জীবন জলে গেল। তা তোমার বেদ উপনিষদ জানা আছে’? ‘আজ্ঞে না’। ‘তাহলে তো তোমার অর্ধেক জীবনটাই গেল’। সেই সময় হঠাৎ ঝড় উঠেছে। মাঝি তখন জিজ্ঞেস করছে ‘পণ্ডিত মশাইর সাঁতার জানা আছে’? ‘না বাপু সাঁতার-ফাতার জানা নেই’। ‘তাহলে তো আপনার পুরো জীবনটাই গেল’। এখানে ভল্টায়ারের পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আর ঠাকুরের মুর্খ মাঝির গল্পের বক্তব্য, এই দুটোর কোনটা ঠিক? মাঝি শান্তিতে আছে, সে শাস্ত্র পড়েনি আর ভল্টায়ারের বিধবা ব্রাহ্মণীও শান্তিতে আছে সেও শাস্ত্র পড়েনি। ভল্টায়ার মুর্খ ব্রাহ্মণীর নিন্দা করে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রশংসা করছেন আর এখানে ঠাকুর পণ্ডিতের নিন্দা করছেন আর মাঝির প্রশংসা করছেন। এর মধ্যে কোনটা ঠিক? ঠাকুর একটা জিনিষকে বোঝানোর জন্য একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে বলছেন। ঠাকুর কিন্তু একবারও মাঝির জীবন পণ্ডিতের জীবন থেকে ভালো বলছেন

না। ঠাকুরের বক্তব্য হল তুমি ভবসাগর পার করতে জানো কিনা। আখ্যায়িকার এই এক সমস্যা হয়, আমরা মূল কথাকে ছেড়ে ভুল কথাকে ধরে নিই। লোকেরা বলবে – এই তো ঠাকুর বললেন পাণ্ডিত্যের কোন দরকার নেই। তোমার তো পাণ্ডিত্যের দরকার নেই, তুমি তো পণ্ডিত নও, কিন্তু তুমি কি সাঁতার শিখেছ? সাঁতার কাটা মানে ওপারে যাওয়া। জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রের ওপারে যাওয়ার ফেরিঘাটে বড় করে নোটিশ টাঙানো আছে ‘মুর্খদের প্রবেশাধিকার নাই’। তুমি যদি মুর্খ হও, ফেরীঘাট থেকে তোমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। আবার তোমাকে জন্ম-মৃত্যুর সাগরের এপারে পাঠিয়ে দেবে। যত দিন মুর্খ থাকবে তত দিন তাকে এইভাবে ঘোরাতে থাকবে।

ঠাকুর এই কাহিনীতে বলছেন, তুমি নিজে জীবন-মৃত্যু রূপ সাগরকে অতিক্রম করতে চাইছো কিনা। ঠাকুরের পণ্ডিত ভল্টায়ের পণ্ডিতের মতই। কিন্তু ঠাকুর আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্য মাঝি হওয়া নয়, জীবনের উদ্দেশ্য মুর্খ বিধবা ব্রাহ্মণী হওয়া নয়, জীবনের উদ্দেশ্য পণ্ডিত হওয়াও নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হল জীবন-মৃত্যুর পারে যাওয়া। কিন্তু মুর্খ ভক্তরা বলবে, ঠাকুর বলে দিয়েছেন শাস্ত্র পড়তে হবে না, বিচার করতে হবে না। আরে ভাই! বিচার না করার ক্ষমতাও তোমার নেই। আচার্য শঙ্করও বলছেন বিচার করে ঈশ্বরকে কোন দিন জানা যাবে না। এই কথা ঠাকুরও বলছেন। কিন্তু বিচার করার শক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ মনের অঙ্কট-বঙ্কট গুলোও পরিষ্কার হবে না। তার মানে শুধু বিচারকে নিয়েই আবদ্ধ থেকে না, বিচারের পারে যে একটা জিনিষ হয় সেটার দিকে মন দাও। আসল কথা হল, রাজযোগের প্রত্যেকটি সূত্র এবং তার উপর স্বামীজীর ব্যাখ্যা বোঝার জন্য প্রচণ্ড স্কুরধার বুদ্ধির দরকার। স্কুরধার বুদ্ধির জন্য চাই সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনচর্চা। শাস্ত্রের গুহ্যকথা আমরা তাই ধরতে পারি না, কিন্তু তাও আমাদের শাস্ত্রকথা শুনতে হবে। শাস্ত্রের কথা অনেকবার অনেকদিন শুনতে শুনতেও এক সময় মনের মধ্যে ধারণাটা বসে যায়। এখানেও তাই আমাদের একই কথাকে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক রকম উপমা দিয়ে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে।

বৃত্তি হল এনামেলিং, স্বামীজী তাই বলছেন এই বৃত্তিই তোমার আমার জগৎ। জলাশয়ে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে, এক একটা তরঙ্গ মানে এক একটা বৃত্তি। কিন্তু মনের মধ্যে এই রকম হাজার হাজার তরঙ্গ উঠছে। যেমন আমি, আমি পুরুষ, আমি সন্ন্যাসী এই বৃত্তিটা জাগ্রত আছে, আমি ক্লাশ নিচ্ছি, আমি আচার্য এই বৃত্তিটাও জাগ্রত আছে, আমি রাজযোগ পড়াচ্ছি এটাও জাগ্রত আছে। গরমে এখানে অনেকের ঘুম আসছে দেখে আমার করুণা হচ্ছে, ভাবছি দুপুর ক্লাশ না নিয়ে সকালে কিংবা বিকালে ক্লাশ নেওয়া যায় কিনা। এটুকু সময়ের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে কত রকম চিন্তার তরঙ্গ উঠছে। একজন সদ্য মা হয়েছে, নবজাতকের বয়স কিছু দিনের। মায়ের সারা জীবন এখন ঘুরছে শিশুকে কেন্দ্র করে। মায়ের পুরো বৃত্তি সন্তানকে কেন্দ্র করে। এই বিশাল জগৎ মায়ের কাছে এখন ছোট হয়ে গেছে। তাহলে এত দিন যে তার বিরাট জগৎ ছিল, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে যে বিশাল জগৎ ছিল সেটা কোথায় গেল? ওই জগৎও আছে, কিন্তু এখন স্মৃতির অতলে পড়ে আছে। স্মৃতিও বৃত্তি, কিন্তু চাপা পড়ে আছে, পরে সুযোগ আর সময় মত ভেসে উঠবে। সব বৃত্তিই আমার আপনার জগৎ। বাইরে জগৎ আছে কি নেই, এগুলো অনেক পরের ব্যাপার, ব্যাপারটা হল বাইরের জগৎ একটা সূচনা বা উত্তেজনা মাত্র, জলাশয় পাথর ছোঁড়ার মত, পাথর ছোঁড়ার পর জলে যে তরঙ্গ তৈরী হচ্ছে, এটাই আমার জগৎ। এগুলো একদিনে বোঝা যাবে না, যোগ হল হাতে কলমে সাধনা। সাধনা করতে করতে ধারণা হবে।

এবার মনে করুন জলাশয়ের তলায় একটা হীরের আংটি রাখা আছে। আমি ওই হীরের আংটিটা দেখতে চাইছি। কিন্তু জলাশয়ের উপরে ক্রমাগত তরঙ্গ উঠছে বলে জলাশয়ের নীচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জল যদি একেবারে স্বচ্ছ থাকে তাহলে জলাশয়ের তলদেশের সব কিছু দেখা যাওয়ার কথা। আমাদের মনটাও একেবারে স্বচ্ছ, পরিষ্কার। কিন্তু সমস্যা হল মনের মধ্যেও ক্রমাগত ঢেউ উঠেই চলেছে। জলে এত ঢেউ উঠছে যে জলটা সব সময় চঞ্চল হয়ে রয়েছে। যখন সমস্ত ঢেউ ওঠা বন্ধ হয়ে শান্ত হয়ে গিয়ে একটা মাত্র ঢেউ থাকবে তখন পরিষ্কার সব কিছু দেখা যাবে। ওই একটা ঢেউও যখন

বন্ধ হয়ে গেল তখন সব কিছু শেষ। উদ্দেশ্য হল সমস্ত বৃত্তিকে বন্ধ করে দেওয়া। সূত্রটা হল যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। তাহলে যোগের উদ্দেশ্য কী? এই যে চিত্তে অনবরত চেউ উঠছে এই চেউ ওঠাকে থামিয়ে দেওয়া। কর্মযোগ কাজের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে। ভক্তিযোগ ভক্তির মাধ্যমে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করছে, জ্ঞানযোগ জ্ঞানের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে। যোগ অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করে। সব যোগের লক্ষ্য হল এই তিন নম্বর সূত্র, চারটে যোগেরই উদ্দেশ্য স্বরূপ জ্ঞান। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এর সাথে যখনই যোগ শব্দ যোগ হবে তখন সেই যোগের একটাই কাজ আমাদের মনে যত বৃত্তি উঠছে সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করা। কীভাবে? যোগের ক্ষেত্রে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করে, কর্মযোগের ক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম করে, জ্ঞানযোগে নিত্যানিত্য বিচার করে আর ভক্তিযোগে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব অবলম্বন করে।

মস্তিষ্কের গঠনের উপর নির্ভর করে প্রাণির আচরণ

সবারই মধ্যে চিত্ত আছে, গাছপালা, পশু, পাখি সবারই চিত্ত আছে। কুকুরের মধ্যেও চিত্ত আছে, অচেনা আওয়াজ শুনলে সেও ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। তারও মন আছে, সেও ভাবে খেতে যাবো কি যাবো না, তারও অহঙ্কার আছে, যখন বাচ্চা দেয় তখন জানে এরা আমার বাচ্চা। কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তিটা তাদের থাকে না। আমাদের মস্তিষ্ক তিনটে অংশে বিভক্ত, স্পাইনাল কড্ যেটা নীচের দিকে চলে গেছে, তার উপরে ছোট্ট আঙুরের মত একটা অংশ আছে আঙুরের উপর একটা আপেলের মত বসানো আছে আর তার উপরে একটা যেন বাঁধাকপি রাখা আছে। এই তিনটে অংশ, প্রথমে বাঁধাকপির মত, তার নীচে একটা আপেল আর আপেলের নীচে একটা আঙুরের মত, সেখান থেকে নীচে স্পাইনাল কডের সঙ্গে নীচের দিকে নেমে যায়। আহা, নিদ্রার মত দৈনন্দিন যা কিছু কাজ হয় এগুলো ছোট্ট আঙুরের মত অংশ দিয়েই হয়ে যায়। পিঁপড়ে, আরশোলা ওদের অতটুকুই আছে তাতেই তাদের কাজ চলে যায়। জগতের শতকরা পঁচানব্বুই থেকে আটানব্বুই জন লোকের দৈনন্দীন জীবনের চাহিদা ওই আঙুরের মত সাইজের মস্তিষ্ক আছে অতটুকু দিয়েই মিটে যায়, ওর বেশী দরকার পড়ে না। তার মধ্যে আপেলের সাইজের মস্তিষ্ক আছে, সে আরেকটু উন্নত। এরা কিছু জিনিষ জানে আবার কিছু জিনিষ জানে না। যেমন কুকুর, কুকুরকে ট্রেনিং দিয়ে বলে দেওয়া হল এ তোমার প্রভু, সে তখন তার প্রভুকে চিনবে। তার প্রভুকে ছাড়া কুকুর আর কাউকে চিনতে পারবে না। কুকুরের আবার বিবেক থাকে না, ওর প্রভুর বন্ধু যে তারও বন্ধু এই বিবেক তার কোন দিন আসবে না। কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা জানে। সেইজন্য যারা বলে ‘আমি অত শত জানি না আমি পরিষ্কার বলে দেব এটা ঠিক না ভুল’, তাকে বলতে হবে ‘তুমি তো ভাই কুকুর, গরুর মত আচরণ করছ’। কারণ পশুরা জানে এটা ঠিক এটা ভুল।

তৃতীয় বাঁধাকপি সাইজের মত উন্নত মস্তিষ্ক একমাত্র মানুষেরই থাকে। কুকুর যদি জানে এ আমার শত্রু সে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে শেষ করে দিতে চাইবে। কুকুরের থেকেও যারা আরও নিম্ন যোনির তারা শুধু জানে এটা আমার খাবার, এটা আমার খাবার নয়। এর বাইরে তারা আর কিছু জানে না। যেমন মাছি জানে এটা আমার খাদ্য আর এটা আমার খাদ্য নয়। মাছি নিজের শত্রু মিত্র বলে কিছু জানে না। কিন্তু কুকুর জানে এ আমার মিত্র আর এ আমার শত্রু। মিত্রের সাথে মিত্রের মত ব্যবহার করবে আর শত্রুর সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করবে। একমাত্র মানুষই শত্রুর সাথে মানুষের মত ব্যবহার করতে পারে। আমি একজনকে পছন্দ করি না, কিন্তু কোন পার্টিতে তার সাথে দেখা হয়ে গেল তাকেও আমি একটু মুচকি হাসি দিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলতে পারবো ‘কেমন আছেন’। কিন্তু কুকুর বেড়ালকে কোথাও দেখতে পেলেই দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। যদি কোন মানুষ বলে ‘ওই লোকটাকে দেখলেই আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়’, তার মানে সে কুকুরের মত আচরণ করছে, অর্থাৎ তার cortex এখনও develop করেনি। এই cortex এর সামনের দিকের বিভিন্ন অংশ develop এর উপর নির্ভর করবে সে কোন দিকে যাবে, এই অংশ উন্নত হলে সাহিত্যে যাবে, এই অংশ উন্নত হলে অঙ্কের দিকে যাবে ইত্যাদি। বুদ্ধিবৃত্তিই ঠিক করে দেয় জিনিষটা এই রকমই, এই বুদ্ধিবৃত্তি একমাত্র মানুষের মধ্যেই হতে পারে। সেইজন্য ঈশ্বরের অবধারণা একমাত্র মানুষই করতে পারে। আর ঈশ্বর

জ্ঞান একমাত্র মানুষই লাভ করতে পারে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। মানুষই ঈশ্বর দর্শন করতে পারে, মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীর বুদ্ধি নেই, বুদ্ধির জন্য মস্তিষ্কের যে কাঠামো দরকার সেটা মানুষের মধ্যেই একমাত্র আছে, আর কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এখন প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গিয়ে নিউরো বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়ে গেছে, যার ফলে এগুলোকে এখন আর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।

মনের পাঁচটি অবস্থা

মানুষের মন সব সময় তিনটে গুণের সমন্বয়ে তৈরী। কারুর মন তমোগুণী, কারুর রজোগুণী আবার কারুর মন সত্ত্বগুণের হয়, আবার কারুর তমো-রজো বা সত্ত্ব-রজো মিলিয়েও হয়। এই তিনটে গুণকে আধার করে মানুষের মনকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে – ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা বিমূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনের এই পাঁচটি অবস্থা। আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তাহলেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময় আমাদের মন বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত এই শব্দগুলো বাংলায় যে ক্ষিপ্ত বলে সেই ক্ষিপ্ত নয়, এগুলো হল শাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা।

প্রথমটা হল ক্ষিপ্ত, এই অবস্থায় মন পুরোপুরি ছড়িয়ে থাকে। গুণের দিকে দিয়ে ক্ষিপ্ত অবস্থায় মন তমস গুণে আচ্ছন্ন থাকে। মন যখন তমোগুণে থাকে তখন মন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। পাঁচটা জিনিষকে নিয়ে মন চঞ্চল হয়ে আছে, কখন এদিকে তাকাচ্ছে কখন সেদিকে তাকাচ্ছে, একটা কিছু করতে শুরু করে সেটা শেষ না করে অন্য কিছু করতে নেমে পড়ছে, আবার ওটাও করছে, সেটাও করছে। বাচ্চাদের মন সব সময় চঞ্চল থাকে। এটাই তমোগুণের লক্ষণ। মন নির্দিষ্ট একটা কিছুতে বা একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে না, মন এই এখানে রয়েছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। যারা অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির, পশুর মত চরিত্র তাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা হল ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত মন মানে চিন্তবৃত্তির অবস্থায় সব সময় থাকা।

মূঢ় বা বিমূঢ়তে সুখ-দুঃখের অনুভব খুব তীব্র থাকে। মন সব সময় মোহাচ্ছন্ন আর ছড়িয়ে থাকে বলে এদের হিংসা বৃত্তি প্রচুর, যার জন্য এরা সব সময় অপরের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করতে থাকে। সন্তাসবাদীরা যারা খুন করে বেড়ায় এরা সব বিমূঢ় অবস্থায় আছে। মনের এই অবস্থাই অসুর, দানবদের স্বাভাবিক অবস্থা। মূঢ় বা বিমূঢ়ও তমোগুণের লক্ষণ। তমের মধ্যে একটা হল active আরেকটা হল non-active। Active যখন বেশী হয়ে যায় তখন ক্ষিপ্ত আর active যখন কম হয়ে যায় তখন সেটাই হয়ে যায় মনের মূঢ় বা বিমূঢ় অবস্থা।

বিক্ষিপ্ত অবস্থা এই দুটোর থেকে একটু উপরে, বিক্ষিপ্তে মন একটু একটু করে কুড়িয়ে আনতে সক্ষম হয়। মনের শক্তি একটু যেন জেগে উঠেছে অর্থাৎ রজোগুণটা অনেক বেড়ে গেছে। যদিও আমরা পাগলকে বিক্ষিপ্ত বলি কিন্তু এর একটা বিশেষ অর্থ আছে, এই বিক্ষিপ্তের অর্থ কিন্তু পাগল নয়। এই অবস্থায় মনকে একটা জায়গাতে স্থির করার চেষ্টা করছে এবং হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য মনটা কুড়িয়ে একটা জায়গাতে স্থিতও হয়ে যায়। মায়েরা যখন রান্নাবান্না করেন তখন কত একাগ্র হয়ে কাজ করেন। কিন্তু বেশী সময় ওই অবস্থায় থাকতে পারেন না। একাগ্র হয়ে কাজ না করলে সেটাই মূঢ় বা ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। বিক্ষিপ্ত হল দেবতাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা। একমাত্র মানুষের মধ্যেই এই তিনটে অবস্থা থাকতে পারে। আর একই মানুষের একই দিনে মন সব কটি অবস্থায় থাকতে পারে।

এই তিনটির উপরে হল একাগ্র অবস্থা। একাগ্রে মন one pointed হয়ে যায়। এটাই সাধকের অবস্থা। মন এখন সত্ত্বগুণের প্রাচুর্যে ভর্তি হয়ে আছে। এদের কার্য ক্ষমতা প্রচণ্ড থাকে, যদিও রজোগুণ এদের থাকে। পরমহংসরা যখন কাজ করেন তখন তাঁরা সব কাজ একাগ্র ভাবে করেন। সাধকরাও যখন কাজ করে তখন একাগ্র ভাবে কাজ করে। সাধক ও সিদ্ধ দুজনের কাজের মধ্যে তফাৎ থাকবে, কিন্তু দুজনেরই কাজে মন একাগ্র থাকবে। সাধারণ মানুষেরও মন কখন কখন এই রকম একাগ্র হয়ে যায়, খুব উত্তেজনামূলক কোন ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে তখন টিভিতে খেলা দেখার মধ্যে মন পুরো একাগ্র

হয়ে যাবে, কিন্তু এটা বিক্ষিপ্ত অবস্থা, এখানে মন অনেকটা কুড়িয়ে আনা হয়েছে। এই অবস্থাকে একাগ্র অবস্থা বলা যাবে না। একাগ্র মন হল, যাদের মন স্বাভাবিক ভাবে সত্ত্বগুণে উঠে গেছে। স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ না থাকলে মন একাগ্র অবস্থায় যাবে না। উচ্চতর সাধকদের মন স্বাভাবিক ভাবে একাগ্র অবস্থায় থাকবে আর তাঁদের কার্য ক্ষমতাও প্রচণ্ড হবে। স্বামীজী বলছেন – রজোগুণের জোরে কখন কাজ হয় না, কাজ হয় সত্ত্বগুণের জোরে। কারণ সত্ত্বগুণী অনাসক্ত হয়ে যায়, অনাসক্ত হওয়ার ফলে তাঁর কার্য ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। কাজ মানে রজোগুণ, রজোগুণের কাজ একটা তমোগুণের দিক থেকে আসে আরেকটা সত্ত্বগুণের দিকে থেকে আসে। যাঁর কাজ সত্ত্বগুণের দিক থেকে আসে তিনি কাজের ব্যাপারে প্রচণ্ড দক্ষ ও ক্ষমতা সম্পন্ন হন আর যখন ধ্যানে বসবেন তখন পুরোপুরি একাগ্র হয়ে যাবেন।

এই চারটির পর আসে নিরুদ্ধ। নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি নয়, চিত্তের অবস্থা। কারণ সেখানে সমস্ত বৃত্তি থেমে গেছে। একাগ্রতে একটাই বৃত্তি আছে, অন্য কোন বৃত্তি নেই। ওই একটি বৃত্তি ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানেন না। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ শ্যামলাতালে দোতলায় থাকতেন। নীচের তলায় ডাস্টবিন ছিল, ডাস্টবিনে অদরকারী কাগজ-পত্র রাখা থাকত। সেই সময় শ্যামলাতালে কাঠ কয়লা ব্যবহার হত। একজন এসে ঘর পরিষ্কার করার পর কিছু কাঠকয়লা সমেত নোংরা ডাস্টবিনে ফেলেছে। কাঠকয়লাতে তখনও আগুন ছিল। ডাস্টবিনের কাগজে প্রথম আগুন ধরে গেল। সব কাঠের বাড়ি। সেখান থেকে পুরো বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে গেল। পুরো ঘর ধুয়োতে ভরে গেছে। ধুয়ো দোতলাতেও ছড়িয়ে গেছে। মহারাজ দোতলায় তখনও চিঠি লিখে যাচ্ছেন। সেবকরা দেখতে পেয়ে দৌড়ে গেছে। ইতিমধ্যে আগুনের শিখা বেরিয়ে গেছে। সেবকরা তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে সরেছেন। মহারাজ তখনও বুঝতেই পারছেন না কি হয়েছে। ওনার পুরো ঘর ধুয়োতে ভরে গেছে, তখনও তিনি চিঠি লিখে যাচ্ছেন, কোন হুঁশ নেই। মহারাজের মন একাগ্র হয়ে আছে, শুধু চিঠি লিখে যাচ্ছেন। যেটা করছেন সেটাই করছেন, তার বাইরে আর কিছু নেই, শুধু একটাই বৃত্তি। কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় ওই একটা বৃত্তিও নেই। কোন বৃত্তি নেই, মন নিরুদ্ধ অবস্থায়, চিত্তের এই অবস্থাকেই বলে সমাধি। সমাধি নিয়ে পরে আবার বিস্তারিত আলোচনা হবে।

প্রথমে মনের চারটে অবস্থা, ক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত থেকে মূঢ় অবস্থা, মূঢ় থেকে বিক্ষিপ্ত আর বিক্ষিপ্ত থেকে একাগ্র। একাগ্র থেকে নিরুদ্ধে যখন চলে গেল তখন আর কোন বৃত্তি থাকছে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একাগ্রকে অতিক্রম করা যায় না। একাগ্র অবস্থা হল শুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ। সত্ত্বগুণও কিন্তু বেঁধে রাখে, গীতায় ভগবান বলছেন *সুখসঙ্গেন বধ্যাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সত্ত্বগুণী সুখ আর জ্ঞান এই দুটোকে ছাড়তে চায় না। যদিও ভক্তি একটা পথ, জ্ঞান একটা পথ, কর্ম একটা পথ, এগুলো কখন মেলে না, কিন্তু ভক্তি পথে একাগ্র অবস্থাই ঠিক ঠিক দ্বৈতের অবস্থা। একাগ্র হয়ে যখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে, ওই ঈশ্বর দর্শনজনিত যে সুখ ও আনন্দের অনুভূতি, সেটাকে ভক্ত সাধক কখন ছাড়তে চায় না। সেইজন্য ভক্ত নিরুদ্ধতে যেতেই চাইবে না। যদি কোন ভাবে নিরুদ্ধতে চলে যায় তখন কী বলবে? যোগসূত্র পুরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাবে, সে তখন বলবে *তদাদ্ৰষ্টৃস্বরূপে অবস্থানম্*। যদি আমি নিরুদ্ধ অবস্থায় চলে যাই তখন আমার যে বাস্তবিক স্বরূপ, সেই স্বরূপে অবস্থান হয়ে যাবে। যদি কারণের প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকে তখন এই ভালোবাসা আমাকে একাগ্রই হতে দেবে না, নিরুদ্ধ তো অনেক দূরের কথা। ভালোবাসা হল মনের চিত্ত আর অহঙ্কারের অবস্থায় থাকা। আমার চিত্তকে আমার ভালোবাসার মানুষটি দখল করে রেখেছে ‘ওর প্রতি আমার ভালোবাসা আছে’। তখন হয় ক্ষিপ্ত, না হয় মূঢ় আর খুব বেশী হলে বিক্ষিপ্ত এই তিনটির মধ্যে ঘোরাতো ফেরা করবে। যতক্ষণ এই বোধ ‘আমার স্ত্রী আমাকে খুব ভালোবাসে’ বা ‘আমার ছেলে আমার প্রাণ’ থাকবে ততক্ষণ এই বোধ আমাদের একাগ্রতেও যেতে দেবে না, নিরুদ্ধের তো কোন প্রশ্নই নেই। আমি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, আমি বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র পড়াই, এই আমি যখন সমাধি অবস্থায় যাব তখন কি নিজেকে আমি সন্ন্যাসী বা আচার্য রূপে দেখব? কোন দিন দেখব না। যখন আমি নিজেকে সন্ন্যাসী মনে করছি তখন কিন্তু আমি চিত্তবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছি। কি বৃত্তি? আমি একজন সন্ন্যাসী, এই সন্ন্যাসী বৃত্তির বোধ। তার মানে, আমি যোগের পথে আর এগোতে পারবো না, কারণ ক্ষিপ্ত, মূঢ় আর বিক্ষিপ্ত এই তিনটির মধ্যেই ঘুরতে থাকব। একাগ্রে তো যেতেই পারবো না, আর নিরুদ্ধ মানে সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে গিয়ে সমাধি অবস্থায় চলে

যাওয়া, সেইজন্য নিরুদ্ধের কোন প্রশ্নই হতে পারে না। সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে যাওয়া মানে, যত রকমের বৃত্তি হতে পারে, জগতের ব্যাপারে আর নিজের ব্যাপারে যত রকমের চিন্তা ভাবনা হতে পারে সব বন্ধ হয়ে যাবে। যে জগৎ এত দিন সূচনা দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সূচনা দেওয়া তো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, আর এখন ভেতর থেকেও কোন চিন্তা-ভাবনা উঠছে না।

এখন চিত্ত যেভাবে বিভিন্ন রূপ বা আকার নিচ্ছে, এই ভাবে এর আগে আগেও চিন্তের নানান রকমের রূপান্তর হয়েছিল, এই জন্মে যেমন রূপ বা আকার নিচ্ছে আবার আমাদের আগের আগের জন্মেও চিত্ত এইভাবে অনেক রূপ বা আকার ধারণ করেছিল। এই ধরণের সমস্ত বৃত্তি, আমার সৃষ্টির পর থেকে আমার যত জন্ম হয়েছে সব এই চিত্তে সঞ্চিত হয়ে আছে। কত বৃত্তি আমাদের চিত্তে জমা হয়ে আছে আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে অনন্ত বৃত্তি জমে আছে। এমন অনেক বৃত্তি আছে যেগুলো অনেক দিন ধরে সঞ্চিত হয়ে বীজাকারে পড়ে থাকে। আমাদের মস্তিষ্ক সমস্ত বৃত্তিকে ধরে রাখতে পারে না। তাই যেগুলোকে সে ধরে রাখতে পারে না, সেই বৃত্তিগুলিকে ছোট্ট বীজাকারে রেখে দেয়। অর্থাৎ ঐ বৃত্তিটা এখন সুপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতি সুযোগ পেলে সুপ্তই আবার বিরাট রূপ ধারণ করে জীবনের গতি পথকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে দেবে। মনে করুন কেউ আমাকে অপমান করেছে। অনেক দিন ধরে, প্রায় পনের কুড়ি বছর তার সাথে আর দেখা নেই। এখন এই বৃত্তিটা আস্তে আস্তে বীজাকারে ভেতরে চলে গিয়ে চিত্তে জমে থাকবে। পনের কুড়ি বছর পর হঠাৎ তার সাথে আবার দেখা হয়ে গেল, তখন সেই সুপ্তাকারে থাকা বৃত্তিটা ভীষণ একটা রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। সৃষ্টির দিন থেকে এই ধরণের কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৃত্তি আমাদের চিন্তের মধ্যে বীজাকারে সুপ্ত হয়ে রয়েছে তার খবর আমরা কিছুই জানিনা। মন আর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই বীজগুলি মৃত্যুর পরে আবার যখন জন্ম হবে সেখানেও তখন তার সাথে থাকবে। জন্মের সাথেই এই বৃত্তিগুলি পাল্টে যাবে না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যাকে ভালো লাগল, তার সাথে কোন মিল নেই, চেহারা, চরিত্র, আচরণ, গুণ কোনটাতেই মিল নেই, তবুও কেন জানিনা অজান্তেই তাকে ভালো লেগে যাচ্ছে। আমরা শুধু আমাদের এই জন্মটাই দেখছি আর মানছি, কিন্তু আমাদের মন আর ইন্দ্রিয় তাদের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব পুটলি বেঁধে সঙ্গে করে বয়ে বেড়াচ্ছে, শুধু মাত্র বাইরের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। বাইরে থেকে টিল পড়ল আর বৃত্তি শুরু হয়ে গেল। সমস্ত শরীর মনের মধ্যে রূপান্তর হতে থাকল? আমরা জানিনা কেন হয়? কিন্তু এইটা জানছি যে যতক্ষণ এই চিন্তের সমস্ত বৃত্তিগুলির নিরোধ না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের কারুরই মুক্তি নেই।

এই অনন্ত বৃত্তিকে একটা একটা করে নাশ করা কখনই সম্ভব নয়। এই অনন্ত বৃত্তিকে নাশ করে মানবকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই যোগদর্শনের আবির্ভাব। যোগদর্শন আমাদের বলে দেবে কিভাবে এই বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করতে হবে। শুধু বৃত্তিগুলোকে নিরোধ করলেই মুক্তি নেই, চরম লক্ষ্য হল যেগুলো বীজাকারে চিন্তের গভীরে জমে আছে সেই অনন্ত বীজের মূলোচ্ছেদ করা। এখনকার বৃত্তিগুলিকে শান্ত করে দিলাম, কিন্তু যেগুলো আগে থেকে বীজাকারে পড়ে আছে চিন্তের তলদেশে, সেগুলি থেকে আবার বৃত্তির জন্ম হবে। যোগদর্শন বলে দেবে সেগুলিকে কিভাবে নিবীজ করতে হবে। তাই যোগদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল বর্তমান বৃত্তিগুলিকে বন্ধ করে আর বীজাকারে যে বৃত্তিগুলি জমে আছে সেগুলির নাশ করে আপনাকে আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া।

তাহলে কি হবে – There is no future, আমাদের শেখানো হয় - Past is dead, future is unborn and take care of the present, but this is not in Yoga philosophy. *Yoga philosophy is about stopping the present, destroying the past so that there is no future.* যোগদর্শন আপনাকে বলে দেবে কি কি করলে বর্তমানকে বর্তমানেই ধরে রাখা যাবে আর এর সাথে সাথে আপনাকে শিক্ষা দেবে অতীতকে কিভাবে মুছে ফেলতে হবে আর এই দুটোতে সফল হয়ে গেলে ভবিষ্যত বলে আর কিছুই থাকবে না।

আমরা চিন্তাকে নিয়ে ভাবছি না, কর্মকে নিয়ে ভাবছি না, আর চিন্তা ও কর্মের কথাকেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমরা একমাত্র এই বৃত্তিতাকে সবার থেকে বড় করে ভাবছি। ঐ যে মনের একটা বিরাট রূপান্তর হয়ে যায় এটাকেই আমরা ভালো করে দেখব। অবশ্য এক রকমেরই রূপান্তর হবে না, মন অনেক রকমের আকার নিয়ে নিতে পারে। কত রকমের হতে পারে সেটাই ক্রমশ দেখতে থাকব।

বৃত্তি জ্ঞান মানেই মিথ্যা জ্ঞান

আধ্যাত্মিক জীবনের খুঁটিনাটি জানার আগ্রহ যাদের আছে তাদের কাছে রাজযোগ ছাড়া ভালো বিষয় আর কিছু হতে পারে না। যারাই বলে বেড়ায় সব ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরই সব দেখবেন, তিনি সব দেখছেন, আসলে কিছু না বুঝেই এরা তোতা পাখির মত সব কথা বলে যাচ্ছে আর তা নাহলে লোকেদের বোকা বানাবার জন্য বলছে। তাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমস্ত রহস্য উন্মোচনের জন্য রাজযোগ ছাড়া কোন গতি নেই। প্রথমেই তাই আমরা বলেছিলাম রাজযোগ হল আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে যেমন দুইয়ে দুইয়ে চার হবে, কোন অবস্থাতেই পাঁচ কখন হবে না, ঠিক তেমনি রাজযোগ যে পথ দিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে যায় সেই পথে ডান দিক বাম দিক হবার কোন প্রশ্নই নেই। আমার মতকে যদি অনুসরণ করে চল তাহলে তুমি মা কালীর দর্শন পাবে বা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে যাও একদিন তুমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করবে, রাজযোগে এই ধরণের কোন স্ততির ব্যাপার নেই। রাজযোগ পরিষ্কার বলে দেবে তোমাকে এভাবেই যেতে হবে আর এটাই হবে, শুধু তোমারই নয় সবার এই একই জিনিষ হবে। রাজযোগে নিজের চিন্তা ভাবনা, নিজস্ব কল্পনার কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। রাজযোগ শুরুই করে তুমি আছ এই বোধকে নিয়ে। তুমি আছ এতে কারুরই সন্দেহ নেই। আমার এই বোধটুকু আছে যে আমি আছি, আমি আছি এই বোধ আছে বলে আমি আছি। এই ধ্রুব সত্যকে কোন অবস্থাতেই না করা যাবে না। আমার আমিটাকে যদি উড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো আর কোন কিছুই থাকছে না। পতঞ্জলি হলেন যোগদর্শনের সূত্রকার। সূত্রকার মানে যোগদর্শন চিরদিন ছিল, বেদের সময় থেকেই যোগ সাধনা, তার পদ্ধতি ছিল, কিন্তু পতঞ্জলি সূত্রু ভাবে এই দর্শনকে একটা জায়গায় একত্রিত করে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। তিনিও যোগদর্শনে এই এতটুকু জিনিষকে মেনেই চলছেন, আমি আছি আর আমার এই বোধ আছে যে আমি আছি।

বৃত্তি নিয়ে আমরা এর আগেও কয়েকবার আলোচনা করেছি, শুধু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আবার এর উপর সামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে। মন যে প্রতিক্রিয়াটা ছাড়ছে, কোন বস্তুর প্রতিক্রিয়া নয়, মস্তিষ্কে বস্তুর যে ইলেক্ট্রিক্যাল সঙ্কেত যাচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়াটাই জ্ঞান। সেইজন্য আমি যে বস্তু দেখছি আপনিও সেই একই বস্তু দেখছেন কিন্তু আমাদের দুজনের দেখাটা যে এক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি জিনিষটাকে যে রকম দেখব আপনি সেই একই বস্তুকে অন্য রকম দেখবেন। কারণ জিনিষটা আসলে কি সেটা জানার কোন পথ নেই। এটা ঠিক যে একটা কিছু আছে। এই যে একটা কিছু আছে সেটা আমার আপনার চোখের লেন্সের মাধ্যমে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে যাচ্ছে, সেখানে আমার আগের আগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে আমি বলছি এই জিনিষটাকে বলা হয় কলম। আপনিও বলছেন এটা কলম। কিন্তু এই কলমকে আমি যেভাবে দেখছি আপনি সেভাবে নাও দেখতে পারেন। সেইজন্য আপনার জগৎ আপনার আর আমার জগৎ আমার। আমার জগৎ কখনই আপনার জগৎ হবে না। এখানেই আমরা দেখছি চার পাঁচ মিনিটের কথাতেই অবধারণা কত পাল্টে গেল। এটাই বাস্তব যে আমার জগৎ আর আপনার জগৎ কোন দিন এক হবে না। মা ছেলেকে যতই ভালোবাসুক, স্ত্রী স্বামীকে যতই ভালোবাসুক কিন্তু দুজনের মন কখনই এক হতে পারবে না। এটাই বৃত্তি। তাহলে বৃত্তি বলতে কি বোঝাচ্ছে? যখনই বাইরের জগৎ থেকে কোন উত্তেজনা বা সূচনা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের কাছে পৌঁছাচ্ছে মন তখন একটা প্রতিক্রিয়া পাঠায়, সেই প্রতিক্রিয়াকেই বলছে বৃত্তি। সেই প্রতিক্রিয়াকে জানা মানে জ্ঞান। আমি আমার মনের প্রতিক্রিয়াকে জানলাম, এই জানাটাই জ্ঞান। আমাদের যখনই জ্ঞান হয় তখন বস্তুজ্ঞান কখনই হয় না, আসলে বৃত্তি জ্ঞানই হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে জ্ঞানের এই ব্যাখ্যা ধারণা করা খুব কঠিন।

আমার মিষ্টি খেতে ভালো লাগে, অমুক নোনতা খেতে ভালোবাসে, আমার এই রকম পোশাক পছন্দের, আপনার কাছে ওই একই রকম পোশাক পছন্দের নাও হতে পারে। জগতে যা কিছু ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ অপছন্দের খেলা চলছে এর সব কিছু চলছে আমাদের মনে। সব কিছু হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে অথচ আমরা বাইরের জগৎ নিয়েই লাফালাফি করে মরে যাচ্ছি। প্রেমিক প্রেমিকাকে বলে ‘আহা! তোমার কাছ থেকে একটু ভালোবাসা যদি পেতাম’! সব ভালোবাসা তোমার মস্তিষ্কে হচ্ছে। ‘আমি যদি একটু ওখানে যেতে পারতাম’, সেটাও এই এখানেই হচ্ছে। ‘আমার যদি জ্ঞান হত’ সেটাও এখানেই হচ্ছে। এরপর আমি ধ্যান করতে বসলাম। ধ্যান করা মানে চিন্তা-ভাবনা করা। যিনি ধ্যানে ঠাকুর কিংবা মা কালীর চিন্তা করছেন, সেটাও বৃত্তি জ্ঞান। যোগদর্শন বলছে সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করতে, কারণ বৃত্তি মানেই মিথ্যা। মিথ্যা কেন বলছে? কারণ ওটা তো আপনার মনের কল্পনা। জিনিষটা বাস্তবিক কী আছে কি করে আপনি জানবেন? আর আপনার প্রতিক্রিয়া আর আমার প্রতিক্রিয়া কোন দিন এক হবে না। মিথ্যা বলেই এক হবে না। প্রতিক্রিয়া ওটাই সত্যি হবে যেটা সবারই ক্ষেত্রে এক হবে। আপনি বলবেন ‘তা কেন হবে? রসগোল্লা খেয়ে সবাই বলবে মিষ্টি’। কিন্তু আমি কি করে জানবো যে আপনি মিষ্টি বলতে মিষ্টিই বোঝেন কিনা, বা মিষ্টি বলতে তেতো বোঝেন কিনা। যেমন একটা রোগ আছে রঙ কানা, এই রোগ যাদের হয় তারা কিছু কিছু রঙ দেখতে পায় না। কিন্তু তারাও এই নিয়েই নিজের মত জগৎ দেখছে, অথচ আপনি আমি যে জগৎ দেখছি তারাও সেই একই জগৎ দেখছে। অনেকে আছে যারা নাকে সুগন্ধ পায় না। সেইজন্যই বলা হয় আপনার জগৎ আপনার জগৎ, আমার জগৎ আমার জগৎ। যখন কেউ ধ্যান করছে তখন তার মন যে বৃত্তিগুলো ছাড়ছে সেই বৃত্তিকেই তো সে ধ্যান করছে। তাহলে আমি যখন ধ্যানে মা কালীর রূপ দর্শন করছি আর আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ দর্শন করছেন, সেটাও বৃত্তি জ্ঞান। বৃত্তি জ্ঞান মাত্রই মিথ্যা। যখন আপনি বলছেন ‘সব ঠাকুরের কৃপা’, এটাও বৃত্তি জ্ঞান। বৃত্তি জ্ঞান মানেই মনের খেলা। এটাই তো উপনিষদাদিতে বলছে আমরা সবাই মনের রাজ্যে বাস করছি। মনের রাজ্য মানেই মিথ্যা। কারণ যা কিছু হচ্ছে সেটা যার যার মনে হচ্ছে, সবারই তো একই জিনিষ হচ্ছে না, আপনার অনুভূতি, কল্পনা কখনই সার্বজনীন হবে না। আমি যা দেখছি সেটাও আপনিও দেখছেন কিনা, এটা জানার কোন উপায় নেই।

জগতে বৃত্তি জ্ঞান ছাড়া কিছু হয় না। যখন আমি সাকার ইষ্টমূর্তি দর্শন করছি তখনও সেটা বৃত্তি জ্ঞান। তাই ওই দর্শনটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝবো? ঠাকুরের যা কিছু দর্শন ও অনুভূতি হয়ে তার সবটাই কি মিথ্যা? আমরা এখানে অত্যন্ত কঠিন এক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এগুলো ঠিক ভাবে না বুঝলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্য কোন দিন আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে না। এই মুহূর্তে আমাদের মন সব সময় খুব সক্রিয়, অর্থাৎ অনবরত বৃত্তি হয়ে চলেছে। এই বৃত্তি ওঠাকে আমরা কমিয়ে কমিয়ে একটি কিংবা দুটি টেউয়ে নিয়ে আসতে পারি। একটা টেউ মানে, আপনি যখন ঈশ্বরের উপর ধ্যান করছেন, ধ্যান করতে করতে আপনার মনের সব বৃত্তি নাশ হয়ে গেছে, আপনাকে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, মশা কামড়াচ্ছে কোন বোধ নেই, এবার একটি মাত্র বৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি বা মা কালীর বৃত্তি এসে যাচ্ছে। আপনার এই একটি মাত্র বৃত্তিটাও মিথ্যা। যে যতই বলুক আমার মা কালীর দর্শন হয়েছে বা ঠাকুরের দর্শন হয়েছে, যার যা কিছু দর্শন হয় সব দর্শনই মনের দ্বারা তৈরী, মনের দ্বারা উৎপন্ন মানে মিথ্যা জ্ঞান।

কিন্তু ওই একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করে অবস্থান করতে করতে একটা সময় সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয়ে যায়। বৃত্তি নিরোধ হওয়া মানে মন এখন সব প্রতিক্রিয়া ছাড়া বন্ধ করে দিয়েছে। সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হওয়াটা কি মরা মানুষের মত? না তা নয়, পুরো চৈতন্যবান মানুষের মত। কিন্তু সমস্ত বৃত্তি ছাড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। ধ্যানের এত গভীরে চলে গেছে যে সেখানে তার ওই শেষ বৃত্তিটাও নাশ হয়ে গেছে। শেষ বৃত্তিও যখন নাশ হয়ে যায় তখন দুম্ করে প্রকৃতির এলাকায় যা কিছু আছে সব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানে এসে যোগ তখন যোগদর্শন হয়ে যায়। যোগ তখন বলছেন, তুমি মনে করছ তোমার মন সব কিছু করছে, অর্থাৎ মন করছে মানেতোমার মস্তিষ্কের কোশিকা গুলো ইলেক্ট্রো সঙ্কেত ছাড়ছে, কিন্তু এদের নিজের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাহলে কে করছেন? এর পেছনে এক চৈতন্য সত্তা আছে,

সেই চৈতন্য সত্তাই সব কিছু করে যাচ্ছেন। চিন্তা ভাবনা করে, বিচার করে এই তত্ত্বকে যে দাঁড় করিয়েছেন তা নয়। যোগ বলবে এটাই সত্য, এটাই আমি দেখেছি আর একটু পরেই তুমিও দেখতে পাবে। চৈতন্য সত্তা যখন মনের মাধ্যমে সামনে আসে তখন সেটা বৃত্তি জ্ঞান হয়ে আসে। যখন যোগ সাধনা দিয়ে এই বৃত্তি জ্ঞান থেমে গেল তখন ওই চৈতন্য সত্তাকে বোধে বোধ করা হয়, তখনই ঠিক ঠিক চৈতন্য সত্তাকে দেখতে পাওয়া যাবে।

এটাই পারমার্থিক জ্ঞান। সেইজন্য বলা হয় নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত কখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হবে না। নির্বিকল্প সমাধি হওয়ার আগে পর্যন্ত মানে অদ্বৈত জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যা কিছু আমরা দেখছি সবটাই মিথ্যা। অদ্বৈত জ্ঞানে একাত্ম বোধ হয়ে যাচ্ছে। একাত্ম বোধ হয়ে যাওয়ার পর বিচিত্র জিনিষ হয়। অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তার মস্তিষ্কে যে নিউরোস গুলো রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে মন রয়েছে, সেই মন এখন প্রকৃতিকেও দেখতে পায় আবার চৈতন্য সত্তাকেও দেখতে পায়। কিন্তু বৃত্তি ও মনের সীমাবদ্ধতা অপসারিত হয়ে যাওয়ার ফলে অখণ্ডকে সে আর খণ্ড রূপে দেখতে পায় না। যেমন টেলিস্কোপ দিয়ে যখন সূর্যকে বা যে কোন বিরাট জিনিষকে দেখি তখন তাকে ছোট করেই দেখা যায়, ঠিক তেমনি যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি অনন্ত, তাঁকে মন যখন দেখে তখন সান্ত রূপেই দেখে। তখন সে দেখবে শ্রীকৃষ্ণ রূপে, মা কালী রূপে। কিন্তু এখন যে শ্রীকৃষ্ণ বা মা কালীকে যেভাবে দেখছে আর আগে যে শ্রীকৃষ্ণ বা মা কালীকে দেখছিল দুটোই আলাদা। এতদিন সে চিন্তা ভাবনা করে দেখছিল। ঠাকুর বলছেন – দ্যাখো! বই পড়ে এক রকম ধারণা হয়, চিন্তা করে এক রকম ধারণা হয় আর তিনি নিজে দেখিয়ে দিলে আরেক রকম তাঁকে দেখা যায়। তার মানে, তিনি যিনি আছেন, তিনি অনেক সময় কাউকে কাউকে নিজেকে দেখিয়ে দেন ‘এই দ্যাখ আমার স্বরূপ’। কিন্তু যেটা দেখাচ্ছে সেটা যে মনের ভুল নয় এটাকে বোঝা খুব মুশকিল। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটা মনের তৈরী বলে পুরোপুরি মিথ্যা। যাঁকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, যেমন ঠাকুর যখন খড়া দিয়ে নিজের গলা কাটতে যাচ্ছেন তখন ঠাকুরকে মা কালী দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁকেও মা কালী দেখাচ্ছেন সেই অখণ্ড চৈতন্যকে। ঠাকুর বলছেন চৈতন্যের সমুদ্রে যেন চেউয়ের পর চেউ আছড়ে পড়ছে। প্রথম তাঁর সেই অখণ্ড জ্ঞান, ওই অখণ্ড জ্ঞানের পর খণ্ড জ্ঞান। এই রূপে তিনি ঠাকুরকে দেখাচ্ছেন। জগতের যত জ্ঞান, আপনার নিজের যা কিছু জ্ঞান, আপনার আশেপাশের যত কিছুর জ্ঞান সব আসে মন দিয়ে বৃত্তির মাধ্যমে। মন যে প্রতিক্রিয়া ছাড়েছে, এই প্রতিক্রিয়াটাই জ্ঞান, এই প্রতিক্রিয়াটাই আপনি। আপনার আমার জ্ঞান মানে বৃত্তির খেলা, অজ্ঞানও বৃত্তির খেলা, আপনার চরিত্র বৃত্তির খেলা, আপনার ব্যক্তিত্ব বৃত্তির খেলা, জগতে বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই। সেই কারণে এটাই সত্য যে তোমার জগৎ আর আমার জগৎ কখনই এক হবে না। দুজন যখন পরস্পর মিশছে, তখন দুজন দুজনের বৃত্তির খেলা চলে, একজন আরেকজনকে এক রকম দেখছে অন্য জন্য আবার তাকে অন্য রকম দেখছে।

চিন্ত কি দেখলাম, বৃত্তি কি, সেটাও কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে আর নিরোধ মানে আটকে দেওয়া, মনকে আর কোন ভাবে রূপান্তরিত হতে না দেওয়া। যেমন কাদা মাটিতে প্রচুর জল ঢেলে রেখেছেন এখন সেই জল যে পাত্রেরে ঢালা হবে কাদা জলটা সেই পাত্রের আকার নিয়ে নেবে। যদি মাটিটা কাদা থেকে একটু শক্ত হয়ে যায় তাহলে সেই মাটিটাকেই কোন আকার দিতে গেলে আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে। মাটিটা যদি একেবারে শুকিয়ে শক্ত ঢেলা হয়ে যায় তাহলে সেই মাটিকে কোন আকার দিতে গেলে আরও বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে। শক্ত মাটির ঢেলাটাকে ভাঙতে হবে, তারপর জল ঢেলে নরম করতে হবে। কিন্তু মাটিকে যদি আঙুনে পুড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ মাটি দিয়ে আর কোন কাজ করা যাবে না। প্রত্যেক মানুষের মন ঠিক এইভাবেই কাজ করে। আমাদের প্রত্যেকের মন এখন কাদা জল মেশানো অবস্থায় রয়েছে। একটু ভালোবাসা পেয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মন আবেগে বশীভূত হয়ে গেল, একটু বাজে কথা কেউ বলে দিল তৎক্ষণাৎ মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে মনের মধ্যে ক্ষোভের বড় বইতে থাকল। অটোআলা থেকে শুরু করে অফিসের কারখানার কর্মচারীরা, কেরানী থেকে অফিসার সবারই মনের অবস্থা এই রকম। যেই কিছু পেয়ে গেল তখন রাজা হয়ে গেল। জলে আর কাদায় মিশে থাকলে যোগী হওয়া যায় না, যোগী হতে গেলে মাটিটা একটু শক্ত হতে হবে। মাটির

মধ্যে যে জলটা মিশে আছে সেই জলটাকে আগে শুকিয়ে ফেলতে হবে, তা না করলে কাদাজল যে পাত্রে রাখবেন সেই পাত্রের আকার নিয়ে নেবে, এই হাসি এই কান্না, এই ঝগড়া এই প্রেম। এক মহারাজের কাছে এক শোকাক্ত ভদ্রমহিলা কান্নাকাটি করছিল, কিছু দিন আগে তার স্বামী মারা গেছে। মহারাজ ঐ কান্নার মধ্যেই হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন ‘মা, আপনার নাতিটি কেমন আছে’। ভদ্রমহিলার কান্না তক্ষুণি থেমে গেল, আর কি আবেগের সঙ্গে বলতে শুরু করে দিলেন ‘ওঃ, নাতির কথা আর বলবেন না মহারাজ, কি মিষ্টিই না হয়েছে, আর এখনই কত রকমের দুষ্টুমিই না করতে শিখেছে’। এই কান্না এই হাসি। নাতির কথা বলতেই মৃত স্বামীর কথা ভুলে গিয়ে মুখে হাসি ফুটে গেল। মনের কোন ভারসাম্যই নেই, যে যোগী হবে সে যখন যে চিন্তাটা ধরে নিল তাকে সেখান থেকে কিছুতেই আর বিচ্যুত করা যাবে না। যোগীর মন এত প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে যায় যে এমন কি সে নিজের সর্বনাশকেও ভ্রক্ষেপ করে না। পুরানে কিছু কিছু কাহিনীতেও আছে, কোন ঋষির একটা মেয়েকে দেখে পছন্দ হয়েছে, তখন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে এখন ঐ ঋষিকে আটকাতে পারবে। ঋষির নিজের সর্বনাশ হোক কিংবা ঐ অঙ্গরার সর্বনাশ করুক, সে যাবেই। এই ধরণের সর্বনাশের কবলে যাতে যোগীরা না পড়ে যায় তাই প্রথম অবস্থাতেই যোগের শিষ্যদের কিছু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ গুলো শুধুমাত্র যে যারা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হবেন তাদের জন্যই নয়, এগুলো গৃহস্থ ভক্তদেরও অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যারাই জপ ধ্যান করবেন তাদেরকেই সাবধাণ হতে হবে যাতে না পরবর্তী কালে মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে সর্বনাশের কবলে পড়ে যেতে হয়। যারা প্রচুর জপ ধ্যান করেন কারুর উপরে যদি কোন কারণে তাদের ক্রোধ এসে যায় তাহলে তার সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত সে শান্ত হবে না। জপ ধ্যান করে তার মনের ক্ষমতা এমন বেড়ে গেছে যে, এরপর যদি কারুর উপরে তার রাগ এসে যায় আর রাগের মাথায় যদি বলে দেয় ওর সর্বনাশ হোক, ওর সর্বনাশ তখন হতে বাধ্য।

যারা ঠাকুরের ভক্ত, অনেক দিন ধরে জপ ধ্যান করছেন, তাঁদের কাছে এগুলো খুব হতাশাব্যাঞ্জক মনে হতে পারে। কিন্তু এইটাই বাস্তব। অথচ সমাজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই কিন্তু চাইছে যোগ অভ্যাস করতে। কিন্তু এই যে পাঁচটা মনের অবস্থার কথা বলা হল, এদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কার হবে? যাদের মন একাগ্র হয়ে গেছে, আর একাগ্রতাই যাদের স্বাভাবিক অবস্থা, খুব বেশি হলে বাচ্ খেলা হতে পারে নিরুদ্ধ আর একাগ্রর মধ্যে, এই ধরণের একাগ্র যাদের হয়েছে তারাই ঈশ্বর দর্শন করতে পারেন। কিন্তু যারা বিমূঢ়, বিমূঢ় হল গন্ধর্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, অঙ্গরা এদের স্বাভাবিক অবস্থা, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন করার ক্ষেত্রে তাদেরকেও বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে। দেবতাদের অবস্থায় কিছুটা মানা যায়। মানে যখন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এঁদের মত মন একাগ্র হতে শুরু হবে তখন ঠিক আছে। শচীন তেগুলকার বা ওর মত যেসব খেলোয়াড় যে ক্রিকেটটা খেলছে, এরা এই ধরণের একাগ্র অবস্থায় আছে বলেই এত দক্ষ। এরা যদি জপ ধ্যানে নেমে পড়ে তাহলে তাতেও তারা খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করে নিতে পারবে। অবশ্য অন্যান্য দিকে এরা নিজেদের খুব বেশি জড়িয়ে রেখেছে বলে যোগের পথে আসবেই না। কিন্তু যদি যোগে নেমে পড়ে তাহলে এরাই হয়তো বিরাট যোগী হয়ে যাবে।

রাজযোগ আপনাকে কোন উপদেশ দেবে না, আপনাকে এটা ওটা করতে বলবে না। ভক্তিয়োগ বলবে তুমি এই কর সেই কর, তন্ত্র বলবে তুমি এতবার মন্ত্র বল, এইভাবে ফুল দাও। রাজযোগ এসব কিছুই বলবে না, শুধু বলবে তুমি অভ্যাস করতে চাও? তাহলে তুমি আগে নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখ তুমি মনের কোন অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আছ। আমি এখানে আছি। ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক।

জড় ও চেতনে তফাৎ কোথায়

এই জগতে যত সজীব পদার্থ আছে, সবারই ইন্দ্রিয় আর মন আছে। সজীব আর নিজীব এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এই ইন্দ্রিয় আর মন। এই জলের বোতলের মন আর ইন্দ্রিয় নেই, এটা তাই জড় পদার্থ, বোতলের পঞ্চ স্কুল ভূত ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু যত সজীব পদার্থ, সে গাছ কিংবা

এমিবিয়া থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীরই একাদশ ইন্দ্রিয় আছে – দশটি ইন্দ্রিয় আর একাদশ হল মন। এই দুটো কিন্তু সেই এক বস্তু থেকেই উৎপন্ন। নির্জীব বোতলেরও কিছু পদার্থ আছে, যেগুলো সজীবের মধ্যেও আছে। যদি বোতলটা কেউ ভেঙ্গে ফেলতে চায় তাহলে এও সামান্য হলেও একটা বাধা দেবে। একটা পাথরের উপরে যদি হাতুড়ি মেরে ভাঙতে যায় পাথরটাও বাধা দেবে, তাই প্রথমেই পাথরটাকে ভাঙতে পারবে না। আমাকেও যদি কেউ মারতে আসে আমি বাধা দেবো। এই রকম কিছু সাধারণ জিনিস দুটোতেই আছে। কিন্তু সব থেকে বড় পার্থক্য এসে যায় ইন্দ্রিয় আর মনের ব্যাপারে। ইন্দ্রিয় আর মন নেই বলে এই বোতলের কোন সূক্ষ্ম শরীর হয় না। সূক্ষ্ম শরীর হয় না বলে এদের জীবাত্তা নেই। জীবাত্তা নেই বলে জড়ের পুনর্জন্মাদির প্রশ্ন নেই। তবে কোন কোন সময় জীবাত্তা প্রয়োজন হলে জড়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে। যেমন বাড়ির ভেতরে আমরা আশ্রয় নিয়ে থাকি। জড় আর চেতনের মধ্যে এটাই সব থেকে বড় পার্থক্য।

গাছপালা, পশুপাখি এদেরও চিন্তা, মন আছে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস যখন বলেছিলেন যে গাছেরও প্রাণ আছে, রাজযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সেদিন কোন নতুন কথা বলেননি। রাজযোগ প্রথম দিন থেকে বলে এসেছে গাছেরও প্রাণ আছে, আর রাজযোগের মৌলিক দর্শন বলছে গাছেরও মন আছে, গাছেরও ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় আর মন সুপ্তাকারে আর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এগুলি খুবই প্রকাশমান আর সক্রিয়। মানুষের মধ্যে চিন্তা, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার পরিষ্কার আলাদা ভাবে দেখা যায়। রাজযোগ পরিষ্কার ভাবে বলে দেয় যতক্ষণ এই চারটেকে স্পষ্ট করে আলাদা না করা যাচ্ছে ততদিন সে পুরুষকে উপলব্ধি করতে পারবে না। এইজন্যই বলা হয় মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কারণ এই মনুষ্য দেহেই এই চারটেকে, মানে চিন্তা, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কারকে আলাদা আলাদা করে দেখা সম্ভব।

তাহলে কি মানুষের থেকেও কোন উচ্চ অবস্থা আছে? অবশ্যই আছে। রাজযোগ কখনই বলবে না যে মানব জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যে প্রাণী এই চারটেকে পার্থক্য করতে করতে যত দূর যাওয়ার ক্ষমতা রাখে সেই প্রাণী তত উন্নত। আর যত সে উন্নত হবে তার তত বিবর্তন হবে। যার মনের এই ক্ষমতা যত কম সে তত নীচে। ঠিক এই জায়গাতে ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদকে রাজযোগ পুরো সমর্থন করে। দ্বিতীয় শ্রেণী আর দ্বাদশ শ্রেণীর এই দুটো ক্লাশের ব্যবধানে আমাদের মনে অনেক বিবর্তন হয়ে গেছে, এখান থেকে আরো বিবর্তন হতে হতে আরো উন্নত হয়ে যাবো। অনেকে হয়ত বলবে বয়স্ক মানুষরা যুবক ছেলেদের সঙ্গে টেকা দিতে পারবে না, তাহলে এখানে কিসের উন্নতির কথা বলা হচ্ছে? কারণ বয়স্করা চিন্তা, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কারকে অল্প বয়সীদের তুলনায় বেশি আলাদা করে দেখতে পান। তাঁরা অনুভব করতে পারেন যে আমার শরীরে এখন প্রতিক্রিয়া আসছে, তাছাড়া মনের আবেগ গুলিকে তারা অভিজ্ঞতার নিরিখে সহজেই বুঝতে পারেন। বয়স্কদের তুলনায় অল্প বয়সী ছোকরাদের মন, শরীর আর ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ও জোর অনেক বেশি থাকতে পারে কিন্তু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয় বলে যুবক বয়সে এই চারটেকে পৃথক করে দেখতে পারে না। বয়স্কদের ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেই তুলনায় তাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে, বিচার শক্তি আর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি হয় বলে বয়স্ক লোকদের কাছেই মানুষ পরামর্শ নিতে এগিয়ে আসে।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের সব কটি যন্ত্র – দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে চিন্তার মধ্যে বাইরে থেকে অনবরত সূচনা আসছে, যার ফলে চিন্তার মধ্যে সব সময় তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এই তোলপাড় যখন শুরু হয় তখন আবার নতুন অনেক কিছু হতে আরম্ভ করে দেয়, আমি কথা বলতে আরম্ভ করছি, কিছু কাজ করতে আরম্ভ করছি, আর আমার মন নানা ধরনের চিন্তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। যোগ বলছে এটাকে আটকে দাও – বৃত্তিগুলোকে নিরোধ কর। ঠিক আছে, যে করেই হোক আমি আমার চিন্তাবৃত্তিকে আটকে দিলাম। কিন্তু তারপর কি হবে? এইবার তৃতীয় সূত্রে বলে দিচ্ছে চিন্তাবৃত্তি নিরোধ হলে কি হবে। এটাই রাজযোগের conclusion।

প্রথম সূত্রে শুধু বলে দেওয়া হল আমরা যোগের আলোচনা শুরু করছি, দ্বিতীয় সূত্রে এসে বলছেন যোগ মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ কিভাবে করতে হবে সেটাই আমরা শেখাতে যাচ্ছি। চিত্তবৃত্তি যদি নিরোধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে? **তদাদ্রষ্টঃ স্বরূপেহবস্থানম্।।৩।।** যার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাবে সে তার বাস্তবিক স্বরূপে অবস্থান করবে।

আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? রাজযোগ কখনই প্রকৃত স্বরূপের ব্যাখ্যা করবে না। রাজযোগের সার্বজনীনতার মূল্য এই তৃতীয় সূত্রের মধ্যেই রয়েছে। যদি কেউ মনে করে তার বাস্তবিক স্বরূপ সে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, যখন তার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাবে তখন সে সত্যি সত্যিই নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান রূপে দেখতে পাবে। যদি বলে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয়ে যাবে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক দেখবে। তুমি নিজের স্বরূপকে যেমন ভাববে সেই স্বরূপকেই তুমি উপলব্ধি করবে। গোপীরা বলছে – আমি কৃষ্ণ হয়েছি, মানে এটাই গোপীদের স্বরূপ। গোপীদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাওয়াতেই তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের এক দেখছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা হলেন চৈতন্যস্বরূপ (conscious principle)। রাজযোগে চৈতন্যকে পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। চৈতন্যকে যেমন রাজযোগে পুরুষ বলছে আবার বেদান্তে, ভক্তিশাস্ত্রে অন্য অন্য নামে উল্লেখ করবে।

বৃত্তি আর ব্যক্তি এক

চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে আমি না হয় আমার স্বরূপকে দেখব, কিন্তু এখন যে অবস্থাটা দেখছি এটা তাহলে কি? এখন কি তাহলে আমার স্বরূপে আমি নেই? আমি তো জানি আমি একজন গৃহী, কিংবা সন্ন্যাসী। এই অবস্থাটা বোঝাবার জন্য এইবার রাজযোগ তার মূল বক্তব্য শুরু করবে। এতক্ষণ বলা হল আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা, আর তারপরে বলল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করলে কি হবে – তুমি তোমার স্বরূপে অবস্থান করবে। কিন্তু আমার তো চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়নি, তাহলে এই যে আমি যে নিজেকে এখন যে অবস্থায় দেখছি এটা তাহলে কি? আমি কি, এখন কি রূপে আছি? এবার রাজযোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ আর স্বরূপে অবস্থান এই দুটোর মাঝখানের অবস্থাটাকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য বিস্তৃত ভাবে বলতে থাকবে।

তখন রাজযোগ বলছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বাকী সময় তুমি **বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র।।৪।।** অন্য সময়ে তুমি বৃত্তির সঙ্গে এক হয়ে আছ। যত প্রাণী আছে, দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সবাই চিত্তবৃত্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। কি রকম এক? এক্ষুণি যদি কেউ এসে গালাগাল দেয় তাহলেই মনের মধ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়ে সেই ক্রোধ বৃত্তির সাথে এক হয়ে যাব। কিন্তু আসলে আমি আর আমার ক্রোধ দুটোই আলাদা, কিন্তু এখন এক হয়ে গেছে। এই জায়গা থেকে আমরা মনের সূক্ষ্ম অবস্থাতে প্রবেশ করব। এখন রাজযোগ যে জিনিষগুলিকে সামনে নিয়ে আসছে এগুলোকে আমরা যদি চিন্তা ভাবনা না করি তাহলে রাজযোগ কি বলতে চাইছে তার কিছুই বুঝতে পারব না। এর আগে যা যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে অনুভূতি সাপেক্ষ, আর এখন যে কথা গুলো বলা হবে এগুলো অনুভূতি সাপেক্ষ নয় এগুলো সবই চিন্তা সাপেক্ষ। যে কোন আচার্যের পক্ষে এগুলো বোঝান খুব মুশকিল হবে যদি না আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনাকে প্রয়োগ না করি।

কেউ হয়তো প্রচণ্ড রেগে গেছে, তাকে যদি ভালো করে বোঝান হয়, তবুও সে রাগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। আমি কাউকে প্রচণ্ড ভালোবাসছি, কেউ যদি সাবধান করে বলে তুমি কিন্তু বিপদে পড়বে। আমি কর্ণপাত করব না। ক্রোধ, ভালোবাসা, দুঃখ এগুলো সবই এক একটি বৃত্তি, যেটা আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে নেবে। কি করিয়ে নেবে? মনকে ক্ষিপ্ত, মূঢ় আর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘোরাবে। আমাদের ব্যক্তিত্ব এখন এই বৃত্তির সাথে এক হয়ে আছে। কারণ ওপর যদি খুব বিরক্তি এসে যায় তখন তার সব কিছুই খারাপ বলে মনে হবে। সে যদি সত্যিই কোন ভালো কাজ করে থাকে কিন্তু এই ক্রোধ বৃত্তি আমাকে বলাতে থাকবে – ছাড় তো! ও আবার ভালো কাজ করবে! কারণ আমার মনে তার সম্বন্ধে এতো ঘৃণা এসে গেছে যে ওর নাম শুনলেই মনটা ঘৃণার একটা আকার নিয়ে নিচ্ছে।

লায়লা-মজনুর বিখ্যাত কাহিনীতে লায়লা নাকি খুব কালো ছিল, আর দেখতেও নাকি খুব একটা আহামরি কিছু ছিল না। আর এই লায়লা মজনুর জন্য দুটো উপজাতির মধ্যে এক অস্বস্তিকর লড়াই হয়েছিল। রাজা এই দুই উপজাতির পরস্পরের লড়াইতে হস্তক্ষেপ করে মজনুকে ডেকে বলছেন ‘মজনু, লায়লার চেহারার তো এই ছিড়ি, তার ওপরে গায়ের রঙ এত কালো, কি দেখে তুমি ওকে এতো ভালবাসতে গেছ’। তখন মজনু রাজাকে যে কথাটি বলল সেটাই পরে একটি বিখ্যাত উক্তি হয়ে গিয়েছিল। মজনু বলছে ‘জাঁহাপনা! আপনার চোখ দিয়ে লায়লাকে দেখবেন না, আমার চোখ দিয়ে দেখুন’। এটাই হল আসল কথা। শেক্সপিয়ার বলছেন ‘Beauty lies on the eyes of the beholder’. কিন্তু রাজযোগ বলবে – No it does not lie in the eyes of the beholder, it lies in the Vritti of the beholder. মা যে নিজের সন্তানকে ভালোবাসে, ছেলেকে দেখতে যত কুৎসিৎই হোক, স্বভাব যত খারাপই হোক মায়ের মন ছেলের প্রতি ভালোবাসায় ডুবে আছে, ছেলের কথা ভাবলেই মন কেমন হয়ে ওঠে।

রাজযোগ বলছে আমাদের চিন্তে বৃত্তির ঢেউ ওঠার বিরাম নেই। পুকুরের জল শান্ত, কিন্তু ক্রমাগত পুকুরের জলে চারিদিক থেকে পাথর পড়েই চলেছে আর পুকুরে ঢেউ উঠেই চলেছে, ঢেউয়ের আর শেষ নেই। যোগ বলবে প্রথমে এই পাথর ফেলাটা বন্ধ কর। পাথর ছোঁড়া বন্ধ হল। তারপর বলবে ঢেউটা একটু থামতে দাও। ঢেউ থেমে গেল। এখন কি হবে? এবারে জানতে পারবে জলের তলায় কি আছে। মন ঠিক এই রকম, অনবরত মনের মধ্যে তরঙ্গ উঠে মনকে সব সময় বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে। শুধু যে বিক্ষুব্ধই করে রেখেছে তা নয়, মন নানান আকৃতি নিয়ে নিচ্ছে। কিসের আকৃতি? আগে যে উপমাটা দেওয়া হয়েছিল, কাদাজলকে বোতলে দিয়ে দিলে কাদাজল বোতলের আকার নিয়ে নিল। যখন যে পাত্রে ঢালা হচ্ছে সেই পাত্রের আকার নিয়ে নিচ্ছে। মনের বৃত্তিকে থামানোর কথা দূরস্ত, মনে যে বৃত্তিটা উঠছে সেই বৃত্তির সাথে মিশে গিয়ে মন পুরো ঐ বৃত্তির রূপ নিয়ে নিচ্ছে। এবার কেউ যদি ইষ্টমন্ত্রের জপ করতে শুরু করে যোগ পথে কোন ভাবে নিজেকে একাগ্রতেও নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, হঠাৎ সে দেখতে পাবে – আরে তাইতো! কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে। তখন কিন্তু সে জগৎকে অন্য ভাবে দেখতে শুরু করবে। আবার এই একাগ্রকে থামিয়ে দিয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিরুদ্ধ অবস্থায় চলে গেলে তখন সে স্বরূপে অবস্থান করবে। তাহলে এতক্ষণ কিসে অবস্থান করছিল? বৃত্তি জ্ঞানে অবস্থান করছিল। বৃত্তি জ্ঞান আর স্বরূপ জ্ঞান দুটো আলাদা। মন যে চঞ্চল হয়ে এক একটা বৃত্তির আকার ধারণ করছে, তখন সে আর তার বৃত্তি এক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে যখন কাম ভাব জাগছে তখন কাম ভাব আর আমরা কি আলাদা? কখনই আলাদা হবে না, দুটো এক থাকবে। আপনি আমি কে? আমাদের বৃত্তি যা সেটাই আমি আপনি। তাহলে যখন সব বৃত্তি থেমে গেল তখন কি আমাদের অস্তিত্ব চলে যাবে? একজন পণ্ডিত নিজেকে ভাবছে আমি পণ্ডিত, আর পণ্ডিত মনে করছে আমি অমুকের স্বামী, অমুকের পিতা ইত্যাদি। ঠাকুর বলছেন এগুলোই উপাধি। উপাধিও যা বৃত্তিও তাই। কিন্তু বৃত্তিতে বাইরের জ্ঞানটাও এসে যায়। আমি আর আমার মন এক, মন যেমন যেমন আকার ধারণ করছে আমিও সেই আকারের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছি। এবার সমস্ত বৃত্তি থেমে গিয়ে মন নিরুদ্ধ হয়ে গেল তখন *তদাদ্রষ্ট্বঃ স্বরূপেহবস্থানম্*।

এখন এই অবস্থায় কেউ যদি ভগবান বুদ্ধের মত বলেন শূন্যবাদ, নির্বাণ মানে কিছু নেই, একদিক থেকে তো ঠিকই বলছেন। তাঁর কাছে জগৎ তো আর নেই, প্রদীপের শিখাকে ফুঁ দিলে যেমন নিভে যায়, নিরুদ্ধ অবস্থায় তার কাছে জগৎটাও নিভে গেছে। তিনি যখন সমাধি অবস্থা থেকে নেমে আসছেন তখন আবার জগৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা কোন জগৎ? আসলে আবার বৃত্তিই সৃষ্টি হচ্ছে। ঠাকুর যখন সমাধিতে চলে যেতেন তখন তাঁর আর কোন কিছুর বোধ নেই, সব কিছু মুছে গেছে। এবার সমাধি অবস্থা থেকে যখন তিনি নেমে আসছেন তখন তিনি প্রথমে কোথায় আসবেন? একাগ্র অবস্থায় যাঁর ধ্যান করছিলেন, ঠাকুর একাগ্র অবস্থায় মা কালীর ধ্যান করছিলেন, সমাধি অবস্থা থেকে নেমে এসে ঠাকুর সেই মা কালীকেই দেখবেন। এরপর আস্তে আস্তে মা কালীকেও দেখছেন আর আশেপাশের আরও অনেককে দেখছেন। তখন তিনি কী দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখবেন? তুলসীদাস বলছেন সিয়ারাম ম্যায়

সব জগ জানু, সমস্ত জগৎকে দেখছি সীতা আর রামচন্দ্র। ঠিক তেমনি ঠাকুরও দেখছেন মা কালীই এই জগৎ রূপে বিরাজ করছেন।

কল্পনা করা যাক, একজন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি বসে আছেন, তাঁর মন এখন বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ মন সত্ত্বগুণের অবস্থায় চলে গেছে। সেই সত্ত্বগুণ থেকে তিনি অতি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে চলে গিয়ে একাগ্র হয়ে গেছেন, একটাই মাত্র বৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। সেখান থেকে আস্তে আস্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তিও চলে গেল, মানে নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল। তখনও সব কিছুই আছে, জগৎ আছে, জগতের ক্রিয়া আছে কিন্তু সব মৃত। কিন্তু তিনি মৃতের মত নন, মুর্ছা অবস্থাতেও নেই। তিনি তখন অত্যন্ত জ্ঞানের অবস্থায় আছেন। ঠাকুর বলছেন সাধারণ জীবের নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর একুশ দিন পরে শরীর চলে যায়, একমাত্র অবতার ও ঈশ্বরকোটিরাই নির্বিকল্প সমাধির পরেও শরীর ধারণ করে রাখতে পারেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ফেরত আসেন। তার মানে, যাঁরাই যোগী তাঁরাই অবতার বা ঈশ্বরকোটি আর তা না হলে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়নি। ঠাকুরের কথা অনুযায়ী এটাই সহজ যুক্তি। ঠাকুরের কথা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে রামানুজ, মাধ্বাচার্যের মত যাঁরা ছিলেন, হয় তাঁদের নির্বিকল্প সমাধি হয়নি, আর তা নাহলে তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথার সাথে এই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অদ্বৈতের ব্যাপারটা মিলছে না। তাহলে বলতে হয় যত বাবাজী আছেন, যোগী আছেন তাঁদের নির্বিকল্প সমাধি হয়নি। যদি নির্বিকল্প সমাধি হয় তাহলে তাঁর শরীর থাকবে না, আর যদি নির্বিকল্প সমাধির পর শরীর থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর উপর ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ আছে। ঠাকুর আবার আচার্য শঙ্করের নাম বলছেন, নারদের নাম বলছেন, এনারা ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত। আমরা যদি কল্পনা করে নিই যোগশাস্ত্র যেটা নিরুদ্ভব অবস্থার কথা বলছে সেটা ঠাকুর যে নির্বিকল্প সমাধির কথা বলছেন তার থেকে হয়তো অত উচ্চ অবস্থা নয়, যেটা বেদান্তসার গ্রন্থে সমাধিবান ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবিদ বরীয়ান্ ইত্যাদি ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। অথচ ঠাকুর কোথাও এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞানীর শ্রেণী বিভাগ করছেন না। এগুলো আসলে বুদ্ধির খেলা মাত্র, এগুলোকে নিয়ে যত কম আলোচনা করা হয় ততই ভালো। যাই হোক, আমরা ধরে নিচ্ছি তিনি নির্বিকল্প সমাধির এক ধাপ নীচে আছেন। এবার তিনি যখন সমাধি অবস্থা থেকে বাহ্য জগতে ফেরত আসছেন, ধরুন তিনি ঠাকুরের মন্ত্র জপ করে সমাধির অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন, তাহলে ফেরত আসার পর প্রথম বোধ তাঁর কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণের বোধটাই প্রথম আসবে। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। যখন তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত মতে সাধনা করছেন তখন তোতাপুরী ঠাকুরকে অখণ্ড জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্রম মাঝখানে কাঁচের টুকরো দিয়ে আঘাত করতেই ঠাকুরের এত দিনের সেই মা কালীও উড়ে গেল। সেখানেও শেষ যে দর্শন হচ্ছে সেটাও মা কালীর দর্শনই হচ্ছে। কিন্তু তারপরেই তাঁর মন অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন ‘জ্ঞান অসি দিয়ে মা কালী দ্বিখণ্ডিত করে দিতেই আমার মন হু হু করে অখণ্ডে লীন হয়ে গেল’। কিন্তু কথামতে তো পাতায় পাতায় মা কালীর নাম। যে মা কালীকে জ্ঞান অসি দিয়ে ঠাকুর দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছেন সেই মা কালী আবার কোথা থেকে এসে গেলেন? যদি ঠাকুরের জীবনে মা কালী আরে ফিরে না আসতেন তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। কারণ সমাধি অবস্থায় যাওয়ার যেমন একটা প্রক্রিয়া আছে তেমনি সমাধি থেকে ফেরত আসারও একটা পরিষ্কার প্রক্রিয়া আছে। সমাধিতে যখন লীন হন তখন শেষ যে শব্দটা তাঁরা শোনেন, যেখান থেকে জগৎকে ছেড়ে দিচ্ছেন তা হল ওঁ জাতীয় কিছু একটা শব্দ। এই কথা খ্রিস্টান মরমীয়া সাধকদের অভিজ্ঞতাতেও পাওয়া যায়, মুসলমানদের সুফীদের অভিজ্ঞতার বর্ণনাতেও পাওয়া যাবে। এবার যখন তিনি ওখান থেকে ফেরত আসেন তখন ঠিক এই একই প্রক্রিয়াতে ফেরত আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যিনি সাধক তিনিও ফেরত আসার সময় দেখছেন ওঁ তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আবার আস্তে আস্তে সৃষ্টি যেমন ছিল ঠিক সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসেন। এই সৃষ্টিটা তাহলে কোথা থেকে এলো? শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে। যোগীরাও ঠিক এই একই ভাবে দেখেন সৃষ্টি ওঁ থেকে এসেছে, নিত্য তাঁরা এটাই দেখছেন। ঠাকুর সব সময় মা কালীর ভাব নিয়ে থাকতেন। ফলে সমাধিতে যাওয়ার আগে মা কালী, ফেরত আসার সময় প্রথমে মা কালী, তারপর মা কালী থেকে সমস্ত জগৎ বেরিয়ে আসছে। ঠাকুর তাই বলছেন মা কালী হলেন অনন্ত প্রসবিনী। ঠিক তেমনি যাঁরা

শ্রীরামচন্দ্রের সাধনা করে সমাধিতে লীন হয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাও ফেরত আসার পর দেখেন শ্রীরামচন্দ্র থেকেই পুরো জগতের সৃষ্টি। যাঁরা নিরাকার সাধক, তাঁরা দেখেন ওঁ এ সব কিছু লয় হয়ে যাচ্ছে আবার ওঁ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। যখন মা কালী, ওঁ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণে ফেরত আসছেন তখন এটাও বৃত্তি জ্ঞান। ঠাকুর যখন মা কালীকে শেষ দেখছেন, তখন ঐ অবস্থাটাই মনের একাগ্র অবস্থা। মা কালীকেও এবার সরিয়ে দেওয়া হল, এটাই তখন ঠাকুরের নিরুদ্ধ অবস্থা।

এখন শ্রীরামকৃষ্ণের একাগ্র থেকে নিরুদ্ধতে যাত্রা চলছে, সেই সময় তোতাপুরী নিজে নিরুদ্ধ অবস্থায় আছেন। এখানে দুটো সমান হবে না, কারণ অবতারের যে জ্ঞান তার সাথে তোতাপুরীর জ্ঞান কখন সমান হবে না। তফাৎ হলেও যেখানে রূপ দর্শন হচ্ছে, সেটা পুরোপুরি বৃত্তি জ্ঞান, তার পরেও যা যা আসছে সবটাই বৃত্তি জ্ঞান। এই বৃত্তি জ্ঞানকে আমি আমার থেকে আলাদা করে দিতে পারি না। কারণ আমি আর আমার মনকে আমার থেকে আলাদা করা যায় না, কারণ মন সব সময় বৃত্তি রূপে থাকে। যখন বৃত্তি থেমে যাবে তখন কী আমি? এটাই আসল আমি। সাধারণ অবস্থায় আমি আমার বৃত্তি এক, এই এক অবস্থায় যেটাকে আমি বলছি সেটা আসলে বৃত্তি। যখন বৃত্তি থেমে যাবে তখন আসল আমিটা এসে যাবে, যে আমিটা বৃত্তির সঙ্গে এক করে রেখেছিল সেই আমিটা তখন আর থাকবে না। সেইজন্য যোগের কাজই হল চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ।

উপনিষদের একটি মূল তত্ত্ব হল আত্মব্রহ্মৈক্য – আত্মাও যা ব্রহ্মও তাই। আত্মাকে ব্যাখ্যা করা হলে ব্রহ্মকেও ব্যাখ্যা করা হয়ে যাবে। তবে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বোঝান যায়। ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করার পর বলবে তুমিই সেই। এই একটা জিনিষকে বোঝানোর জন্য উপনিষদ আরও অনেক কিছুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোচনা করবে। ভগবতাদি সমস্ত পুরানের একটাই মূল বক্তব্য, যিনি ভগবান নারায়ণ তিনিই সব কিছু হয়েছেন। ভগবান নারায়ণ কি করে সব কিছু হয়েছেন ভগবত সেটাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আর নানা রকমের প্রকরণ গুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে থাকবে। সব আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য ভগবানই সব কিছু হয়েছেন বোঝান। উপনিষদ ও পুরানের দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে যোগ পুরোপুরি অন্য এক স্বতন্ত্র পথ ধরে এগিয়ে গেছে। যোগ একবারও ব্রহ্মতত্ত্বে যাবে না, ঈশ্বর তত্ত্বেও যাবে না। যোগের মূল কেন্দ্র আপনাকে আমাকে নিয়ে, আপনি বা আমিই যোগের একমাত্র কেন্দ্র। আমি মানে আমার মন, মন না থাকলে আমিও আসবে না। আমাদের মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকা মানে মস্তিষ্কের মধ্যে নিউরোসগুলো অর্থাৎ কোশিকাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। নিউরোনের কার্যগুলোকেই বলছেন বৃত্তি। আর বৃত্তি সমূহকে নিয়ে তৈরী হয় মন। এখন একটি কোশিকা একা কাজ করতে পারে কিনা, এটা হল নিউরো বিজ্ঞানের ব্যাপার। নিউরো বিজ্ঞানীরাও ঠিক জানেন না মস্তিষ্কের কোশিকাগুলো কীভাবে কাজ করে, কীভাবে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা পরিষ্কার বুঝি আমি আছি আর আমার মন আছে, আর আমার মন নানা রকম কাজ করে। প্রিয়জনকে দেখলে মন আনন্দ পায়, অপ্রিয় কিছু ঘটলে কষ্ট পায়। অপ্রিয় কিছু হওয়ার সম্ভবনা থাকলে মন ভয় পায়। মনের এই কার্যকে উপমা দেওয়ার জন্য বলা হয় মন যেন একটা জলাশয়। জলাশয় ঢিল ফেললে যেমন জলে ঢেউ ওঠে, একটার পর একটা ঢেউ উঠতেই থাকে। জলাশয়ে যদি ক্রমাগত ঢিল বা পাথর পড়তে থাকে জলাশয়ের জলে ঢেউ ওঠাও বন্ধ হবে না, অনবরত ঢেউ উঠতেই থাকবে। এই যে ঢেউ সমূহ এটাকেই বলা হয় বৃত্তি। আমার মন আছে এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আমার মনে যে নানা রকমের চিন্তা-ভাবনা উঠছে এতেও কোন সন্দেহ নেই। এই যেন নানা রকমের চিন্তা ভাবনা উঠছে এর সমষ্টিকেই বলা হয় বৃত্তি।

যদিও সাংখ্য মতে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা যোগ দর্শনে দরকার পড়ে না, কিন্তু একটা বস্তুকে আমরা যখন দেখছি তখন সেই দেখার কাজটা কীভাবে হয়, আর কে দেখে এই নিয়ে যোগ বিশদ ভাবে আলোচনা করছে। আপনার শরীরের উপর আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে, তারপর রেটিনাতে আপনার একটা প্রতিবিম্ব তৈরী হচ্ছে, সেই প্রতিবিম্ব চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কেন্দ্রে যাচ্ছে, মস্তিষ্ক কেন্দ্র সেটাকে নিয়ে এবার অনেক কিছু করবে। অথচ প্রায়ই আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তার সামান্য কিছু জিনিষ

জানছি আর বাকি অনেক কিছুই জানতে পারছি না। আমাদের কানের পর্দায় বাইরের সমস্ত শব্দ সব সময় এসে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে। কিন্তু সব শব্দের উৎস, শব্দের কি বক্তব্য, শব্দের কি ভাব তার কোনটাই ধরতে পারি না। তার মানে মানুষ কান দিয়ে শোনে না, যদি কান দিয়ে শুনত তাহলে টেপরেকর্ডারের মত সব কিছুই রেকর্ড হয়ে যেত। বাসে ট্রেনে যাওয়ার সময় জানলা দিয়ে আমরা কত মানুষ, কত দৃশ্য দেখে যাচ্ছি। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ‘তুমি কি অমুককে দেখতে পেলে, রাহু দিয়ে সাইকেল করে যাচ্ছিল’। আমি বললাম ‘আমি লক্ষ্য করিনি’। লক্ষ্য করিনি মানে, তাহলে কি আমি কান দিয়ে দেখি নাকি? আমার চোখ আছে, চোখে প্রতিবিম্ব এসেছে, স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে রিপোর্টিংও হয়েছে অথচ আমি দেখতে পেলাম না। কেন দেখতে পেলাম না? আসলে চোখ বা মস্তিষ্ক এরা কেউই দেখে না, আসল দেখাটা দেখেন চৈতন্য সত্তা। চৈতন্যের আলো যদি ওই পথ দিয়ে না যায় তাহলে কিন্তু চৈতন্য সত্তা জানতে পারবেন না। এটা বোঝা যায়, অনেকে চোখ খুলে ঘুমিয়ে থাকে। চোখ খোলা, সবই চোখের মধ্য দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে কিন্তু তাও দেখতে পারছে না। আরও ভালো বোঝা যায় মানুষ যখন মরে যায় তখন তার চোখ, কান, নাক সব আছে কিন্তু চোখ দিয়ে দেখতে পারছে না, ডাকলে সারা দিচ্ছে না। কিছু একটা আছে যেটা না থাকলে বাকি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কিছুই জানতে পারছে না। মাইক্রোস্কোপে একটা জিনিষ রাখা আছে, এখানেও সবই আছে, জিনিষ আছে, আলো আছে, মাইক্রোস্কোপ আছে কিন্তু দেখার লোক নেই। তাই ওই জিনিষটাকে কেউ জানতে পারছে না। যিনি সব কিছু দেখছেন তাঁকে বলছেন পুরুষ, পুরুষ মানে চৈতন্য সত্তা।

আমাদের মন হল জড়, পুরুষই একমাত্র চৈতন্য। চৈতন্য সত্তা আছে বলেই সব কাজকর্ম সম্ভব হচ্ছে। আমি দেখতে পারছি, শুনতে পারছি কারণ পুরুষের চৈতন্যের আলো মন, ইন্দ্রিয়ের ভেতর বাইরের বস্তুর উপর গিয়ে পড়ছে। এই মন দিয়ে জগতের সব কাজ করতে পারছি, আর এটাও জানতে পারছি সব মনের বৃত্তি, মন বিভিন্ন রকম আকার ধারণ করছে। কিন্তু সব কিছুর পেছনে যিনি আছেন তাঁকে জানা যাচ্ছে না। ঠাকুর সার্জেন্ট সাহেবের উপমা দিয়ে বলছেন, সার্জেন্ট সাহেবের হাতে লণ্ঠন থাকে সেই লণ্ঠনের আলোতে তিনি সবাইকে দেখতে পান আর বাকিরা এক অপরকে দেখতে পায়, কিন্তু সার্জেন্টকে কেউ দেখতে পায় না। কেউ যদি সার্জেন্ট সাহেবকে প্রার্থনা করে বলে ‘সাহেব! আলোটা একবার তোমার দিকে ফেরাও, তোমাকে একটু দেখি’। সার্জেন্ট আলো নিজের দিকে ফেরালে তখন দেখতে পারে সার্জেন্ট লোকটি দেখতে কি রকম। ভক্তিশাস্ত্র বলবে ‘হে ঠাকুর! তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়াকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে দাও, তোমাকে যেন দেখতে পাই’ ‘হে ঠাকুর! তোমার চৈতন্যের আলো তোমার দিকে ফেরাও, তোমাকে যেন দেখতে পাই’। যোগশাস্ত্র এইসব আর্জি বা প্রার্থনার দিকে একেবারেই যাবে না। কারণ যোগের ঈশ্বরে কোন বিশ্বাসই নেই, জানেই না ঈশ্বর বলে কিছু আছে কিনা। যোগদর্শনকে একটা জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য একজন ঈশ্বরকে দরকার, সেইজন্য যোগসূত্রে সামান্য একটু ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। সাংখ্য তো একেবারেই ঈশ্বর মানে না। সাংখ্যের কাছে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনই নেই, তাদের ঈশ্বর ছাড়াই সব কিছু চলে যাবে। কি চলবে? বলছে সবটাই হল বৃত্তি, তোমার মন আছে, মনে বৃত্তি উঠছে। কিন্তু সব কিছুর পেছনে যে চৈতন্য আছে, যাকে সাংখ্য বা যোগ পুরুষ বলছে, তাঁকে জানা যায় না। জানতে গেলে কী করতে হবে? যোগ করতে হবে। যোগ করলে কী হবে? চিত্তবৃত্তি নিরোধ হবে। মনে যত চেউ উঠছে, সমস্ত চেউ ওঠাকে বন্ধ করে মনকে শান্ত করে দিলে, সব কিছুর পেছনে যিনি কার্য করছেন তাঁকে জানতে পারবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাটাই যোগ। যদি চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায় তখন কী হয়? তখন বলছেন *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবজ্ঞানম্*। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়ার আগে তুমি মনে করছ সব কিছুর দ্রষ্টা তুমি। কিন্তু যোগদর্শনে বলছে আসল দ্রষ্টা হলেন সেই চৈতন্য পুরুষ।

যখন স্বরূপে অবস্থান করছে না, যখন বৃত্তি উঠছে তখন কী হয়? *বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র*, বৃত্তির সঙ্গে নিজেকে এক মনে করে। তুমি আর তোমার বৃত্তি এক হয়ে আছে। আমরা একটা খুব নামকরা কথা শুনে থাকি ‘পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়’। স্বামীজী বলছেন লোকেরা এই রকম অনেক বড় বড় কথা বলে, এমন কেউ যদি থাকেন যিনি পাপী আর পাপকে আলাদা দেখেন, তাঁকে দেখার জন্য আমি

লম্বা পথ হেঁটে যেতে রাজি থাকব। কেন স্বামীজী এই কথা বলছেন? তার ব্যাখ্যা এই চার নম্বর সূত্রেই পাওয়া যাবে। সে আর তার মনের বৃত্তি সব সময় এক। পাপ আর পাপী সব সময় এক, কখনই আলাদা হয় না। সিনেমাতে এই ধরণের বড় বড় ডায়লগ থাকে ‘ইয়ে তুম নহি বোল রহে তুমহারা পয়সা বোল রহা হ্যায়’। এই ধরণের ফিল্মী ডায়লগ সিনেমার স্ক্রিপ্টেই হতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তব। ছেলে মেয়েকে ভালোবেসেছে। ছেলে এসে তার মাকে বলছে ‘ওর জন্য আমি সব লাখি মেরে বেরিয়ে যেতে পারি’। মা তখন খুবই কষ্ট পায়, দুঃখ করে বলে ‘বাবা! মেয়েটাই তোমার মনকে এরকম করে দিয়েছে, মেয়েটি তোমার মনকে হরণ করে নিয়েছে’ বা বলবে ‘এগুলো তোমার কথা নয়, তোমার পাগলামো তোমার মুখ দিয়ে এই কথা বলাচ্ছে’, ‘তোমাকে ভূতে পেয়েছে’। এই ধরণের কত কথাই মায়েরা বলে। আবার মায়েরা অনেক সময় কাঁদে ‘আমার ছেলেটা তো ভালই ছিল, এই প্রেতনীটা ওকে সর্বনাশ করে দিল’। মা এখানে আমার ছেলে আর আমার ছেলের পাগলামোর সঙ্গে কিছুটা তফাৎ করতে পারে। কিন্তু সচরাচর এই রকম হয় না। কারণ *বৃত্তিসারুপ্যমিতরত্র*, অন্যান্য সময় অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান যদি না করে তাহলে তুমি আর তোমার বৃত্তি এক, তুমি আর তোমার পাগলামো এক, তুমি আর তোমার পাপ এক। সেইজন্য পাপকে ঘৃণা করা আর পাপীকে ঘৃণা না করা এগুলো হল সব নেতাদের বড় বড় বুলি আওড়ানোর মত।

বৃত্তি কয় প্রকার

এতক্ষণ বৃত্তি বলতে কি বোঝায় সেটা বিস্তারিত ভাবে বলা হল। এবারে বলছেন এই বৃত্তিগুলি কত রকমের হতে পারে। বৃত্তিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় – *বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাহক্লিষ্টাঃ।।৫।।* আমাদের মনে যত রকমের বৃত্তি উঠছে, জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যত বৃত্তি উঠছে, এর আগের আগের জন্মে যত বৃত্তি উঠেছে, কুকুর, বেড়াল থেকে মহাত্মা হওয়া পর্যন্ত যত রকমের বৃত্তি হতে পারে, সমস্ত বৃত্তিকে আমাদের যোগদর্শনের ঋষিরা পাঁচটা শ্রেণীতে বেঁধে দিয়েছেন। এই পাঁচ প্রকার বৃত্তির মধ্যে কয়েকটি ক্লেশ-যুক্ত আর বাকী গুলো ক্লেশ-শূন্য। এই পাঁচটা বৃত্তি কী, সেটাই ষষ্ঠ সূত্রে বলা হচ্ছে। সেইজন্য ছয় নম্বর সূত্রটি খুব মূল্যবান।

এই পাঁচটা বৃত্তি কি কি? *প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিঃ।।৬।।* প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি – মনে এই পাঁচ রকমের রূপ নেয়। মনে যত রকম চিন্তা ভাবনা উঠছে, সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে এই পাঁচটি রূপে চিহ্নিত করা হয়। এবার প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

প্রথম হল প্রমাণ – *প্রমাণ* মানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। একটা জিনিষকে কীভাবে জানা যাবে সেটাকে বলা হয় প্রমাণ, যেটা দিয়ে অর্থাৎ যার সাহায্যে জগৎকে মাপা হয় সেটাকেই প্রমাণ বলছে। বেদান্তে ছয় রকমের প্রমাণ আছে কিন্তু যোগশাস্ত্র তিন রকম প্রমাণের কথা বলে – *প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।।৭।।* প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আগম। বেদান্তের উপমান, অর্থাপত্তি আর অভাব প্রমাণকে যোগশাস্ত্র বাদ দিয়ে গেছে। উপমান মানে একটা জিনিষকে আরেকটা জিনিষের সাথে তুলনা করে জানা। উপমান আর অর্থাপত্তিকে তাই যোগদর্শন অনুমানে ফেলে দেবে। অভাব প্রমাণকে যোগ প্রত্যক্ষে ফেলে দেবে। স্বামীজী এই সাত নম্বর সূত্রের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমে বলছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বামীজী বলছেন আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু জানছি সেটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। আমাদের শাস্ত্রে, তা বেদান্তই হোক আর যোগশাস্ত্রই হোক, এরা কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণকে প্রচণ্ড উচ্চ স্থানে রেখেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সামনে আর কোন প্রমাণ দাঁড়াতে পারবে না। আচার্য শঙ্কর খুব কড়া ভাষায় বারবার বলছেন যে জিনিষকে প্রত্যক্ষ দেখছি জিনিষটা এই রকম, সেখানে যদি হাজারটা শ্রুতি বাক্য অন্য কথা বলে তাও শ্রুতি বাক্যকে নেওয়া যাবে না। যেমন মুসলমানরা একটা জিনিষকে দেখছে জিনিষটা ভুল, কিন্তু কোরানে অন্য রকম লেখা আছে বলে ওই ভুলটাকে ওরা স্বীকার করবে না। খ্রিস্টানদেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে বিরাত

সমস্যা। যেমন গ্যালিলিও টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছেন চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে। কিন্তু বাইবেল অন্য রকম বর্ণনা করছে। খ্রিস্টানদের কাছে বাইবেল শ্রুতি প্রমাণ। পাদরীরা গ্যালিলিওকে বলে দিল ‘তোমার কথাগুলো ভালোয় ভালোয় ফেরত নিয়ে নাও তা নাহলে এক্ষুণি তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে’। গ্যালিলিওর আগে ব্রুণোও এই ধরনের কিছু কথা বলেছিলেন বলে তাঁকে চার্চের তরফ থেকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিও তখন খুব নামকরা লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হল। ধর্ম এই রকম অন্যায় করেছিল বলে বিজ্ঞান আজ ধর্মের উপর আক্রমণ করছে। হিন্দুদের কাছে এসব কোন সমস্যাই নয়। হিন্দুদের শ্রুতি বাক্যে যাই থাকুক, প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমনি দেখে নেবে জিনিষটা এই রকম, সঙ্গে সঙ্গে তারা শ্রুতি বাক্যকে পালেট নেবে। স্বামীজী বলছেন দূষিত জল থেকে ম্যালেরিয়া হয়। তখনকার লোকেরা তাই ভাবত। কিন্তু স্বামীজীর শরীর চলে যাওয়ার কয়েক বছর পর রোনাল্ড রস আবিষ্কার করলেন মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়। তাহলে স্বামীজী বলে গেছেন দূষিত জল থেকে ম্যালেরিয়া হয় এই শ্রুতি বাক্যের এখন কী হবে? আমরা যদি হিন্দু না হয়ে অন্য ধর্মের হতাম তাহলে বলতাম মশারি খাটাতে হবে না, মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কোন সম্পর্কই নেই, দূষিত জল থেকে ম্যালেরিয়া হয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে কক্ষণ এই জিনিষের অনুমতি দেবে না। প্রমাণিত হয়ে গেছে মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়, ব্যস্ এটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাহলে স্বামীজী যে বলেছিলেন? স্বামীজী তখন তিনি নিজের মত বলেছিলেন, তখনকার বিজ্ঞানে এই কথাই বলা হয়েছিল। এখন বিজ্ঞান প্রমাণিত করে দিয়েছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে, হিন্দুরা বলবে – ভালো তো, ঘুরুক না তাতে অসুবিধার কি আছে। আগামীকাল যদি বিজ্ঞান বলে দেয়, না আগে ভুল বলা হয়েছিল, সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। হিন্দুরা তখন কী বলবে? ঘুরুক না, আমাদের তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেন অসুবিধা নেই একটু পরেই আমরা দেখব। আমাদের ঋষিদের বক্তব্য হল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য হয় তাহলে তার সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না, এটাই তখন শেষ কথা বলে সবাই মেনে নিতে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রমাণ হল অনুমান প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের জীবন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর কম চলে, অনুমান প্রমাণের উপরই বেশী চলে। বিজ্ঞানের যত থিয়োরী আছে, তার সবটাই অনুমান প্রমাণের মধ্যে পড়ে। অনুমান প্রমাণ আবার দুই রকমের, একটা deductive আরেকটি inductive। একটা জিনিষ যখন হয়েছে তাহলে আরেকটা জিনিষও হবে, এটা হল deductive। যদি বলে আজকে সূর্যাস্ত হবে কি হবে না? এই যে সূর্য আস্তে আস্তে যাচ্ছে এটা দিয়ে deduct করা যায় যে সূর্য অস্ত যাবে। কিন্তু আমরা জানি সূর্যাস্ত আজকেও হবে, এটা কিন্তু অনুমান প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়। তিন ঘন্টা পরে আমি কি করব সেটা এখন কী করে জানব? এটাও অনুমান প্রমাণ। অনুমান মানে বাংলা অনুমান নয়। অনুমান হয়, কিছু জিনিষকে সামনে রেখে আমরা এর একটা নিষ্কর্ষ বার করছি, একটা ধারণা তৈরী করা হচ্ছে, আর সেই ধারণাকে কেন্দ্র করে নিজের জীবন চালান হচ্ছে। প্রত্যক্ষকে আধার করে একটা জিনিষকে চিন্তা ভাবনা করে জানাটাই অনুমান প্রমাণ। আপনি এই মাত্র ঘরে ঢুকলেন, দেখছি আপনার জামা প্যান্ট ভেজা, ভেজা দেখে আমি অনুমান করে নিলাম বাইরে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ ভাবে বৃষ্টি হতে দেখিনি, মেঘলা আকাশ, বাইরে থেকে এসেছেন, জামা-কাপড় ভেজা, তার মানে বৃষ্টি পড়ছে বা পড়েছে। নৈয়ায়িকরা অনুমান প্রমাণের উপর প্রচুর কাজ করেছেন। তাঁরাই বিভিন্ন নিয়ম তৈরী করে দিয়েছেন অনুমান প্রমাণের দ্বারা কীভাবে ঠিক হবে এই জিনিষটা ঠিক আর এই জিনিষটা ভুল। পাশ্চাত্য দর্শনেও অনুমান প্রমাণ নিয়ে অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের যত থিয়োরী এই অনুমান প্রমাণকে সাপেক্ষ করেই তৈরী হয়েছে।

তৃতীয় হল শ্রুতি প্রমাণ বা আগম প্রমাণ, আগম মানে শ্রুতি। ভারতে দুই রকমের দর্শন আছে, প্রথমটাকে বলা হয় আস্তিক দর্শন আর দ্বিতীয়টিকে নাস্তিক দর্শন বলে। আস্তিক দর্শন মানে যাঁরা বেদকে প্রমাণ রূপে মানছেন আর নাস্তিক দর্শন মানে যাঁরা বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদকে মানে না, আর আজকের যুগে শিখ ধর্মও নাস্তিক দর্শনের মধ্যে গণ্য হবে।

নাস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যাঁরা ভগবান মানেনে না, কিন্তু তা নয়, ভগবানে বিশ্বাস থাকলেও একজন নাস্তিক হতে পারে যদি সে বেদকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ না করে। প্রমাণ মানে যা কিছু বলা আছে তা সবই সত্য। আস্তিক দর্শনের প্রমাণ হল বেদে যা কিছু বলা হয়েছে তার সব কিছুই সত্য। শ্রুতি প্রমাণও একটা জিনিষকে জানার জন্য প্রচণ্ড গুরুত্ব। আগম প্রমাণ হল একমাত্র বেদ বা ঋষি বাক্য। ঠাকুর যেটা বলে দিয়েছেন সেটাকে নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না। আগু বা আগম প্রমাণকে প্রামাণ্য রূপে না মানলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণ আমাদের শুধু দৃশ্য জগতের জ্ঞানই দেবে, তার মানে এরা বৃত্তি জ্ঞানের বাইরে যেতেই পারবে না। আপনি খুব বুদ্ধিমান হতে পারেন, আপনি হাজারটে আইনস্টাইনের সমান হতে পারেন, কিন্তু আপনি যা কিছু বলবেন সবই আপনার মনের জগৎ থেকেই বলবেন, এটাই তো বৃত্তি জ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু বেদে আত্মার স্বরূপের ব্যাপারে বলছে *স পর্যগাচ্ছুক্ৰমকায়মত্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্*, আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা সব জায়গায় যেতে পারে, যেখানে সৃষ্টি নেই সেখানেও আত্মা আছেন, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ। দৃশ্য জগতে এই রকম জিনিষ তো কখন দেখা যায় না। এই রকম জিনিষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অনুমান প্রমাণ দিয়ে কোন দিন জানতে পারবো না। এটাকে জানার জন্য চাই শব্দ প্রমাণ বা আগম প্রমাণ। আপনি যদি বলেন ‘আমি বেদের কথা মানি না’। তাহলে আপনাকে বলা হবে আপনার দ্বারা আত্মাকে জানা যাবে না। অন্য দিক দিয়ে যদি দেখা হয়, এমন কিছু আছে আমি জানি না অথচ অপরের কথাকে বিশ্বাস করছি, এটাও এক ধরনের আগম প্রমাণ। আমাদের পরম্পরাতে যত ঐতিহ্য আছে বা গুরুজনরা যে কথাগুলো সব সময় বলে আসছেন, এগুলো কোন না কোন ভাবে শব্দ প্রমাণের মধ্যেই পড়ে, সেইজন্য আগম শব্দটা ব্যবহার করা হয়, আগম মানে বেদ। মা বাচ্চাকে বলে দিয়েছে ‘ও তোর দাদা’, বাচ্চার কিন্তু স্থির বিশ্বাস সে তার দাদা। মা বলে দিয়েছে অমুক লোক তোর বাবা সেটা আমরা বিশ্বাস করে নিচ্ছি আর ঋষিরা বলছেন ‘ঈশ্বর আছেন’ সেটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মাকে যদি কোন বাচ্চা প্রশ্ন করে ‘মা! কি প্রমাণ আছে যে উনি আমার বাবা’ তখন মা বাচ্চাকে একটা চড় লাগিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ যদি বলে ‘ঋষিদের কথা আমি মানতে পারলাম না’, তখন আমরা বলছি ‘উনি কত যুক্তিবাদী! কি সুন্দর যুক্তি দিয়ে কথা বলছেন’। আপনার যদি সন্দেহ থাকে তখন সবেতেই সন্দেহ করুন, কিন্তু আমরা সব কিছুতে সন্দেহ করছি না।

আমরা এখানে খুব উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ তত্ত্বের আলোচনা করছি। উচ্চ তত্ত্বের আলোচনা যখন কেউ করতে আসছেন তখন তাঁরা ধরেই নিয়েছেন তাঁদের এগুলোর উপর প্রাথমিক ধারণা হয়ে গেছে। সেইজন্য তাঁরা বলে দিলেন প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আগম এই তিনটে দিয়েই সঠিক জ্ঞান হয়। যে কোন জিনিষের ঠিক ঠিক জ্ঞান তখনই হবে যখন সেই জিনিষের একটা অতীতের পরম্পরা থাকবে, যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে আর আমি ঠিক ঠিক জিনিষটাকে দেখেছি। আপনি ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা করেননি, ঈশ্বরকে দেখেননি, অথচ ধারণা হয়নি, কোন জ্ঞান হয়নি অথচ বলছেন ‘আমি ঈশ্বরকে মানতে পারছি না, আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিন’। ঈশ্বর তো কোন বস্তু নয় যে আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে। যিনি ঈশ্বরকে জানেনে, যাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে গেছে তাঁর ভারি বয়ে গেছে ঈশ্বরকে ধরে নিয়ে এসে আপনার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে। কিন্তু যিনি বলছেন আমি ঈশ্বরকে দেখেছি – *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*। বেদের ঋষি বলছেন *বেদাহমেতম্*, আমি দেখেছি তাঁকে। এরপর কোন প্রশ্নই নেই, আমি দেখেছি, এরপর আমি তোমার প্রশ্নের কি উত্তর দেব! ঠাকুরও বলছেন – আমি তোমার কথা কী শুনবো, আমি তো এই রকমই দেখেছি।

স্বামীজী এই রাজযোগের কথা আমেরিকার মাটিতে আলোচনা করেছিলেন। যদিও আমেরিকাতে তখন বেশীর ভাগ লোক বাইবেলকেই মানত, খ্রিস্টান ফাদারদের কথাকে মানছে, কিন্তু একটা জিনিষকে সাবলীল ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ দিয়ে বলা, এই ব্যাপারটা বিদেশের ঐতিহ্যে ছিল না। স্বামীজী আগম প্রমাণকে বলছেন – যাঁরা ঋষি ছিলেন, যাঁরা একটা নির্দিষ্ট পথে জীবন চালিয়ে প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন করে সেই সত্যকে দর্শন করেছিলেন, তাঁদের কথাই ঋষি প্রমাণ, যাকে আগম প্রমাণ বলে, শ্রুতি প্রমাণ বা আগুবাক্য বলে। পদার্থ বিজ্ঞানে আইনস্টাইন যা যা বলেছেন এখন সবাই তা

মেনে নিচ্ছে। নিউটনও যা বলেছেন সেটাও মেনে নিচ্ছে – এটাই আশু প্রমাণ। যে যে জিনিষের উপর কাজ করে গেছে, তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, যেমন মার্কস্ এ্যঞ্জেলস যা বলে গেছেন সেটাই কমুনিষ্টদের কাছে শ্রুতি প্রমাণ। এখানে স্বামীজী বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান প্রাপ্তি। আমরা সবাই জান্তে অজান্তে জ্ঞান প্রাপ্তির দিকেই ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছি। এই যে বিবর্তনের উপর এত কথা বলা হয়, যদি প্রশ্ন করা হয় এই বিবর্তন আমাদের কোন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার একটাই উত্তর – জ্ঞানের দিকে।

যদি আমরা মেনে নিই এ্যামিবা থেকে মানুষ উন্নত হতে হতে আজকে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু কোন জায়গাতে তারা উন্নতি করেছে? পিঁপড়ে থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি মনুষ্যতের প্রাণী কোন না কোন ক্ষেত্রে মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। একটা পিঁপড়ের যে প্রচণ্ড দ্রাণ শক্তি সেই শক্তির সামনে মানুষের দ্রাণ শক্তি কিছুই নয়। সন্দেশের একটা সামান্য টুকরোও যদি আলমারির মাথায় তুলে রাখা হয়, কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজারে হাজারে পিঁপড়ে এসে ওই টুকরোকে ঘিরে ফেলবে। একটা গৃধ্র চল্লিশ কিলোমিটার রেডিয়াসে একটা মরা জিনিষ পড়ে থাকলে সেটাকে তারা দেখতে পায়। মাটি থেকে এক কিলোমিটার উঁচু থেকে চিল যদি দেখে রাস্থা দিয়ে একটা ইঁদুর পার হচ্ছে, সেখান থেকে ডাইভ দিয়ে ছোঁ মেরে নীচে নেমে ইঁদুরটাকে ধরে আবার আকাশে চলে যাবে। যখন আমাদের ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় তখন কত ব্যাথা অনুভব হয়, কিন্তু মশা যখন রক্ত টেনে নিতে থাকে আমরা টেরও পাইনা। রক্ত শোষা হয়ে যাওয়ার পর জানতে পারি মশা আমাকে কামড়াচ্ছে। জেঁক রক্ত টেনে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে তাও আমরা টের পাইনা যে আমাকে জেঁকে ধরেছে। জেঁকটা এলো, আমার গায়ে উঠেও গেল, কখন সে আমার চামড়া ফুটো করে রক্ত খেতে শুরু করল, রক্ত খেয়ে বিরাট লম্বা হয়ে গেল, খসে পড়ে গেল, আর তখনও আমার রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছে। যতক্ষণ পটাসিয়াম ফেরোক্লোরাইড না লাগানো হচ্ছে ততক্ষণ রক্ত বেরনো বন্ধই হবে না। মশা, জেঁক এরা শরীরের যেখানে বসবে সেখান লোকাল এ্যনাস্বেসিয়া করে নেয়। আমাদের শরীরের কোন অংশ যদি কেটে যায় তখন রক্ত পাপড়ির মত জমে যায়। কিন্তু জেঁক যখন কামড়ায় তখন রক্তের মধ্যে এ্যন্টি কয়াবিনেট যেতে থাকে। একদিকে জেঁক রক্ত শুষে যাচ্ছে অন্য দিকে এ্যন্টি কয়াবিনেট যেতে থাকে, যার ফলে জেঁক খসে পড়ে গেলেও রক্ত পড়া বন্ধ হবে না। দশ পনেরটা জেঁক যদি লেগে যায়, জেঁক খসে পড়ে গেলেও এইভাবে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ মারাও যেতে পারে। কারণ রক্ত অনর্গল বেরোতেই থাকবে। আমাদের ডাক্তাররা এখনও পর্যন্ত মশার শুঁড়ের মত পাতলা সিরিঞ্জ তৈরী করতে পারেনি। তাহলে ভাবুন মানুষ এই অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের কাছে কত কিছুর ব্যাপারে কত নগণ্য। বিবর্তনে বলে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু কিসের নিরিখে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে? মানুষের চোখের দৃষ্টি শক্তি চিল বা গৃধ্রের কাছে অতি নগণ্য। মানুষের দ্রাণ শক্তি সামান্য পিঁপড়ের দ্রাণ শক্তির তুলনায় কিছুই নয়। চিতা বাঘ যে গতিতে দৌড়াতে পারে, অলিম্পিকের কোন দৌড়বীর তার ধারে কাছে কোন দিন যেতে পারবে না। পাখিদের মত মানুষ কোন দিন আকাশে উড়তে পারবে না। কোন দিক দিয়েই মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা যাচ্ছে না, পশুদের মত হজম শক্তিও তার নেই। তাও আমাদের কত গর্ব মানবজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষ তাহলে কিসে শ্রেষ্ঠ? জ্ঞানের দিকে সবার থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিকে মানুষ নিজের মত কাজে লাগাতে পারে, বুদ্ধিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া ও কৌশল অন্য কোন প্রাণীতে নেই। এই বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ মশা মারার অনেক কৌশল বার করে ফেলেছে। আমরা ইচ্ছা করলে মশারি ব্যবহার করতে পারি, স্প্রে করতে পারি, মশা মারার কত রকম তেল বেরিয়েছে, কয়েল লাগিয়ে মশা তাড়াতে পারি। কিন্তু কোন প্রাণী আজ পর্যন্ত মানুষকে আটকে রাখার কোন কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি। গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের চলাফেরার মত আমরা সাবমেরিন বানিয়ে নিয়েছি, পাখিদের মত উড়োজাহাজ তৈরী করেছি। যেখানেই যাওয়া যাবে মানুষ সব কিছুকেই টেক্সা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেইজন্যই বলা হয় মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান প্রাপ্ত করা।

এই জ্ঞান দুই প্রকার, একটা অপরা বিদ্যা আরেকটি পরা বিদ্যা। বিজ্ঞান অপরা বিদ্যাকে নিয়ে চলে আর পরা বিদ্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। কোন জাতি যদি একমাত্র পরা বিদ্যার

দিকেই সব কিছু চেলে দেয় সেই জাতির শক্তি হ্রাস হয়ে যাবে। আর পরা বিদ্যাকে অবহেলা করে শুধু অপরা বিদ্যার দিকে যদি বেশী চলে যায় তখন সেই জাতি পশুর মত হয়ে যাবে। যে জাতি বা সমাজ দুটো বিদ্যাকে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে, যেটা আগে হিন্দু সমাজে ছিল, সেই সমাজই জগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসবে, বাকি সমাজ গুলো নীচে পড়ে থাকবে। ঋষিরা ছিলেন জ্ঞানের মূর্তি। যাঁরা পরা বিদ্যাকে আদর্শ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, ঋষিদের কথা তাঁদের শুনতেই হবে। যারা অপরের পকেটের টাকা নিজের পকেটে নিয়ে আসাকে লক্ষ্য করেছে তাদের আমেরিকার ধন কুবেরদের কথা শুনতে হবে।

আজ যদি একজন এসে বলে আমি সিদ্ধ পুরুষ, আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক। এখন সে সিদ্ধ পুরুষ কিনা বোঝার কোন উপায় নেই, কিন্তু যে কথাগুলো বলছে সেগুলো সত্য কিনা বোঝা যাবে তিনটে শর্ত দিয়ে – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি মানে আগম প্রমাণ। আগম মানেই ঋষি বাক্য। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কিছু কথা বলেছেন, স্বামীজী কিছু কথা বলেছেন, সেই কথাগুলো আমরা মেনে নেবো কি নেব না? হ্যাঁ নেবো। কেন নেবো? কারণ তাঁদের চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিষ ছিল, যা কিনা তাঁকে ঋষির পদমর্যাদায় নিয়ে গেছে। প্রথম হল, তিনি যা কিছু বলছেন তা নতুন কিছু বলছেন না, তবে নতুন ভাবে বলছেন। নতুন কথা বলা আর নতুন ভাবে বলা দুটো এক জিনিষ নয়। যে কথাটা বলছেন দেখতে হবে আগেও কেউ সেই কথা বলেছেন কিনা। যেমন স্বামীজী সেবার কথা বলছেন, এটা নতুন কিছু কথা নয়। আমাদের শাস্ত্রও আগে বলছে গরীব লোকের সেবা কর। যুক্তি কি হবে? স্বামীজী বলছেন আত্মাই যদি সব হয়ে থাকেন, তুমি যদি সব কিছু হয়ে থাক তাহলে তুমি যাকে সেবা করছ সেতো তোমার ভাই নয়, সেতো তুমি নিজে। সেইজন্য যারা দুঃখ-কষ্টে আছ তাদের সেবা করাটাই তোমার কর্তব্য। আর অনুভূতি কি বলছে? স্বামীজী বলছেন আমি অনুভব করেছি সেবার্ধ একটা পথ। অপরকে সেবা করা, স্বামীজী নিজের অনুভূতি থেকে এই কথা বলছেন। স্বামীজী কক্ষণ বলছেন না, আমি বলছি তোমরা সেবার্ধ পালন কর। আজ স্বামীজী যে রামকৃষ্ণ মিশন তৈরী করে গেছেন, এতে লক্ষ লক্ষ লোকের কত ভাবে উপকার হচ্ছে। এটা স্বামীজীর অনুভূতি – সেবা করেও তোমার মুক্তি হবে। যুক্তিতে এই কথা দাঁড়াচ্ছে, শ্রুতিতে এর আগে আগে পরম্পরাতেও আছে। অনেকে বলতে পারেন – মুণ্ডকোপনিষদে তো বলছে ইষ্টাপূর্ত করে কিছু হয় না। মুণ্ডকোপনিষদে যে ইষ্টাপূর্তের কথা বলছে, সেই ইষ্টাপূর্ত কর্মে অনেক কামনা-বাসনা মিশে থাকে, কিন্তু স্বামীজী যে সেবা কার্যের কথা বলছেন তাতে কোন কামনা-বাসনা নেই। বরঞ্চ এর পেছন একটা জ্ঞান আছে, সেটা হল অদ্বৈতের ভাব।

আবার অন্য দিকে বলা যায়, মহম্মদ বলছেন আমি হলাম শেষ পয়গম্বর। তার মানে মহম্মদের পর আর কোন পয়গম্বর আসবেন না। কিন্তু ধর্মীয় পরম্পরাতে মহম্মদের আগেও অনেক পয়গম্বর এসেছেন, আগে যদি এসে থাকেন তাহলে পরেও আসতে পারেন। অনুভূতিতে কোথায় দাঁড়াবে? মহম্মদ বলছেন – আল্লা আমাকে বলেছেন তুমি আমার দূত। সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু মহম্মদই শেষ পয়গম্বর, এটা যুক্তিতেই দাঁড়াচ্ছে না। মহম্মদ যদি আল্লার দূত হন, মহম্মদের আগেও যদি আল্লা বা ঈশ্বরের দূতরা এসে থাকেন তাহলে মহম্মদের পরেও আল্লার দূত আসবেন না, এটাতো যুক্তিতেই দাঁড়াচ্ছে না। মহম্মদের এই উক্তি পুরো অযৌক্তিক, হিন্দুরা তো কখনই এই কথা মানতে পারবে না। খ্রিস্টান ধর্মে আবার আরও অযৌক্তিক কথা বলা হয়, যিশুর আগেও কেউ ছিলেন না, যিশুর পরেও কেউ আসবেন না। হিন্দুদের কাছে পরিষ্কার Three Taste of Truth। ভাই তোমার আগেও কেউ হয়েছিল কিনা, তোমার পরেও এই রকম হবে কিনা, আমিও তোমার অনুভূতি পেতে পারি কিনা আর যুক্তিতে দাঁড়াবে কিনা, এই সব কিছু যদি মেলে তবেই সেটা Truth।

আপনি বলতে পারেন, এটাতো আপনি হিন্দু মতে বলছেন, খ্রিস্টান মতে এগুলো taste of truth নাও হতে পারে। সে নাও হতে পারে, আমরা হিন্দু দর্শন নিয়ে আলোচনা করছি। আর আমাদের যোগ মতে আগম প্রমাণ যখন হবে, ঋষিদের কথাগুলো যখন আসবে তখন তিনি যে কথাগুলো বলছেন, সেই কথা আগের আগের ঋষিরাও বলেছেন, পরের ঋষিরাও বলবেন, অযৌক্তিক কিছু বলবেন না আর

তিনি নিজে সেটা প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। কিন্তু যেটা অনুভব করেছেন সেটা কী অনুভব? এই অনুভব কিন্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ নয়। আগম প্রমাণ সব সময় হয় অতীন্দ্রিয়ের ব্যাপারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কথা যদি ঋষি বলেন তার কোন মূল্য নেই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের ব্যাপারে জানার জন্য আমাদের ঋষিদের কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। গরুর দুধ কীভাবে দুইতে হবে এটা জানার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। বিজ্ঞানের কথা জানার জন্য পুরাণের কাছে আমি কেন যাব? ভূগোলের কথা জানার জন্য ভাগবতে যাওয়ার কী দরকার? তার জন্য বিজ্ঞানের বই আছে, ভূগোল বই আছে। ঋষির কাছে যাব ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কথা জানার জন্য, ইন্দ্রিয়রাজ্যের পারে কী আছে, ঐটাকে জানার জন্য আমাকে ঋষির কাছে যেতে হবে। নরেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ‘মহাশয়! আপনি কী ঈশ্বরকে দেখেছেন?’ তার মানে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের জ্ঞান আপনার আছে কি নেই। এখানে জ্ঞান মানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা নয়, অনুমান করেও জানা নয়, এখানে আসে অপরোক্ষানুভূতি, আপনি নিজে দেখেছেন। আগম প্রমাণে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্দ্রিয়াতীত জগতের জ্ঞানের কথাই ঋষিরা সব সময় বলবেন।

স্বামীজী এখানে বিভিন্ন শাস্ত্র বাক্যকে নিয়ে এসে নিজের জ্ঞানরাশির আলোকে নিজের তরফ থেকে বলছেন – এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি নিজেকে ‘আপ্ত’ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কিনা। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কিনা। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত সে ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা মনুষ্যজাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা। কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে উহা পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়া যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। প্রথম শর্ত তাঁর কথা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির সঙ্গে মিল থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের কথা বলা চাই। কোন সন্ন্যাসী যদি ম্যানেজমেন্ট, সাহিত্যের উপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় তাহলে সেই বক্তৃতার কোন মূল্য থাকবে না। তুমি ঋষি যদি হও তাহলে তোমার একমাত্র বিষয় হবে ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ। তৃতীয় হল তাঁকে নিঃস্বার্থ হতে হবে আর পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা হতে হবে। পবিত্রতা একটা জিনিষেই হয় – কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে। ঋষির যদি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হয়ে থাকে তাহলে তিনি ঋষি নন। উপনিষদেও বলছে শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্, তাঁকে শ্রোত্রিয় হতে হবে অর্থাৎ শাস্ত্র জ্ঞান থাকতে হবে আর সেই সাথে ব্রহ্মনিষ্ঠ হতে হবে। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠম্ তাঁর কখন মায়ানিষ্ঠা হবে না, কারণ ব্রহ্ম আর মায়া আলো আর অন্ধকারের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রহ্মনিষ্ঠম্ মানে যিনি স্বরূপে অবস্থান করে আছেন আর মায়ানিষ্ঠা মানে যিনি বৃত্তি জ্ঞানে অবস্থান করছেন। যিনি বৃত্তি জ্ঞানে বসে আছেন তাঁর এখনও জগতের প্রতি মায়া মমতা রয়েছে। জগতের প্রতি যার মায়া মমতা আছে তার মনের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চন আর নাম যশের লিপ্সা থাকবেই। যে সাধু টাকা-পয়সার জন্য ছটফট করছে, নাম-যশের পেছনে দৌড়াচ্ছে, মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এমন গুরু যদি আমাকে শাস্ত্র জ্ঞান দেয় তাহলে সেই শাস্ত্র শোনার আমার দরকার নেই। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি। পবিত্রতা আর নিঃস্বার্থপরতা নেই অথচ ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কথা বলে যাচ্ছে, তার কথা শুনে আমাদের কাজ নেই। আবার ঋষির কোন কথা যদি বিজ্ঞানে প্রমাণিত কোন কথার বিরোধী হয় তাহলে সেই কথাকে তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করতে হবে।

একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ আর আরেকজন আধ্যাত্মিক পুরুষ নন কিন্তু তিনিও খুব শান্ত শিষ্ট, সবারই প্রতি তাঁর করুণা আছে। আধ্যাত্মিক পুরুষও স্বাভাবিক ভাবেই খুব শান্ত শিষ্ট, তিনিও সবারই প্রতি করুণা সম্পন্ন। এই দুজনের মধ্যে তফাৎ কোথায় আর সেটা বোঝা যাবে কী করে? একজন মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে নিখুঁত আরেকজন আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে নিখুঁত। একজন সাধারণ লোক যখন দেখবে তখন কী করে বুঝবে? বোঝার কোন পথ নেই। আসল তফাৎটা হয় জ্ঞানে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াতীত জগত আর ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার জ্ঞান আছে। ঠাকুর বলছেন পিঠে গুলোকে বাইরে থেকে দেখলে একই রকম মনে হয়, কিন্তু কোনটার ভেতর কলাইয়ের পুর আর কোনটার মধ্যে ক্ষীরের পুর। একজন হলেন সত্ত্বগুণী লোক, তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে, আধ্যাত্মিক পুরুষ হলেন ত্রিগুণাতীত।

দুজনকে একটু নাড়া না দিলে কখনই আলাদা করে তফাৎ করা যাবে না। আর আপদ বিপদের সময় বোঝা যাবে, যিনি সত্ত্বগুণী লোক তিনি বিপদে নিজের ভারসাম্যটা হারিয়ে ফেলবেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ সর্বদা *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* গীতার এই বাক্যে প্রতিষ্ঠিত।

এতক্ষণ আমরা প্রমাণ বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। প্রমাণ বৃত্তি জ্ঞান লাভের সব থেকে বড় উৎস। এর আবার তিনটে উৎস – প্রত্যক্ষ থেকে, অনুমান থেকে আর আগু বাক্য অর্থাৎ আগম থেকেই মানুষ তার জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তার করে। পাঁচটি বৃত্তির মধ্যে ঠিক ঠিক বৃত্তি হল প্রমাণ বৃত্তি। প্রমাণ বৃত্তিই আমাদের জ্ঞানের ভিতকে মজবুত করে। সেইজন্য সব সময় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটির উপর বেশী জোর দিতে হয়। অর্থাৎ পড়াশোন নিয়মিত করতে হবে, সাধুসঙ্গ নিয়মিত করতে হবে, শাস্ত্রের কথা সাধু বা আচার্যের মুখে নিয়মিত শুনে যেতে হবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এগুলোও প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়ে। সেইজন্য আলতু-ফালতু সিনেমা দেখা, টিভি দেখা বন্ধ করে শ্রুতি প্রমাণ, আগম প্রমাণের দিকে বেশী করে জোর দিতে হবে। অনুমান প্রমাণকেও শাস্ত্রীয় বাক্যের চিস্তার কাজে প্রয়োগ করতে হবে। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও ততটাই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যতটা আমার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রমাণ বৃত্তি আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটে মিলিয়ে প্রমাণ বৃত্তি।

দ্বিতীয় বৃত্তি হল *বিপর্যয় – বিপর্যয়ো মিথ্যা জ্ঞানমতক্রপপ্রতিষ্ঠাম্।।৮।।* বিপর্যয় মানে *মিথ্যা জ্ঞানম*। যখন মিথ্যা জ্ঞানের উপর মিথ্যাটাই আসল জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সেটাই হয়ে যায় বিপর্যয় বৃত্তি। এই বিপর্যয়ও বাংলা বিপর্যয়ের যে অর্থ সেই অর্থে বলা হচ্ছে না। বেদান্তে দুটো খুব নামকরা উপমা দিয়ে বিপর্যয় বৃত্তি বা মিথ্যা জ্ঞানকে বোঝান হয় – সুক্তিকা রজতভ্রম আর রজ্জু সর্পভ্রম। অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখছি একটা দড়ি পড়ে আছে তাতেই সাপের ভ্রম হয়ে গেল, আর সুক্তিকা মানে ঝিনুকের উপর এমন ভাবে আলো পড়েছে যে দেখে মনে করছি রূপো পড়ে আছে। এই যে ভ্রম, আছে দড়ি কিন্তু দেখছি সাপ, এই ভ্রমটাই এক অন্য ধরনের বৃত্তি। বিপর্যয়ে মিথ্যা জ্ঞান এসে আমাদের পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। জিনিষটা যেটা আছে সেটাকে না দেখিয়ে অন্য আরেকটা কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে। বিপর্যয়ে বস্তু আছে, বস্তু যে নেই তা নয় কিন্তু যেটা আছে সেটা না দেখিয়ে দেখাচ্ছে অন্য আরেকটা। এটা কিন্তু বেদান্তের মায়্যা নয়, এখানে আমাদের সাধারণ বৃত্তির কথা বলা হচ্ছে। আর এটা প্রমাণও নয়, প্রমাণ হলে হয় প্রত্যক্ষ দেখাবে, নয়তো অনুমান হবে আর তা নাহলে আগু বাক্য হবে। বিপর্যয় বৃত্তিকে আমাদের সব সময় বিচার করতে হয়, যখনই কিছু দেখছি তখন ভালো করে বিচার করে দেখতে হয় আমি যেটা দেখছি এটা কি প্রমাণ বৃত্তি নাকি বিপর্যয় বৃত্তি।

আসল কথা হল, আমাদের বেশীর ভাগ বৃত্তিই বিপর্যয় বৃত্তি। নিজের স্ত্রীকে যদি কেউ মনে করে, আমার স্ত্রীর মত দ্বিতীয় আর কেউ নেই, এটাই বিপর্যয়, কারণ স্ত্রী মানেই মিথ্যা। আবার ভাবছি, অমুক জিনিষ পেলে আমার জীবনে শান্তি ফিরে আসবে, এটাও বিপর্যয়। একটা কিছু কল্পনা করছি, জিনিষটা যে রকম সে রকম না ভেবে অন্য কিছু ভাবছি, বাড়ির সবাই নিষেধ করে যাচ্ছে, এরকমটি করতে যেও না। কিন্তু আমি জানি আমাকে করতেই হবে, না করলে আমার বিপদ হবে, এটাই বিপর্যয়।

বিপর্যয় যে সারা জীবন আমাদের কীভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ভাবছি এই কাজটা যদি আমার হয়ে যায় তাহলে আমার শান্তি হয়ে যাবে, এই জিনিষটা যদি আমার হাতে এসে যায় তাহলে এবার আমি নিশ্চিত থাকতে পারব। কিন্তু কোন দিন এই কাজ হবে না আর কোন কিছুই আসবে না। এটাই মিথ্যা জ্ঞান, এটাই বিপর্যয়। ভাবছি, যদি একবার কোন রকমে চার ধাম করে নিতে পারি, একবার যদি গঙ্গাসাগর করে নিতে পারি, একবার যদি অমুক বাবাজীর দর্শন করে নিতে পারি তাহলে আমার সব দুঃখ-কষ্ট চলে যাবে। এগুলো সব বিপর্যয়। এসব করে কিছুই হবে না, জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলবে। আজ পর্যন্ত কারুর কিছু পাল্টায়নি আপনারও পাল্টাবে না। এই বিপর্যয়ের উপরেই সব সাধু-বাবাজীরা করে খাচ্ছে – কাউকে এই তাবীজ দিচ্ছে, কাউকে এই পাথর দিচ্ছে, কাউকে মালা দিচ্ছে, কাউকে এই যন্ত্র সেই যন্ত্র দিচ্ছে। এটাই বিপর্যয়। স্বয়ং

অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের কষ্ট ঘোচাতে পারলেন না, তাঁর শিষ্যদের কোন জাগতিক কষ্টের লাঘব করতে পারলেন না আর সেখানে এই বাবাজী সেই বাবাজীরা বাজারে নেমে পড়েছে লোকেদের সব সমস্যার রাতারাতি সমাধান করে দিতে, তা কি কখন সম্ভব! যখন আপনি অমুক বাবাজীর কাছে, অমুক ফকিরের কাছে দৌড়ে যাচ্ছেন, এই বাবাজী আমাকে এই করে দেবে, এই ফকির বাবা আমার এই ভালো করে দেবে, এই মন্দিরে সেই মন্দিরে মাথা ঠুকে ভাবছেন ভগবান আমার সব দুঃখ দূর করে দেবেন – এগুলো সব বিপর্যয়। যারা বিয়ে করেছে বিয়ের পর তারা কাঁদছে, যাদের বিয়ে হচ্ছে না তারা কাঁদছে, এই জীবনে আমার আর বিয়ে হল না বলে – সব বিপর্যয়।

বিপর্যয় থেকে আরও বাজে হয় বিকল্প বৃত্তিতে। *বিকল্প হল – শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।।৯।।* বস্তুশূন্য ভাব। বিকল্পে বস্তু নেই, আছে শুধু শব্দ জ্ঞান। প্রথমে হল সত্য জ্ঞান, দ্বিতীয় হল মিথ্যা জ্ঞান, তৃতীয় বৃত্তিতে আদপেই কিছু নেই তা সত্ত্বেও মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে। আমাকে কেউ গাধা বলে দিল, শুনে আমি চটে লাল হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সাথে গাধার কোন মিল নেই তবুও আমার মনের মধ্যে তোলপাড় হয়ে গেল শুধু আমাকে গাধা বলা হয়েছে বলে। পঞ্চতন্ত্রের একটা কাহিনীতে সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ভিখারী ছিল। ভিক্ষে করে বাড়ি এসে কিছু ছাতু একটা মাটির হাড়িতে রেখে দিত। এইভাবে জমাতে জমাতে হাড়িটা প্রায় অর্ধেক ভরে গেছে। একদিন সেই ভিখারী ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে আর বিমোতে বিমোতে ভাবতে শুরু করল – আর তো কয়দিন, এর পর হাড়িটা ছাতুতে ভরে যাবে, তারপর হাড়িটা আমি বিক্রী করব, আমার কটি টাকা হবে, সেই টাকা দিয়ে আমি একটা গরু কিনব, ওই গরু দুধ দেবে, সেই দুধ দিয়ে এই করব, সেই করে এই হবে, তার থেকে এই হবে সেই হবে, সেখান থেকে আমার জমি হবে, বাড়ি হবে, তারপর আমি বিয়ে করব, বিয়ে করার পর আমার চারটে বাচ্চা হবে, বাচ্চারা হুটোপাটি করবে, আমি তখন আমার স্ত্রীকে ধমক দেব – তুমি তোমার বাচ্চাগুলোকে সামলাতে পারছো না, এই দেখ আমি এক্ষুণি সোজা করে দিচ্ছি – এই বলে সে একটা ডাঙা নিয়ে দুম্ব করে মারতে এমন ভাবে চালিয়েছে যে ডাঙাটা ছাতুর হাড়ির উপর পড়তেই হাড়িটা ভেঙে সব ছাতু মেঝেতে ছড়িয়ে গেছে। ওখানেই তার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। এগুলো হল বস্তুশূন্য ভাব, কোথাও কিছু নেই শুধু মনের মধ্যে কতকগুলো শব্দ তৈরী হয়েছে। শেয়ার মার্কেটে তাও কিছু আছে কিন্তু এখানে কিছুই নেই তাতেই সেই লাফাতে শুরু করেছে।

স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন – একটা কথা *শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থ বিচার করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছি।* স্বামীজী বলছেন – যারা দুর্বল চিত্তের তারাই এই রকম করে। এদের নিজের চিত্তের বৃত্তির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। চিত্ত আর তার বৃত্তি এক হয়ে যায়, যেমন সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ কখন আলাদা থাকে না। বিকল্পের ক্ষেত্রে কি হয় – বাসে একজন যাত্রী আমাকে বলল ‘আপনি কি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না’? আর যায় কোথায়, এরপর আমার মেজাজ যে কোথায় চড়ে যাবে কোন ঠিকানা থাকবে না ‘কী বললেন! আমি চোখে দেখতে পাই না! আমার চোখ আছে কিনা আপনাকে দেখিয়ে দেব’? এখানে বস্তুশূন্য। আমি সত্যিই কী চোখে দেখতে পাই না? অন্ধকে অন্ধ বললে তার মনে আঘাত লাগার যুক্তি আছে। আমাকে যদি কেউ বলে ‘তুমি একটা চোর’। এবার আমি যদি রেগে যাই তাহলে সন্দেহ হবে নিশ্চয়ই চুরির ব্যাপারে আমি জড়িত। আপনাকে কেউ মিথ্যাবাদী বলে দিল। ‘কী আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বললেন’! মানে আপনি তেতে গেছেন। আপনি তেতে গেলেন কেন ভেবে দেখেছেন? আপনি তেতে যাচ্ছেন মানে দুটো জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে – হয় আপনার চিত্ত অতি দুর্বল আর তা নাহলে আপনি মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদী বললে রাগবেই রাগবে। আপনাকে কেউ চোর বলে দেওয়ার পর আপনি যদি রেগে যান তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে। মানুষ কখন চটে যায়? যখন তার মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকে। দুর্বলতা না থাকলে চটেবে না। বিকল্প বৃত্তি শুধু মাত্র শব্দজ্ঞানেই তৈরী হয়ে যাচ্ছে। বিকল্পে আমরা বিচারও করি না।

বিকল্পের খারাপ দিকটা বলা হল, কিন্তু এর ভালো দিকও আছে। বিকল্প বৃত্তি মানে কল্পনার জগৎ, কল্পনা জগতের ভালোর দিকে গেলে সে খুব ভালো সৃজনশীল হয়ে যাবে। বিপর্যয়েও তাই হবে। কবি কত কিছু কল্পনা করে করে সুন্দর একটা কবিতা রচনা করে দিচ্ছেন। যাঁরা শিল্পী, তাঁরাও একটা কিছু দেখে নিলেন, তারপর সেটাকে নিয়ে কল্পনার জগতে চলে গেলেন তারপর সেখান থেকে একটা সুন্দর ছবি দাঁড় করিয়ে দিলেন। এনারাও বিকল্প ও বিপর্যয়ের মধ্যেই পড়ে আছেন। তাই বলে কবি বা শিল্পীদের চিত্ত কি দুর্বল? ঠিকই, শিল্পী বা কবিদের চিত্ত দুর্বল থাকে বলে তাঁদের ব্যক্তিত্বে সেই জোর থাকে না। প্রচণ্ড আবেগ প্রবণ হন বলে একটু কিছুতেই তাঁরা ধৈর্য হারা হয়ে পড়েন। যাঁদের মধ্যে বিকল্প ও বিপর্যয় বেশী থাকে তাঁরাই সাহিত্য, কবিতা, গান রচনা করতে পারবেন। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকরা কল্পনার জগতেই বেশী বিচরণ করেন, আর কল্পনার জগতে বিচরণ করা মানেই বিকল্প বিপর্যয় বৃত্তিগুলো প্রবল। কিন্তু আমরা এখানে জগৎকে নিয়ে কথা বলছি না, যাঁরা যোগী হতে চাইছেন তাঁদের কথাই আমরা আলোচনা করছি। যোগের ক্ষেত্রে বিকল্প ও বিপর্যয় বৃত্তি একেবারেই চলবে না।

চতুর্থ বৃত্তি *নিদ্রা* – *অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা*।।১০।। নিদ্রাও অত্যন্ত প্রভাবশালী বৃত্তি। নিদ্রা বৃত্তি হল অভাব প্রত্যয়, প্রত্যয় মানে বোধ বা জ্ঞান। এখন কোন বৃত্তি নেই ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মানে নিদ্রাতে আমার জগৎটা অভাব বোধে চলে গেছে। জগৎ থাকছে, চোখ খোলা থাকলেও আমার কোন বোধ নেই, চোখ বন্ধ থাকলেও কোন বোধ থাকছে না। ঠাকুর বলছেন – ঘুমিয়ে পড়লে মুখে কেউ প্রস্রাব করে দিলেও কোন হুঁশ হয় না। কেন হয় না? জগতের কোন বোধই নেই। নিদ্রাবৃত্তির আবার স্বপ্নাদি আছে। কিন্তু এখানে যে নিদ্রার কথা বলছে আসলে এখানে সুষুপ্তির কথা বলা হচ্ছে। স্বপ্ন আর সুষুপ্তি দুটোই অভাব বৃত্তি। স্বপ্নাবস্থায় বহির্জগতের অভাব হয়ে যায় আর সুষুপ্তিতে স্বপ্নাবস্থার বোধটাও চলে যায়। স্বামীজী বলছেন যে জিনিষকে আগে আমরা বোধ করিনি, সেটা আমরা কখনই স্বপ্নে দেখিনি। আপনি হয়তো বলবেন, ‘তা কেন হবে, আমি তো সেদিন স্বপ্নে দেখলাম আমার বন্ধু যাচ্ছিল হঠাৎ সে বাঘ হয়ে গেল। আমি তো আগে বন্ধুকে কখন বাঘ হতে দেখিনি’। আপনি এটা কেন বুঝতে পারছেন না যে, আপনি যদি আগে বন্ধুকে বাঘ হতে দেখে থাকেন আর সেটাই যদি স্বপ্নে দেখে থাকেন তাহলে সেটা তো আর স্বপ্ন হবে না। স্বপ্ন মানে, আপনি বাঘও জানেন, বন্ধুও জানেন, সব জানা মিলিয়ে একটা কিন্তু কিছু হওয়া। স্বপ্নে এই রকমই হয়, হাজার রকমের জিনিষ আপনার জানা আছে, সব জানাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা অন্য ধরণের বোধ হয়। সারাদিন মন প্রমাণ, বিপর্যয় ও বিকল্প বৃত্তিতে চঞ্চল হয়ে থাকে, কিন্তু একটা সময় মনও একটু শান্তি পেতে চায়, অভাব চায়। তখন মন নিদ্রাবস্থায় চলে যায়। এখানে যোগ যেভাবে অভাবকে বলছে বেদান্ত এভাবে অভাব প্রত্যয়কে নেয় না, তারা বলবেন অভাবটাও একটা প্রমাণ। যোগ অভাবকে প্রমাণ বলে নেয় না। যোগের কাছে অভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়বে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা অনেক কিছুকে নিয়ে কল্পনা করে যাই, জাগ্রত অবস্থার এই কল্পনা গুলোই ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন রূপে আসে। সুপ্ত আর স্বপ্নাবস্থা দুটো একই জিনিষ। যখন অভাব প্রত্যয় হয় অর্থাৎ আপনার যখন কোন বোধ নেই তখনই এই দুটো অবস্থা আসছে। আমি ঘুমিয়ে আছি এই বোধটাও তখন থাকবে না। নিদ্রাভঙ্গের পর বোধ হবে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।

শেষ ও পঞ্চম বৃত্তি হল *স্মৃতি* বৃত্তি – *অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ*।।১১।। এগারো নম্বর সূত্রে যে স্মৃতি বৃত্তির কথা বলছে, এটি প্রচণ্ড জোরালো একটি বৃত্তি। আগের চারটে বৃত্তির সব কটি থেকে এই স্মৃতি বৃত্তি আসে। এই চারটে থেকে চিন্তে যে বৃত্তিগুলো উঠছে আর সেখান থেকে যে অনুভূতি হচ্ছে সেগুলোই আবার সংস্কার রূপে চিন্তে জমা থাকে। যখনই কোন সুযোগ পেয়ে যাবে, কোন কাজ করছে না, চুপচাপ বসে আছে তখন চিন্তে জমে থাকা বৃত্তিগুলো মনের মধ্যে স্মৃতি বৃত্তি হয়ে উঠে আসে – আগে আগে যত ধরণের অনুভূতি হয়েছে – কি করেছিলাম, আমার সাথে অপরে কি কি করেছে, আমাকে কি কি করতে হবে এই সব নানান স্মৃতির মধ্যে মনটা ঘুরতে থাকে। এর আগে আগে যা কিছু আমাদের অনুভব হয়েছে তার কিছু জিনিষ হারিয়ে গেছে আবার কিছু অনুভব সংস্কার রূপে চিন্তে জমা হয়ে আছে। সংস্কার বশতঃ বা অনুকূল সুযোগ পেলে সেই অনুভূতি গুলো যখন চিন্তের মধ্যে

ফিরে আসে তখন সেটাকেই বলছে স্মৃতি। আমাদের মস্তিষ্ক সব কিছুকে ধরে রাখে না, যে অল্প কিছুকে ধরে রাখে তার সব ব্যাপারে আমরা সব সময় সজাগ নই। যেগুলোর ব্যাপারে সজাগ থাকি সেগুলো প্রমাণ বৃত্তিতে চলে যাচ্ছে। যেগুলোর ব্যাপারে সজাগ নই কিন্তু আছে, সংস্কার বশতঃ যখন সেগুলো চিত্তের উপর ভেসে উঠে আমাদের মনকে ধাক্কা দেয়, এটাই স্মৃতি। এই স্মৃতি আবার চার রকমের হয়, প্রমাণের ব্যাপারেও চার রকম হবে আর বিপর্যয়, বিকল্প আর নিদ্রার ব্যাপারেও হবে।

এখানে যে স্মৃতি বৃত্তির কথা বলা হল, এই স্মৃতি নিজে কখন একা চলতে পারে না, বাকি চারটে বৃত্তির যে কোন একটা থেকে স্মৃতির জন্ম হয়। যেমন কেউ ভালো স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্ন আসলে নিদ্রাবৃত্তি, ঘুম ভাঙার পর সে এখন সেই ভালো স্বপ্নের স্মৃতির উপরে বসে আছে। অথবা রাতে ভালো ঘুম হয়েছে, সকালে ঘুম ভাঙার পর সেই ভালো ঘুমের স্মৃতিকে অবলম্বন করে বলছে – ওঃ কাল রাতে কি দারুণ ঘুম হয়েছে। এই স্মৃতি আসছে নিদ্রাবৃত্তি থেকে, নিদ্রা নিজে অভাব বৃত্তি থেকে আসছে, মনের ভেতরে তখন কিছু ছিল না, মনটা শূন্য অবস্থায় ছিল, তার কিছু মনে নেই। নিদ্রা যদিও অভাব বৃত্তি, কিন্তু অভাব বোধটাই স্মৃতি হয়ে ফিরে আসছে। এখানে মজার ব্যাপার হল যোগ অভাবকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে না, একমাত্র বেদান্তই অভাবকে প্রমাণ রূপে নেয়। কিন্তু যোগশাস্ত্রে বৃত্তিতে এসে অভাব বোধ প্রচণ্ড একটা ভূমিকা নিয়ে নিচ্ছে। যেমন রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ার পর আপনার কোন জ্ঞান ছিল না, ঘুমে কি হয়েছে কিছুই মনে নেই। কিছু মনে নেই মানে অভাব বৃত্তি, কিন্তু এই অভাবকেও আপনি মনে রেখেছেন। সেইজন্য বলে, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প আর নিদ্রা এই চার রকম বৃত্তি থেকে যেসব জিনিষ অনুভব হয়েছে তার অনেক কিছু সংস্কার রূপে চিত্তে জমা হয়ে থাকে। সময় হলে সেই সংস্কারগুলো অনেক সময় জেগে ওঠে, এটাই স্মৃতি। প্রমাণের তিনটে প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ আর শব্দ প্রমাণ এই তিনটেই স্মৃতিতে থাকে। বিপর্যয়, মানে মিথ্যা জ্ঞান সেটাও স্মৃতিতে থাকে। পাঁচ দিন আগে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা দড়ি দেখে আপনার সাপ মনে হয়েছিল, আপনি ভয় পেয়েছিলেন। এটা আপনার মিথ্যা জ্ঞান কিন্তু স্মৃতিতে থেকে গেছে। বিকল্পও স্মৃতিতে থাকে। আমাকে দশ বছর আগে গাধা বলেছিল আমি কিন্তু ভুলে যাইনি। কম্পিউটার ছেলে না মেয়ে ইদানিং এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। শেষে প্রমাণিত হল যে কম্পিউটার মেয়ে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছে, আপনি যদি আপনার স্ত্রীর কাছে কোন ভুল করেন কুড়ি বছর পরেও স্ত্রী সেটা মনে রেখে দেবে। আর সেটা এমন উপযুক্ত সময়ে বার করে আনবে যেখানে আপনাকে বেইজ্জত করে ছেড়ে দেবে। কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভে ঠিক তাই হয়। আপনি কম্পিউটারে যা যা ভুল করছেন তার সব কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভে রেকর্ড হয়ে থাকবে। কোন দিন ওটা ওখান থেকে মুছে যাবে না। স্ত্রীকে আপনি হয়তো দুটি মন্দ কথা বলেছিলেন, সেটাকেও কুড়ি বছর পরে আপনাকে শোনাতে ছাড়বে না – তোমার ওই কথায় আমি কি কষ্ট পেয়েছিলাম তুমি বুঝতে পারবে না, এখনও মনে করলে আমার শরীরে জ্বালা ধরে যায়। এটাই বিকল্প বৃত্তি স্মৃতি হয়ে থেকে গেছে। কয়েকটা শব্দ মাত্র, সেই শব্দের অর্থও হয়তো যাকে বলা হচ্ছে তার কাছে স্পষ্ট নয়, তাতেই এই অবস্থা। অবশ্য যোগে যে নিদ্রাবৃত্তির কথা বলা হয় সেই নিদ্রাতে কোন স্বপ্নাদি কিছু থাকে না, এখানে যদিও সুষুপ্তি শব্দটাকে ব্যবহার করছে না, কিন্তু সুষুপ্তির বৈশিষ্ট্যকেই শুধু নিয়ে আসা হয়েছে। মানুষ যখন কোন কারণে শারীরিক বিপর্যয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সেই অজ্ঞান অবস্থাটাকেও এখানে ধরা হচ্ছে না।

আমাদের মস্তিষ্কে মনের যে কাজ চলছে, আসলে কাজ মানে এই পাঁচ রকমের বৃত্তি মনের মধ্যে নিরন্তর উঠছে। যোগের লক্ষ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ। বৃত্তি নিরোধ মানে একটা দুটো বৃত্তিকে আটকালে চলবে না, এই পাঁচ রকমের বৃত্তির সব কটি বৃত্তিকে নিরোধ করতে হবে। এই কথা শোনার পর অনেকেই চমকে উঠবে, কী বলছেন আপনি স্মৃতিকেও মন থেকে মুছে দিতে বলছেন? হ্যাঁ তাই, সমাধি অবস্থায় স্মৃতিও থাকবে না। শুধু তাই নয়, নিদ্রাবৃত্তিও থাকবে না, সব সময় একেবারে সজাগ। কোন ধরণের কল্পনা চলবে না। আরও বড় ব্যাপার হল কোন প্রমাণ বৃত্তিও থাকবে না। আমি জগৎ থেকে যা কিছু পাচ্ছি, কোন শ্রুতি প্রমাণ চলবে না, তারও আগে আগে শাস্ত্র থেকে যত কথা শুনে এসেছি আর তার যেগুলো স্মৃতিতে পড়ে আছে সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে যাবে। যে লোকটি গাঁজা খেয়ে বা মদের নেশা

করে বৃন্দ হয়ে পড়ে আছে, তার মনেও তো এখন কোন চিন্তা ভাবনা নেই, তাই বলে কী একে আমরা চিন্তবৃত্তি নিরোধ বলব বা সমাধির অবস্থা বলতে যাব? কখনই নয়। কারণ তার এখন কোন বোধ নেই, এটাই অভাব প্রত্যয়। যদিও নিদ্রা বৃত্তিকে অভাব প্রত্যয় বলছে, এখানেও তার সব কিছুই অভাব বোধ হয়ে যাচ্ছে। যখন মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে, এ্যনাস্থেসিয়া দিয়ে অজ্ঞান করার পরেও সব কিছুই অভাব হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সমাধির অবস্থায় এই অভাব বৃত্তিও থাকবে না, অভাব বৃত্তিটাও না হয়ে যাচ্ছে। আমরা এতক্ষণ এই পাঁচ রকম বৃত্তির আলোচনা করলাম। যোগদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল – এই পাঁচ রকমের যত বৃত্তির কথা বলা হয়েছে এর সব কটি বৃত্তির নিরোধ করাটাই যোগ।

এখন এই পাঁচটা বৃত্তিকে নিরোধ করব কি করে? মনের নিয়ন্ত্রণ মানে চিন্তের নিয়ন্ত্রণ। কারণ মন যেটাকে পুরোপুরি জড়িয়ে ধরে থাকে সেটাই চিন্ত। তাই চিন্তের নিয়ন্ত্রণ মানে মনের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এই চিন্তকে নিয়ন্ত্রণ করবে কী ভাবে? কারণ চিন্তে ক্রমাগত চেউ উঠেই চলেছে। এখান থেকে দু চারটে ভালো ভালো কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে যেই বাসে উঠছি সঙ্গে সঙ্গে অত লোকের কিচির মিচির, অতগুলো লোকের ভালো মন্দ ব্যবহার, সৎ ব্যবহার, খারাপ ব্যবহার সব মনের মধ্যে ঢুকছে, অনবরত বাইরে থেকে চিন্তের মধ্যে বসিং হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় চিন্তকে কী করে শান্ত করা সম্ভব আর নিয়ন্ত্রণই বা কি করে হবে! অন্য দিকে সমাধিবান পুরুষদের চিন্ত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁদের বাইরের জগতের ব্যাপারে কোন বোধই নেই, গায়ে মশা কামড়ে রক্ত টেনে যাচ্ছে কোন বোধই নেই, ঠাকুর ধ্যান করছেন তখন পাখি খাবারের খোঁজে মাথায় এসে নিশ্চিন্তে বসছে, ঠাকুরের কোন হুঁশই নেই। সমাধিতে চিন্ত সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ যোগ যে চিন্তবৃত্তি নিরোধের কথা দ্বিতীয় সূত্রে বলছে সেই চিন্ত এখন পুরোপুরি নিরোধ হয়ে গেছে।

সমাধিবান পুরুষদের থেকে যাঁরা একটু নীচে তাঁদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। মনের নিয়ন্ত্রণ মানে, চোখে একটা কিছু দৃশ্য এসেছে, এসে গেছে তো এসেছে সেই নিয়ে তিনি আর বেশী বিচার করতে যাবেন না, দুনিয়ার সব খবর নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হবেন না। মনকে সব সময় বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বুদ্ধি সব সময় পাকা হয় শাস্ত্র বাক্য ও গুরু বাক্যে বা নিজের বিচারের দ্বারা। বিচার যেটা হবে সেটাও হবে শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশকে আধার করে। আপনি মা-বাবার কাছে কিছু শিক্ষা পেয়েছেন, গুরুর কথা শুনেছেন বা ভালো বই পড়েছেন, সেখান থেকে আপনি শিক্ষা পেয়েছেন কারুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে নেই। এটাই আপনার বুদ্ধি হয়ে গেল। এখন একজন দুর্ব্যবহার করছে দেখে আপনি বিচার করছেন এটা কি ভালো ব্যবহার নাকি খারাপ ব্যবহার, কিন্তু এই ব্যাপারে আপনার বুদ্ধি তৈরী হয়ে আছে তাই আপনার বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছে এটা দুর্ব্যবহার। আপনাকে কেউ ঘুষ দিতে চাইছে, তখনও আপনি বিচার করতে শুরু করেছেন ঘুষ নেওয়াটা কি ভালো না খারাপ, তখন আপনার বুদ্ধি বলছে – শাস্ত্র বলছে অন্যায় ভাবে উপার্জিত ধন কখনই কাছে রাখতে নেই। এদিকে বাড়িতে বউ অনেক দিন ধরে আপনাকে বলে যাচ্ছে তার একটা দামী গয়না দরকার, গয়না না দিলে অশান্তি সৃষ্টি হবে। এবার আপনার মনে দ্বন্দ্ব লেগে গেল। একটা মন বলছে চুরি কর, আরেকটা মন বলছে চুরি করো না। মন আর বুদ্ধির লড়াই হলেও আসলে মনেরই লড়াই। এখানে এসেই বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে যায়। বুদ্ধির জোর যত বেশী হবে তত আপনি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবেন। বুদ্ধি বলছে – তুমি কিছুতেই চুরি করবে না, কারণ তোমার স্ত্রী তোমার গুরু নয়, তোমার গুরু হলেন তোমার মা-বাবা আর শাস্ত্র। এনারা কখনই তোমাকে এই কাজ করতে বলবেন না। যার বুদ্ধির যত জোর তার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ তত বেশী।

কিন্তু আমাদের সমস্যা হল, মন আমাদের চঞ্চল আর বুদ্ধিও অত শক্তিশালী নয়। বুদ্ধিকে পাকা করা হয়নি বলে বুদ্ধির কথা অমান্য করছি। অহঙ্কারে সব সময় রাগ আর দ্বেষ লেগে আছে, কোন জিনিষের প্রতি পছন্দ আছে আবার কোন জিনিষকে অপছন্দ করছে। পছন্দ করলে তার দিকে এগোতে চায়, অপছন্দ করলে তার থেকে দূরে থাকতে চায়। অহঙ্কারকে কোপ মারতে হয়, অহঙ্কারে কোপ মারা মানে পছন্দ অপছন্দের তালিকাটা ছোট করে আনা, কোন কিছুতে বেশী জড়াতে নেই। ভালো গাড়ি

আমাদের চোখে পড়বেই। ঠাকুরের চোখেও পড়ত। হৃদয়রাম তাঁর মামাকে দেখাচ্ছেন – মামা! মামা! ওই দ্যাখো লাট সাহেবের বাড়ি। ঠাকুর দেখলেন মাটির টিপি। আমি আপনি কোন দিন লাট সাহেবের বাড়িকে মাটির টিপি দেখব না। এখানে ঠাকুরের চিত্তও পুরো নিয়ন্ত্রণে আছে, চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্য হচ্ছে না। একটা ভালো গাড়ি কিংবা বাড়ি চোখে পড়লে আমাদের মন নানান রকম কথা ভাবতে শুরু করে দেবে – এই রকম একটা বাড়ি করতে পারলে কেমন হত! তখন বুদ্ধি বলছে, দেখো ভাই! এই রকম বাড়ি করতে অনেক টাকার দরকার, এত টাকা তুমি কোথা থেকে জোগাড় করবে! কিন্তু অহঙ্কার বলছে – না! আমার এরকম জিনিষ চাইই চাই। অহঙ্কারকে এই জায়গাতে কোপ মারতে হয়। যাদের মন দুর্বল তাদের অহঙ্কারকে মারতে হয় আর বুদ্ধি বৃত্তিকে বাড়াতে হয়। বুদ্ধি কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে মনের চাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। মনের উপর ঠিক ঠিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে চিত্তে কোন রকম ক্ষোভ সৃষ্টি হয় না। তত্ত্ব প্রাপ্য শুভাশুভম্, রাহা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন শুভ জিনিষও চোখে আসছে অশুভও আসছে, কিন্তু কোন কিছুই আপনার মনকে চঞ্চল করছে না। বেশীর ভাগ সময় যখন আমরা আলোচনা করব তখন মন বলতে আমরা চিত্তকেই বোঝাব। মানব জীবন দু ভাবে চলে – বৃত্তি রূপে অবস্থান আর স্বরূপে অবস্থান। যোগসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে দেখাচ্ছে আমরা কীভাবে বৃত্তি রূপে অবস্থান করি আর তৃতীয় সূত্রে দেখাচ্ছে কীভাবে স্বরূপে অবস্থান করি।

বৃত্তি জ্ঞান মানে মস্তিষ্কের কোশিকার জ্ঞান, কিন্তু সচ্চিদানন্দের জ্ঞান মস্তিষ্ক দিয়ে হয় না। মস্তিষ্কের কোশিকার মাধ্যমে যখন সচ্চিদানন্দের জ্ঞান হবে তখন সাকার রূপে দর্শন হবে। ঠাকুর যখন মস্তিষ্কের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দকে দেখছেন তখন দেখছেন মা কালীকে, তখন আর অখণ্ডকে দেখছেন না। অখণ্ডকে দেখতে গেলে তাঁকে সমাধির অবস্থায় যেতে হবে, তখন তাঁকে মস্তিষ্কের বাইরে যেতে হবে। মস্তিষ্কে আসা মানেই আপনি পাল্টে গেলেন। আপনাকে আমি যখন দেখছি তখন এক রকম দেখব, কিন্তু যখন ভালো ক্যামেরা নিয়ে আসব তখন কিন্তু আপনি ক্যামেরার লেন্সে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। যত বড় স্ক্রিন নিয়ে আসা হোক না কেন, জিনিষটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে। মন যতই উচ্চ হোক, যখন মন দিয়ে সচ্চিদানন্দকে দেখবে তখন এটাই ছবি দেখার মত হয়ে যাবে, আসলটা আর থাকবে না। ক্যামেরার ল্যাপ্সের মত মনের ছোট্ট লেন্স দিয়ে আসবে। আর তার অনুভবও অন্য রকম হবে। কিন্তু যাঁর এখনও সচ্চিদানন্দের বোধ হয়নি তিনি জিনিষটাকে অন্য রকম দেখবেন। যিনি সচ্চিদানন্দকে বোধে বোধ করেছেন তিনি অন্য রকম দেখবেন। আমরা বলতে পারি যে, কই আমি তো এটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তখন ওই একই উপমা ব্যবহার করতে হয় – আপনি আমাকে যখন দেখছেন তখন আমাকে এক রকম দেখছেন, কিন্তু আমার ছবি যদি দেখেন, যদিও আমারই ছবি, তবুও আপনার আমাকে আলাদা বোধ হবে। স্বপ্নে যখন আপনি আমাকে দেখবেন তখন আবার পুরোপুরি অন্য রকম দেখবেন। একই মানুষ কিন্তু আমরা কত ভাবে দেখছি। আমাকে সামনা সামনি দেখলে এক রকম, চিন্তা করলে আরেক রকম, চোখ বন্ধ করলে অন্য রকম, ছবিতে এক রকম আর স্বপ্নে আরেক রকম। সচ্চিদানন্দও ঠিক সেই রকম। বই পড়ে এক রকম, চিন্তা করে এক রকমের ধারণা হবে, স্বপ্নে আরেক রকম ধারণা হবে, চিন্তা করে করে স্বপ্নে দেখলে অন্য রকম ধারণা আর বোধে বোধ করলে অন্য এক ধারণা হবে। আর বোধে বোধ হওয়ার পর চিন্তা করলে আরেক রকম ধারণা হবে। জিনিষটা এভাবেই চলে। বোধে বোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক আর বৃত্তি জ্ঞান অস্বাভাবিক। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বৃত্তি জ্ঞান আমাদের স্বাভাবিক আর বোধে বোধটা অস্বাভাবিক। যিনি চৈতন্য তিনি তো সব সময় নিজেকে জানেন। স্বরূপ জ্ঞানটাই স্বভাব, কিন্তু তুমি নিজেকে ভুলে গেছ।

এই পাঁচটা বৃত্তিকে থামিয়ে দেওয়াই যোগ। পাঁচ রকমের বৃত্তির সব কটি বৃত্তিকে যখন আটকে দেওয়া হবে তখনই হবে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান জেগে যাবে। যোগ মনকে খুব technically নিয়েই বেশী চলে। সেইজন্য মনের শ্রেণিবিভাজনটা যোগের পক্ষে খুব জরুরি হয়ে পড়ে, সব কিছুকে যার যার নিজের নিজের খাপে খাপে রেখে দেওয়া না হলে পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবে। মনের যেখানে ছাপ পড়ে আছে, এর নাম চিত্ত। যোগের লক্ষ্য হল এই চিত্তে যেন কোন বৃত্তি না ওঠে। আমি এবার একটা গুহায় গিয়ে থাকতে শুরু করলাম, চোখ, কান সব বন্ধ করে গুহায়

পড়ে আছি। তাহলে মোটামুটি আমরা ধরে নিচ্ছে প্রমাণ বৃত্তি আর আসবে না, কারণ ইন্দ্রিয়ে দিয়ে কিছু আসার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারুর সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু বাকি জিনিষগুলো তো থেকেই যাবে – বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা আর স্মৃতি এই চারটে তো চলে যাবে না। এই চারটেকে চেষ্টা করে নাশ করতে হবে। তার মানে চিন্তে যেন কোন বিকার না আসে, কোন বৃত্তি যেন না ওঠে। কিন্তু এভাবে কেউ কখন চিন্তের বৃত্তিকে নাশ করতে পারবে না। মন এমনই এক জিনিষ যে, মন কখন ফাঁকা থাকতে পারে না, সম্ভবই নয়। সাইকেল যতক্ষণ চলতে থাকবে পড়ে যাবে না, কিন্তু দাঁড় করিয়ে দিলে পড়ে যাবে। মন ঠিক তেমনি, সব সময় চলতে থাকবে। চাঞ্চল্যতা মনের স্বাভাবিক অবস্থা, চাঞ্চল্যতা তার স্বভাবেই লেগে আছে। আর যদি মনকে থামিয়ে দেওয়া হয়, মন শেষ হয়ে যাবে। সাইকেলকে তাও স্ট্যাণ্ড দিয়ে বা কোন কিছুর সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, মনকে কিন্তু সেইভাবে কখন দাঁড় করান যাবে না। কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য হল, যাঁরা যোগের পথে সাধনা করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য হল মনকে থামান।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলনই আধ্যাত্মিক সাধনা

কিন্তু থামাবার উপায় কী? ঠাকুরকেও একজন বলছেন – মন তো নিয়ন্ত্রণে আসে না, উপায় কী? ঠাকুর বলছেন – কেন অভ্যাসযোগের কথা আছে না, আর বৈরাগ্য! একটা জিনিষকে বারবার করাটা অভ্যাস আর যেটা আমার বস্তু নয় সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ, এটাই বৈরাগ্য। অভ্যাস আর বৈরাগ্য এই দুটোর কথা একই সাথে গীতাতেও বলা হয়েছে। যোগশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে আমাদের সূত্রাকার বলছেন **অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।।১২।।** এখানে যেটা বলা হল, এটাই আধ্যাত্মিক পথের প্রকৃত সাধনা। আমরা যাই করি না কেন, ভক্তি করা, জ্ঞান সাধন করা, খোল করতাল নিয়ে হরিবোল হরিবোল করা, এমনকি অন্যান্য ধর্মে খ্রিস্টান, মুসলমান কিংবা ইসকনের ভক্ত, বেদান্তী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, যে পথই হোক না কেন সবাইর পরম সাধন এই দুটো – অভ্যাস আর বৈরাগ্য। অভ্যাস আর বৈরাগ্যের অনুশীলনই সাধনা। পাঁচ রকম বৃত্তির যে কথা আগে বলা হয়েছে এই বৃত্তিগুলোকে থামাবার একমাত্র উপায় অভ্যাস আর বৈরাগ্য।

স্বামীজী রাজযোগে এই সব সূত্রের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। রাজযোগ হল practical spirituality এখানে কোন ডানদিক বামদিক নেই। স্বামীজীর লেখা রাজযোগ যত পড়বেন তত বুঝবেন, যত বুঝবেন তত ভালো লাগবে। জ্ঞানে দুটো জিনিষ হয় – একদিকে বলে knowledge is power, আর অন্য দিকে বলে to know is to love। জ্ঞান মানে শক্তি, আর জ্ঞান মানে ভালোবাসা। একটা জিনিষকে আমরা যখন জেনে যাই তখন সেই জিনিষটাকে আমরা ভালোবাসি। অন্য দিকে যেটা নিকৃষ্ট, সেটাকে জেনে যাওয়া মানে তার উপর আপনার ক্ষমতা এসে গেল। বাজারে এক সজীওয়ালার কাছ থেকে সজী কেনেন, আপনি জেনে গেলেন এই সজীওয়ালার ঠিকায় আর এই মাছওয়ালার পাচা মাছ বিক্রী করে। যেদিন আপনি জেনে গেলেন সেদিন এদের উপর আপনার ক্ষমতা এসে গেল। কারণ আর এরা আপনাকে ঠকাতে পারবে না। এর বিপরীতে একটা ভালো জিনিষকে যদি জেনে যান তখন হয় to know is to love, একটা জিনিষকে জানা মানে তাকে ভালোবাসা। একটা বই পড়তে শুরু করার পর চার-পাঁচ পাতা পড়ার পর বুঝতে পারছি বইটা ফালতু, তখন বইটা ফেলে দিই। আবার সেই বই পড়ে অন্য আরেকজনের খুব ভালো লাগছে, সে তখন হয়তো দশ বার পড়ে ফেলবে। নির্ভর করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি কোথায় আছে। একটা জিনিষকে জেনে নিলে দুটোর মধ্যে একটা হবে – হয় সেই জিনিষের প্রতি আপনার ভালোবাসা জন্মাবে, আর তা না হলে মনে হবে এতে কিছু নেই। যখন বলবে এতে কিছু নেই তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে ক্ষমতা এসে গেছে। আবার যখন মনে হবে কী সাংঘাতিক জিনিষ, তখন তার প্রতি আপনার ভালোবাসা জন্মাবে। যাঁরা জ্ঞানমার্গের পথ অবলম্বন করেন তাঁদের কাছে knowledge is power। আমি তোমাকে বুঝে গেছি তোমার মধ্যে কিছু নেই। লাট সাহেবের বাড়ি দেখে ঠাকুর বলছেন মাটির টিপি। তিনি জেনে গেছেন জিনিষটা কি। এটাই জ্ঞানমার্গ, একটা জিনিষকে জেনে যাচ্ছে, তার স্বভাব জেনে গেল, জানার পর তাকে ফেলে দিয়ে

বেরিয়ে গেল। রসগোল্লা খেতে ভালো লাগে, কিন্তু রসগোল্লা দুধ আর চিনি ছাড়া তো কিছু নয়। অথচ রসগোল্লার সাথে দুধ আর চিনির কখন তুলনাই করা যাবে না, দুটো আলাদা। আপনি অনেক তর্ক করবেন, রসগোল্লার মধ্যে অনেক কারিগরির ব্যাপার আছে, শিল্প আছে, সময় ও শ্রম লেগেছে, রসগোল্লার মধ্যে সার তত্ত্ব আছে, হাজারটি কথা আপনি বলতে পারেন। কিন্তু মূল উপাদান দুধ আর চিনি ছাড়া রসগোল্লাতে কিছু নেই। বাচ্চাকে দুধ আর চিনি দিলে খাবে না, রসগোল্লা দিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটা স্তরে এসে কেউ দেখছে সত্যিই তো রসগোল্লা দুধ আর চিনি ছাড়া কিছুই নয়, তার মানে এখন তার মধ্যে শক্তি এসে গেল। এই শক্তি এসে যাওয়ার পর রসগোল্লা আর তাকে মুগ্ধ করতে পারবে না। অন্য দিকে ভক্তিমার্গের যাঁরা সাধক তাঁদের কাছে জ্ঞান হল to know is to love। কিন্তু এখানে সাধক কোন জিনিষটাকে জানছেন? পরমার্থতত্ত্বকে। ভক্ত আর জগতের কোন কিছুর প্রতি তাকান না, যদিও বা তাকান তখন এই দৃষ্টি দিয়েই তাকান এই জগৎটা তাঁরই। তখন তাঁর মধ্যে কোন ভেদ বুদ্ধি থাকে না। তখন ওকে পছন্দ করি আর একে অপছন্দ করি এই মনোভাবও আসবে না।

এই পাঁচটি বৃত্তিকে বুঝে নেওয়ার পর দেখে বাস্তবে তিনি হলেন সেই পুরুষ। জানার ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের বা আত্মারই আছে। আত্মা ছাড়া আর কেউ কিছু জানতে পারে না। চৈতন্যই নেই তখন জানবে কোথা থেকে! এবার হয়তো আপনি শাস্ত্র পড়ে বা গুরুর মুখে শুনলেন – তাই তো! আমি সব সময় নিজেকে আমার বৃত্তির সঙ্গে এক করে রেখেছি, এই বৃত্তি থেকে আমাকে বেরোতে হবে। এর থেকে বেরোলে কী হবে? আমি কে, এটা জানতে পারবো। তার জন্য উপায় কী? *অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নীরোধঃ*। শত্রুকে জেনে গেলে শত্রুকে মারা সহজ হয়ে যায়। দিদিমা নাতিকে এমন ভালোবাসে যে, সেখান থেকে বেরোতে পারছে না, পুরুষ প্রকৃতিকে এমন ভালোবেসে ফেলেছে যে আর প্রকৃতিকে ছাড়তে পারছে না। ঠাকুর মা কালীকে এমন ভালোবেসে ফেলেছেন যে তাঁকে ছাড়তে পারছেন না, তোতাপুরী ঠাকুরকে অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারছেন না। আমাকে যদি এখন এগোতে হয় তাহলে আমাকে আমার বৃত্তি থেকে আলাদা করতে হবে। আলাদা করা মানে বৈরাগ্য। যতক্ষণ নাতি থেকে দিদিমা না সরে আসে ততক্ষণ দিদিমা কি করে বুঝবে তিনি কে! পুরুষকে এখন চিত্তবৃত্তি থেকে বেরোতে হবে, তার জন্য দরকার বৈরাগ্য। বৈরাগ্য করতে হলে, শুধু বৈরাগ্যই নয়, যে কোন কিছু করতে গেলে আমাকে মনের সাহায্য নিয়েই করতে হবে। পুরুষ আলাদা হয়ে যাবে মনে করলেই প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারবে না। পায়ে কাঁটা ফুটলে আরেকটা কাঁটা দিয়ে পায়ের কাঁটাকে বার করতে হয়। এই যে পুরুষ মনের সঙ্গে, মনের সমস্ত বৃত্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে এই একাত্ম বোধের নাশ হবে মনের দ্বারাই। বৈরাগ্যের জন্য প্রথমই দরকার মনের নির্মলতা, মনকে একেবারে কলুষ মুক্ত হতে হবে। একেবারে শুদ্ধ, পবিত্র, পরিষ্কার না হলে বৈরাগ্য হবেই না, আর তার সঙ্গে যুক্তি বিচারে পুরো প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আসলে যোগদর্শন অধ্যয়ন করার যোগ্যতা অর্জন করা, যোগদর্শন অনুশীলন করার ক্ষমতা লাভ করা অতি দুর্লভ। যোগদর্শনের যুক্তিকে বিচার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যোগদর্শন থেকে যুক্তিতে আরেকটু দাঁড়ায় একমাত্র অজাতবাদ। অজাতবাদে যুক্তি আরও প্রখর, এত কড়া কড়া যুক্তি যে মাথাটা ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাবে। আমাদের সব যুক্তি একটা জায়গাতে এসেই থেমে গেছে – ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুরই দেখবেন। এই ধরনের যুক্তি নিয়ে আর যাই হোক না কেন, বেদান্ত, যোগের মত দর্শন চলে না। এদের যুক্তি, বিচারের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ ছিটকে বেরিয়ে যাবে। আপনি এখন বলছেন আমি বৈরাগ্যের অনুশীলন করব। কীসের বৈরাগ্য? আমার যে স্বরূপ সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। তাহলে তো আপনাকে আগে প্রকৃতিকে ত্যাগ করতে হবে। আমি ত্যাগ করে দেব। তার আগে আপনাকে বুদ্ধিকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে দেব। বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে চাইছ তো, তাহলে এবার শুদ্ধ হও, পবিত্র হও, যুক্তি পরায়ণ হও, বিচারশীল হও। যেমনি শুদ্ধ, পবিত্র, যুক্তি পরায়ণ, বিচারশীল হতে যাবেন তখনই নানা রকমের গোলমাল হতে শুরু করবে। তখন সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার পর মনে হবে একটু কিছু রাখি, একটু কিছু না রাখলে আমার জীবন চলবে কীভাবে! নানা রকম সংশয় এসে আমাদের মনকে চঞ্চল করতে শুরু করে দেবে।

জীবনে প্রথমবার যে কাজটা করছি, তা ভালো মন্দ যাই হোক, সেই কাজই আমাকে পরে ওই একই কাজের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। একজন বড় ডাকাত রাজার সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েছে। বিচারের পর তার ফাঁসির আদেশ হয়েছে। ফাঁসে দেওয়ার আগে ডাকাতকে তার শেষ ইচ্ছা বলতে বলা হয়েছে। ডাকাতটি বলছে ‘আমার মাসিকে কাছে নিয়ে আসা হোক’। মাসি তার কাছে আসতেই সে মাসির কান দাঁত দিয়ে খুব জোরে কামড়ে দিয়েছে। কারণ, ডাকাতটি যেদিন প্রথম মিথ্যা কথা বলেছিল, মাসির কাছে নালিশ করাতে মাসি বিশ্বাস করেনি, তারপর প্রথম যেদিন চুরি করল, সেদিনও মাসি বিশ্বাস করেনি। এই মিথ্যা কথা, চুরি করা বাড়তে বাড়তে এখন সে ডাকাতিতে পৌঁছে গেছে। এই একই জিনিষ মনের সঙ্গেও হয়। প্রথমবার আপনি একটা সৎ কার্য বা অসৎ কার্য করলেন, কার্য যা হবার তাহা হয়ে গেল, কিন্তু সেই কার্য মনের উপর একটা ছাপ রেখে দেয়। প্রথম কোন খারাপ কাজ করতে মন খুব আড়ষ্ট থাকে, ভয় ভয় থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়বার করার পর মন আগের মত আড়ষ্ট হবে না। এরপর তৃতীয়বার করল, মনের উপর আরেকটু ছাপ পড়ে গেল, চতুর্থ বার আরও অনেকটা ছাপ পড়ে গেল, এই করে করে আজকে আমি অমুক ব্যক্তিত্বে দাঁড়িয়েছি, আপনি তমুক ব্যক্তিতে এসে পৌঁছেছেন। এটিএম কার্ডে কত টাকা আছে কেউ জানে না, এটিএম মেশিনে কার্ড ঢোকালে জানা যাবে কত টাকা আছে। এমনিতে সব এটিএম কার্ড দেখলে একই রকম লাগবে, কিন্তু মেশিনে ঢোকালে বোঝা যায় কোন এটিএম কার্ডই সমান নয়। আমাদের সবার মনও এই রকম। সবারই মাথা একই রকম, কিন্তু মনের মধ্যে সব রকমের ছাপ জমা আছে। আপনি ভালো লোক কেন? ভালো কাজ করে করে আপনার ওই ছাপ গুলো ভালো বা শুভ হয়ে গেছে। আপনি খারাপ লোক কেন? বাজে কাজ করে করে অশুভ সংস্কারে আপনার মন ভর্তি হয়ে আছে। আজকে আমি আপনি শুভ ও অশুভ কাজের মিশ্রণে এক বিশেষ ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছি, এটাই ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়েছে আগে আগে আমরা যেমন যেমন কাজ করেছি সেই অনুসারে। সব কার্য যে মনের মধ্যে ছাপ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে এই ছাপকে বলে সংস্কার। কালী পূজায় কেউ কেউ খুব নিষ্ঠা সহকারে সারা রাত জেগে জপ-ধ্যান করেছে, কেউ রাত জেগে শুধু পূজো দেখে গেছে, কেউ সারা রাত সেদিন খুব জুয়া খেলেছে, আবার কেউ হয়তো সারা রাত হৈ হুল্লোড় করেছে, মাংস-ভাত খেয়েছে, বাজী পুড়িয়েছে – সব কাজই মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে দেবে। এই হতে হতে যখন কোন সংস্কার বলবতী হয়ে যায় তখন সেটাই হয়ে যায় অভ্যাস। বাবা ছেলেকে শাসন করে বলছে ‘তুই সব সময় বড়দের সঙ্গে অসম্মান করে কথা বলিস কেন?’ কারণ দেখা যাবে সে আগেও অসম্মান করে কথা বলেছে, তার আগেও বলেছে। প্রথমবার যখন বড়দের অসম্মান করে কথা বলেছিল তখন তার মনে একটা ছাপ পড়েছে। দ্বিতীয়বার যখন বলেছে তখন ছাপটা আরও গভীর হয়ে গেল। এই করতে করতে এখন তার চক্ষুলাজ্জা চলে গেছে। প্রথম হয় কার্য, কার্য থেকে সংস্কার আর সংস্কার থেকে তৈরী হয় অভ্যাস। এই অভ্যাস থেকে হবে নতুন কার্য। আগামী দিনের কার্য যেটা হবে সেটা আপনার স্বভাব ও অভ্যাসবশত।

যোগদর্শনের কথা শুনে এবার আপনি ঠিক করলেন আমার স্বভাবটা পাল্টাতে হবে। স্বভাব পাল্টাতে হলে এবার আপনাকে উল্টো দিক থেকে শুরু করতে হবে। যে অশুভ কাজগুলো করা আপনার স্বভাবে আছে সেই কাজগুলো করা আগে বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করার পর শুভ কাজ করা শুরু করতে হবে। শুভ কাজ করা শুরু হলে ধীরে ধীরে সংস্কার পাল্টাতে আরম্ভ করবে, সংস্কার পাল্টালে স্বভাবও পাল্টাতে শুরু হবে। স্বভাব পাল্টালে কর্মও পুরো পাল্টে যাবে। আমরা সেইজন্য নিশ্চিত করে কাউকে বলতে পারি না যে ইনি অত্যন্ত ভালো মানুষ। এই মুহূর্তে, এই পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত ভালো লোক কিন্তু আগামীকাল তিনি কি হবেন কোন নিশ্চয়তা নেই। ঠিক তেমনি এই মুহূর্তে যাকে অত্যন্ত খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল তিনি অত্যন্ত ভালো লোকও হয়ে যেতে পারেন। সেইজন্য যোগে চরম ভালো লোক বা চরম খারাপ লোক বলে কিছু হয় না। একটা অশুভ কাজ করেছে বলে তাকে খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু কাল পাল্টা কোন ভালো কাজ করতে শুরু করলে সেই খারাপ লোকই পাল্টে গিয়ে ভালো লোক হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য কথায় বলে বেড়ালকে প্রথম রাগেই মারতে হয়।

এক তেজী রাজকুমারীর সাথে এক রাজকুমারের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের আগে সবাই রাজকুমারকে সাবধান করে বলে দিয়েছিল ‘তুমি ভাই মেয়েটিকে সামলাতে পারবে না’। যাই হোক বিয়ে হয়ে গেছে। রাজকুমারীর একটা পোষা বেড়াল ছিল। রাজকুমার বিয়ের রাতে মেয়েটিকে বলছে ‘দেখো আমি তোমার সব কথা মানব, কিন্তু আমি যদি কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে যাই তোমাকে আমি তিনবার ছাড় দেব’। প্রথম রাতেই রাজকুমারের খাবার সময় বেড়ালটা এসে ঘুরঘুর করছে, প্রথমবার সরিয়ে দিয়েছে। প্রথমবার সরিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার এসেছে, দ্বিতীয়বারও সরিয়ে দেওয়ার পর তৃতীয়বার এসেছে। তৃতীয়বার সরিয়ে দেওয়ার পর চতুর্থবার আসতেই রাজকুমার তরোয়ালটা বার করে এক কোপে বেড়ালটাকে কেটে দিয়েছে। ব্যস্, আর কোথায় যাবে! রাজকুমারী চৈচাতে শুরু করেছে ‘তুমি অত্যন্ত নির্দয়! নির্ধুর! আমার আদরের বেড়ালকে মেরে দিলে’। রাজকুমার গুণতে শুরু করেছে – এক। ওই এক পর্যন্তই গোণা হয়ে গেছে, এরপর সারা জীবন রাজকুমারী আর মুখ খোলেনি। এই কাহিনী হাসি মজা করার জন্য নয়। যে কোন গোলমাল যদি আসে প্রথমে ওখানেই তাকে মেরে শেষ করে দিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তে তাই হয়, প্রথম কোপেই মারতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত তাদেরই জন্য যারা সংস্কারবশতঃ করে ফেলেছে। কিন্তু যাদের স্বভাবে চলে গেছে তাদের এখন অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। যারা পকেটমার, ছিনতাইবাজ এদের পুলিশ যতই মারুক, ছাড়া পেলে যা করছিল তাই করতে থাকবে। এদেরকে পাল্টানো খুব কঠিন।

আমাদের সবার যে ব্যক্তিত্ব, এই ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় আমাদের ভেতরের সংস্কারের সমষ্টি দ্বারা। এই সংস্কার সমষ্টি হল যেটা আমাদের মনের উপরের অংশে ভাসছে, কিন্তু মনের গভীরে আরও যে কত সংস্কার সূক্ষ্ম হয়ে বীজাকারে জমা হয়ে আছে তার খবর আমরা কেউ জানি না। আমার আপনার ব্যক্তিত্ব হল সামনের সংস্কারের ছোট্ট একটা পুটলি, কিন্তু এই ছোট্ট পুটলির তলায় আরেকটা বিরাট পুটলি আছে, যেটাতে জন্ম-জন্মান্তরের সব সংস্কার সঞ্চিত রাখা আছে। রাজযোগে পরে এই নিয়ে বিরাট আলোচনা হবে। এখন আমার আপনার যে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এখনকার ভালো মন্দ সংস্কার মিলিয়ে তৈরী।

একমাত্র পথ হল অভ্যাস আর বৈরাগ্য। আপনি বুঝে গেলেন এটা আমার কোন কাজে লাগবে না, তৎক্ষণাৎ সেই জিনিষকে ত্যাগ করে দিতে হবে, এটাই বৈরাগ্য। শাস্ত্রের কথা শুনে, গুরুর মুখে শুনে আপনি বুঝে গেছেন এই কাজ করা উচিত নয়, তাহলে ওই কাজ আর কখনই করা চলবে না। এবার আপনাকে অভ্যাস করা শুরু করতে হবে। এত দিন করে করে বুঝতে পারছেন আমি ভুল পথে চলে এসেছি, এবার অভ্যাস করে করে আপনাকে ঠিক অতটা পথই আসতে হবে যতটা পথ ভুল পথে চলে এসেছেন। সেই জায়গাতে এসে এবার অন্য দিকে যেতে হবে। এটাকেই যোগশাস্ত্রে বলছে *অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ*। বারবার একটা জিনিষকে করে যেতে হবে, আমি করবই করব, যাই হয়ে যাক আমি করব, অভ্যাসের এটাই মূলমন্ত্র। আরেকটা জিনিষ জানার, একটা জিনিষ যদি কেউ একের অধিক বার করে থাকে, তার মানে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। অত সহজে এই সংস্কার তার যাবে না, তার জন্য গুরুকৃপা ও অনেক কিছু সহায়তা চাই।

কিন্তু তাই বলে যে সে একেবারে গোল্লায় চলে যাবে বা গেছে, তা কখন নয়। যে কোন মুহুর্তে যে কোন লোক যদি চেষ্টা করতে শুরু করে দেয়, ধীরে ধীরে সে এগোতে শুরু করবে। যেমন, আপনাকে কেউ কটু কথা বললে আপনি রেগে যান। এবার আপনি শাস্ত্রের কথা শুনে বুঝলেন যে এভাবে একটুতেই রেগে যাওয়াটা ঠিক নয়। এরপর বাড়ির কেউ আপনাকে অপমানজনক কোন কথা বলল। অপমানজনক কথা বলা মানে বিকল্প, কারণ কথাগুলো শব্দ মাত্র। কিংবা সত্যি সত্যিই আপনার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করা হল যেটা প্রমাণের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, প্রমাণের মধ্যে মানে আপনি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। এবার আপনার মন সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ বৃত্তিতে চলে গেল। ক্রোধ বৃত্তি আপনাকে ঘিরে ফেলার জন্য আপনিও ঠিক করে নিলেন – এবার কিছু করতে হবে। কিন্তু শাস্ত্র শুনে শুনে আপনার বুদ্ধি পরিশ্কার হয়ে গেছে, আপনিও তাই ঠিক করে নিয়েছেন আমি কিছু করবো না। এই যে আপনি ঠিক করে নিলেন আমি কিছু করবো না বা কিছু বলবো না, তার মানে নিজেকে আটকাবার শক্তি আপনার

মধ্যে এসে গেছে। প্রথমবার না হয় আটকে দিলেন, দ্বিতীয়বার আবার আপনাকে অপমান করল বা একটা খারাপ কথা বলল, দ্বিতীয়বারও আটকে রাখলেন কিন্তু তৃতীয়বার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। এবার রাগটা বেরিয়ে আসবে।

সেইজন্য পরের সূত্রে বলছেন **তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ।।১৩।।** একটা সংস্কারকে যখন আমরা ধরে রাখছি তখন সেই সংস্কারটাই স্থায়ী হয়ে যাবে। আমি রেগে যাবো না, আমার ক্রোধবৃত্তিকে বেরোতে দেব না। এইভাবে বার বার যখন একটা বৃত্তিকে আটকে দেওয়া হচ্ছে, বৃত্তিকে নিজের বশে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন সেটাকে বলছেন অভ্যাস। বৈরাগ্য হল একটা জিনিষ, যেটা আমার কোন কাজে লাগবে না, সেটাকে ফেলে দেওয়া। কিন্তু সূত্রাকার এই সূত্রে অভ্যাসকে ব্যাখ্যা করছেন **তত্র স্থিতৌ**, যতক্ষণ না স্থিতি হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ যত্নপূর্বক নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। যখন চেষ্টা করতে হচ্ছে না তখন সেটা অভ্যাসের পর্যায়ে পড়বে না। যেমন একজন লোক জীবনে কখন মিথ্যে কথা বলেনি, তার ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাটা অভ্যাসের পর্যায়ে যাবে না। অভ্যাস হল, যে সব সময় মিথ্যে কথা বলে সে এখন অভ্যাস করে করে মিথ্যে কথা বলাটা বন্ধ করে সত্য কথা বলার চেষ্টা করছে। যোগে সত্য কথা বলা, ভালো কাজ করার অভ্যাসের কথা বলছে না, এখানে বৃত্তিকে নিয়ে বলা হচ্ছে। অপরের ভালো কিছু দেখলে আমার মনে হয় – আহা! আমারও যদি এই জিনিষ হত। এটাই লোভ বৃত্তি, লোভ বৃত্তিকে যখন আমি বুঝে নিলাম এবার আমার কাজ হল লোভ বৃত্তিকে বশে নিয়ে আসা, লোভ বৃত্তিকে আমি আসতে দেব না। আমি বুঝতে পারছি আমার মধ্যে ক্রোধ বৃত্তি আছে, এবার আমার চেষ্টা হবে ক্রোধ বৃত্তিকে আসতে না দেওয়া। এই বৃত্তিকে আসতে না দেওয়া, চেষ্টা করে করে বশে নিয়ে আসা হচ্ছে এটাকেই বলছেন অভ্যাস।

মনে অনবরত বৃত্তি উঠছে এটা বাস্তব। আর মনের বৃত্তিগুলি যতক্ষণ না ঈশ্বরের বৃত্তি না হচ্ছে, অর্থাৎ জাগতিক বৃত্তি যতক্ষণ থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু সত্যের উপলব্ধি হবে না। এই দুটোর উপরে কোন প্রশ্নই চলতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মগুরুরা যে পথকেই অনুসরণ করতে বলুন না কেন তারা কিন্তু পরে গিয়ে সবাই এই কথাই উল্লেখ করছেন – বৃত্তিগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ক্রোধবৃত্তির কথাই ধরুন। ক্রোধবৃত্তি হয়তো প্রমাণ থেকেই এসেছে। গঙ্গার জলে নেমে বলছি আমি আর জলে ভিজতে চাইনা। তাহলে আমার কাছে একটাই পথ খোলা, গঙ্গা থেকে উঠে আসা। গঙ্গার জল থেকে উঠে আসাটাই বৈরাগ্য। তাহলে তো বৈরাগ্য খুব সহজ হয়ে গেল। কিন্তু এর থেকে আরো কঠিন যদি হয়? যদি আমি কুয়োতে পড়ে যাই তখন আমি কি করব? একই কথা বলতে হবে কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসো। কিভাবে বেরোবে? চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম ধরে ধরে উঠতে গিয়ে একটু উঠেই হয়ত পড়ে যাবে। তখন আবার চেষ্টা কর। এভাবে দু বার, তিন বার, পাঁচ বার, ছ'বার চেষ্টা করতে করতে একটা সময় ঐ অন্ধকার গভীর কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এছাড়া আর কোন পথ নেই। এটাই বৈরাগ্য আর অভ্যাস, আমার বেরিয়ে আসবার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা চাই আর সাথে সাথে ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য নিরন্তর অভ্যাস চালিয়ে যাওয়া চাই। আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ কথাই – অভ্যাস আর বৈরাগ্য। মনের বৃত্তিগুলিকে একমাত্র অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারাই নিরোধ করা সম্ভব। বৈরাগ্য – এগুলো ছেড়ে দাও। ছাড়বে কি করে, একবারে ছাড়া যায় না, তাই অভ্যাস করে যাও।

গীতাতেও এই একই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – হে অর্জুন তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ, মনের বৃত্তিকে নিরোধ করা অসম্ভব বলেই মনে হয়, এতে কোন সংশয় নেই, কিন্তু ‘অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে’ অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারাই অসম্ভব সম্ভব হবে। অর্জুন ভগবানকে বলছিলেন ‘প্রভু আপনার কথাগুলো শুনতে খুবই মিষ্টি মিষ্টি লাগছে, বলছেন মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কিন্তু বায়ুকে যেমন কোথাও বন্ধ করা যায় না, মনকেও তেমনি বশে আনা যায় না’। ভগবান তখন বলছেন, অর্জুন তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অভ্যাস যোগ আর বৈরাগ্যের দ্বারা সম্ভব। সাফল্যের কোন সহজ পথ হয় না, খাটতে হবে। জীবনমুক্ত হতে চাইছি, তা এমনি এমনি হয়ে যাবে না, অভ্যাস আর বৈরাগ্য এই দুটোকে চাই। বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ অবস্থা কোনটা? সাধনার উচ্চ

অবস্থায় জীবনমুক্ত হওয়ার বাসনাকেও বৈরাগ্য দিয়ে দেয়, যদিও এটা খুবই উচ্চ অবস্থার কথা। একটা খুব মজার কাহিনী আছে। এক রাজার দরবারে এক সাধুবাবা এসেছেন। সাধুবাবাকে দেখে রাজা খুব মোহিত হয়ে গেছে। রাজা সাধুবাবাকে কিছু দিতে চাইল, কিন্তু সাধুবাবা কিছু নিত চাইলেন না। রাজা সাধুকে বলছে ‘সত্যি আপনার কী বৈরাগ্য’! সাধুবাবা বলছেন ‘আপনার বৈরাগ্যের সামনে আমার আর কি বৈরাগ্য’! রাজা বলছে ‘আপনি এ কী বলছেন’! সাধুবাবা বলছেন ‘আমি আর কি ত্যাগ করেছি, কটা টাকা আর ভালো খাওয়া পড়াকেই না ত্যাগ করেছি, আর জগতের যেটা সব থেকে মূল্যবান বস্তু ভগবান, আপনি সেটাকেই বৈরাগ্য দিয়ে দিয়েছেন, আপনার এই বৈরাগ্যের সামনে আমার এই বৈরাগ্য তো অতি তুচ্ছ’। যদি কেউ বলে আজ থেকে আমরা এই অভ্যাস করব, আমার মনকে কোন কিছুতেই বিচলিত হতে দেব না, আমার মনের মধ্যে যাতে কোন প্রতিক্রিয়া না হয়, তার জন্য আমি আজ থেকে খুব করে অভ্যাস করতে থাকব। আসলে তারা কিন্তু এখানে অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত পক্ষে বৈরাগ্যের অনুশীলনই করতে যাচ্ছে। ঠাকুর বার বার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন। কারণ এই বৃত্তিগুলি সব থেকে বেশি প্রেরণা শক্তি পায় কামিনী-কাঞ্চন ভোগের থেকে। বৈরাগ্য মানে বাইরের কোন কিছুই যেন আমার মনের মধ্যে কোন ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি করে আমার মনের মধ্যে কোন বৃত্তি তৈরী না করতে পারে।

অভ্যাস একদিন করলেই ওটা স্থায়ী রূপ পাবে না। লক্ষ্য হচ্ছে বৈরাগ্য, আর বৈরাগ্যই সব থেকে উচ্চ অবস্থা। সেইজন্য পরের সূত্রে বলছেন **স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥** যোগে দর্শনের এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সূত্র। **স তু** – মানে ঐ জিনিষটা, মানে অভ্যাসটা, **দীর্ঘকাল** – অনেক দিন ধরে, **নৈরন্তর্য** – নিরন্তর, একটুও ছাড় দেওয়া চলবে না, আজকে একটু করলাম কাল করলাম না, আবার অনেক দিন পর আবার একটু করলাম, এভাবে করলে কিছু হবে না, সব সময় করে যেতে হবে। **সৎকারাসেবিতো** – খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শুধু এটাকেই অভ্যাস করে যেতে হবে, কয়েদীকে মেরে কাজ করাবার মত নয়, ভালোবেসে করছি, আমি এটাই করতে চাই। কিছু করা মানে সেবা করা, শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার সঙ্গে সেবা করে যাচ্ছি। অনিচ্ছার সঙ্গে অভ্যাস করলে হবে না, **সৎকারাসেবিতো**, শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক দিন ধরে এই অভ্যাস করে যেতে হবে। তখন কি হয়? **দৃঢ়ভূমিঃ** – সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অবিচল অটল হয়ে গেল, তখন ওখান থেকে পতন আর হবে না। আমার যে ব্যক্তিত্ব, আমার যে চরিত্র এটাই দৃঢ়ভূমি। এই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি।

ছোটবেলায় কত কষ্ট করে অ আ ক খ শিখতে হয়েছিল। আর আজকে সব কটি বর্ণ এক নিঃশ্বাসে শুনিয়ে দিতে পারছি। মানে এই ব্যাপারে দৃঢ়ভূমি হয়ে গেছে। কিন্তু এই অবস্থায় আসার জন্য কত অভ্যাস করতে হয়েছে, নিরন্তর অভ্যাস করে করে আজকে বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর এক নিঃশ্বাস শুনিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন জিনিষ, যেমন জপ-ধ্যান প্রথম প্রথম করতে কত বিরক্তি লাগে, কিন্তু এটাই অনেক দিন ধরে, বছরের পর বছর নিয়ম করে নিরন্তর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবেসে করে যাচ্ছি, তখন জপ-ধ্যান করাটা সংস্কারে পরিণত হবে, সংস্কার থেকে স্বভাবে, স্বভাব থেকে চরিত্রে, চরিত্র থেকে দৃঢ়ভূমি হয়ে যাবে। দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যাস করে গেলে মন নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। আসলে মন এখানে নিয়ন্ত্রণে আসছে না, মনের প্রতিক্রিয়া, উত্তেজনা গুলো নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। বাইরের উত্তেজনা সব সময় মনকে সূচনা পাঠাতেই থাকবে উত্তেজিত করাবার জন্য, কিন্তু মনের মধ্যে তাতে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না, কেননা এই প্রতিক্রিয়াটা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এ যেন ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী সৈন্যের মত। যুদ্ধক্ষেত্রে সব ঘোড়াগুলো সৈন্যদের পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধের বিউগল্ বেজে উঠল, ঘোড়াগুলো এখন তেড়েফুড়ে ছুটে যেতে চাইছে। কিন্তু যে সওয়ার হয়ে আছে সে ঘোড়ার লাগামকে শক্ত করে ধরে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে, ঘোড়া যদি এগিয়ে যায় তাহলে সর্বনাশটি হয়ে যাবে।

নিরন্তর অভ্যাস করতে বলা হচ্ছে। এখন ঠিক করে নিলাম আমি কারুর উপর রাগ করব না, তখন এটাকেই অনেক দিন ধরে অভ্যাস করে যেতে হবে। অনেক দিন করতে করতে রাগবৃত্তিকে

নিরোধ করাতে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবো তখন এই রাগ বা ক্রোধ থেকে আমার আর পতনের ভয় থাকবে না। একজন মানুষ যদি একটা জায়গায় বেনিয়মে চলে, সে সব জায়গাতেই বেনিয়মে চলবে। আধ্যাত্মিক পুরুষের মধ্যে দুটো জিনিষ থাকে, প্রথমটা হল কোন রকম বেনিয়মের মধ্যে তিনি থাকবেন না। ঠাকুর যখন জামা-কাপড় পড়তেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন, কোথাও যেতেন তখন সব কিছুতে তাঁর হিসাব করা থাকত, কোথাও তাঁর বেনিয়ম কিছু ছিল না। যার একটা জায়গায় বেনিয়ম আছে অন্য জায়গাতেও তার বেনিয়ম হতে বাধ্য।

আমাদের সবারই মধ্যে একটা শৃঙ্খলতার ব্যাপার আছে। শৃঙ্খল ব্যাপারটা যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন ডাকাত, খুনী, চোর, চাষী, কামার, লেখক, বিজ্ঞানী, সন্ন্যাসী এদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের সবারই মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাকে সবার থেকে আলাদা করে মনে রাখা হয়। বড় কাজই করতে থাকুক আর ছোট কাজই করতে থাকুক একটা ব্যাপার সবারই এক থাকে। দক্ষতা সবারই থাকে ঠিকই, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যাবে না কে কতটা দক্ষ, দক্ষতা থেকেও আরেকটা জিনিষ আছে যেটা শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সবারই থাকবে। যাঁরাই যার যার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হন তাঁরা সবাই একজন বড় মাপের শিল্পী হন। এনারা যেটাই করছেন সেটাকেই মনে হবে একটা আর্ট। এখন শিল্প বা আর্টকে ব্যাখ্যা করলে অনেক কিছু এসে যাবে। কিন্তু এখানে বলতে চাইছে, এনারা নিজের নিজের ক্ষেত্রে যে একটি জিনিষই করছেন সেটা দেখেই আমরা থ হয়ে যাব। কুমারটুলিতে যাঁরা মূর্তি তৈরী করছেন, সেই মূর্তি তৈরী করতে তাদের যে মনের একাগ্রতা, ওই একাগ্রতা দিয়ে একটা শিল্পকে ফুটিয়ে তুলছেন। এখানে যে দৃঢ়ভূমির কথা বলা হচ্ছে, এত দিন ধরে করে করে এঁদেরও দৃঢ়ভূমি হয়ে গেছে। একটা জিনিষকে কত ছোটবেলা থেকে করতে করতে এঁদের এটাই একটা শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে, যে যেটা করছে সেটাই একটা শিল্প হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে যে কজন বসে আছি, আমাদের মধ্যে একজনও কি বলতে পারি জীবনে আমার এমন কোন একটা কাজ আছে যেটা একটা শিল্পের, একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছি? মায়েদের মধ্যে অনেকে বাড়িতে স্যালার্ড বানান, তাতে লঙ্কা, পেঁয়াজ, শশা, টমেটোকে প্লেটে এমন সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করেন দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মিষ্টির দোকানে স্পেশাল অর্ডার দিলে কারিগররা পুরো একটা বরযাত্রীর সাজে সন্দেশ বানিয়ে দেয়, তাতে পান্ডা, বেহারা থেকে সব থাকে। এগুলো আর্ট। জাপানে চা বানানো আর চা পরিবেশন করাও একটা আর্ট। জাপানীরা যখন জুডো ক্যারাটে লড়ে, সেটাও তখন ওদের কাছে একটা আর্ট। এর নামই মার্শাল আর্ট।

বারাণসী আশ্রমে এক মহারাজ ছিলেন, উনি পুরো আমটা চামচ দিয়ে খেতেন। মহারাজরা ওনাকে ভালো ল্যাংড়া আম দিয়ে বলতেন ‘তুমি যে আমটা খাবে আমরা শুধু সেটা তাকিয়ে দেখতে চাই’। আম খাওয়ার জন্য আমকে বটি দিয়ে মাঝখানটা সামান্য একটু চিরে দিতে হবে। উনি আস্তে করে আমটা ছাড়িয়ে নেবেন। তারপর চামচ দিয়ে প্রথমে আমের উপরের অংশটা খাবেন, তারপর চামচটা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে নীচের অংশটা খাবেন। একটা সময় আঁটিটা আলগা হয়ে বেরিয়ে যাবে তার সাথে উপরের আর নীচের দুটো খোসাটা পুরো আলাদা হয়ে যাবে। আঁটিটা পিঁপড়ে চেটে দিলে যে রকম পরিষ্কার হয়ে যায়, ঠিক ওই রকম পরিষ্কার হয়ে যেত। মহারাজরা বলতেন ‘ভাই! তুমি খাচ্ছ শুধু এটাই দেখতে চাই’। এটাও একটা আর্ট। কাঁথা সেলাই সব বাড়িতেই করে, কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু কাঁথা দেখলে মনে হবে যেন বাড়ির দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখি, এত সুন্দর! খাওয়ার সময় আসন, পাতা, জলের গ্লাস যে পাতা হচ্ছে তাতে একটু ট্যারাব্যাক থাকলে শ্রীমা খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, সবাই চিন্তাহরণ মহারাজ বলে তাঁকে জানতেন, খুব নামকরা মহারাজ। ওনার নামে বলা হত, খাওয়াটাও যে একটা আর্ট চিন্তাহরণ মহারাজকে না দেখলে বোঝা যাবে না। গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অফ কালচার ওনার নিজের হাতেই তৈরী। গোলপার্কের এই কালচার বানানোর পেছনে ওনার নামে অনেক কাহিনী আছে। গোলপার্কের ইনস্টিটিউট তৈরী হয়ে যাওয়ার পর উনি যখন উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেন নামার সময় নিজের উত্তরীয় সিঁড়ির রেলিংএর উপর রাখতেন আর উত্তরীয়টা ঘষতে ঘষতে নামতেন। কোথাও একটু যদি ধুলো কণা পাওয়া যায় তাহলে লোকের চাকরী চলে যেত।

গোলপার্কে যে মার্বেল বসানো হয়েছে, তার একটা মার্বেলের রঙটা একটু মেলেনি। মার্টিন বার্ন কোম্পানী গোলপার্কের বিল্ডিং বানিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মার্টিন বার্ন কোম্পানীতে ফোন চলে গেছে। ফোন পেয়েই ওরা বলছে ‘মহারাজ! ক্ষমা করবেন, আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ার সবে জয়েন করে নতুন কাজ শিখছে’। ফ্লোরের সমস্ত মার্বেলকে তুলে ফেলে দিতে হল। অথচ ফ্লোরের কাজ দেখছিলেন খুব সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। কয়েক বছর আগে গোলপার্কে কিছু কাপ-ডিশ কেনার দরকার ছিল। একজন মহারাজ গাড়ি নিয়ে বেঙ্গল পটারিজে গেলেন, আধ ঘন্টার মধ্যে দু ডজন কাপ-ডিশ কিনে বেরিয়ে এলেন। ড্রাইভার মহারাজকে বলছে ‘মহারাজ! গোলপার্কের দিনকাল কত পাল্টে গেছে, আপনি গেলেন আর আধ ঘন্টার মধ্যে দু ডজন কাপ-ডিশ কিনে নিয়ে চলে এলেন। অথচ আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে চিন্তাহরণ মহারাজের সঙ্গেও আমি এসেছিলাম কাপ-ডিশ কিনতে। উনি প্রথমে রঙ আর ডিজাইন বাছাই করলেন, এই করতেই ওনার দিনের অর্ধেক সময় চলে গেল। এরপর উনি প্রত্যেকটা প্লেটকে আলাদা করে রাখলেন, প্লেটকে নেড়ে দেখলেন, তারপর কাপটাকে রাখলেন, কাপটাকে নেড়ে দেখলেন, কাপটাকে উল্টে রাখলেন, উল্টে নেড়ে দেখলেন আওয়াজ হচ্ছে কিনা, তারপর কাপটাকে রেখে প্লেটটাকে উপরে রাখলেন, নেড়ে দেখলেন আওয়াজ হচ্ছে কিনা, যদি একটু আওয়াজ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিচ্ছেন। সারাটা দিন চলে গেল শুধু এক ডজন কাপ-প্লেট কিনতে আর মালিকের ঘাম ছুটে গেছে’। এটা হল আর্ট। প্রত্যেকটি কাপ-প্লেটকে প্রত্যেক পজিশানে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখছেন আওয়াজ হচ্ছে কিনা, একটু আওয়াজ হলেই সেটা বাতিল। উনি খুব খেতে পারতেন, আর তেলেভাজা হলে তো কথাই নেই। একবার এক সেন্টারে গেছেন, সেখানে চপ ভাজা হচ্ছে। ওনাকে চপ গরম গরম দিতে হবে। দুটো গরম গরম ভাজা চপ ওনাকে প্লেটে করে দেওয়া হয়েছে। উনি খেয়েছেন, খাওয়ার পর ওখানকার অধ্যক্ষের নাম করে বলছেন ‘আমাকে খাতির করে ঠিকই কিন্তু কোন কালচার নেই’। অধ্যক্ষ আবার খুব অভিজাত উচ্চ বংশের লোক, শুনে খুব রেগে গেছেন – ‘আমার নাকি কালচার নেই! কী দেখে বলছেন আমার কালচার নেই?’ চিন্তাহরণ মহারাজ বলছেন ‘দুটো কেন দেওয়া হয়েছে, একটা একটা করে দেওয়াটাই ভদ্রতা’। খাওয়াটাও ওনার কাছে একটা আর্ট ছিল।

এবার আমরা ভেবে দেখি, আমাদের জীবনে এমন কোন জিনিষ কি আছে যেটাকে আমরা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছি? সত্যি কথা বলতে আমাদের কাছে এমন কোন কিছু খুঁজে পাবো না যেটা দেখে কেউ বলবে এটা আর্ট। অনেক পূজারী যখন পূজো করছেন সেটাকেও উনি তখন আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। চন্দন ঘষা থেকে ধূপকাঠি জ্বালানো থেকে শুরু করে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজানো যেটাই করছেন সবটাই তাকিয়ে দেখার মত। আর্ট মানেই তাই, যেটা করবে সেটার দিকে সবাইকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে। এই আর্টের পর্যায়ে যদি কোন একটা কিছুকে নিয়ে গেছেন, তাহলে আপনি একটা জায়গায় সবাই কে ছাড়িয়ে গেছেন। অভ্যাস আর বৈরাগ্য এই দুটো জিনিষই আর্টের জনক। একটা জিনিষকে বিশেষ ভাবে অনেক দিন ধরে করা হচ্ছে তখনই সেই জিনিষটাকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শচীন তেগুলাকার একটা চার মারছে তখন বলে touch of an artist। ক্রিকেটে যে কেউ বল মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু শচীন তেগুলাকারের স্ট্রোকের মধ্যে একটা আর্ট আছে, সবটাই যেন প্রচেষ্টা শূন্য, সবাই তাকিয়ে থাকে। সবাই যে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন না তা নয়। যখন বাঁটা দিচ্ছেন, ঘর মুছছেন, বিছানা করছেন, মশারি ভাঁজ করছেন, যা কিছু করছেন তখন ওটাকেই মনে হবে ছবির মত। ছবির মত মানে, এবার আপনার মনটা গোছানো হয়ে গেছে। এই গোছানো মন দিয়ে এবার অনেক কিছু করা যাবে। যতক্ষণ আপনার জীবনে এই আর্ট না আসছে, অন্তত একটা জিনিষে বা যে কোন একটা ক্ষেত্রে যদি আর্টের পর্যায়ে না পৌঁছায়, ততক্ষণ আপনি কিন্তু জীবনে দাঁড়াতে পারবেন না। কিছু কিছু উকিল আছেন, যখন তাঁরা বিচারকের সামনে সওয়াল করেন, ওনার সওয়াল শোনার জন্য অন্য অনেক উকিল ও মক্কেলরাও হাজির হয়ে যান, এটাই art of speaking। আমেরিকাতে একজন বিখ্যাত উকিল ছিলেন Clarence Seward Darrow, উনি যখন বলতে শুরু করতেন বিচারকরা হাঁ করে শুনতেন আর বলতেন this is an art of speaking। একটা জিনিষের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি, একটা জিনিষ শুনছি তো শুনছিই, তার মানে ওই জিনিষটা

আর্টের পর্যায়ে চলে গেছে। আমাদের সমস্যা হল আমাদের কোন কৃতকৃত্যতা নেই, ভগবানের ঘর থেকে একটা শরীর নিয়ে এসেছি, ভগবানের ঘর থেকে কিছু বুদ্ধি নিয়ে এসেছি, ভগবানের ঘর থেকে কিছু টাকাকড়ি নিয়ে এসেছে আর সেটা নিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছি। যার বুদ্ধি আছে সে মনে করছে আমার মত চালাক কে আছে! যে দেখতে সুন্দর সে মনে করছে আমার কত আর কে দেখতে এত সুন্দর! বড়লোক মনে করছে আমার মত আর কে আছে! আমরা কি কোন কিছুকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি? শুধু চুল আঁচড়ানো, শুধু বিছানা করা এটাকে কি আর্টের পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে পেরেছি? যখন চুল আঁচড়াচ্ছে তখন লোকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে, সে যেন একটা একটা করে চুলকে সাজাচ্ছে। আপনি বলবেন আমার মত থালা মাজতে কেউ পারে না। আপনি যখন থালা মাজছেন তখন কি কেউ অবাধ হয়ে আপনার থালা মাজা দেখছে? ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনাদের জীবনে দেখুন, এনাদের প্রত্যেকটি কাজ ছিল এক একটা পিওর আর্ট। জামার বোতাম লাগাচ্ছেন সেটাও একটা আর্ট, জামার বোতাম খুলছেন সেটাও একটা আর্ট, সব কিছুই একটা আর্টের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। মন যখন গোছানো অবস্থায় চলে যায় তখন সব কিছু আর্টের পর্যায়ে চলে যায়। এই আর্টের পর্যায়ে যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ আপনি জীবনের কোন ক্ষেত্রে এগোতে পারবেন না, তা সে জাগতিক ক্ষেত্রেই হোক আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই হোক। ততক্ষণ আপনি এলেমেলো কাজ করে যাচ্ছেন, আপনার এই কাজের কোন দাম নেই। আমাদের জীবনে যে এত দুঃখ কষ্ট তার একমাত্র কারণ আমরা কেউই আর্টিস্ট নই। শিল্পী কখন জীবনে কষ্ট পায় না, সে নিজের শিল্পের জগতে ডুবে থাকে। প্রত্যেক আর্টের জন্য সাধনার দরকার। তবে কিছু কিছু সাধনা আছে যেটা আর্ট নয়। কিন্তু এই যে সাধনাগুলোর কথা বলা হল এগুলো আর্টের পর্যায়ে। চৌদ্দ নম্বর সূত্রে বলছেন *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ* – অনেক দিন ধরে নিরন্তর ভাবে লেগে আছেন, খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে করে যাচ্ছেন তখন ওটা দৃঢ়ভূমি হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক চলে, ওই আর্টের কাজ তখন স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এই যে বলছেন – *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ* – কি করে দৃঢ়ভূমি হবে? কি করে এটাতে প্রতিষ্ঠিত হবেন? মিলিটারিতে সৈনিকরা দীর্ঘ দিন ধরে শুধু লেফট রাইট করে যাচ্ছে। অনেক দিন করে করে সৈনিকদের সংস্কারের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন তৈরী হয়ে যাচ্ছে। সামনে গুলি চলছে, ওর কমাণ্ডার যখন বলবে – রান, ড্যাশ্। সে সোজা ওখানে ছুটে যাবে, গুলি চলছে কি চলছে না, সেদিকে তার কোন ভ্রক্ষেপ নেই, মনটাকে এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, সে শুধু জানে কমাণ্ডারের আজ্ঞা আমাকে পালন করতে হবে।

এতক্ষণ অভ্যাসের কথা বললেন, এরপরের সূত্রে বৈরাগ্যকে আরো পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে – *দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।।১৫।।* যা কিছু দেখা হয়েছে আর যা কিছু শোনা হয়েছে আর অন্য দিকে জগতের যত বিষয় আছে তার যা কিছু আমি নিজে অনুভব করেছি বা অপরের কাছে শুনেছি এই ভাবে শোনা, দেখা ও অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়ের প্রতি যে তৃষ্ণা হয়েছে সেই তৃষ্ণাকে বশে নিয়ে আসা বা নিয়ন্ত্রণ করাকেই বলা হচ্ছে বৈরাগ্য। বিষয় মানে ভোগ্যবস্তু। ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে আমি নিজে ভোগ করে অনুভব করেছি বা অপরে ভোগ করেছে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে বা পড়ে জানতে পেরেছি। এটাকে বশীকার করা অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাটাই বৈরাগ্য। হয় আপনি নিজে কিছু অনুভব করেছেন, কিংবা অপরের কাছে শুনেছেন। এই যে বিষয়বস্তু, হয় আপনি শুনে থাকবেন, আর তা নয়তো আপনি নিজে ভোগ করে থাকবেন, এই বিষয়বস্তুকে যে ত্যাগ, এই ত্যাগ করাটাও একটা বৃত্তি। কারণ ত্যাগেও একটা আনন্দ হয় এটাকেই বলছেন বৈরাগ্য। খুব সহজ সরল ভাষায় বলতে গেলে এই সংসারে যে কোন ভোগ্যবস্তু, যেটাকে নিজে ভোগ করেছে বা অপরের কাছে এই ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে শুনেছে, সেটার প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকা বা সেটাকে ত্যাগ করে দেওয়াকেই বলছেন বৈরাগ্য।

আমাদের কাছে যে জ্ঞান আসে সেই জ্ঞানের পেছনে আছে কোন কিছু করার প্রেরণা, প্রেরণা আবার দুটো কারণে আসে। একটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, আরেকটি অপরের কাছে শুনে। বৈরাগ্য-

শক্তির বিকাশের মাধ্যমে এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আসে। সেইজন্য বলছে মানুষের সঙ্গ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যখনই কারকে কিছু করতে দেখলেন বা কিছু ভোগ করতে দেখে নিলেন তখনই ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা আত্মদানের প্রবণতা আমাদের মধ্যে আসবে। এখন যে নানা ধরণের ফ্যাশন এসেছে এগুলো আসছে একটা প্রেরণা থেকে। এই প্রেরণা আবার আসছে নিজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও সংস্কার থেকে আর কারুর কাছ থেকে শুনে অথবা কারুরটা দেখে। যেমন শৈশবে কেউ জানে না যে সবাইকে অর্থ উপার্জন করতে হয়, সমাজে থাকতে গেলে একটা মর্যাদা নিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু বাড়ির লোকেরা, পাড়ার লোকেরা, আত্মীয়-স্বজনরা অনর্গল বলতে থাকবে – বাপু যদি টাকা পয়সা না আয় করতে পারো জীবনে কিছু হবে না, এই ভাবে বলে বলে ছোটবেলা থেকেই আমাদের মনকে এইভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়। এটা যে সবাই নিজের স্বভাববশতঃ মনে নিয়েছেন তা নয়, সবার কাছে শুনতে শুনতে ভেতরে একটা কর্তব্যাকর্তব্য বোধের জন্ম নেয়। ঠাকুরের খুব সুন্দর উপমা আছে। ভাইপো মদ খায়, কাকা ভাইপোকে বার বার বারণ করে। ভাইপো বিরক্ত হয়ে বলছে ‘খুড়ো, তুমি একদিন খেয়েই দেখো না, তারপর যদি আমাকে ছাড়তে বল আমি ছেড়ে দেব’। একদিন কাকা মদ খেয়ে এসে ভাইপোকে বলছে ‘তুই ছাড়িস আর নাই ছাড়িস আমি আর ছাড়ছি না বাপু’। তার এই মদ খাওয়ার ব্যাপারে প্রেরণা কোথেকে এলো? ভাইপোকে শুধু মদ খেতে বারণ করতে গিয়েছিল আর ভাইপোর কাছে শুনে সে মদ খেতে চলে গেল। আমরা ঠাকুরের এই কাহিনী গুলো মজা করে নিই বটে, কিন্তু যখনই শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন তখনই ঠাকুরের এই সব কথার গূঢ় তত্ত্বগুলিকে ধারণা হবে। ঠাকুর কখনই আমাদের মজা দেবার জন্য বা আমোদ করবার জন্য এইসব কাহিনী বলতেন না। এই ধরণের শাস্ত্র আচার্যের কাছে অধ্যয়ন করার পর কথামতে ঠাকুরের কথার যে দিগদিগন্ত বিশাল ব্যাপ্তি সেটা আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়।

যে কোন ভোগবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সবার মন যাবে। কারুর হয়তো একটা বিষয়ে দুর্বলতা আছে, কারুর আবার অন্য বিষয়ে দুর্বলতা থাকতে পারে। সন্ন্যাসীদের জীবন অন্য রকম, তাঁদের সমস্ত রকম ভোগ্যবস্তু থেকে দূরে থাকতে হয়। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী কারুর কাছ থেকে হয়তো কম্প্যুটারের ব্যাপারে কিছু শুনলেন। শোনার পর তাঁর হয়তো ইচ্ছে হল কম্প্যুটারটা কি রকম জিনিষ একটু দেখলে হয়। যোগ বলছে এই যে প্রলোভন হল, এটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, আমার কম্প্যুটার লাগবে না। বৈরাগ্য হয়ে গেলে কম্প্যুটারের ব্যাপারে আগ্রহজনিত কোন বিকারই আসবে না। বিকার আসবে, বিকার আসার পর বিকারকে আটকাবে, তা নয়। বিকারকেই আসতে দেওয়া হবে না। ভোগের বিষয়কে পাওয়ার জন্য মনে সব সময় চেউ উঠছে। একজন যোগী, তার আগে বিয়ে হয়েছিল। তার বৌ মরে গেছে। বৌকে খুবই ভালোবাসত, কিন্তু সে এখন সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এখন একা একা বসে আছে, বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল, সে আমাকে কত যত্ন করত, কত ভাবে আমাকে খাতির করত। মন বার বার ঐদিকে চলে যাচ্ছে। বৈরাগ্য মানে? মনকে ঐদিকে যেতে না দেওয়া। কেন যেতে না দেওয়া? আমার এখন ওসব লাগবে না, ছিল এক সময়, চলে গেছে, আর লাগবে না। এখন আমার নেই, আগে ছিল তো ছিল, আবার কেন ঝামেলা ডেকে নিয়ে আসব।

একজন শেখ মরুভূমির উপর দিয়ে উটের পিঠে করে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে যেতে একটা তাঁবু খাটিয়েছে রাতটা কাটাবার জন্য। তাঁবুর মধ্যে শেখ শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখে তাঁবুর তলা দিয়ে উট তার নাকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। শেখ একটা ডাঙা দিয়ে উটের নাকে মেরেছে। উট শেখকে তখন বলছে ‘সারাদিন কত কষ্ট সহ্য করে আপনাকে পিঠে করে ঘুরে বেড়াই, কাল ভোর হলে আবার আপনাকে পিঠে বসিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আমার নাক খুব স্পর্শকাতর, একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। বাইরে এখন খুব ঠাণ্ডা, আমার নাকটা তাঁবুর ভেতরে একটু গরমে রাখতে দিন’। শেখের মন নরম হয়ে গেল, উটের নাককে থাকতে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর দেখে উটের বিরাট মুণ্ডটাই তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেছে। শেখ প্রচণ্ড রেগে গেছে। উট বলছে ‘এত বড় তাঁবুতে তো আপনি একাই আছেন, আর আমার এই মাথাটুকুই না ভেতরে আছে, আমার যে লম্বা গলা, অতো বড় শরীর বাইরেই তো পড়ে আছে। পুরো ঠাণ্ডটাই তো আমার শরীরকে সহ্য করতে হচ্ছে’। শেখ বেচারী উটকে কি আর বলবে। মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ধড়মড় করে উঠে দেখে উটের গলা শুদ্ধ পুরো মুখটা তাঁবুর ভেতরে ঢুকে এসেছে। রাগে শেখের মুখ লাল হয়ে গেছে। শেখ কিছু বলার আগেই উট বলছে ‘দেখো! আমি তো ঢুকেই গেছি, থাকতে হয় আমার সঙ্গেই থাক, আর যদি না পারো তুমি বাইরে গিয়ে থাকতে পারো’। যে জিনিষটা আমি ভোগ করিনি, কিন্তু যেমনি সেই জিনিষের ব্যাপারে অপরের কাছে শুনে নিলাম, তখনই সেই জিনিষের মধ্যে ঢোকানোর জন্য নাকটা উশখুশ করতে শুরু করে দেবে। যারা ওস্তাদ তারা জানে উটের নাকটা যখন ঢুকতে চাইছে তার মানে এবার পুরোটাই ও দখল করে নেবে। ওখানেই মেরে উটের নাক ঢোকাটা বন্ধ করে দিতে হবে। ভোগের জিনিষ যেটা আপনি শুধু কারুর কাছে শুনেছেন বা কোথাও পড়েছেন আর আপনি নিজে কখনও ভোগ করেননি, ওখানেই নাককে ঢুকতে দিতে নেই। নাক যদি ঢুকে যায়, সারা রাত আপনাকেই তাঁবুর বাইরে রাত কাটাতে হবে, ছুঁচ হয়ে ঢুকবে ফাল হয়ে বেরোবে। যে কোন ভোগের জিনিষে নাক যদি একবার ঢুকেছে, আর কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। পুরো উট এবার ঢুকবে। নাক ঢোকানোকে প্রথমেই ডাঙা মেরে বার করে দিতে হবে। এটাই বৈরাগ্য।

আমরা যত প্রবন্ধাদি, রচনা, গল্প, উপন্যাস, কবিতা পড়ি তার মধ্যে আমরা এমন একটিও লেখা কি পড়ি যেটা বৈরাগ্যবান পুরুষের লেখা? খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক, ষাণ্মাসিক পত্রিকাতে কারা লিখছে? সব বিষয়ী লোকেরা। বিষয়ী লোক বিষয়ের কথা ছাড়া তো আর কিছু লিখবে না। যখন ভ্রমণ কাহিনী লিখছে ভুটানে রোমাঞ্চময় সফর, সেখানে সেই ভোগের কথাই লিখছে। এমন ভাবে লিখছে কেউ পড়লে তারও মনে ভুটান ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছা বৃষ্টিটা জেগে যাবে। সবই বিষয়, বিষয় মানে মানুষকে ভোগের দিকে টেনে আনা। সবাই নিজের দল ভারী করতে চায়। বিষয়ী লোকেরাও দল ভারী করার জন্য জেনেই হোক বা না জেনেই হোক তারা সব সময় অন্যকে ভোগের দিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে যাবে। চোর ডাকাতরাও দল ভারী করতে চাইছে, মাওবাদীরাও দল ভারী করে, রাজনীতির পার্টিগুলোও দল ভারী করে, সন্ন্যাসীরাও দল ভারী করে, মুসলমানরাও দল ভারী করতে চাইছে, হিন্দুরাও চাইছে দল ভারী করতে। যারা ভোগী তারাও চায় আমার চারিদিকে যেন সব সময় ভোগীরাই থাকে, তা নাহলে তার মনে একটা অপরাধ বোধ কাজ করতে থাকবে। কিন্তু ওরই মধ্যে নিজের ভোগের এলাকাটা নিজের দখলে রাখবে, ওখানে কারুর অধিকার সহ্য করবে না।

আমাদের যে মুক্তি আসে, বৈরাগ্যের মাধ্যমেই আসে। বৈরাগ্য আর মুক্তি এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। একমাত্র বৈরাগ্য দিয়েই মুক্তি আসে। বৈরাগ্য ছাড়া মুক্তি হয় না। এই জগতের অভিজ্ঞতা যখন আমাদের হয়ে যাবে তখন এই জগতের ব্যাপারেও বৈরাগ্য এসে যাবে। শৈশবে আমরা খেলনা নিয়ে, কত রকমের পুতুল নিয়ে খেলতাম। মন যখন ভরে যেত তখন ঐ খেলনা গুলো ফেলে দিতাম। আপনি এখন ক্লাশ ফাইভে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কিন্তু যখন জেনে যাবেন ক্লাশ ফাইভে এই এই জানতে হয়, ক্লাশ ফাইভে যা জানার সেটা জেনে যাওয়া মানে ক্লাশ ফাইভের প্রতি বৈরাগ্য এসে গেল। বৈরাগ্য এসে গেল মানে এখন ক্লাশ ফাইভ থেকে আপনি মুক্ত। এই জগতের অভিজ্ঞতা লাভের পর যখন এই জগতের প্রতি বৈরাগ্য এসে যাবে তখন আপনারও মুক্তি হয়ে যাবে।

এখন এমন কিছু যদি ভোগের সুযোগ আসে যেটাকে প্রশ্রয় দিলে দুনিয়ার কেউ কোন দিনও জানতে পারবে না, তখন সে যদি ওই ভোগকেও পুরো উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসে, তখন সেটাই হবে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য। কিন্তু সে যখন বুঝে গেল কেউ জানতে পারবে না, ঠিক আছে করে নিই, তখন বুঝতে হবে তার এখনও বৈরাগ্য আসেনি। আরেকটা হল সঙ্গদোষ, একজনের সঙ্গে অনেক দিন থাকতে থাকতে কিছু জিনিষের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় আর কিছু কিছু ধরনের কাজ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। আমাদের মনের ভেতরে কোথায় কোন বীজ লুকিয়ে আছে জানা নেই, একটু সামান্য সুযোগ পেলেই বীজ থেকে কখন অঙ্কুর বেরিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে যাবে বুঝতেও দেবে না। সত্যিকারের নৈতিকতা যখন আসে তখন ভেতর থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সত্যি সত্যিই সে ভোগ করতে চাইছে না।

বৈরাগ্য কেন? যদি গান্ধীজী কে জিজ্ঞেস করা হয় – আপনি সত্যের কেন অনুশীলন করেন? তাঁর কাছে একটাই উত্তর, তাঁর জীবনীতে তিনি বলছেন – এটাই আমার আধ্যাত্মিক সাধনা। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কেন মিথ্যা কথা বলেন না, কিংবা কেন চুরি করতে চান না? আমাদের কাছে এর কোন সদুত্তর নেই। কেননা, আমাদের উপরে যখনই কোন চাপ এসে পড়বে, সুযোগ যদি সামনে এসে যায় বা এমন কোন পরিস্থিতি এসে যাবে যখন আমরা মিথ্যে কথাও বলব আবার দরকার পড়লে ঘুষও নেব। যে মুহূর্তে একটা সামান্য লোভের বৃত্তি বা ভয়ের বৃত্তি, অনিশ্চয়তার বৃত্তি এসে যায় আমাদের সব নৈতিকতা সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যাবে। সত্য ছাড়া আধ্যাত্মিকতার কোন কল্পনাই করা যেতে পারে না। সমাজেও সত্যের অনেক মূল্য আছে, সত্য পথে থাকলে সমাজ মসৃণ ভাবে চলতে থাকে। কিন্তু চোখের সামনেই দেখছি সত্যকে বাদ দিয়ে সমাজ দিব্যি চলে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যকে বাদ দিলে আধ্যাত্মিকতার কিছুই থাকেনা। ঠিক সেই রকম বৈরাগ্যেরও প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক মূল্য আছে। বৈরাগ্য ছাড়া আধ্যাত্মিকতার চিন্তাই করা যায় না। আবার বৈরাগ্য অভ্যাসের ফলে নিজের ব্যক্তিগত অনেক কিছুতেই মঞ্জল হয়। যে মদাসক্ত, মদ খেয়ে খেয়ে শরীর খারাপ করেছে, ডাক্তারের পরামর্শে মদ খাওয়া ছেড়ে দিলে নিজের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এরপর সে হয়তো দু-বছর মদ খেলো না। দু-বছর পর ভাবছে ‘এতদিন তো মদ খাইনি, এখন একটু খাওয়া যেতে পারে, এতে শরীরের কিছু ক্ষতি হবে না। এখানে মনে হতে পার সে হয়তো কোন ভুল করছে না আর একদিনেই তার শরীরও খারাপ হয়ে যাবে না। কিন্তু একজন আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে এটাই মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। আধ্যাত্মিক সাধক যে ব্রত নিয়েছে তার থেকে যদি একটু সামান্যতম মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে ঐটুকু বিচ্যুতিই তার পক্ষে অবশ্যাস্তাবি পতনের কারণ হয়ে যাবে। একজন সন্ন্যাসী, একজন ব্রহ্মচারী, একজন সাধক তাঁরা যে ব্রত নিয়েছেন, এনারা কিন্তু কোন অবস্থাতেই, তা চাপে পড়েই হোক বা একটুখানি নিয়মের বাইরে করে দেখাই যাক না, এই মনোভাব নিয়ে কখনই অন্য রকম কিছু করবেন না। কারণ তাঁদের লক্ষ্য এসবের থেকে অনেক উঁচুতে।

রাজযোগে যেসব কথা আলোচনা করা হয়েছে এগুলো শুধু তাদেরই জন্য যাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চ। সর্বশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য যখন হবে তখন জগতের সব কিছু এমনকি প্রকৃতিও তাঁর কাছ থেকে খসে পড়ে যাবে। তখন কি হবে? **তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গণবৈতৃষ্ণ্যম্।।১৬।।** আমাদের বৈরাগ্য যেটা হওয়ার সেটা হয় বস্তুর প্রতি। আপনার মিষ্টির প্রতি বৈরাগ্য হয়ে গেছে, আমার সিনেমার প্রতি বৈরাগ্য হয়ে গেছে, সাধুদের কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি বৈরাগ্য হয়ে গেছে। বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এরপরও একটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। গীতায় বলছেন *রসবর্জং রসপোহস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, আপনি বস্তু ত্যাগ করে দিতে পারেন, কিন্তু বস্তুর রসটা কোথায় যাবে! স্বামী স্ত্রীর থেকে বিরক্ত, স্ত্রী স্বামী থেকে বিরক্ত। বুড়ো বুড়ি থেকে বিরক্ত, বুড়ি বুড়ো থেকে বিরক্ত। সারাটা জীবন একজন একজনের থেকে শুধু জ্বলাই পেয়ে এসেছে। এই যে একজন আরেকজনের থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাইছে, তার মানে তাদের তো আর পুনর্জন্ম হবে না। কিন্তু তাও তো পুনর্জন্ম হচ্ছে। কারণ তাদের ভেতরে যে রস, রস মানে কাম, ওই কামের রস তো থেকে গেছে। আজকে যদি বুড়ো বুড়ির কাউকে কুড়ি-একুশ বছরের যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন তাকে আর আটকে রাখা যাবে না, কোথায় কোন ভোগের মধ্যে বাঁপিয়ে পড়বে ঠিক নেই। ডায়বেটিকসের রোগী মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু মিষ্টি খাওয়ার রস তো তার চলে যায়নি। আপনি বস্তু ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বস্তুর তন্মাত্রা কোথায় যাবে? তন্মাত্রারও উপরে রয়েছে অহঙ্কার, মহৎ আর সবার উপরে রয়েছে তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো আর তমো। এই তিনটে গুণের খেলাই উপর থেকে নীচ সর্বত্র চলছে। জগতে যা কিছু দেখছি সবই এই তিনটে গুণের মিশ্রণে তৈরী। সূত্রে বলছেন *গুণবৈতৃষ্ণ্যম্*, এই তিনটে গুণের প্রতিও যদি আপনার বিতৃষ্ণা এসে যায় তখন আপনি জানতে পারবেন আপনি কে। এটাই বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ অবস্থা। যাঁর তীব্র বৈরাগ্য লাভ হয়েছে তাঁর কাছে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। আমরা সবাই সব সময় বৈরাগ্যের অনুশীলন করে যাচ্ছি। যখন পায়খানা প্রস্রাবাদি করছি তখনও তো ত্যাগই করছি, যখন ঘাম বেরোচ্ছে সেটাও তো বৈরাগ্যই, যে কোন বিসর্জন মানেই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য কি আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে? ত্যাগ

করলেই কি বৈরাগ্য হয়ে যাবে? কখনই হবে না। প্রথমে হয় বস্তু ত্যাগ, বস্তু ত্যাগের আরও উপরে হবে তন্মাত্রা ত্যাগ। শেষে তিনটে গুণের প্রতি যে আসক্তি, সেটাও যখন চলে যায় তখন পুরুষ তাঁর ঠিক ঠিক যে স্বরূপ, সেই স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হবে বৈরাগ্য তো তেমন কিছুই নয়। কিন্তু তা নয়, স্বামীজী বলছেন, অন্ধকার ও অলসতা হল তমো, কাজকর্ম হল রজো আর এই দুটোর সামঞ্জস্য হল সত্ত্ব। যখন এই তিনটে গুণের প্রতিও আপনার বিতৃষ্ণা এসে গেল তখন আপনি প্রকৃতির এলাকাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। প্রকৃতির এলাকাকে ছাড়িয়ে যাওয়া মানে নিজের স্বরূপ বা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে গেলে কিংবা যখন সাধনা শুরু হয়েছে তখন থেকে যেমন যেমন মনের বৃত্তি নাশ হতে হতে মন যত একাগ্র হতে থাকে তখন সমাধি হতে শুরু হয়। যোগ মতে সমাধি দুই প্রকার। সাধারণ সমাধিকে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত মানে ঠিক ঠিক জ্ঞান। ঠিক ঠিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বলে সমাধি। আর দ্বিতীয় হল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি

আমরা প্রথম থেকে আলোচনা করে যাচ্ছি, যখনই বাইরের কোন বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে নাড়িয়ে দেয় তখন আমাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। চিত্তের এই চাঞ্চল্যতাকে বলছেন বৃত্তি। সব সময় যে বাইরের বস্তু থেকেই চাঞ্চল্য আসবে তা নয়। আপনার বিপর্যয় অর্থাৎ একটা মিথ্যা জ্ঞান হয়ে থাকতে পারে, বিকল্প অর্থাৎ কোন শব্দ কানে এসেছে সেখান থেকে আপনার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তার সঙ্গে নিদ্রা আর স্মৃতি এই পাঁচ রকমের বৃত্তি আমাদের চিত্তে সব সময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে চলেছে। চিত্তের এই চাঞ্চল্যতাকে শান্ত করাকেই যোগ বলছেন। দুম্ করে এক ধাপেই এই চাঞ্চল্যতা বন্ধ হয় না, এর জন পর পর কয়েকটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে বৃত্তির সংখ্যাকে কমান। যখন কোন পার্টিতে যাচ্ছি সেখানে নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া, হৈহুল্লোড় সব কিছু হচ্ছে, মন তখন অনেক কিছুতে লেগে আছে। এখানে আমরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কথা শুনছি, মন এখন একটা বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের মনে এখানে অনেক কম বৃত্তি উঠছে। এটাই যদি ফোর ফাইভের কোন ক্লাশ হত তাহলে অনেক বেশী বৃত্তি উঠত। কোন ছেলে শুনছে, কোন ছেলে দুষ্টুমি করছে, কোন ছেলে দুষ্টুমি করার প্ল্যান করছে, কোন ছেলে শিক্ষকের ছবি আঁকছে। কিন্তু এই ক্লাশে হয় আপনারা মন দিয়ে শুনছেন, নয়তো ঝিমোচ্ছেন, বৃত্তি মোটামুটি সীমিত হয়ে যাচ্ছে। জগতের মাঝখানে, সংসারের মধ্যে যখন বিচরণ করছি তখন আমাদের বৃত্তি সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। যোগী বলছেন আমাকে বৃত্তির সংখ্যাটা কমাতে হবে। বৃত্তির সংখ্যা কমানোর উপায় কী? কোন একটা বস্তুতে নিজের মনকে একাগ্র করা।

যোগী কোন গুরুর কাছে গেলেন। গুরু তাঁকে একটি ইষ্টমন্ত্র দিয়ে বলে দিলেন ‘তুমি এই ইষ্টমন্ত্র জপ কর আর শিবমূর্তির উপর ধ্যান কর’। এবার যোগী শিবের উপর ধ্যান করতে শুরু করলেন। আরকেজন যোগী তিনি আবার ভগবান-টগবান মানেন না, গুরু তাঁকে বলে দিলেন ‘ঠিক আছে তোমাকে ভগবান মানতে হবে না, তুমি এই কলমের উপর ধ্যান কর, কলমের চিত্তা ছাড়া অন্য কোন চিত্তা যেন মনে না আসে’। অনেক গুরু ধ্যানের ক্লাশে দেওয়ালে বড় করে একটা কালো বিন্দু এঁকে দিয়ে ওই কালো বিন্দুর উপর মনঃসংযোগ করতে বলে দেন। এখন এরা সবাই সাত দিন, সাত মাস, বছরের পর বছর এইভাবে ধ্যান করে যাচ্ছে। কিছুই হচ্ছে না। এত দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে কিছু তো অন্ততঃ হবে। তাহলে কি হবে? তখন বলছেন এই ভাবে ধ্যান করলে তোমার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কী? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চার ধরণের আলাদা আলাদা সমাধি হয়। পরের সূত্রে এই চার রকম সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথাই বলছেন **বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ/১১৭/।** বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চার প্রকারের সমাধিকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত। কিন্তু যখন বলা হয় তখন প্রত্যেকটির সাথে ‘স’ লাগিয়ে বলা হয় – সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দা ও সাস্মিতা।

সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি

যখন কোন স্থূল জিনিষের উপর আমরা ধ্যান করার চেষ্টা করি, তখন ঐ বস্তুটির উপর মন পুরো একাগ্র হয়ে যায় – যেমন ভগবানের কোন রূপ বা বিগ্রহের উপরে ধ্যান করছি মানে, তখন মন ঐ রূপ বা বিগ্রহেই ডুবে গেছে। ধরুন এই কলমের উপর আপনি ধ্যান করছেন। আপনি যখন সামনে থেকে আমার হাতে কলম দেখছেন তখন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, দেওয়াল দেখতে পাচ্ছেন, টেবিল দেখছেন তার সঙ্গে এই কলমটাও দেখছেন। এখন কলম ছাড়া অন্য যত বস্তু আছে তার সব কটাকে আপনি মন থেকে ছেড়ে দিয়ে শুধু এই কলমের উপরেই মনকে একাগ্র করে ধ্যান করছেন। যেমন অর্জুন যখন পাখির চোখকে নিশানা করেছেন তখন তিনি চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। যখন ধ্যেয় বস্তু ছাড়া অন্য আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না তখন একে বলছেন সবিতর্ক সমাধি। সবিতর্ক সমাধিতে শুধু বস্তুর উপর ধ্যান করে যাচ্ছেন, ওই বস্তু ছাড়া অন্য সব বস্তু তার মন থেকে খসে পড়ে গেছে। যখন এই একটি বস্তুর উপরে মনকে পুরো একাগ্র করে ধ্যান করতে পারছেন তখন এই বস্তুর ব্যাপারে আপনি সব কিছু জেনে যাবেন। আপনি যদি দু বছর, পাঁচ বছর ধরে শুধু জলের উপর ধ্যান করে যান তখন জল তার নিজের ব্যাপারে সব কিছু আপনাকে বলে দেবে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা, যাঁরা অনেক বছর ধরে একটা সমস্যা নিয়েই পড়ে থাকেন, একটা সময় সেই বস্তু নিজেই নিজেকে তাঁর সামনে পুরোপুরি উন্মোচন করে দেয়। অর্কিমিডিস যে চিৎকার করে বলে উঠলেন ইউরেকা ইউরেকা, তিনিও একটা সমস্যাকে নিয়ে ধ্যানে ডুবে গিয়ে সবিতর্ক সমাধির অবস্থায় চলে যেতেই সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন। আমি আপনি যখন বাথটাবে স্নান করছি তখন আমরাও নিজেকে হাল্কা মনে করছি, তাই বলে কি আমরা ওই গাণিতিক সূত্র দিয়ে সব সমাধান বার করে দিতে পারব? কখনই পারব না। অর্কিমিডিস ল অফ বোয়েন্সির ফর্মুলা দিয়ে বার করে দিলেন রাজমুকুটের সোনাতে ভেজাল আছে। কত গভীর ভাবে তিনি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তিনি অন্য আর কিছু ভাবছেন না শুধু এই প্রপার্টির উপর, সোনা আসল না নকল। প্রকৃতি হঠাৎ নিজেকে অর্কিমিডিসের কাছে খুলে দিল। যে কোন জিনিষ, যে কোন সমস্যা, যে কোন বস্তুর উপর যদি কেউ ধ্যান করতে থাকেন সেই বস্তু একটা সময়ে তার রহস্য ধ্যাতার সামনে উন্মোচন করে দেবে।

তবে আমাদের মনঃসংযোগের ক্ষমতা আর নিউটনের মত বিজ্ঞানীর মনঃসংযোগ ক্ষমতার মধ্যে গুণগত তফাৎ থাকবে। নিউটনের মন অনেক উন্নত, যে জিনিষটা তিনি যত তাড়াতাড়ি বার করে দেবেন, আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো দ্বিগুণ বা তিনগুণ সময় বেশী লাগবে। যে কোন একটা জিনিষকে নিয়ে শুধু ভাবতে থাকুন, ভাবতে ভাবতে আপনার চিন্তা যত তীব্র ও গভীর হতে হতে যেমনি সমাধি অবস্থায় চলে যাবে সেই সমাধিকে বলছেন সবিতর্ক সমাধি। সবিতর্ক সমাধিতে ওই বস্তুর জ্ঞান পুরোপুরি হয়ে যাবে। নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বার করলেন, সেটাও এই একই পদ্ধতিতে এসেছে। আমরা মনে করছি গাছ থেকে আপেল পড়ল আর নিউটনের কাছে মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে গেল। এই ভাবে কখন হয়নি। নিউটনের বায়োগ্রাফিতে বর্ণনা আছে, উনি এই সব নিয়ে দিনরাত পড়াশোনা করতেন, চিন্তা ভাবনা করে যেতেন। এর মধ্যে সেই সময় একবার নিউটন খুব কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁকে একটা ফার্ম হাউসে এক বছর একা থাকতে হয়েছিল। সেখানে তাঁর কিছুই করার ছিল না। সেখানেও তিনি সারাদিন এই সমস্যা নিয়ে ভাবছেন তো ভাবছেন, এটাই সমাধি। কিন্তু সবিতর্ক সমাধি, এই সমাধিতে বস্তু জ্ঞান হয়। বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন যত আবিষ্কার সব এই সবিতর্ক সমাধিতেই হয়।

কিন্তু মনকে কোন স্থূল বস্তুতে একাগ্র করার পর দেখছি বস্তুও সেই পঞ্চ মহাভূতের তৈরী। যেমন জল, জল তৈরী হয়েছে পঞ্চ মহাভূত দিয়ে। এখন বস্তুকে সরিয়ে বস্তুর ঐ পঞ্চ মহাভূতের উপর মনকে একাগ্র করার পর যে সমাধি হবে তখন সেই সমাধিকে বলছেন নির্বিতর্ক সমাধি। সবিতর্কের আরেকটা নাম হয়ে গেল নির্বিতর্ক সমাধি। নির্বিতর্কে কি হয়, ঐ স্থূল বস্তুতে মনকে একাগ্র না করে বস্তুর উপাদানের উপরে ধ্যান করা হচ্ছে, ঐ ধ্যানের মাধ্যম দিয়ে আপনি বস্তুর উপাদান গুলি জেনে গেলেন। স্বামীজী আবার দেশ ও কালের বাইরে চিন্তা করার কথা বলছেন। তার মানে যেমন এই গ্লাশের জল

দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু শুধুমাত্র জল, জল বস্তুর উপর যখন ধ্যান করা হয় তখন সেটা দেশ ও কালের বাইরে চলে যাবে, তারপরে আসবে পঞ্চ মহাভূত, তখন যে সমাধি হয় তাকে নির্বিতর্ক সমাধি বলছেন।

সবিচার ও নির্বিচার সমাধি

এবার যদি আরেক ধাপ পেছনের দিকে চলে যাওয়া হয়, যেমন এই জল পঞ্চ মহাভূতের তৈরী, এই পঞ্চ মহাভূতের পেছনে আছে মহাভূত মানে তন্মাত্রা। এতক্ষণ আপনি শুধু জলের উপর ধ্যান করছিলেন, সেখান থেকে এবার আপনার মন জলের তন্মাত্রার স্তরে চলে গেছে, আপনি দেখছেন জগতে যা কিছু আছে সব পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত। তখন আপনার তন্মাত্রার জ্ঞান হয়ে যাবে। আমাদের ধ্যান যখন হয় তখন ঠিক এভাবেই ধাপে ধাপে যায়। যাঁরা প্রথম অবস্থায় ঠাকুরের ধ্যান করতে শুরু করেছেন তাঁরা হয়তো এই ব্যাপার গুলো বুঝতে পারবেন না, কিন্তু সব ধ্যানের পদ্ধতি ও ধাপ একই। প্রথমে স্থূল বস্তু, স্থূল ভূত থেকে চলে যায় পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত থেকে চলে যায় পঞ্চ তন্মাত্রার উপর। যখন বস্তুর তন্মাত্রার উপর ধ্যান হচ্ছে, তার মানে স্পষ্ট দেখছেন এই বস্তু এই এই তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। তখন সেখানে যে সমাধি হবে সেই সমাধিকে বলছেন সবিচার সমাধি। এখান থেকে যখন এর পারে চলে যাবে, পারে চলে যাওয়া মানে দেশ কালে নয়, শুধু তন্মাত্রায়। তখন দেখছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা কিছু আছে সব তন্মাত্রা দিয়েই তৈরী। এখন শুধু জলের তন্মাত্রা নয়, শুধু তন্মাত্রায় মন চলে গিয়ে সমাধি হয়ে গেছে তখন তার সেই সমাধিকে বলছেন নির্বিচার সমাধি। নির্বিচার সমাধি যাঁর হয়ে গেছে, বুঝে নিন জগতের সমস্ত বস্তুর উপর তাঁর ক্ষমতা চলে এসেছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন সমুদ্রের পুরো জলকে পান করে নিতে পারবেন। অগস্ত্য মুনি যে সমুদ্রের জল পান করে নিয়েছিলেন, সেখানেও তাঁর নির্বিচার সমাধি হয়ে গিয়েছিল বলেই তন্মাত্রার উপর তাঁর পুরো ক্ষমতা এসে গিয়েছিল।

সানন্দা সমাধি

এই যে বিচার চলছে, বুদ্ধি দিয়েই বিচার করা হচ্ছে। যত জ্ঞান হয় সব বুদ্ধি দিয়েই হয়। এখন যে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা হচ্ছে সেই বুদ্ধির উপরে মনকে একাগ্র করে যে সমাধি হচ্ছে তাকে বলছেন সানন্দা সমাধি। তবে এখানে বুদ্ধি বলতে নিজের বুদ্ধি, নাকি সমষ্টি বুদ্ধির কথা বলছেন ঠিক পরিষ্কার নয়। কিন্তু এখানে সমষ্টি বুদ্ধি হওয়ারই কথা। সমষ্টি বুদ্ধির উপর অর্থাৎ মহৎ তত্ত্বের উপর যখন ধ্যান করা হয় এবং তখন যে সমাধি হবে তাকেই বলছেন সানন্দা সমাধি। মহৎ থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। সানন্দা সমাধিতে আপনি মহৎএর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। মহৎএর নীচেই অহঙ্কার। স্বামীজী এখানে পরিষ্কার করে বলেননি, এই অহঙ্কার নিজের অহঙ্কার নাকি সমষ্টি অহঙ্কার। আসলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সমষ্টি অহঙ্কার আর সমষ্টি বুদ্ধির সাথে ব্যষ্টি অহঙ্কার ও ব্যষ্টি বুদ্ধির বিশেষ তফাৎ নেই। যখন বুদ্ধির উপর ধ্যান করে সমাধি লাভ হয়ে যাচ্ছে, এখানে আর কোন চাঞ্চল্য নেই শুধু বুদ্ধির বোধটুকু আছে তখন সেই সমাধিতে বিরাট এক আনন্দের অনুভব হয়, এটাকে তাই বলছেন সানন্দা সমাধি।

সাস্মিতা সমাধি

আর যখন অহঙ্কারের উপর ধ্যান করে সমাধি হয় তখন অস্মির ভাবটুকু থেকে যায়, আমি আছি এই বোধটাই একমাত্র থাকে, এই সমাধিকে বলছেন সাস্মিতা সমাধি। এখানে স্বামীজী কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন সাস্মিতা সমাধিতে যখন কেউ চলে যান তখন তাঁকে প্রকৃতিলীন বা প্রকৃতিলয় পুরুষ বলে। প্রকৃতিলীন পুরুষের নিজের শরীরের বোধ আর থাকে না, তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই নিজের শরীর দেখেন। সেইজন্য তখন তাঁর শরীরকে কেটে দিলেও তাঁর কোন কিছুর বোধ হয় না, কারণ তিনি নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন।

- - - -

এবার আমরা যদি সৃষ্টিতত্ত্বকে আরেকবার সংক্ষেপে আলোচনা করে নিই তাহলে পুরো জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার হাতে এই কলম আছে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা মেনে নিচ্ছি কলমটা পুরো

লোহা দিয়ে তৈরী। এই লোহা তৈরী হয়েছে পঞ্চভূত দিয়ে, যার মধ্যে পাঁচটি তত্ত্ব (আকাশ, তেজ, জল, বায়ু ও পৃথিবী) আছে সেগুলো মিলেমিশে এই লোহা তৈরী হয়েছে। এই পঞ্চভূতের পেছনে রয়েছে পঞ্চ তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ)। পঞ্চ তন্মাত্রার পেছনে রয়েছে অহঙ্কার। অহঙ্কারেরও পেছনে আছে বুদ্ধি বা মহৎ তত্ত্ব। মহৎ তত্ত্বের পেছনে রয়েছে সত্ত্ব, রজো ও তমো অর্থাৎ প্রকৃতি। তাহলে এই যে কলম, এই কলমের অনেকগুলো অস্তিত্ব রয়েছে। এক কলমের কলম রূপে অস্তিত্ব রয়েছে, এর পঞ্চভূত রূপে অস্তিত্ব রয়েছে, তন্মাত্রা রূপে অস্তিত্ব রয়েছে, অহঙ্কার রূপে অস্তিত্ব রয়েছে, মহৎ রূপে অস্তিত্ব রয়েছে আর প্রকৃতি রূপেও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পুরুষ রূপে বা চৈতন্য রূপে এর অস্তিত্ব নেই। এবার আমরা এর এক একটা অস্তিত্বের রূপকে নিয়ে ধ্যান করছি। ধ্যান মানে আমাদের মন এখন একটা বস্তুর উপর একাগ্র হয়ে গেল, তখন একটা শক্তি এসে গেল। যখন কলমের তন্মাত্রার উপর ধ্যান করছি তখন আমাদের এক রকমের জ্ঞান এসে যাবে। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম knowledge is power, যখন কোন বস্তুকে জেনে গেলাম তখন আমাদের সেই বস্তুর উপর ক্ষমতা এসে যাবে। এরপর এর পেছনে রয়েছে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্বকে জানতে পারলে আরেক রকম ক্ষমতা এসে যাবে। তারও পেছনে রয়েছে বুদ্ধি তত্ত্ব, সেটাকেও যখন জেনে গেলাম তখন অন্য রকম ক্ষমতা এসে গেল। এখানেও আমরা কিন্তু ফেঁসে আছি। কেন ফেঁসে আছি? কারণ এখনও আমরা প্রকৃতির এলাকার মধ্যেই পড়ে আছি। এই অবস্থায় মৃত্যু হয়ে গেলে আবার জন্ম নিতে হবে। কিন্তু এবার বিরাট ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মাবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে রাজা সুরথ আর বৈশ্য সমাধির কথা বলা হচ্ছে, রাজা সুরথ আবার জন্ম নেবে কিন্তু সমাধিকে আর জন্ম নিতে হবে না। আমাদের যদি এখন একটা একটা করে সমাধি হয়, তা সে সানন্দাই হোক আর সাস্মিতাই হোক আবার সবিতর্কই হোক বা সবিচারই হোক তাতে আমাদের মধ্যে বিরাট ক্ষমতা এসে যাবে। তাই না, এবার যদি এই অবস্থায় কেউ মারা যায় সে হয়তো কোন দেবতা হয়ে জন্ম নেবে, হয়তো ইন্দ্র হয়েই জন্ম নিল, মানে বিরাট কিছু হয়ে জন্মাবে। কিন্তু জন্মাতে আমাদের সবাইকেই হবে। আর প্রকৃতির লীলা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের সবাইকেই আবার প্রকৃতির মধ্যে বীজাকারে পড়ে থাকতে হবে। আবার পরের কল্পে যখন প্রকৃতির লীলা শুরু হবে তখন আবার আমরা জন্মাব, চক্রাকারে এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতেই থাকবে। কত দিন চলবে? যত দিন না অসম্প্রজাত সমাধি হচ্ছে। সম্প্রজাত সমাধি, মানে আপনার আমার মনের বিরাট একাগ্রতা এসে গেছে, কিন্তু এই সমাধিতে আমাদের কারুরই কোন দিন মুক্তি হবে না।

স্বামীজী ইডি স্টার্ডিকে একটা চিঠিতে বলছেন, যখন কেউ ধ্যান করতে শুরু করে তখন ধ্যান করতে করতে এক সময় দেখে সমগ্র জগতের বস্তু সমুদয় এই কটি দ্রব্য দ্বারা নির্মিত, তারপর দেখে না তা নয়, সবটাই যেন শক্তি। তারও পেছনে যখন চলে যায় তখন দেখে দ্রব্য, শক্তি কিছুই নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবটাই মন। এই মনকেও যখন ছাড়িয়ে যায় তখন দেখে শুধু আমিই আছি, তখন ব্রহ্মার সঙ্গে নিজেকে এক মনে করে। এখানে সে কিন্তু চাইলেই একটা নতুন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে দিতে পারে, কিন্তু করে না। এই অবস্থাকে বলছেন প্রকৃতিলীন বা প্রকৃতিলয়। কিন্তু এখানেও সে ফেঁসে থাকে, এখান থেকেও সে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। এর পরের স্তরে এই অবস্থাকেও যখন সে ছেড়ে দেবে, আগের সূত্রে যেখানে বলছেন তৎপরং পুরুষখ্যাতেঔর্গবৈতৃষ্ণম্, তিনটে গুণের প্রতিও যদি তার বিতৃষ্ণা হয়ে যায়, তখনই একমাত্র সে ছাড়া পাবে। এখন অহঙ্কারে এসে ফেঁসে আছে, শুধু আমি ভাবটা তার এখনও থেকে গেছে।

যোগদর্শন পড়লে বোঝা যায় আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ কত সুদীর্ঘ ও সাধনসাপেক্ষ। ভক্তিতে আমাদের কত সহজে বলে দেয় ঠাকুরকে ধ্যান কর, চিন্তা কর মৃত্যুর সময় তিনিই তোমাকে রামকৃষ্ণলোকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ভক্তি আর যোগের কথা কি কখন আলাদা কথা হতে পারে! কখনই হতে পারে না। যাঁরা ভক্তিপথে সাধনা করছেন তাঁকেও ঠিক এই একই পথ দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে ঠাকুরই নিয়ে যাবেন। নিয়ে তো যাবেনই কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন আর কতদিনে নিয়ে যাবেন কেউ বলতে পারবে না। মৃত্যুর পর যে রামকৃষ্ণ লোকে যাচ্ছে তাকেও ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন আবার যে নরকে যাচ্ছে তাকেও ঠাকুরই নরকে নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে

এগুলো সব মুখের কথা। যোগশাস্ত্র যখন পড়া হয়, পড়ার পর যখন যোগ সাধনায় নামবে তখন সমস্ত রকম চালাকি, মুখের কথা, ধাপ্লাবাজী সব বন্ধ হয়ে যাবে। যোগের সামনে এসে দাঁড়ালে বোঝা যাবে তুমি এখন কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছ আর তোমাকে এখন কি কি করতে হবে। আধ্যাত্মিক পথে যা হবার সব এই পথ দিয়ে এভাবেই হবে আর ঈশ্বর দর্শন, নির্বিকল্প সমাধি, জীবনমুক্ত যাই বলুন ওই অবস্থায় পৌঁছাতে হলে সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। যেমন যেমন আপনার মনের একাগ্রত বাড়বে তেমন তেমন মন উচ্চস্তরে যাবে, যেমন যেমন সমাধি হবে তেমন তেমন আপনার ক্ষমতা আসবে। কি করে বুঝবেন? পাঁচ জন লোক আপনাকে মানতে শুরু করবে, আপনার কথা সবাই শুনতে চাইবে, আপনার কথাকে সবাই বিশ্বাস করবে। ঠাকুর বলছেন – কেশবের ধ্যানটুকু ছিল বলে এত মান সম্মান। ধ্যান মানে কেশব সেনের মনের একাগ্রতা একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিল।

সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দা ও সাস্মিতা এই সমাধির মধ্যে দিয়ে গেলে তখনই তাঁর ক্ষমতা আসে। ক্ষমতাও কিন্তু যেমন যেমন এগোবে তেমন তেমন বাড়তে থাকবে, অনেক জায়গায় একেবারে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে কোন সমাধিতে কি ধরনের ক্ষমতা আসবে। তন্মাত্রাতে যদি সবিচার সমাধি হয়ে যায় তখন তিনি তন্মাত্রার মালিক হয়ে গেলেন। এখন তিনি যদি বলেন রসগোল্লা এসে যাক, সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লা চলে আসবে। কারণ তন্মাত্রার উপরেই এখন তাঁর পুরো নিয়ন্ত্রণ এসে গেছে। বাতাস যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, রসগোল্লাও সেই একই তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, রসগোল্লার ক্ষেত্রে তন্মাত্রার কিছু combination পাল্টে দিতে হবে, তার বাইরে আর কিছু করতে হবে না, তখন বাতাসটাই রসগোল্লা হয়ে যাবে। মুর্থ লোকেরা যে বাবাজীদের পেছনে দৌড়ায় এই ধরনের কিছু চমৎকারী দেখিয়ে দিয়েছে বলেই দৌড়াচ্ছে। যাঁর তন্মাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ এসে গেছে তিনি কী আবার চমৎকার দেখিয়ে বাহবা কুড়োতে যাবেন! তাঁর ভারী বয়ে গেছে চমৎকার দেখাতে! যেখানেই কেউ চমৎকারী দেখাচ্ছে বুঝে নিন কিছু গোলমাল আছে আর তা নাহলে পরিষ্কার মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। যিনি এই তন্মাত্রার উচ্চস্তরে চলে এসেছেন, যিনি স্পষ্ট দেখছেন যে জিনিষ দিয়ে বাতাস তৈরী সেই জিনিষ দিয়ে রসগোল্লাও তৈরী, তিনি কেন কাউকে দেখাতে যাবেন যে এই দেখো বাতাস থেকে আমি রসগোল্লা বানিয়ে দিলাম? তাঁর ভারী বয়ে গেছে। প্রথমেই তাঁর মনে হবে এরা সব মুর্থ। কী উদ্দেশ্যে তিনি এসব দেখাতে যাবেন? বলবেন কটা টাকার জন্য। কেন টাকার জন্যও যাবেন? তিনি জানেন যে তন্মাত্রা দিয়ে বাতাস তৈরী সেই তন্মাত্রা দিয়ে সোনা তৈরী, তাঁর টাকার দরকার হলে বাতাস থেকেই সোনা বানিয়ে নেবেন। এরপর তিনি টাকার জন্য পাঁচটা বড়লোকের পেছনে কেন ছুটতে যাবেন! আসলে যেসব বাবাজীরা বড়লোকদের হাতে রাখছে, শিষ্য বানাচ্ছে বুঝে নিন এদের কোন সমাধি-ফমাধি কিছুই হয়নি, মুখেই ফড়ফড়ানি। একটু ধ্যান করেছেন, মন একাগ্র হয়েছে তাতে একটু শক্তি হয়েছে সেটা দিয়ে নাম-যশ পেয়ে গেছেন। যাঁর বস্তু জ্ঞান হয়ে গেছে, বস্তুর তন্মাত্রার উপর যাঁর সমাধি হয়ে গেছে তিনি তো সমস্ত নাম-যশের উর্ধ্বে চলে গেছেন, জগৎকে তিনি থোরাই কোন পাত্তা দিতে যাবেন!

আমরা দৈনন্দিন যে সাধনা করি সেখানে যখন ধ্যান করছি সেটা ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে ধরতে পারি না। এগুলো আমাদের সবারই একটু জেনে নেওয়া দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে ধ্যান করার সময় আমরা কি করছি? প্রথমে দেখছি ঠাকুরের ছবি, তারপর তাঁর রূপ। যখন ধ্যান শুরু করা হয়, প্রথমে হাত কিংবা পা, এরপর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ আলাদা আলাদা ভাবে ধ্যান করা হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে ঠাকুরের সমগ্র শরীরটা ধ্যানে নিয়ে আসতে থাকে। ঠাকুরের সমগ্র শরীর যখন ধ্যানে আসে তখন কিন্তু মূর্তি বা ছবি রূপে আসেনা, তখন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জীবন্ত মনে হবে। আমরা সব কিছুকে তিন মাত্রায় দেখি (three dimensions), কিন্তু যখন সাধারণ অবস্থায় ধ্যান করি তখন দুই মাত্রাতেই (two dimensions) ধ্যান করি, আসলে আমরা ছবির ধ্যান করি, আর তা নাহলে ঠাকুরের মূর্তির ধ্যান করি। এটাকে ধ্যান বলে না, এটাকে বলা হয় চিন্তন করা, একটা কিছুতে মনটাকে কল্পনা করে করে একাগ্র করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধ্যানে কিন্তু প্রথমেই তিন মাত্রায় চলে যাবে। তিন মাত্রায় যখন চলে গেল তখন মন এখন ধ্যানের একাগ্রতায় চলে এসেছে – সবিতর্কে পৌঁছে গেল। এখান থেকে কিছু অনুভূতি আসতে থাকবে। আমরা যখন ঠাকুরের কথা চিন্তা করি তখন মূলতঃ আমরা ঠাকুরের কল্পনাই

করি। যাই হোক, এখন ঠাকুরের খুব গভীর ধ্যান হচ্ছে, সেখানে কোন একটা কারণে দেখলেন ঠাকুরের একটা হাত উপরে উঠে গেছে। আমি চাইছি ঠাকুরের হাতটা যেন নেমে আসে। কিন্তু তখন মন এত একাগ্র হয়ে আছে যে, আমি আর ঠাকুরের হাত নামাতে পারছি না। অথবা মনে হল ঠাকুরের গালে একটা মাছি বসে আছে। মন ধ্যানে এত একাগ্র হয়ে গেছে যে ঠাকুরকে যতখানি জীবন্ত মনে হচ্ছে ঠাকুরের গালের মাছিটাকেও ততটাই জীবন্ত মনে হবে। এখন আমি চাইলেও ঐ মাছিটাকে উড়িয়ে দিতে পারব না। এগুলি হল ধ্যানের গভীরতার প্রাথমিক ধাপ।

যত ধ্যানের গভীরে যেতে থাকবে ততই এই জগতের ব্যাপারে যে ধারণাগুলি আছে তার পরিবর্তন হতে থাকবে। এই জগৎটাকে এত দিন জুল জড় পদার্থের মনে হত, কিন্তু ধ্যানের গভীরে যত প্রবেশ করবে তখন দেখতে থাকবে এই জগৎ হচ্ছে পঞ্চভূতের সমষ্টি। ঠাকুর বলছেন – রসগোল্লাতে কি আছে, গলার তলায় চলে গেলেই শেষ। লাট সাহেবের বাড়ি দেখে বলছেন ইটের ঢিপি। লাট সাহেবের বাড়িটা কি দিয়ে তৈরী? লাট সাহেবের বাড়ি যে উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয়েছে সেই জিনিষ গুলিকেই ঠাকুর দেখছেন। রসগোল্লাতে কি – দুধ, চিনি আর লেবুর রস। দুধে লেবু দিলে দুধ ছানা হয়ে গেল, ছানার সাথে চিনি মিশিয়ে রসে ডুবিয়ে দিলে রসগোল্লা হয়ে গেল। এখন দুধ, চিনি আর লেবু মিশিয়ে গ্লাশে করে খেতে দিলে রসগোল্লার মত কি এক খেতে লাগবে, আপাতভাবে এক লাগবে না কিন্তু কার্যত এক। কিন্তু রসগোল্লা খাওয়ার সময় কি কেউ বলে দুধ আর চিনি খাচ্ছি। এরপরে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন দুধ আর চিনিকেও আলাদা আলাদা করে তাদের তন্মাত্রা গুলিকেই পরিষ্কার দেখতে সক্ষম হবে।

আরও পরিষ্কার করে যদি বলা হয়, সূর্যে আসলে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাস ছাড়া কিছু নেই। সেখান থেকে এই দুটো গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে পৃথিবীতে এসে এটা মিষ্টি এটা তেতো, করলা, তেঁতুল, আম, কলা, চাল, গম যা খাচ্ছি, আর এ সুন্দরী, এ বুড়ি, এ বুদ্ধিমান, এ মুর্থ এত রকমের বিভিন্ন জিনিষ এসে যাচ্ছে। আর আইনস্টাইনের সহজ থিয়োরিতে চলে গেলে সেখানে পাব – All these matter, atom, electron are nothing but condensed form of energy. কিন্তু আমরা কি এনার্জি দেখছি? রাজযোগ তো এই একই কথা বলছে। যোগ যখন তন্মাত্রার কথা বলে তখন তারা সেই অবস্থাতে চলে গেছে যেখানে সে আর কিছুই জড় দেখছে না, সে শক্তিকেই দেখছে, যদিও পদার্থ বিজ্ঞান থেকে কিছুটা আলাদা। আমি যদি বলি এই বোতল কতকগুলি পরমাণুর সংমিশ্রণ আর বোতলের জলও কয়েকটি পরমাণুর সংমিশ্রণ। এগুলো আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি, আমরা কখনই এর প্রকৃত স্বরূপকে দেখতে পাই না। আর যদি বলি এরা সব ইলেকট্রনের সমষ্টি, সব একই জিনিষের সৃষ্টি, ভুল কিছু বলা হচ্ছে না। আরও এগিয়ে যদি বলি এগুলো সব এনার্জির ঘনীভূত রূপ, এনার্জির সমুদ্রে এটা একটা ঘনীভূত ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়, এতে কোন ভুল নেই। আমরা যা দেখছি সব এনার্জির সমুদ্রের এক একটা ঢেউ রূপে কখনই দেখছি না। কিন্তু যাঁরা দেখেন তাঁরা সত্যিই সেই এক বস্তু দেখছেন। ঠাকুর যেমন বলছেন – সন্দেশ আর বিষ্ঠা এক, কোন পার্থক্য নেই। তা ঠাকুর কি তাত্ত্বিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে কথা গুলো বলছেন? এনারা একবারে সত্যি সত্যিই এক জিনিষ দেখছেন। যোগীরা ঐ অবস্থায় সব তন্মাত্রাই দেখেন। এটাকেই আবার বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বলবে।

তন্মাত্রার পর আসছে বুদ্ধি। এখানে দেখছেন – আরো! সমস্ত কিছু তো কেবল মনেরই প্রকাশ। এখন সে বিষয় বস্তু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছে। এই জগতে যা কিছু আছে সবই আমারই মনের প্রতিক্রিয়া। এখন আমার মনটাই হয়ে গেল ধ্যানের বিষয়। সব কিছু উড়ে গেছে, শুধু মন পড়ে আছে। এখানে যে সমাধি হয় এই সমাধিকে বলছে সানন্দা।

সব শেষে আসছে অস্মিতা, অহং ভাব। এখন আর কিছু নেই, মনও চলে গেছে, কেবল অহংভাব পড়ে আছে। জগতের যা কিছু আছে সব আমিই, আমারই প্রকাশ। আমিই একমাত্র আছি। এই আমিটা মনেরই একটা দিক মাত্র। এখানে এসে যখন পুরো একাগ্র হয়ে সমাধি হয় তখন এই সমাধিকে বলে সাস্মিতা, আমি বোধটা পড়ে রয়েছে আর বাকী সব উড়ে গেছে।

এই চার ধরনের সমাধিকে বলা হচ্ছে সবীজ সমাধি। সবীজ মানে – আমরা যখন এই জিনিষগুলো চিন্তা করছি, ধ্যান করছি তখন সমাধি হলেও চিন্তে যে বীজগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলো সব থেকে যায়। আমরা চিন্তবৃত্তি নিরোধকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এগুলোতে চিন্তবৃত্তি থেমে যায়, কিন্তু আগের ও পরের বীজগুলো থেকে যায়, সেইজন্য এই ধরনের সমাধিকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যখন সাধকের সাস্মিতা সমাধি হয়ে যায় তখন তাকে শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় বিদেহ। তখন তাঁর শরীরবোধ আর থাকেনা, শরীরের সমস্ত বাধা থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। এখন সে নিজকে অহংতত্ত্বের সাথে মানে অহঙ্কারের সাথে এক বোধ করছে।

এই যে জগৎ, এই জগৎএর স্থূল বিষয়ের সাথে আমরা এখন এক হয়ে আছি। যেহেতু এই স্থূল বিষয়ের সাথে মন এক হয়ে আছে তাই আমার যে ক্ষমতা আর আমার ধারণ করবার শক্তি পুরো স্থূল অবস্থায় থাকে। এই স্থূলকে ছেড়ে যখন কেউ তন্মাত্রাতে চলে যাবে তখন তার হাতে এক বিশাল সাম্রাজ্য এসে গেল, তখন সে এই তন্মাত্রার নিয়ন্ত্রণ কর্তা হয়ে গেল। সব থেকে ভালো উপমা হল পরমাণু বোমা। বিজ্ঞানীরা এনার্জির স্তরে গিয়ে পরমাণুকে ভাঙলেন। ছোট্ট একটা বোমা, তার তেজ আর শক্তি কি প্রচণ্ড। এখানে এনার্জির স্তর থেকে চলে গেলেন তন্মাত্রাতে। মনও যখন এই তন্মাত্রাতে চলে যাবে তখন সে সমস্ত জড় জগতের সব কিছুর জ্ঞাতা, কর্তা হয়ে গেল।

এই জড় জগতের যদি কেউ সম্রাট হয়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যান তারপর তাঁর কাছে আমি যদি কিছু চাই তখন তা নিমেষের মধ্যে দিয়ে দেওয়াটা তাঁর কাছে কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হবে না। এখন জড় জগতকে ছাড়িয়ে যে তন্মাত্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে, সেই তন্মাত্রাকেও জয় করে তন্মাত্রার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ত্তে করে নেয় তখন পুরো যা কিছু আছে, জীবন, মৃত্যু, জড় পঞ্চভূত দিয়ে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তার মালিক হয়ে গেল। সূক্ষ্ম জগতে এখন সে চলে গেছে, এই সূক্ষ্ম জগতে চলে যাওয়াতে তার ক্ষমতা কোটি কোটি গুণ বেড়ে যাবে। এরপরে যখন সূক্ষ্ম জগতটাকেও ত্যাগ করে দেবে তখন সে মনের প্রভু হয়ে যাবে। এখন তার ক্ষমতা এমন জায়গায় চলে গেল যে এখন জগতের যত মন আছে সব মনকেও যেমন খুশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। তার ইচ্ছা মাত্র, যে কোন প্রাণীরই মনের পরিবর্তন হয়ে যাবে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

কিন্তু এগুলো সবই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। জ্ঞাত মানে জ্ঞান, যেখানে জ্ঞান আছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি মানে যে সমাধিতে জ্ঞান আছে। এই সমাধিতে আমি জ্ঞানটা থাকছে তার সাথে বস্তু জ্ঞানটাও থাকছে। বস্তু কি বলতে গিয়ে বলছেন, প্রথম যে বস্তুর ধ্যান করছেন, দ্বিতীয় সেই বস্তুর তন্মাত্রা, তৃতীয় নিজের চিত্ত আর চতুর্থ অহঙ্কার। এগুলো সবই বস্তু। বস্তুর উপর ধ্যান করে বস্তুর একটা জ্ঞান পাওয়া হচ্ছে বলে এর নাম সম্প্রজ্ঞাত। এর বিপরীত আরেক ধরনের সমাধির কথা যোগে বলা হয়, তার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন জ্ঞান থাকে না। এখানে কোন বস্তুর উপর ধ্যান হয় না। তাহলে ধ্যান দুই রকমের হয়ে গেল – একটা বস্তুর উপর ধ্যান আর অন্যটিতে কোন বস্তুর উপর ধ্যান করা হচ্ছে না। যদি কোন বস্তুর উপর ধ্যান না হয়, তাহলে ধ্যান কীভাবে হবে? কোন বস্তুর উপর যদি ধ্যান না হয় তাহলে কি নিরাকারের উপর ধ্যান হবে? না, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরাকারের উপরেও ধ্যান হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বলা হচ্ছে কোন জ্ঞান থাকবে না। নিরাকার একটি অন্য দর্শনের পরিভাষা। অন্য দর্শনের পরিভাষা ব্যবহার করা হলে মনে হবে যেন ব্যাপারটা একই, কিন্তু মিল হবে না, কোথাও না কোথাও তফাৎ এসে যাবে। নিরাকারের বিপরীত শব্দ সাকার। সাকার সাধনা মানেই ঈশ্বরের উপর সাধনা। কিন্তু যোগে ঈশ্বরের উপর সাধনার কথা বলা হয় না। বেদান্ত দর্শনে যে অর্থে নিরাকারের কথা বলা হয়, যোগে সেই অর্থে কখনই নিরাকারকে নিয়ে আসা যাবে না। যোগ বলছে কোন জ্ঞান রাখা চলবে না। এগুলো বুঝতে আমাদের খুবই কঠিন মনে হবে। আসলে যোগদর্শন পুরোপুরি অন্য ভাবে চলে। এখানে ঘুরে ফিরে একটি কথাই বলা হবে – চিন্তবৃত্তি। চিন্তে যে বৃত্তিগুলো উঠছে, মনে যে নানা রকমের বিচার উঠছে, এই নিয়েই যোগদর্শন। যখনই আমরা কোন সমাধান খুঁজব তখন দেখতে হবে

চিন্তের যে বৃত্তি, মনের যে বিকার তার সাথে কি মিল আছে খুঁজলে আমরা উত্তর পেয়ে যাব। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মনের বৃত্তিকে একমুখী করা হয়। মনের সমস্ত বৃত্তিকে থামিয়ে বস্তুর উপর লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন ওই বস্তু ছাড়া আর কিছু থাকবে না, তখন এটাই হয়ে যাবে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তাহলে অনেকে বলতে পারে সাকার সাধনাও সম্প্রজ্ঞাত। ঠিকই, সাকার সাধনাও সম্প্রজ্ঞাত। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সম্প্রজ্ঞাত সাকার সাধনা নয়। কারণ আপনি যদি নিজের মনের উপরও ধ্যান করেন সেটাও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে পারে। কিন্তু সাকার সাধনাতে আপনাকে একমাত্র ঈশ্বরের রূপের উপরই ধ্যান করতে হবে। আবার নিরাকার সাধনার করার সময় বিচার করে করে ধ্যান করা হয়, নিরাকার ধ্যানে বিচার করে করে এক একটা জিনিষকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও নিরাকারের সাথে অসম্প্রজ্ঞাতের মনে হয় মিল রয়েছে, কিন্তু নিরাকার সাধনাতে আপনি মেনেই নিচ্ছেন সাকার আছে, আমাকে সাকারের পারে যেতে হবে। যোগে কিন্তু এইভাবে বলা হয় না।

যোগ বলছে, আমার একটাই কথা, কোন বৃত্তিকেই আমি উঠতে দেব না। জ্ঞান মানেই বৃত্তি, যে কোন বস্তুর জ্ঞান মানেই বৃত্তি। মনে যদি ঢেউ নাই ওঠে তাহলে আমরা জিনিষকে জানবো কী করে! ঢেউ না উঠলে বস্তু জ্ঞানও হবে না। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাতে বলছে আমি কোন বিচারকেই উঠতে দেব না। তার মানে, যখনই কোন বিচার উঠছে, তা যে কোন বিচারই হোক না কেন, ওই বিচারকে ওখানেই কেটে উড়িয়ে দেবে। নিরাকার আর অসম্প্রজ্ঞাতের সাধনা পদ্ধতিও পুরো আলাদা, শব্দের অর্থও পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু শেষে সবই এক, সেই এক জায়গাতেই যাচ্ছে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে কোন বৃত্তি, যে কোন ভাব উঠলেই সেটাকে ওখানেই কেটে উড়িয়ে দেবে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আগে থেকে বৃত্তি ঠিক করা আছে, আমি ওই বস্তুর উপর আমার বৃত্তিকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করব। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও ওই একটি বস্তুর বাইরে যে কোন বৃত্তিকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার ওই বস্তুর উপর পুরোপুরি মন কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে সমাধি হয়ে যাবে। অসম্প্রজ্ঞাতে প্রথম থেকেই কোন বস্তুই তার লাগছে না, বস্তু তো নেইই আর যে কোন বিচার উঠছে তাকেও কেটে নামিয়ে দিচ্ছে, যদিও এই উড়িয়ে দেওয়াটা ধ্যানের গভীরেই হয়। যাঁরা নিরাকার সাধনা করেন তাঁরা সচ্চিদানন্দের ধ্যান করেন, কিন্তু নিরাকার রূপে। নিরাকার ধ্যানের পদ্ধতিও একটু আলাদা।

সবার শেষে সে মনকেও পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে। এই মনকে নাশ করে দিলে এই যে জগতে আমরা বহু দেখছি, এই বহু দেখাটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন সে বিদেহ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত রকমের দেহভাব থেকে সে মুক্ত হয়ে গেল। আমি তুমি আলাদা এই ভাবটাও খসে পড়ে যায়। বিদেহতে সমস্যা কি হয়, এই অবস্থাতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যেতে পারবে, কিন্তু তার মুক্তি হবে না। কিছু দিন পর আবার ওখান থেকে নেমে আসতে হবে। যেমন মৃত্যুর পর কারুর যদি ভালো কর্ম করা থাকে সে সেই ভালো কর্মের জোরে কোন এক স্বর্গে যেতে পারবে। স্বর্গের আবার নানান ভাগ আছে, সেই স্বর্গ থেকে আরো উচ্চতর স্বর্গে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার কর্মভোগ যেই শেষ হয়ে যাবে সেখান থেকে তার আবার পতন হয়ে যাবে।

এই জন্য পরের সূত্রে বলছেন – **বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ।।১৮।।**
বিরাম-প্রত্যয় মানে, একটুও কোন ছাড় না দিয়ে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের জন্যও নিজের মনে ছাড় না দিয়ে নিরন্তর অভ্যাস করে করে সংস্কারশেষোহন্যঃ, সমস্ত সংস্কার শেষ হয়ে যায়, শুধু চিন্তের দৃঢ়তা রূপ সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত এত দৃঢ় হয়ে গেছে যে, কোন সংস্কারকে আসতেই দেবে না। কোন কোন জিনিষকে আসতে দেবে না? প্রমাণকে আসতে দেবে না, বিপর্যয়কে আসতে দেবে না, বিকল্পকে আসতে দেবে না আর নিদ্রা ও স্মৃতিকে আসতে দেবে না। প্রমাণকে সরিয়ে দেওয়া খুব সহজ, আপনি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে অন্ধকার করে আসনে বসে গেলেন, ওখানেই প্রমাণ শেষ হয়ে গেল। নিদ্রাবৃত্তিকেও আটকে দেওয়া যায়, আমি জেগে রয়েছি, স্বপ্নও দেখছি না, এতেই নিদ্রা ও স্বপ্ন আটকে গেল। আর বিকল্প ও বিপর্যয় এরাও বেশি বিরক্ত করবে না। তাহলে কে বেশি বিরক্ত করবে? স্মৃতি। যোগীর কাছে স্মৃতি ভয়ঙ্কর। আমাদের সারা জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট, তা ধ্যানের গভীরেই হোক আর

ধ্যানের বাইরেই হোক, সব কষ্টের উৎস স্মৃতি। তাই যে কোন যোগ সাধকের, শুধু যোগ সাধকই নয়, যে কোন পথের আধ্যাত্মিক সাধকের সাধনার পথে স্মৃতি মারাত্মক বিপজ্জনক। বিপর্যয়, যে কল্পনার দিকে নিয়ে যায়, এও আমাদের অশান্তির কারণ। কল্পনাতেও স্মৃতির একটা ভূমিকা থাকে। স্মৃতিতে যে জিনিষটা আছে সেটাই অন্য রকম রূপ নিয়ে কল্পনাতে এসে খেলা করতে থাকে।

অনেকে বলতে পারেন, কল্পনাই যদি না থাকে তাহলে সৃজনশীল কাজ হবে কী করে, চিত্রকরকে ছবি আঁকতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, কবিকে কবিতা রচনা করতে কল্পনার সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হয়। তাহলে কল্পনাই যদি উড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে নান্দনিক শিল্প কোথা থেকে আসবে? ঠিকই বলছেন, কল্পনাতে ভেসে শিল্পী হওয়া যাবে কিন্তু যোগী কোন দিন হতে হবে না। কবি বা চিত্রকর যোগী না হতে পারেন কিন্তু ধর্মপথে থেকে ধার্মিক হতে পারবেন, ধার্মিক হয়ে তখন অনেক কথাই বলবেন। কিন্তু সবারই জানা দরকার, যোগের যে পথ সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হয়। ঠাকুরও বলছেন – কোন একটা দিকে বেশি এগোলে ঈশ্বরের দিকে মন যেতে চায় না। ঠাকুর আসলে এই কথাই বলতে চাইছেন, কোন একটা বিদ্যা, গান হোক, বাজনা হোক, লেখালেখি হোক, লেকচার দেওয়া হোক, এগুলোর যে কোন একটাতে বেশি গেলে ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। অন্য দিকে ঠাকুর আবার বলছেন – কোন একটা দিকে ভালো থাকলে ঈশ্বরের দিকে সহজে যাওয়া যায়। এখানে প্রতিভার কথা বলছেন, একটা কিছুতে প্রতিভা থাকলে, কোন একটা বিষয়ে যদি দক্ষতা ও ক্ষমতা থাকে তখন খুব সহজে ঈশ্বরের দিকে এগোন যায়। কিন্তু একবার যে ঈশ্বরের পথে পা রেখেছে, তারপর সে যদি বলে আমি এবার আমার প্রতিভা, আমার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল কাজে নামবো, তাহলে সে কিন্তু আর ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারবে না, যোগী তো কোন দিনই হতে পারবে না। কিন্তু একজন চিত্রকর তার ছবি আঁকা ছাড়তে চাইছে না আবার ঈশ্বরকেও ছাড়তে চাইছে না, ঠিক আছে তাও মন্দের ভালো। তুমি যা কিছু আঁকছ ঈশ্বরকে অর্পণ কর। এরপর কী হবে? এভাবেই চলতে থাকবে। অনেক জন্ম লেগে থাকতে থাকতে কোন জন্মে গিয়ে যদি যোগের পথে আসে তখন আবার চিন্তা ভাবনা শুরু হবে। যাই চিন্তা ভাবনা করা হোক না কেন, পথ কিন্তু এটাই। ঠিক যখন সাধনা শুরু হবে তখন এই পথ দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। যোগে যা যা বলছে, এই পথ দিয়ে যাওয়া ছাড়া কিন্তু অন্য কোন পথ কারুর জন্যই নেই। তিনি যিশুই হন, শ্রীরামকৃষ্ণই হন, শ্রীমাই হন, বুদ্ধই হন সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হয়েছে। তবে এনারা হলেন আধ্যাত্মিক মহীর্ষ, তাই সব কিছু নিমেষের মধ্যে করে বেরিয়ে গেছেন। আমার আপনার ক্ষেত্রে সময়টা অনেক বেশি লাগবে।

আমরা যদি মনে করি – ‘হে প্রভু! তুমি কতজনকে পার করে দিয়েছ, আমিও তো তোমার শরণ নিয়েছি’ – এইভাবে প্রার্থনা করতে করতে প্রভু নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আমাকে পার করে দেবেন। এইভাবে কোন দিন কিছু হবে না। যতক্ষণ যোগের পথে না আসবে ততক্ষণ কিন্তু ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতা শুরু হবে না। শরণাগতি, প্রার্থনা এগুলো সব প্রস্তুতি। কিছু না করার থেকে শরণাগত হওয়া, প্রার্থনা করা অনেক ভালো। রাজযোগ হল Science of Spirituality। রাজযোগ সরাসরি বলে দিচ্ছে জিনিষটা এই, আর এভাবেই হবে। এখানে কোন ছাড়াছুড়ি নেই, কোন ব্যতিক্রম নেই। এই বক্তব্যের সত্যতা যদি কেউ যাচাই করতে চান, তাহলে তাঁকে একবার লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সাধনার সময়ের বর্ণনাগুলো পাঠ করতে হবে। নরেন্দ্র নাথ দত্তের এমন ব্যাকুলতা হেদুয়া থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটী দৌড়ে আসছেন, কোথা দিয়ে দৌড়াচ্ছেন কোন হুঁশ নেই, খড়ের গাদার মাঝখান দিয়ে দৌড়ে এসেছেন গায়ে খড় লেগে আছে কোন হুঁশ নেই। তার মানে মন থেকে সব কিছু উড়ে গেছে, আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতে হবে এর বাইরে আর কোন কিছুর অনুভূতি নেই। এই হচ্ছে ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতা কাকে বলে এই অবস্থায় না এলে কেউ বুঝতে পারবে না। স্বামীজীর মন থেকে তখন সব কিছু উড়ে গেছে। তাঁর মন থেকে প্রমাণ উড়ে গেছে, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি পাঁচটাই উড়ে গেছে। তাহলে কী আছে? সম্প্রজাত সমাধি, এক বস্তু শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন কিছু নেই। শ্রীমায়ের জীবন এত অবগুণ্ঠিত হয়ে চাপা ছিল যে তাঁর এই ধরনের কিছুই জানা যায় না, কিভাবে তিনি সাধনা করেছিলেন, কি কি করেছিলেন। তার মধ্যেও এক একটা ঘটনা যখন সামনে

আসে তখন অবাধ হয়ে ভাবতে হয় একজন গ্রাম্য সাধারণ মহিলাও সমস্ত রকম পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সাধনার কত উচ্চাভিলাষ নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

সাধক জীবনে যাঁরাই এগোতে চাইবেন সবাইকে তাঁদের এভাবেই এই পথ দিয়েই যেতে হবে। আর শরণাগতিই বলুন, ব্যাকুলতাই বলুন, খিচুড়ি খাচ্ছি, বাতাসা খাচ্ছি, মন্দিরে যাচ্ছি, চরণামৃত পান করছি, প্রণামি দিচ্ছি শুধু এই করে যোগের পথে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তবে কি, কিছু না করার থেকে এসব করা সত্যি সত্যিই অনেক শ্রেয়। কবি বা শিল্পী যদি বলেন আমি যদি কল্পনা করাই বন্ধ করে দিই তাহলে আমি কবিতা রচনা কিভাবে করব, আমি ছবি কিভাবে আঁকব! কবি বা শিল্পী একেবারে ঠিক কথাই বলছেন। কিন্তু এক খাপে দুটো তলোয়ার ঢোকে না, আপনি কবিও হবেন আবার যোগীও হবেন তা কখন হতে পারবেন না। কিন্তু একজন কবি বা শিল্পী বলছেন আমি সারা জীবন কবিতা বা শিল্প নিয়েই থাকতে চাই। তখন তাঁর জন্য কী উপায় থাকতে পারে? তখন একটাই উপায়, কবি ঈশ্বর বিষয়ক ছাড়া আর কোন কিছু রচনা করতে পারবেন না বা শিল্পী ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কিছুকে তার কলা জগতে নিয়ে আসবেন না। এখন কোন চিত্রকর কৃষ্ণভক্ত, তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকেই বিভিন্ন ভাবে চিত্রন করে যান তখন এটাই তাঁকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিয়ে যাবে। একজন শিল্পীরও সমাধি লাভ হবে কিন্তু সেখানে তাঁকে ঈশ্বর ছাড়া কোন কিছু নেওয়া যাবে না। কিন্তু যাঁরা কল্পনার জগৎ থেকে কবিতা বা চিত্র সৃষ্টি করে যাচ্ছেন তাঁদের কখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হবে না। যে কোন লোক যদি একটা জাগতিক বিদ্যাতে অনেক এগিয়ে যায় তাহলে সে আর কোন দিন ঈশ্বরের পথে যেতে পারবে না। কারণ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটা বৃত্তির মধ্যে বিপর্যয় বৃত্তি তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এই পাঁচটা বৃত্তিকেই একটি বস্তুর দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তারপর সেই বস্তু থেকে তন্মাত্রার দিকে, তন্মাত্রা থেকে চিত্তের দিকে, চিত্ত থেকে নিজের অহঙ্কারের দিকে নিয়ে যেতে হবে। আসলে ভক্ত আর যোগীর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ থাকতে পারে না। কারণ ভক্ত একমাত্র ভগবানের চিন্তন করে সেখানে অন্য কিছুকে আসতে দেয় না।

এইভাবে ভগবানের চিন্তন করতে করতে একটার পর একটা ধাপকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। যোগীরা অত্যন্ত সাধারণ আধারকে দিয়েও যোগের অনুশীলন শুরু করিয়ে দিতে পারেন। যোগীরা বলেন তোমাকে ঈশ্বর, আত্মা, চৈতন্য এসব নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না, এই চক আছে তুমি এই চককে নিয়েই একাগ্র ভাবে চিন্তন করতে থাক। শুধু যোগেই নয়, ভক্তিতেও আছে যেখানে গুরু বলে দিলেন এই ভেড়াই তোর ইস্ট, শিষ্য সেই ভেড়াকেই ধ্যান করে যাচ্ছে। এখানে যোগ আর ভক্তিতে পথে কোন তফাৎ নেই। তবে যোগের পথ অনেক কঠিন পথ। কিন্তু সবাইকে এই কঠিন পথ দিয়েই যেতে হবে, এছাড়া কোন উপায় নেই। লীলাপ্রসঙ্গে শুধু কেউ যদি ঠাকুরের সাধনার অংশটুকু পড়েন, পড়ার পর প্রথমেই তার মনে হবে আমার সাধনার দরকার নেই। দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস এসেছেন। ঠাকুর দেখছেন যেখানে ঐঠো পাতা ফেলা হয়েছে সেখানে কুকুরের সাথে সেই পরমহংসও খাচ্ছেন। কুকুরগুলো আবার তাঁকে কিছু বলছেও না। ঠাকুর দেখছেন আর কাঁদছেন আর হৃদয়রামকে বলছেন ‘ওরে হৃদু! আমারও কী এই অবস্থা হবে?’ আপনারা একবার নিজেদের ভেবে দেখুন তো যে, নিমন্ত্রণ বাড়ির ঐঠো পাতা যেখানে ফেলা হয়েছে সেখানে কুকুরও খাচ্ছে আর আপনিও খাচ্ছেন! আমরা এই জিনিষ চিন্তাই করতে পারি না। আপনি বলবেন ঠাকুর তো বলেছেন আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর। আমাকে তাই এত কিছু করার দরকার নেই। ঠাকুর এগুলো উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছেন। ঠাকুর যা যা করেছেন সবাইকে তাই করতে হবে। একটু এদিক সেদিক হয়তো হতে পারে কিন্তু সবাইকে এই একই জিনিষ করতে হবে। সেইজন্য যোগকে বলা হয় Science of Spirituality। ঠাকুরের সাধনা-জীবন হয়তো অন্য সাধকের সাধনা-জীবনের সাথে মিলবে না, কিন্তু যোগে যা যা বলা আছে সবটাই মিলবে, কারণ যোগে সাধনার পুরো ব্যাপারটাকে সাধারণীকরণ করা হয়েছে।

যদিও যোগে বলা নেই, কিন্তু ভালো হয় যদি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি করার পর অসম্প্রজ্ঞাতে যাওয়া হয়। একটা বৃত্তিই যখন থেকে গেল তখন সেই একটি বৃত্তিকেও নাশ করে দেওয়া। ঠাকুর যেটা

করেছিলেন – যে মা কালীর উপর এত দিন ধ্যান ধারণা করে মা কালীর দর্শন লাভ করলেন, সারাদিন মা মা করে যাচ্ছেন কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য সেই মা কালীকেও জ্ঞান খড়া দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে কেটে উড়িয়ে দিতে হল। এটাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মূল কথা, সেখানে জ্ঞেয় কিছু থাকবে না, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এর বিভেদটা থাকবে না। এই তিনটে জিনিষই বৃত্তি দিয়ে আসে, এখন কোন বৃত্তিই নেই, তাই জ্ঞান জ্ঞেয় বলেও কিছু থাকবে না। তখন যা আছে তাই আছে। তার মানে একমাত্র চৈতন্যই আছেন, তখনও শুধু চৈতন্য রূপেই অবস্থান করছেন।

পুরুষ আছেন, মন আছে আর বিরাট জগৎ আছে। এই তিনজনের মধ্যে পুরুষেরই একমাত্র চৈতন্যের আলো আছে, পুরুষের আলোতে মন ঝলমল করে উঠছে। যেমন বিদ্যুৎএর জন্য এই টিউব লাইট জ্বলছে। টিউব লাইটের আলোতে আমরা টিউব লাইটকেও দেখতে পাচ্ছি, আর এই আলোতেই আমরা এক অপরকেও দেখছি। ঠিক সেই রকম পুরুষের জন্য মন জ্বলে উঠল। যেখানে পুরুষের আলো বেশী তাকে আমরা বলছি চৈতন্য, যেখানে আলো খুব ক্ষীণ তাকে বলছি জড়। চৈতন্যের আলোতে বোতলের প্রতিবিম্ব যখন মনের উপর এসে পড়ছে তখন বোতলের জ্ঞান হচ্ছে। এইভাবে বাইরে থেকে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্ব অনবরত মনের উপরে এসে পড়ছে আর পুরুষ বলছে আমি এটা জানলাম। কিন্তু এই জানার সঙ্গে এসে যাচ্ছে আরেকটি ব্যাপার, একটা জিনিষকে জানলেই কিছু করার ব্যাপারটাও এসে পড়ে। কিছু করা মানেই সুখ-দুঃখ এসে যাবে। যখন এই সুখ-দুঃখের জ্বালা আর নিতে পারে না তখন সে গুরুকে আশ্রয় করে, শাস্ত্র পড়তে শুরু করে। গুরু বলে দিলেন তুমি বস্তুর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছ বলেই এই সুখ-দুঃখ। এখানে নিজেকে নিজের ছেলে বউয়ের সাথে জুড়ে রাখার কথা বলা হচ্ছে না, মনের সঙ্গে জুড়ে রেখেছ। মন তো পুরুষ নয়, মন প্রকৃতির জিনিষ। স্ত্রীরা রেগেমেগে যেমন বাপের বাড়ি চলে যায়, মনের বাপের বাড়ি হল জগৎ। বোকা পুরুষ মনকেই আমি ও আমার ভেবে মনের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। এদিকে মন সব সময় বাপের বাড়ির দিকে অর্থাৎ জগতের দিকে চলে আছে। পুরুষ মনের সাথে নিজেকে জুড়ে নিয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে পেয়ে আর থাকতে না পারে এক সময় বলে, আমার অনেক হয়েছে আর লাগবে না। তখন গুরু মুখে শুনে, শাস্ত্র পড়ে পুরুষ একটা জিনিষকে অবলম্বন করে ধ্যান করতে শুরু করে। ধ্যান করতে করতে একটা সময় যে জিনিষকে নিয়ে ধ্যান করছিল সেটি ছাড়া বাকি জগৎ তার উড়ে যায়। তারপর সেই একটা জিনিষও উড়ে যায়। আর কিছু নেই মানে মনও আর নেই, বৃত্তি যদি না থাকে তাহলে মনের অস্তিত্বও নাশ হয়ে যাবে। তার আগে বৃত্তি থাকলেই মন থাকবে, মন থাকলেই বৃত্তি থাকবে।

মন কখনই কোন জিনিষকে জানছিল না, পুরুষই সব সময় জানছে। পুরুষ এবার সব কিছু থেকে নিজেকে পুরোপুরি আলাদা করে দিয়েছে, এই অবস্থাকেই বলা হয় স্বরূপে অবস্থান। স্বরূপ অবস্থানের পর, চিন্তাবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাওয়ার পরেও যোগীর শরীর তো থেকে যাচ্ছে। শরীর থাকলে মন থাকবে। স্বরূপ অবস্থান থেকে যখন যোগী নেমে আসেন তখন আবার মন এসে যাবে, মন কোথাও চলে যাবে না। কিন্তু জগতের চাকচিক্য, জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ থাকবে না। এ্যাস্ট্রিক্সের কার্টুনে একটা মজার কাহিনীতে দেখাচ্ছে মিলিটারিতে অনেক লোক নিয়োগ করা হবে। অনেক লোক এসেছে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাবে বলে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে একটা মোটসোটা লোক লম্বা কোট পড়ে এসেছে। আর্মি অফিসার লোকটিকে গায়ের কোটটা খুলতে বলেছে। কোটটা খোলার পর দেখছে লিকলিকে রোগা ঘাটের মড়ার মত একটা লোক কোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। যখন ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে আসছে তখন সবাই জিজ্ঞেস করছে কী হল! লোকটি বলছে They told me I am under weight। আঙুর ওয়েট ফোয়েট কিছুই বলেনি, হাড়ি আর চামড়া ছাড়া শরীরে আর কিছুই নেই। ভেবেছিল আর্মিতে নাম লিখিয়ে যদি কিছু খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যায়। লোকটি গায়ে কোট চাপিয়ে পুরো জগৎকে বোকা বানাতে পারবে কিন্তু যে গায়ের কাপড় খোলা অবস্থায় ওকে দেখে নিয়েছে তাকে কি আর সে বোকা বানাতে পারবে! পুরুষ এতক্ষণ প্রকৃতির খেলায় মুগ্ধ ছিল, কিন্তু এবার সে নিজেকে দেখে ফেলেছে। নিজেকে একবার যখন দেখে ফেলেছে এরপর আর কেউ তাকে মুগ্ধ করতে পারবে না। এরপর জগৎ, মন, প্রকৃতির সব কিছুই থাকবে কিন্তু পুরুষ জেনে

গেছে আমি আলাদা প্রকৃতি আলাদা। এরপর যত দিন শরীর চলার চলবে, যেদিন শরীর পড়ে গেল সেদিন সেও শরীর থেকে মুক্ত হয়ে গেল। সে যদি ইচ্ছে করে সমাধি অবস্থাতেই নিজের শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। সমাধি অবস্থায় থাকলে, খাওয়া-দাওয়া হবে না, শরীরে অন্ন জল যাবে না, জৈব ধর্ম অনুযায়ী শরীরও আর টিকে থাকতে পারবে না, আপনা থেকেই এক সময় খসে পড়ে যাবে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে গেলে তাই আর তাকে ফিরে আসতে হবে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি তখনই হবে যখন তার পূর্ণ বৈরাগ্য হবে, তখন ঐ অবস্থাতে মানুষ সব কিছুকে ছেড়ে দেয়, এর ফলস্বরূপ যে বীজগুলো ভেতরে রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ রূপে ভস্মীভূত হয়ে ছাই হয়ে যায়। এটাই আঠারো নম্বর সূত্রে বলছেন *বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ*, এই সমাধিতে যোগীর সমস্ত সংস্কারের নাশ হয়ে যায়। স্বামীজী বলছেন ‘ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাভীত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ’। মুক্তি সব সময় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি থেকেই হবে। যদি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হয়ে শুধু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহলে এর পর কিছু দিন ভোগটোগ হয়ে যাবার পর আবার নীচে নেমে আসতে হবে। সেখান থেকে তার দেবতাদের মধ্যে জন্ম হবে, সেখান থেকে পরে হয়তো তার আবার মানুষ রূপে জন্ম হবে।

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের সাধনা পদ্ধতিতে একটা মৌলিক পার্থক্য হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বস্তুকে নিয়ে সাধনা করা হচ্ছে আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বস্তু থাকছে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক দর্শনের ভাষায় এইভাবে না বলে আরেক ধাপ নামিয়ে বলবে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আসক্তির ব্যাপার আসছে। জগতের প্রতি যাদের এখনও আসক্তি আছে তাদের জন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধনা, যাদের কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই তাদের জন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধনা। আমাদের সবারই মনে কামনা-বাসনা গিজ্জগিজ্জ করছে। একজন শিল্পী বলছে আমি যদি কল্পনাই ছেড়ে দিই তাহলে আমি ছবি কি করে আঁকবো। তার মানে, তার আসক্তি আছে। এই রকম আসক্তিকে যোগ বলছে, তুমি ছবি আঁকতে চাইছো তো, ঠিক আছে এই নাও শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী, এবার তুমি শ্রীরামের জীবনকে আধার করে ছবি আঁকতে থাক। আসক্তি আছে বলে যোগ তাকে একটা বস্তু ধরিয়ে দিল, বস্তু আছে বলে তাকে সম্প্রজ্ঞাতের পথ নিতে হবে। কোন কিছুর প্রতি একটু সামান্য আসক্তি থেকে যাওয়া মানে ভেতরে সংস্কারের বীজ থেকে গেছে। সংস্কার থেকে গেলে কী হবে পরের সূত্রেই সেটা বলবে।

অসম্প্রজ্ঞাতে কোন বৃত্তি থাকবে না, অর্থাৎ কোন বস্তুকে অবলম্বন করা হয়নি। কোন বস্তুকে অবলম্বন করা হয়নি মানে পূর্ণ অনাসক্ত। এই সূত্রের উপর স্বামীজী তার ভাষ্য শুরু করছেন মুক্তির কথা দিয়ে। মুক্তি মানেই সম্পূর্ণ ভাবে অনাসক্ত। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে যাওয়াটাই আবার বেদান্তে হয়ে যায় নিরাকার সাধনা। আমাদের শাস্ত্রে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় বলা হচ্ছে তুমি অনাসক্ত হও। কিন্তু এখানে অনাসক্ত শব্দটা বলছেন না, অনাসক্ত শব্দের বদলে বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ, যেখানে জ্ঞেয় বা জ্ঞানের কোন ব্যাপার থাকবে না। জ্ঞান থাকা মানে বৃত্তি থাকা, বৃত্তি থাকা মানে কোন বস্তুকে অবলম্বন করে থাকা। বস্তুকে কেন অবলম্বন করতে হচ্ছে? কারণ দুর্বল বলেই অবলম্বন করতে হচ্ছে। কিসের দুর্বলতা? আসক্তির। দুর্বলতা আর আসক্তি একই জিনিষ। আমরা সবাই স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, নাম-যশের প্রতি আসক্ত। এই আসক্ত ব্যক্তিকে যদি বলা হয় তুমি বৃত্তি, জ্ঞানের বাইরে যাও, সে কী কখন পারবে বাইরে যেতে! এক বিধবা বুড়ি এসে ঠাকুরকে বলছে ‘আমি আমার নাতিকে ভুলে থাকতে পারি না’। ঠাকুর তাকে বলছেন ‘তুমি তোমার নাতিকেই গোপাল রূপে দেখ’। আসলে ঠাকুর বুড়িকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পথ দেখিয়ে দিলেন। নাতির প্রতি তার এত আসক্তি, কিন্তু এই আসক্তির পথ দিয়েও তাকে একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়।

যোগ সবাইকেই প্রেরণা জুগিয়ে যাবে, সবারই জন্য যোগ পথ ঠিক করে দিয়েছে। শুধু বলছেন তোমার নিজের মত বস্তু বেছে নাও। কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু তাঁর বৈষ্ণব শিষ্যকে বলতে পারবেন না যে, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে এই চকের উপর ধ্যান কর। কিন্তু যোগের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। যোগ বলবে তুমি চকের উপরেই ধ্যান কর। প্রথমে চক ছাড়া কিছু দেখবে না। দ্বিতীয় ধাপে এই চককে দেখবে দেশ কালের বাইরে, তখন এই ধ্যানকে বলবে নির্বিতর্ক। এরপর তন্মাত্রা, যে উপাদান

দিয়ে এই চক তৈরী হয়েছে তার উপর ধ্যান করতে হবে, তারপর দেখো এই তন্মাত্রা দেশ ও কালের বাইরে। এত দূর হয়ে যাওয়ার পর এবার তোমার চিত্তের উপর ধ্যান কর। চিত্তের উপর ধ্যান করার পর আমি আছি এই বোধের উপর ধ্যান কর। এর উপর সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আর কিছু নেই। এখন তুমি প্রস্তুত হয়ে গেলে, অহং অস্মি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমিই হয়েছে এই বোধটুকু হওয়া শুধু বাকি থেকে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে তখন সত্যিকারের এই বোধ আসবে যে, আমি চাইলে একটা নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারি। শুধু বোধ নয়, সত্যিকারের এই ক্ষমতা এসে যাবে। এর পরের ধাপে এই ক্ষমতাটাকেও ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তুমি মুক্তি যদি চাও, একটু সামান্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি যদি থাকে তাহলে মুক্তি কিন্তু তোমার কোন দিন হবে না। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন সুতোয় একটু আঁশ যদি বেরিয়ে থাকে তাহলে ছুঁচে সুতো ঢুকবে না। একটু আঁশ যদি থাকে তাহলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে পারবে কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কোন আশা নেই।

মুক্তি মানেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যান করার সময় যে বিচারই আসুক না কেন সব বিচারকে কেটে উড়িয়ে দিতে হবে। এটাই যোগের প্রথম থেকে সাধনার পথ। আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রে দেখি তিনি প্রথমে মা কালীর উপর ধ্যান করে গেছেন, তারপর মা কালীকেও জ্ঞান অসি দিয়ে কেটে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন। এভাবেও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আসা যায়। কিন্তু যোগশাস্ত্র বলছে না যে তুমি প্রথমে সম্প্রজ্ঞাতের অনুশীলন কর, তারপর অসম্প্রজ্ঞাতের অনুশীলন কর। তবে সম্প্রজ্ঞাত থেকে অসম্প্রজ্ঞাতে আসতে পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। সম্প্রজ্ঞাতে সমস্যা হল, সাধনা আর পবিত্রতা যদি সেই রকম না থাকে আর তারপর কেউ যদি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুশীলন করতে যায় তাকে ঘোর তমোগুণ এসে গ্রাস করে নেবে। বৃত্তি উঠছে আর আমি বৃত্তিকে ফাঁকা করে দিচ্ছি, বৃত্তিকে ফাঁকা করা মানে মনকে শূন্য করে দেওয়া। পবিত্রতা আর সাধনা যদি না থাকে তাহলে মন শূন্য করতে গেলেই ঘোর তামসিকতার মধ্যে ডুবে যাবে।

বুদ্ধির উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানে সে এখন চেতনার স্তরে আছে। আমি আপনি যখন জগৎকে দেখছি, জানছি তখন এটাই আমাদের চেতনার স্তর। আর যখন পুরুষ নিজেকে জানতে পারছে তখন স্বামীজী তাকে বলছেন অতিচেতন স্তর। তখন সে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়ে গেছে, সে এখন যা বলবে সেটাই হতে বাধ্য। টিউবলাইট বা ফ্যান যখন সারাতে হয় তখন মিস্ত্রি যেভাবেই হোক সারিয়ে দেব, কিন্তু যখন ইলেক্ট্রিক লাইনের কোন কাজ করে তখন মিস্ত্রিকে অনেক সাবধনতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। মানুষ জগৎকে নিয়ে যখন কাজ করছে তখন এক রকম কাজ করে, কিন্তু যখন চৈতন্যকে নিয়ে কাজ করে তখন ব্যাপারটা পুরো পাল্টে যায়। এইভাবে পুরুষ যখন নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে নিজেকে জেনে গেল, নিজেকে জেনে নেওয়াতে যে জ্ঞান আসে সেই জ্ঞানের তুলনায় জগতের সব জ্ঞানই অতি তুচ্ছ। এই দুটো বিদ্যাকে উপনিষদ পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা বলছে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আপনি পাচ্ছেন পরা বিদ্যা আর সম্প্রজ্ঞাতে অপরা বিদ্যা। সেইজন্য বিজ্ঞানী যখন একটা বিষয়কে নিয়ে, যে কোন একটা তত্ত্ব বা ইক্যুয়েশনকে নিয়ে একাগ্র হয়ে চিন্তা করে যাচ্ছেন তখন তিনি অবশ্যই তার সমাধান পেয়ে যাবেন। কিন্তু তুমি যত বড় বিজ্ঞানী হও না কেন, ঠাকুরের কাছে এসে তুমি অতি নগণ্য হয়ে যাবে। কারণ ঠাকুর অতিচেতন স্তরে চলে গেছেন, তাঁর তুলনায় সব জ্ঞানী অত্যন্ত নগণ্য। তুমি এখনও সম্প্রজ্ঞাত এলাকায় ঘুর ঘুর করছ। এগুলো ধারণা করা খুব কঠিন, কিন্তু এটাই সত্য।

শুরু হয় একেবারে ইট, কাঠ, পাথর থেকে অর্থাৎ যাদের মন বলে কিছু নেই। এরপর দ্বিতীয় ধাপে জ্ঞানের প্রকাশ আসতে থাকে। এর মধ্যে আবার গাছপালা এদের সামান্য একটু চেতনার প্রকাশ হয়েছে, কুকুর বেড়ালে চেতনা আরেকটু বেড়েছে আর মানুষের মধ্যে চেতনার সব থেকে বেশী প্রকাশ। কিন্তু এদের সবার থেকে উপরে হল মনেরও পারে। মনেরও পারে মানে, পুরুষ নিজে স্বরূপে অবস্থান করছে। এই তিনটে স্তর – no mind, mind and beyond mind । এর সাধনার একটিই পথ – আমাদের যে শরীর মন ইন্দ্রিয় সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ দিয়ে নির্মিত, প্রথম তমসকে

দাবাতে হয় রজো গুণ দিয়ে আর রজো গুণকে দাবাতে হয় সত্ত্বগুণ দিয়ে। সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণ এক সঙ্গেই থাকে আর এদের যোগফল সব সময় এক। তাই তমো আর রজো গুণকে যত দাবিয়ে রাখা হবে সত্ত্বগুণ ততো বাড়বে। কিন্তু উল্টাপাল্টা অনিয়মিত ভাবে কাজকর্ম করলে সত্ত্বগুণ তমো গুণে চলে যাবে। সত্ত্বগুণে পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মন একেবারে পূর্ণ অবস্থায় চলে আসে। এবার এই সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে চলে যেতে হবে। সত্ত্বগুণের পারে চলে যাওয়ার পর দেখে – তাইতো এতক্ষণ কি হচ্ছিল! আমি পুরুষ, চৈতন্য সত্তা আলো দিচ্ছিলাম বলে জগতের ছবি আমার মনের উপর ভেসে যাচ্ছিল, আর আমি বোকার মত ভেবে যাচ্ছিলাম আমারই সব কিছু হচ্ছিল। এসব গুহ্য কথা আমাদের যতই শোনান হোক না কেন আমরা কিছুতেই ধারণা করতে পারবো না। কারণ কত জন্মজন্মান্তর ধরে এরা দুজন দুজনকে এক মনে করে রেখেছে যার ফলে পুরুষ মনকে ছাড়তে পারছে না। একটা পোড়ো ভাঙা বাড়িতেই অনেক দিন বাস করার পর যখন ভালো ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হয় তখন ওই পোড়ো বাড়ির উপর কত মায়া পড়ে যায়, ছাড়তে গেলে কত কষ্ট হয়। ফ্ল্যাটে চলে আসার পর ভাবে তাই তো কী করে এতদিন ওই ভাঙা বাড়ীতে ছিলাম। আমাদের সব জাগতিক সম্পর্কে এই একই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু মুক্তি যখন হয়ে যায় তখন ভাবে এদের সাথে এতদিন ছিলাম কী করে! জাগতিক বন্ধন সব কিছুর সাথে আমাদের এমন একাত্ম করে রেখেছে যে মনে হয় আমি আপনি এক। সাধনা করে করে যখন অসম্প্রজ্ঞাততে চলে গেল সে তো তখন রাজা। এতদিন সে বোকার মত নিজেকে এদের সবার চাকর ভাবছিল।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে যদি খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া যায় তাহলে রাজযোগের বাকিটা বুঝতে খুব একটা কঠিন মনে হবে না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রথমে বস্তুর উপর ধ্যান করে সমাধি হয়ে শেষ সমাধি হয় নিজের অহংকারের উপর। প্রথমে বস্তু, তারপর এক এক করে তন্মাত্রা, চিত্ত ও অহংকার এই চারটে স্তরে যে সমাধি হয় সেই সমাধিকেই বলছেন বিতর্ক, বিচার, আনন্দ আর অস্মিতা। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন বস্তু থাকে না। পুরুষের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে সব কিছুই বস্তু, প্রকৃতিও বস্তু, মনও বস্তু এবং জগৎও বস্তু। যতক্ষণ বস্তুর জ্ঞান হবে ততক্ষণ বুঝে নিতে হবে তার বৃত্তি উঠছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বৃত্তি জ্ঞান হয়, যতক্ষণ বৃত্তি জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ কোন না কোন ভাবে সে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যখন সে সংসার থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল তখন বৃত্তি থেকেও আলাদা হয়ে গেল। তখন সে নিজের মত অবস্থান করে, নিজের মত অবস্থান করা মানে খেলা শেষ। যোগদর্শনের পুরো আলোচনার বিষয় হল পুরুষ যে কোন কারণেই হোক, ভুলবশতঃ হোক আর সত্যি সত্যিই হোক, নিজেকে মনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। পুরুষ তখন নিজেকেই মন মনে করে, আর মনের সাথে এক করে নেওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে পড়ে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম মানে বস্তুর সঙ্গেও এক মনে করে। মন জানে আমি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এক, এবং বাস্তবেও এক। ইন্দ্রিয় আবার জানে আমি বস্তুর সঙ্গে এক। জগত মানে মন, ইন্দ্রিয় আর বস্তুর নিজেদের খেলা। মাঝখান থেকে পুরুষ, যিনি চৈতন্য সত্তা, তিনি নিজেকে ভাবছে আমি আর মন এক। এই এক মনে করার জন্য পুরুষের অশান্তির আর শেষ নেই। সুখ আর দুঃখের খেলা চলতেই থাকে। বলছেন, মন যখন কোন বস্তুর উপর কেন্দ্রিত হয়ে যায় তখন সে একটা সুখ পায়। এই সুখটা বস্তুর সুখ। মন যখন কেন্দ্রিত হয়ে যায় তখনই মানুষ বৈজ্ঞানিক হয়ে যায়, একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যায়। চিত্রকর যদি গভীর ধ্যানে গিয়ে ছবি আঁকেন, তখন সেই ছবি অন্য ধরণের হয়ে যাবে। যখন কোন বস্তুর উপর মন কেন্দ্রিত হয়ে যায় তখন সেই বস্তুর রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়।

দ্রষ্টা বলতে আমরা বুঝি যিনি দেখছেন। এখানে আমরা সবাই মনে করি আমাদের মনই সব কিছুর দ্রষ্টা। এখানেই আমরা ভুল করে বসে আছি। আমাদের সমগ্র ভারতীয় দর্শন কখনই স্বীকার করবে না মনই আমাদের শেষ কথা। একমাত্র চার্বাক দর্শন, যারা ভৌতিক বাদ তারাই মনে করে মন শেষ কথা। বৌদ্ধরা এই কথা মানবে না, জৈনরাও মানবে না আর আমাদের ষড়্দর্শন এরা তো কোন মতেই মন শেষ কথা বলে মানবে না।

ষড়দর্শনের প্রথম দর্শনই হল সাংখ্য দর্শন। সাংখ্যের যমজ ভাই যোগদর্শন, যার জন্য সাংখ্য আর যোগ মোটামুটি একসাথে চলে। অন্য দিকে নৈয়ায়িকদের যমজ ভাই বৈশাষিকরা। এই দুটো দর্শনও এক সঙ্গে চলে। আবার পূর্বমীমাংসা আর উত্তর মীমাংসা যাদের অন্য নাম কর্মকাণ্ড আর বেদান্ত, এই দুটি দর্শনও এক সঙ্গে চলে। যদিও ছয়টি দর্শনের কথা বলা হয় কিন্তু এই মিল থাকার জন্য দুটি দুটি করে তিনটে গ্রুপের মধ্যে পুরো ছটি দর্শনকে নিয়ে আসা যায়। পাশ্চাত্যে আমরা অনেক দর্শনের কথা পাই, আর প্রত্যেক দর্শনের পেছনে একজন করে দার্শনিকের নাম জড়িয়ে আছে, যেমন কান্ট, হেগেল, এ্যারিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হল পাশ্চাত্যে যে অর্থে এনাদের দার্শনিক বলা হয় সেই অর্থে ভারতের কাউকেই আমরা দার্শনিক আখ্যা দিতে পারি না। সত্যি কথা বলতে ভারতে সেই অর্থে কোন দার্শনিকই নেই। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্যে যদি কোন দর্শনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় এই দর্শনটি কার? তখন হয়তো এর উত্তর হতে পারে প্লেটো বা হেগেল বা শ্যেপেনহাওয়ারের। ভারতে অনেক বইয়ের মলাটে লেখা থাকে পাতঞ্জল যোগদর্শন বা কপিল মুনির দর্শন। কিন্তু পাশ্চাত্যের অর্থে ভারতের কাউকেই দার্শনিক বলা হয় না।

আমাদের এখানে দর্শন মানে, বেদ কী বলতে চাইছে সেটাকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা। আমি এখানে পাতঞ্জল যোগদর্শনের উপর ব্যাখ্যা করছি, তাই বলে পাতঞ্জল যোগদর্শনকে কী আমার দর্শন বলা হবে? কখনই নয়, কারণ আমি এর ব্যাখ্যাকার মাত্র। পতঞ্জলিও ঠিক একই কথা বলবেন, তিনিও বলবেন আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমার কথা নয়, বেদেও ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে যেটাকে আমি শুধু ব্যাখ্যা করছি। তাহলে কি বৈদিক দর্শন বলা যেতে পারে? তাও বলা যাবে না। কারণ বেদ তো আমাদের কারুরই কথা নয়, বেদ ভগবানের কথা। তাই ভারতে যত দর্শন আছে সব ভগবানের কথা। তাহলে কপিল মুনির নাম কেন নেওয়া হচ্ছে? এই দর্শনটা এক সময় হারিয়ে গিয়েছিল, কপিল মুনি এসে একে উদ্ধার করেছেন। গীতায় ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন *স কালেনেহ মহতা যোগ নষ্টঃ পরন্তপঃ*, এই যোগের কথা চিরদিন এভাবেই ছিল কিন্তু হারিয়ে গিয়েছিল, সেটাকে আমি উদ্ধার করে তোমাকে বলছি। এই উদ্ধার কর্তা কে হবেন? ভগবান ছাড়া সাধারণ মানুষ কেউ এইসব দর্শনের উদ্ধার কর্তা হতে পারবেন না। সেইজন্য কপিল মুনি, যাঁকে দর্শন শাস্ত্রের জনক বলা হয়, তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। এই কারণে সক্রেটিস, প্লেটোকে পাশ্চাত্যে যে অর্থে দার্শনিক বলা হয় সেই অর্থে ভারতে দার্শনিক কেউ হতে পারেন না, হয়ও না। কারণ যতক্ষণ বেদের সঙ্গে আপনার কথা না মেলে আপনার কথা কেউ শুনতে যাবে না। আর বেদ ভগবানের কথা, তার মানে ভারতে যত ঋষি মহাত্মারা ছিলেন, ব্যাসদেব, আচার্য শঙ্কর, পতঞ্জলি, স্বামীজী সবাই বেদের কথাকেই বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আচার্য শঙ্করের ব্যাপার তো সেই অর্থে আরও পরিষ্কার ছিল। আচার্য বলছেন, বেদের তত্ত্ব রয়েছে উপনিষদে, আগের আগের ঋষিরা উপনিষদের এই এই অর্থ করেছেন। আচার্যের গুরু গৌড়পাদ তিনিও এর উপর কাজ করেছেন। শেষে আচার্য দেখলেন বিভিন্ন ভাষ্যকাররা বিভিন্ন রকম অর্থ করার ফলে আসল অর্থকে কেউ অবধারণা করতে না পারাতে সব গুলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে এই নাও আমি আবার স্পষ্ট করে এর সব অর্থ লিখে দিলাম। শঙ্করাচার্য এত সুন্দর অকাট্য ও বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে সমস্ত উপনিষদকে সাজিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর এত নাম। ভারতে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে দর্শনের কথা বলতে গেলে কেউ শুনবে না, যদি না সেই কথা বেদে থাকে। ঠাকুর বলছেন চাপরাশ না থাকলে লোকে তার কথা কেউ শুনতে যাবে না। বাড়ির গিন্নীরা রোজ যে তরকারী রান্না করে তা কোন দিন এক রকম হবে না, ভাতও কোন দিন এক রকম হবে না। গিন্নীরা তো রোজই রান্নাতে নতুন নতুন প্রোডাক্টস নিয়ে আসছেন, তাই বলে কি তাদের Industrialist বলা যাবে? কখনই বলা যাবে না। আমার, আপনার সবারই জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা নিজস্ব দর্শন আছে। ঈশ্বরের ব্যাপারে আপনার এক রকম ধারণা আমার এক রকম ধারণা, তাই বলে আমি আপনি কোন দিন দার্শনিক হবো না। দার্শনিক হতে গেলে একটা উচ্চ স্তরে যেতে হবে। সেই উচ্চ স্তরে বেদের বক্তব্যকে গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে আপনার মতকে উপস্থাপনা করতে হবে। এটা অবশ্য বেদান্তের একটা পথ। আর বেদান্তকে যদি না মানা হয় তাহলে ওদের ষড়লিঙ্গ, মানে ছটি শর্ত আছে, ওই ছটি শর্তকে পূরণ করে

আপনার বক্তব্য রাখতে হবে। সেইজন্য কপিল মুনিকে যে অর্থে ভারতীয় দর্শনের জনক বলা হয়, সেটা পাশ্চাত্যে যে অর্থে দার্শনিক বলা হয় সেই অর্থে বলা হয় না। কপিল মুনি বেদের বক্তব্য নিজের মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

কপিল মুনির সব থেকে বড় অবদান সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য দর্শন না বুঝলে যোগদর্শন বোঝা যাবে না। বেদান্তের উপর আবার যোগের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। সেইজন্য বেদান্ত বুঝতে গেলে যোগদর্শন বুঝতে হয়, যোগ বুঝতে গেলে সাংখ্য বুঝতে হয়। আবার অনেক সময় সাংখ্য থেকে সরাসরি বেদান্তে চলে আসার নজিরও পাওয়া যায়। স্বামীজী সাংখ্যের উপর অনেক ভাষণ দিয়েছেন, যদিও ইদানিং সাংখ্য দর্শন পড়া বা জানার লোক আর পাওয়া যায় না। এমনিতে সাংখ্য দর্শনে এমন অনেক আধ্যাত্মিক গুহ্য তত্ত্বের দুর্ধর্ষ বর্ণনা আছে যার মধ্যে চিন্তনশীল মানুষ অবাধে বিচরণ করে নিজস্ব চিন্তা জগৎকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। মাতৃসঙ্গীতে যখন বলে আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি, এই প্রকৃতি শব্দ যখনই আসবে তখনই তা সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্য দর্শনে ঢুকে গেল। যখনই কাউকে বলা হয় উনি সত্ত্বগুণী বা উনি রজোগুণী, তখনও সাংখ্য দর্শনে ঢুকে গেল। যখন আমরা তন্মাত্রার কথা বলি বা যখন বলছি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তখনও সাংখ্য দর্শনে চলে এলাম।

ঈশ্বর না মানার সাংখ্য দর্শনের যুক্তি

সাংখ্যের বক্তব্য খুবই সহজ, চৈতন্য সত্তা পুরুষ আছেন আর তাঁর পাশে প্রকৃতি আছে। যেমনি পুরুষ আর প্রকৃতি কাছাকাছি এসে যায় তখনই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষ বেচারীর কিছুই করার থাকে না। আবার পুরুষ না থাকলে প্রকৃতি নিজেকে বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু সৃষ্টির ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখ সব কিছু পুরুষ নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে বোকা স্বামীর মত প্রকৃতির সেবা করতে থাকে। পুরুষ প্রকৃতির কাছে এলেই প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে যায়। প্রকৃতি চঞ্চল হওয়া মানে সৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়া। এখানে পুরুষ মানে ব্যাটা ছেলে পুরুষ নয়, সাংখ্যে মেয়েরাও পুরুষ। পুরুষ মানে চৈতন্য সত্তা আর প্রকৃতি মানে জড় সত্তা। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ফলে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তাকে আমরা চিঞ্জড়গ্রস্থি বলতে পারি। অথচ পুরুষ কখনই প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে নেই, যদিও গ্রস্থি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, এই গ্রস্থি শব্দটা আবার তন্ত্র থেকে এসেছে, যেখানে বন্ধনটা আসল, মা ওই বন্ধনটা কেটে দেন। সেইজন্য তন্ত্রে মায়ের কাছে বন্ধন কেটে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। সাংখ্যে এসব কিছু প্রার্থনার ব্যাপারই নেই। তুমি চৈতন্য সত্তা, পুরুষ, তোমার প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অগ্নি সাক্ষী রেখে সাত পাকে ঘুরিয়ে পুরুষকে দিব্যি খাইয়ে দিয়ে একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ইচ্ছে করলে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। আগে ডিভোর্সের নিয়ম ছিল না, এখন নিয়ম হয়ে গেছে। আগেকার দিনে বউয়ের জ্বালায় অতীষ্ট হয়ে গেলে পুরুষ বলতো ‘এবার আমি সন্ন্যাসী হয়ে চললাম’। চৈতন্য সত্তার একই দুরবস্থা, সেও প্রকৃতির জ্বালায় মরছে। একটা অবস্থার পর পুরুষ বলে আর নয়।

এই সে যোগের এত লম্বা ব্যাখ্যা করা হল এর মধ্যে কোথাও কি আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব হয়েছে? পুরুষ প্রকৃতির বন্ধনে পড়ল, তারপর পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন থেকে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এসে দেখছে আসলে তার কোন বন্ধনই ছিল না, এত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা আমরা পেলাম না। সাংখ্য দর্শন এই যুক্তিকে অবলম্বন করে জোর গলায় বলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। পুরুষ আর প্রকৃতিকে দিয়েই আমার কাজ চলে যাবে, ঈশ্বরকে আমাদের কোথাও দরকার নেই। শুধু সাংখ্যই নয় বেদান্তের যেখানে শুরু, সেই পূর্ব মীমাংসকরাও একই কথা বলে। এই দুটো দর্শন, সাংখ্য আর পূর্ব মীমাংসা, পুরো বেদের উপর দাঁড়িয়ে আছে আর ষড়দর্শনের অন্যতম দুটি দর্শন। ষড় দর্শন থেকে ন্যায় আর বৈশাখিককে ছেড়ে দিলে আমাদের দর্শনে কোন সমস্যা হবে না, কিন্তু সাংখ্য আর পূর্ব মীমাংসাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় বেদান্ত মাঝ পথেই মুখ খুবড়ে বসে পড়বে। কারণ বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্ত এই দুটো দর্শন থেকে এসেছে। অথচ এই দুটো দর্শনেই ঈশ্বরকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এদের মতে ঈশ্বরের কোন দরকারই নেই। সাংখ্য আবার আরও মারাত্মক কথা বলে – দেখো বাপু! তুমি যে

ঈশ্বর ঈশ্বর করছ, তোমার এই ঈশ্বরকে তো চৈতন্যই হতে হবে। তাহলে চৈতন্য হয় বদ্ধ হয়ে আছে আর তা নাহলে মুক্ত হয়ে আছে, হয় প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়ে আছে আর তা নাহলে প্রকৃতির খপ্পড়ে নেই। কিংবা এটাও হতে পারে তিনি কখন প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়েছিলেন এখন বেরিয়ে গিয়ে মুক্ত হয়ে গেছেন। তাহলে যে ঈশ্বরকে প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়তে হয় সে আবার কিসের ঈশ্বর! যদি কোন সন্ন্যাসী মেয়ের পাল্লায় পড়ে বিয়ে থা করে বাচ্চার জন্ম দিয়ে দেয় তাহলে তিনি আর কিসের সন্ন্যাসী! তেমনি ঈশ্বরও যদি প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে বদ্ধ হয়ে আবার মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন তাহলে তার আর কী বৈশিষ্ট্য! আর যিনি মুক্ত তিনি বন্ধনে পড়তে যাবেন কেন! তুমি বলছ ঈশ্বর মুক্ত, তিনি যদি মুক্ত হন তাহলে তিনি সৃষ্টি করতে যাবেন কেন? আমরা এখানে সবাই মুক্ত, আমাদের কী কখন ইচ্ছে হবে জেল খাটতে কেমন লাগে দেখার জন্য যাই একবার জেল খেটে দেখে আসি? যে মুক্ত সে কেন যেচে বন্ধনে পড়তে যাবে! আর যে বন্ধনে পড়ে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ সৃষ্টি করতে হলে প্রকৃতির এলাকায় আসতে হবে, সুতরাং যিনি প্রকৃতির এলাকায় এসে বন্ধনে পড়ে সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তার বৈশিষ্ট্য কোথায়, সে আবার ঈশ্বর কিসের? সেইজন্য সাংখ্য বলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। সাংখ্য দাঁড়িয়েই আছে ঈশ্বর নেই এই যুক্তির উপরে। সাংখ্যের ঘাড়ে যদি কোন ভাবে ঈশ্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্যের পুরো দর্শন সব খসে পড়ে যাবে। সাংখ্যের কাছে পরিষ্কার, আমার প্রকৃতিই সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, এরপর ঈশ্বরে যাওয়ার আমার কিসের প্রয়োজন! আমার কাছে চৈতন্য সত্তা আছে, যিনি নিত্যমুক্ত। যখন সেই চৈতন্য সত্তা প্রকৃতির কাছে আসে তখন প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে নিজের নৃত্য দেখাতে শুরু করে। চৈতন্য বেচারী প্রকৃতির ওই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তারপর অনেক মার খেয়ে কান্নাকাটি করে করে এক সময় বলতে শুরু করে ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’। তখন সে মুক্তির পথে পা বাড়ায়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের জন্যও ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন হয় না। এই দুই ধরনের সমাধিতে ঈশ্বর দর্শনের কোন ব্যাপারই আসে না। সমাধির সাধনাতেও ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। এবারে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, আপনি বলছেন কপিল মুনি বেদের বক্তব্যই ব্যাখ্যা করছেন, অথচ বেদে প্রথমেই শুরু হচ্ছে *অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্*। বেদে অগ্নি একজন দেবতা, ইন্দ্র একজন দেবতা এই রকম বেদে পদে পদে শুধু দেবতাদের কথাই বলছে, যত সুক্তম্ আছে সবেতে দেবতাদের স্তুতি করা হচ্ছে। তাহলে বেদের সাথে সাংখ্যের কথা তো একেবারেই মিলছে না। সাংখ্য বলবে ঠিকই বলছ, বেদে দেবতাদের কথাই আছে। কিন্তু ওই যত দেবতা আছে এদের ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দেবতারা আসলে আমার তোমার মত যত জীব সাধনা করে করে হয়ত মুক্তি পেল না কিন্তু মুক্তি না পেলেও তাদের মধ্যে প্রচুর ক্ষমতা চলে আসে।

জ্ঞানমার্গে যখন নেতি নেতি পথে চলে তখন *knowledge is power*। আর ভক্তি পথে যখন চলে তখন *to know is to love*। জ্ঞানমার্গে চলে চলে যখন কেউ একটা জিনিষকে জেনে গেল তখন সেই জিনিষের ক্ষমতাটা তার মধ্যে চলে আসে। ঠাকুর বলছেন মিষ্টি গলার নীচে চলে গেলে আর তার মিষ্টত্ব পাওয়া যাবে না। তার মানে মিষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা এসে গেল, আপনাকে মিষ্টি আর মুগ্ধ করতে পারবে না। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ খুব মজার মজার গল্প করতে পারতেন। উনি উত্তরকাশীতে একবার খুব তপস্যা করছিলেন। তপস্যা থেকে ফিরে আসার পর ওনাকে চেরাপুঞ্জী আশ্রমে পাঠানো হল। চেরাপুঞ্জীর আশ্রমের অবস্থা তখন খুব একটা ভালো ছিল না, খুবই গরীব আশ্রম। মহারাজ একটা টিনের শেডে গিয়ে ঘুমোতেন আর সারা রাত সেখানে জপ-ধ্যান করতেন। প্রথম দিন শেডে ঘুমোতে গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই টিনের চালে ধূপ ধাপ করে আওয়াজ হতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন টিনের ছাদে পাথর ছুড়ছে। উনি প্রথমে একটু চমকে উঠেছেন। যাই হোক কিছুক্ষণ আওয়াজ হওয়ার পর সব আওয়াজ থেমে গিয়ে শান্ত হয়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলেন গাছ থেকে ফল-টল পড়ার জন্য আওয়াজ হচ্ছিল। দ্বিতীয় দিন আবার ওই একই কাণ্ড। উনি সেদিন একটা টর্চ নিয়ে দেখতে বেরোলেন, কিন্তু কোথাও কিছু নেই। তারপর ভাবলেন কেউ হয়তো ইট পাথর মারছে, নাকি ভূতের উপদ্রব, কিছুই বুঝতে পারছেন না। পরের দিন কাজ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো দিনের

বেলায় রোদের প্রচণ্ড তাপে টিন খুব গরম হয়ে যায়। চেড়াপুঞ্জী এমনিতে খুব ঠাণ্ডার জায়গা, রাত্রে ঠাণ্ডায় টিন সঙ্কুচিত হতে থাকে যার ফলে ওই রকম আওয়াজ হয়। ব্যস্, এরপর আর কোন চিন্তা নেই। জিনিষটাকে জেনে নেওয়া মানেই তার ক্ষমতাটা পেয়ে গেলেন, সেইজন্য বলা হয় to know is to have power, knowledge is power। জীবনের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, সব মানুষই ক্ষমতাকে ভালোবাসে, সেই ক্ষমতা সব সময় আসে জ্ঞান অর্জন থেকে।

এই সে এবার আপনি সাধনা করতে শুরু করলেন, বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতার সমাধি যেমন যেমন হচ্ছে তেমন তেমন আপনার জ্ঞান বাড়ছে। যেমন এর আগে বলা হল যে বস্তুর উপর ধ্যান করে সমাধি হচ্ছে সেই বস্তুর ক্ষমতা আপনার মধ্যে চলে আসবে। তেমনি তন্মাত্রার উপর ধ্যান করলে তন্মাত্রার ব্যাপারটা জেনে গেলেন, মনের উপর ধ্যান করলে মনের খুঁটিনাটি সব কিছু জেনে গেলেন। তন্মাত্রা, মনকে যদি জেনে যায় সেতো আমার আপনার থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। কিন্তু এইভাবে সাধনা করতে করতে তাকে তো একদিন মরে যেতে হবে। মরে যাওয়ার পর তার কী হবে? বলছেন, প্রকৃতি থেকে যখন সে আবার বেরিয়ে আসবে তখন সে প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে বেরিয়ে আসবে। তখন সে-ই হয়তো ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ কোন দেবতা হয়ে যাবে। এই কথাই সাংখ্য দেবতাদের ব্যাপারে বলছে, বেদে যে দেবতাদের কথা বলা হয়েছে, আমার তোমার মত অতি সাধারণ জীব সাধনা করে করে যখন অত্যন্ত ক্ষমতাবান হয়ে যায় তারাই পরে দেবতা হয়ে জন্ম নেয়। যাদের ক্ষমতা আরও কম, যারা যজ্ঞ-যাগ করেছে তারা স্বর্গে যাবে, সেখানে গিয়ে এই দেবতাদের অধীনে থাকবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আর অপরা বিদ্যা যে এক এখানে এসে বোঝা যায়। অপরা বিদ্যা বলছে তুমি যজ্ঞ কর, যজ্ঞ করলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। তবে অপরা বিদ্যা আর সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে একটা বড় পার্থক্য হল, অপরা বিদ্যাতে সে চাইছে আমার যেন স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধকরা দুর্বল চিন্তের সাধক বলেই তাদের একটা বস্তুকে অবলম্বন করে তাতে মনকে একাগ্র করতে বলা হচ্ছে। একাগ্র করে তাদেরও সমাধি হয়ে গিয়ে একটার পর একটা ক্ষমতা আসতে থাকবে। কিন্তু দুর্বল চিন্তা বলে তাদের সেই ক্ষমতা নেই যে সব ক্ষমতাকে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এরাই পরে আর সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মাবে না, দেবতা হয়ে বা দেবলোকাদিতে বিভিন্ন ভাবে জন্মাবে। বেদে যত দেবতাদিদের কথা বলা হয়েছে এরা সবাই এই শ্রেণির। আচার্য শঙ্করও তাই বলবেন। আমি আপনি যখন দেবতার কথা বলি তখন মনে করি যে আমরা আলাদা আর দেবতারা আলাদা কিছু। সাংখ্য বলবে আমরা কেউই আলাদা নই, দেবতাও যা আমিও তাই। তবে ওরা একটু এগিয়ে আছে আমি একটু পিছিয়ে আছি, এছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমাদের দেবতা বা ভগবানের কোন দরকার নেই। যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল ঈশ্বরের কোন দরকার নেই, আর বেদে যে দেবতাদের কথা বলা হয়েছে তাদেরও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল। তাহলে সাংখ্যই তো সব দর্শনের রাজা। স্বামীজী বলছেন কপিল মুনি আমাদের সমস্ত দর্শনের জনক, Father of all philosophy।

সাংখ্য ও বেদান্তের লড়াই

তাহলে সাংখ্য দর্শন ভারতে দাঁড়াতে পারল না কেন? তার কারণও এটাই, ঈশ্বরকে মানলো না বলে। সাংখ্য বলছে আমরা রাজা, ঈশ্বরকেই উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বেদান্তও বলছে না যে আমরা সাংখ্যবাদী, বরঞ্চ বলে আমরা বেদান্তী। সাংখ্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিল ঈশ্বর বলে কিছু নেই, আমরা হলাম রাজা। তাহলে এমন কিছু একটা অকাট্য যুক্তি আছে যেটা দিয়ে সাংখ্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। বেদান্তীদের কাছে এমন কী অকাট্য যুক্তি আছে যে যুক্তিতে তারা সাংখ্যকে উড়িয়ে দিয়েছে? বেদান্ত ঠিক এই জায়গাতেই সাংখ্যকে মারছে, তুমি যে ঈশ্বরকে মানো না এটা তোমার বোকামো। কিন্তু এর থেকেও বেদান্তের সাংখ্যের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুক্তি হল, সাংখ্য বলছে পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা, পুরুষের ক্রিয়াশক্তি নেই কিন্তু চেতনা শক্তি আছে। অন্য দিকে প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তি আছে কিন্তু চেতনা শক্তি নেই। অথচ সাংখ্য বলছে দুটোর মিলনে সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বেদান্ত সাংখ্যবাদীদের প্রশ্ন করছে দুটোর মিলন কী করে হচ্ছে? পুরুষের ক্রিয়াশক্তি নেই, যার ক্রিয়াশক্তি নেই সে প্রকৃতির কাছে যাবে কীভাবে? আর

প্রকৃতির চেতনা শক্তি নেই বলে তারও পুরুষের কাছে যাওয়ার প্রেরণা আসার কথা নয়। বেদান্ত যখন নানা রকম যুক্তি দিয়ে সাংখ্যকে আক্রমণ করে তখন এদের কাছে আর কোন উত্তর থাকে না। তখন সাংখ্য নানা রকম উপমা নিয়ে আসতে শুরু করে। যখন কেউ উপমা দিতে শুরু করবে বুঝতে হবে এবার তার যুক্তি দুর্বল হতে শুরু করেছে। তর্কেও যদি কেউ উপমা দিতে শুরু করবে বুঝবেন এবার সে দুর্বল হয়ে গেছে। সাংখ্যেরা এখানে উপমা নিয়ে আসে অন্ধ খঞ্জবৎ। একজন অন্ধ একজন খোঁড়া, এরা যেমন এক অপরকে সাহায্য করে ঠিক সেইভাবে পুরুষ আর প্রকৃতি এক অপরকে কাছে আসতে সাহায্য করে। কিন্তু এই উপমাতেও সাংখ্য বেদান্তীদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। যে মুক্ত পুরুষ সে বন্ধনে পড়তে যাবে কেন! সেইজন্য পরে পরে কিছু সাংখ্যবাদী একজন ঈশ্বরকে নিয়ে আসার প্রয়োজন মনে করলেন, কারণ তাঁরা দেখলেন ঈশ্বরকে না নিয়ে এলে চৈতন্য জড়ের কাছে আসবে কেন এই প্রশ্নের সমাধান করা যাবে না। এটাও একটা যুক্তি, কিন্তু এর থেকেও বেদান্তের কাছে একটা প্রচণ্ড বড় যুক্তি আছে। আচার্য শঙ্করও এই একই ভাবে সাংখ্যের বিরুদ্ধে প্রথর যুক্তি দিয়ে সাংখ্য দর্শনকে একেবারে কুচি কুচি করে কেটে রেখে দিলেন। তিনি সাংখ্যের কথা দিয়েই সাংখ্যকে কেটে রেখে দিলেন।

তুমি বলছ প্রকৃতিই সব কিছু করছে? হ্যাঁ, প্রকৃতিই তো সব কিছু করে দিচ্ছে। তোমার প্রকৃতি কী? প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো আর তমো। সৃষ্টি যখন হচ্ছে না তখন প্রকৃতির এই তিনটে গুণের কী হচ্ছে? কেন, সত্ত্ব, রজো আর তমো পুরো সাম্য অবস্থায় থাকে। তখন বেদান্ত বলবে, তাহলে তোমার মতে তমো যখন উঠতে চাইবে তখন সত্ত্ব আর রজো তমোকে দাবিয়ে দেবে, কারণ এই তিনটে এক তৃতীয়াংশ করে সমান অনুপাতে আছে। সৃষ্টি করার জন্য দরকার রজো গুণের আধিক্য, এবার সত্ত্ব আর রজো মিলে তমোকে তো দাবিয়ে দেবে, এরপর চৈতন্য এসে যতই ওখানে নাড়ানাড়ি করুক না কেন, পুরুষ এসে যাই করে দিক বক্ষ্যা স্ত্রী থেকে কোন দিন সন্তান উৎপাদন করতে পারবে না। তাহলে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তোমরাই বলছ এই তিনটে গুণ এক তৃতীয়াংশ করে সমান অনুপাতে আছে, তাহলে রজোগুণ যদি বাড়তে চায় তখন সত্ত্ব আর তমো এসে তো রজোগুণকে দাবিয়ে দেবে। রজোগুণকে দাবিয়ে দিলে সৃষ্টি হবে কোথা থেকে! সত্যিই সাংখ্যের কাছে এর কোন উত্তর নেই। সাংখ্য নিজের জালে নিজেই ফেঁসে যায়। সাংখ্যই বলছে তিনটে গুণ সমান অনুপাতে থাকে। সৃষ্টির জন্য রজোগুণ দরকার, শুধু রজোগুণই দরকার নয়, তার থেকে আরও বাজে ব্যাপার হল যখন মহৎএ আসে। মহৎ মানে সত্ত্বের আধিক্য, সত্ত্বের আধিক্য হলে সৃষ্টি এগোবে কী করে? এটা হতে পারে যদি তমোগুণের যে এক তৃতীয়াংশ আছে সেটা কমে এক শতাংশে এসে যায়, তখন তেত্রিশ থেকে হয়ে গেল বত্রিশ। এবার তমোর বত্রিশ থেকে ষোল দিয়ে দেওয়া হল রজোকে আর বাকি ষোল দেওয়া হল সত্ত্বগুণকে। তখন সৃষ্টিও চলতে থাকবে আর সত্ত্বও থেকে গেল। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ থেকে তমোগুণ যে কমে এক শতাংশে আসবে সেটা কী করে সম্ভব হচ্ছে? সেই কথাতো সাংখ্য বলছে না। এরপর বেদান্ত সাংখ্যের সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাইবে না। বেদান্ত বলবে, তোমার যেটা মূল কথা, যার উপর তোমার পুরো দর্শন দাঁড়িয়ে আছে সেটাই তোমার গোলমালে, এরপর তোমার সাথে আর কি কথা বলব! এই ধরণের অনেক কারণে সাংখ্য মার খেয়ে গেল। এটাকে বলে Dualistic Realism। সাংখ্যের বাস্তববাদী দর্শন আমাদের নেই। দ্বৈতবাদ বলতে ঠিক ঠিক যেটা বোঝায়, সেই দিক থেকে সাংখ্যই একমাত্র ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদী। সাংখ্য প্রথম থেকে দুটো সত্ত্বকে মানে, প্রকৃতি বা জড় সত্ত্বকে মানে আর পুরুষ বা চৈতন্য সত্ত্বকে মানে।

এরপর যোগদর্শন এসে গেল, আসলে যোগ সাংখ্যেরই বিস্তার। সাংখ্য অনেক কিছুতে চূপ থেকে গেছে, যোগ সেই কথাগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু যোগ প্রথমেই ঈশ্বরের বামেলাটা এড়িয়ে গিয়ে বলে দিল ঈশ্বর আছেন, তবে এই ঈশ্বর বেদান্তের ঈশ্বর নয়। যোগের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আগেই বলা হয়েছে knowledge is power, ঈশ্বর তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ। আমাদের কাছে যে জ্ঞান সেই জ্ঞান সীমিত, ঈশ্বরের কাছে সেই জ্ঞান অনন্ত আর চিরন্তন। সেইজন্য যোগদর্শনও দ্বৈতবাদ। ঠিক ঠিক বলতে গেলে যোগদর্শন ত্রয়ীবাদ হয়ে যায়, কারণ এখানে চৈতন্য সত্ত্ব আছে, প্রকৃতির সত্ত্ব আছে আর ঈশ্বরের সত্ত্ব আছে। কিন্তু তিনটে সত্ত্ব এলেও যোগদর্শনকে দ্বৈতবাদীই বলা

হয়। রামানুজ আর মাধ্বাচার্য যে দ্বৈতবাদের কথা বলেন সেই দ্বৈতবাদ কোন না কোন ভাবে যোগদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ঈশ্বর আছেন, জীব বা আত্মা আছেন আর জগৎ আছে। শুধু যোগের সাধন পদ্ধতি এবং অন্য কিছু কিছু জিনিষ বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীদের থেকে আলাদা।

বেদান্তের ঈশ্বর আর যোগের ঈশ্বরের পার্থক্য

এরপরেও অনেক রকমের যুক্তি নিয়ে আসা হয় যেখানে বেদান্ত যোগের ঈশ্বর ধারণাকেও কেটে দেয়। আমরা আর এত কিছুই মধ্য যাবো না। আমাদের এতটুকুতেই কাজ হয়ে যাবে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কখনই আমাদের ঈশ্বরের সাথে এক করবে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে গেলেও কোন দিন ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারবে না, নিজের স্বরূপে অবস্থান করবে কিন্তু যোগের ঈশ্বরের সঙ্গে এক হবে না। বেদান্ত দর্শনে এসে এই ব্যাপারটাই পুরো পাল্টে যায়। বেদান্ত বলে চৈতন্যের কোন অংশ হতে পারে না। আচার্য শঙ্কর বেদ থেকে উল্লেখ করেই দেখাচ্ছেন দুটো সত্তা কখন হতে পারে না। আবার যোগও বেদ থেকেই দেখাবে সত্তা মানে দুই। বেদান্তের ঈশ্বর আর যোগের ঈশ্বর এই দুই ঈশ্বরের মধ্যে বিরাট তফাৎ। বেদান্তের ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, জগতকে পালন করেন আবার জগতের লয়ের কর্তা। যোগের ঈশ্বর এসব কিছুই করেন না। যোগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছু জানেন। তাহলে আমি আপনি যা কিছু করছি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় কি করছি? কখনই নয়, এসব ক্ষেত্রে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করবেন না। তাহলে কি করে সব কিছু হচ্ছে? আমার প্রকৃতিতে করে যাচ্ছি, স্বভাবস্বত্ব প্রবর্ততো। প্রকৃতি তার নিজের মত চলছে, কিন্তু তিনি সবটাই জানেন। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ*, তিনি সমষ্টি রূপে জানেন আবার ব্যষ্টি রূপেও জানেন, তিনি বিশেষকেও জানেন আবার সামান্যকেও জানেন। যোগ তার ঈশ্বরের ব্যাপারে এই একই কথা বলছে, তিনি সবটাই জানেন কিন্তু কোথাও নাক গলাবেন না। বেদান্তের ঈশ্বর আবার সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন, ইচ্ছে করলে তিনি অনেক কিছুই করে দিতে পারেন। যোগ আবার বেদান্তের এই বক্তব্যকে মানবে না।

আসলে সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন তাদেরই জন্য যাদের ভেতরে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি আছে, লেগে থাকার দম আছে। ভ্যাদভ্যাদে চিড়ের মত লোকেদের জন্য যোগদর্শন নয়। কারণ যোগদর্শনের সব কিছু পালন করতে গিয়ে আমাদের বুক মাথা ফেটে সব চৌচিড় হয়ে যাবে। আচার্যও বলছেন, তোমাকে এটাই করতে হবে, এছাড়া আর কোন পথ নেই। শরণাগতিও একটা পথ। কিন্তু গিরিশ ঘোষকে যখন ঠাকুর বকলমা দিতে বললেন, তারপর ছেলে মারা যাওয়ার পর গিরিশ ঘোষ বলছেন ‘তখন তো বুঝতে পারিনি যে যে ছেলে মরে গেলেও কাঁদতে পারবো না’। ঈশ্বরের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে একটু এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু পথের ব্যাপারে একটু কোথাও তফাৎ হয় না। বেদান্তকেও এই পথ দিয়েই যেতে হয়, সেইজন্য যোগ প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ দর্শন।

এখন বলছেন দেবতা বা ঈশ্বর কারা? যাঁরা প্রচুর সাধনা করেছিলেন কিন্তু মুক্তি পাননি। মুক্তি যাঁরা পাননি, তাঁদের মধ্যে যিনি সব থেকে উপরে আছেন তিনি হয়ে যাবেন প্রকৃতিলীন পুরুষ। প্রকৃতিলীন পুরুষের নীচে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নীচে বাকি দেবতারা। এটাই উনিশ নম্বর সূত্রে বলছেন **ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্।।১৯।।** ভব মানে সংসার, *ভব-প্রত্যয়ো*, শেষে যখন সংসার জ্ঞানের মধ্যেই থেকে যায় তখন তাঁরই *বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্* হন, খুব হলে তাঁর প্রকৃতিলয়াদি হবে, তার বেশি কিছু হবে না। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যখন তুমি সংসারের কোন কিছুর উপর চিন্তা ভাবনা করে ধ্যানাদি করছ, তোমার সমাধিও হয়ে যাচ্ছে। অপরা বিদ্যাতে বলা হচ্ছে *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*, তুমি বিচার করে দেখ, এই যা কিছু তুমি করছ এর ফলে *লোকান্* অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল লোকাদিতে যাবে, এগুলো কোনটাই কোন কাজের নয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তোমার একই জিনিষ হচ্ছে। শেষে তোমার মনটা পড়ে থাকছে ভব, এই সংসারে। স্বামীজী ঠাকুরকে বলছেন খণ্ডন ভববন্ধন, আপনি এই সংসারের বন্ধনটা খণ্ডন করে দিন। কিন্তু তুমি যখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধির জন্য ধ্যান করছ, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দা ও সাস্মিতা এই যে চার ধরণের সমাধির কথা আগে অনেকবার বলা হয়েছে,

এগুলো সবই ভব-প্রত্যয়, সংসারের এলাকাতেই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে খুব হলে তুমি দেবতা হবে নাহলে প্রকৃতিলীন পুরুষ হবে বা ব্রহ্মার মত ক্ষমতা পেয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতির বাইরে যেতে পারবে না। তাহলে প্রকৃতির বাইরে কারা যেতে পারবে? যাঁরা অসম্প্রজাত সমাধিতে যাবেন। সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত এই দুই ধরনের সমাধির মধ্যে সম্প্রজাতে বস্তু জ্ঞান হয় না, বস্তু জ্ঞান ছাড়া সম্প্রজাতে আরেকটা খুব বড় ব্যাপার থেকে যায় তাহল আসক্তির ব্যাপার। একটা বস্তুর উপর আমি কেন ধ্যান করতে চাইছি? কারণ ওই বস্তুতে আমার আসক্তি আছে। আমাদের সবারই অনেক কিছুর প্রতি আসক্তি আছে, বাড়ির প্রতি আসক্তি আছে, পরিবারের প্রতি আসক্তি আছে, টাকা-পয়সার প্রতি আসক্তি আছে। এগুলো সবই বাইরের জিনিষ কিন্তু তার থেকেও বেশী আমার নিজের শরীর মনের প্রতি আসক্তি আছে, আমার সম্মানের প্রতি আসক্তি আছে। আসক্তিকে আমরা ছাড়তে পারি না। আসক্তি না ছাড়তে পারলে বস্তু জ্ঞানের দিকেই এগোবে, বস্তু জ্ঞান মানেই বৃত্তি জ্ঞান। বস্তু আর বৃত্তি মানেই সংসার। বস্তু জ্ঞানে অবশ্যই তোমার সমাধি হবে, কিন্তু তোমার মুক্তি হবে না, মৃত্যুর পর আবার যখন জন্মাবে তখন হয়তো কোন দেবতা বা শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা হয়ে জন্ম নেবে। মুক্তি হবে একমাত্র অসম্প্রজাত সমাধিতে।

যখন তার চিন্তাবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায় তখন সে নিজের স্বরূপের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। পতঞ্জলি কখনই বলছেন না যে এটাই একমাত্র পথ। তিনি বলছেন এই পথ ছাড়াও আরও অনেক বিকল্প রাস্তা আছে। এই সূত্রে পতঞ্জলি ঠিক বিভিন্ন পথের কথা না বলে বলতে চাইছেন যাঁরা সত্যিই সম্প্রজাতকে ছেড়ে আরও উচ্চতর স্তরে যেতে চাইছেন তাঁদের কি ভাবে যেতে হবে? বলছেন **শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।।২০।।** যাঁরা *বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্* থেকে ভিন্ন, যাঁরা অসম্প্রজাত সমাধির দিকে এগোতে চাইছে তাঁদের মধ্যে এই কটি জিনিষ থাকতে হবে। আমার মুক্তি চাইই চাই, এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। যদি বলেন আমার স্বর্গ চাইই চাই, তাহলে মুক্তি হবে না। আবার আপনি যদি বলেন এমনিতে আমার কোন কিছুই লাগবে না কিন্তু আমার একটা কুকুর আছে তাকে আমি খুব ভালোবাসি। তাহলেও হবে না। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা থাকতে হবে, গুরু যখন বলে দিয়েছেন তখন এটা অবশ্যই হবে, গুরুবাক্যে এই রকম শ্রদ্ধা থাকতে হবে। বীর্য, অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক প্রচণ্ড শক্তি থাকতে হবে। এরপর স্মৃতি, স্মৃতি খুব প্রখর হতে হবে, এই স্মৃতি ‘বৃত্তি স্মৃতির’ কথা বলা হচ্ছে না। এখানে স্মৃতি মানে গুরু মুখে এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যে জ্ঞান এসেছে সেই জ্ঞানকে সব সময় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা। এর সাথে বলছেন সমাধি থাকতে হবে, সমাধি মানে প্রচণ্ড একাগ্রতা, মনকে সব সময় উচ্চ চিন্তনে বা পবিত্র কোন কিছুতে একাগ্র করে রাখার ক্ষমতা। অনেকে চুপচাপ বসে আছে কিন্তু অনবরত পা নেড়ে যাচ্ছে বা অকারণে শরীরকে দোলাতে থাকবে, তার মানে এদের মন সব সময় চঞ্চল হয়ে আছে, এই চঞ্চল মন দিয়ে এদের দ্বারা যোগ কোন দিনই হবে না। যিনি যোগী হতে চাইছেন তিনি যে কাজই করুন না কেন, সব কাজই পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে করতে হবে। বিছানার চাদর পাতছে, ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে, জামা-কাপড় ভাজ করছে, জামার বোতাম লাগাচ্ছে প্রত্যেকটি কাজ পুরো একাগ্র চিন্তে করে যাচ্ছে। পূর্ণ একাগ্র দিয়ে যে কাজই করা হবে সেই কাজটাই একটা শিল্পকলার পর্যায়ে চলে যাবে। এরপর বলছেন প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা মানে সত্য কি, অসত্য কি, নিত্য কি, অনিত্য কি, পুরুষ কি রকম, প্রকৃতি কি রকম এই বিচার সব সময় রাখা। আমার যা কিছু চাওয়া, বাসনা সবই প্রকৃতির এলাকার মধ্যেই পড়ছে, কিন্তু আমি তো পুরুষ আমি কেন প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়তে যাব – এই বিচারকে নিত্য জাগিয়ে রাখা। এই বিচার আর ভাবকে জাগিয়ে রাখলে তখন যা কিছুই আসুক কিংবা চলে যাক তাতে তাঁর মনে কোন ধরনের বিকার আসবে না। কেউ যদি তাঁকে কিছু দিতে আসে তখন তিনি বলে দিতে পারবেন আমার এসব কিছুই লাগবে না। আমাদের কেউ যদি বলে – আপনি কি ব্রহ্মা হতে চান? আমরা কেউই চাইবো না ব্রহ্মা হতে। কিন্তু যদি বলে আপনার হাজার টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন আমরা সবাই রাজী হয়ে যাব। কারণ আমাদের দৌড় ওই হাজার টাকা পর্যন্ত।

যাদের প্রচণ্ড উৎসাহ আছে, আগ্রহ আছে আর সাহস আছে তারাই খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য পাবে। সেই কথাই পরের সূত্রে বলছেন **তীত্রসংবেগানামাসন্নঃ।।২১।।** যোগের পথে তোমার সাধনা

তীব্র হবে নাকি ধীরে ধীরে হবে এটা নির্ভর করে তোমার চেষ্টা কেমন হবে। ঠাকুর পার করে দেবেন, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে হয়ে যাবে, এসব কথায় যোগ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না তার আবার ঈশ্বর পার করে দেবেন কোন প্রশ্নই নেই। যোগ শুধু দেখে তোমার মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য আছে কিনা। ঠাকুরও টিমে তেতালা ভাব একদম সহ্য করতেন না। যার জন্য গীতাতে খুব জোর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘ধৃত্যুৎসাহসমত্বিতাঃ’। আধ্যাত্মিক জীবনে উৎসাহ খুব মূল্যবান, আমাকে যা পাবার এই জীবনেই পেতে হবে, আর এই উৎসাহকে বরাবরের জন্য ধরে রাখতে হবে, এই দুটো থাকলে সাফল্য আসবেই। ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্ম পুনর্জন্মকে মানেই না, হিন্দু ধর্ম বা বেদান্ত যদিও পুনর্জন্ম মানে কিন্তু বলবে তোমার যা করার এখানে এই জন্মেই করতে হবে। আমরা মনে করি ভোগ এই জন্মে করে নেওয়া যাক, যোগ আগামী জন্মে করা যাবে। বেদান্ত কক্ষণ এই কথা বলবে না, এই জন্মেই তোমাকে যোগ সাধনা করে জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তোমার যোগ সাধনা কত দূর যাবে নির্ভর করে তোমার বৈরাগ্য, তোমার সাধনা কতটা তীব্র। সাধনা যদি তীব্র না হয় তাহলে কিছুই হবে না।

তাহলে ধৃতি আর উৎসাহের তীব্রতা না থাকলে যোগ সাধনা করলে কী কিছুই হবে না? কিছুই যে হবে না তা নয়। তখন বলছেন – **মৃদুমধ্যাধিমাভ্রতাং ততোপি বিশেষঃ।।২২।।** আগের সূত্রটাকেই অন্য ভাবে বলছেন। উৎসাহ যদি সাধারণ থাকে, মানে মধ্যম থাকে তাহলে সাফল্যও সাধারণ হবে। যত বেশি সাফল্য পেতে চাইবে তত বেশি জোর দিতে হবে। কুড়ি নম্বর সূত্রকেই পরের দুটো সূত্রে টেনে নিয়ে বলছেন, যাদের মধ্যে তীব্র শ্রদ্ধা, প্রচণ্ড শক্তি, প্রখর স্মৃতি, জাগ্রত বিবেক তাদের তাড়াতাড়ি হবে, যাদের অতটা তীব্রতা নেই তাদের ধীরে ধীরে হবে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির এটা একটা পথ। এরপর বিকল্প পথের কথা বলছেন।

বিকল্প পথের কথা বলতে গিয়ে পতঞ্জলি বলছেন – **ঈশ্বরপ্রতিধানাদা।।২৩।।** যদি এত কিছু করা সাধ্যে না কুলায় বা এত কিছু যদি না করতে চায় তাহলে তাদের জন্য আরেকটি বিকল্প রাস্তা আছে, তা হল মনকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করে দেওয়া। ঈশ্বরের উপরে যদি ধ্যান করা হয় তাহলেও এই সমাধি লাভ হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা, এখন যদি আমরা আমাদের পুরো মনকে শ্রীরামচন্দ্রের উপরে, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামকৃষ্ণে একাগ্র করি তাতেও আমাদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হবে। যোগের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এই সূত্রে এসে সাংখ্য থেকে যোগ আলাদা হয়ে হয়ে যায়। এখান থেকেই যোগের ঈশ্বরত্বের উপর আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সাংখ্য ঈশ্বরকে কেন উড়িয়ে দেয় তার ব্যাখ্যা আমরা আগে করেছি। তাদের খুব সহজ বক্তব্য, ঈশ্বর যদি সচ্চিদানন্দ হন তাহলে তিনি পুরুষ। তিনি যদি পুরুষ হন তাহলে হয় তিনি বন্ধনে ছিলেন আর তা না হলে চিরমুক্ত। যদি তিনি বন্ধনেই ছিলেন তাহলে তিনি আর কিসের ঈশ্বর, আর যদি তিনি চিরমুক্তই থাকেন তাহলে বন্ধনে কেন পড়তে যাবেন বা অন্য জীবাত্তাদের জন্য তিনি বন্ধন কেন সৃষ্টি করতে যাবেন? যে কোন দ্বৈতবাদী ধর্মের কাছে এই প্রশ্নই একটি বিরাট সমস্যা। যদিও মাধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী ছিলেন কিন্তু তিনি নিজের দর্শনকে একটু অন্য ভাবে নিয়ে যাওয়াতে অন্যান্য দ্বৈতবাদী ধর্ম থেকে মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ আলাদা। কিন্তু এই প্রশ্ন সব রকম দ্বৈতবাদী দর্শনকে সমস্যায় ফেলে দেয়। বেদান্তের কাছে সমস্যা নয় কারণ বেদান্তের মতে সৃষ্টি বাস্তব নয়। যিনি শুদ্ধ চেতন্য তাঁরই নিজের প্রকৃতি, তিনি এই প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা একটা জিনিষকে ঢেকে দিয়ে সেটাকে অন্য রকম দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসলে কোথাও কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, সৃষ্টিও হয় না। সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, সচ্চিদানন্দ ছাড়া যা কিছু দেখছি এটাই মায়া। যোগের ঈশ্বরকে নিয়েও পাঁচটা প্রশ্ন করা যায়, কিন্তু আমরা এখানে সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। যোগ বলছে ঈশ্বরের ধ্যান করলেও হবে। ঈশ্বরের ধ্যান করা মানে, একমাত্র ঈশ্বর চিন্তন করে অন্যান্য বৃত্তিকে চাপা দিয়ে দেওয়া। তবে যোগের যে ঈশ্বর, তিনি সাকার কি নিরাকার, সাকার হলে সেই ঈশ্বরের সাকার রূপ কেমন হবে, এসব নিয়ে কোন কথা বলতে যাবে না।

যোগের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

যদিও সাংখ্য ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু যোগ ঈশ্বরের কথা বলছে। এই সূত্রে যোগ ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলবার একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে – **ক্লেশকর্মবিপাকাশয়েরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥** অর্থাৎ ঈশ্বর এক বিশেষ পুরুষ যাঁকে কোন ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল আর বাসনা স্পর্শ করতে পারেনা। আমি আপনি কে? আমিও সেই পুরুষ আপনিও সেই পুরুষ, আমার যে দেহ সেটাও প্রকৃতি থেকে এসেছে, আপনার যে দেহ সেটাও প্রকৃতির উপাদান দিয়ে তৈরী কিন্তু জাতি, বয়স, লিঙ্গ, সম্প্রদায় এগুলো আমার আপনার মধ্যে একটা ভেদ করে দিচ্ছে। আপনার আমার সাথে যে ভেদ রয়েছে ঠিক একই ভেদ আপনার সাথে আর আপনার সন্তানের সাথে এবং প্রত্যেকের প্রত্যেকের সাথে রয়েছে, এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। সেইজন্য জাতি, বয়স, লিঙ্গ, সম্প্রদায় এগুলোকে যোগে গণ্য করা হয় না। আমি আলাদা আপনি আলাদা এই বোধটুকুই আছে, এর বেশি আর কিছু নেই। কিন্তু আমার আপনার মধ্যে ঈশ্বরের বড় একটা পার্থক্য হল আমি আপনি বিভিন্ন জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছি, আর প্রকৃতির মধ্যে আমরা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে আছি। কিন্তু ঈশ্বর, তিনি হলেন বিশেষ পুরুষ, তিনিও পুরুষ আপনি আমিও পুরুষ কিন্তু তাঁকে দুঃখ, কর্মজনিত ক্লেশ এগুলো স্পর্শ করে না। তাঁর কোন ধরণের বাসনা নেই তাই তাঁকে কোন কর্ম করতে হয় না, সেইজন্য কর্মের কোন ফলও তাঁকে স্পর্শ করে না। যোগের ঈশ্বরের যে বৈশিষ্ট্য এখানে সেটা স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কোন ধরণের কর্মবিপাক, কর্মক্লেশ, কর্মশায়ের সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। কর্ম করলেই ক্লেশ হবে, কর্ম করলেই বিপাক অর্থাৎ বিপরীত ফলও হতে পারে আর কর্ম করলে কর্মশায় তৈরী হবে, অর্থাৎ একটা কর্ম করলে সেই কর্মের ফল থেকে আরও কর্ম তৈরী হবে। ঈশ্বরের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ তিনি এগুলোর কোন কিছুই সঙ্গে নিজেই জড়ান না, তাই সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। বেদান্তের ঈশ্বর বা ভক্তের ঈশ্বর কিন্তু সৃষ্টিকর্তা, তাই সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক। যোগের ঈশ্বর সৃষ্টির কোন কিছুতেই থাকেন না। সৃষ্টিতে জড়ালে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক প্রশ্ন এসে যাবে। কারণ যে কর্ম করছে তার ফলও তাকে স্পর্শ করবে। বেদান্ত যদি আগাগোড়া খুব গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে বেদান্তে ঈশ্বরের ধারণাটাই অন্য ধরণের। ঈশ্বরই হন আর যেই হন কর্ম করলে তার ফল তাঁকে পেতে হবে। যদিও আমরা বলি যিনি জ্ঞানী তাঁকে কোন কর্মের ফল স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু মহাভারতেই আমরা অন্য রকম ধারণা দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণকে যখন গান্ধারী অভিশাপ দিচ্ছেন তখন তার ফল শ্রীকৃষ্ণকেও রেহাই দিচ্ছে না। কিংবা হলধারী যখন ঠাকুরকে অভিশাপ দিচ্ছেন, ঠাকুরকেও সেই ফল পেতে হয়েছিল। একদিকে আমরা বলছি তিনি যখন মানুষের রূপ ধারণ করেন তখন তিনি মানুষের মতই ব্যবহার করেন। মানুষের মত ব্যবহার করলে মানুষের যা হবে একই জিনিষ অবতারেরও হবে। তাঁর বন্ধন হয়তো হবে না কিন্তু কিছু কিছু ফল তো তাঁকেও ভুগতে হবে। ঈশ্বর রূপে তাঁকে এগুলো বাঁধছে না ঠিকই কিন্তু দেহধারী মানব রূপে বাঁধছে। এগুলো নিয়ে প্রশ্নের আর শেষ নেই, সেই প্রশ্নের এই উত্তর, সেই উত্তরে আবার এত প্রতি প্রশ্ন হয় যে আমরা খেই হারিয়ে ফেলে জীবনের আসল উদ্দেশ্যটাই ভুলে যাই। সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভালো। যোগ এই ব্যাপারে পরিষ্কার, যোগ বলে দিচ্ছে ঈশ্বর আছেন কিন্তু কোন কর্মক্লেশ, কর্ম বিপাক, কর্মশায় এগুলো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কেন স্পর্শ করতে পারে না? কারণ তিনি স্রষ্টা নন। তাহলে সৃষ্টি কীভাবে হচ্ছে? পুরুষ প্রকৃতির মিলনে। সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

যোগের এই তত্ত্ব অনেকটাই দ্বৈতবাদী দর্শনের মত। ঈশ্বর আর জীব – ঈশ্বর হলেন বিশেষ পুরুষ আর জীব সাধারণ পুরুষ। এই যোগই আবার যখন অদ্বৈতে আসবে তখন বলবে ঈশ্বরের যে পুরুষ আর জীবের যে পুরুষ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যোগ বিশ্বাস করে ঈশ্বরই সেই আত্মা, সেই পুরুষ, কিন্তু বিশেষ।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যেখানে জ্ঞানের একটা ছোট কিরণ, রশ্মি বা আলোর একটা রেখা মাত্র থাকে সেখানে ঈশ্বরের মধ্যে সেটাই হয়ে যায় অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। বলছেন – **তত্র নিরতিশয়ং**

সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥২৫॥ ঈশ্বর আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এটিও একটি খুব বড় পার্থক্য। মানুষের মধ্যে যেটা বীজাকারে আছে সেটাই ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত আকারে আছে। যেমন জ্ঞান, আমার আপনার মধ্যে জ্ঞানের বীজটুকু আছে, অল্প একটু জ্ঞান আছে কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে পুরো জ্ঞানের ভাণ্ডার বিদ্যমান। যেমন আইনস্টাইন, বিজ্ঞানের অত বড় মস্তিষ্ক। পুরো জ্ঞানের ভাণ্ডার একটা বিশাল সমুদ্র, সেই জ্ঞান ভাণ্ডারে বিজ্ঞান একটা ছোট্ট অংশ, সেই বিজ্ঞানের একটা ছোট্ট অংশ হল পদার্থ বিজ্ঞান। সেই পদার্থ বিজ্ঞানের একটা অংশকে আইনস্টাইন জানেন। তার মানে জ্ঞানের বীজটুকু আইনস্টাইনের মধ্যে আছে। কিন্তু ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ। মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন *যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ*, ঈশ্বর ব্যাপ্তি রূপেও জানেন আবার সমষ্টি রূপেও জানেন।

এখানে এনারা একটি খুব মজার যুক্তি নিয়ে আসেন। যখনই কোন কিছু তারতম্য থাকবে, তারতম্য মানে তর ও তম, যেমন সুন্দর, সুন্দরতর এবং সুন্দরতম, ইংরাজীতে বলা হয় ডিগ্রী, যেখানেই ডিগ্রীর ব্যাপার আসবে, ছোট বড় বোধ যেখানে আসবে, সেখানে একটা maximum হতে বাধ্য। যেমন জল একশ ডিগ্রীতে ফুটেছে কিন্তু অন্য জিনিষ যেমন লোহা পনেরশ ডিগ্রীতে গিয়ে তরল হয়। তাহলে এখানে ডিগ্রী এসে গেল, তাহলে এর একটা maximum হতে বাধ্য। কিন্তু যেখানে ডিগ্রী বলে কিছু নেই, যেমন পুরুষ তিনি চৈতন্যময়, তাঁর ডিগ্রী বলে কিছু নেই বলে সেখানে আর কোন maximum হবে না। যেখানে ডিগ্রী আছে, যেখানেই তর ও তম অর্থাৎ তারতম্য আছে সেখানে maximum হবেই। কিন্তু যেখানে কোন তারতম্য নেই সেখানে যেটা আছে সেটাই maximum আমি আপনি কোন দিন এই maximum হতে পারবো না। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনা করে আমি আমার স্বরূপ জেনে যেতে পারি কিন্তু ঈশ্বরত্ব কোন দিন পাবো না। যোগ দ্বৈতবাদ ব'লে এখানে ঈশ্বর আর জীবের তফাৎ সব সময় থেকে যাবে। সাধারণ পুরুষকে অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষকে কর্মে লিপ্ত হতে হয় কারণ তার মধ্যে রয়েছে বাসনার বীজ, ঈশ্বরের কোন বাসনা থাকেনা বলে কোন কর্মও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। আর ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে অনন্ত জ্ঞান আর সাধারণ পুরুষের মধ্যে জ্ঞানের একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ মাত্র থাকে, মানুষের মধ্যে জ্ঞান খুব সীমিত।

স্বামীজী এই তারতম্যের খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন, তুমি যদি একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের কথা অনেকক্ষণ যাবৎ চিন্তা করতে থাক বা বৃত্তের দিকে তাকিয়ে থাক তাহলে কিছুক্ষণ পরে তোমার মনে হবে ওই ক্ষুদ্র বৃত্তের বাইরে আরেকটি বড় বৃত্ত হয়ে আছে। ঠিক তেমনি বিশ্বরক্ষাণ্ডকে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মত দেখ তাহলে ওই বৃত্তটা পরিবৃত্ত। পরিবৃত্ত কিসে? আরেকটি বড় বৃত্ত দিয়ে। ঠিক এইভাবে স্থান ও কালের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দেশের কথা ভাবলে সেই সীমিত দেশের বাইরে একটা অসীমিত দেশ আছে দেখতে পাওয়া যায়। কালের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, যদি এক সেকেন্ডের কথা ভাবি তাহলে তার চারিদিকে অনন্ত সময়ও আছে। যে কোন জিনিষ যদি সীমিত হয় তাহলে সেটা অসীমিতও আছে। তাহলে সীমিত কোথায়? অসীমের মাঝখানে। তাহলে জ্ঞান যদি সীমিত হয়, একজনের মধ্যে যদি সীমিত জ্ঞান হয় তাহলে অনন্ত জ্ঞানও থাকবে। যাঁর মধ্যে অনন্ত জ্ঞান আছে যোগে তিনিই ঈশ্বর। যারা জীব, যার মধ্যে সীমিত জ্ঞান আছে, সে যাই করুক না কেন, সব করে তার মুক্তিও হয়ে যেতে পারে কিন্তু অসীম জ্ঞান কখনই হবে না। এই যে অনন্ত জ্ঞান, যে জ্ঞানের উপরে আর কিছু যেতে পারে না এটাই ভগবান, এটাই যোগের ঈশ্বর। তাই যোগের ঈশ্বরের এই ধারণা বেদান্ত বা অন্যান্য সবার ঈশ্বরের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জ্ঞানের জন্য কী হয় বলতে গিয়ে পরের সূত্রে বলছেন।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল – **স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬॥** বলছেন তিনি, মানে ঈশ্বর যিনি, তিনি গুরুরও গুরু, কাল দিয়ে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আমার একজন গুরু আছেন, সেই গুরুরও একজন গুরু আছে, তাঁরও একজন গুরু আছেন, কিন্তু ঈশ্বর হলেন সবারই গুরু। সেইজন্য ঠাকুরকে আমরা বলি ‘জয় শ্রীগুরুমহারাজকী জয়’। বলছেন – *কালেনানবচ্ছেদাৎ* - বাকি গুরুরা কালের মধ্যে আবদ্ধ, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কাল সীমিত নয়। তাই যোগের দর্শন অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলা যাবে না। যোগের ঈশ্বর কখনই দেহ ধারণ করতে পারেন না। প্রথম কথা যোগ

অবতার তত্ত্বে বিশ্বাস করেনা, যোগ বলে যে ঈশ্বর কখনই শরীর ধারণ করেন না। যোগের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে আপনার কোন পার্থক্য নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন অনেক বড় আধারের পুরুষ আর আমি আপনি অনেক ছোট আধারের। ঈশ্বর সব সময়ই ঈশ্বর, তিনি সময়ের দ্বারা আবদ্ধ নন। যোগ কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মানবে না? যোগ বলবে – শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ সালে জন্মালেন আর ১৮৮৬ সালে দেহ ছেড়ে দিলেন। আপনি বলবেন ওটা মায়া, যোগ বলবে – ওটা আপনার কাছে মায়া, আমরা যেটা চোখে দেখছি সেটাই সত্য। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন এই বিরাট সচ্চিদানন্দ সাগরে যিশু, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এনারা হলেন যেন একটা বিরাট ঢেউ, আর আমি আপনি হলাম জলের ছোট ছোট বুদ্ধ।

যোগ ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে তাঁর কয়েকটি গুণের কথাও বলে দিল। ১) কোন দুঃখ কষ্ট তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। ২) তাঁর সর্বজ্ঞত্ব রয়েছে, যেটা মানুষের মধ্যে বীজ রূপে রয়েছে। তখন যিনি যোগী তিনি প্রশ্ন তুলবেন – যিশু কি সংস্কৃত জানতেন? না, সংস্কৃত জানতেন না। তাহলে তো তিনি সর্বজ্ঞ হলেন না। ঠাকুর কি ক্যালকুলাস্ জানতেন? না, জানতেন না। তাহলে তিনিও তো সর্বজ্ঞ হলেন না। যোগীদের মতে তাই এনারা কেউ ঈশ্বর নন। এর পরেও যোগ বলছে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু সমস্যা হল যোগের যিনি ঈশ্বর, তাঁর জগতের ব্যাপারে কোন ভূমিকাই নেই। তাহলে সৃষ্টি কে করেন? আমরা এর আগে যে বিদেহ, প্রকৃতিলীন পুরুষের কথা বললাম, সাস্মিতা সমাধি যাঁর হয়েছে তিনি প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে যান। এর মধ্যে যিনি বরিষ্ঠ প্রকৃতিলীন পুরুষ থাকেন তিনি মনু রূপে সৃষ্টির কার্য করেন। সৃষ্টির কার্যে ঈশ্বর কখনই থাকবেন না। সৃষ্টির ব্যাপারে ভাগবতে যত রকমের কল্পনা করা আছে যোগে তার কোনটাই প্রযোজ্য হবে না। ৩) তৃতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বর হলেন গুরুরও গুরু।

স্বামীজীর খুব মূল্যবান একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত হল, আমাদের সবারই ভেতর সমুদয় জ্ঞান বিদ্যমান, এর উপর স্বামীজীর খুব বিখ্যাত দুটি উক্তি হল ‘Each soul is potentially divine’ আর ‘All knowledge is within you’। আমাদের ভেতর সেই চৈতন্য সত্তাই বিরাজ করে আছেন বলে সমস্ত জ্ঞান আমাদের মধ্যেই আছে। কিন্তু আমি নিজেকে মনে করছি জগতের অনেক কিছুই তো আমি জানিনা, আমার মধ্যে অজ্ঞানতা আছে। আপাত দৃষ্টিতে দুটো বিরোধী কথা এসে যাচ্ছে, একদিকে বলা হচ্ছে সব জ্ঞান আমাদের ভেতরেই বিদ্যমান অন্য দিকে বেশীর ভাগ জিনিষের ব্যাপারে আমি অজ্ঞান। এই জায়গাতেই স্বামীজী বলছেন সব জ্ঞান তোমার মধ্যেই আছে কিন্তু এই জ্ঞানের উন্মেষের জন্য বাইরে থেকে একটা শক্তির ধাক্কা দেওয়া দরকার। বাইরে থেকে এই ধাক্কাটা দেন গুরু। স্বামীজী বলছেন, জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। গুরু যখন জ্ঞানের শক্তিতে আমাদের একটু ধাক্কা দিয়ে দেন তখন ভেতরের জ্ঞানের উন্মেষ হতে শুরু করবে। স্বামীজীর এই ধরণের বিখ্যাত উক্তি আমরা বিভিন্ন স্কুল কলেজের দেওয়ালে টাঙানো দেখি। কিন্তু ঠিক ঠিক কী অর্থে স্বামীজী এই উক্তি করেছেন আমাদের পক্ষে ধারণা করা একটু কঠিন। যখন বলছেন ‘all knowledge is within you’ সেটা কিন্তু মানুষ রূপে বা ব্যক্তি রূপে বলছেন না। আসলে চৈতন্য সত্তা আমাদের সবার ভেতরে বিদ্যমান, ওই চৈতন্য সত্তা রূপে আপনার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। কিন্তু চৈতন্য সত্তা পুরোপুরি বুদ্ধি দিয়ে ঢাকা। বুদ্ধি ওই চৈতন্যকে কিছুতেই বেরোতে দিচ্ছে না। গুরু গিয়ে টোকা মেরে আস্তে আস্তে চৈতন্যকে বার করেন। কিন্তু গুরু নিজেও সীমিত। আইনস্টাইন ফিজিক্স পড়াতে পারবেন কিন্তু বায়োলজি পড়াতে পারবেন না। আইনস্টাইন ফিজিক্সের গুরু, তিনি আপনার ভেতরে ফিজিক্সের জ্ঞান এনে দেবেন। যিনি বায়োলজির গুরু তিনি সেই ভাবে আপনার বায়োলজির জ্ঞান এনে দেবেন, যিনি ধর্মের গুরু তিনি ধর্মের জ্ঞান আপনার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে আসবেন। এই রকম প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গুরুর দরকার। আমাদের ধারণা বিভিন্ন গুরু আমাদের ভেতরে জ্ঞান ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, আসলে কিন্তু তা নয়। গুরু আমাদের ভেতর কোন জ্ঞান ঢুকিয়ে দিচ্ছেন না, তিনি কতকগুলো তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই তথ্যগুলো যখন ভেতরে গিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করে তখন কিছু তথ্য আমাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। জ্ঞান বা শিক্ষা যেটা হয় সেটা আমাদের ভেতর থেকেই হয়। শিক্ষক বা গুরু আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে দিচ্ছেন তা নয়। যে বিভিন্ন তথ্য ভেতর গিয়ে থেকে যাচ্ছে, আমাদের চেতনা সজাগ হয়ে কিছু কিছু তথ্যকে ধরে নেয়, যখনই কোন তথ্যকে ধরে নিলে তখনই সেই বিষয়ের পুরো

জ্ঞান আপনার জেগে গেল। যদি গুরু না থাকেন তাহলে কী হবে? গুরু থাকলে শিষ্যের জাগ্রত হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশী বেড়ে যায়। কিন্তু গুরু না থাকলে জ্ঞান বিকাশের সম্ভবনাটা হবে না। গুরু না থাকলে যে কিছুই হবে না তা নয়। রামানুজ্ খুব নামকরা গণিতজ্ঞ ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁর নিজের মত চিন্তা ভাবনা করছেন, কিছু কিছু ভাব তাঁর ভালও লাগছে, আবার বেশীর ভাগ ভাবগুলো সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। পরে হার্ডি নামে একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের কাছে যাওয়ার পর তিনি রামানুজকে একটা নির্দিষ্ট প্রণালীতে বেঁধে দিলেন।

গুরু যা কিছু দিচ্ছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলছেন সব তথ্য, তথ্যের বাইরে কিছু হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যদি তথ্য না হতো তাহলে ঠাকুরের কথা শুনে হৃদয়রাম আর হাজারর জীবন তো ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাতে হয়নি। কিন্তু চেতনা অর্থাৎ ক্ষেত্র যাঁদের তৈরী থাকে একটা তথ্য এলেই চেতনা সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এত গুরু, এত আচার্যের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দাঁড়াতেই তাঁর চেতনা দপ করে জেগে গেল। গুরু শিষ্যদের মাঝখানে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, সব শিষ্যই গুরুর সব কথা নিতেই পারবে না, কারণ সব কথা নেওয়ার প্রস্তুতি সবার মধ্যে হয়নি। যিনি সিদ্ধ গুরু তিনিও শেষ যে কথাগুলো বলেন সেগুলোও তথ্য হয়েই ভেতরে যাচ্ছে। যাঁদের মধ্যে চৈতন্য একটু জেগেছে তাঁরাই গুরুর কথা ঠিকমত অনুধাবন করে চটপট এগিয়ে যান। সেইজন্য গুরু ছাড়া চেতনা জাগার সম্ভবনা অনেক কম। কিন্তু গুরু থাকলেই যে সব শিষ্যের চেতনা জেগে যাবে তা নয়। স্বামীজীও তাই বলছেন, গুরু ছাড়া হবে না। শুধু যোগ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে গুরুর দরকার তা নয়, সবেতে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, সঙ্গীত, ছবি আঁকা সবেতেই গুরুর দরকার। বই পড়াও এই একই জিনিষ হচ্ছে। বইও আমাদের কিছু তথ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমার কিছু জিনিষ জানা আছে, কিছু দেখা আছে, সেটা বইয়ে পড়লে একটা বিশেষ জ্ঞান হয়ে যায়। আর সাক্ষাৎ গুরুর সান্নিধ্যে থাকলে মনে কিছু সংশয়, শঙ্কা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা পরিষ্কার করে দিতে পারেন। স্বামীজী এই অর্থেই গুরুর উপর বেশী জোর দিয়েছেন, গুরু না হলে কিন্তু হবে না। এতক্ষণ আমরা যত রকম গুরুর কথা বললাম ঈশ্বর হলেন এদের সবার গুরুরও গুরু।

ঈশ্বরের আরেকটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ৪) কালেনানবচ্ছেদাৎ, তিনি দেশ কালের অতীত, দেশ বা সময়ের দ্বারা তাকে সীমায়িত করা যায় না, তাই তিনি সব সময়, সর্ব কালেই আছেন। বাকী যত ঈশ্বরের ধারণা, তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলছে এগুলোকে যোগ একেবারেই মানবে না। কিন্তু যোগ কেন ঈশ্বরকে এখানে নিয়ে এসেছে? আমাদের ধ্যানের পক্ষে খুব উপযোগী হবে বলে ঈশ্বরকে নিয়ে আসা হয়েছে।

‘ওঁ’এর ব্যাখ্যা

তারপরে বলছেন – **তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥২৭॥** – বলছেন তাঁকে তো জানা যাবে না, ঠিক আছে যখন জানা যাবে না তখন আমাদের জানার দরকারও নেই। যদি তিনি আমার আপনার জীবনের দুঃখ-কষ্টের নিবারণ নাই করতে পারেন তাহলে এই ঈশ্বরের কি প্রয়োজন? সেইজন্য যোগ ঈশ্বরের কথা খুব বেশি বলবে না। কিন্তু তবুও যোগকে ঈশ্বরের কথা বলতে হচ্ছে। কারণ যোগ বলছে তোমার লক্ষ্য হল চিন্তবৃত্তি নিরোধ করা, ঈশ্বর আমাদের এই চিন্তবৃত্তি নিরোধ করতে সাহায্য করেন। তিনি হলেন সেই পুরুষ, সচ্চিদানন্দ, আমরা তো তার উপর মনকে একাগ্র করে চিন্তের বৃত্তিগুলিকে আটকাতে পারি। কিভাবে একাগ্র করতে হবে সেটাকে বলতে গিয়ে প্রথমে বলছেন ‘তস্য বাচকঃ প্রণবঃ’। তাঁর যে বাচক সেটা হল ওঁ। কেন আর কিভাবে ঈশ্বরের বাচক ওঁ, আর এর কি মর্মার্থ, এর উপর খুব গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

ঈশ্বরের সব সময় দুটি রূপ – একটি তাঁর চৈতন্য রূপ যে রূপকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, এই রূপকে আমরা বলছি ঈশ্বরের অব্যক্ত রূপ, তাঁর আরেকটি রূপ হল ব্যক্ত রূপ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপ। সব ধর্মই বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।

যেটাই ব্যক্ত রূপ, অর্থাৎ যেখানে বস্তু রয়েছে তা সে চাঁদ হোক, সূর্য হোক বা অন্যান্য যত গ্রহ নক্ষত্রই হোক, যে কোন বস্তু হলেই বস্তুর সঙ্গে একটা নাম থাকবেই। এটাই হয়ে যায় নাম আর নামী। যেমন আপেল বলতে একটা বস্তুর নাম কিন্তু আপেল আবার একটা নামীকে বোঝাচ্ছে, নামী হল বস্তু, যেটা সেই বস্তুর ভেতরের ভাব। যে কোন বস্তুর দুটো অঙ্গ, একটা বস্তু রূপ আরেকটি তার নাম রূপ। নাম আর নামী সব সময় অভিন্ন। নামীর সাথে আমরা আবার অনেক বিশেষণ লাগাচ্ছি। যেমন যখনই কেউ জল বলল, আমি জানি সে কি বলতে চাইছে। যেমনি বলল জল নিয়ে এস তখন আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না কি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। কিন্তু জলের ক্ষেত্রে অনেক রকম বিশেষণ আছে, ঠাণ্ডা জল, গরম জল, পানীয় জল, হাত ধোয়ার জল ইত্যাদি। কিন্তু যখন H²O বলছে তখন জলের একটা বিশেষ উপাদানের কথাই বলা হচ্ছে, যেটা সব সময় জলেই থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে জল শব্দটা পাল্টে যাচ্ছে, কোথাও পানী বলছে, কোথাও ওয়াটার, কোথাও একোয়া বলছে। কিন্তু যদি বলা হয় জলের একটা সর্বসাধারণ শব্দ ঠিক করতে, তখন আমরা ঠিক করে জলের একটা সাধারণ শব্দ বলতে পারবো না। অন্যান্য বস্তুর ব্যাপারে সাধারণ একটা শব্দ নাও করা যেতে পারে কিন্তু একটি বস্তু আছে যার শব্দ মোটামুটি বিশ্বের সব ভাষাতেই এক মনে হবে। সেটা হল মা। ছাগলও বলে ম্যা, গরুও বলে হান্না। বিশ্বের যে কোন দেশে মাকে কোথাও আম্মা, কোথাও মাম্মি, মাদার বলছে, সব শব্দের মধ্যে ‘মা’ শব্দটা জড়িয়ে আছে। বাচ্চা যখন প্রথম মুখ খোলে তখন ঠোঁট দিয়েই তার প্রথম শব্দ বেরোয়, সেইজন্য ‘প’, ‘ম’, ‘ব’ এই শব্দ গুলো যে কোন শিশুর বাচ্চার মুখ দিয়ে প্রথম উচ্চারিত হয়। পাপা, বাবা, মা এই শব্দগুলো বাচ্চার মুখে খুব সহজে আসে। ‘ফ’ আর ‘ভ’ তে জোর বেশী লাগে, বাচ্চারা জোর দিতে পারে না, তাই এই তিনটে ‘প’, ‘ব’ ও ‘ম’ সব দেশে বাচ্চাদের মুখে খুব সহজে আসে। ভোকাল কর্ড যদি ঠিকমত প্রশিক্ষণ না পেয়ে থাকে তখন ঠোঁট থেকে যে শব্দগুলো বেরোয় সেই শব্দগুলোই বেশী বেরোবে। মা শব্দটা সবার খুব সাধারণ শব্দ হওয়ার কারণ এটাই। শিশু প্রথম থেকে যাকে খুব কাছে কাছে দেখছে, যে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছে, তাকে সম্বোধন করার যখন প্রয়োজন মনে হয় তখন বাচ্চা প্রথম যখন মুখটা খুলতে থাকে তখন ওই মা শব্দটাই বেরিয়ে আসে। সেইজন্য সারা বিশ্বে মা শব্দটা খুব সাধারণ শব্দ হয়ে গেছে।

এই সিদ্ধান্তটাই আমাদের ঋষিরা গ্রহণ করলেন। বস্তু মানেই নাম, বস্তু হলেই তার একটা নাম থাকবে। আর নাম থাকলেই ‘অ’ থেকে ‘ম’ পর্যন্ত যেতে হবে। আমাদের বর্ণমালা শুরু হয় ‘অ’ থেকে আর শেষ হয় ‘ম’তে গিয়ে। ‘অ’ বর্ণযুক্ত সমস্ত শব্দ বের হয় কণ্ঠ দেশ থেকে। ‘অ’ ‘উ’ ‘ম’ যেমন তিনটে, গানে সেটাই সাতটা সুর হয়ে যায়, এরও আবার কোমল তীব্র মিলিয়ে অনেক রকম হয়ে যায়। কিন্তু ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ বর্ণমালায় গিয়ে সংখ্যাটা অনেক বড় হয়ে যায়। সমস্ত বর্ণমালা যদি কমাতে শুরু করা হয় তখন কত দূর কমানো যেতে পারে? কণ্ঠ দেশ আমাদের রাখতেই হবে, কারণ এখান থেকেই শব্দ বেরোতে শুরু করে। দ্বিতীয় ঠোঁট আনতেই হবে, কারণ এখানে এসে শব্দ শেষ হচ্ছে। কণ্ঠ আর ঠোঁটের মাঝে একটা কিছু আছে বলে ওর জন্য একটা কিছু রাখতে হবে। এই মাঝের অংশে শব্দটা গড়াতে থাকে, এর শুরু হয় ‘উ’ দিয়ে। ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ এই তিনটেকে যদি রাখা হয় তাহলে বর্ণমালার স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের যত অক্ষর আছে সব কটিকেই এই তিনটে দিয়ে মোটামুটি বেঁধে ফেলা যায়। এবারে যে মুহুর্তে ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ দিয়ে সব বর্ণগুলিকে বেঁধে দেওয়া হল তখনই সমস্ত বর্ণ দিয়ে যত শব্দ আছে সব শব্দকেই বাঁধা হয়ে গেল। সেইজন্য বলছেন *তস্য বাচকঃ প্রণবঃ*।

যেমন CO² বলতে কার্বনডাইঅক্সাইড বোঝায়, C বলতে বোঝাচ্ছে কার্বনকে। এবার ডায়মণ্ড বলতে যা কিছু আছে, গ্রাফাইট বলতে যা কিছু আছে, কয়লা বলতে যা কিছু আছে শুধু একটা C দিয়ে পুরো জগৎ বুঝিয়ে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি যখন ওম্ বলা হচ্ছে তখন যত রকমের বস্তু আছে, বস্তুকে যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়, ইঙ্গিত করা হয় নাম দিয়ে, নাম মানেই শব্দ, শব্দ মানেই বর্ণের সংমিশ্রণ। আর যত রকম বর্ণের সংমিশ্রণ আছে সব এই ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ এই তিনটির মধ্যে চলে আসবে। তাহলে ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ দিয়ে ঈশ্বরের যে ব্যক্ত রূপ সেটাকে দেখিয়ে দেওয়া যায়। আর অব্যক্তকে কি দিয়ে

বোঝাচ্ছেন? ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’এর পর যে নৈঃশব্দ নেমে আসছে, এই নৈঃশব্দটাই অনন্ত। অনন্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের অব্যক্ত ওর মধ্যেই এসে যাচ্ছে। সেইজন্য ওঁমকে বলা হচ্ছে *তস্য বাচকঃ প্রণবঃ*।

ওঁম দিয়ে ঈশ্বরের অভিব্যক্তিকে সব থেকে স্পষ্ট করা যায়। বেদ বা উপনিষদ বলছে বলেই বলা হচ্ছে না, পুরোপুরি যুক্তির দিয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওঁমই একমাত্র শব্দ যা দিয়ে ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপ আর অব্যক্ত রূপ দুটো রূপকেই দেখিয়ে দেয়। আল্লা শব্দ দিয়ে বা গড্ শব্দ দিয়ে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম যদি ঈশ্বরকে বুঝিয়ে দেয় এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু আল্লা ও গড্ এই দুটো শব্দ থেকে জগৎরূপী ঈশ্বর ও জগতের পারের ঈশ্বরকে বুঝিয়ে দিতে ওঁ অনেক বেশী কাছাকাছি যায়। অনেক বাড়িতে বাচ্চা তার মাকে মা না বলে অন্য কিছু নামে সম্বোধন করে। দিদিমার কাছে বড় হয়েছে বলে হয়তো দিদিমাকেই মা বলে ডাকছে, আর বাচ্চা যদি মামার বাড়িতে বড় হয়ে থাকে সেখানে তার মাকে সবাই দিদি বলে ডাকতে শুনছে বলে সেও মাকে দিদি বলে ডাকে। তাই বলে দিদি আর মা একই সম্পর্কের হবে না। কারণ মা শব্দ বলতেই বোঝায় বাচ্চা প্রথম দিন থেকে যে objectকে প্রত্যক্ষ ভাবে চেনে। বাচ্চা প্রথম চেনে যে তাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, যে তার লালন-পালন করছে, ফলে তার শব্দটা বেরোচ্ছে মা। মা বলতে যেমন বোঝায় যিনি বাচ্চাকে প্রথম দিন থেকে দেখাশোনা করছেন, ঠিক তেমনি ওঁম বলতে বোঝায় পুরো সৃষ্ট জগৎ আর জগতের বাইরে যেটা আছে, দুটোকেই বোঝাচ্ছে। সেইজন্য বলছেন *তস্য বাচকঃ প্রণবঃ*।

এই সূত্রের বিরাট লম্বা ভাষ্য দিয়ে স্বামীজী বলছেন, শব্দ ও বস্তুর মধ্যে সব সময় একটা সম্বন্ধ থাকে। বিজ্ঞানীরা ফিজিক্সের যখন বিভিন্ন জিনিষের নামকরণ করেন তখন সেই বস্তু ও নামের মধ্যেও একটা সম্বন্ধ থাকে। বিভিন্ন দেশ, জাতি, সমাজে এসে বস্তুর নামের পরিবর্তন হলেও সম্বন্ধ একটা তাতে থাকতে হবে, সম্বন্ধ ছাড়া চলবে না। আমরা যদি শব্দের গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো কোন কোন ভাষার শব্দ সেই বস্তুর খুব কাছাকাছি চলে গেছে, তখন বলে এই শব্দটাই এই বস্তুর সার্বজনীন শব্দ। ঠিক তেমনি ঈশ্বর বলতে আমরা যে কোন শব্দ নিতে পারি, শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, আল্লা, গড্ যা খুশী নিতে পারি, কিন্তু দেখা যায় ঈশ্বরের সম্বন্ধ যুক্ত যত রকম শব্দ আছে তার মধ্যে ওঁম শব্দই ঈশ্বরের খুব কাছে যায়। ‘অ’ ‘উ’ ও ‘ম’এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই ব্যাখ্যার জন্য ওঁম ঈশ্বরের সব থেকে কাছে যাচ্ছে। সেইজন্য যোগের যে ঈশ্বর তাঁর নাম ওঁম। উপনিষদাদিতে ওঁম এর অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যোগ এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে আমার যে ঈশ্বর তাঁর বাচক হল ওঁম। যদু, মধু, শ্যামের মত ওঁম কোন ঈশ্বরের নাম নয়, ঈশ্বরের বাচক বলা হচ্ছে। যদিও যদু, মধু এগুলো বাচক কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ওঁম শুধু নাম নয়, বাচক কারণ সে ঈশ্বরের দিকে ইঙ্গিত করে। ঈশ্বরের নাম নয় কেন? কারণ ঈশ্বরকে কখন বস্তু রূপে দেখা হচ্ছে না। বস্তু হলেই একটা নাম হবে, কিন্তু ঈশ্বর তা নয়, তিনি *কালেনানবচ্ছেদাৎ*, তাঁকে শুধু ইঙ্গিত করা যায়। কি দিয়ে ইঙ্গিত করা যায়? ওঁম দিয়ে। তাই বলছেন *তস্য বাচকঃ প্রণবঃ*।

শুধু যে যুক্তিতেই এই কথা দাঁড়াচ্ছে তা নয়। তখন স্বামীজী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন, দেখা যায় হিন্দুরা ধর্ম নিয়ে প্রচুর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। কিন্তু ধর্মের কোন ব্যাপারেই সবাই একমত নয়, কেউ বলছেন পুরুষ ঈশ্বর, নারী ঈশ্বর, কেই নিষ্ঠুর ঈশ্বরের কথা বলছেন, কেউ বলছেন সগুণ ঈশ্বরের কথা, কেউ নিরাকার সাকার নিয়ে বিচার করে যাচ্ছেন কিন্তু ওঁমএর ব্যাপারে এনারা সবাই এক। এটা অতিরিক্ত যুক্তি, কিন্তু প্রধান যুক্তি হল যা কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে সবই বস্তু রূপে আছে, বস্তু হলে তার একটা নামও থাকবে। নাম মানেই বর্ণমালার মধ্যে সে আবদ্ধ। পুরো বর্ণমালাকে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় এই তিনটিতে ‘অ’ ‘উ’ ও ‘ম’। আমরা যেমন কথায় কথায় বলি ‘আমি এই ব্যাপারে A to Z জানি’। মানে বলতে চাইছি আমি এর আদ্যপান্ত জানি। A to Z বলতে যা বোঝায় সেটাই ওঁম বলতে বোঝায়। তাহলে আমরা বলতে পারি ওঁম না বলে A to Z শব্দ ভগবানের জন্যও ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এতে সমস্যা হবে, এখানে শেষ যে Z শব্দ বলছি এখানে এসে যুক্তিটা দাঁড়াবে না। Z বলতে গিয়ে মুখটা বন্ধ থেকে যাচ্ছে, পুরো খুলছে না। যেমন বস্তু ও শব্দের সম্পর্ক আছে, ঠিক

তেমনি শব্দ ও ধ্বনির মধ্যেও সম্পর্ক আছে। ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষাতে শব্দ আর ধ্বনিকে মেলান হচ্ছে না, বিশ্বের একমাত্র বিজ্ঞান সম্মত ভাষা হল সংস্কৃত ভাষা, যে ভাষাকে আমাদের ঋষিরা পুরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমন সংস্কৃত বর্ণমালাতে প্রথম বলছে ‘অ’, ‘অ’ থেকে সামান্য একটু জোরে আসছে ‘আ’ বর্ণে, তারপর এইভাবে ‘ই’ ‘উ’ ‘এ’ ‘ঐ’ ইত্যাদিতে জোরটা একটু একটু করে বাড়ছে। তারপর ‘ও’ থেকে ‘ক’এ এসে আরেকটু উপরে এল, সেখান থেকে ‘চ’এ এসে আরও উপরে এল, ‘চ’ থেকে ‘ত’, ‘ট’ আর ‘প’ যখন এসে গেল তখন শব্দ ঠোঁটে চলে এল, পুরোটাই একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ইংরাজী বর্ণমালায় প্রথমেই A আর সেখান থেকে সোজা ঠোঁটে নিয়ে আসা হয়ে হয়েছে Bতে। Cতে এসে আবার পেছনে চলে গেল। D ওখানেই থাকল, কিন্তু E আবার নীচের দিকে চলে গেল। শব্দের কোন সামঞ্জস্যই নেই।

পঁচিশ থেকে সাতাশ এই তিনটে সূত্র যোগের খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তিনটে সূত্রকে মাথার মধ্যে খুব ভালো করে না বসাতে পারলে যোগের ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই আমরা ধারণা করতে পারব না। একসাথে তিনটে সূত্রকে আমরা আবার একটু আলোচনা করে নিচ্ছি। পঁচিশ নং সূত্রে বলছেন তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্, বাকি সবারই মধ্যে জ্ঞানের বীজ মাত্র রয়েছে। রেলের ইঞ্জিনিয়ার রেলের কলকজা ও মেশিন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে, কিন্তু কলকজা আর মেশিন দিয়েই শুধু রেল চলছে না, রেলকে ঠিক মত চলতে গেলে এর বাইরে রেলের অনেক কিছুই দরকার। তার মানে রেলের ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে রেলের জ্ঞানের বীজটুকু আছে। কিন্তু এই বীজ বৃক্ষ রূপে একমাত্র ঈশ্বরেই আছে। কারণ তিনি শুধু একটা দুটো জিনিষ জানেন না, শুধু যে কলকজা আর মেশিনের খবরই তিনি জানেন তা নয়, অন্যান্য সব কিছুই জানেন। তার কারণ যখনই আমরা একটা ক্ষুদ্র বৃত্তকে দেখি তাহলে ওই ক্ষুদ্র বৃত্তের চতুর্দিকে অনন্ত বিস্তৃত আরেকটি বৃত্তের কথাও আমাদের মনে হবে। ছোট আছে মানে তার বড়ও হবে, তেমনি যদি বীজাকার থাকে তাহলে তার বৃক্ষাকার হতে বাধ্য। অনু আছে মানে বৃহৎও আছে। এখানে একটাকে নেওয়া হচ্ছে না, যেখানেই তারতম্যের ব্যাপার আছে সেখানেই তার একটা maximum আসবে। এই ভাবটাই যোগ ঈশ্বরের উপর নিয়ে এসেছে।

মূল কথা হল, যোগ বলছে এই জগৎ জড়, কিন্তু এই জড়ের পেছনে আছে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পেছনে আছে মন, মন আবার দুই ভাবে আসে, এরপর আসছে প্রকৃতি, আর প্রকৃতির পারে আছে মুক্তি। একবার এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করে গেলে মুক্তি হয়ে যাবে। এনারা যে পথের কথা বলবেন তাতে প্রথমে বলবেন আপনি কোন একটা বিষয়ের উপরে মনকে একাগ্র করণ, তারপর সেই বিষয়ের যে তন্মাত্রা গুলো রয়েছে তার ওপরে মনকে একাগ্র করতে বলবে। এইভাবে মন একাগ্র হতে হতে একটা সময় বস্তু আর তার তন্মাত্রা গুলিকে পরিষ্কার আলাদা করে দেখা যাবে। কিন্তু এখন আমরা সব একাকার দেখছি। ধরণ আমাকে কেউ ডাকল, তখন আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, ঐ যে নাম ধরে ডাকল, এখন এই নাম ধরে ডাকার শব্দ, শব্দের যে রূপ, তার অর্থ, তার প্রাসঙ্গিকতা, এগুলো সব আমাদের কাছে এক জোট হয়ে খিচুরি পাকিয়ে একটা একক বস্তু রূপে গণ্য হয়। যোগীরা কিন্তু এর প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা দেখেন। কোন গ্রাম দেশে যখন কেউ কাউকে দূর থেকে ডাকছে তখন দূর থেকে শব্দটা ভেসে আসে। কেউ হয়তো বুঝতেও পারে না কে কাকে ডাকছে, একটা শব্দ যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। তারপর স্পষ্ট বুঝতে পারবে, একটা শব্দ ভেসে যাচ্ছে কারুর উদ্দেশ্যে, নিজেকে ঐ শব্দ থেকে পরিষ্কার আলাদা দেখা যায়। এই ধরণের অভিজ্ঞতা এখানে হবে না। ফাঁকা মাঠে বেশি মনে হবে। ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও শব্দ থেকে, শুধু শব্দই নয়, স্পর্শ, কোন কিছুর গন্ধ, একটা দৃশ্য, এগুলি থেকে নিজেকে আলাদা দেখা যায়। একটা স্পর্শ পেলাম, আমি আলাদা স্পর্শটা আলাদা। এগুলি আমার আপনার সবার হবে, তখনই হবে, আমরা যত আমাদের মনকে একাগ্র করতে পারব ততই এগুলো পরিষ্কার হতে থাকে। প্রথমেই একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়। এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার পরে আসে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে আলাদা করা। আলাদা করা তখনই যাবে যখন প্রতিক্রিয়ার সময়টা কমে আসবে আর নিজের মনের উপর যখন অনেক নিয়ন্ত্রণ হবে।

প্রতিক্রিয়ার সময় যখন ধীরে ধীরে কমতে থাকে তখন মন তার নিজের আসল জায়গায় প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। মন যত নিজের স্বরূপে মিশে যেতে থাকবে ততই এই জগতের সাথে যে বাঁধনে বাঁধা আছে, সেটা আলগা হতে থাকবে। এখন এই যে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমাদের চোখের সামনে দেখছি, এর মধ্যে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র দেখছি। ধ্যানের মাধ্যমে যখন নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করবে, অর্থাৎ তার প্রকৃত স্বরূপের দিকে সে অগ্রসর হতে থাকবে তখন তার পেছনে যে বিশুদ্ধ চৈতন্য রয়েছে সেই চৈতন্যের মধ্যে সে নিজেকে দেখতে শুরু করছে, সেই চৈতন্যের আলো আরো অধিক মাত্রায় প্রকাশমান হতে থাকবে। এইভাবে এই জগতের গুরুত্ব যত তার কাছে কমতে থাকবে ততই তার প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়তে থাকবে এবং একটা সময় আসে যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সমুদ্রের একটা জলকণার মত মনে হবে।

পুরুষ যখন নিজেকে আত্মস্বরূপ আর এই প্রকৃতির জ্ঞানের মাধ্যমে বাইরে ও ভেতরে বিস্তার করতে থাকে তখনই তার কাছে জগৎ তুচ্ছ হতে থাকে। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যখন পুরুষ ও প্রকৃতির জ্ঞান এসে যায় তখন পরিষ্কার বোঝা যায় ‘ও এই ব্যাপার’! ঠাকুর বলছেন – একজন মুখোশ পড়ে ভয় দেখাচ্ছিল। যাকে ভয় দেখাচ্ছিল সে বলল ‘আরে, তুই আমাদের পোদো না’। সে যখন পোদোকে চিনে ফেলে তখন পোদো তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক জনকে ভয় দেখাতে চলে গেল। ঠিক সেই রকম প্রকৃতি এই নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে আর সেই নাচ দেখে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে নিজেকে একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। যখন ধ্যানের প্রক্রিয়ায় পুরুষ নিজেকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে বিস্তার করতে শুরু করে দিল সেইখান থেকে প্রকৃতি তুচ্ছ হতে থাকে, তুচ্ছ হতে হতে প্রকৃতিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তখনই পুরুষের মুক্তি হয়ে গেল। এখন শুধু পুরুষই আছে প্রকৃতি আর নেই। পুরুষের এই অবস্থাটাই যোগের ভাষায় বলা হয় কৈবল্য, কৈবল্য মানে কেবল মাত্র পুরুষই আছেন আর কিছু নেই। কৈবল্যই রাজযোগের চরম লক্ষ্য। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাজযোগ মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের নিয়ে যায়। স্বামীজী কর্মযোগে একটা খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – একটা বলদ ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা মশা ওর শিংএর উপর বসে আছে। অনেকক্ষণ বসার পর মশাটার কি মনে হল, সে বলদের কানে গিয়ে বলছে ‘দাদা, অনেকক্ষণ আপনার শিংএ বসে আছি, আপনার নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে, এর জন্য আমি খুব দুঃখিত’। বলদ বলছে ‘তুমি তোমার পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে এসে আমার শিংএ অনেক দিন বসবাস করে যাও না কেন তাতে আমার কিছুই যায় আসে না’। প্রকৃতি ঠিক এই বলদের শিংএ বসে থাকা মশার মত হয়ে যায়। এখানে বলদ সেই পুরুষ আর মশা প্রকৃতি।

আগেকার দিনের শাস্ত্রকাররা নিজেদের মনগড়া কিছু লিখতেন না, পরম্পরাতে যে চিন্তা ভাবনাগুলো বিভিন্ন মুনি-ঋষিদের মধ্যে আলোচিত হয়ে আসছিল, গুরু মুখে সেগুলো শুনে নিলেন, তারপর আরো চার পাঁচ জায়গা থেকে শোনার পর ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মূল তত্ত্বগুলিকে শাস্ত্রাকারে বেঁধে নিতেন। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যা উপলব্ধি করতেন সেটাকেই পরবর্তী কালে তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের শিখিয়ে দিতেন। আর দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন গুরুকুলে যে যে জিনিষকে নিয়ে যে সব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা হয়েছে, সেগুলিকে কোন একজন সাধক সংগ্রহ করে একটা পদ্ধতিতে বেঁধে দিতেন। যেমন বাংলা অনেকেই বলছে, কলকাতা, বর্ধমান, ঢাকা সব জায়গাতেই বলছে। এখন কোন ভাষাবিদ বিভিন্ন কথ্য ভাষাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে, গবেষণার ভিত্তিতে এই কথ্য ভাষাকেই একটা ব্যাকরণের নিয়মে বেঁধে দিলেন, সেখানে থেকে একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেল। পতঞ্জলিও এই ধরনের কাজ করেছিলেন, এখানে তাঁর নিজস্ব কোন মত ক্ষাপণ করেননি।

যোগের ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে কোথায় যেন আমাদের একটু গোলমাল বেঁধে যায়, বেদান্তের সঙ্গেও যোগের ঈশ্বরকে মেলান যায় না আবার পুরাণের সাথেও মিল খায়না; যোগ একটা কথ্যে বলে দেয় – ঈশ্বর তিনি গুরুও গুরু, মানে সবার থেকে তিনি ওপরে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন *ইমং বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবানহমব্যায়ম্। বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুরীক্ষাকুহবেব্রবীত।।* আমিই প্রথমে এই যোগের কথা বিবস্বত মনুকে বলেছিলাম, মনু বিবস্বানকে

বলেছিলেন, বিবস্বান ইক্ষাকুকে বলেছিলেন। যোগের পরম্পরা এভাবেই চলছে। অর্জুন! তুমি যে মনে করছ এরাই প্রথম বলছেন, তা নয়, আমিই প্রথম বলেছি, আমার থেকেই শুরু হয়েছে। যত গুরু দেখছ সবাই তাঁর গুরু, সেই গুরু আবার তাঁর গুরু থেকে পেয়েছেন। কিন্তু প্রথম গুরু হচ্ছে আমার থেকে, তাই আমি সমস্ত গুরুর গুরু। ঈশ্বরের আর কী বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন? তাঁর মধ্যে চৈতন্য বোধ সব থেকে বেশি, জ্ঞান তাঁর অনন্ত, তাঁকে সময়ের দ্বারা বাঁধা যায়না, কিন্তু তারপরে আর কোন ধরণের বক্তব্য নেই। সৃষ্টির ব্যাপারে যোগ পরিষ্কার বলে দেয় সৃষ্টি প্রকৃতির ব্যাপার, ঈশ্বরের এখানে কোন ভূমিকা নেই, তিনি সব কিছু থেকে পৃথক। যোগের মতে আপনিও শ্রীরামকৃষ্ণের মত হতে পারেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অচিন্তনীয় সফলতা, সেই সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তাঁর মধ্যে যে একাগ্রতার শক্তি ও অন্যান্য যে সব গুণাবলী যেমন সত্যনিষ্ঠা, ব্যাকুলতা, দৃঢ়তা ছিল তার কণা মাত্রও আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। এই পার্থক্যের কথা যোগ কখনই বলতে যাবে না, কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে বলবে আপনার আর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু ভাগবতের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। ভাগবত বলবে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন এই যোগের ঈশ্বর আর তিনিই তাঁর মায়া শক্তিকে আশ্রয় করে লোককল্যাণার্থে মানুষ রূপ ধারণ করে অবতরণ করেন। বিদেশীরা বলে ঈশ্বরের এমন কোন ধারণা পৃথিবীতে নেই যেটা হিন্দুরা অনেক আগেই ব্যাখ্যা করে রেখেছে। হিন্দু দর্শনে যে যেভাবে ঈশ্বরকে ভাবতে চান, যে রূপেই ধারণা করতে চান না কেন, সব ভাবই এখানে দেওয়া আছে, শুধু যে আছে তাই নয়, হিন্দুদের সবার মনের মধ্যে সমস্ত ভাবই গ্রথিত হয়ে আছে।

এর ঠিক আগের সূত্রে যেখানে বলা হয়েছে এর আগে আগে যত গুরু ছিলেন ঈশ্বর তাঁদেরও সবার গুরু, সেই ঈশ্বরের বাচক ওঁ। বাচক বলতে এখানে নাম বোঝায় না, বাচক কথার যথার্থ অর্থ হল যাঁকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। ঈশ্বরকে কিভাবে দেখানো যায় বললে তখন ওঁ এই প্রতীকের মাধ্যমে তাঁকে ইঙ্গিত করা হয়। স্বামীজী আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাতত্ত্বের দ্বারা ‘ওঁ’ এর তাৎপর্যকে বুঝিয়েছেন, যেটাকে নিয়ে পরবর্তি কালে রিজেন্স্টাইন বলে একজন আমেরিকান দার্শনিক স্বামীজীর দেওয়া তত্ত্বের উপরে অনেক আলোচনা করেছেন।

অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাতে ভাব আর শব্দ পুরো আলাদা হয়ে যায়। পৃথিবীর সব দেশের লোকেদের মধ্যে হয়তো অনেক ভাবের মিল থাকতে পারে কিন্তু শব্দ আর ভাষাতে গিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যখন ভগবানের কথা আসে, তখন ভগবান বা ঈশ্বর হলেন প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের একটি ভাব, ঈশ্বরকে যার যা ভাব সেই ভাবে নাম নিয়ে ডাকছে। আমরা বলছি গোলাপ ইংরাজীতে বলবে রোজ্, সেক্সপিয়র বলছেন গোলাপকে যে নামেই ডাকো সে গন্ধ দেবে। আমরা ভাব আর শব্দের যে কথা বলছি এটা ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একই হয়। ঈশ্বরের অনেক অনেক শব্দ আছে, গড, আল্লা ইত্যাদি।

যখন বলছি ঈশ্বর তখন এর অর্থ কি দাঁড়ায়? ‘ঈশ্’ শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন। ভগবানের অর্থ ভগ, ভগ মানে ঐশ্বর্য – যাঁর ঐশ্বর্য আছে তিনিই ভগবান, যেমন ধনবান মানে যার ধন আছে, গুণবান মানে, যার গুণ আছে। সংস্কৃতে প্রত্যেকটি শব্দই একটা বিশেষ বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করে। কিন্তু যখনই গড বলছে সেই রকম কোন ভাব এই শব্দের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হচ্ছে না। কিন্তু ঈশ্বর শব্দটা ঈশ্বরের একটা বিশেষ দিককে বোঝাচ্ছে, আবার যখন বলছেন ভগবান তখন ভগবানের অন্য একটা বিশেষ ভাবকে সামনে নিয়ে আসে।

ঋষিরা ওঁ শব্দকে ঈশ্বরের বাচক রূপে নিয়ে এলেন। এটা এই নয় যে একটা শব্দ আছে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই সেই শব্দের সৃষ্টি করে দেবেন। মুনি ঋষিরা যখন সমাধির গভীরে চলে যেতেন, এটা শুধু যে হিন্দু ঋষিরাই উপলব্ধি করেছিলেন তাই নয়, ইসলাম ধর্মের যারা সন্ত মহাপুরুষ তাঁরাও বলেছেন যে গভীর সমাধিতে তাঁরা একটা ধ্বনি শুনতে পান, ঘন্টার যেমন চং বাজার পর শেষের দিকে একটা শব্দের রেশ থেকে যায় যেটা লম্বা একটা ‘ম’এর মত শোনায়, তারপর শব্দটা যেন কোথায় মিলিয়ে যায়, ঋষিরা বা সাধকরা যখন গভীর সমাধি থেকে নেমে আসেন তখন তাঁদের এই ঘন্টার চং শব্দটা দিয়ে তাঁদের প্রথম চেতনাটা ফিরে আসে, চং এর ‘চ’ টা থাকেনা, একটা গভীর লম্বা ‘ম’, গম্ ধ্বনির

রেশটা আস্তে করে মিলিয়ে যেতেই একটা নৈঃশব্দ বিরাজ করতে থাকে। এই শব্দকেই ঋষিরা বলেন স্ফোট। তাঁরা বলেন সৃষ্টি এই শব্দ থেকেই প্রথম বেরিয়ে আসে। তাঁরা যে ওঁ কে ঈশ্বরের প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন, এটাও তার একটা প্রধান কারণ হতে পারে। বলেন ওঁ থেকেই সব সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু যেটা সব থেকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা, যা আমরা উপনিষদেও পাই, আর স্বামীজীও এই যুক্তির উপর বেশি জোর দিয়েছেন – এই বিশ্বরক্ষাও যাবতীয় যা কিছু আছে, যেটাকে আমরা জানতে পারছি, দেখতে পারছি, আবার যেটাকে জানতে পারছি না, দেখতেও পারছি না, সব কিছুর একত্র সমষ্টি হলেন ভগবান। প্রথমে সমস্ত বিষয় + অদৃশ্য, যেটাকে আমরা জানছি না = ঈশ্বর। ঈশ্বর মানে তো তাই, কোন কিছুই তো ঈশ্বর ছাড়া নেই। বিহার ইউপি়র দিকের ভাষার আর ভাবের মধ্যে একটা খুব সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরুন মোটর সাইকেলকে বলবে ফট্ফটিয়া, মোটর সাইকেল ফট্ ফট্ শব্দ করছে সেই ভাবের সাথে মিল রেখে বস্তুর হিন্দী নাম হয়ে গেল ফট্ফটিয়া। বেলুড় মঠের খেয়াঘাটে যে নৌকাগুলো চলে এগুলিকে বলা হয় ভুট্ভুটি। কেন ভুট্ভুটি বলছে? যখন চলে তখন ভুট্ ভুট্ আওয়াজ করে। প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ভাব আছে আর সেই বস্তুটিকে বোঝাবার জন্য তার একটি শব্দ ও ভাষা আছে, ঐ যে ভুট্ভুট্ আওয়াজ আর তার নাম ভুট্ভুটি, এই দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যেকটি বস্তুই একটা ভাবের মূর্ত রূপ, আবার প্রত্যেক ভাবেরই একটা শব্দ আছে। সুতরাং আমাদের তিনটি ধাপ আছে – ক) বিষয়, খ) ভাব এবং গ) শব্দ। ভাব রয়েছে মনে, শব্দ থাকে জিহ্বায় আর ঠোঁটে আর বস্তু বা বিষয় রয়েছে বাইরে। একজন মানুষ – সে হল বিষয় বা বস্তু, আমি বলছি ‘মানুষ’ এটা হল শব্দ, আর এই শব্দের যে ভাব সেটা রয়েছে মস্তিষ্কে। সুতরাং এই পৃথিবীতে যে কোন বস্তুর কথাই বলা হোক না কেন সব কিছুই আমাদের ভেতরের এক একটি ভাবের বহিঃপ্রকাশ। ঐ ভাবকে যখন শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করছি তখন সেটা হয়ে যায় ঐ বস্তুর শব্দরূপ।

ভগবান হলেন সমস্ত বস্তু সমূহের একক সমষ্টি। ভগবানের উপরে সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। ঈশ্বর না হলে আর কিছুই কিছু নয়। আমরা এখন ভগবানের ভাবকে পেয়ে গেলাম। সমস্ত ভাবের জন্ম হয় মনে। কিন্তু মন নিজেই খুব সীমিত। ভগবান আবার সব কিছুর সমষ্টি। মন ক্ষুদ্র আর ভগবান বিরাট। সেইজন্য মন কখনই ভগবানের এই ভাবকে বিষয় রূপে ধরতে পারেনা। এখন প্রত্যেকটি বস্তুর একটা যেমন ভাব আছে আর প্রত্যেকটি ভাবের জন্য একটা শব্দ আছে। কিন্তু প্রত্যেকটি ভাবের জন্য একটা বস্তু নাও থাকতে পারে। একটা উড়ন্ত ঘোড়ার ভাবকে যদি নিয়ে আসা হয়, তখন কিন্তু এই ভাবের কোন বস্তু থাকতে পারে না। যারা কল্পকাহিনী লেখেন তাঁরা তাঁদের লেখা বা ছবির মধ্যে ভাবকে বস্তুতে বাস্তবায়িত করে দেন। কিন্তু এগুলোর আসলে কোন অস্তিত্বই নেই, এটাকেই বলে বিকল্প বৃত্তি। এখানে এসে বোঝা যায় যে ধর্মের তত্ত্বগত ভাব অনেক গভীরের জিনিষ। ছোট ছোট বাচ্চারা দুম্দাম শব্দ তৈরী করে দিচ্ছে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন ভাব বা বস্তুর অস্তিত্বই নেই। এইভাবে যে কেউই একটা ভাবকে মনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে সেটার হয়তো কোন অস্তিত্বই নেই আর এর হয়তো কোন শব্দ নাও থাকতে পারে।

সুতরাং বস্তু যদি থাকে আর তার যদি শব্দরূপ না হয় আর ভাব না থাকে তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। হঠাৎ এমন কোন একটা প্রাণী দেখা গেল এই রকম প্রাণী এর আগে কেউ কোন দিন দেখেনি, এখন সে চিন্তা করতে থাকবে এটা কি হতে পারে। চিন্তা করে করে প্রাণীটা কি বস্তু যদি বার করতে না পারে, তখন তার মধ্যে একটা ভাব আসবে আর সেই ভাব অনুযায়ী এর একটা নাম দেবার চেষ্টা করবে, যাতে করে অপরকে তার এই ভাবকে বোঝাতে পারে যে আমি এই ধরণের একটা প্রাণীকে দেখেছি।

বিষয়, ভাব আর শব্দকে কেন্দ্র করে এক বিশাল দর্শন দাঁড়িয়ে যায়। বিষয় সব সময় বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ব্যাপার, ভাবের ব্যাপারটা চলে যায় দার্শনিকদের কাছে, আর শব্দ কিছু যায় ভাষাবিদ বা ব্যাকরণে আর কিছুটা যায় দার্শনিকদের এক্তিয়ারে। মজার ব্যাপার হল আমরা যে অর্থে বিষয় বা বস্তুকে বুঝি সেভাবে ভগবান কোন বস্তু বা বিষয় নন। ভাব হিসাবে ধারণা করি, কিন্তু ভাব রূপে ধরলে তিনি

আছেন আবার বিষয় রূপে ধরলে তিনি নেই – God is not an object but an idea. ভাব এই অর্থে যে তাঁর বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, ভগবান নিছক কোন কল্পনা নয়, আছেন তথাপি তিনি object নন। এখন আমাদের তাঁকে একটা নাম দিতে হবে। নাম দিতে গেলে আমাদের শব্দের প্রয়োজন। তাই আমরা নাম দিলাম গড্, আল্লা, ভগবান, ঈশ্বর। কিন্তু কোন শব্দটা তাঁর নাম আর ভাবের পক্ষে সব থেকে সঙ্গতিপূর্ণ হবে? এখানে স্বামীজী বললেন আমরা ঈশ্বরকে ওঁ শব্দ দ্বারা অভিহিত করতে পারি। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় এই ওঁ এর ওপর খুব জোর দিলেন। আমরা যখন ‘অ’ বলছি তখন এই ‘অ’ শব্দ কন্ঠ থেকে বেরোচ্ছে, ‘ম’ হল ঠোঁঠে আর ‘উ’ শব্দ গড়িয়ে চলে। এখন যে কোন একটা শব্দ যদি তৈরী করতে চান সে যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন, যে ভাষাগুলো হয়ে মরে গেছে, যে ভাষাগুলো ভবিষ্যতে আসবে, যে ভাষাগুলো এখন আছে, ওঁ কে বাদ দিয়ে বা ওঁ কে অতিক্রম করে কোন শব্দই তৈরী করা যাবে না। আমাদের প্রথমে কোথাও শুরু করতেই হবে, মাঝে কোথাও ঘুরতেই হবে, আর ‘ম’ তে এসে শেষ করতেই হবে, এর বাইরে কিছু করার নেই। যে কোন শব্দকে এভাবেই চলতে হবে। মনে করুন গড্ শব্দটা, গড্ শব্দটা ‘অ’ এর এলাকা থেকে শুরু হচ্ছে, ভেতরে ঢুকছে ‘ড’ কিন্তু শেষে ঠোঁট পর্যন্ত এলোই না। যে কোন শব্দ এই এতটুকুর মধ্যেই ঘুরতে হবে, কন্ঠ থেকে বেরিয়ে ঠোঁট পর্যন্ত। এর বাইরে কোন শব্দই বার করতে পারবেন না। আপনি আঙ্গুলে তুড়ি মারছেন, এটা কোন ভাষা নয় কেবল একটা শব্দ মাত্র। শব্দ তৈরীর জন্য আমাদের যে সাউণ্ড বক্স রয়েছে সেটাকে কাজ করাতে হবে। আর সেটার জন্য কন্ঠ থেকে ঠোঁট পর্যন্তই আপনি আবদ্ধ, এর বাইরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। এখন প্রথম শব্দ হচ্ছে ‘অ’ আর শেষ হচ্ছে ‘ম’। ইংরাজীতে যতই শব্দ আনুন সব A to Z, এই ছাব্বিশটা অক্ষরের বাইরে যেতে পারবেন না। এটাকে আরো যদি কমিয়ে আনেন তাহলে শুধু ইংরাজীই নয় সমস্ত ভাষাতেই প্রত্যেকটি শব্দ এই তিনটে শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ – অ উ ম।

এখন ভগবান হলেন সমস্ত বস্তুর সমষ্টি – God is matrix of all objects. যা কিছু আছে সব ভগবানকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর জগতে যত শব্দ হতে পারে ওঁ কে ভিত্তি করে আছে। তাই আমরা ভগবান আর ওঁ কে সব থেকে নিকট সম্পর্ক যুক্ত দেখতে পাচ্ছি। ভগবান হলেন একটা ভাব, একটা আদর্শ। কিসের ভাবকে বোঝাচ্ছে? ভগবান সব কিছুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের আধার, তাঁর উপরেই সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দিকে ওঁ হল সব শব্দের আধার। বিষয় আর শব্দ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। যত বিষয় হতে পারে তার base হল ভগবান, আর যত শব্দ হতে পারে তার base ওঁ, এখন base and base মিলিয়ে দিলেই ঈশ্বর আর ওঁ এই একই ভাবকে ইঙ্গিত করবে God and Aum is related. তাই বলছেন ‘তস্য বাচকঃ প্রণবঃ’, ভগবানের যে বাচক সেটা হল ওঁ। কেন বাচক ওঁ? এ ছাড়া অন্য কোন কারণ বা যুক্তি নেই। এর চেয়ে আর কোন সুন্দর শব্দ হতে পারেনা। আগামীকাল আরও ভালো শব্দ বার করে আনতে পারেন কিন্তু যত ভালোই শব্দ নিয়ে আসুন ওই শব্দকে যখন এই রকম সূক্ষ্ম ভাবে কাঁটাছেঁড়া শুরু করা হবে তখন দেখা যাবে ওঁ ছাড়া আর কোন শব্দ এত ভালো ঠিক ঠিক যুক্তিযুক্ত ঈশ্বরের বাচক হতে পারবে না। সব থেকে মজার ব্যাপার হল এই ওঁ এর ধারণা বেদে অনেক আগে থাকতেই এসে গেছে। আর উপনিষদ বেদের অনেকে কিছুই ছেড়ে দিল কিন্তু বেদের ওঁ কে ছাড়তে পারল না, ওঁ কে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখল। এরপরে এলো পুরাণ, তারপরে এলো দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, তারপরে যোগ, সাংখ্য কত কি, কিন্তু সবাই ওঁ কেই ধরে রাখল, ওঁ কে কেউই ছাড়তে পারল না।

আধ্যাত্মিক জগতে স্বামীজীর ওঁ এর এই তত্ত্বের আবিষ্কার একটি অসাধারণ আবিষ্কার, তিনি দর্শনের যুক্তি দিয়ে ওঁ কে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন কেন ওঁ কে ঈশ্বরের বাচক বলা হয়। স্বামীজী আরও বললেন – যে কোন হিন্দু সে যে ভগবানকেই মানুক না কেন, ওঁ কে কিন্তু কেউ ছাড়বে না। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের যেগুলো সাধারণ তত্ত্ব, যেগুলো প্রত্যেক হিন্দুই স্বীকার করে, এবং যার দ্বারা একজন হিন্দুকে হিন্দু বলে জানা যায়, ওঁ হল এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি সাধারণ ধারণা যেটার দ্বারা সমস্ত হিন্দুকে এক সূত্রে বাঁধা যায়। সেইজন্য স্বামীজী যখনই সুযোগ পেয়েছেন তিনি ওঁ এর ওপরে কিছু না কিছু আলোকপাত করে গেছেন। যখনই তিনি বেদান্ত এবং হিন্দুধর্মের অন্যান্য

শাখার সাধারণ ভিত্তির কথা বলেছেন তিনি সবার দৃষ্টি প্রথমে ওঁ এর উপরেই আকর্ষণ করেছেন – সব হিন্দুদের কাছেই ওঁ অতি পবিত্র একটি শব্দ ও প্রতীক। স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিল একটা মন্দির থাকবে যেখানে শুধু ওঁ ছাড়া আর কিছু থাকবে না, কেননা আগে এমন পরিস্থিতি ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে যে বৈষ্ণবদের মন্দিরে শাক্তরা যাবে না, শাক্তদের মন্দিরে বৈষ্ণবরা যাবেনা। কিন্তু শুধু ওঁ থাকলে এই ভেদ বুদ্ধি আর আসবে না। স্বামীজী তাঁর ব্যাখ্যাতে যেখানে বেশি জোর দিয়েছেন তা হল তিনি বলছেন, ঈশ্বরের সাথে এক সম্বন্ধ হওয়ার জন্যই শুধু নয়, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হয়েছে ওঁ তার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হয়েছে ও তা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উপনিষদে বিশেষ করে মাণ্ডুক্য উপনিষাদিতে ওঁঙ্কারের স্তুতি করা হয়েছে। এই স্তুতি গুলি করা হয়েছে মানুষের মনকে এইদিকে আকৃষ্ট করার জন্য।

স্বামীজী আরও বলছেন যে ওঁ শব্দে ঈশ্বরের সব রকমের ভাবই রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে তিন বলছেন যখনই আপনি গড় বলছেন তখনই ঈশ্বরীয় ভাব খুব সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এখানে আপনাকে বিশেষণ যোগ করতে হবে – Personal God (সগুণ) না Impersonal God (নির্গুণ), পূর্ণ বা পরম, কিন্তু ওঁঙ্কারে এই সমস্যা নেই। আপনি যে ঈশ্বরকেই মানুন না কেন, আল্লা, গড্‌ যাই মানুন সর্বত্র এই ওঁ শব্দ ও প্রতীককে ব্যবহার করা যেতে পারে। আরও যেটা মজার ব্যাপার তা হল সমাধিতে যে গম্‌ শব্দ শোনা যায় সেই শব্দও এই ওঁঙ্কারের মধ্যেই বিদ্যমান।

‘ওঁ’ জপ ও তার অর্থচিন্তনের গুরুত্ব

এখন যিনি আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছেন, যোগসাধনে তিনি কিভাবে এগোতে পারেন? তখন পতঞ্জলি বলছেন – **তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥২৮॥** - তজ্জপঃ – ওঁ এই শব্দ কেউ যদি জপ করে আর **তদর্থভাবনম্** - সাথে সাথে ওঁএর যে অর্থ এতক্ষণ ব্যাখ্যা করা হল সেই অর্থকেও সে যদি চিন্তন করতে থাকে তখনই এই ওঁ তাঁর নিজের কাজ করতে শুরু করবে। ধ্যান মানে অর্থ ভাবনা। এখানে রূপ চিন্তন কিছু নেই, কারণ যোগের ঈশ্বরের কোন রূপ নেই, তাই যোগ বলে দিচ্ছে ওঁ এর অর্থ চিন্তন করবে আর ওঁ জপ করে যাবে। যদি শুধু ওঁ ওঁ জপ করলে কিছুই হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিন্তন করা বা তাঁর লীলার চিন্তন করার কথা যে কারণে বলা হয়, এখানেও ঠিক একই জিনিষ প্রযোজ্য। কারণ একটা জিনিষকে যখন খুব গভীর ভাবে চিন্তা করছি তার মানে সেই জিনিষকে আমি পেতে চাইছি, তাঁর সঙ্গে এক হতে চাইছি। অর্থ ভাবনা কি রকম – ওঁ হল ঈশ্বর, ওঁ হল শ্রীকৃষ্ণ, ওঁ হল শ্রীরামকৃষ্ণ, ওঁ ভগবান, ওঁ সেই সচ্চিদানন্দকেই ইঙ্গিত করছে। এই ভাবে যখন অর্থ ভাবনা করে জপ করা হবে তখন এই ওঁঙ্কার তাঁর নিজের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করতে আরম্ভ করবে। মনের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি বা তরঙ্গ উঠছে আর মন সেই বৃত্তির রূপ বা আকার নিয়ে নিচ্ছে, এই রূপ নেওয়াটা আটকানোই যোগের মূল লক্ষ্য। যখন শুধু জপ করা হয় তখন বৃত্তি নিরোধ হয় না, কিন্তু যখন ওঁ এর যে অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে সেই অর্থকে যখন চিন্তা করে জপ করা হয় তখন অন্যান্য যে বৃত্তিগুলি মনের মধ্যে চলতে থাকে সেগুলি নিরোধ হয়ে যায়। যারা ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছেন, তাঁরা যদি ইষ্টমন্ত্র এই একই পদ্ধতিতে অর্থ ভাবনা সহ জপ করেন তাতেও একই ফল হবে, সমস্ত ইষ্টমন্ত্রই ওঁ দিয়েই শুরু করা হয়। আর যাঁরা ইষ্টমন্ত্র এখনও পাননি তাঁরা যদি শুধু এই ওঁঙ্কার জপ করেন তাতেও হবে, তবে অর্থ ভাবনা অর্থাৎ সাথে সাথে ঈশ্বরের চিন্তন করে যেতে হবে।

আমাদের সবারই মন অবাস্তিত অনেক ধরণের সংস্কারের দ্বারা বোঝাই হয়ে আছে। যত বড় ঋষিই হোন আর দাগী আসামীই হোক, সবারই মধ্যে ভালো মন্দের সংস্কার সব রূপেই মিশে রয়েছে। যখনই চিন্তের বৃত্তিকে নিরোধ করতে চাইবে, তখনই সংস্কারগুলো তাকে পায়ে শেকল বেঁধে পেছনের দিকে টেনে ধরবে। মানুষ যখনই নিষ্ঠার সাথে একটু সাধন-ভজন শুরু করতে যায় তখন বাইরের যত রকমের জাগতিক ঝঞ্জটগুলি সব তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসে। যদি দেখেন সাধকের জীবনে কোন বাধা আসছে না, সবাই খুব খাতির যত্ন করছে, কোন কিছুরই অভাব নেই, সব মসৃণ ভাবে চলে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে সাধনার কোথাও কোন গোলমাল আছে বা আদপে কোন সাধনাই করছে না। যখন

থেকে আমরা যোগদর্শনের উপর আলোচনা করে যাচ্ছি তখন থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, বাইরে আমাদের কিছুই নেই, বাইরে রয়েছে উত্তেজনা মাত্র। বাকি যা কিছু হচ্ছে সব আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে হয়ে চলেছে। কাউকে ভালোবাসছি মানে আমি তার মত হতে চাইছি।

ভগবান বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ ভিক্ষা করতে বেরিয়ে খুব জলতেষ্টা পাওয়াতে তিনি একটা কুয়োর কাছে জল খেতে এসেছেন। সেখানে নীচু বর্ণের একটি যুবতী মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছিল। মেয়েটি আনন্দকে জল খাওয়ালো। আনন্দ খুব সুন্দর করে মেয়েটিকে একটি ধন্যবাদ জানাল। মেয়েটি জীবনে এত ভালো ব্যবহার কারুর কাছ থেকে পায়নি। আর আনন্দ ছিল একজন আকর্ষণীয় তেজোদীপ্ত যুবক সন্ন্যাসী। মেয়েটি আনন্দের প্রতি এমন আকর্ষিত হয়ে গেল যে, ওখানেই ঘটি বাটি ছেড়ে আনন্দের পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করেছে। আনন্দ একটু বিরক্তি প্রকাশ করাতে মেয়েটি বলল আপনাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারবো না, আমি আপনার কাছেই থাকবো। আনন্দ খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। মেয়েটিকে নিয়ে আনন্দ ভগবান বুদ্ধের কাছে গেছেন। ভগবান বুদ্ধ মেয়েটিকে প্রশ্ন করছেন ‘আনন্দের কোন জিনিষটা তোমার ভালো লেগেছে?’ মেয়েটি উত্তরে বলল ‘আনন্দের এই যে ব্যবহার, এটাই আমার ভালো লেগেছে’। ভগবান বুদ্ধ বলছেন ‘আনন্দের ওই ব্যবহার যদি আনন্দের মধ্যে থাকে তাতে তোমার কী এসে গেল? তার ব্যবহারে তুমি যে আনন্দ পাচ্ছ, ওর ব্যবহার, ওর চিন্তা ভাবনাকেই তো তুমি ভালোবেসেছ তাহলে তুমিও ঐ রকম হয়ে যাও, তাহলেই তো সব হয়ে গেল’। মেয়েটি তখন জানতে চাইল ‘কী ভাবে হওয়া যাবে?’ ‘তুমি ভিক্ষুণী হয়ে যাও’। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুণী হয়ে গেল।

আমরা যাকে ঠিক ঠিক ভালোবাসি বা যাকে অত্যন্ত সম্মান করি, যাঁর বিরুদ্ধে কেউ সামন্য একটা কথা বললে আমি ফোঁস করে উঠি। তার মানে কী? আমি কি তাঁর চাকর, নাকি পোষা কুকুর? এখানে যে ভালোবাসা বা সম্মানের কথা বলা হচ্ছে, এই ভালোবাসা বা সম্মান হল, তাঁর গুণ, তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবকেই আমি ভালোবাসছি, তাঁর ভেতরের ভাবকে আমি সম্মান করছি। ভাবকে সম্মান করা মানে আমার মধ্যে ওই ভাবের অভাব আছে এবং আমিও হতে চাইছি কিন্তু পারছি না, আমি চাইছি আমার মধ্যেও যেন ওই ভাব আসে। আকর্ষণ কার প্রতি হয়? তাঁর প্রতিই আকর্ষণ হবে তিনি যে ভাবের মূর্ত রূপ, আর সেই ভাবের প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে। শ্রদ্ধা মানে, ঐ ভাব আমি নিজের মধ্যে আনতে চাইছি। আমার ভেতরে যেটা অপূর্ণ তাঁর ভেতরে সেটা পূর্ণ। আমি যখন ঠাকুরকে ভালোবাসছি, ঠাকুরের সামনে গিয়ে যখন মাথা নত করছি, তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবের মূর্ত রূপ, আমি চাইছি সেই ভাব আমার ভেতরেও আসুক। সেইজন্য বলে ভালোবাসা অনেক রকমের হয়, কোন ভালোবাসায় করুণার ভাব থাকে, কখন মায়ার ভাব থাকে, এই ভালোবাসায় আমরা কখনই তার মত হয়ে যেতে চাইছি না। বাবা-মা যখন নিজের সন্তানকে ভালোবাসে তারা কি তখন সন্তানের মত হয়ে যেতে চাইছে? কখনই নয়। কেন? কারণ বাবা-মা সন্তানের প্রতি মায়াতে আবদ্ধ। গীতাতে একটা কথা অনেকবার আসে *মচ্ছিত্ত মৎপরঃ*, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ মনে করবে আর আমাতেই তোমার চিত্ত যেন সব সময় থাকে। আমরা একজনকে শ্রেষ্ঠ মনে করছি কিন্তু চিত্ত অন্য একজনের কাছে পড়ে থাকে। আচার্য শঙ্কর ভগবানের এই কথার ভাষ্য দিতে গিয়ে বলছেন, একটি যুবক এক যুবতীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতে পারে আর তার মন সব সময় সেই যুবতীর মধ্যে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই যুবকও জানে শিব কিংবা বিষ্ণু এই যুবতীর থেকে অনেক উপরে। স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামী ভালোবাসতে পারে, আমরা একজন মানুষকেও ভালোবাসতে পারি, কিন্তু এই ভালোবাসা মায়া থেকে আসছে, তাই এরা *মৎপরঃ* কখনই হতে পারে না। আমরা যেমন জানি শ্রীরামকৃষ্ণই *পরঃ*, *পরঃ* মানে শ্রেষ্ঠতম।

আমি কোন মহারাজকে খুব সম্মান করি। তার মানে আমার ভেতরে একটা কাঁচা ভাব আছে, এই কাঁচা ভাবটা ঠিক পূর্ণ রূপ নিতে পারছে না। কিন্তু এই মহারাজের মধ্যে দেখছি আমার কাঁচা ভাবটা পূর্ণ রূপে বিদ্যমান। তখন আমি চাইবো আমিও যেন ওই রকম হই। কিন্তু যখন আমরা মায়াতে আবদ্ধ, এই লোকটি আমাকে অনেক সাহায্য করে দিচ্ছে, ইনি আমাকে এই সুযোগ করে দিচ্ছেন, তখন তাকে যে সম্মান করছি, এটা কিন্তু আমার মনের ভাব নয়, এই ভাবটা আসলে মনের একটা খেলা মাত্র।

আগামীকাল কোন সাহায্য না পেলে বা সুযোগ না দিলে তাকে মনে মনে লাখি মেরে বেরিয়ে যাব। জগতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়। যখন আমাদের স্বার্থ পূর্ণ হয় না তখন আমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাই। কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি, যেটা আমার ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাঁকে আমি কখনই ছাড়তে পারবো না। কারণ উনিই আমার অপূর্ণতারই পূর্ণ রূপ। সত্যিকারের ভালোবাসা মানে তাই। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করা মানে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তো মহাসমাধি হয়ে গেছে, তাঁকে ভালোবেসে আমার কী লাভ? তখন আমাদের বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দর্শন দেবেন। কিসের দর্শন দেবেন? তাঁকে তো ছবিতে মূর্তিতে সব সময় আসতে যেতে, উঠতে বসতে দর্শন হচ্ছে, তাতে আমাদের হলটা কী? কিছুই তো আমাদের হয় না। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করা, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসা মানে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবের মূর্ত রূপ আমি সেই ভাবকে আমার নিজের মধ্যে আনতে চাইছি। কিন্তু ওই ভাবকে ভেতরে আনার আগে আমাদের জানতে হবে, ধারণা করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের কী ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের কী ভাব না জেনেই যদি ঘন্টার পর ঘন্টা চোখ বন্ধ করে হাজার হাজার জপ করে যাই তাতে আমাদের কোন কিছুই হবে না। ওই ভাবটা আগে আনতে হবে, ভাব আনা মানে তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

মন্ত্রের অর্থকে যখন ভাবা হয়, সেই অর্থের উপর যখন ধ্যান করা হয় তখনই ভেতরে ভাব আসবে। সারা দিন ওঁ জপ করে যেতে পারি, ক্যাসেট চালিয়ে সারা দিন ওঁ শুনে যেতে পারি, সারা জীবনেও এতে কিছু হবে না। জলে পাথর পড়ে থাকার মত হবে, যুগ যুগ ধরে জলের মধ্যে পাথর পড়ে আছে কিন্তু পাথরে এক ফোঁটা জলও ঢোকে না। অর্থ ভাবনা যতক্ষণ না করা হয়, মন্ত্র কী বলতে চাইছে যতক্ষণ না ধারণা হবে আর যতক্ষণ আমার ব্যক্তিত্বের সাথে এক না হয় ততক্ষণ ওই জপে কোন লাভ হয় না। কিন্তু জপ যদি না করা হয় তাহলে ভাব পাকা হবে না। যখন প্রত্যেক দিন প্রচুর জপ অনেক দিন ধরে করা হয় তখন দেখা যায় জপ না করলেও ভেতরে নিজের থেকেই জপ হতে থাকে। নিজের থেকে যে জপ হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমি নিজে সচেতন ভাবে করছি না ঠিকই কিন্তু মন নিজেই মন্ত্রের ভাবের মধ্যে ডুবে যায়। তবে এই অবস্থায় আসার আগে বেশ কয়েক বছর ধরে দিনে কম করে অন্তত কুড়ি পঁচিশ হাজার করে জপ করতে হবে। জপ তিনটে স্তরে চলে – প্রথমে জপ সচেতন ভাবে করছে, দ্বিতীয় স্তরে জপ নিজে থেকেই হতে থাকে। নিজে থেকেই যখন জপ হয় তখন তার অর্থ চিন্তনও নিজে থেকেই হয়। জপে সব থেকে বড় যে জিনিষটা হয় তা হল, যেমন আমি ওঁ জপ করে যাচ্ছি, ওঁ জপ করতে করতে যে স্পন্দন তৈরী হয় এই স্পন্দন আমার ভেতরে আজীবনে যত স্পন্দন আছে সেগুলোকে চাপা দিয়ে দেয়। ঘরের দেওয়ালে আগে থেকেই একটা রঙ আছে, এর ওপর অন্য রঙ চাপিয়ে দিলে আগের রঙটা চাপা পড়ে যাবে, তার ওপর আরও রঙ করলে আগের রঙটা আরও চাপা পড়ে গেল। আমরা সারা জীবন, শুধু এই জীবন নয়, জন্ম জন্ম ধরে সংসার সংসার চিন্তা করে আমার আসল যে সত্তা সেই পুরুষের সত্তা চাপা পড়ে গেছে। এবার আমি অন্য রকম চিন্তা করতে শুরু করলাম। প্রথমে জল ঢালতে শুরু করলাম আগের রঙকে পরিষ্কার করার জন্য। জপ আর তার অর্থ চিন্তন মানে দেওয়ালে জল ঢেলে ঢেলে জন্ম জন্ম ধরে হাজার হাজার সংস্কারের নীচে চাপা পড়ে থাকা পুরুষের সত্তাকে বার করে নিয়ে আসা।

আমরা যা কিছু করছি, ভালো মন্দ যাই করি না কেন, তার একটা ছাপ সংস্কার রূপে ভেতরে থেকে যাবে। যেমনি বাইরে থেকে শোনার মাধ্যমে বা দেখার মাধ্যমে ওই সংস্কারের অনুকূল কিছু জিনিষ ভেতরে চলে আসবে তেমনি ভেতরে চাপা পড়ে থাকা ওই সংস্কারটা বুম্ করে বেরিয়ে আসবে। এবার আমি জপ করতে শুরু করলাম, দিনের পর দিন জপ করে যাচ্ছে, এরপর একদিন আমার ভেতরে যে আধ্যাত্মিক ভাবটা চাপা পড়ে আছে সেই ভাব জাগতে শুরু করবে। নিজে থেকে এই ভাব জাগবে না, সেইজন্য সাধুসঙ্গ করতে বলা হয়। যখন গায়ের জোরে প্রচুর জপ করে যাচ্ছি আসলে তখন আমার মনকে অনবরত ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছি। একটা খুব নামকরা বই আছে যার নাম ‘Beyond Pilgrim’, রাশিয়ার কোন এক চার্চের সাধক এই বইটি লিখেছেন। পুরো বইটা প্রার্থনার উপর লেখা। সেখানে দেখাচ্ছেন একজন সাধকের খুব ইচ্ছা হল জানার, আমাদের সব সময় প্রার্থনা করতে বলা হয়, কিন্তু

এই প্রার্থনা কীভাবে করতে হবে? আমাদের ভাষায় বলা যেতে পারে, জপ করা এবং জপ কীভাবে করবে। সেই সাধক অনেক ফাদারের কাছে ঘুরে ঘুরে জানার চেষ্টা করছেন কিন্তু মনের মত কোথাও আচার্য পেলেন না যাঁর কাছে কিছু শিখতে পারেন। তারপর একজন ফাদারকে পেলেন, তিনি তাঁকে বোঝালেন আধ্যাত্মিক যাত্রা কীভাবে হয়। তবে এর সব কিছু আমাদের গ্রহণ করা ঠিক নয়, কারণ আমাদের ভাব ও সাধনার পথ পুরোটাই আলাদা।

ওঁএর অর্থ চিন্তন আর সাথে সাথে ওঁএর জপ এই দুটোকে একসঙ্গে করলে তবেই গিয়ে ভাব জাগ্রত হবে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – *অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখা দেয়।* লাটু মহারাজের জীবনে এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। লাটু মহারাজ বিহারের ছাপড়া জেলার এক অজ গ্রাম থেকে এসে কলকাতা শহরে রামবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন। রামবাবু লাটু মহারাজকে মাঝে মাঝে কাজে-টাজে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠাতেন। আসার পথে রাস্তায় মদের দোকান পড়ত। উনি হয়তো ছোটবেলা বিহারে অনেককে তাড়ি খেতে দেখেছেন, তাড়ির গন্ধটাও তাঁর খুব পরিচিত ছিল। পরে উনি শুনেছেন মদ, তাড়ি এসবের থেকে দূরে থাকতে হয়। মদের গন্ধে মন যাতে চঞ্চল না হয় সেইজন্য লাটু মহারাজ রাস্তা পাল্টে অনেক বেশী পথ ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন। এই ইচ্ছাশক্তি অর্জন করা খুব কঠিন। আসলে আমরা সবাই খুব দুর্বল চিন্তের, যদিও আমরা নিজেদের দুর্বলতা মানতে চাই না।

খুব নামকরা একজন সন্ন্যাসী গৃহস্থ জীবনে তিনি বড় জমিদার বাড়ির ছেলে ছিলেন। তাঁর খুব সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। ছেলে সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছে শুনে তাঁর বাবা একটা বাড়িতে বন্ধ করে রেখেছেন। যে মেয়েটির সাথে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেও খুব বড় সম্ভ্রান্ত জমিদার বাড়ির মেয়ে। এখন সেই মেয়েটিকেও ওই একই বাড়িতে ছেলেটির সাথে রেখে দিয়ে বলে দেওয়া হল তোমাকে এখন থেকে এই মেয়েটির সাথে থাকতে হবে আর এর সাথেই তোমার বিয়ে হবে। কিছু দিন যেতেই মেয়েটি ছেলেটির হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছে যে এ সত্যিই মনে প্রাণে সন্ন্যাসী হতে চাইছে। কিন্তু দুজনকে একসাথে ওই বাড়িতে রাখা হয়েছে আর বলে দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ ছেলেটি বিয়ে করতে রাজী না হয় ততক্ষণ ছেলেটিকে বাড়ির বাইরে কোথাও ছাড়া হবে না। মেয়েটির কাজই হল ছেলেটিকে বিয়ে করাতে রাজী করান। শেষে একদিন মেয়েটি জিজ্ঞেস করল ‘আপনার কি সত্যিই সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে’? ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে দিয়েছে। মেয়েটি তখন বলল ‘ঠিক আছে আমি আপনাকে সাহায্য করব, আর আমি যেমনটি বলব আপনি তেমনটি করে যাবেন। আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি আপনি বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেছেন’। মেয়েটি সবাইকে বলে দিল ও বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেছে। শুনে সবারই খুব আনন্দ। এবার সবাই নিশ্চিত। মেয়েটি কিছু দিন পর বলল ‘আমরা দুজন বাগবাজারে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাব’। জমিদার পরিবারের মেয়ে, তার সঙ্গে দেহরক্ষী, পাহারাদাররা আছে। গঙ্গার পারে গিয়ে মেয়েটি সব পাহারাদারদের সরিয়ে দিয়েছে ‘আমরা দুজন এখন গঙ্গার পারে নিরিবিলা গল্প করবো তোমরা আমাদের কাছে থাকবে না’। সবাই আড়ালে চলে যেতেই মেয়েটি বলছে ‘এই সুযোগ, এক্ষুণি আপনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ওপারে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে পালান। এক্ষুণি যদি না পালাতে পারেন এরপর কিন্তু আপনি আর সুযোগ পাবেন না’। ছেলেটিও গঙ্গার জলের কাছে নেমে জলস্পর্শ করছে দেখিয়ে ওখানেই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড় মঠে চলে গেলেন। সেখান থেকে পরে তাকে আবার কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি খুব নামকরা একজন সাধু হয়েছিলেন। ঐ মহিলাও জীবনে আর বিয়ে করলেন না। এর দশ এগারো বছর পর ওই মহারাজ একবার গঙ্গা থেকে স্নান করে উঠে আসছেন আর সেই সময় ওই মহিলাও গঙ্গা স্নান করতে নামছিলেন। মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে যেই দেখেছেন সামনে সেই মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে হাতে যা ফুলটুল ছিল সব ফেলে ওখান থেকে দৌড়ে সোজা হাঁফাতে হাঁফাতে আশ্রমে পৌঁছেছেন।

পরবর্তিকালে এই কাহিনী শোনার পর অন্য একজন খুব নামকরা সন্ন্যাসী অন্য মহারাজদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, তিনি পালিয়ে এলেন কেন? আসলে যিনি প্রশ্ন করছেন তাঁকে কখন এই

ধরণের কোন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়নি বা তাঁর মনে নারীর ব্যাপারে কোন রকম দুর্বলতা ছিল না। কিন্তু যিনি পালিয়েছিলেন তিনি ভালো মত জানতেন যে তাঁর দুর্বলতা ছিল। শুধু দুর্বলতাই যে ছিল না তাই নয়, ওই মেয়েটি জীবনে তাঁর এত মঙ্গল করেছিল যে কোথাও তাঁর মনে মেয়েটির প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব, আর কৃতজ্ঞতার ভাব থেকে মেয়েটির প্রতি করুণার ভাব থেকে গিয়েছিল। এখন যখন তিনি মহিলাটির মুখোমুখি হয়েছেন তখন পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তাঁর মনে মেয়েটির প্রভাব চাড়া মেরেছে। এখন বাঁচার কী পথ? দৌড়ে পালাও। যাঁরা সাধক, যিনি বুঝে গেছেন এই এই জায়গায় আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারবো না আর যতক্ষণ আমার ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ এই এই ক্ষেত্র আমার পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক, চোখ-কান বুজে সেখান থেকে সরে আসা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সেইজন্য জপ ও জপের অর্থ চিন্তনই একমাত্র উপায় যেটা বাকি সব কিছুকে কেটে ফেলে।

দশকুমার চরিত্রে মারীচি নামে এক সাধুকে নিয়ে এই ধরণের এক কাহিনী আছে, আর আমাদের পরম্পরাতে মনের দুর্বলতার শিকার হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রচুর কাহিনী পাওয়া যাবে। যেমন বিশ্বামিত্র ঋষি এত তপস্যা করলেন কিন্তু মেনকাকে দেখেই সব তপস্যা নষ্ট হয়ে গেল। কারণ এতদিনের রাজা, রাজার এতদিনের ভোগ বাসনা সব মেনকাকে দেখে বন্যার জলের মত বেরিয়ে এসেছে। সেইজন্য বলা হয় একবার যখন জেনে গেলে এই জায়গাটা তোমার দুর্বলতার জায়গা, ওখান থেকে আগে পালাও। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। আমাদের মনে ভোগের ভাব গিজগিজ করছে। যেমনি কোন ভোগ্য বিষয়ের সামনে পড়েছ, ওই বিষয় আমাদের টানবেই, কিছু করার নেই। আমাদের ভেতর এত ভোগ বাসনা, এত কাম বাসনা রয়েছে যে একটু যদি টোপ কেউ ফেলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে গিলে নিয়ে বড়শিতে ফেঁসে যাবে। আপনি সত্যিই যদি যোগী হতে চান প্রথম কাজই হল যাদের মনে সাংসারিক ভাব রয়েছে তাদের চিন্তাভাবনা থেকে, তাদের সঙ্গ থেকে সব সময় দূরে দূরে থাকতে হবে, ভালো হয় যদি এদের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করে দেওয়া যায়। আর যদি সংসারে থাকতে হয়, সমাজে মেলামেশা করতে হয় তখন এদের সঙ্গে কথা কম বলুন আর এদের সব কথাতে সায় দিয়ে যেতে হবে, কোন তর্কাতর্কিতে যাওয়া চলবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রচুর জপ আর তার অর্থ চিন্তন করে যেতে হবে। যতক্ষণ অর্থ চিন্তন না করা হবে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক ভাব ভেতরে ঢুকে সাংসারিক ভাবকে কেটে উড়িয়ে দিতে পারবে না। জপের অর্থ চিন্তন আর ধ্যান একই ব্যাপার। এর সাথে সাথে সাধুসঙ্গ অবশ্যই করে যেতে হবে। ঠাকুর সাধুসঙ্গের উপর খুব জোর দিচ্ছেন। শুধু যে ঠাকুরই জোর দিচ্ছেন তা নয়, সব সাধু, সব শাস্ত্রই সাধুসঙ্গ করতে বলছেন। জপ, জপের অর্থ চিন্তন আর সাধুসঙ্গ এই তিনটে একসাথে করতে থাকলে তবেই মনে শুভ সংস্কার তৈরী হতে শুরু করবে।

আমাদের মনের মধ্যে যত রকমের সংস্কার আছে – ভালো-মন্দের সংস্কার, পাপ-পুণ্যের সংস্কার, সমস্ত সংস্কারকে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষে পুড়িয়ে ফেলা না হচ্ছে ততক্ষণ সাধক জীবনে এগোনই যাবে না। এখন প্রশ্ন হল কিভাবে এগুলোর নাশ করা যাবে। পদার্থ বিজ্ঞান বলছে যখন কোন তরঙ্গকে বাতিল করতে হয় তখন ঐ তরঙ্গ যে মাত্রায় আছে সেই একই মাত্রাতে বিপরীত তরঙ্গ পাঠিয়ে প্রচণ্ড কম্পন তৈরী করে ঐ তরঙ্গটাকে ফাটিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের মনে যত রকমের সংস্কার সমূহ আছে সবই এই ধরণের কম্পন ক্রিয়া সম্পন্ন তরঙ্গ। আমাদের বাইরে যে বিশাল জগৎ রয়েছে, আমরা যে চিন্তা করছি সেই চিন্তার তরঙ্গ এই জগৎএর মধ্যেও কম্পন তৈরী করে চলেছে। যদি বাজে দিকে এই তরঙ্গের কম্পন চলে যায় তখন একেবারে কোথায় নিয়ে যে ফেলবে টের পাওয়া যাবে না। যেমন তালিবানদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা সবাই একই মাত্রার তরঙ্গ ছাড়তে থাকে আর তাতে নিজেও মরে তার সাথে অপর কয়েকজনকে নিয়ে মেরে সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এর বিপরীত চিন্তার তরঙ্গ তৈরী করা। যদি হিংসা বৃত্তি বেশি থাকে তাহলে অহিংসা বৃত্তি আনতে হবে। যার মধ্যে যদি নোংরা বৃত্তি থাকে তখন তার দরকার ভালো ও সৎলোকের সঙ্গ করা। যাদের সংসঙ্গ হবে না তাদের মধ্যে ঐ নোংরা বৃত্তিগুলো থেকে যাবে। আর এই নোংরা বৃত্তি নিয়ে যদি বাজে লোকের সাথে ঘুরে বেড়ায় তাহলে তখন দুটো একই মাত্রাতে মিশে বুম্ করে সব ফেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ভালো লোকের সঙ্গ করলে ঐ বৃত্তিগুলিই নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলছেন

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা। সাধুসঙ্গ করলে সংস্কারগুলো আস্তে আস্তে পালাটাতে শুরু করে। ভালো সংস্কার সবার মধ্যেই আছে আবার খারাপটাও আছে, এইবার যেই সাধুসঙ্গ হতে শুরু হল তখন বাজে সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে নাশ হতে আরম্ভ করে। সাধক জীবনে আসল কাজ হল সাধুসঙ্গ। ঠাকুর যে বারবার সাধুসঙ্গের কথা বলে গেছেন তার প্রধান কারণ এটাই।

এখন চাকরি সূত্রে এমন এক জায়গায় থাকতে হচ্ছে যেখানে সৎসঙ্গ করা সম্ভব হচ্ছে না, অথবা মনে করুন রাষ্ট্রা ঘাটে বাসে ট্রেনে করে যাচ্ছি তখন ভালো সঙ্গ কোথায় পাব, উল্টে যে সব সঙ্গ আমাদের কপালে জুটে যেতে পারে তাতে আমরা হয়তো বিপদেও পড়ে যেতে পারি। এর থেকে বাঁচতে হলে তখন খুব জপ করা শুরু করে দিতে হয়। *তজ্জপস্তুদর্থাভাবনম্* - অর্থ ভাবনা সহ জপেই আমাদের সৎসঙ্গ হয়ে যাবে। যতক্ষণ জপ করব ততক্ষণ আমাদের সৎসঙ্গ হতে থাকবে আর নোংরা বৃত্তিগুলি সামনে আসতে পারবে না। এখানে জপের ব্যাপারে পতঞ্জলি মন্ত্রের কথা বলছেন না, ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টচিন্তার প্রথা অনেক পরের দিকে এসেছে, পতঞ্জলির সময়ে এই প্রথা তখনও আসেনি। এখানে পতঞ্জলি কেবল ওঁঙ্কারের কথাই বলছেন। অবশ্য ওঁ যে কোন মন্ত্রের মতই একটি মন্ত্র। যাদের এখনও দীক্ষা হয়নি তারা যদি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ধীরে ধীরে ওঁ উচ্চারণ করে, নিশ্বাস নিচ্ছে গভীর ওঁ, নিশ্বাস ছাড়ছে আবার গভীর ওঁ উচ্চারণ করে, তাতেও মন্ত্রের ফল লাভ হবে। এইভাবে ওঁ জপের মাধ্যমে আমাদের সৎসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে বিভিন্ন শব্দের সংমিশ্রণে ওঁ তৈরী হচ্ছে না, ওঁ নিজেই স্বয়ং স্বতন্ত্র শব্দ। খেয়াল রাখতে হবে ‘ওং’ উচ্চারণ যেন কখনই না হয়, কারণ এই ‘ওং’ এ দুটো শব্দের সংমিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে – ‘ও’ এবং অনুস্বর ‘গ’ মিলে ‘ওং’ হচ্ছে। কিন্তু ওঁ একটা পুরো স্বতন্ত্র ধ্বনি এবং ওঁ শুধু যে ধ্বনিই নয় এটি একটি স্বতন্ত্র অক্ষরও বটে। নতুন একটা সফট্‌য়ার বেরিয়েছে যেখানে ওঁ এর জন্য একটা key কে আলাদা ছেড়ে রাখা হয়েছে, ওঁ এর তাৎপর্যটা এরা ঠিক বুঝেছে যে ওঁ একটা স্বতন্ত্র অক্ষর ও প্রতীক, যেমন ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে অনেক ধরণের প্রতীক ব্যবহার করা হয়, ওঁ হল ঠিক সেই রকম একটি প্রতীক।

আমরা দেখলাম যোগ বলছে তুমি এভাবে ওঁঙ্কার জপ করলে তোমার ভেতরে যে সংস্কারগুলো আছে সেগুলো আর ওপরে আসতে পারবে না। উনুনের উপর ভাতের হাড়ির জল যেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে, তেমনি আমাদের মধ্যে নানা রকমের বিচার, চিন্তা ভাবনা সব সময় টগবগ করছে। ওঁঙ্কারের জপ করে কি হয়, মনের ভেতর এই টগবগানিটা বন্ধ হতে শুরু করে। কিন্তু পতঞ্জলি এর থেকে আরো অনেক এগিয়ে বলছেন – *ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়্যভাবশ্চ।।২৯।।* এর অর্থ হল, যদি এইভাবে প্রচুর জপ ও জপের অর্থ চিন্তন করা হয় তাহলে তখন দুটো জিনিষ হবে। *ততঃ প্রত্যক্চেতন*, আমরা এখন পরাগ্ চেতন হয়ে আছে, পরাগ্ মানে বাইরে, আমাদের চেতনা সব সময় বাইরের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মমতা কি করলেন, বুদ্ধবাবু কি করলেন, মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী কি বললেন, তেলের দাম কেন বাড়ল, কে ঠিক, কে ভুল করল সারাদিন আমরা এই নিয়েই আছে, পরনিন্দা আর পরচর্চাকেই প্রধান উপজীব্য করে আমাদের চেতনা সব সময় পরাগ্ চেতন হয়ে আছে। কিন্তু জপ করতে করতে আর তার সাথে জপের অর্থ চিন্তন করতে করতে *ততঃ প্রত্যক্চেতন*, মনটা ভেতরের দিকে প্রবেশ করে যায়, তখন আর কারুর সাথে বেশী কথা বলতে ভালো লাগবে না, আজবাজে লেখা পড়তে ভালো লাগবে না, এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে ভালো লাগবে না। তার সঙ্গে দ্বিতীয় কি হয়? *অপি অন্তরায়্যভাবশ্চ*, যখন মানুষ যোগ সাধনার পথে যাত্রা শুরু করে তখন তার অনেক রকমের বিঘ্ন আসে, সমস্যা আসে, এই বিঘ্ন ও সমস্যাগুলো ওঁ জপ করলে কেটে যায়। ওঁ জপ আর এর অর্থের ধ্যান যোগ সাধনার সমস্ত বিঘ্ন বা বন্ধন গুলোকে প্রতিহত করে। যাদেরই প্রচুর সাংসারিক ঝামেলা, নানা রকম বিঘ্ন হতেই থাকে তারা যদি এই দুটো – প্রচুর জপ আর জপের অর্থ ভাবনা করতে থাকে তাহলে এই দুটো বিঘ্ন ও সমস্যা কমে যাবে। প্রত্যক্ চেতনে মন আস্তে আস্তে

ভেতরের দিকে ঢুকে গেল, এরপর বাইরের জগতের ব্যাপারে আগ্রহ কমে যায়, এর সাথে জীবনের অনেক সমস্যা ও বিঘ্নও কমে যায়।

যোগ সাধনার বিঘ্ন সমূহ

আমাদের জীবনের বিঘ্ন বা সমস্যার শেষ নেই। বিঘ্নের কথা বলতে গিয়ে পতঞ্জলি যে সূত্রটা দিচ্ছেন এটি আমাদের সকলের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটা বড় সূত্রে পতঞ্জলি বলছেন –

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যবিরতিভ্রান্তিদর্শনালঙ্ক-

ভূমিকত্বানবহিত্তত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়ঃ।।৩০।।

রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যমরাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা না হওয়া ইত্যাদি – এগুলোই চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যাঁরাই যোগ পথে সাধন ভজন করে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে মহাত্মা হতে চাইছেন, তাঁরা যখন যোগ পথে নামবেন প্রথমেই তাঁদের নানা রকমের সমস্যা আসতে শুরু করে দেবে। এগুলোই যোগের বিঘ্ন। যোগপথে কি কি বিঘ্ন আসে এবং সব সাধকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার একটা তালিকা দিয়ে দিলেন।

প্রথমেই বলছেন **ব্যাদি** র কথা। বেশির ভাগই যারা সাধক জীবনে প্রবেশ করে তাদের আজকে জ্বর, কালকে সর্দি, তারপর কোমর ব্যাথা, নানান রোগ লেগেই আছে। সবটাই যে মনের ব্যাপার তা নয়, কিন্তু বিঘ্ন রূপে এগুলো আসে। যারাই সাধক জীবন শুরু করেন তাঁদের সব থেকে বড় বিঘ্ন হল ব্যাদি। জপ-ধ্যান করলে ব্যাদি হবেই, এটাই যোগ বিঘ্ন। জপ আর তার অর্থ চিন্তন করলে ব্যাদিগুলো কমে যায়। **স্ত্যান** – স্ত্যান হল শরীরের কম্পন, যারাই খুব জপ-ধ্যান করতে শুরু করবে তাদের শরীরে কম্পন হবে। কিন্তু কিছু দিন পরে এই কম্পন বন্ধ হয়ে যায়। **সংশয়** – মাঝে মাঝে মনের মধ্যে সন্দেহ হয় আদৌ ভগবান বলে কিছু আছে কিনা, আত্মা বলতে আদপে কিছু হয় কিনা, ইত্যাদি। সংশয় হল যোগের একটি প্রধান বিঘ্ন। ঠাকুরের উপর যদি সংশয় না হয়, যোগের ব্যাপারে যদি সন্দেহ না হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার কোথাও কিছু গোলমাল হচ্ছে। এই কথা যোগীকে বলা হচ্ছে, পাড়ার লোকদের বলা হচ্ছে না। যোগ পথে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর মনে একটা সন্দেহ আসবেই – আমি এইভাবে আমার জীবনটাকে নষ্ট করছি না তো, জীবনে কত আমোদ আহ্লাদ ছিল আর এই জীবনটাই তো শেষ, সব ছেড়ে কিসের জন্য আমার জীবনটা নষ্ট করছি! এই ধরণের সংশয় আসবেই। এই সংশয়কে কে দূর করবে? জপ-ধ্যান, জপ-ধ্যানে লেগে থাকলে এই সংশয় এলেও একে বেশী দূর এগোতে দেবে না। যোগীর জীবনে যদি কোন সমস্যা না আসে তাহলে বুঝতে হবে তার সাধনায় কিছু গোলমাল আছে নতুবা সাধনাই শুরু হয়নি। যোগে নানা রকমের বিঘ্ন আসবেই, লোকনিন্দা, এমন কিছু হয়ে গেলে যে আপনার নামে অনেক কলঙ্ক হয়ে গেল, হয়তো জীবনের সংশয় দেখা দিল। যারা সাধু হয়ে যান, দেখা যায় শেষের দিকে, সারাটা জীবন সাধুজীবন কাটিয়ে শেষে তাঁর মনে নিজেরই একটা অস্তিত্বের সঙ্কট এসে যায়। সংশয় হল আধ্যাত্মিক জীবনের মাইলস্টোন, অনেক দিন সাধনা করার পর মনে যদি সংশয় এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সে আধ্যাত্মিক পথে এগোচ্ছে। ঠাকুরের জীবনেও এই সংশয় আমরা দেখতে পাই। শরীর যাবার পাঁচ বছর আগেও ঠাকুর মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন ‘মা, নরেন বলছে এগুলো নাকি আমার মনের ভুল, তুই কি আমাকে বোকা বানালি’! কবে বলছেন? তাঁর অদ্বৈত সিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পরে এই কথা বলছেন। মা কালী যখন বললেন ‘নরেন সব মানবে’ তখন ঠাকুরের মন শান্ত হল। **প্রমাদ** – এখানে প্রমাদ বলতে বোঝাচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগের প্রতি স্পৃহা, যোগের পথ থেকে সরে এসে জগতের ভোগে নেমে পড়া। সাধক জীবনে এটিও একটি বিরাট বাধা। মাংস, মদ, টেলিভিশনের নানা অনুষ্ঠান, মিষ্টি মিষ্টি গান, এই ধরণের যে কোন ইন্দ্রিয়ের রসাস্বাদন থেকে সাধককে অনেক দূরে থাকতে হবে। যোগী, সন্ন্যাসীদের পক্ষে এগুলো যে কী প্রচণ্ড সমস্যা কল্পনা করা যায় না। যতগুলো বিঘ্ন আছে তার মধ্যে প্রমাদ আর তারপরেই আলস্য, এই দুটো সাধনার জীবনে প্রধান অন্তরায়। **আলস্য** মানে অলসতা, আলস্য আবার দুভাবে আসে একটা মানসিক

আলস্য আর দ্বিতীয় শারীরিক আলস্য। শারীরিক আলস্য হল – বসতে ভালো লাগছে না, কাল থেকে শুরু করা যাবে এখন একটু শুয়ে নিই, আর মানসিক আলস্য হল বসে আছি কিন্তু জপ ধ্যান করতে ভালো লাগছে না, মনটা শূন্য হয়ে পড়ে। শ্রীমাও বলছেন, ভোরবেলায় তাঁর ওঠার অভ্যাস ছিল, কিন্তু শরীর খারাপ থাকার দরুন একদিন উঠতে পারেননি। পরের দিন তাঁর মনে হল আরেকটু না হয় ঘুমিয়ে নিই। প্রমাদ জগতের সুখভোগের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যোগী ও সন্ন্যাসীদের এমনিতেই লোকসমাজ সম্মান দেবে, যোগ অনুশীলনের জন্য তাঁর বিশেষ কিছু কিছু শক্তি আসে, জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এতে লোকে আরও সম্মান করে। তখন অনেক লোকজনও জুটে গিয়ে তোয়াজ করতে শুরু করবে। কাঁচা যোগী তখন সেই সুযোগে ভোগে নেমে পড়ে।

রৈক্স মুনি খুব তেজী যোগী ছিলেন। ওখানকার রাজা একদিন শুনছেন দুটো পাখি আকাশ পথে কথা বলতে বলতে উড়ে যাচ্ছে – এখন যে যা পূণ্য করেছে সব রৈক্স মুনির কাছে যাচ্ছে। কথা শুনে রাজা খুব অবাক হয়ে রৈক্স মুনির খোঁজ করতে লাগলেন। দেখছেন রৈক্স মুনি গরুগাড়ির চাকায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। রাজা তাঁকে বললেন ‘আপনি কী জ্ঞান পেয়েছেন আমাকে বলুন’। শুনে রৈক্স মুনি রাজাকে ভাগিয়ে দিলেন। রাজা এবার সে তার কন্যাকে নিয়ে এসে বলছে ‘এ আপনার দাসী, আপনার সেবা করবে, একে আপনার কাছে রেখে দিন’। কন্যাটিকে দেখে রৈক্স মুনি সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এই কাহিনীর আরেকটি ব্যাখ্যা হল, যখন মানুষ নিজের মেয়েকে কারুর হাতে দান করে দেয় তখন এটাই বোঝায় আমি আপনাকে উচ্চতম শ্রেষ্ঠ সম্মান দিলাম, এর থেকে বেশী সম্মান দেওয়ার আমার আর কিছু নেই। কিন্তু এখানে রৈক্স মুনি একজন ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী যদি কারুর মেয়েকে নেওয়ার পর যদি বলে এবার আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যাকে দু মিনিট আগে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে বাকি যোগীদের ক্ষেত্রে কী হবে কল্পনা করা যায় না। এটাই প্রমাদ – টাকা, পয়সা, মান সম্মান যোগীর চরণে অর্পণ করবার জন্য সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাইন যত বড় হবে যোগীর মন তত উৎফুল্ল হবে। ছদ্মবেশী সাধুদের নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে না, এগুলো পাওয়ার জন্যই সাধুর ভেদ নিয়েছে। কিন্তু এখানে যাঁরা আসল সাধু তাঁদের কথা বলা হচ্ছে, আসল সাধু হলেই তাঁদের কাছে এটাই বিদ্য হয়ে আসবে আর নানান রূপ নিয়ে, কখন ব্যাধি হয়ে আসবে, কখন শরীরের কম্পন নিয়ে আসবে, কখন আলস্য রূপে আসবে, কখন ভোগ রূপে আসবে, কখন জনসেবা করার ইচ্ছা হয়ে আসবে। উদ্দেশ্য হল আপনাকে যোগ পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া।

এরপর আবার আছে **ভ্রান্তির্দর্শন** – আধ্যাত্মিক সাধনায় ভ্রান্তির্দর্শন একটা মারাত্মক ব্যাপার, অনেকেই আছেন যাঁরা প্রথম প্রথম দীক্ষা নিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই ঠাকুর মায়ের দর্শন পেতে শুরু করেন। এঁদের কাছে মঠের মহারাজরা সত্যিই অভাগা, সাধুরা সেই কবে ঘরবাড়ি ছেড়ে দিনরাত ঠাকুরের কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু মন্দিরে ঠাকুরের মূর্তি আর দেওয়ালে ঠাকুরের ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখার সৌভাগ্য হয়নি। রাজযোগ এইসব ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার, প্রথমেই বলে দিচ্ছে তোমার কিন্তু ভ্রান্তি দর্শন হবে। তোমার মনে হবে আমি ঠাকুরকে দেখছি, আমার জ্যোতি দর্শন হচ্ছে, তোমার মনে হবে আমি ওঁ শুনতে পাচ্ছি। এগুলো হলে তোমার জন্য একটাই উপদেশ, আগে ভালো করে খাওয়া দাওয়া কর, একটু শরীর চর্চা কর, ডাক্তার দেখাও। যারা খুব আবেগপ্রবণ, ভক্তিতে একেবারে গদগদ ভাব অথচ মন কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে রয়েছে, তাদেরই এইসব ভ্রান্তির্দর্শন বেশি হয়। এই ধরণের দর্শন হলে বুঝতে হবে তার মানসিক রোগ আছে। মজার ব্যাপার হল, যারা মানসিক রোগী আর যারা ঠিক ঠিক যোগী তাদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মিল থাকে। এখানে বলছেন ভ্রান্তির্দর্শন যোগের বিদ্য। ভ্রান্তির্দর্শনের ঠিক আগে আছে সংশয়, যেখানে স্বামীজী মন্তব্য করছেন ‘আমাদের এই যোগবিজ্ঞান-বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন দূরদর্শন-দূরশ্রবণাদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, ততদিন এই বিদ্যার সত্যতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে। এইগুলির একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে সাধক আরও অধ্যবসায়শীল হয়’। স্বামীজী বলেই দিচ্ছেন তোমার মনে যে সন্দেহ বা সংশয় এসেছে এটা চলে যাবে যদি তোমার মধ্যে যোগ সিদ্ধি আসে। আবার ভ্রান্তির্দর্শনের কথাও বলছেন। যদি কেউ ঠাকুরের ধ্যান করে ঠাকুরের দর্শন পায় তাহলে কি করে বুঝবো

এটা দিব্য দর্শন নাকি ভ্রান্তিদর্শন? একদিকে স্বামীজী বলছেন তুমি এগোচ্ছ বলেই তো তোমার এই ধরনের দর্শন হচ্ছে। অন্য দিকে যোগ বলছে এটা ভ্রান্তিদর্শন। ব্যাখ্যাকাররা বলছেন সুক্তিতে যেমন রজতভ্রান্তি। কিন্তু তার আগেই বলে দেওয়া হয়েছে বিকল্প বিপর্যয়, বিকল্প মানে যে জিনিষটা আদর্শেই নেই সেই জিনিষটাই তুমি দেখছ। এই যে অনেকে ঠাকুরকে দেখছেন, শ্রীমাকে দেখছেন এগুলো কি বিকল্প নাকি ভ্রান্তিদর্শনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? এইজন্যই গুরুর দরকার। এখানে গুরুই আমাদের প্রচণ্ড সাহায্য করেন, একমাত্র গুরুই বলে দেবেন তোমার এটা ভ্রান্তিদর্শন নাকি তুমি ঠিক পথে এগোচ্ছ। স্বামীজী বলছেন ভ্রান্তিদর্শন মানেই বিকল্প। যতক্ষণ একটা অবস্থায় না পৌঁছে যাচ্ছে ততক্ষণ এগুলো বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে।

তার মধ্যে সব থেকে মুশকিল হল **অলঙ্কৃতভূমিকতানবস্থিততানি**, যোগী একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পরেও সেখান থেকে তাঁর পতন হয়ে যাওয়া। এটাই পরে তাঁকে ব্যাধি স্ত্যানে নিয়ে চলে যাবে। প্রথম কথা আপনি এগোতে পারবেন না, দ্বিতীয় কথা যেখানে পৌঁছেছেন সেখান থেকে পতন হয়ে যাবে। বেশীর ভাগই যারা জপ-ধ্যান করছে, যোগ সাধনা করছে তারা জানতেও পারে না কখন উচ্চ অবস্থা থেকে নীচে পড়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর উপমা দিচ্ছেন একটা বল সিঁড়ি থেকে যখন পড়তে থাকে তখন ধাপে ধাপে পড়তেই থাকে, নীচে না পড়া পর্যন্ত থামতেই চাইবে না। যোগের পথে এটি একটি বিরাট বড় সমস্যা। যোগে দু-চারদিন যোগ সাধনা না হলে মনে নেবে কিন্তু সাধনা করে যেখানে পৌঁছেছ সেখান থেকে তোমার যেন পতন না হয়ে যায়। কারণ উপরে পৌঁছান জীবনে সব সময়ই সুখকর কিন্তু উপর থেকে নীচে পড়ে যাওয়াটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। অন্য দিকে এটাও বলা হয় যখন জানা হয়ে যায় উচ্চ অবস্থাট কী, তখন সেই অবস্থায় যাওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছা থাকে। কিন্তু যোগদর্শনে যে ভূমিকে একবার যোগী লক্ষ্য করেছেন সেই ভূমি থেকে পতন হওয়াটা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। এগুলো কিসে আটকায়? জপ আর তার অর্থ ভাবনা করলে। এখন যা কিছু দর্শনই হোক না কেন, রাজযোগের একটাই পরীক্ষা এতে কি তোমার চিন্তবৃত্তি নিরোধ হচ্ছে? মনের মধ্যে চিন্তা বা বৃত্তি যদি এখনও উঠতেই থাকে আর সব রকম দর্শনও যদি হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে মস্তিষ্কে নির্ঘাৎ গোলমাল আছে। তুমি ব্রহ্মা হয়ে যেতে পারো, বিষ্ণু হয়ে যেতে পারো কিন্তু তোমার একটাই পরীক্ষা, চিন্তবৃত্তি নিরোধ হয়েছে কিনা।

এর পরের বিঘ্ন একাগ্রতা লাভ না করা আর একাগ্রতা লাভ করেও ধরে রাখতে না পারা। যেখানে মন দিচ্ছে সেখানে মনকে ধরে রাখতে পারছে না, তার মানে তার ভেতরে এখনও গলদ রয়েছে। তবে এর থেকেও বাজে অবস্থা হল একাগ্রতাকে ধরে না রাখা, একাগ্রতা থেকে পতন হওয়া আরও বাজে। একটা উচ্চ অবস্থা থেকে পতন হওয়াটা যোগের একটা সাধারণ সমস্যা। বলা হয় সমাধির সব থেকে উচ্চ অবস্থা, মানে ব্রহ্মার মতন অবস্থাতে চলে গেলে সেখান থেকেও পতন হওয়ার সম্ভবনা সব সময় থাকবে। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে বলা হয় আপনি কত উচ্চ অবস্থায় চলে গেলেন তার কোন গুরুত্ব নেই, পর্বতারোহীরা যখন পাহাড়ে উঠতে থাকে তখন কটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠল সেদিকে না তাকিয়ে বেশি নজর দেয় যে পর্যন্ত উঠেছে সেখান থেকে পতন যেন না হয়ে যায়। যোগও এই একই সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে। বেশির ভাগ আধ্যাত্মিক জীবন এই ধরনের পতনের ফলে হারিয়ে যায়। এই এই বিঘ্ন আছে আর এগুলি থেকে পতন আসবেই, পতঞ্জলি একেবারে তালিকা দিয়ে দিয়েছেন – এই এই কারণে তোমার পতন হতে বাধ্য। এরপরে আরেকটি মারাত্মক বিঘ্ন **চিন্তের বিক্ষিপ্ত**। রাগ দ্বন্দ্ব দিয়ে যাচ্ছি সামনে এমন একটা কিছু নজরের মধ্যে চলে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়ে গেল।

অসমাহিত চিন্তের লক্ষণ

সমাজে সবাই যোগী হয় না, যারা যোগী নয়, যোগের অভ্যাস যদি না করা হয় তাহলে তাদের জীবন কীভাবে চলছে? আসলে যোগীরা সব সময় চেষ্টা করেন মনের বৃত্তিগুলো কীভাবে কমান যায়, মনের বৃত্তি কমানোর চেষ্টা থাকার জন্য যোগীর জীবন একাগ্রতাপূর্ণ হয়। যোগী যা কিছু করে সচেতন

ভাবে করেন আর খুব চিন্তা ভাবনা করেই সব কিছু করছেন। এখানে আমরা যোগীদের কথাই বলছি, সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে না। যোগী হওয়ার জন্য সবাইকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে তা কখনই নয়, যে কোন লোকই যোগী হতে পারে। এখানেই সাধারণ মানুষ আর যোগীদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। যারা যোগ সাধনা করছে না, যারা যোগী নয় তারা কোন কিছুই সচেতন ভাবে করবে না। কিন্তু যোগী যখন খাওয়া-দাওয়া করছেন তখনও তিনি সচেতন যে আমি খাচ্ছি। যখন চিন্তা-ভাবনা করছেন তখনও সজাগ হয়েই চিন্তা-ভাবনা করছেন। সচেতন ভাবে কিছু করা মানেই মন একাগ্র। সাধারণ মানুষ কিন্তু সব কিছুই অবচেতন ভাবে যন্ত্রের মত প্রবাহে করে যাচ্ছে, তার মধ্যে কখন সখন নিজের ভালো লাগার বস্তুর উপর মন একাগ্র হচ্ছে কখন হচ্ছে না, কখন খুব নিষ্ঠা আবার কখন করতে হবে তাই করছে। সাধারণ মানুষের জীবনে সব কিছুই আছে, একেবারেই যে এলোমেলো তাও নয়, অনেক কিছুতে গোছান পরিপাটি আছে আবার অনেক ব্যাপারে এলোমেলো, অনেক ক্ষেত্রে একাগ্র, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তার মানে জীবন দুই রকম চলে। আসলে যোগী যে কাজটাই করেন সেখানে তাঁর মন পুরো নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে জীবন দু ভাবে চলে, একটাতে জীবন প্রবাহে চলে যাচ্ছে, এটাই সংসারীদের জীবন। আর দ্বিতীয় যোগীদের জীবন, যোগীদের জীবন মানে পুরোটাই যুক্ত জীবন। গীতায় ভগবান বলছেন *নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চায়ুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ অশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।* এখানে উল্টোটা বলছেন, যারা অযুক্ত অর্থাৎ যারা যোগী নয় তাদের মনে কোন বিচার নেই, যাদের বিচার নেই অর্থাৎ যাদের মন সমাহিত নয়, তাদেরই অশান্ত জীবন। জীবন অশান্ত হলে জীবনে কোন সুখ আসবে না। সাধারণ জীবন আর যোগযুক্ত জীবনের পার্থক্য এক কথায় বলতে গেলে সাধারণ জীবন প্রবাহে চলে যাচ্ছে আর যোগীর জীবন সমাহিত জীবন। এখন যদি কেউ বলে জীবন প্রবাহে চলে গেলে অসুবিধার কি আছে? অসুবিধা হল, জীবন প্রবাহে চলতে থাকলে তোমার মন সমাহিত থাকবে না, অসমাহিত জীবন মানেই বুদ্ধির বিকাশ হবে না, বুদ্ধির বিকাশ না হলে বিষয়তৃষ্ণায় মন সব সময় অশান্ত হয়ে থাকবে, অশান্ত মন মানে জীবনে কোন দিন শান্তি আসবে না।

কিন্তু যোগ কী বলছে? *দুঃখদৌর্ভাগস্যঙ্গমেজয়তুশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুবঃ।।৩১।।* এর আগে যত বিঘ্নের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই বহির্জগতের বিঘ্ন – পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জপ ধ্যান করতে বসলেই ঘুম পাচ্ছে, আসনে বসাও হয়েছে কিন্তু জপ করতে ইচ্ছে করছে না, সকালে উঠে জপে বসবে কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। এর থেকে আরও খারাপ হল মনকে একাগ্র করতে না পারা – একেই বলে অসমাহিত চিত্ত। সব সময় যে অসমাহিত চিত্তেই জীবন চলছে তা নয়, কখন অনাসক্ত জীবনও চলছে আবার কখন আসক্ত জীবনও চলছে, কোথাও কোথাও খুব নিষ্ঠা আছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ছাড়াই সব কিছু করে যাচ্ছে। কিন্তু মূল হল এদের জীবন প্রবাহে চলে যাচ্ছে। যখন কবিতা বা গান লিখছে সেটাও প্রবাহে লিখে যাচ্ছে। কিন্তু যোগীর মন সম্পূর্ণ একাগ্র আর সমাহিত। যোগী যে কাজটাই করেন সেটা তিনি জেনে বুঝে একাগ্র ভাবেই করেন। এমন কি দাঁত ত্রাশ করা পর্যন্ত। আমরা যখন জামার বোতাম লাগাই তখন আমরা কিন্তু সচেতন থাকি না যে এখন আমি জামার বোতাম লাগাচ্ছি। সমাহিত চিত্ত যদি না হয়ে থাকে, মন যদি পুরো একাগ্র না হয়, প্রত্যেকটি পদক্ষেপে যদি সজাগ না থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে তার জীবন প্রবাহে চলছে, যোগী হতে তার অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ঘুম থেকে জাগার পর আমি কি সজাগ থাকছি যে আমি এইভাবে উঠে বসছি? যোগী ঘুম থেকে ওঠার সময়ও সজাগ, আমাকে বাঁ দিকে কাত হয়ে ডান হাতে ভর দিয়ে শরীরকে সোজা করতে হবে। যোগী কখন বাচ্চাদের মত দুম্ করে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠবেন না। সারা দিন যে কাজটাই করছেন প্রত্যেকটি কাজেই প্রচণ্ড সজাগ। কাজ করার সময়ও যদি সজাগ না থাকে তাহলে প্রথম ধাক্কা আসবে *দুঃখম্*। মানুষের জীবনে দুঃখ কেন? কারণ সে সমাহিত নয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হচ্ছে সেখানে এই কথাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন – *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্* - যিনি অশান্ত তার সুখ কোথেকে আসবে! আর শান্তি কখন হবে? যখন সমাহিত চিত্ত হবে – চিত্ত যখন একাগ্র হয় তখনই শান্তি আসে।

তাই বলে কি যোগীর জীবনে কখন দুঃখ আসবে না, কোন অশান্তি আসবে না? একশবার আসবে, কিন্তু দুঃখ, অশান্তি যোগীকে স্পর্শ করবে না। কেন স্পর্শ করবে না? একাগ্র চিত্ত বলে। সমাহিত চিত্ত হওয়ার জন্য যোগীর মন এত শক্তিমান হয়ে যায় যে, দুঃখ অশান্তি এগুলো পিছলে বেরিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ সামান্য একটু দুঃখেই চুপসে যায়, কারণ সে প্রবাহে চলছে। দুর্বল চিত্ত, অসমাহিত চিত্ত, একাগ্রতার অভাব এগুলো একই জিনিষ। এগুলো থাকলে প্রথম ধাক্কা মারবে দুঃখ দিয়ে। তাও তো অনেকে জীবনে প্রচুর সুখ পায়। নিশ্চয়ই সুখ পায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনে কি কম সুখ আছে! একজন পতিব্রতা স্ত্রী থেকে স্বামী যে সুখ পায়, বাধ্য সুসন্তান থেকে বাবা-মা যে সুখ পায় এই সুখকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের আচার্যরাও এই সুখকে অস্বীকার করছেন না, শুধু বলছেন সুখের প্রত্যেকটি বিন্দুর পেছনে এক মণ করে দুঃখ আসছে। যে মানুষ সুখের সময় আনন্দে উদ্ভলিত হয়ে ওঠে সেই মানুষ কিন্তু সুখ সরে গেলে দুঃখ সাগরে নিমজ্জমান হয়ে যাবে। অতি সাধারণ সাধারণ বিষয়ে দুঃখ বোধ তাদেরই আসে যাদের চিত্ত সমাহিত নয়।

তারপরে আছে **দৌর্মনস্য** – দৌর্মনস্য মানে মানসিক দুঃখ। কোন কারণ নেই কিন্তু সব সময় মন খারাপ করে থাকা। কিছুই হয়নি, কিন্তু অকারণে মন খারাপ করে থাকবে। প্রথম দুঃখটা বাস্তবিক, টাকা-পয়সার অভাব হয়ে গেল, শরীরে ব্যাধি এসে গেল, এতে যে দুঃখ হয় সেটা বাস্তবিক। কিন্তু দৌর্মনস্য হল মানসিক সন্তাপ, একটা অদৃশ্য কিছু আশঙ্কায় আতঙ্কে থাকা। আর কি হয় – **অঙ্গমেয়জয়তু**, অনেকের দেখা যায় শরীরের অঙ্গগুলো কাঁপতে থাকে, কোন কারণ নেই হাত দুটো কাঁপতে থাকে। এগুলো শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ, শরীর দুর্বল থাকলে হাত পা কাঁপে। যোগ অভ্যাস করলে শরীরের কাঁপাটা বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে বসে বসে পা নাড়াতে থাকবে। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) একবার এক মাড়োয়ারির বাড়িতে চাঁদা সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন, হরি মহারাজের সামনে বসে ঐ মাড়োয়ারি বসে পা নাড়িয়েই যাচ্ছিল। হরি মহারাজ হঠাৎ এমন চেষ্টা করে বলে উঠলেন – ‘পা নাড়া বন্ধ করুন’। এরপরে শেঠজী আর চাঁদা দেয়! মহারাজ চাঁদা না নিয়েই চলে এলেন। যাঁরা সমাহিত চিত্ত তাঁদের সামনে বসে যদি কেউ পা নাড়ে সেটাও তাঁরা সহ্য করতে পারবেন না। এগুলোই লক্ষণ, যে লক্ষণের সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে আপনার চিত্ত সমাহিত নয়। আপনার মন যত বেশি একাগ্র হবে আপনার শারীরিক নড়াচড়া তত কমে আসবে। তিন চার বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সব সময় তারা হাত পা নাড়িয়েই চলেছে। শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলো অতটা অশোভন নয় কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের কেউ যদি হাত পা নাড়তেই থাকে তখন আর সেটা শোভনীয় থাকেনা, বোঝা যাচ্ছে তার মন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেকটি লক্ষণ **শ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপ**, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস। আমরা যখন হঠাৎ কোন কারণে ভয় পেয়ে যাই বা রেগে যাই তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি পাল্টে গেছে। সব সময় দুঃখ অনুভব করা, মন সর্বদা অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কম্পন, অকারণে হাত-পা নাড়া, আর অনিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়া এগুলোই অসমাহিত চিত্তের লক্ষণ। আমরা যারা যোগ পথে এগোতে চাইছি তাদের উদ্দেশ্যে যোগশাস্ত্র বলছে, যোগ পথে যদি এগোতে চাও তাহলে তুমি যদি জপ কর আর তার সাথে সাথে যদি জপের অর্থ ভাবনা কর তখন তুমি কিছু কিছু বিষয় থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। প্রথম বিষয় হল ব্যাধিস্ত্যানাদি অর্থাৎ রোগ ব্যাধি এগুলো তোমার আর বিষয় রূপে আসবে না। পরের ধাপে বলছেন এগুলো যদি তুমি না কর, দীক্ষাদি নিয়ে তুমি যদি খুব জপ ধ্যান না কর তখন কিন্তু তোমার দুঃখ আসবে।

যদের সমাহিত চিত্ত তাদের অত সহজে দুঃখ হবে না। তবে দুঃখ-কষ্ট কি আসবে না? জপ ধ্যান যাঁরা করছেন তাঁদেরও নিশ্চয়ই মনে কষ্ট আসবে। মন কি এদিক ওদিক যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সোজা হয়ে যাবে। কারণ মনও প্রকৃতির মধ্য। যোগ কখনই বলবে না যে সমাহিত চিত্ত হয়ে গেলে তোমার পোড়ো বাড়ি পাকা বাড়ি হয়ে যাবে। দুঃখ একটা হবে, কিন্তু মানসিক সন্তাপ হবে না, মনের অবসাদ কখনই আসবে না। তবে তার শারীরিক হঠাৎ কোন বিপর্যয় হলে সামান্য সময়ের জন্য অবসাদ হবে কিন্তু একটু নড়েই আবার ঠিক হয়ে যাবে। কারণ যাঁর চিত্ত সমাহিত মনের

উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এসে যাবে। হাত পা কাঁপা, শরীর কাঁপা কোন ভালো সাধুর মধ্যে কখন দেখা যাবে না। কারণ শরীরের কম্পন সরাসরি স্নায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্নায়ুকে আবার চালাচ্ছে মস্তিষ্ক, মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে মন। একাগ্র মন মানে মন নিষ্ক্রিয়, মন ক্রিয়াহীন হয়ে পড়লে মস্তিষ্কও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে, মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া মানে স্নায়ু ক্রিয়াহীন হয়ে গেল, স্নায়ু ক্রিয়াহীন হয়ে গেলে শরীর নড়বে না। তাই এক আসনে টানা দুঘন্টা যদি না বসতে পারে তাহলে বুঝতে হবে মন এখন একাগ্র হয়নি। কিন্তু আমাদের পাঁচ মিনিট পরেই একটু ঘাড় চুলাকাবে, একটু পা চুলকাবে, কান চুলকাবে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও অনিয়মত হবে। এগুলো আর কিছুই না, এর একমাত্র কারণ মনের একাগ্রতার অভাব। যোগ অভ্যাস করে মন একাগ্র হয়ে গেলে এই ধরনের কিছু হবে না। আজকের দিনে যদি বলা হয় তখন বলবে জপ ধ্যান করলে ব্লাড প্রেসারাদির মত কোন রোগ আর হবে না। যোগ অভ্যাস করলে সত্যি সত্যিই রোগ ভোগ অনেক কমে যাবে। এখানে যাঁরা দেড়-দু ঘন্টা এক নাগাড়ে শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছেন তাঁদের কথা শুনলে অনেক সন্ন্যাসীরাই অবাক হয়ে বলেন, এনারা এতক্ষণ শোনে কী করে! আমেরিকানদের attention span তিন মিনিট, বক্তাকে যে কোন বিষয়ে যা বলার তিন মিনিটে বলে দিতে হবে। তিন মিনিট বলার পরেই একটা বিরতি দিতে হবে। সেই তুলনায় ভারতীয় ছাত্রদের attention span দশ মিনিট। এখানে বক্তা একটা বিষয়ের উপর দশ মিনিট বলে যেতে পারেন। দশ মিনিট বলার পর একটু অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে মূল বিষয়ে এসে আবার দশ মিনিট বলে যেতে পারেন। কিন্তু এখানে দেড় ঘন্টা একই বিষয়ের উপরে বলে যাওয়া আর সেটাকে মনযোগ দিয়ে শুনে যাওয়াটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তার মানে, যাঁরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন তাঁদের মন অনেক কেন্দ্রিত হয়ে গেছে।

আপনাকে এসে কেউ যদি বলে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকালেই তার চোখ দিয়ে জল পড়ে তাকে বলুন আপনি আসনে বসে একটু জপ করুন তো। দু ঘন্টা যদি আসন না পাল্টে বসতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার মন একাগ্র হয়েছে। ভক্তিয়োগ আর রাজযোগে কোন পার্থক্য নেই, এরা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। রাজযোগ যা যা গুণের কথা বলছে ভক্তিয়োগে যে ভক্ত হবে তারও এই একই গুণাবলী থাকতে হবে। কর্মযোগী বলছে আমি রাজযোগ করি না আমি কর্মযোগী, খুব ভালো কথা। কিন্তু তাকে যদি দু ঘন্টা টানা বসতে বলেন আর যদি না বসতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সে কর্মযোগেও ফাঁকি দিচ্ছে। রাজযোগ হল সবার শেষ পরীক্ষাগার, এখানে এসে সবার পরীক্ষা হয়ে যাবে তা তুমি যে পথেই যাওনা কেন, সে পথে তুমি ঠিক ঠিক চলছ কিনা সব রাজযোগে এসে ধরা পড়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয় Raja Yoga is the ultimate Testing Laboratory of every kind of spirituality. এখানে কারুর রেহাই নেই, যতই বলুক আমার পথ আলাদা, আমার ভাব আলাদা, রাজযোগে এসব কিছু খাটবে না, প্রত্যেকের পরীক্ষা এখানে হয়ে যাবে, আর সে ঠিক না বেঠিক সব রাজযোগে এসে ধরা পড়ে যাবে। আমি খোল-করতাল নিয়ে হরিবোল হরিবোল করতে পারি, দিনে দুবার গঙ্গাস্নান করি, মন্দির মন্দিরে সারাদিন ঘুরে বেড়াই কিন্তু এগুলোর দ্বারা প্রমাণ হয়না যে আমি একজন ভক্ত বা যোগী। ভক্ত মানে টানা দু-ঘন্টা আসনে বসতে হবে, অবসাদগ্রস্ত কখনই হবে না, যতই ঝড়ঝাপটা আসুক কখনই সে টলে যাবে না, শরীরের কোন ধরনের নড়াচড়া বা কম্পন হবে না আর শ্বাস-প্রশ্বাস ছন্দোবদ্ধ হয়ে চলবে।

বৃত্তির সংখ্যা কমানো এবং মন একাগ্র করার বিভিন্ন উপায়

তাহলে এগুলো কিভাবে ঠিক করা যায়? পতঞ্জলি বলছেন এগুলো এমনিতে কখনই সারানো যাবে না। এগুলো থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র উপায় **তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।।৩২।।** পতঞ্জলি এই সূত্রে উপায়টা বলে দিচ্ছেন, একটি তত্ত্বের অভ্যাস করাই এগুলো থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। মনকে একটা জিনিষের উপর একাগ্র করার অভ্যাস করতে হবে, এই অভ্যাস না করলে তোমার সমস্যাগুলো থেকে যাবে। চিন্তের সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করে মনকে একটি বৃত্তিতে নিয়ে আসার অভ্যাসের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ধরুন আপনি শুধু গুঁএর কথাই চিন্তা করে যাচ্ছেন, এখানে একটা বৃত্তি গুঁ শুধু থাকছে, অথবা গুঁএর চিন্তা করতে করতে বৃত্তির সংখ্যাগুলো কমিয়ে দেওয়া। যখন ঠাকুরের

উপর ध्यान करा হচ্ছে तখনও वृत्तिर संख्या कमिये आना হচ্ছে। ये कोन एकटा जिनिषेर उपर यदि मनके एकाग्र करा याय तहले समस्या अनेक कमे यावे। किन्तु आमामेदर समस्या हल आमरा एकटा जिनिषेर उपर मनके अनेकक्षण धरे राखते पारिना। आमामेदर मनेर स्वभाव बानरेर स्वभाव थेके कोन अंशेई आलादा नय, कोन जिनिषेई आमरा मनके बेशीक्षण धरे राखते पारिना।

बेशीर भाग लोकई बलबे, एकटा विषयके धरे ध्यान करे याओया आमर पक्षे संभव नय। एदेर जन्यओ योग खूब उदार। अन्यान्य यत दर्शन आछे तादेर मध्ये योगदर्शन सब थेके उदार। आमामेदर सवारई मन विभिन्न रकमेर, आमर मन आलादा, तार मन आलादा, आपनार मन आलादा, योग सवारई मनेर मत करे चले। योगेर उद्देश्य सवाइके एगिये निये याओया। येमन धरण एकजन गान खूब ভালोबासे, एकजन ভালो बाजाते पारे, एकजन ভালो छवि आँकते पारे, यार येदिकेई प्रतिभा थाकुक ना केन, सवाइके सवार जायगा थेके योग चेष्टा करछे कीभावे योगी बानानो याय। तुमि ये जिनिष करछ कर किन्तु सेखाने यदि तोमार कोन समस्या हय तहले तोमार मने ये गोलमाल गुलो आछे सेगुलोके आगे बन्क कर। कीभावे बन्क करबे? मनके एकटा जिनिषे एकाग्र कर। आमर मन तो एकाग्र हते चाय ना, आर आमर बयसओ हये गेछे। तखन योग तादेर जन्य परेर सूत्रे बलछेन। এই सूत्रेई आमामेदर सवार पक्षे अत्यन्त मूल्यवान सूत्रे, এই सूत्रेई मुखन्त करे राखा दरकार। राजयोगेर एई एकई अत्यन्त मूल्यवान सूत्रे। तेत्रिंश नं सूत्रे राजयोग बलछे –

**मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या-
पुण्यविषयाणां भावनात्तिष्ठप्रसादनम्॥३३॥**

एखाने आमरा पाछि मैत्री, करुणा, मुदित, आनन्द आर उपेक्षा, एखन एकटार साथे आरेकटा साजिये निले आमामेदर बुबते सुविधा हबे –

येखान सुख	सेखाने मैत्री
येखाने दुःख	सेखाने करुणा
येखाने पुण्य	सेखाने मुदित
येखाने अपुण्य	सेखाने उपेक्षा

राजयोगेर उद्देश्य चिन्तवृत्ति निरोध करा। मनेर मध्ये हजार हजार वृत्ति उठछे, वृत्तिर संख्या कमिये आनाई योगेर प्राथमिक उद्देश्य। वृत्तिगुलोके निरोध करार जन्य आमामेदर कि कि अनुशीलन करते हबे आमामेदर जाना आछे, आर एगुलो कतटा अनुशीलन करते पारबो जानिना। प्रथमे बललेन ईश्वरेर उपर ध्यान कर। तारपर बललेन ओँ जप कर आर साथे साथे ओँएर तांपर्य चिन्ता कर। अनुशीलनेर कथा बले देओयार पर आवार बले दिछेन एगुलो करले तोमार की हबे, आर ना करले की हबे। तारपर बललेन एकटा विषय वा बन्तर उपर ध्यान कर। किन्तु हठाँ केउ यदि बले आमि तो ध्यान करते पारि ना। योग तखन बलछे, ठिक आछे तोमाके ध्यान करते हबे ना। मनेर मूल समस्या हल मन सब समय चण्ण, मनेर এই चाण्ण्यके आटकानो नियेई कथा। तार आगे देखते हबे मन किसे किसे चण्ण हय। दैनन्दिन काजेर मध्ये समाज ओ परिवार किछु किछु घटना आमामेदर दिके ठेले दिछे, किछु कथा ठेले दिछे, समाजे, बाडिते या किछु आमि शुनछि, देखछि ओ अनुभव करछि तदुपरि रयेछे सूति ओ स्वप्न, सब किछु थेके आमर मने अनवरत नानान रकम प्रतिक्रिया हये याछे। पतञ्जलि सब रकम प्रतिक्रियाके चारटे श्रेणीते विभक्त करे दिलेन – सुख, दुःख, पुण्य ओ अपुण्य।

एखन ये जिनिषगुलि आमरा आलोचना करते याछि एर सामान्यतम अंशओ यदि आमरा अनुशीलन करते पारि तहले आमामेदर चरित्रेर मध्ये एकटा सदात्रक परिवर्तन घटिये आमामेदर मनुष्य जीवनेके अतीव धन्य करे देबे। बलछेन – तोमार मने गुच्छ गुच्छ संस्कार जमे आछे, एगुलो

সবই আবর্জনা, আর এদের সাথে লড়াই যা করার পড়ে হবে কিন্তু নতুন যে সংস্কার গুলো আসছে আগে সেগুলোর প্রবাহকে বন্ধ কর। বর্তমান যুগে যে আধুনিক যুদ্ধ হয় তখন প্রথমে শত্রুপক্ষের সরবরাহের সংযোগ মাধ্যমটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। যেটা সামনে আছে তার সাথে না হয় যুদ্ধ করা যাবে, কিন্তু সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র যদি ক্রমাগত আসতেই থাকে তাহলে আমি কতক্ষণ লড়াই করব! এখানে আমার লড়াই মনের সঙ্গে, তাই আগে দেখতে হবে মনের মধ্যে যেন নতুন কোন সংস্কার তৈরী না হয়। তখন বলছেন – আমরা এই জগতের সঙ্গে যখন সম্পর্ক তৈরী করি তখন আমাদের মনের চার ধরণের আবেগের মাধ্যমেই সব রকম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রথম হল সুখ, সুখ মানে তার মনে একটা আনন্দ হয়েছে। কি আনন্দ? আমার ছেলে বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। মনের মত খাবার খেয়ে আমার সুখ হচ্ছে, আমার পাশের বাড়িতে যারা আছে তাদের মনেও এই ধরণের ভালো খাবার খেয়ে সুখ হচ্ছে। আমার বন্ধুর ছেলে এই দুর্দিনের বাজারে একটা ভালো চাকরী পেয়েছে, বন্ধুর এই আনন্দ সংবাদ চোখ দিয়ে কান দিয়ে আমার কাছে আসছে। আমার ছেলে, আমার স্ত্রীরও অনেক রকম আনন্দ আসছে। সমাজে সবারই কত রকম আনন্দ আসছে। আমি কি দেখছি? চারিদিকে শুধু সুখ আর সুখ। এই সুখ আমাকে উদ্বেলিত করছে। দ্বিতীয় যে জিনিষ আমাকে উদ্বেলিত করে তা হল দুঃখ। আমার বাড়ির কারুর দুঃখ হয়েছে, আমার পরিচিত কারুর দুঃখ হয়েছে, আমার অপরিচিত কারুর দুঃখ হয়েছে, আমার শত্রুর দুঃখ হয়েছে, আমার মিত্রের দুঃখ হয়েছে বা আমার ছেলের সোয়াইন ফ্লু হয়েছে। নিজের চোখে এই দুঃখ দেখছি, কারুর কাছে শুনিছি, খবরের কাগজ পড়ে জানছি, এই সুখ আর দুঃখ আমাদের মনের উপর ক্রমাগত ছাপ ফেলে যাচ্ছে। এভাবেই সুখ আর দুঃখ আসছে আর মনে ছাপ ফেলে যাচ্ছে।

সুখ আর দুঃখ ছাড়া আর দুটো যে আবেগ মনে সংস্কার তৈরী করে তা হল পূণ্য আর অপূণ্য। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, এটা খুবই পূণ্য কাজ। এক জায়গায় দেখতে পেলাম সেখানে এক সাধু ভালো কাজ করছে, সেবা কাজ করছে, আমি বললাম ‘বাঃ, খুব ভালো সাধুতো’! এটাই পূণ্য, মানে ভালো কাজ। আর অপূণ্য – এক জায়গায় দেখছি একজন আরেকজনকে ঠকাচ্ছে, কিংবা মারামারি করছে, মদ খেয়ে মাতলামো বা অসভ্যতা করছে – এগুলো সবই অপূণ্য, মানে খারাপ কাজ। সুখ, দুঃখ, পূণ্য আর অপূণ্য এই চারটি ছাড়া পঞ্চম কোন আবেগ আমাদের মনে ছাপ ফেলে না। আমাদের চারিপাশে যত রকম ঘটনা ঘটছে এই চারটির বাইরে অন্য কোন রকম কিছু হয় না।

এই দুই ধরণের কাজ দেখে আমার মনে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া হবে। এগুলো দেখে তোমার মনে যাতে কোন রকমের বিক্ষিপ্ত উৎপন্ন না হয় তার জন্য তুমি কি করবে সেটাই যোগ এই সূত্রে বলে দিচ্ছে। যখনই কোথাও সুখ দেখবে, একজন লোক আনন্দে আছে, সে যেই হোক, সেখানে তোমার ভাব হবে মৈত্রী। পাশের বাড়ির পরিবারের সাথে আমার মনোমালিন্য, কথাও বন্ধ। এখন তার মেয়ের বিয়ে লেগেছে, পাশের বাড়িতে আনন্দের দিন এসেছে। এই সময় তার আনন্দ দেখে আমি যদি ভেতরে জ্বলতে থাকি তাহলে আমার যে মানসিক ও শারীরিক যেটুকু সুখ শান্তি ছিল সেগুলো তো শেষ হয়ে যাবেই আর তার সাথে সাথে আরও অনেক ধরণের অশান্তি এসে আমাকে গভীর সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে। কিন্তু আমি যদি নিজেকে যোগী বলে মনে করি বা আমি যদি যোগী হতে চাই তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে যেখানেই কোথাও কারুর সুখ-শান্তি-আনন্দ দেখব সেখানেই আমার মনের মধ্যে বন্ধু ভাব, মৈত্রী ভাব নিয়ে আসতে হবে। যোগী মানে তাই। যোগী মানে কারুর প্রতি তার আর বিরূপ ভাব থাকবে না। যোগীর দৃষ্টি সমান থাকতে পারে, কিন্তু জগতে কি সবাই সমান? কক্ষণই নয়। তাই যিনি যোগী হতে চাইছেন তিনি যখনই কোথাও শুভ, ভালো, সুখ বা আনন্দ দেখবেন তখন সাথে সাথে মৈত্রীভাব – বাঃ বাঃ, খুব ভালো, এইতো চাই, আরো হোক এই রকম। বন্ধু বন্ধুকে যেভাবে আহ্বাদিত হয়ে নিজের উৎফুল্ল ভাব প্রকাশ করে ঠিক সেই রকম ভাব যোগীর মনের মধ্যেও হতে হবে। পতঞ্জলি বলছেন, যদি তুমি তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও, জপ-ধ্যান করা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় বা মনকে একাগ্রতা করার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে তাহলে এই অভ্যাস করে যাও, যেখানেই সুখ দেখবে সেখানেই মৈত্রী ভাব নিয়ে আসতে হবে। তোমার শত্রু, তোমার কোন প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে যদি কোন সুখ দেখ সেখানে তুমি সব ভুলে মৈত্রী ভাব নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করো।

তারপরে বলছেন – ঐ সুখের পাশেই যদি কোথাও দুঃখ দেখ তখন করুণার ভাব প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের কি হয়? এর ঠিক উল্টোটাই হয়। যখন পাড়া-প্রতিবেশীর ভালো কিছু হয় তখন গা জ্বালা করে আর যখন খারাপ কিছু হয় তখন খুশীতে আর আনন্দে ডগমগ হয়ে যাই। আসলে আমাদের নিজের ভালোতে যত না আনন্দ হয় অপরের দুঃখ দেখলে তার থেকে বেশী আনন্দ হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীই যোগী আর ভোগীর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। পতঞ্জলি এটাকে আটকে দিয়ে বলছেন, অপরের দুঃখ দেখলে, সে তোমার শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে করুণার ভাব নিয়ে আসতে হবে, সান্ত্বনা দিয়ে তার দুঃখকে লাঘব করার চেষ্টায় প্রযত্ন হতে হবে। কারুর সাথে আমার মতের মিল হয়তো নাও থাকতে পারে, কিন্তু তার যদি কোন দুঃখ বা বিপদ এসে পড়ে তখন তাকে গিয়ে বলতে হবে, কোন চিন্তা নেই আমি আপনার পাশে আছি। ব্রাসুর আর ইন্দের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। ইন্দের হাত থেকে বজ্র পড়ে গেছে। ব্রাসুর ইচ্ছে করলে সেখানেই ইন্দের খেলা শেষ করে দিতে পারতো। ইন্দ্র তখন ভয়ে কাঁপছে। ব্রাসুর ইন্দ্রকে বলছে, আমি তোমাকে খালি হাতে মারবো না, তুমি তোমার বজ্র তুলে নাও। অর্থাৎ ইন্দ্র এখন দুঃখে পড়ে গেছে, ব্রাসুর ইন্দ্রকে করুণার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ইন্দ্র বজ্র তুলে নিল। আবার লড়াই শুরু হল। তাও ইন্দ্র কিছু করতে পারলো না। তখন বাধ্য হয়ে ইন্দ্রকে ব্রাসুরের সাথে সন্ধি করতে হল। এটাই হল শক্তি। মূল কথা, শত্রুও যদি দুঃখে পড়ে যায় তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কোন ভিখারীকেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে নেই। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠিরকে ঋষি বলছেন – তোমার কাছে কোন জিনিষ না থাকতে পারে কিন্তু দুটো মিষ্টি কথাতো আছে। একদিন আমি হয়তো প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করতে পারলাম না, আমার পরিচিত আরেকজন প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করল, দুটো লজেন্সও পেলো আর সে এসে যখন বলবে – আজকে আমার কি ভালো প্রেসিডেন্ট মহারাজের দর্শন হয়েছে, তিনি নিজে কৃপা করে আমাকে একটা লজেন্স প্রসাদ দিলেন। তখন আমিও নিজেকে সুখী মনে করব – আজ আমার দর্শন হলো না, ঠিক আছে, আরে আপনারতো হয়েছে তাতেই আমি খুব খুশী মনে করছি নিজেকে। এই মনোভাব যেই এসে গেলো তখন আর চিন্তা বিক্ষিপ্ত হবে না। আর যদি মনে করতে থাকি ‘আজ আমি কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম আমার গুরুদর্শন হলো না, আর এর কেমন সুন্দর দর্শন হয়েছে’ – এই ধরনের ভাবনার উদয় হলেই কিন্তু চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয় যেখানেই কারুর ভালো কিছু দেখবে সেখানেই যদি মৈত্রীভাব নিয়ে আসা হয় তখন আর চিন্তে কোন রকম বিক্ষিপ্ত উৎপন্ন হবে না।

ঠিক সেই রকম যেখানে কারুর কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট নজরে আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে করুণার ভাব নিয়ে আসতে হবে। আবার যেখানেই দেখবেন শুভ কিছু হচ্ছে, কোন পূণ্য কাজ হচ্ছে তখন সেখানে হবে মুদিত। আগে ছিল মৈত্রী মানে sense of friendliness কিন্তু এখানে হবে মুদিত। বন্যা হয়ে গেছে, লোকেদের খুব কষ্ট হচ্ছে, এই কষ্ট দেখে আমার করুণা আসছে, তারপরেই একদল লোক বন্যাপীড়িত লোকেদের সেবা ও ত্রাণ কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ত্রাণকার্য দেখে আমার মনটা খুব খুশীতে ভরে গেল, এই ভাবকেই বলছেন মুদিত।

কিন্তু আমরা এই সমাজে যখন কাজকর্মের খাতিরে ঘোরাঘুরি করি আমাদের চোখে অশুভ জিনিষটাই বেশি নজরে পড়ে – এখানে গুণ্ডামী হচ্ছে, ওখানে মদ খেয়ে মাতলামো করছে, এ ঘুষ নিচ্ছে, ও চুরি করছে, এ ওকে ছুরি মারছে, ছিনতাই, নারীহরণ লেগেই আছে – এখানে বলা হচ্ছে উপেক্ষার ভাব অবলম্বন করতে। বেলুড় মঠে এসে ঠাকুর দর্শন করল, একজন ভালো সাধুকে দর্শন করে খুব খুশি হয়ে গেল। তারপর বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে জিটি রোডে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দেখে একজন মদ খেয়ে মাতলামো করছে। আমি যদি যোগী হই তাহলে মনে করতে হবে এই যে লোকটি মদ খেয়ে মাতলামো করছে, এগুলো কিছুই নয়, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের গন্তব্যস্থলে চলে যাব। আমরা সাধারণত কি করি? এই সামান্য ঘটনাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে চলি – ‘ছিঃ ছিঃ মঠের সামনে যা শুরু হয়েছে না, মঠটাকে আর পবিত্র রাখতে দিলো না, সমাজটা উচ্ছল্লে গেছে’ এই সব বলে মনে মনে এই ভেবে খুব একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে সবার সামনে আমি কিছু একটা বলে বেশ

হিরো হয়ে গেলাম। আসলে তা নয়, আমাদের মনেই রয়েছে নানা ধরনের নোংরামো, এই নোংরামো গুলো কিভাবে বেরোবে? এইভাবে আলোচনার মাধ্যমে নোংরা আবর্জনা গুলো বেরিয়ে আসে। এটাকে বলা হয় আত্মদ, এইভাবে আমরা অশুভ জিনিষগুলিকে আত্মদন করে থাকি। যে জিনিষকে নিয়ে যে যত বেশি আলোচনা করবে বুঝতে হবে কোনভাবে এটার প্রতি সে তত আসক্ত হয়ে আছে। রাজযোগ তাই পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে – যদি তুমি দেখ এই ঘটনা সত্যিই অশুভ তখন সোজাসুজি সেটাকে উপেক্ষা করে ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে এস। অপরের নিন্দা করা, অপরের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা, অন্যের কার্যকলাপ নিয়ে অবজ্ঞা করা এগুলো সবই অপূণ্য কর্ম। যা কিছু অপূণ্য, অশুভ জিনিষ, এগুলো আলোচনা করাতে দূরে, মাথাতেও আসতে দেওয়া উচিত নয়। এটাই হল উপেক্ষা। কিন্তু যেখানে দায়িত্ব এসে যায় সেখানে আবার আলাদা প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। দায়িত্ব আলাদা জিনিষ। এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলা হচ্ছে না। যেখানে দায়িত্ব নেই সেখানে উপেক্ষা। যেমন আপনার ছেলে বা আপনার বন্ধুর ছেলে মদ খেয়ে বেড়াচ্ছে, রাষ্ট্রায় মেয়েদের প্রতি অশালীন মন্তব্য করছে, এগুলো অপূণ্য। এখানে উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না। ধরে এমন কড়া শাসন করতে হবে যে জীবনে আর এই রকম করার সাহস যাতে না পায়। এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। উপেক্ষা হল যেখানে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এই চারটির মধ্যে কোনটাতেই কর্তব্য নিয়ে কোন আলোচনা করা হচ্ছে না। যদি কেউ সত্যিকারের যোগী হতে চায় তাহলে এই চারটিকে – মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষা দিয়ে সারা জগৎকে জয় করে নিতে পারবে।

যদি কেউ যোগী নাও হতে চায় কিন্তু শান্তিপূর্ণ বা একটা মহৎ জীবন যাপন করতে চাইছে, তখনও এই চারটিকে জীবনে ঠিক ঠিক ভাবে যদি তিনি পালন করে তাহলেই তার সমগ্র জীবনের পটভূমি নাটকীয় ভাবে একটা ইতিবাচকে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যখনই কোন কিছু আলোচনা করতে যাচ্ছে, কোন একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যাচ্ছে, এই যে প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে যাচ্ছে এটাই হল তার চিন্তাবৃত্তি। যখন মনের কোন প্রতিক্রিয়া অপরের প্রতি ব্যক্ত করতে যাবে তখন ব্যক্ত করার আগে খুব ভালো করে বিচার করতে হবে এই প্রতিক্রিয়া যেটা আমার মধ্যে হচ্ছে এটা এই চারটির কোনটাতে পড়ছে – এই প্রতিক্রিয়াটা জাগতিক সুখের অন্তর্গত নাকি কোন দুঃখের মধ্যে পড়ছে অথবা এটা কি পূণ্যের মধ্যে নাকি অপূণ্যের মধ্যে পড়ছে। সুখের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? আমাদের মধ্যে যে হিংসা বা ঈর্ষার বৃত্তি আছে সেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমার অপছন্দের কারণে আনন্দ হচ্ছে আমি গিয়ে তার আনন্দে তাকে বাহাবা দিয়ে উৎসাহিত করলাম, এখানে আমি কিন্তু আমার ঈর্ষা বৃত্তিকে চাপা দিয়ে দিলাম। সে যখন কোন দুঃখে পড়ে গেল তখন তার কাছে গিয়ে আমিও নিজের দুঃখ প্রকাশ করলাম এখানেও আমার ঈর্ষা বৃত্তি চাপা পড়ে গেল। সে যখন কোন অপূণ্য করছে তখন আমার চোখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে উপেক্ষা করে গেলাম। বন্ধুর সঙ্গে যে ব্যবহার শত্রুর সাথেও একই ব্যবহার হবে। যেখানে কর্তব্য আছে সেখানে আলাদা হবে। কর্তব্যের বাইরে আর সব জায়গায় এই চার ধরনের প্রতিক্রিয়া – মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষা নিয়ে আসতে হবে।

যোগাচার্য বলছেন তুমি যদি ঠিক ঠিক এই চারটিকে অনুশীলন কর তাহলেও তোমার জীবন পুরোপুরি পাল্টে যাবে। ছয় মাসও যদি এগুলোকে কেউ অনুশীলন করে তার ব্যক্তিত্ব এমন স্তরে চলে যাবে যে, সে চাইলেও কারণের প্রতি তার হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণার ভাব আসবে না। হিংসা মানে, মনে মনে চাইছে তার পতন হোক। পতন হোক মানে, সে হয়ত একটা উচ্চ পদে আছে সেখান থেকে তার পতন হয়ে যাক। উচ্চ পদে আছে মানেই সে সুখে আছে। কিন্তু পতঞ্জলি বলছেন যেখানে সুখ সেখানে তোমাকে মৈত্রী ভাব নিয়ে আসতে হবে। ঘুম না হওয়া, মানসিক উদ্বেগ, বদহজম, সবার পেছনে আছে হিংসা, অপরের ভালো দেখে মনে জ্বালা ধরছে। শুধু শত্রু বা অপছন্দ লোকের ভালো কিছুতেই যে হিংসা হবে তাই নয়, নিজের খুব প্রিয় বন্ধু তারও যদি হঠাৎ কিছু ভালো হয়ে যায় তখন সেটা সহ্য হবে না। অপরের সুখ আমাদের কখনই সহ্য হয় না, ঠিক তেমনি অপরের দুঃখতেও মনে হয়, ওর হয়েছে ভাগ্যিস আমার হয়নি।

মৈত্রী-করণা-মুদিত-উপেক্ষার এই চারটির অনুশীলন করলে কি হয়? বলছেন *চিত্তপ্রসাদনম্* - মনের শান্তি হয়ে যায়। যাদের দেখেই মনে হয় মনের মধ্যে অশান্তি রয়েছে তাদেরকে বোঝাতে হবে – ভাই তুমি সুখ-দুঃখ-পূণ্য-অপূণ্য এই চারটি অবস্থায় যথাক্রমে মৈত্রী-করণা-মুদিত-উপেক্ষা অনুশীলন কর। যারই ভালো হচ্ছে তুমি আনন্দ কর, যেখানে দুঃখ হচ্ছে সেখানে করুণা প্রকাশ কর, যেখানেই শুভ বা পূণ্য কিছু হচ্ছে সেখানে গিয়ে তুমি বাহবা দিয়ে উৎসাহিত কর আর যেখানে অশুভ কিছু দেখছ সেখান থেকে সরে এসো। এই চারটেকে জীবনের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে অনুশীলন করে একটি দৃষ্টান্তপূর্ণ জীবন, একটি সম্মানিত জীবন আর শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন কর। এগুলো করলে প্রথমেই আমাদের কথায় কথায় রেগে যাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে আমার যে চৈতন্য সত্তা, আমি আমার চৈতন্য সত্তাতে ধীরে ধীরে অবস্থান করতে চাইছি। যারা এগুলোর অনুশীলন করছে না তারা ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের স্তরে পড়ে আছে, মনের স্তরেও আসতে পারছে না। এদের জীবনটা প্রবাহেই চলে যাচ্ছে। প্রবাহে চলা মানে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে, ইন্দ্রিয় তাকে যখন যেদিকে সুযোগ পাচ্ছে সেদিকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে আপনি এক ধাপ উপরে চলে এসেছেন, কারণ আপনি এখন মনের স্তরে অবস্থান করছেন। মনের স্তর থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে চাওয়া মানে, আপনি এখন চৈতন্য সত্তার স্তরে থাকতে চাইছেন। এখন আপনার সঙ্গে আর কারুর তুলনা করাই চলে না। যারা দুটো টাকার জন্য রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে, বাজারের সজীওয়ালার সাথে ঝগড়া করে এরা হল প্রকৃতির রাজ্যের দাস, এদের সাথে আপনার আর তুলনাই চলে না। কারণ আপনি এখন হলেন প্রকৃতির রাজ্যের এলাকার রাজা। এরা আপনারও দাস নয়, এরা প্রকৃতির দাস, যে প্রকৃতি আপনার দাসী। আপনি বলবেন, আমি তো এখনও চৈতন্য সত্তাতে পৌঁছতে পারিনি। ঠিকই, এখনও চৈতন্য সত্তাতে পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু মনের স্তরে তো চলে এসেছেন, সেখান থেকে আপনি আরেকটা ধাপ এগোতে চাইছেন। যে নিজেকে রাজা বলে জানতে চাইছে সে তার নিজের দাসীর এক সামান্য গোলামের প্রতি কি নিয়ে ঈর্ষা করতে যাবে! একটা হাতি একটা পিঁপড়ের সাথে ঝগড়া করতে গেলে যে অবস্থা হবে আপনার সাথে প্রকৃতির রাজ্যের বাসিন্দাদের ঝগড়াও সেই রকম হবে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – একটা ব্যাঙের একটা টাকা হয়েছিল। একটা হাতি সেই ব্যাঙের গর্তকে ডিঙিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাঙটা রেগে গিয়ে হাতিকে লাথি দেখিয়ে বলছে ‘তোর এত বড় আস্পর্শ আমার বাড়ি ডিঙিয়ে যাচ্ছিস’! হাতি যদি এখন ব্যাঙের সাথে ঝগড়া করতে নেমে পড়ে তাতে হলোটা কী! আমরা তো সারাদিন তাই করে চলেছি।

আমাদের সমস্ত শাস্ত্র বলছে তুমি হলে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যার দাসী হল সমগ্র প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির দাসী হল মন, সেই মনের দাস আবার ইন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়ের খাদ্য হল জগৎ, সেই জগতকে সবাই রমণ করে বেড়াচ্ছে। আপনার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, বন্ধু, আত্মীয় এরা সবাই তো তাই করে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে গিয়ে আপনি লড়াই করতে নেমে পড়ছেন। যোগ এই একটা পথ বলে দিল, যে পথটা আমাদের পক্ষে খুব সহজ পথ। ভক্তি মার্গ বা বেদান্তে আমরা অনেক রকম কথা বলি, যেমন গীতায় ভগবান বলছেন *সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়ঃ*, এখানে এই তেত্রিশ নম্বরের ব্যাখ্যাতে একই কথা বলা হচ্ছে। তেমনি *সম্বশ্টৌ সততং যোগী*, গীতার এই একই কথা এখানেও এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে করা হয়েছে। গীতাতে যে যে শ্লোকে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে বলা হচ্ছে, সেগুলোকে একত্র করে জাল দিতে দিতে এই সূত্রটাই বেরিয়ে আসবে। সিদ্ধ পুরুষদের এটাই স্বভাব, সাধকরা এটাই অভ্যাস করেন। আগেকার দিনে যাঁরা সমাজে অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদের স্বভাবেও এই চারটে ভাব থাকত।

মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রথম হল জপ, দ্বিতীয় ধাপ বিবেক বিচার। বিবেক বিচার মানে বিপরীত ভাবনার অভ্যাস, উত্তাল চেউ যেটা মনের মধ্যে উঠছে ঐটাকে আরেকটা বিপরীত চেউ দিয়ে আটকে দেওয়া। এতেও মন অনেক শান্ত হয়ে যায়। তারপর বলছেন *প্রচ্ছদন-বিধারণাত্যাং বা প্রাণস্য।।৩৪।।* মন একাগ্র করার অনেক উপায়ের কথা বলা হচ্ছে।

প্রথমে বললেন জপ ও অর্থ চিন্তন, দ্বিতীয় সুখ, দুঃখ, পূণ্য ও অপূণ্যে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষার ভাব অবলম্বন করা আর এই সূত্রে তৃতীয় উপায়ের কথা বলতে গিয়ে প্রাণায়ামের কথা বলছেন। প্রচ্ছদন মানে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার পর নিঃশ্বাসকে ওখানে আটকে রাখা। অথবা বিধারণাভ্যান, নিঃশ্বাস ভেতরে নিয়ে প্রাণকে ধরে রাখা। যোগের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলে কুম্ভক। কুম্ভক দুই প্রকার, নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর বায়ুকে ধরে রাখা আর নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বায়ুকে ধরে রাখা। ইদানিং প্রাণায়াম নিয়ে যে ভাবে সবাই মেতে উঠেছে, সেই ধরনের কোন প্রাণায়ামের কথা কিন্তু রাজযোগ বলছে না আর তার চেয়ে বড় ব্যাপার হল পতঞ্জলি রাজযোগে প্রাণায়ামের উপরে খুবই কম গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ প্রাণায়ামাদি করার জন্য যে ধরনের শরীর দরকার সেই শরীর আমাদের নেই। বয়স যাদের অল্প এবং যারা অত্যন্ত পবিত্র জীবন যাপন করছে, যারা পুরোপুরি সাত্ত্বিক আহার করে, তাদের জন্যই প্রাণায়াম। আর উপযুক্ত গুরুর কাছে থেকে প্রাণায়ামাদির অনুশীলন করতে হয়। পরের দিকে এই যোগ থেকেই একটা আলাদা শাখা বেরিয়ে নিজেদের হঠযোগী বলে পরিচয় দিতে শুরু করল। হঠযোগীরা পরে আসন আর প্রাণায়ামের উপর খুব বেশি মাত্রায় জোর দিল। কিন্তু রাজযোগে এই দুটোকে সামান্য একটু শুধু ছুঁয়ে গেছে মাত্র, বেশি আলোকপাত করা হয়নি। রাজযোগের মূল লক্ষ্য চিন্তবৃত্তি নিরোধ করা আর প্রাণায়াম হল এই চিন্তবৃত্তি নিরোধ করার অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটা উপায় মাত্র, এছাড়া রাজযোগে প্রাণায়ামের অন্য কোন ভূমিকাই নেই। প্রাণায়ামের মূল কথা, জগতে যা কিছু হচ্ছে সব প্রাণ থেকেই হচ্ছে, এখন এই প্রাণ শক্তিকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত করার কৌশলটা রপ্ত করা যায় তাহলে মনকেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সাধারণদের জন্য কিছু সহজ প্রাণায়াম আছে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হল অনিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করা। যত সময় ধরে নিঃশ্বাস ভেতরে নেওয়া হচ্ছে তত সময় ধরে নিঃশ্বাস বাইরে ফেলা, এতেও মন অনেক শান্ত হয়ে যায়।

আমাদের যা কিছুই আলোচনা চলছে এর সব কিছুই যারা যোগী বা যারা যোগী হতে চান তাদের জন্যই। কিন্তু আমরা বেশির ভাগই হয় ভোগী নয়তো রোগী, এখানে আমরা কেউই যোগী নই। তাই আমাদের সব কিছুই করা প্রয়োজন আছে, জপ করাও দরকার, একটু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার, বিবেক-বিচারের দ্বারা বিপরীত ভাবনা আনাও দরকার। সব থেকে বড় কথা এটাই যে আমাদের বর্তমান শরীরের যে রকম গঠন, এই শরীর মোটেই আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য উপযুক্ত নয়। বেশির ভাগের লোকের শরীরে রয়েছে অত্যধিক মেদ, আর তা নাহলে শীর্ণকায়, শরীরে একটুও মাংস নেই। যোগীর শরীর হবে একেবারেই মেদশূন্য, আবার একেবারে রোগাও নয়, চাবুকের মত শরীর, ইস্পাতের মত স্নায়ু হতে হবে, তিনি যে কোন যোগীই হোন না কেন, ভক্তিয়োগ, রাজযোগ, বা জ্ঞানীই বলুন আর কর্মযোগই বলুন যোগীর শরীরে একটা আলাদা সৌন্দর্য সৌষ্ঠব থাকবে। তবে জপধ্যান করলে, সাধন-ভজন করলে শরীরের গঠনটাই পুরো পাল্টে যায়। প্রাণায়াম করলে শরীর আরো সুন্দর এবং রোগমুক্ত হয়ে যায়। স্বামীজীও স্পষ্ট করে বলছেন যে, রাজযোগে প্রাণায়াম অভ্যাস শুরু করলে সাধকের শরীরের অনেক কিছু পরিবর্তন হতে থাকে এবং যোগীর চেহারা কমনীয়তা ও ব্যক্তিতে আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি হয়। কারণ মন আর শরীর এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত, মন শরীরকে ঠিক করে, শরীরও মনকে সতেজ রাখে। মন যদি পশু স্বভাবে পড়ে থাকে তখন তার শরীরটাও অসুরের মত হবে। জপধ্যান, বিবেক-বিচার আর প্রাণায়ামের মাধ্যমে মন যেমন যেমন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে শরীরের গঠনটাও আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকবে। মৈত্রী করুণা যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি যোগীদের কাছে প্রাণায়ামও খুব মূল্যবান। প্রাণায়াম অশান্ত মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে। সহজ প্রাণায়াম সবাই করতে পারে, যেমন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় মনে মনে গভীর ভাবে ওঁ উচ্চারণ করে নিঃশ্বাস নেওয়া হল আবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় ওই একই সময় ধরে গভীর ভাবে মনে মনে ওঁ উচ্চারণ করতে করতে নিঃশ্বাস ছাড়া। এইভাবে কিছু সময় ধরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিলে মনও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

এই সূত্রের উপর স্বামীজী খুব সুন্দর ভাষ্য দিয়েছেন। এখানে তিনি নিঃশ্বাস না বলে বলছেন প্রাণ। প্রাণ আর নিঃশ্বাসের পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। নিঃশ্বাস তো আসলে বাতাস, বাতাস একবার ভেতরে টেনে নেওয়া হচ্ছে আবার বাতাস বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। বাতাস দিয়ে কিছু হয় না, বাতাসের

সাথে প্রাণ শক্তি আসছে আর প্রাণ শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রাণের উপর স্বামীজীর অনেক মূল্যবান মন্তব্য আছে। আকাশ আর প্রাণের ধারণা ঋকবেদেই প্রথম এসেছে। আকাশ মানে জড়, জড় মানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা, প্রকৃতি, মহৎএর বর্ণনায় যাকে তন্মাত্রার অবস্থায় বলা হয়েছে। কিন্তু বেদে এই তন্মাত্রার কোন ধারণা নেই। বেদে বলা হচ্ছে *আনীতবাদম্*, আকাশ পার্টিকেলস্ আছে, এই পার্টিকেলস্ বিজ্ঞানের ইলেক্ট্রন প্রোটন নয়। এই ব্যাপারে আমাদের ঋষিদের মডেল পুরো আলাদা, বিজ্ঞানের মডেলের সঙ্গে এনাদের মডেলকে মেলানো যাবে না। *আনীতবাদম্* মানে জড় আছে আর তার সাথে শক্তি আছে, কোন একটা জায়গায় জড় আর শক্তি আলাদা হয়ে যায়। জড় হল আকাশ আর শক্তি হল প্রাণ। এই প্রাণ যখন আকাশের উপর কাজ করে তখনই সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আমাদের শরীর পুরো আকাশ তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত। প্রাণ যখন এই শরীরের ভেতরে যাচ্ছে তখন প্রাণ এই শরীরের উপর কাজ করতে থাকে। আমাদের শরীর চালানোর জন্য আকাশ আর প্রাণ দুটোরই ভূমিকা আছে। যখন আমরা বলি আমার শরীর খারাপ, শরীরের কোন অঙ্গে ব্যাথা অনুভব হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে আকাশে কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। আকাশ বলতে কিন্তু এখানে জড় পদার্থকে বলা হচ্ছে, আমাদের শরীরের হাড়, স্নায়ু, পেশী, মাংস, এগুলো সবই আকাশ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। আকাশে মানে আমাদের শরীরে যদি কোন গোলমাল হয় আকাশ দিয়ে এই গোলমাল ঠিক করা যাবে না, তখন প্রাণ দিয়ে ঠিক করতে হবে। যোগীরা বলছেন নিঃশ্বাসের সাথে শরীরের ভেতরে প্রাণশক্তি যাচ্ছে। নিঃশ্বাস যখন ছাড়া হচ্ছে তখন প্রাণশক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণে প্রাণ শরীরের উপর কাজ করে নিচ্ছে।

এই প্রাণকে শরীরের যে কোন অঙ্গে প্রবাহিত করে দেওয়া যায়। শরীরের কোন অঙ্গে যখন ব্যাথা অনুভব হয় তখন মন সেই অঙ্গের উপরেই পড়ে থাকে, মন ওখানে পড়ে আছে মানে প্রাণ নিজে থেকেই সেখানে বেশী যাচ্ছে। প্রাণ শক্তি যখন ব্যাথার অঙ্গে প্রবাহিত হয় তখন সেই অঙ্গকে নিরাময় করতে শুরু করে দেয়। যোগীদের শরীরের কোন অঙ্গে ব্যাধি হলে ওনারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন যে প্রাণশক্তি ওই অঙ্গে প্রবাহিত করে দিয়ে সেই অঙ্গকে নিরাময় করে নেন। যে কোন ওষুধের যে প্রয়োগ করা হয় সেখানেও এই একই ব্যাপার কাজ করছে। ওষুধ ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গে প্রাণের ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। সেই অঙ্গ যখন প্রাণকে বেশী করে টানতে থাকে তখন ব্যাধিটা কমতে শুরু করে। ব্রহ্মাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটা সামান্য তীরকে বা একটা ঘাসের টুকরোকে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্র দিয়ে অভিষিক্ত করে দিলে সেই তীর বা ঘাসের টুকরোটাই ব্রহ্মাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। শক্তির ব্যাপারে আমাদের ঋষিদের যে ধারণা তাতে বলা হয় শক্তিকে গ্রহণ করার জন্য একটা মাধ্যম প্রয়োজন। যেমন খাওয়া-দাওয়া করা হচ্ছে, খাদ্যের মাধ্যমেও প্রাণশক্তি ভেতরে যাচ্ছে। আবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও প্রাণশক্তি ভেতরে আসছে। এই যে শক্তি ভেতরে আসছে এরও একটা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়। প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ভালো প্রক্রিয়া হল প্রাণায়াম, নিঃশ্বাসকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া, ছেড়ে দিয়ে কুম্ভক করা। আবার নিঃশ্বাস টেনে বায়ুকে ভেতরে আটকে রেখে কুম্ভক করা। আমাদের এগুলো কোন কিছুই দরকার হয় না, তবে ব্যাপারটা জেনে রাখা ভালো। পতঞ্জলি এগুলোকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি, উনি এত বিকল্প উপায় দিয়ে রেখেছেন যে, এই ধরণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করাটা একটা ছোট্ট বিকল্প উপায়। তবে পরের দিকে যোগের কোন কোন শাখার যোগের শিক্ষকরা এই প্রাণায়ামকেই একটা পুরো বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। পতঞ্জলির কাছে প্রাণায়াম কোন বিশেষ গুরুত্ব পায়নি, কোন গুরুত্ব নেই এই কারণে যে যেমন তিনি বলছেন জপ ও তার অর্থ ভাবনা করলেই হবে বা মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষার অনুশীলন করলেও তোমার হয়ে যাবে। এগুলোর মধ্যে কোন একটা করলেই তোমার মন একাগ্র হয়ে যাবে। আমাদের মাথায় ঢুকে আছে যোগ মানেই প্রাণায়াম, কিন্তু পতঞ্জলির কাছে যোগ মানে শুধু প্রাণায়াম নয়। পতঞ্জলির কাছে একটাই উদ্দেশ্য, কী করে তোমার মনের বৃত্তিকে নিরোধ করবে। মনের বৃত্তিকে নিরোধ করার জন্য তিনি অনেকগুলো উপায় বলে দিচ্ছেন, যার মধ্যে প্রাণায়ামও একটি উপায়।

তন্ত্র মতে বলা হয় আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ি আছে, প্রাণায়ামের শক্তি এই তিনটে নাড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। ইংরাজী আট যদি এভাবে ০০ আড়াআড়ি

পর পর উপর নীচ লেখা হয়, তখন যে আকৃতি দাঁড়াবে আমাদের মেরুদণ্ডের গঠনও ঠিক এই ভাবে তৈরী। এর মধ্য দিয়ে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি মূলাধার থেকে উঠে মাথায় চলে গেছে, আর এই দুটো নাড়ির মাঝখান দিয়ে সুষুন্না নাড়িও উপরে উঠে গেছে। যোগীরা এই রকমটি দেখেছেন। আমাদের শরীর দিয়ে যত রকম কাজকর্ম করছি এর চেতনাটা থাকে মূলাধারে। একেবারে নীচের দিকে মূলাধারের বাসস্থান। বলা হয় এই রকম মোট সাতটি বাসস্থান আছে। এগুলো কিছুটা তন্ত্র থেকে এসেছে আর এখন যোগও এই জিনিষগুলোকে পুরোপুরি মেনে চলে। বলা হয় লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি এই তিনটে মিলিয়ে মূলাধার। যে প্রাণিক শক্তিতে মানুষের জীবন চলছে সেই প্রাণশক্তি নীচের দিকে থাকে। প্রাণায়ামাদির সাহায্যে যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় তখন আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থল নীচে যেখানে মূলাধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে সেখান থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে।

সাধারণ সময় সমস্ত মানুষের প্রাণের ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে যে জীবন চলছে সেটা ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুটো নাড়ির মাঝখান দিয়ে চলতে থাকে। একটা বাম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আরেকটি ডান দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। যোগীরা এই কথা বলেন, আর ঠাকুরও বলছেন যোগীরা এগুলো দেখতে পান। কিন্তু মাঝখানে সুষুন্না নামে যে নাড়ি আছে সেটি সব সময় নিষ্ক্রিয় থাকে। যখন জপ-ধ্যান বা যোগ সাধনা করা হয় তখন এই সুষুন্নার দ্বারটা খুলতে শুরু করে। যোগীরা এটিকে একটা সাপের সাথে বর্ণনা করেন। সাপটি কি রকম? সাপ তার লেজকে নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে মূলাধারে গুয়ে আছে, এটাকেই যোগীরা বলছেন কুণ্ডলিনী শক্তি। যখন প্রাণায়ামাদি সহ সাধনা করতে থাকে তখন সাপটা তার মুখ থেকে লেজটা খুলতে শুরু করে। তারপর একটা সময় লেজটাকে পুরোপুরি মুখ থেকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিয়ে সে এবার সুষুন্না নাড়ির পথ ধরে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এখন কেউ যদি মেরুদণ্ড কেটে এনে মাইক্রোস্কোপে দেখে সেখানে সে ইড়া পিঙ্গলাকে কখনই দেখতে পারবে না। তার মানে এগুলো এতই সূক্ষ্ম যে মাইক্রোস্কোপেও দেখা যাবে না। সেই অতি সূক্ষ্ম সুষুন্না নাড়ির মধ্যে আবার একটা সাপ, সেই সাপ তাহলে কত সূক্ষ্ম হবে আমরা কল্পনাও করতে পারবো না।

আসলে এই সাপ হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি শক্তি। এই শক্তিকেই যোগীরা বলছেন একটা দড়ির মত মূলাধারে লেজ আর মুখ এক করে পড়ে আছে। এরপর লেজ আর মুখ যখন খুলে গেল তখন দড়িটাকে উপরের দিকে টানতে শুরু করে। দড়ি টানা মানে চেতনার কেন্দ্র আস্তে আস্তে উপরের দিকে চলে আসা। যেমন যেমন চেতনার স্তর উপরের দিকে উঠতে থাকে তেমন তেমন জগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে থাকে। সপ্তভূমি, কুণ্ডলিনী, সর্প এই ধারণাগুলোর মধ্যে যোগ ও তন্ত্রে সব মিলে মিশে রয়েছে। ঠাকুর কিন্তু বারবার সপ্তভূমি, কুণ্ডলিনী এগুলোর উপর জোর দিয়ে বলছেন ব্যাপারটা এই রকমই হয়। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ মানে ওই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হওয়া। হৃদয় হল চতুর্থ বাসস্থান। হৃদয়ে যখন কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উঠে আসে তখন তার চেতনার স্তর অনেক পাল্টে যায়। সাধক তখন জগৎকে জ্যোতি রূপে দেখে। আর তার চিন্তা ভাবনাগুলোও অনেক সূক্ষ্ম স্তরে চলে যায়। তিনি যদি কবি হন তখন তার কবিতার মধ্যে অন্য ধরনের গভীর ভাব ফুটে ওঠে। যাঁরা খুব বড় কবি, তাঁদের হৃদয়ে কুণ্ডলিনী শক্তি এসে যায়। হৃদয়ে কুণ্ডলিনী শক্তি না এলে কিন্তু মহৎ রচনার সৃষ্টি হবে না। কুণ্ডলিনী শক্তি আরও উপরে উঠে এলে তখন অন্য রকম হবে।

যোগ কিন্তু সরাসরি কুণ্ডলিনী নিয়ে কিছু বলছে না। এটা সহজ ভাবে বোঝা যায়, সেই সময় মনে যত বৃত্তি উঠবে সব বৃত্তিকে সে এক রকম দেখবে। বৃত্তির সংখ্যা যেমন যেমন কমতে শুরু করবে তেমন তেমন স্বাভাবিক ভাবে জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে থাকবে। আমি এখন আপনাদের সবাইকে এক সঙ্গে দেখছি, আপনাদেরও আমি এক রকম দেখছি। কাল যদি বিশেষ কাজে আপনাকে আমার দরকার পড়ে, আর তার জন্য আমি আপনার অফিসে দেখা করতে গেলাম, তখন আমি আপনাকে অন্য রকম দেখব। ঠিক তেমনি আমার মনে যখন হাজার রকম বৃত্তি, হাজার রকম চিন্তা থাকবে তখন এই বৃত্তি ও চিন্তা দিয়ে জগৎকে অন্য রকম দেখব। যখন চিন্তা ভাবনা অনেক কমে যাবে তখন জগৎকে আরও স্পষ্ট ও অন্য রকম দেখব। যার জন্য যে মানুষ এখন একটুতেই রেগে যাচ্ছে,

তার মানে সে বস্তুকে ঠিক ভাবে দেখতে পারছে না, যখন দুঃখ কষ্টে থাকে তখন জগৎকে সে ঠিক ভাবে দেখতে পায় না। যোগী সাধনা করে করে নিজে নিরপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরও এই কথা বলছেন আর তন্ত্র তো এই ব্যাপারে একেবারে দৃঢ়। তাঁরা বলেন যোগীরা ধ্যানের গভীরে পরিষ্কার দেখতে পান কুণ্ডলীনি শক্তি, যার আকৃতি একটা সর্পের মত, একটা আলোর মত আস্তে আস্তে সুষুন্না নাড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে।

কিন্তু যেখানে সেখানে এই কুণ্ডলীনি শক্তি থাকতে পারবে না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বলে কোন পার্টিকেলস্ হয় এখানে থাকবে তা নাহলে সেখানে থাকবে, মাঝামাঝি কোন জায়গায় থাকবে না, কুলকুণ্ডলিনীও তাই। হয় সে কুণ্ডলিনী পাকিয়ে নীচে পড়ে থাকবে আর তা নাহলে ওর মুখ চতুর্থ ভূমিতে এসে যাবে। সেখান থেকে উঠে পঞ্চম আর পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ ভূমিতে উঠে আসবে। সেখান থেকে চলে যাবে সপ্তমে। সপ্তমে কুলকুণ্ডলিনী উঠে এলে কী হয় আর বলা যাবে না। চতুর্থ স্থান হল হৃদয়, এখানে কুলকুণ্ডলিনী উঠে এলে জ্যোতি দর্শন হয়। পঞ্চম ভূমিতে উঠে এলে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা বলবে না। অর্থাৎ, মন তাঁর ঈশ্বরের প্রতি এত একাগ্র হয়ে গেছে যে তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা বলবে না। বিষয়ীরা এসে পড়লে সে উঠে চলে যাবে। ষষ্ঠ ভূমি ভ্রমর মধ্য, এখানে কুলকুণ্ডলিনী উঠে এলে যোগী পরিষ্কার দেখতে পায় ভ্রমর মধ্য কুলকুণ্ডলিনী আছে। এখানে যোগী ঈশ্বরকে দেখেন তিনি আর ঈশ্বর যেন এক কিন্তু মাঝখানে যেন কাঁচের মত একটা ব্যবধান আছে। আর সপ্তম ভূমিতে গেলে কী হয় সেটা আমাদের জানা নেই, এটাই নির্বিকল্প সমাধি। ঠাকুর এভাবেই এগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাণায়াম করলেও কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে একটা একটা করে ভূমিকে অতিক্রম করে উপরের দিকে ঠিক এই পদ্ধতিতে উঠতে থাকে। ধ্যান করলে এবং অন্য যত পথের কথা বলা হয়েছে সবতে একই জিনিষ হবে। স্বামীজী যদিও এখানে শুধু প্রাণায়ামের বর্ণনা করছেন কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একই জিনিষ হয়। ঠাকুর কথামতে এক জায়গায় বলছেন – জ্ঞানের একটি লক্ষণ আছে, কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়। হৃদয়ে অর্থাৎ চতুর্থ ভূমিতে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে সেখান থেকে পতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু কষ্ট দেশে এলে আর পতনের ভয় থাকে না, ওখান থেকে খুব জোর হয়তে হৃদয়ে নেমে আসতে পারে কিন্তু তার থেকে আর নীচে পড়ে যাবে না। কুণ্ডলিনী জাগরণ স্বসংবেদ্য, যার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ হয়েছে সেই একমাত্র জানতে পারে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। তবে তাঁর কিছু বাহ্যিক আচার আচরণ দেখে বোঝা যায়।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন যেখানেই গতি ও ক্রিয়া আছে সেখানেই প্রাণ আছে। তাহলে আমরা সব সময় নানা রকমের যে চিন্তা-ভাবনা করছি সেখানেও ক্রিয়া আছে। একটা চিন্তা করছি, সেই চিন্তার মাঝখানে আরেকটা নতুন চিন্তা ভেতরে আসছে, এটাও একটা ক্রিয়া। তাহলে সমস্ত রকম চিন্তা-ভাবনাতেও প্রাণ জড়িয়ে আছে। তার মানে চিন্তা-ভাবনা দিয়েও প্রাণশক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, আর প্রাণের সাথেও চিন্তা-ভাবনা জড়িয়ে আছে। সেইজন্য বলছেন তুমি যদি প্রাণায়াম কর তাহলে তোমার চিন্তা-ভাবনাও অনেক নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে। চিন্তা ভাবনা যদি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও সামঞ্জস্য আসবে। উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। যতক্ষণ প্রাণায়াম না হয় ততক্ষণ শরীর আর মনে শক্তি আসবে না। যখন স্থির লক্ষ্য বন্দুক চালায় তখনও তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অর্জুন যখন বলছেন ‘আমি একমাত্র পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি’, যদিও মহাভারতের উপর আমাদের কোন প্রশ্ন করার অধিকার নেই, কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে যিনি গুরু প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছেন অথচ বলছেন তিনি পাখির চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সে কি কখন সম্ভব? যোগের দৃষ্টিতে কখনই সম্ভব নয়। যাঁর এই ধরণের একাগ্রতা আছে যেখানে তিনি পাখির চোখ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সেখানে তিনি কারুর কথাও শুনতে পাবেন না। আমরা বাড়ির বাচ্চাদের গালাগাল দিই ‘কালো হয়ে গেছিস নাকি, তখন থেকে ডেকে যাচ্ছি শুনতে পাচ্ছিস না’! বাচ্চা একটা উত্তেজক ক্রিকেট ম্যাচ যে দেখছে তার কানে কোন কথা যাচ্ছে না, আর অর্জুন পাখির চোখ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সেখানে গুরু দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করছেন আর অর্জুন উত্তর দিচ্ছেন! আসলে এটি একটি আখ্যায়িকা, যাতে বোঝান হচ্ছে একাগ্রতা কাকে বলা

হয়। অন্যরা যখন বলছে ‘আমি গাছপালা দেখতে পাচ্ছি, লোকজন দেখতে পাচ্ছি’, এটাও ঠিক নয়। কারণ যখনই কোন বস্তুর উপর দৃষ্টিকে একাগ্রভাবে নিক্ষেপ করা হয় তখন আশেপাশের সব কিছু আর স্পষ্ট দেখা যাবে না। দুর্যোধন বা ভীমের মত বীর যখন পাখির চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে তারাও তখন আশেপাশের কিছু দেখতে পাবে না, পাখিকে পুরো আর গাছের ডালপালও হয়তো দেখবে, কিন্তু বর্ণনা অনুযায়ী আশেপাশের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাবে না। অর্জুন যখন শুধু পাখির চোখ দেখছেন তখন তিনি কোন কিছুর শব্দও কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে শুনতেও পারবেন না, আর উত্তর দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

স্বামীজী বলছেন আমাদের চিন্তা-ভাবনা আর প্রাণের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সেইজন্য যাঁরা খুব উচ্চকোটির যোগী তাঁদের চিন্তাও খুব শক্তিশালী হয়। এতই শক্তিশালী হয় যে তাঁরা তাঁদের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে অপরের চিন্তা-ভাবনাকেও পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তিনি কাউকে বললেন ‘তুমি ঠিক হয়ে যাও’, তাঁর চিন্তার এত শক্তি যে সেই লোকটির মনের চিন্তা-ভাবনাও এবার পাল্টাতে থাকবে। ওই চিন্তা-ভাবনাতে তার যে প্রাণশক্তি কাজ করছে, যোগীর কথাতে সেই প্রাণশক্তিটাই পাল্টে যাচ্ছে। প্রাণশক্তি যখন তার পাল্টে যাচ্ছে তখন তার শরীরটাও সেরে যাবে। সেইজন্যই যোগীদের কাছে সবাই ভিড় করে। স্বামীজী বলছেন আমাদের মন একট ইঞ্জিনের মত কাজ করে, প্রাণকে বাইরে থেকে টানছে আবার সেই প্রাণকে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে যখন ভেতরে বায়ু যাচ্ছে, সেই বায়ুর মধ্য দিয়েই প্রাণ ভেতরে যাচ্ছে। কিন্তু চিন্তে তো কোন বায়ু যাচ্ছে না তাহলে চিন্তে প্রাণশক্তি কীভাবে যায়? চিন্তার মাধ্যমে প্রাণশক্তি চিন্তকে সঞ্জীবিত করছে। কারণ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ক্রিয়া হচ্ছে, তাতেও গতি আছে। তাই চিন্তা-ভাবনা যদি এলোমেলো হয় তাহলে বুঝতে হবে তার প্রাণশক্তিও এলোমেলো। প্রাণ যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে চিন্তা-ভাবনার এলোমেলোটাও ঠিক হয়ে যাবে। প্রাণকে কীভাবে ঠিক করা যাবে? প্রাণায়ামের মাধ্যমে। আপনি যদি বলেন আমি মৈত্রী, করুণা দিয়ে ঠিক করে নেব। তাতেও হবে। উদ্দেশ্য হল চিন্তা-ভাবনাকে ঠিক করা। এই ঠিক করাটা আপনি প্রাণায়াম দিয়ে করবেন, নাকি যোগ যে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিচ্ছে সেই ঈশ্বরের ধ্যান করে করবেন, নাকি জপ দিয়ে করবেন, নাকি মৈত্রী করুণা দিয়ে করবেন সেটার কোন গুরুত্ব নেই। পতঞ্জলি কোনটাতেই বেশী জোর দিচ্ছেন না, এই ব্যাপারে তিনি খুব উদার। যোগ অনুশীলন করলে শরীর নীরোগ হয়, শুধু শরীরই নয় মন পাল্টে যায়, চিন্তা-ভাবনা পাল্টে যায়, অপরকে ভালো করার ক্ষমতা এসে যায়।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্বামীজী শিক্ষার উপর খুব সুন্দর কথা বলছেন। স্বামীজী বলছেন যে কোন নতুন কিছু শিক্ষাকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। কারণ মানুষের স্বভাবই হল পুরনো ধ্যান-ধারণাকেই সে আঁকড়ে থাকতে চায়। স্বামীজী এখানে একটা উপমা আনছেন, মনটা হল একটা ছুঁচ আর মস্তিষ্ক যেন মনের সামনে একটা নরম কাদার তাল। এখন ছুঁচ দিয়ে যদি কাদার তাল ফুটো করে দেওয়া হয় তখন ছুঁচ সহজেই কাদার তালের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়ে একটা ছিদ্র তৈরী হয়ে যাবে। যখনই আমরা কোন চিন্তা মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করি ততবারই মস্তিষ্কের মধ্যে একটা চ্যানেল তৈরী হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্বামীজী যখন এই কথাগুলো বলছেন তখনও আমাদের নিউরো-সাইন্স এতটা উন্নত হয়নি। কিন্তু স্বামীজী অত দিন আগে যেটা বলে গেছেন এখন নিউরো-বিজ্ঞান একই কথা বলছে। এখন বলা হয় নিউরোনস্, মস্তিষ্কে যে সেল গুলো রয়েছে সেগুলোকে নিউরোন বলে। স্বামীজী যেটা ছিদ্রের কথা বলছেন সেটা আমাদের বোঝানর জন্য বলেছেন, কিন্তু নিউরোন গুলো একেকটা চ্যানেল করে নিচ্ছে, যা কিছু আমরা অধ্যয়ন করছি, শিক্ষার মাধ্যমে যত নতুন নতুন চিন্তা মস্তিষ্কে পাঠাচ্ছি মস্তিষ্কে নিউরোনগুলো তত চ্যানেল তৈরী করে নিচ্ছে।

মস্তিষ্কে এই রকম কত চ্যানেল আছে সেটা দিয়ে বিচার করা হয় একজন মানুষ কত বড় জ্ঞানী বা পণ্ডিত। খুব উন্নত মস্তিষ্কে সব থেকে বেশি কুড়িটা করে চ্যানেল থাকে। এই কুড়িটা চ্যানেল আবার কুড়িটা নিউরোনের সঙ্গে যুক্ত, আবার প্রত্যেকটি নিউরোনের আবার পনেরো কুড়িটা করে চ্যানেল রয়েছে। ঐ চ্যানেল গুলো এই নিউরোনের চ্যানেলের সাথে আবার সংযুক্ত থাকে। এইভাবে প্রত্যেকটি নিউরোন পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে – ঠিক ইন্টারনেটের মত। এইভাবে আমাদের মস্তিষ্কে

মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় দশ কোটি সেল রয়েছে। আর আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীরা এর শতকরা চৌদ্দভাগ ব্যবহার করে বিজ্ঞানের কত কি তত্ত্ব আবিষ্কার করে দিলেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মস্তিষ্কের একশ ভাগ কেউই কোন দিন ব্যবহার করতে পারে না, কারণ মস্তিষ্কের কাজ করার জন্য তার নিজস্ব কিছুটা খালি জায়গার দরকার। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিক অবস্থাতে শতকরা আট ভাগ সেল ব্যবহার করে থাকি। এখানে মনে হতে পারে আট আর চৌদ্দর মধ্যে কি আর এমন পার্থক্য। কিন্তু বিরাট পার্থক্যই হবে, কেননা যখন এটাকে 100 million এ নিয়ে যাচ্ছেন তখন এর বিরাট পার্থক্য এসে যাবে। শতকরা চার ভাগ এদিক সেদিক হয়ে গেলেই সমগ্র সংখ্যাটা কোথায় চলে যাবে আমরা ভাবতেই পারব না।

এই কারণে দেখা যায় একটা বয়সের পর মস্তিষ্ক আর নতুন কোন চিন্তা নিতে পারে না, কেননা যে চ্যানেল গুলো আগে হয়ে গেছে সেখানে আর নতুন চ্যানেল তৈরী করতে চায় না, সেইজন্য বয়স হয়ে গেলে পুরনো জিনিষকেই আঁকড়ে থাকে, নতুন কিছু গ্রহণ করতেই চায় না, মনটা গোঁড়া হয়ে যায়। বলা হয় বুড়ো টিয়া পাখিকে নতুন বুলি শেখানো যায় না। যত বয়স হতে থাকে কাদার তালটাও অর্থাৎ মস্তিষ্কও তত পাথরের মত শক্ত হতে থাকে। যারা বিষয়ী লোক তাদের আধ্যাত্মিক কথা বলতে গেলেই তাদের ভেতরে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়, আর যে শোনাচ্ছে তাকে সহ্য করতে পারে না। কেননা আধ্যাত্মিকতার যে নতুন চ্যানেলটা মস্তিষ্কে আসছে সেটা আগে থাকতে যে চ্যানেল গুলো তৈরী হয়ে রয়েছে সেগুলোর সাথে এই নতুন চ্যানেলের কোন মিল নেই, এগুলো তার কাছে একেবারেই অপরিচিত, কিছুতেই সে তাই এই নতুন চ্যানেলকে বরদাস্ত করতে পারেনা। মস্তিষ্ক তখন ধাক্কা মারে আর সেটাই বাইরে এসে মানসিক ক্ষিপ্ততা রূপে প্রকাশ পায়। এই কারণে যারা অসুর প্রকৃতির, যারা খুব ভোগী তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা শোনান বা উপদেশ দিতে নিষেধ করা হয়।

এখন কোথাও শুনে নিল প্রাণায়াম করলে এই এই হবে, শরীর ভালো থাকবে, জপ করলে মনে শান্তি আসবে, এগুলো শোনার পর যখন সে প্রাণায়াম করতে শুরু করল তখন তার মস্তিষ্কের এই চ্যানেল গুলো নরম হতে শুরু করে। একটু নরম হয়ে গেলে তখন নতুন চ্যানেল তৈরী করা সম্ভব হয়। এতক্ষণ যে জ্ঞানটা আসছিল সে নতুন চ্যানেল তৈরী করতে পারছিল না, যে জিনিষের কোন অভিজ্ঞতা হয়নি, যে জিনিষকে সে কোন দিনই ভোগ করেনি, তাকে কংক্রিটের মত জমাট বাঁধা মস্তিষ্ক কখনই নিতে পারেনা। কিন্তু যেই প্রাণায়াম, সাধন-ভজন করতে আরম্ভ করে দিল তখন তার মস্তিষ্ক আস্তে আস্তে নরম হতে শুরু করবে, এরপর ধীরে ধীরে তাকে নতুন চিন্তা পাঠালে সে আর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে না, নতুন আরেকটা চ্যানেল করে দেবে। কিন্তু তার আগে মস্তিষ্ককে সুস্থ সতেজ রাখতে হবে। যদি খবর দেওয়া হয় আজকে আমার বাড়িতে কোন মহারাজ আসবেন তখন আমি ঘরদোর পরিষ্কার করতে শুরু করে দেব, নতুন চায়ের কাপ কিনব, পরিষ্কার পর্দা লাগাব। আর যদি এক মাস আগে বলা হয় রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ তাঁর কয়েক জন সেবককে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসবেন, তখন আমি হয়তো গোটা বাড়ির ভেতর বাইরে নতুন রঙই করিয়ে দিলাম। এখানেও ঠিক এই একই জিনিষ করতে হয়। একটা নতুন ভাবনা, নতুন জ্ঞানের আলো পাঠানো হচ্ছে, এখন ঠিক এই ভাবেই মস্তিষ্কটাকে সাজাতে হবে ঐ নতুন প্রজ্ঞালোককে গ্রহণ করার জন্য। তার আগে মস্তিষ্কের ঝাড়া মোছা শুরু করতে হবে। ঝাড়া মোছা হচ্ছে – জপ, বিবেক-বিচার, প্রাণায়াম, তপস্যা এগুলো মনকে শান্ত করার জন্যই শুধু নয়, মস্তিষ্কের জন্যই এগুলো করা সব থেকে বেশি প্রয়োজন। যত বয়স হচ্ছে মস্তিষ্কের সেল গুলো তত শক্ত হতে থাকে আর তার পক্ষে নতুন করে কিছু আয়ত্ত্ব করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে এই কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। সেইজন্য বয়স হলে বলে – তুমি বাবা করতাল বাজিয়ে হরিবোল হরিবোল কর, নাহলে হাততালি দিয়ে হরি ওঁ হরি ওঁ কর, এছাড়া আর কিছু তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। একটা বয়সের পর মস্তিষ্ক একটা নিরেট পাথর হয়ে যায়, নতুন কোন আইডিয়া দিলে মস্তিষ্ক নিতে না পেরে মাথার বিকৃতিও আসতে পারে। স্বামীজীও এখানে বলছেন – সাধারণ লোকেরা যদি যোগ অভ্যাস করতে আসে তাহলে তাদের মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। কারণ যোগ

হল একেবারে নতুন চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি। অন্যান্য পথে বিশেষ করে ভক্তিয়োগে বলবে তোমার হবেই হবে। কিন্তু রাজযোগ সরাসরি বলে দেবে – বাপু তোমার দ্বারা হবে না, কেননা তোমার ব্রেন ফসিল হয়ে গেছে। তাহলে আমার কি হবে? যোগ বলবে এখন থেকেই তুমি চেষ্টা করতে থাক, পরের জন্মে গিয়ে আবার ভালো করে প্রথম থেকেই যাতে জোর কদমে শুরু করতে পারো তার জন্য এখন থেকেই মনের প্রস্তুতি নাও। রাজযোগ বলেই দিচ্ছে – there is no easy and short-cut method in spiritual life.

সেইজন্য আমাদের মুনি ঋষিরা বহুকাল আগেই বলে দিয়েছেন আধ্যাত্মিক সাধনা ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হয়। আর যদি ছোট বয়স থেকে শুরু নাও করা যায় তাহলে যখনই শুরু করবে সেখান থেকে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক কারুর কাছ থেকে কিছু একটু শিখে নিয়ে প্রথম দিন থেকেই এক ঘণ্টা ধরে প্রাণায়াম করতে শুরু করে দেবে। এই বয়সে যদি প্রথম দিন থেকে এক ঘণ্টা প্রাণায়াম করতে যায় তাহলে তার মাথাটা খারাপ না হয়ে কোন উপায় আছে! টর্চের ব্যাটারির দুদিকে হাত দিলে সার্কিটটা পূর্ণ হচ্ছে কিন্তু কারেন্ট লাগছে না। কিন্তু ৪৪০ ভোল্টে হাত দিয়ে দেখুক তো, তখন কারেন্ট কাকে বলে বুঝিয়ে দেবে। এই বয়সে যতক্ষণ আমরা হরিবোল হরিবোল করছি তখন এটাতে কিছু গোলমাল হবে না, এখানে ছোট ব্যাটারিকে স্পর্শ করা হচ্ছে। কিন্তু যখন প্রাণায়াম করতে নামবে তখন সে ৪৪০ ভোল্টকে নিয়ে খেলা করতে শুরু করল।

স্বামীজী বলছেন, আমাদের শুদ্ধ চৈতন্যের উপর জগতের যে ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এটাই আমাদের জগৎ, যেটা আমরা প্রথম থেকে আলোচনা করে আসছি। স্বামীজী বলছেন ‘অনন্তের কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা আমাদের ‘জগৎ’ বলিয়া থাকি’। ছোট ঘাসের ডগায় একটা ছোট শিশির বিন্দু আর তার মধ্যেই সমগ্র বিশ্বরক্ষাও প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি আমাদের এই ক্ষুদ্র মন কিন্তু তার মধ্যেই পুরো বিশ্বরক্ষাও প্রতিভাসিত হচ্ছে। আমরা বলতে পারি ছোট শিশির বিন্দুর মধ্যে পুরো বিশ্বরক্ষাও প্রতিফলিত হয়ে আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিবিশ্বের ছবিটা তো নিতান্তই ক্ষুদ্র। ঠিক তেমনি আমাদের মনে বিশ্বরক্ষাওয়ের যে ছবি আসছে সেটাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু তার পেছনেই রয়েছে সেই অনন্ত, সেই বিরাট। এখানে স্বামীজী খুব মূল্যবান কথা বলছেন, এই যে অনন্ত চৈতন্য আর মনে প্রকৃতির যে একটা প্রতিবিম্ব পড়ছে, যেটাকে আমরা আমাদের জগৎ বলছি, তাহলে এখানে দুটো সত্তা এসে যাচ্ছে। এই দুটো সত্তার মধ্যে যখন যে কোন ধর্ম একটা অঙ্গকে জোর দেয় তখন ঐ ধর্ম অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ ধর্ম হওয়ার জন্য সেই ধর্ম দুর্বল হয়ে যায়। যে ধর্ম শুধু চৈতন্যকে নিয়েই কথা বলে সেই ধর্ম যেমন দুর্বল, ঠিক তেমনি যে ধর্ম শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূত সংসার নিয়েই ব্যাপ্ত সেই ধর্মও তেমনি দুর্বল। বিশ্বের বেশীর ভাগ প্রচলিত ধর্মগুলি সংসারের মধ্যেই বিচরণ করে যাচ্ছে, সংসারে কীভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়, ঈশ্বরকে ভালোবাসলে কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়, কীভাবে মৃত্যুর পরেও অনন্ত সুখ পাওয়া যায়। এগুলোই ধর্মের দুর্বলতা।

পতঞ্জলি এত কিছু বলার পর এবার অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলছেন **বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরূপণ্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী।।৩৫।।** যখন মানুষ এই জিনিষগুলো অনুশীলন করতে থাকে, করতে করতে মন একাগ্র হয়ে যাওয়ার কিছু দিন পর থেকেই তার নানা ধরনের সিদ্ধাই আসতে শুরু করে। মন কোন অবস্থায় একাগ্র হয়? যখনই কোন জিনিষের প্রতি মানুষের মন আকর্ষণ হবে তখনই তার মন সেই জিনিষে একাগ্র হবে। যোগ কিন্তু এই একাগ্রের কথা বলছে না। তাহলে কোন ধরনের একাগ্রের কথা বলছেন? **বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরূপণ্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী**, যোগ পথে যে একাগ্রতা আসে এই একাগ্রতায় এমন এমন বিষয়ের ব্যাপারে জানতে পারা যায় যা কিনা সহজ অবস্থায় আমরা কোন দিনই জানতে পারবো না, আমাদের কল্পনারও বাইরে আর অপরেও সেটা জানে না।

খুব সহজ উপমা হল, একজন খুব নামকরা ক্রিকেট প্লেয়ার ব্যাটিং করতে নেমেছে। এখন ইনি যদি একটা চার মারেন তাতে এমন কিছু আশ্চর্যের নয়, আমাদের জানা আছে তিনি এভাবেই সাবলীল ভঙ্গিতে চার ছয় মেরে থাকেন। তার মানে তাঁর একাগ্রতাতে যা কিছু হচ্ছে এতে অবাক হওয়ার কিছু

নেই। শচীন তেগুলকার সেধুরি করলে অবাধ হওয়ার কিছু নেই, তাঁর নিজের কাছেও তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়, অপরের কাছেও আশ্চর্যের কিছু নয়। শচীনের মধ্যে যে একাগ্রতা এবং এই একাগ্রতাতে তিনি যা কিছু করছেন এতে অবাধ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যোগ পথে যখন একাগ্রতা আসে আর সেই একাগ্রতায় এমন এমন কিছু জিনিষ হয় তাতে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তখন দেখে, যে জিনিষগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে কখনই জানা যায় না, সেই জিনিষগুলোকে তিনি জানতে পারছেন। যোগের সিদ্ধির ব্যাপারে স্বামীজী দুটো জিনিষ প্রায়ই বলে থাকেন, যেমন বলছেন – যদি নাসাগ্রে মনকে একাগ্র করা হয় তাহলে কিছু দিনের মধ্যে সুগন্ধ পেতে শুরু করে আর দূরের জিনিষ দেখতে পায়। এছাড়া যদি জিহ্বার মূলে ধ্যান করা যায় তাহলে বহু দূরের কথা শুনতে পায়। সাত দিন করলেই এগুলো আসতে থাকে, অবশ্য যদি ঠিক ঠিক যোগী হয়ে থাকে।

তবে যোগদর্শনে এই ধরনের সিদ্ধাইকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিভিন্ন সাধকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের সিদ্ধাই হবে। তবে একটা জিনিষ সবারই এক হয়, আপনি একটা জিনিষ ভাবছেন দেখা যাবে ঠিক সেই জিনিষটাই বাস্তবে ঘটবে। যদি একবার ঘটে তখন মনে হবে লেগে গেছে, দ্বিতীয়বার ঘটলে মনে হবে ঠিক আছে যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে, তৃতীয়বারেও তাই মনে হবে। কিন্তু বেশ কিছু দিন অনেক জপ-ধ্যান করতে করতে একটা অবস্থার পর যদি দেখেন মাথার মধ্যে উদ্ভট উদ্ভট যে চিন্তাগুলো হচ্ছে সেগুলোও বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আপনার প্রথমেই মনে হবে এর পেছনে কিছু একটা ব্যাপার আছে। এগুলো সত্যি সত্যিই হয়, সাধকের সাধনার ক্ষেত্রে এগুলো একটা প্রভাব ফেলে। এগুলোকে কোন ভাবেই যুক্তি দিয়ে মেলানো যায় না। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক জিম্বার্ডো তাঁর বিখ্যাত একটি বইতে Altered state of consciousness নামে একটা নতুন ধারণা নিয়ে এসেছেন। সেখানে তিনি বলছেন এমন একটা state of consciousness হয়, যখন এমন অনেক কিছু জানা যায় যা কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে যোগ সিদ্ধাই মানে সাধারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা হওয়ার নয় সেটাই হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জানার কথা নয় আজকে বাড়িতে কে আসবেন, তিনি কি খাবার নিয়ে আসবেন, কিন্তু আগে থেকেই আপনি জেনে যাচ্ছেন। এই ধরনের জিনিষ যে শুধু যোগীদের ক্ষেত্রেই হয় তা নয়, অনেক সাধারণ জিনিষও সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায়। এর সব থেকে ভালো উদাহরণ হল, ছেলে যদি বাইরে থাকে আর ছেলের যদি কিছু হয়ে যায় বাড়িতে মায়ের মন ছটফট করতে শুরু হয়ে যায়। আসলে ছেলের সাথে মায়ের মন এমন জড়িয়ে রয়েছে যার ফলে ছেলের মাথা ফেটে গেলে, হাত ভেঙে গেলে মায়ের মনে ওই অনুভূতিটা এসে তোলপাড় শুরু করে দেয়। এগুলোই হল একটা Altered state of consciousness। এখানে এটা কিন্তু মায়ের নিজের ছেলের উপরেই হচ্ছে।

পতঞ্জলি কিন্তু বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাকে নিয়ে বলছেন না। তিনি বলছেন এই ধরনের অনেক কিছু যখন হবে তখন মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী, আপনার মন তখন একটা স্থিতিতে দৃঢ় হয়ে যাবে। কোন স্থিতিতে দৃঢ় হবে? জপ-ধ্যানই ঠিক, এই জপ-ধ্যান থেকেই আমি শক্তি পাচ্ছি, যে শক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই পাওয়ার কথা নয়। তখন মনে আর কোন সন্দেহ আসবে না, আমি যেটা করছি এটাই ঠিক, এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়। ঠাকুরও মা কালীর কাছে আবদার করে বলছেন – ছেলেরা যদি একটু কিছু না পায় তাহলে উৎসাহ কী করে পাবে! এই ধরনের কিছু কিছু সিদ্ধাই যখন আসে তখন সাধকের উৎসাহ আসে। স্বামীজী বলছেন, অস্তিরচিত্ত ব্যক্তিও যদি সামান্য যোগ অনুশীলন করে কিছু দিন পরেই এই ধরনের অনুভূতি আসতে শুরু করে দেবে। তখন সাধকের মনে যত সন্দেহ আছে সব চলে যাবে। তবে স্বামীজী রাজযোগের যে ক্লাশ নিয়েছিলেন তাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তি ছিলেন, স্বামীজীর সংস্পর্শে তাঁরাও যোগের ব্যাপারে অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছিলেন। উন্নত প্রমত্ত ব্যক্তিদের এসব কথা বলার পর তারা যদি যোগ শুরু করে দেয় তাদের কিছুই হবে না, একটু সময় লাগবে। কিছু দিন ধৈর্য ধরে করার পরে বুঝতে পারে জীবনটা অন্য রকম।

আর এই সব সাধনাতে যদি কোন রকমের ভোগের প্রশ্রয় থাকে তাহলেই তা সাধকের মাথাটা নষ্ট করে দেবে। এর মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে নারী-পুরুষ সঙ্গ। যোগে সাধন অবস্থায় যদি নারীসঙ্গ হয় তাহলে মাথাটা খারাপ হবেই হবে। এই কারণে আধ্যাত্মিক জীবনে ব্রহ্মচর্যের উপরে প্রচণ্ড জোর দেওয়া হয়। যে কোন ধর্মপথের সাধনায় যদি দেখা যায় ব্রহ্মচর্যের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না তখন সেই ধর্মপথে এক বিন্দুও বিশ্বাস রাখতে নেই। কারণ আধ্যাত্মিকতা আর অব্রহ্মচর্য সম্পূর্ণ ভাবে পরস্পর বিরোধী। কেউ যদি এক চুলও ব্রহ্মচর্যকে সরিয়ে রেখে ধর্মের কথা বলে তাহলে বুঝতে হবে সে পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলছে নয়তো তার মাথাতে নির্ঘাৎ গণ্ডগোল আছে। **Psychic energy** দুভাবে বেরোয় – একদিকে আধ্যাত্মিকতার বিকাশের মধ্য দিয়ে আর যদি আধ্যাত্মিকতা বন্ধ থাকে তখন সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে শক্তিটা বেরিয়ে যায়। কেউ যদি ঠিক করে থাকে আমি সন্তান উৎপাদনও করব আবার প্রাণায়ামও করব ধ্যানও করব তাহলে মাথা তার খারাপ হবেই হবে, কেউই বাঁচাতে পারবে না তাকে। দ্বিতীয় আরও বাজে, একদিকে রোজ মুরগীর মাংস খাবে মদ নেশা ভাঙ করবে আবার জপ করবে প্রাণায়ামও করবে তারও মাথাটা নির্ঘাৎ খারাপ হবেই হবে। এগুলো সবই যোগ সাধনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। আগে মনের কাছে পরিষ্কার হও – তুমি ভোগ চাও, না যোগ চাও, যোগ আর ভোগ কক্ষণ একসাথে হবে না।

যখন এই ধরনের কিছু সিদ্ধাই আসতে শুরু করে তখন মানুষের আধ্যাত্মিক জগতের উপর বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়। কোন অবিশ্বাসী যদি এই যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করার পর এগুলোর ব্যাপারে যদি সন্দেহান থাকে তখন কিছুদিন সাধনার পর এই সব অনুভূতি হতে থাকলে তার আর সন্দেহ থাকবে না, তখন সে আরো জোর কদমে অধ্যবসায় সহায়ে সাধন করতে থাকবে।

পতঞ্জলি যেমন প্রাণায়ামাদির কথা বললেন, এরপর আবার তার বিকল্প পথও বলে দিচ্ছেন। এখানে তিনি যোগদর্শনকে একটা সুদৃঢ় পথে তুলে দিতে গিয়ে আর যোগ সাধনাকে সুগম করার জন্য খুব খোলা মনে বলে যাচ্ছেন। যেমন পরের সূত্রে বলছেন – **বিশোক বা জ্যোতিষ্কতী।।৩৬।।** বিশোকা মানে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা জ্যোতির কথা বলা হচ্ছে। এই জ্যোতির আলোকে টিউব লাইটের আলো বা সাধারণ আলোর মত বলছেন না। আলো আর জ্যোতির মধ্যে তফাৎ হয়। সাধারণ আলো জড় কিন্তু জ্যোতিতে মনে হয় জীবন আছে। যদি কোন জ্যোতিপুঞ্জের উপর ধ্যান করে মনকে একাগ্র করা হয় তাতেও একই ফল হবে। স্বামীজী এখানে বলছেন যার ভগবানে বিশ্বাস নেই সেও যদি মেরুদণ্ড সোজা করে বসে হৃদয়ের মধ্যে একটা পদ্মফুল আছে ভাবতে থাকে, আর সেই পদ্মফুলটা অধোমুখী, সেই অধোমুখী পদ্ম আস্তে আস্তে সোজা হয়ে উঠল, আর সেই পদ্মফুলের মাঝখানে সূর্যের যেমন আলো বেরোয়, সেই রকম একটা জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে, এই জ্যোতির যদি সে চিন্তন করে তাতেও চিত্তবৃত্তিগুলো কমে গিয়ে তার মন শান্ত হয়ে যাবে। কল্পনা নয় চিন্তন করতে বলছে। কল্পনা আর চিন্তনের মধ্যে পার্থক্য হল, কল্পনায় মন অস্তিরমনা, কখন এদিকে যাচ্ছে কখন ওদিকে যাচ্ছে, কিন্তু চিন্তন তা নয়, চিন্তন মানে একটা জিনিষকে নিয়ে এক ভাবে ধরে রাখা। চিন্তন করতে করতে মনটা গভীরে চলে যায়। মন যখন গভীরে চলে যায় তখন এই এতক্ষণ যে অনেক ঢেউ উঠছিল, সেই ঢেউগুলো শান্ত হয়ে যায়।

পরের সূত্রে বলছেন – **বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।।৩৭।।** যিনি বীতরাগ, অর্থাৎ রাগ আর দ্বেষের পারে, যাঁর হৃদয় পবিত্র ও নির্মল, তাঁর চিন্তন করা। যদি কোন মহাপুরুষ, মহাত্মা, যাঁকেই আপনার মনে হচ্ছে যে ইনি রাগ আর দ্বেষের পারে, তাঁর ধ্যান করলে, চিন্তা করলেও চিত্তের বৃত্তি গুলি শান্ত হয়ে যায় আর মন ধীরে ধীরে পবিত্রতা লাভের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাঁকে মানুষ মনে করে ধ্যান করলে কাজ হবে না, তিনি এমন একজন যাঁর মধ্যে রাগ ও দ্বেষ নেই, তাঁর মধ্যে কোন ধরনের কামনা বাসনা নেই, তিনি হলেন একেবারে পূর্ণ পুরুষ, এই ধরনের চিন্তন করতে হবে। আমাদের জন্য ইস্টের ধ্যান করা। আগে যেমন বললেন **ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্বা**, ঈশ্বরের উপর ধ্যান করতে বলা হচ্ছে। ঈশ্বরের উপর ধ্যান করে আপনি যা পাবেন, মন্ত্র জপ করলে একই জিনিষ পাবেন, প্রাণায়াম করলে একই

জিনিষ পাবেন আর হৃদয়ে যদি জ্যোতির চিন্তন করেন তখনও আপনি একই জিনিষ পাবেন। আবার শুধু গুরুর ধ্যান করলেও একই জিনিষ হবে আর কোন সাধু, মহাত্মা, যিনি পবিত্র হৃদয়ের, যাঁর প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে, তাঁকেও যদি আপনি ধ্যান করেন সেই একই ফল পাবেন। একই ফল মানে, চিন্তে নানান রকমের যত বৃত্তি আছে সব বৃত্তি কমে আসবে।

যে ধরণের সংস্কারযুক্ত লোকের সঙ্গ আপনি করবেন সেই ধরণের সংস্কার আপনার মধ্যে জেগে উঠবে। কিছু খারাপ লোক আছে যাদের সাথে আপনার কথা বলতেই ভালো লাগে না, তার কারণ আপনার ভেতরে ঐ সংস্কারটা নেই যেটা ঐ খারাপ লোকের মধ্যে আছে। যদি ঐ ধরণের একটু সংস্কারও আপনার ভেতরে থাকত ঐটাই তেড়েফুড়ে বেরিয়ে এসে আপনাকে দিয়ে তার সঙ্গ করিয়ে নিত। কেউ মদ খেয়ে মাতলামো করছে, আপনি ওই মাতালকে দেখে হয়ত সরে এলেন, কিন্তু অনেকে আছে মাতাল লোক মাতলামো করছে দেখলেই কাছে গিয়ে তাকে খোঁচাবে, ‘কি খুড়ো কেমন আছো’, ‘তোমার নেশাতো দেখছি খুব জমেছে তাই না’! বলেই মাতালের সঙ্গে খাস গল্প জুড়ে দিয়ে মজা করতে বসে যাবে। সে হয়তো মদ খায়না কিন্তু ভেতরে মদ খাওয়ার সংস্কার আছে বলে তার কাছে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে, তার সাথে মজা হাসি-ঠাট্টা করে আনন্দ পেতে চাইছে। এরও আর বেশি দেবী নেই মদ ধরল বলে। যখনই কোন জিনিষকে নিয়ে কেউ বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, সে যে কোন জিনিষকে নিয়েই হোক না কেন, কারুর কিছু হলে করুণা দেখাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে এটা কি করে হল, এটা কেন হল, এই ধরণের পাঁচটা প্রশ্ন যদি করে তখন বুঝতে হবে যে এর ভেতরেও কিছু গোলমাল আছে, মানে তার ভেতরের চাপা সংস্কার জাগতে শুরু করেছে। ঠিক তেমনি কেউ হয়তো কারুর নামে খুব নিন্দা করছে, ধিক্কার দিচ্ছে তাহলেও বুঝতে হবে গোলমাল আছে। এগুলো আর কিছুই না, সংস্কার চাড়া মারছে আর সেটাই আগে থেকে জানান দিচ্ছে। আর যাদের সংস্কার নেই, কারুর কিছু হলে সে তার কাছে যাবে একটা করুণার ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করবে তারপর বলবে ‘যা হয়ে গেছে ছেড়ে দাও, এরপর যাতে আর না হয় চেষ্টা কর’, এইটুকু বলে বেরিয়ে যাবে। সংস্কারের কারণে এটা হয় না, প্রকৃত করুণা ভাব থেকে আসে, দুঃখ এসেছে, আপনার একটা বিপদ হয়ে গেছে, আপনার প্রতি করুণাবশতঃ সাহায্য দিয়ে গেল।

এখানে বলা হচ্ছে বীতরাগ – মানে এমন লোক যাঁর মধ্যে কোন ধরণের কামনা-বাসনা নেই, তখন তাঁর যে চিন্তন করছে সেটা যে শুধু চিন্তনই হচ্ছে তা নয়, তাঁর সঙ্গও হয়ে যাচ্ছে। পতঞ্জলি বলছেন জপ করলে যা হয়, এই ধরণের কোন সাধুগুরুষের ধ্যান করলে সেই একই জিনিষই হয়। অথবা জ্যোতির উপরে যদি ধ্যান করেন তাতেও একই ফল হবে। আবার সমুদ্রের মাঝখান থেকে ভোরের লাল সূর্যের উদয় হচ্ছে, এই নৈসর্গিক দৃশ্যকেই হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করলেও একই জিনিষ হবে। মনে যে হাজার ধরণের বৃত্তি অহরহ উঠছে, যেন তেন প্রকারে ঐ বৃত্তির ওঠাকে আটকে দেওয়া। যেটাতেই একাগ্র করুক না কেন দেখতে হবে ঐ চিন্তাটা যেন খুব শক্তিশালী হয়। যে লোক খুন করতে যায় তারও চিন্তাটা প্রচণ্ড আকারে শক্তিশালী থাকে, তখন তার একটাই চিন্তা থাকে আর কোন বৃত্তির ঢেউ তখন থাকে না, কিন্তু এই চিন্তা কখনই মহৎ নয়। তাই যিনি চিন্তের বৃত্তিগুলিকে আটকাতে চাইবেন তার দুটোই থাকতে হবে একদিকে শক্তিশালী চিন্তা হতে হবে আর অন্য দিকে সেই চিন্তাটা যেন খুব পবিত্র, মহৎ, সাধুভাব হয়। পতঞ্জলি একটার পর একটা অনেকগুলো উপায় আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন, এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে চিন্তের বৃত্তির ঢেউ ওঠাকে আটকানো যেতে পারে।

এই রকম আরেকটি উপায়ের কথা পরের সূত্রে বলছেন – **স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।।৩৮।।** কথামতে স্বপ্নের ব্যাপারে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ আছে – কেউ স্বপ্নে কিছু দেখেছে, স্বপ্নে কেউ কিছু পেয়েছে। ঠাকুরকে একজন তার স্বপ্নের কথা বলতেই ঠাকুর বলছেন – আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে তুমি শিখ্রই মন্ত্র নাও। স্বপ্নে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসে হিন্দুধর্মে এটাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। স্বপ্নের মধ্যে যে বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শন হয় সেই দর্শনগুলো ভীষন জীবন্ত হয়ে আসে। আমাদের কিছু কিছু যে মনস্তাত্ত্বিক দর্শন আছে সেখানে স্বপ্নের ব্যাপারে বলছে স্বপ্নে যে দেবদেবীর দর্শন হয় সেটা তাঁরাই

পাঠান, অন্য স্বপ্নগুলো আমাদের মন থেকে হয়। কিন্তু মূল কথা হল এখন কেউ যদি স্বপ্নাদৃষ্ট পবিত্র বা শুভ কোন বিষয় নিয়ে ধ্যান করতে থাকে, তাতেও আমাদের চিন্তবৃত্তি নিগ্রহ করতে সাহায্য করবে। ধরুন কেউ দেখল শ্রীরামচন্দ্র তীর-ধনুক নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে স্মিত ও মিষ্ট হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন, আর তাঁর অশেষ করুণা বরে পড়ছে। স্বপ্নে দেখা এই চিত্রটি মনের মধ্যে গভীর ভাবে বসে যাবে। অন্য সময়ে যখন ইষ্টের ছবিকে কল্পনা করবার চেষ্টা করবে তখন কিন্তু ইষ্টের প্রতিমূর্তিটা এত পরিষ্কার দেখতে পাবে না, কিছুটা অস্পষ্ট দেখাবে, কিন্তু স্বপ্নে দেখা সেই ছবিটাই জীবন্ত ও বর্ণময় রূপে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্যানের সময় স্বপ্নে দেখা ঐ জীবন্ত বর্ণময় ছবিকে চিন্তন করতে থাকলে এই হাজার রকমের চিন্তার চেউ ওঠাটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর এটাই তো যোগের উদ্দেশ্য।

আমরা যে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা এখানে বলছি তা নয়, রাজযোগের একেবারে প্রাথমিক তত্ত্বগুলিই এখন বলা হচ্ছে, বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তখন তাকে শেখানো হয় আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ, আমরা এখন ঐ অবস্থাতেই আতা গাছে তোতা পাখি আওড়াচ্ছি।

তারপর শেষে বলছেন – **যথাভিমতধ্যানাদা।।৩৯।।** প্রাণায়াম থেকে শুরু করে এতক্ষণ একটার পর একটা যা কিছু বলা হল সেগুলো তো তুমি করতেই পার, এছাড়া তোমার যেটা বেশী ভালো লাগে সেটাও তুমি করতে পার। যোগের উদ্দেশ্য হল ছড়ানো ছোটানো মনকে এক জায়গায় গুটিয়ে নিয়ে আসা। তোমার যেটা ভালো লাগে, ঠাকুর যেমন বলছেন তোমার নাটিকে বেশী ভালো লাগে? আচ্ছা নাটিকেই গোপাল ভেবে সেবা কর। ঠাকুর এখানে ধ্যানের কথা বলছেন না, সেবার কথা বলছেন। পতঞ্জলি এখানে যেটা বেশী শুভ সেগুলোর কথা আগে বলছেন, যেমন ঈশ্বরের কথা, বৈরাগ্যের কথা বা ওঁএর জপ ও ধ্যান, তার সঙ্গে জ্যোতি, ইষ্ট ইত্যাদি নানান রকমের কথা বলে বলে শেষে বলছেন, এগুলোর কোনটাই যদি তোমার না হয় তাহলে তুমি যেটা ভালোবাসো তাকেই ধ্যান কর। একজন ছেলে একটা মেয়েকে সত্যিকারের খুব ভালোবাসে, কিন্তু ছেলেটির মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটিও ভেতরে ভেতরে চাইছে আধ্যাত্মিক পথে এগোতে। তখন ছেলেটিকে বলে দেওয়া হল তুমি যদি মেয়েটিকে দেবী রূপে চিন্তা করে তার সেবা কর তাতেই তোমার হবে।

অনন্তমূর্তি কল্প সাহিত্যের একজন খুব বিখ্যাত লেখক। উনি কল্প ভাষায় খুব নামকরা বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক আবার বড় পণ্ডিতও, উনি এক সময় ভাইস চ্যান্সেলারও হয়েছিলেন। ওনার সাহিত্যে সামাজিক চেতনা এক সময় প্রচণ্ড আলোড়ন তৈরী করেছিল। অনন্তমূর্তির কিছু উপন্যাস ইংরাজীতেও অনুবাদ হয়েছে। উপন্যাসের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের চিরাচরিত কিছু প্রথাকে তিনি প্রচণ্ড নিন্দা করেছেন, তিনি যে হিন্দু সমাজকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন তা নয়। কিন্তু হিন্দুদের কিছু কিছু প্রথাকে উনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। সে যাই হোক তাঁর উপন্যাসগুলো খুবই উচ্চমানের। আমাদের ভারতীয় ভাষায় যত সাহিত্য সৃজন হয়েছে তার বেশ কয়েকটি উপন্যাস খুব উচ্চমানের। সেই তুলনায় ভারতে ইংরাজী ভাষায় যত সাহিত্য রচিত হয়েছে সেগুলো একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার আর পড়তেই ইচ্ছে হবে না, এতই নিম্নমানের।

অনন্তমূর্তির উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটি খুব নামকরা উপন্যাস ‘ভারতীপুরা’র মধ্যে একটা কাহিনী আছে তাতে একজন মেথরের ছোট্ট একটা প্রসঙ্গ আছে। মেথরটির কাজ ছিল রাজবাড়িতে গিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করা। রোজই একটা সময়ে সে রাজবাড়িতে যায়, সেখানে খুব সুন্দর ভাবে রাজবাড়ির বাথরুমগুলো পরিষ্কার করে ঝকঝক তকতক করে দিয়ে আবার বাড়ি চলে আসে। একদিন দৈবাৎ বাথরুম পরিষ্কার করতে করতে সে সেই রাজবাড়ির রানীকে অনাবৃত অবস্থায় দেখে ফেলে। রানীর দেহের ওই সৌন্দর্য দেখে মেথরটির মাথাটি গেছে বিগড়ে। এমনই মাথা ঘুরে গেছে যে বাড়ি এসে সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার মন পুরোপুরি এখন রানীর উপর পড়ে আছে, রানী ছাড়া আর সে কিছু ভাবতেও পারছে না, রানীর ওই সৌন্দর্য ছাড়া কিছু দেখতেও পারছে না। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে সে সব রকম কাজকর্ম করাও ছেড়ে দিয়েছে। তার স্ত্রী কোন রকমে একটু দুধ বা তরল জাতীয় খাবার খাইয়ে দেয়। এই ভাবে এক দিন, দু দিন, এক মাস, দু মাস থেকে ছয় মাসে

কেটে গেছে। স্ত্রী কতবার এসে জিজ্ঞেস করে তোমার কি হয়েছে, কিন্তু সে নির্বিকার ভাবলেশহীন ভাবে শুধু অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে, স্ত্রীর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আস্তে আস্তে এমন পরিণতির দিকে এগোতে লাগলো যে লোকটির বেঁচে থাকাটাও সংশয় চিহ্নের মধ্যে এসে গেছে। স্ত্রী একদিন অনেক দিব্যি দিয়ে বারংবার জিজ্ঞেস করার পর সে তখন বলে দিল ‘দেখো! আমি একদিন রানীকে এই রকম দেখে ফেলেছিলাম, সেই থেকে রানীর ওই ছবিটা আমার মন থেকে আর যাচ্ছে না। আমার মন পুরো রানীর উপর পড়ে আছে। আমার একমাত্র ইচ্ছা আমি একদিন রানীকে সামনা সামনি ঐ রকমটি দেখব, এছাড়া আমার আর কোন ইচ্ছা নেই’।

স্বামীর মুখ থেকে সব শোনার পর স্ত্রী তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। এর থেকে তাকে যদি কেউ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেয় সেটাও সে মাথা পেতে নিতে পারবে কিন্তু রানীকে কীভাবে সে এই কথা বলতে পারবে! আমরা অতি নগণ্য মেথর, রাজবাড়ির পায়খানা, বাথরুম পরিষ্কার করা আমাদের কাজ। এই দুঃসাহস কাজ করার চিন্তাও আমরা করতে পারিনা। কিন্তু দেখছে স্বামী মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর, স্বামীর জীবনের অবশ্যস্তুবি পরিণতির কথা ভেবে তার স্ত্রী কোন রকমে রানীর কাছে পৌঁছেতে পেরেছে। রানীকে সব কথা বলেছে। রানীও তার সব কথা শুনেছেন। শোনার পর রানী তার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন ‘ও এখন সারাদিন কী করে?’ স্ত্রী বলল ‘আপনাকে সেদিন ওই ভাবে দেখার পর বাড়িতে একটা খাটের উপর শুয়ে থাকে, সেই যে খাটে এসে শুয়েছে সেই থেকে খাট থেকে আর ওঠেনি’। রানী বললেন ‘ঠিক আছে, তুমি ওকে নিয়ে এস, ও যেমনটি চাইছে আমি তেমনটিই করব’। রানীর কথা তো স্ত্রীর বিশ্বাস হচ্ছে না। কোন রকমে দৌড়ে এসে স্বামীকে সব বলেছে ‘এই দেখো, তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হয়েছে। তুমি আমার সাথে চলো, রানী মা তোমাকে ডেকেছেন’। তখন শরীরের সব শক্তি দিয়ে খাট থেকে উঠে রাজবাড়ির দিকে চলেছে। রাজবাড়ীতে পৌঁছেছে। রানী আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। সবাইকে তিনি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। ওর স্ত্রীকেও ঘরের বাইরে রাখা হল। লোকটি ধীরে ধীরে রানীর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই দেখে তার সামনে রানী সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজবাড়ির মেথর সে, আর এতদিনে তার চুল দাড়িও ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। রানীর ওই অনাবৃত মূর্তির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকল, তারপর সে রানীর সামনে নত হয়ে পুরো সাষ্টাঙ্গ অবস্থায় গিয়ে রানীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মজার ব্যাপার হল, লোকটি প্রণাম করে যখন নিজের জায়গায় দাঁড়াল তখন রানীও হাঁটু গেড়ে লোকটিকে প্রণাম করল।

বক্তব্য হল, এই যে এখানে পতঞ্জলি বলছেন *যথাভিমতধ্যানাদা*, লোকটি রানীর ওই সৌন্দর্যকে ভালোবেসে ফেলেছে, এরপর শুধু রানীর ওই রূপকে চিন্তা করে করে সে নিজেও বুঝতে পারেনি কখন অজান্তে সে যোগী হয়ে গেছে। রানী খুব বুদ্ধিমতি ছিলেন, তিনিও বুঝতে পেরেছেন যে লোকটি আমার চিন্তা করে করে যোগী হয়ে গেছে, যার জন্য তিনি ওই অনাবৃত অবস্থায় তাকে প্রণাম করলেন, প্রণাম করে তিনি আলাদা হয়ে গেলেন। লোকটি বাড়ি ফিরে এল, সেখান থেকে সোজা ঘরবাড়ি ছেড়ে যোগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল। অনন্তমূর্তি এখানে একটা কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু এই ধরণের ঘটনা আমাদের পরম্পরাত্রে অনেক পাওয়া যাবে, যেখানে একজন প্রেমিক নিজের প্রেমিকাকে ভেবে ভেবে এমন হয়ে গেছে যে তার মনে সেই প্রেমিকা ছাড়া অন্য কিছু থাকছে না। লায়লা-মজনুতেও একই ঘটনা। এক অপরের চিন্তা করতে করতে করতে তাদের দেহবোধটাই চলে গেছে। যার দেহবোধ চলে গেছে তার আর চিন্তবৃত্তি কি করে থাকবে! পতঞ্জলি এই সূত্রে এই কথাই বলছেন, যে জিনিষকে আপনি খুব ভালোবাসেন, আর সেই জিনিষেরই শুধু চিন্তন করে ধ্যান করতে থাকেন তখন আপনার চঞ্চল মন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে একাগ্র হয়ে যাবে।

তাহলে আমাদের স্তরে যারা ধ্যান করি সেখানে আমাদের কী সমস্যা হয়? প্রথম সমস্যা হল যে জিনিষের প্রতি গুরু ধ্যান করতে বলে দিয়েছেন সেই বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ না থাকা, ফলে সেই বিষয়কে আমরা ধরে রাখতে পারিনা। তার থেকেও বড় সমস্যা হল, এতক্ষণ যোগে নানা

রকমের যত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, ধ্যান করতে বসলে অজান্তায় সব কটি পদ্ধতির উপর আমাদের পরীক্ষা চলতে থাকে। প্রথমে ভাবছি, জপটা একটু বেশী করেই করি। ভাবার পর জপ করা শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মনে হবে, জপ থাক ধ্যানটাই বেশী করে করি। ধ্যান শুরু হয়ে গেল। ধ্যান করতে করতে মনে হবে ঠাকুরের লীলা চিন্তনটাই করি। লীলা চিন্তন করতে করতে মনে হল গীতা পাঠ করলেও তো একই জিনিষ হবে, তাহলে গীতা পাঠটাই করা যাক। সবটাই শুভ কাজ, কিন্তু একটা শুভ কাজে মনকে পুরোপুরি না লাগিয়ে, একটা শুভকে সরিয়ে আরেকটা শুভ কাজে চলে যাচ্ছে, সেটাকে সরিয়ে আবার আরেকটাতে চলে যাচ্ছে। যদি আমি ঠিক করে নিই এক ঘন্টা আসনে বসবো, এক ঘন্টা আসনে বসে আছি ঠিকই কিন্তু এক শুভ কাজ আরেক শুভ কাজকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে যেতে থাকবে। ফলে শুভ শুভের মধ্যে এমন খেলা হতে থাকে যে শেষমেশ কোন বৃত্তিই আর নিরোধ হয় না। যেমন ছিলাম তেমনই থেকে যাই। সেইজন্য ভাগবত ধর্মে পরিস্কার বলে দেয় – এই নাও কৃষ্ণ মন্ত্র আর এই তোমার কৃষ্ণের রূপ, এবার নাম করো আর এই রূপের ধ্যান করতে থাক। এই দুটোর বাইরে এরা কেউ যাবে না, যার ফলে তাদের মনও সহজে একাগ্র হয়ে যায়। কিন্তু খাপছাড়া কিছু বই আর ম্যাগাজিন পড়ে, সাধুদের লেকচার শুনে আমাদের অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে, যার জন্য মনে হয় জপ না করে ধ্যান করি বা ধ্যান করে শুধু জপ করলেও হবে, নানা রকম মনের খেলা চলতে থাকে।

তবে সংসারে থেকে কখনই ধ্যান হওয়ার কথা নয়। এমনকি সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা খুব উচ্চমানের তাঁদেরই যা একটু ধ্যান হয়। স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের একটা ঘটনা আছে। তখন তিনি মঠের সাধারণ সম্পাদক। একদিন আরতির পর মহারাজ ঘরে আলো নিভিয়ে মশারির ভেতরে ধ্যান করছিলেন। সেই সময় কোন সাধু এক সমস্যা নিয়ে এসেছেন। উনি মহারাজের ঘর পর্যন্ত গেলেন। দেখছেন ঘরের আলো জ্বলছে না। উনিও ফিরে আসছেন। সিঁড়ির কাছে আসতেই খট করে সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠল। মহারাজের ঘর থেকে আওয়াজ এল ‘কে’? সাধুটি আবার মহারাজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ‘কী ব্যাপার’? ‘না মহারাজ, একটু সমস্যা হয়ে গেছে, তাই বলতে এসেছিলাম’। ‘ফিরে যাচ্ছিলে কেন’? ‘দেখলাম আলো বন্ধ করে আপনি ধ্যান করছেন, তাই’। ‘এটাও তো ধ্যান’। এখন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এমন অবস্থায় আছেন সেখানে উনি ধ্যান করছেন, নাকি কাজ করছেন, ওনার কাছে সবটাই সমান। কোনটাতেই ওনার স্বার্থ কিছু নেই, যেটাই করছেন ঈশ্বরের সেবা রূপে করছেন। এই অবস্থায় কোন কিছুতে তফাৎ থাকে না, এটা ধ্যান, এটা কাজ বলে কিছু থাকে না, সবটাই সমান হয়ে যায়। উনি যা কাগজ পত্র এনেছিলেন সব দেখে নিয়ে কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলেন। সাধুটি যতক্ষণ ঘরের বাইরে পা রেখেছেন ততক্ষণে উনি ঘরের দরজা বন্ধ করে আলোর সুইচ অফ করে আবার ধ্যানে বসে গেছেন।

আমরা এই জিনিষ পারবো না, সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে সব কিছুকে ধাপে ধাপে রাখা আছে। সংসার আর ঠাকুরের ধ্যান এর মাঝখানে দুটো ধাপ রাখা হয় একটা হল শাস্ত্র পাঠ বা আবৃত্তি। শাস্ত্রের কোন স্তোত্র বা অধ্যায় আবৃত্তিতে আরও সুবিধা, কারণ বহির্মুখি মন যখন মুখে আবৃত্তি করতে থাকে তখন মন ওই আবৃত্তির কম্পনের মধ্যেই অনুরণিত হতে থাকবে। সেখান থেকে এবার চোখ বন্ধ করে জপ শুরু করে দিতে হবে। এবার জগৎ আর ঈশ্বরের মাঝামাঝিতে মন চলে গেল, সেখান থেকে ধ্যানে চলে যেতে পারবে। ধ্যান থেকে যখন আবার সরাসরি কাজে নামবে তখন একই সমস্যা হবে। ধ্যান থেকে তাই আবার ধাপে ধাপে ফেরত আসতে হবে। ধ্যানের পর একটু জপ করে নিল, তারপর একটু কথামৃতাদি কোন শাস্ত্র পাঠ করল বা মনে মনে পড়ে নিল, তারপর আস্তে আস্তে জাগতিক কাজে নেমে আসবে। এই হল আমাদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি। পতঞ্জলি বলছেন, যে কোন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল, আপনি জপই করুন আর ধ্যানই করুন, একটি বৃত্তিতে মনকে নিয়ে আসা, অর্থাৎ মনে যে অসংখ্য বৃত্তি অনবরত উঠছে সেটাক কমিয়ে আনা। এতগুলো যে পদ্ধতির কথা বলা হল সবার এই একটাই উদ্দেশ্য, এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে যত তাড়াতাড়ি ধ্যানে ঢুকতে পারা যায় তত ভালো, কিন্তু ধ্যান যদি না হয় তাহলে জপ করবে, জপ করতে পারছে না তখন পাঠ করবে। কিন্তু এগুলো কত দিন ধরে করবে? সাধক জীবনের দুই এক বছর করবে, তারপর ধ্যানের দিকেই বেশী জোর দিতে হয়।

দু বছর ধরে সাধনা করে যাচ্ছেন কিন্তু মন বসাতে এখনও আপনাকে এক ঘন্টা পাঠ করতে লাগে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার কিছু গোলমাল আছে।

এর আগে আমরা একটা সূত্র পেরিয়ে এসেছি, যে সূত্রটাকে আমরা রাজযোগের সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বলতে পারি – *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ*। আমি যে ধ্যানই করি না কেন সেটাকে দীর্ঘকাল, নিরন্তর ভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবার মনোভাবে করার পর চিত্তের দৃঢ়ভূমি হয়, তা নাহলে অদৃঢ়ভূমি হয়ে থাকবে। চোরাবালির মধ্যে যদি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তখন সড়াৎ করে ভেতরে দিকে ঢুকে যাব, এক সেকেণ্ডের জন্যও দাঁড়াতে পারবেন না। আমাদের যত সাধনাদি, জপ-তপ করা এগুলো সব এই চোরাবালির মত। কিন্তু এটাকে মার্বেল মেঝের মত দৃঢ়ভূমি করতে হবে। এই মেঝের উপরে আপনিও দাঁড়াতে পারেন আরও পঞ্চাশ জনকে চেয়ার টেবিল নিয়ে দাঁড় করাতে পারেন। এই রকম দৃঢ়ভূমি করার জন্য দীর্ঘকাল, নিরন্তর আর শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধনা করে যেতে হবে। যতদিন দিনে ছয়-সাত ঘন্টা সাধনা না করা যাচ্ছে তাও বহু দিন ধরে না করলে কিছুই হয় না। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে একজন দীক্ষা নিয়ে বলছেন ‘গুরুদেব, আপনি যে বললেন দিনে দুবার একশ আটবার করে জপ করতে, এখন আমি যদি না করতে পারি তাহলে আমার কি হবে?’ বিজ্ঞান মহারাজ বলছেন ‘কি আর হবে, যেটা হবার ছিল সেটা হবে না’। এভাবে কখনই কিছু হয় না। এখন নিজের কাছে প্রশ্ন করুন আপনি নিজে কি চান। আপনি কি চান আপনার মঙ্গল হোক, আপনি কি চান আমি যোগী হতে চাই, আপনি কি চান আমার ঈশ্বর দর্শন হোক, যদি চান তাহলে দীর্ঘকাল, নিরন্তর আর শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধনা করে মনের সমস্ত আবর্জনা গুলোকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

তাই বলছেন যে কোন জিনিষ যেটাই ভালো লাগছে, যেমন ঠাকুরের কাছে একজন মহিলা যেমন বলেছিলেন যে তার ভাইপোর ওপর খুব মন, শুনেই ঠাকুর বলছেন ‘তুমি ভাইপোকেই গোপাল মনে করে ধ্যান করবে, ওকে খাওয়াচ্ছ কিন্তু মনে করবে তোমার ইষ্ট দেবতাকেই খাওয়াচ্ছ’। এইভাবে করে করে কয়েক দিন পরেই তার ভাইপোর ওপর থেকে মায়া মমতা চলে গেল। যে কোন লোককে, বাড়িতে বা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাকে খুশি, যে কোন পুরুষকে কোন মহিলা বা যে কোন মহিলাকে কোন পুরুষ, বা তার সন্তান, স্বামী, তার ভাই, বোন, নাতি, নাতনী যে কাউকে যদি কেউ বলে ইনিই আমার ইষ্ট, আর ঠিক ঐভাবে যদি তাকে দেখে ইনিই আমার ইষ্ট, আর এইটাকে নিয়েই সে যদি ধ্যান করে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই তার সব কিছু পাল্টে যাবে।

এর কারণ পতঞ্জলি পরের সূত্রে বলছেন – *পরমাণু-পরমতত্ত্বাত্তোহস্য বশীকরঃ॥৪০॥* মহৎ, মহতেরও পরম মানে অনন্ত, বিরাট আবার তার সাথে পরমাণু, সব থেকে যেটা ছোট – এই তিনটে – পরমাণু, পরম ও মহৎ অর্থাৎ সব থেকে ছোট থেকে বৃহৎ পর্যন্ত তখন তার অবাধ গতি হয়ে যায়। সব থেকে ক্ষুদ্র আর সব থেকে বৃহৎ বলতে যা কিছু আছে এর কোনটাই আর আপনার বিঘ্নোৎপাদন করতে পারবে না। বিঘ্ন না করতে পারার জন্য আপনার মন ছুটে গিয়ে সমাধিতে লয় হয়ে যাবে। আমাদের মন সমাধিতে কেন লয় হয় না? একটা যেমন বৃত্তির কারণ নিয়ে বলা হয়েছে, এবার অন্য দিক থেকে সমাধি না হওয়ার বিঘ্নের কারণ দেখানো হচ্ছে। অনেকে এসে বলেন আমার নাতির জন্য ঠাকুরের দিকে মন দিতে পারিনা, যেমন এক হরিণ শাবকের জন্য জড় ভরতের মন আর ধ্যানে থাকতে চাইছে না, পুরো মনটা তাঁর হরিণের দিকে চলে গেছে। কিছু না কিছু বিঘ্নাত্মক চিন্তা যোগীর মধ্যে থেকে যায়। কিছু না কিছু জিনিষ আমাদের মনকে টেনে নেবে, সেগুলো ছোটও হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। যাকে আপনি খুব ভালোবাসেন সে আপনার মন টেনে নিচ্ছে বা কোন সুখ আপনার মন টেনে নেবে, কিংবা কোন সুবিধা পাওয়া বা বিশেষ কোন বস্তুর জ্ঞান মনকে টেনে নেবে। মনকে টেনে নেওয়া মানে এগুলোই বিঘ্ন রূপে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। যোগীর যে মন সমাধিতে চলে যেতে চাইছে সেটাতে বিঘ্ন এসে যাচ্ছে। ছোট থেকে বড় কিছু না কিছু বিঘ্ন আছে। কিন্তু এর আগে যত রকম উপায়ের কথা বলা হয়েছে ঈশ্বরপ্রনিধাণ বা প্রাণায়াম, এগুলোর অনুশীলন করতে করতে পরমাণু, পরম ও মহৎ সব কিছুর উপর আপনার বশীকরণ মানে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসবে। একটা জিনিষের উপর নিয়ন্ত্রণ

ক্ষমতা কীভাবে আসে? যে জিনিষটাকে আমরা জেনে যাই সেই জিনিষের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসে। জ্ঞান মানেই পুরো ক্ষমতা চলে আসা। ঠাকুর গল্প করছেন – পাহাড়ের উপর কুঁড়ে ঘর। একদিন খুব বাতাস উঠেছে। যার ঘর সে তখন বলছে এটা হনুমানের বাড়ি। তারপরেও বাতাস বন্ধ হচ্ছে না, এরপর সে একবার বলছে রামের বাড়ি, তারপর বলছে লক্ষ্মণের বাড়ি, বায়ুদেবতার বাড়ি। এত সব বলার পরেও যখন দেখছে যে বাড়িটা এবার সত্যি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, একে আর রক্ষা করতে পারবে না। এবার তার জ্ঞান হয়ে গেল। কী জ্ঞান? এই বাড়িকে আর বাঁচানো যাবে না। জ্ঞান আসার সাথে তার শক্তিও এসে গেল। তখন বলছে – শালার বাড়ি। এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিই বিঘ্ন। এগুলো কিসের প্রতি আছে? কোন বস্তুর প্রতিই আমাদের কাম ক্রোধাদি আছে। কিন্তু যখন দেখছি পরমাণু থেকে পরম মহৎ তত্ত্ব, ছোট থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা কিছু আছে তার মধ্যে কোন কিছু নেই যেটা আমার বাধা হতে পারে, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ি কোন কিছুই আপনাকে আটকাতে পারবে না। যদি না আটকাতে পারে তখন কী হবে? যদি বিঘ্নই কিছু না থাকে তাহলে কোন বৃত্তিও উঠবে না, কোন বৃত্তিই যদি না থাকে মন হুশ করে তখন সমাধিতে ঢুকে যাবে। কিন্তু এই সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

এই সূত্রটাই আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমাদের বাইরের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয় রয়েছে এর কোন মূল্যই নেই, তার পেছনে যে তন্মাত্রাগুলো বা ভাব রয়েছে সেটাই আসল। স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং শূন্য এই চারটে অবস্থা চলতে থাকে। যেমন প্রত্যেকের একটা নাম আছে, কিন্তু তার পেছনে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার রয়েছে। সেই সূক্ষ্মের ভেতরে আবার একটা সূক্ষ্মতর ব্যাপার আছে। তারপরে কি আছে? শুধু সেই সচ্চিদানন্দ, শূন্য, এখানে বস্তুর দিক থেকে শূন্য বলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সচ্চিদানন্দে পৌঁছান, তাই এই স্থূলটার একেবারেই কোন মূল্যই নেই। আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা বহু জন্মের সংস্কারের ফলে এত জড় হয়ে গেছি, আর আমাদের বুদ্ধি এতো কম, এত মন্দবুদ্ধি হয়ে গেছে যে, এটা যে শুধু আমার আপনার কথা বলছি তা নয়, সারা জগতে এই জিনিষই চলছে। সূক্ষ্ম জিনিষ গুলোর ধারণা করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে গেছে।

এতক্ষণ যে জিনিষগুলোর বর্ণনা করা হল, এগুলো করলে কি হয়? বলছেন যোগীর মন বাধা মুক্ত হয়ে যায়। আমাদের মন এখন নানা ভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়ে স্থূল হয়ে আছে। যখনই এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করতে থাকবে তখন এই বন্ধন গুলো আলগা হতে শুরু করে, পাথরের মত যেটা জমাট বেঁধে আছে ওটা নরম হতে শুরু করে। এখানে একটা কয়লার টুকরো রাখা আছে, এটা এখন জমাট বেঁধে আছে। এখন যদি একটা হাতুড়ির ঘা কয়লার উপর মারা হয়, টুকরোটা আরো ছোট ছোট টুকরোর আকারে চলে যাবে, আর যদি কয়লার টুকরোতে আগুন দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ধুয়ো হয়ে ছড়িয়ে যাবে। এখন কয়লাটা যেখানে খুশি যেতে পারবে, মানে কয়লাটা এখন বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল। যেখান দিয়ে খুশি, জানলা দিয়ে, দরজা দিয়ে, ভেন্টিলেটর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। মনেরও ঠিক তাই হয়, মন এখন একেবারে নিরেট পাথরের মত হয়ে আছে, যখনই ধ্যান করতে শুরু হয় তখন এই জমাট অবস্থাটা আলগা হতে শুরু করে। যখন আলগা হতে থাকে তখন সে মুক্ত হতে শুরু করল। মুক্ত যখন হয়ে গেল তখন এই মনের পক্ষে যে কোন জিনিষের জ্ঞান প্রাপ্ত করা সহজ হয়ে যায়। মনটা এত কমনীয় ও নমনীয় হয়ে গেছে যে সে এখন যে কোন জিনিষকে আয়ত্ত করে নিতে পারবে, যেমন ধুয়ো পুরো ঘরকেই ঢেকে দিতে পারে। অথচ এটাই যখন কয়লার আকারে পড়ে ছিল তখন কোন কাজ করতে পারছিল না। যোগীর মন ঠিক তাই, যখন তার মন যেখানে লাগাবে সেইটার জ্ঞানই প্রাপ্ত করে নেবে। যদি সে গাছের ব্যাপারে জানতে চায় তখন সে যেমনি পুরো মনটাকে গাছে লাগিয়ে দেবে তখনই গাছের সব বিদ্যা সে জেনে যাবে। এর কারণ হল তখন যোগীর মস্তিষ্ক সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু যোগীর কাছে এরও কোন গুরুত্ব নেই। কি গুরুত্ব এই সূত্রে বলছেন –
ক্ষীণবৃত্তেরতিজাতস্যেব মণেগ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেবু তৎস্থ-তদজ্ঞনতা-সমাপত্তিঃ।।৪১।। যোগীর

মনের সমস্ত বৃত্তি যখন নির্জীব হয়ে নাশ হয়ে যায় তখন যোগীর আর কোন কিছুই প্রতিই কোন আকর্ষণ থাকে না। বৃত্তি নির্জীব হয়ে যাওয়া মানে সব কিছু নিজের আয়ত্তে চলে আসা, যোগী জেনে গেছেন এগুলো কি, এরপর তাঁর মন আর চঞ্চল হবে না। তখন কী হয়? তখন তিনটে যন্ত্র – যে জিনিষটাকে গ্রহণ করা হচ্ছে, যিনি গ্রহণ করছেন আর যার সাহায্যে গ্রহণ করা হচ্ছে, এই তিনটে জিনিষ সমান হয়ে যায়। গ্রহীতৃ, মানে যিনি গ্রহণ করেন, গ্রাহ্য, মানে বস্তু আর গ্রহণ মানে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া, এই তিনটে এক হয়ে যায়। এখানে যোগী তিনটে বস্তুকে স্পষ্ট আলাদা আলাদা দেখতে পাচ্ছেন – গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ। এই তিনটির ব্যাপারেই যোগীর মন একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় আর তিনটেকেই সে পরিষ্কার আলাদা দেখতে পায়। যেমন আমি এই ডাস্টারটাকে দেখছি, এই দেখার যে প্রক্রিয়া – চোখ দিয়ে যাচ্ছে মস্তিস্কের স্নায়ুতে, স্নায়ু দিয়ে যাচ্ছে মনে, মন সেটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার পেছনে যে চৈতন্য রয়েছে, যাকে আমরা পুরুষ বা আত্মা বলছি, তার কাছে। যোগী এই তিনটেকেই পরিষ্কার পৃথক ভাবে দেখতে পারেন, এটা বস্তু, এটা বুদ্ধি আর এটা পুরুষ।

আরেকটু বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে। আপনি টানা ধ্যান করে যাচ্ছেন আর সমস্ত বাধাগুলোও অপসারিত হয়ে গেছে তখন গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই তিনটে মিলে একটি বৃত্তি হয়ে যায়। এখানে গ্রহীতা হলেন সেই পুরুষের সত্তা, গ্রহণ মানে যে ইন্দ্রিয় দিয়ে ক্রিয়াটা হচ্ছে আর তার প্রক্রিয়া আর গ্রাহ্য হল বিষয়। এই তিনটে মিলে এক হয়ে যাওয়াটা কী রকম? যখনই আপনি কোন একটা বিষয়কে নিয়ে ধ্যান করছেন, যেমন একটা ফুল বা জ্যোতির অথবা আপনার ইষ্টের উপর ধ্যান করছেন। সবটাই এই জগতের বিষয়, তখন এই বিষয় আলাদা আমার চিত্ত আলাদা আর যিনি চৈতন্য সত্তা তিনি আলাদা। এই তিনটে প্রথম অবস্থায় পরিষ্কার আলাদা থাকার জন্য আমি দেখছি একটা ফুলকে, আর বিচার করতে পারছি এই ফুলের রঙ এই রকম, এর গন্ধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু যখন ধ্যানের গভীরে চলে যায় তখন তিনটে মিলে এক হয়ে যায়। তিনটে মিলে এক হওয়া মানে, যে জিনিষকে ধ্যান করছে সেই বিষয়ের সঙ্গে এই তিনটে মিলে এক হয়ে যায়। স্ফটিকের উপমা দেওয়া হয়। স্ফটিকের সামনে যদি একটা লাল ফুল রেখে দেওয়া হয় তখন স্ফটিকটা পুরো লাল হয়ে যাবে। নীল রঙের ফুল রেখে দিলে নীল রঙ হয়ে যাবে। তখন আলাদা কোন ভাব আর থাকে না।

বলছেন, যোগীর মন এমন পরিষ্কার যে একেবারে স্ফটিকের মত হয়ে গেছে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে যাওয়াতে ধ্যানের বিষয়ের আকৃতিটা তার হয়ে যায়। এটাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে বস্তু বা বিষয়কে নিয়ে যোগী ধ্যান করছে সেই বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে যোগী এক হয়ে যায়, তাকে আর আলাদা করা যায় না। যোগীর আমি বোধটা কিন্তু তখনও থেকে যায়। ভাগবতে রাসলীলাতে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে করে এমন হয়ে গেছেন যে বলছেন ‘আমি কৃষ্ণ হয়েছি’। রাসলীলাতে এখানে গোপীদের আমি বোধটা আছে আর কৃষ্ণ বোধটাও আছে। এখানে ধ্যাতা, ধ্যেয় আর ধ্যান তিনটে এক হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বোধটা থেকে যাওয়ার জন্য বলছেন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যদিও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, কিন্তু মনের এটি খুব উচ্চতম একটি অবস্থা।

অনেকে এসে বলে আমার ঠাকুরের দিব্য দর্শন হয়েছে বা ইষ্টের দর্শন হয়েছে। আমরা কী করে বুঝবো এই দর্শন দিব্য নাকি ভ্রান্তি দর্শন? এই সূত্রেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যিনি বলছেন আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন লাভ করেছি, তার মানে তাঁর সমস্ত বৃত্তি থেমে ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এটাই ঠিক ঠিক দর্শন, এর বাইরে কোন দর্শনের কোন দাম নেই। বাকি সব দর্শন সম্পূর্ণ মনের ভ্রান্তি। যিনি ঠাকুরকে দর্শন করছেন তার মানে দাঁড়াল তাঁর বাকি সব বৃত্তি নাশ হয়ে গেছে। সব বৃত্তি নাশ হয়ে গেলে কি হবে বলতে গিয়ে বলছেন গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেযু তৎস্ব-তদঙ্গনতা-সমাপত্তিঃ, স্ফটিক আর ফুল যেমন একাত্ম হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যোগী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন। যোগী আর শ্রীরামকৃষ্ণ দুজন আলাদা কিন্তু হয়ে গেলেন একাত্ম। একাত্মটা কোথায় দেখা যাবে? তাঁর মনে দেখা যাবে না, সংসারে একাত্ম দেখা যাবে, তাঁর যে আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা সব কিছুতে দেখাবে তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। যেমন গোপীরা বলছেন ‘আমি কৃষ্ণ হয়েছি’। গোপীরা এরপর

সংসারে আর আগের মত আচরণ করতে পারছেন না, কারণ তাঁদের মন পুরো আলাদা হয়ে গেছে। অন্য কোন দিকে আর তাঁদের মন যাবে না। এই যে ভাব, যেখানে গ্রহীতা, গ্রহণ আর গ্রাহ্য এই তিনটে মিলে যতক্ষণ এক না হয় ততক্ষণ কোন রকম দিব্য দর্শনের কোন দাম নেই। এই দর্শন যখন হয় তখন এটাই সরাসরি ধরা পড়বে তাঁর বাহ্যিক আচরণে। এই জগতের দিকে তাঁর আর কোন দৃষ্টি থাকবে না। তখন তিনি যদি কিছু করেন সেটাও জীব বা জগতের মঙ্গলের জন্যই করবেন। যিনি সবাইকে ঠাকুর রূপে দেখছেন তখন কি আর কারুর সাথে তাঁর ঝগড়া করতে ইচ্ছে হবে নাকি কাউকে বেশী কাউকে কম ভালোবাসতে পারবেন! রাগ দ্বेष থেকেই সব সমস্যা সৃষ্টি হয়, রাগ দ্বেষ থেকেই আসে শোক মোহ। যিনি সবাইকে ঠাকুর দেখছেন তখন কাকেই বা দ্বেষ করবেন আর কাকেই বা বিদ্বেষ করবেন, তখন সব সমান হয়ে যায় বলে শোক মোহও আর আসবে না। সেইজন্য ঠিক ঠিক দিব্য দর্শন আচরণে গিয়ে পরিষ্কার ধরা পড়ে।

জগতের যত জ্বল বিষয় আছে আর তার যে জ্ঞান সেটা চিত্তে গিয়ে পড়ছে, বলা হয়েছিল যে চিত্ত হল যেন একটা প্রকাণ্ড জলাশয় বা হ্রদের মত, এই চিত্তই যখন আবার বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালন করে তখন তাকেই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার বলা হয়। এই যে চিত্ত, এখানে জগতের সমস্ত কিছুর যে জ্ঞান সংগ্রহিত হচ্ছে, আর এই জ্ঞানকে যাঁর কাছে পাঠান হয় তিনি হলেন চৈতন্য, এই চৈতন্যকেই বলা হয় পুরুষ বা আত্মা বা জীবাত্মা। এই চিত্ত, জ্ঞান, আর পুরুষ পুরো আলাদা হয়ে যায়। কিভাবে আলাদা হয় সেটাই পরের সূত্রে বলা হচ্ছে।

বিভিন্ন সমাধি অবস্থার বর্ণনা

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্ঘীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।।৪২।। এর আগে বলা হল কোন কারণে সমাধিতে যখন শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিলে যদি এক হয়ে যায় তখন এই সমাধিকে বলছেন সবিতর্ক সমাধি। আর সমাধিতে যখন এই তিনটে আলাদা হয়ে যায় তখন তাকে বলছেন নির্বিতর্ক সমাধি। যে কোন জ্ঞানের তিনটে ধাপ থাকতে হবে। প্রথম ধাপ শব্দ, দ্বিতীয় ধাপ অর্থ এবং তৃতীয় ধাপ জ্ঞান। যেমন ধরুন আপনারা আমাকে শুনছেন, আমাকে দেখছেন এই প্রক্রিয়াটা তিনটে ধাপে সম্পূর্ণ হয়। প্রথম আমার কথাগুলো আপনাদের কাছে ধ্বনি হয় কানে যাচ্ছে, বাতাসের মাধ্যমে কথাগুলো ভেসে আপনার কানে ধাক্কা মারছে, সেখানে থেকে সেই শব্দটা আপনার মনের কাছে পাঠান হচ্ছে। প্রথমে গিয়ে শব্দটাই লেগেছে। এইটাই বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি। যখন সেখান থেকে মনের কাছে সরবরাহ হচ্ছে তখন সেখানে শব্দের অর্থটাকে বোঝার কাজটা বুদ্ধি করতে থাকে, বুদ্ধি হল নিশ্চয়্যাত্মিকা, বুদ্ধি এই শব্দটাকে নিশ্চিত করে বলে দেয় শব্দের এই অর্থ। কিন্তু এই অর্থের যে জ্ঞান এটা পুরোপুরি আলাদা। যেমন ধরুন, একটা কুকুর ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল, ভৌ ভৌ একটা শব্দ হয়ে গেল, এই শব্দের একটা অর্থও হয়ে গেল, অর্থ হল কুকুর ডাকছে। কিন্তু এরপরে জ্ঞানের ব্যাপারটা পুরো আলাদা, ওই কুকুর কি বলতে চাইছে এই জ্ঞান আমার কোন দিন হবে না। এটা কুকুরের ডাক এটুকুতেই আমাদের জ্ঞান সীমিত থেকে যাবে। একটা ছোট বাচ্চা যখন কাঁদে তখন আমাদের কাছে সেটা শুধু বাচ্চার কান্না রূপেই থেকে যাবে। কিন্তু বাচ্চার মা ওই কান্না শুনেই বুঝে যায়, বাচ্চার খিদে পেয়েছে বলে কাঁদছে, নাকি ঘুম পেয়েছে বলে কাঁদছে। এখানে শব্দ বলতে ইন্দ্রিয়ের সব ক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছে, কান দিয়ে শুনছি সেটাও যেমন শব্দ, চোখ দিয়ে দেখছি সেটাও শব্দ আর নাক দিয়ে যে ভ্রাণ নিচ্ছি সেটাও শব্দ, সবটাই শব্দ। শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এই তিনটে প্রথমে মিশে থাকে। সব সময় আমরা অত বিচার করি না যে, শব্দটা এল, কান দিয়ে যাচ্ছে, মস্তিষ্কে গিয়ে শব্দের একটা আকার তৈরী হচ্ছে, সেখান থেকে একটা অর্থ বেরিয়ে এল। অর্থ বেরিয়ে আসার পর আমার যে চৈতন্য সত্তা তাঁর কাছে গেল, সেখানে গিয়ে জ্ঞানোদয় হল, এভাবে কখনই আমাদের কিছু হয় না। যখন আমাকে বলা হল ‘পালাও’ তখনই সঙ্গে সঙ্গে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এক হয়ে পালাতে থাকলাম। শুধু শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানই একসাথে হচ্ছে না, এর সাথে ক্রিয়াও এক সঙ্গে হচ্ছে। যেখানে ক্রিয়া হচ্ছে না সেখানেও শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান মিশে থাকে। কোন খবরকে যখন নিয়ে যাওয়া হয় সেই conscious principle অর্থাৎ চৈতন্যের জন্য, তিনি তখন

তিনি ঐ জ্ঞানের ওপরে একটা আবরণ ছুঁড়ে দেন। এই যে আবরণটা ছুঁড়ে দিলেন, এটাকেই বলছেন জ্ঞান। যখন বিভিন্ন ধরণের সমাধি হয়, বিশেষ করে যখন কোন বস্তুর উপর ধ্যান করা হয়, তখন বস্তু জ্ঞান তার হবে কিন্তু সেখানে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটে মিশে থাকে। এর খুব সহজ উপমা দেওয়া যেতে পারে, টিভির স্ক্রীনে যখন আপনি কোন সিনেমা বা খেলার দৃশ্য দেখছেন তখন আপনার মন খুব একাগ্র হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আপনার শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিলে মিশে এক হয়ে আছে। পতঞ্জলি বলছেন যত রকমের সমাধির কথা বলা হল এগুলো সবই সবিতর্ক সমাধি। কেন সবিতর্ক সমাধি? কারণ এতে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিশে থাকে।

এই তিনটে এমন নিবিড় ভাবে মিশে থাকে আর আমাদের প্রতিক্রিয়ার সময় এত কম যে এদের আলাদা অস্তিত্ব বোঝাই যায়না। দুজনে ঝগড়া করছি, আপনি আমাকে একটা গালাগাল দিলেন আমি তার প্রত্যুত্তরে আরেকটা গালাগাল দিলাম, এইভাবে এক অপরকে গালাগাল দিয়েই চলেছি। রাতের অন্ধকারে অজানা একটা বস্তুকে দেখার পর সে বিচার করছে, চিন্তা করছে আর বস্তুটাকে নিরূপণ করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঝগড়-ঝাটি যখন হচ্ছে তখন কিন্তু আর বিচার করা, সংশয়, সন্দেহ এই পার্থক্য গুলো থাকছে না। এখানে কি হচ্ছে – আপনি আমাকে গাধা বললেন, আমি আর চিন্তাচিন্তা কিছুই করছি না, না করে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম আপনি পেঁচা, আমাকে কোন চিন্তা করতে হচ্ছে না, মানে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিশে গেছে, চক্ৰিশ ঘন্টাই এই শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিশে থাকে। চারটে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর মেয়েকে যদি এক জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ওরা কি বলছে আর কি শুনছে কিছুই মানে বোঝা যাবেনা, চাঁই চাঁই করে কথার ফুলঝুড়ি ঝরতেই থাকবে। দূর থেকে আমরা মনে করছি এরা না বুঝেই সব কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু তা না, এদের শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিশে রয়েছে। এ একটা কথা বলছে, এর অর্থ যাচ্ছে, তার জ্ঞান তৈরী হচ্ছে, জ্ঞানের আকার নিচ্ছে আর তার সাথে সাথেই কিন্তু ওদের উত্তরটাও থাকে। যখনই দেখলেন উত্তর এসে গেছে তখন এটা বুঝিয়ে দিল যে, যে শব্দটা গিয়েছিল সেই শব্দের জ্ঞানের আকার ধারণটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এতক্ষণ যত রকমের সমাধির কথা বলা হল এতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান মিশে থাকে। এবার বলছেন আসল ব্যাপার। এর থেকেও যেটা আরও উচ্চ স্তরের সেই সম্বন্ধে পরের সূত্রে বলছেন **স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।।৪৩।।** এই সূত্রে আমাদের ঠিক ঠিক সমাধির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখানে এসে আর কোন বিচার থাকে না, এই অবস্থাকে বলছেন নির্বিতর্ক। **স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ**, স্মৃতি এমন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, **স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা**, তখন আর স্বরূপকে নিয়ে চিন্তা করে না। তাহলে কী করে? **অর্থমাত্রনির্ভাসা**, শুধু মাত্র অর্থটাই ভেসে থাকে, অন্য আর কোন কিছু ভাসে না। মনে করুন আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছেন। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার জন্য আপনার দুটো জিনিষ লাগবে। প্রথমে লাগবে একটা রূপ, তা সে ছবিই হোক বা মূর্তিই হোক আর অন্যটা হল নাম, যেমন হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। তাহলে দাঁড়াল শব্দ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তার অর্থটা আসবে না, আর অর্থ না আসলে জ্ঞান হবে না। অর্থের দ্বারা কী জ্ঞান হবে? আমি হরির নাম করছি, আমি হরির ধ্যান করছি। এই করতে করতে আপনি পুরো ডুবে গেলেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু নির্বিতর্ক সমাধি যখন হবে তখন শব্দের আর দরকার হবে না। বাহ্যিক যে শব্দ আসছিল সেটা আর থাকবে না। তাহলে কী থাকবে? **অর্থমাত্রম্**। আপনি এতদিন যে কৃষ্ণের ধ্যান করেছেন, যার জন্য কৃষ্ণ শব্দের যে অর্থ একমাত্র সেটাই থাকবে, আর সেখান থেকেই জ্ঞান হয়ে যাবে। তার মানে এখন আর ঠাকুরের মূর্তি বা শ্রীকৃষ্ণের রূপের আর দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণ নামেরও দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে পরিপূরণ করে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র। তন্ত্রেও এইভাবে বলা হয়, দেবীর প্রতিমা আছে আর ওই প্রতিমার সঙ্গে মন্ত্র আছে। মূর্তি বা প্রতিমা যা মন্ত্রও তাই। আর তার সঙ্গে তন্ত্র যন্ত্রকে নিয়ে আসে। মন্ত্র যা যন্ত্রও তাই, আর যন্ত্রও যা প্রতিমাও তাই। তখন এগুলোর যে কোন একটার উপর মনকে একাগ্র করতে পারলে উদ্দেশ্যটা পূরণ হয়ে যায়। আমরা যখন ধ্যান করি তখন ঠাকুরের মূর্তির সামনে গিয়ে বসতে হবে, ঠাকুরের মূর্তিকে কিছুক্ষণ দেখতে হবে, তারপর ঠাকুরের নাম জপ করতে হবে।

এগুলো করা এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থের উপর যাতে মনকে একাগ্র করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থ মানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব। ঠাকুরের একটি রূপ আছে, ঠাকুরের একটি নাম আছে আর ঠাকুরের একটি ভাব আছে। সেইজন্য যতক্ষণ নাম আর রূপকে নিয়ে ধ্যান করা হয়, এটাও ভালো, কিন্তু তখন তা সবিতর্ক সমাধি পর্যন্তই নিয়ে যাবে। যখন নাম ও রূপকে ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের ভাবের উপর মন পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন এটাই হয়ে যাবে নির্বিতর্ক সমাধি। এখন আর আপনার বাহ্যিক কোন বিষয়কে অবলম্বন করার প্রয়োজন হবে না, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপেরও দরকার নেই, শ্রীরামকৃষ্ণের নামেরও দরকার নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের যে অর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব আর তার যে জ্ঞান সেটা এবার নিজে থেকেই এসে যাবে। আপনি এতদিন যে বস্তুর উপর ধ্যান করে আসছিলেন, যেমন যিনি কোন জ্যোতির উপর ধ্যান করছিলেন, সূর্যের জ্যোতি বা কোন শিখা, যে কোন জ্যোতির উপর ধ্যান করছিলেন, তাঁকে আর এখন কোন জ্যোতিকে ভাবতে হবে না। এই ধ্যান খুব উচ্চমানের ধ্যান। এখন আর কোন বস্তুর দরকার হবে না, অর্থ মাত্র হলেই হয়ে যাবে, আর অর্থ থেকেই জ্ঞান হয়ে যাবে।

অন্য দিকে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এই তিনটির মধ্যে যে সম্পর্ক চলছিল, এই তিনটেও পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাবে। যদি কোন শব্দ আসে তখন সেই শব্দ আলাদা হয়ে যাবে, তার সাথে অর্থ আর জ্ঞানও আলাদা হয়ে যাবে। সবিকল্প সমাধিতে যে তিনটে মিশে ছিল, নির্বিতর্ক সমাধিতে এই তিনটে আর মিশে থাকে না। যদি কোন পাখি ডাকে, পাখি ডাকছে বলে তার একটা শব্দ আসবে, শব্দ হলে তার একটা অর্থ থাকবে আর অর্থ থাকলে তার একটা জ্ঞান আছে। এই স্তরের যাঁরা যোগী যখন পাখির ডাক শুনলেন তখন তাঁর কাছে শব্দের কোন গুরুত্ব নেই, তিনি অর্থের উপরে যদি গভীর ভাবে চিন্তন করেন, তখন ওই অর্থ থেকে জ্ঞান তাঁর সরাসরি হয়ে যাবে। ফলে পাখি কি বলতে চাইছে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন। শব্দ, অর্থ আর জ্ঞানের যে সম্পর্ক হয়ে আছে সেই সম্পর্কটা যোগীর কাছে কেটে গিয়ে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান তিনটেই আলাদা হয়ে যায়। ধরুন একটা ছোট্ট পাখির খিদে পেয়েছে, পাখিটি তখন চিঁচিঁ করে মাকে ডাকছে। পাখিটির যে খিদের জ্ঞান সেটাকে শব্দের মাধ্যমে তার মায়ের কাছে পাঠাচ্ছে। সেই শব্দ এখন যোগীর কাছেও আসছে, কিন্তু তিনি জানেন না পাখিটি কী বলতে চাইছে, কারণ তিনি পাখির ভাষা জানেন না। তখন তিনি শব্দের অর্থের উপর যদি ধ্যান করেন তখন শব্দের জ্ঞানটাও সরাসরি এসে যাবে। তিনি পরিষ্কার বুঝে যাবেন পাখিটি কী বলতে চাইছে। তাহলে তাঁকে যদি পশুপাখিদের ভাষার উপর একটা বই লিখতে বলা হয়, তিনি কিন্তু তা লিখতে পারবেন না, কিন্তু তিনি বলে দেবেন এই পশু বা পাখি এই বলছে। যারা ওয়াল্ড লাইফ নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা পশুপাখিদের আওয়াজের অনেক রকম বর্ণনা দেন। সেইভাবে এনারা বলতে পারবেন না। ঠাকুরও বলছেন, এক সময় তিনি পশুপাখির আওয়াজ বুঝতে পারতেন।

এইভাবে যখন তিনটেকে আলাদা করে নেওয়া হল, তারপর এই শব্দের ওপর যখন মনকে একাগ্র করে করে সেই অবস্থায় যে সমাধি হবে তার একটা বিশেষ নাম আছে। যে কোন শব্দের উপরেই মন একাগ্র করতে পারা যায়। প্রথমটা আসছে বহির্জগতের যে কোন ধরনের কম্পন, পাখা চলছে, সবুজ গাছপালা আছে, আকাশ কালো হয়ে আসছে, অথবা বাতাসে কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, কিংবা আপনাকে কেউ স্পর্শ করছে – সব কিছুই শব্দ। যখন এই শব্দটা আমার কাছে আসছে তখন এর অর্থ তৈরী হচ্ছে। আমি এই সবুজ গাছের দিকে তাকালাম – প্রথমে আমার চোখের উপরে বাইরে থেকে একটা আলোর কম্পন এসে পড়ল, সেই বার্তাটা বহন করে নিয়ে গেল ভেতরে মস্তিষ্কে, অর্থ তৈরী হয়ে গেল - গাছ, আর সব শেষে হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞান আর অর্থ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আসল অর্থ যখন হয় তখন তার সাথে প্রতিক্রিয়া জড়িত থাকে – যদিও অনেক সময় এই অর্থটা পরিষ্কার থাকে না কিন্তু প্রতিক্রিয়া থাকবেই। যেমন এখানে গাছ দেখে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে – বাঃ, কি সুন্দর সবুজ গাছ, এটাই আপনার প্রতিক্রিয়া, বা আহা রে গাছটা মরে যাচ্ছে – এটা আবার অন্য প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াতে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে জ্ঞান এখনও জড়িয়ে আছে।

হাওড়া স্টেশনে এক একটা ট্রেন এসে থামছে আর লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে চলেছে সাবওয়ে দিয়ে। এর কিন্তু সব কটারই শব্দ হচ্ছে, অর্থ হচ্ছে আর জ্ঞানও হচ্ছে। আমাদের জ্ঞান হচ্ছে লোকগুলো ছুটেছে, এখন ভীড়ের মধ্যে যদি আমার কোন বন্ধু আমাকে দেখে থাকে তখন সে আমার নাম ধরে চেষ্টা করে ডাক দিল আর আমার সমস্ত প্রক্রিয়াটা খ্যাঁচ করে আমার নাম ধরে ডাকার শব্দে গিয়ে আটকে যাবে। এইখানেও শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিশে আছে আর এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শব্দ, অর্থ আর জ্ঞানকে আলাদা করার পর শব্দের ওপরে ধ্যান করে যে সমাধি হয়, সেটা এক ধরনের সমাধি, কিন্তু এর থেকে আরও উচ্চ সমাধি হবে অর্থের উপরে মনকে একাগ্র করার পর যে সমাধি হয়। এর সহজ উদাহরণ হল একটা পাথর পুকুরে ছুঁড়ে দিলে পাথরটা জলের নীচে চলে গেল কিন্তু পুকুরের জলে ঢেউটা থেকে যাবে ঠিক তেমনি বাইরে থেকে যখন কোন উদ্দীপন আসছে তখন উদ্দীপনটা বা কম্পনটা কিছু পড়ে চলে যায় কিন্তু তার অর্থটা থেকে যায়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পাশের ঝোপে দেখতে পেলাম কেউ কাউকে খুন করছে। আমি তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে সরে এলাম, কিন্তু মন থেকে এই দৃশ্যটা কখনই যাবে না, মনের মধ্যে একটা ছাপ থেকে যাবে। স্বামীজী তাঁর ব্যাখ্যাতে বলছেন, যখন কোন শব্দ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভেতরে আসছে তখন মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে যায়। শব্দ থেকে মনে যে ছাপ পড়ে, সেখান থেকে আমাদের সংস্কার সমূহ তৈরী হয়। কিছু কিছু এই ধরনের সংস্কার আছে যেগুলি মনের খুব গভীরে চাপা পড়ে থাকে। সেইজন্য শব্দ আর অর্থ সব সময় একে অপরকে জড়িয়ে আছে। স্বামীজী উপমা দিয়ে বলছেন, যখন গরু বলা হল, গরু বললেই গরুর ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। আবার যখন কেউ গরু বলছে না, কিন্তু মনে মনে গরুর কথা ভাবছি তখন আমার মনের মধ্য থেকেও সেই শব্দ বেরোচ্ছে। এখানে শব্দ আর গরুর চিত্র পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

এখানে কিন্তু বহির্জগতের আর কোন বিষয় নেই কিন্তু বিষয়ের ছাপ গুলো মনের গভীরে থেকে গেছে। এই সংস্কারের উপরে ধ্যান করার কথাই বলা হচ্ছে, এখানে সংস্কার হচ্ছে অর্থ, আর সেখানে মনের যে সমাধি হয় সেটা অনেক উচ্চ মাপের সমাধি। সেই সমাধিতে তিনি তিনটেকে পরিষ্কার আলাদা দেখতে পান। যেমন ধরুন যখন কেউ ঠাকুরের উপরে কিংবা শ্রীকৃষ্ণের উপরে ধ্যান করছে সেখানে এক ধরনের সমাধি হবে। কিন্তু আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থের উপর যখন ধ্যান করবেন তখন তা ভিন্ন ধরনের সমাধি হবে, আর এটা অনেক উচ্চ সমাধি। প্রথমে তিনটেকে আলাদা করতে হবে। আলাদা করা তখনই সম্ভব হবে যখন প্রতিক্রিয়ার সময়টা কমতে থাকবে। প্রতিক্রিয়ার সময়টা কিভাবে কমান যায় তার জন্য আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বুঝতে পারি, যদি কিছু সময়ের জন্য সোজা হয়ে চুপ করে বসে চোখ বন্ধ করে কোথায় কোথায় কি কি শব্দ আমাদের কানে ভেসে আসছে, শুধু সেই শব্দগুলোর ওপরে মনকে একাগ্র করে লক্ষ্য করতে থাকি, সে যে কোন ধরনের শব্দই হোক না কেন। কয়েক মিনিট চুপ করে বসে বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনতে থাকব। তখন কি হবে বাইরের প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাপার আমি সজাগ হয়ে গিয়ে বুঝতে পারছি এটা পাখার শব্দ, এটা পাখির ডাক, দূরে একটা জল পড়ার শব্দ, আর দূরে একটা রিক্সার প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ। এই শব্দগুলো আগেও ছিল, কিন্তু তখন এই শব্দগুলোর ব্যাপারে আমরা সজাগ ছিলাম না। কিন্তু এই এক মিনিট আমরা সজাগ থাকার জন্য দূর থেকে একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এসেছিল সেটাও আমাদের কানে এসে আঘাত করতেই মন তাকে ধরে নিয়ে তার অর্থ তৈরী করে দিচ্ছে। যোগীরা যখন ধ্যান করেন তাঁদের এই প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তির সময়টা অনেক ধীরে হতে থাকে। প্রতিক্রিয়ার সময় যত কমতে থাকে ততই এই শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এই তিনটেকে পরিষ্কার আলাদা আলাদা দেখতে থাকে। এমনি সময়ে পাখা চলছে আর তার যে শব্দ হচ্ছে সেই শব্দ অন্য সব শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই চোখ কান বন্ধ করে একাগ্র করার চেষ্টা করা হবে তখন পাখার আওয়াজ আলাদা আর পাখির ডাক আলাদা করে অনুভব করতে পারবে। এই আলাদাটা আরো পরিষ্কার হবে যখন আরো ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করবে।

যখন এই তিনটে আলাদা হতে শুরু করে তখন সে তার অন্তর্জগতের আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থার সন্ধান পায়, সেই সূক্ষ্ম অবস্থার উপর ধ্যান করতে যখন শুরু করে তখন মন আরও উন্নততর অবস্থাতে যেতে শুরু করবে। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা নিয়েছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন অনেক কিছু তত্ত্বের প্রতিমূর্তি, প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ একটা ছবি বা মূর্তি, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক গভীর তত্ত্বের মূর্তরূপ। মন্দিরে আমরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি দেখতে পাই, সেই মূর্তির ধ্যান করতে গিয়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থের উপরে, যেমন তাঁর সত্য, ত্যাগ, তীব্র ব্যাকুলতা এগুলোর উপর যখন ধ্যান শুরু করা হবে, আর মন যখন ঐ জিনিষের ভেতরে বেশি ডুবে যেতে থাকে, তখন অন্য ধরনের এক উচ্চ সমাধির দিকে চলে যাবে।

আমাদের ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ যা কিছু হয় সব এই চিন্তের মধ্যেই হয়। যখন এই ধরনের ধ্যান শুরু হবে তখন বুদ্ধি পরিষ্কার হতে আরম্ভ করে। একটা ব্ল্যাক বোর্ড রয়েছে তাতে এখন কিছুই লেখা নেই। কিন্তু রোজ যদি এর ওপরে কিছু না কিছু লিখতে থাকি, কিছু দিন পর অনেক ধরনের লেখাতে বোর্ডটা ভরে যাবে। অত লেখার ওপরেই যদি কিছু লিখতে যাই তখন সেই লেখাটা কিছুই বোঝা যাবে না। এখন যদি আস্তে আস্তে একটার পর একটা আস্তরণ মুছতে শুরু করা হয় তখন আবার যখন নতুন কিছু লেখা হয় সেই লেখাটা পরিষ্কার পড়া যাবে। ঠিক সেই রকম আমাদের বুদ্ধিতে নানা ধরনের সংস্কারের উপরে সংস্কার স্তরে স্তরে জমে রয়েছে, আগে এই সংস্কারগুলিকে সরিয়ে বুদ্ধিকে পরিষ্কার করতে হবে। একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই বুদ্ধি বা চিত্ত পরিষ্কার হতে থাকে। ধ্যানের গভীরে গিয়ে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে। এই শব্দটা বাইরে থেকে এসেছে, এই শব্দ আমার স্মৃতিতে যা পড়ে আছে সেখান থেকে এসেছে আর এই শব্দ স্বপ্ন থেকে আসছে। এই যে নানান রকমের শব্দ আসছে, শব্দের উৎসগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকে। এইভাবে চিত্ত যখন পরিষ্কার হতে শুরু হয় তখন বিষয়ের আসল যে রূপ সেই রূপকে স্পষ্ট দেখতে পায়। ওই অবস্থায় আমরা শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানকে আলাদা করতে সক্ষম হব। এখান থেকেই যোগের প্রথম পাঠ শুরু হল।

পরের সূত্রে বলছেন *এতয়েব সবিচার নিবিচার চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।।৪৪।।* প্রথমের দিকে আমরা সবিতর্ক, সবিচার, সাস্মিতা আর সানন্দা এই চার রকম সমাধির কথা আলোচনা করেছি। এর আগের কয়েকটি সূত্রে সবিতর্ক আর নিবিতর্ক সমাধিকে নিয়ে বললেন। এই সূত্রে বলছেন সবিচার আর নিবিচার সমাধির ব্যাপারে। সবিতর্ক সমাধি হল যখন কোন বস্তুর উপর ধ্যান করে সমাধি হয়। আর সবিচার সমাধি হল যখন তন্মাত্রার উপর ধ্যান করে যে সমাধি হচ্ছে। তন্মাত্রার ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হয়। তন্মাত্রাতেও সবিচার আর নিবিচার সমাধি হয়। যখন একেবারে শুদ্ধ অর্থে চলে যাচ্ছে সেখান থেকেই সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পারেন। তন্মাত্রার উপর ধ্যান করছে ঠিকই। যেমন ধরুন আপনি একটি কলমের উপর ধ্যান করছেন, ধ্যান করতে করতে আপনার বিতর্ক সমাধি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন খুব গভীরে চলে যাবেন তখন আর কলমের দরকার হবে না, সরাসরি সমাধি হয়ে যাবে। কিন্তু বিচার সমাধিতে কলমের উপর ধ্যান না করে কলমের তন্মাত্রার উপর ধ্যান করার কথা বলা হচ্ছে। আর মনের উপর যখন ধ্যান করছে তখন বলছেন সানন্দা আর অহঙ্কারের উপর ধ্যানকে সাস্মিতা বলছেন। এখানে সবিচার আর নিবিচার সমাধির কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যদি শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিশে থাকে তাহলে সেটা সবিতর্ক আর যদি তিনটেকে আলাদা করতে পারেন তাহলে সেটা নিবিতর্ক সমাধি হয়ে যাবে। বিচার সমাধিতেও ঠিক তাই হয়, যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান মিশে থাকে তাহলে সেটা সবিচার সমাধি হয়ে যাবে, আর যদি তিনটে আলাদা হয়ে যায় সেটা হয়ে যাবে নিবিচার সমাধি। একই জিনিষ বলে স্বামীজীও বলছেন এর উপর আর পুনরুক্তি করার প্রয়োজন নেই। যে পাঁচটি তন্মাত্রা দিয়ে জগতের সৃষ্টি সেই পঞ্চ তন্মাত্রার উপর যখন ধ্যান করছে প্রারম্ভিক অবস্থায় তন্মাত্রা গুলো থাকবে। যখন আরও উচ্চ অবস্থায় চলে যাবে তখন ওই তন্মাত্রার আর কোন দরকার হবে না। প্রথমের দিকে স্বামীজী এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। এই কলমটি দেশ ও কালের মধ্যে বাঁধা হয়ে আছে। এখন বিকাল বেলা পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে ইউনিভার্সিটির হলে কলমটা দাঁড়িয়ে আছে। এর উপর মন যখন

একাগ্র করা হবে তখন এটা হয়ে যাবে সবিভর্ক সমাধি। এই কলমকে যদি দেশ ও কাল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তখন শুধু কলম রূপেই থাকছে, দেশ আর কালের মধ্যে এই কলম নেই। তাহলে এখন কলমটা বস্তু রূপে আর থাকছে না, অর্থমাত্র রূপে থেকে যাবে। এর উপর ধ্যান করে যদি মন একাগ্র হয়ে যায় তখন সেটাই হয়ে যাবে নির্বিভর্ক সমাধি। ঠিক তেমনি যদি তন্মাত্রার উপর ধ্যান করা হয়, যেমন ধরুন ভূমি তন্মাত্রা। একদিকে ভূমি তন্মাত্রা দেশ ও কালের মধ্যে আবার অন্য দিকে ভূমি তন্মাত্রা দেশ ও কালের বাইরে। ভূমি তন্মাত্রাকে দেশ ও কালের মধ্যে ধ্যান করলে এক রকম হবে আবার দেশ ও কালের বাইরে ভূমি তন্মাত্রার ধ্যান করলে অন্য রকম হবে। প্রথমে ধ্যানের বিষয় ছিল স্থূল কিন্তু এখানে সেই ধ্যানেরই বিষয় সূক্ষ্ম হয়ে গেল। এটাই এখানে বলছেন, সমাধি যে সব এক রকমের হবে তা নয়, সমাধি অনেক রকমের হয়।

এখন বলছেন **সূক্ষ্মবিষয়তত্ত্বগালিঙ্গ-পর্যবসানম্ ॥৪৫॥** যদি এটাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়, মানে শব্দ ও অর্থ বলা হল, এর থেকেও যদি সূক্ষ্ম স্তরে চলে যায়, সূক্ষ্ম স্তর মানে যখন আমরা সাংখ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা পড়ছিলাম তখন সৃষ্টির সব থেকে ওপরে হল প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে আসছে মহৎ, মহৎ থেকে আসছে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে আসছে তন্মাত্রা, তন্মাত্রা থেকে আসছে মহাভূত, আর তন্মাত্রা থেকেই অন্য দিকে সৃষ্টি হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলির, বলছে এই যে চক্ৰশক্তি তত্ত্ব রয়েছে আর এর উপরেই আপনি ধ্যান করতে শুরু করেন তখন ধ্যানের গুণগত মান আরও অনেকটা উপরে চলে এলো। আমি এখন শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ধ্যান করছি, তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থের উপরে ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম, এবারে এই দুটোই ছেড়ে দিয়ে মনের উপরেই ধ্যান শুরু করলাম। মন এই বহির্জগতের কোন স্থূল বিষয় নয়, মন এই অন্তর্জগতের বিষয় মানে সূক্ষ্ম। যখন চক্ৰশক্তি তত্ত্বের কথা বলা হয় তখন চক্ৰশক্তি তত্ত্ব আমাদের এই স্থূল শরীরের স্থান কোথায় জানা দরকার। এই জিনিষটা আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে চক্ৰশক্তি তত্ত্বের কোথাও এই স্থূল শরীরটাকে রাখা যায় না, অর্থাৎ শরীর যোগীদের কাছে অত্যন্ত নগণ্য, স্থূল শরীরের কোন মূল্যই নেই। চক্ৰশক্তি তত্ত্ব শুরু হয় স্থূল শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, সেখান থেকে।

যখন এই ভাবে চিন্তন করা হতে থাকে তখন এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে যে অনেক অবাস্তিত বস্তু মিশে রয়েছে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে সূক্ষ্ম শরীরটা পালটাতে শুরু করে। আগে মনকে স্থূল বিষয়ের উপরে একাগ্র করার কথা বলা হয়েছিল। যদিও ঐ ধরণের একাগ্রতায় যে ধ্যান করা হয় সেটা নিম্ন প্রকৃতির ধ্যান, কিন্তু সূক্ষ্ম স্তরে ধ্যানের ব্যপারে এই একাগ্রতাই অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এবার সৃষ্টি তত্ত্বের উপরে ধ্যান করতে যাচ্ছে। এখন আর ছেলের কথা ভাবছে না, ছেলের মায়ের কথা ভাবতে শুরু করেছে। পঞ্চ তন্মাত্রা অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, যে পাঁচটা উপাদান দিয়ে এই বিশ্বের সব কিছু তৈরী, সেই তন্মাত্রার উপরে ধ্যান করছে। তন্মাত্রার উপর ধ্যান করার জন্য আগে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞানকে অতিক্রম করে আসতে হবে। এখন আমরা কিছুটা গভীরে প্রবেশ করেছি। পঞ্চ তত্ত্বের উপরে ধ্যান করা যখন শুরু হয়ে গেল তখন এই ধ্যান একেবারেই অন্য ধরণের মাত্রা পেয়ে গেল, যে জ্ঞান এখন আসতে শুরু করবে সেটাও সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, আর যে শক্তি আমাদের মধ্যে জাগরতি হবে সেটাও এক অন্য ধরণের শক্তি। যেমন প্রকৃতির নীচে যে মহৎ আছে, সেই মহতের উপর যদি কেউ ধ্যান করতে শুরু করে তাহলে সে সমস্ত সৃষ্টি পদার্থের, অর্থাৎ পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার প্রভু হয়ে যাবে। যদি ইচ্ছে হয়তো সে একটা নতুন ব্রহ্মাণ্ডই সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম হবে। তার নীচে যে অহঙ্কার আছে বা তন্মাত্রা যেগুলো আছে তার উপরে যদি ধ্যান করা হয় তখন অন্য রকমের শক্তি আসবে।

এই শরীরের পেছনে যে তত্ত্ব রয়েছে, যে তত্ত্ব এই শরীরটা তৈরী হয়েছে, সেই তন্মাত্রার উপরে ধ্যান করে এখন সে তন্মাত্রার মালিক হয়ে গেছে, এখন ইচ্ছে করলেই সে যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে এই শরীরটাকেই পাল্টে নিতে পারবে। আর যদি সে তন্মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায় তখন সে যত খুশি শরীর তৈরী করিয়ে নিতে পারবে। এইভাবে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে, এক নম্বরে পৌঁছাবার

জন্য দুই নম্বরকে আগে পেরোতে হবে আবার দুই নম্বরে আসতে হলে তিন নম্বরকে পেরিয়ে আসতে হবে। যদি কেবল তিন নম্বরেই আটকে থাকে তাহলে এই তিনের যা কিছু আছে সেটার উপরই শুধু কারিকুরি করতে পারবে। কিন্তু যদি এক নম্বরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চলে আসে তখন দুই তিনের যা কিছু আছে সবই আয়ত্তে চলে আসবে। আর একেবারে শেষে যদি প্রকৃতিতে পৌঁছে যায়, প্রকৃতির সঙ্গে যদি নিজেকে যুক্ত করে নিতে পারে তাহলে তো সব কিছুর পারে চলে যাবে। তখন মা কালীর সঙ্গে এক হয়ে গেল, এখন মা কালীর যা ক্ষমতা আছে তার মধ্যেও সেই একই ক্ষমতা এসে গেল।

সেইজন্য এখানে বলছেন, যে চব্বিশ তত্ত্ব রয়েছে এর ওপর যদি ধ্যান করা হয় তখন তার অন্য ধরণের সমাধি হবে। কিন্তু এই চব্বিশ তত্ত্বের যেটার উপরই সমাধি হোক না কেন সেই সমাধি সবীজ সমাধি হবে। সমাধি হয়েছে কিন্তু যে বীজ থেকে জন্ম-মৃত্যু চক্র চলতে থাকে সেই বীজগুলো থেকে যায়। এই উচ্চ তত্ত্বগুলির উপর ধ্যান করে করে বড় জোর ব্রহ্মা হয়ে যেতে পারবে। পুরাণে আছে, মনু আগে রাজা ছিল কিন্তু সে ভগবানের সেবা করে, তপস্যা করে ব্রহ্মা হয়ে গেল। তারপরে ব্রহ্মা হবার পর আবার তার পতন হয়ে গিয়েছিল, ঐ জায়গাতে একভাবে তারা থাকতে পারে না, কারণ তার মধ্যে জন্ম-মৃত্যু চক্রের বীজটা থেকে গেছে। ব্রহ্মাই হয়ে যাও আর যাইই হয়ে যাওনা কেন সংসার বীজ তোমার মধ্যে থাকবেই। আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর মনু কিংবা ব্রহ্মা হয়ে রাজত্ব করার পর আবার মানুষ হয়ে জন্ম নেবে। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্* - এইটাই চলতে থাকবে, এখন থেকে বেরোতে কেউ পারবে না।

আমরা আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুনেই আবদ্ধ হয়ে আছি। আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুন এগুলো শরীরের ধর্ম, কিন্তু এই শরীর থেকে একটু উপরে চলে গেলেই এই আহার, ভয়, নিদ্রা আর মৈথুন তক্ষুণি খসে পড়ে যাবে। যতক্ষণ শরীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ এই সমস্যাগুলোও থেকে যাবে। কিন্তু আমাদের সর্বক্ষণের লক্ষ্য হল শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানকে আলাদা করা। কিন্তু যখনই ধ্যানের মাধ্যমে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিকে ধারণা করতে সক্ষম হবে তখন এই আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনজনিত সমস্যা গুলো ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করে দেবে। সমস্যা গুলো থাকবে কিন্তু এগুলো আর বেশি কাবু করতে পারবে না। ধ্যান করে যদি সত্যিকারের সাধু কিংবা যোগী হয়ে যায় তাহলে জগতের কোন কিছুরই প্রতি তার আর আকর্ষণ থাকবে না।

ধ্যানের এই প্রক্রিয়া প্রকৃতিতে গিয়ে শেষ হয়। মনে করা যাক ধ্যানের প্রথম বিষয় হল এই কলম, কলমের পেছনে আছে তন্মাত্রাগুলো, তন্মাত্রার পেছনে আছে অহঙ্কার, অহঙ্কারের পেছনে আছে মহৎ তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্বের পেছনে আছে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো ও তমো, তিনটে গুণের পেছনে আছে প্রকৃতি। যোগীরা যখন ধ্যান করেন, তখন তাঁদের যেমন যেমন মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়, যেমন যেমন তাঁর মন সূক্ষ্ম হতে থাকে তেমন তেমন তিনি আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতমতে ধ্যান করতে পারেন। আমি যদি প্রথমেই বলি কলমের উপর ধ্যান না করে কলমের তন্মাত্রার উপর ধ্যান করবো, আমি কিন্তু তা করতে পারবো না। প্রথমে কলমের উপরেই আমাকে ধ্যান করতে হবে। সেখান থেকে আরেক ধাপ পেছনে যেতে হবে। তন্মাত্রার উপর ধ্যান করার পর অহঙ্কার তত্ত্বের উপর মনকে একাগ্র করতে হবে। এইভাবে ধাপে ধাপে মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সূক্ষ্মের দিকে যেতে হবে।

এরপরের সূত্রে বলছেন *তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।।৪৬।।* শেষ ধ্যান হল প্রকৃতির উপর, প্রকৃতি হল অব্যক্ত। পুরুষ হলেন সেই চৈতন্য সত্ত্বা, তিনিই তাঁর মনকে ধ্যান করে করে গুটিয়ে নিয়ে আসেন। শেষে প্রকৃতির উপর যখন ধ্যান করেন তখন জিনিষটাকে আরেক রকম দেখেন। এই যে প্রকৃতি পর্যন্ত নিয়ে আসা হল এটাই *তা এব সবীজঃ সমাধিঃ*। এই পর্যন্ত যত রকমের সমাধির কথা বলা হল, সবিতর্কই বলুন আর সবিচারই বলুন, সাস্মিতা বলুন আর সানন্দাই বলুন, বস্তুর উপর ধ্যান করুন বা তন্মাত্রার উপরই ধ্যান করুন কিংবা প্রকৃতির উপরই ধ্যান করুন, সবটাই *সবীজঃ*। তখনও বীজ থেকে যাবে। কিসের বীজ? আপনার সংস্কারের বীজ। আপনি যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন, অনুভব করেছেন, এর সব কিছুই সংস্কার রূপে আপনার মধ্যে থেকে গেছে। যদি কেবল্য না হয়ে যায়, যদি

আপনার আত্মজ্ঞান না হয়ে থাকে তাহলে ওই সংস্কারের বীজ আজ হোক কিংবা কাল হোক আবার আপনাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে টেনে নিয়ে শরীর ধারণ করিয়ে দেবে। এই যত রকমের সমাধি বলা হয়েছে এগুলো সব প্রকৃতির এলাকার জ্ঞান, তাই বলছেন সবীজ সমাধি, সবীজ মানে সংস্কারের বীজটা থেকে যাচ্ছে। আপনি জিনিষটা জানছেন ঠিকই, কিন্তু আপনার ভেতরে যে সংস্কার, স্বভাব, প্রবৃত্তিগুলি যেমন ছিল তেমনই থেকে গেছে। ঠাকুর বলছেন – যদি দেখি পণ্ডিতের মন কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে আছে আমি বলি ধিক্। শকুন অনেক উপরে ওঠে কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ে। আপনি ধ্যান করে সমাধিতে গিয়ে এই তত্ত্বগুলোকে জয় করে নিতে পারেন, কিন্তু আপনার ভেতরে যত আবর্জনা আছে তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আপনার নিজের সংস্কারের পুটলিটা যেমন ছিল তেমনই থেকে যাচ্ছে। সেইজন্য এই ছয় রকমের সমাধিকে বলা হয় সবীজ সমাধি।

সবীজ সমাধিতে গিয়ে আপনি সমাধিবান পুরুষ হতে পারেন কিন্তু আবার আপনাকে জন্ম নিতে হবে। যদি সবিচার সমাধি হয়ে থাকে তাহলে আপনি হয়তো ভালো স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নেবেন। যদি সানন্দা সমাধি হয়ে থাকে তাহলে হয়তো দেবতা হয়ে জন্মাবেন, সাস্মিতা সমাধি হয়ে থাকলে আপনি হয়তো প্রকৃতিলয় পুরুষ হয়ে জন্মাবেন। প্রকৃতিলয় পুরুষ হয়ে জন্মালে সেখানে ক্ষমতার সুখই পাবেন। এই ক্ষমতাই আপনার অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এরপর যখন প্রলয় হয়ে আবার সৃষ্টি হবে তখন আপনি হয়তো বড় কোন রাজা-টাজা হয়ে জন্মাবেন। রাজা হয়ে এবার যদি আপনি উল্টোপাল্টা কিছু করতে থাকেন তখন সেখান থেকে পতন হয়ে হয়ে শেষে কয়েকটা জন্মের পরে হয়তো পোকামাকড় হয়ে জন্মাবেন। এতদিনের সব তপস্যা বিফলে চলে গেল। সেইজন্য বলা হয় এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তোমার ক্ষমতা বাড়ছে, তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে, তোমার অনুভূতি সূক্ষ্ম হচ্ছে ঠিকই, তুমি বুঝতে পারছ এই জগৎ থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এগুলো সবই সবীজ। কারণ আপনার সংস্কারের বীজগুলো যেমনটি ছিল তেমনটিই থেকে যাচ্ছে। সমাধিতে মনে হবে এগুলো নেই, কিন্তু চাপা পড়ে আছে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন পায়রাকে চাল-গম খাওয়ার পর বোঝা যায় না খেয়েছে কিনা, কিন্তু গলায় হাত দিলে বোঝা যায়, সব চাল-গম ওখানে জমিয়ে রেখেছে। আমাদের মনটাও ঠিক পায়রার মত, জীবনে যা যা ভালো করেছি, মন্দ করেছি সব রেকর্ড হয়ে সংস্কার রূপে আমাদের মনের ভেতরে জমে আছে, যখন অনুকূল সময় আসবে তখন ওই সংস্কারই আমাকে ঠেলে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল নিবীজ সমাধির দিকে যাওয়া। কীভাবে নিবীজ সমাধির দিকে যাবে? সেটাই পরের সূত্রে বলছেন।

নির্বিচার-বৈশারদ্যেহধ্যাত্তপ্রসাদঃ।।৪৭।। মন যখন আরও শুদ্ধ হয়ে যায় তখন তন্মাত্রাকে দেশ কালের বাইরে দেখায়। যেখানে মন যখন পুরোপুরি শুদ্ধ হয়ে যায় সেখানেই মন স্থির হয়ে যায়। ধ্যানের উপযোগিতাটা এখানেই বোঝা যায়, ধ্যান সাধককে ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু এটাই যোগের একমাত্র লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবজ্ঞানম্। যতই উপরে যাক না কেন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে আবার পতন হবে। একটা হাওয়াইকে যত জোরেই ওপরে পাঠান হোক না কেন, গ্যাস যেই ফুরিয়ে আসবে তখনি নীচে নেমে আসবে। কালীপূজোর সময় যে রকেটগুলো ছাড়া হয় তখন কত জোরে ওপরে ছুটে যায় কিন্তু কিছুটা উপরে গিয়ে আবার ভুস্ করে নীচে নেমে আসে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পুরো শক্তিকে অতিক্রম করে পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এদের মধ্যে নেই, তাই সব কিছুই প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায়।

কিন্তু সেই পুরুষের উপরে যখন ধ্যান করা হয় তখনই আসে **ঋতন্তরা তত্র প্রজ্ঞা।।৪৮।।** নির্বিচার সমাধিতে গিয়ে মন যখন পুরো সেখানে বসে যাচ্ছে, যখন ধীরে ধীরে দেশ কালের বাইরে চলে গিয়ে ওই জায়গাতে যখন সমাধি হয় তখন সেই জায়গাটা জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে। সেখানে গিয়ে আপনার শুধু জ্ঞান আর জ্ঞানই থেকে যায়। যখন এই পুরুষের জ্ঞান লাভ হয় তখন এই জ্ঞানকে একমাত্র সত্য বলে অনুভূত হতে থাকে, তার ফলে সত্যের উপর মন একাগ্র হয়ে যায়। এই জ্ঞান সত্য দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন **যথাবৎ পশ্যাতি**, জিনিষটি যেমন ঠিক তেমনটি দেখায়। ফলে কোন

কিছুই তাকে আর আকর্ষিত করতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, এই সংসার হল আমড়া, আঁটি আর চামড়া, খেলে আবার অল্পশূল। কিন্তু সুন্দর কিছু দেখলে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, কারণ এখানে যথাবৎ পশ্যতি হচ্ছে না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে গেলে যেমনটি আছে তেমনটি দেখতে শুরু করে। তখন জগতের কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো তাকে নাচাতে পারে না।

প্রকৃতির এই তত্ত্বগুলি নিয়ে আস্তে আস্তে ধ্যান করে যেখানেই পৌঁছাক না কেন মুক্তি এতে হবে না, কিন্তু যখন সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের উপর মন একাগ্র হতে শুরু হয় তখন এই ধ্যানই যোগীকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। রাজযোগে এতক্ষণ ধরে যা কিছু বলা হচ্ছে এগুলো যতই খুব কঠিন মনে হোক না কেন সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। হতে পারে আমি ব্রহ্মা হতে চাই না, ইন্দ্রপদ চাই না, আমি স্বর্গ চাই না, আমি ভক্তি মুক্তি চাই। কিন্তু পাঁচশ টাকা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে গেলে এক্ষুণি বাগা নিয়ে রাষ্ট্রায় নেমে আন্দোলন শুরু করে দেব। কারণ আমাদের দৌড় ঐ পাঁচশ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের এখন বোঝার ক্ষমতাই নেই ইন্দ্রপদ বা ব্রহ্মপদ কি জিনিষ, অথচ সবাই বলে আমরা ত্যাগী। কিসের ত্যাগী! আমরা ভক্তি মুক্তি কি জিনিষ কিছু বুঝি না? গানের মধ্যে দুটো কথা শুনে নিয়েছি আর বলছি আমি ভক্তি চাই মুক্তি চাই না। কিন্তু চায়ে একটু চিনি কম বেশী হয়ে গেলে আগুন লেগে যায়। কারণ আমাদের চেতনার গণ্ডি এটুকুর মধ্যে আটকে আছে।

ভগবান বিষ্ণু একবার নারদকে অনুমতি দিয়ে বললেন তোমার যাকে ইচ্ছা একজনকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে আসতে পারো। ভগবান বিষ্ণুর কথা শুনে মর্ত্যে এসে এক গুবরে পোকাকে দেখে নারদের খুব দয়া হল। নারদ গিয়ে গুবরে পোকাকে বলছে – ওহে, কি এই গোবরের মধ্যে দিন রাত পড়ে আছিস, বৈকুণ্ঠ ধামে যাবি? গুবরে পোকা বলছে – হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বললেই চলে যাব। কিন্তু ওখানে কি আছে? নারদ বলছেন – ওখানে খুব সুখে আনন্দে থাকবি। গুবরে পোকা বলছে – তা, ওখানে ভালো গোবর পাওয়া যাবে তো? গুবরে পোকার পুরো মন ঐ গোবরে আটকে আছে, আর ঐটাই তার চেতনার কেন্দ্রবিন্দু, সে আর বৈকুণ্ঠের কি ধারণা করতে পারবে! আমাদেরও এই গুবরে পোকার মত অবস্থা। যে যাই করুক, জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ করুক, কিংবা ভক্তিয়োগ অভ্যাস করুক, আর মন্ত্র জপ করুক, সবাইকেই কিন্তু ধ্যানের গভীরে যেতে হয়, আর যারাই ঠিক ঠিক ধ্যান করবে সবাইর ধ্যান কিন্তু এই ভাবেই এগোবে। আর এইভাবে যেতে যেতে তার একটা অবস্থা আসবে যখন বলা হবে যে আপনি এখন ব্রহ্মা হয়ে গেলেন, একটা সময় আসবে যখন সবার মনকে জানতে পারবে, যখন সবার মনকে তার নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

ঋতসুরা তত্র প্রজ্ঞাতে আপনি সত্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে যাবেন। এবার যে জ্ঞান পাচ্ছেন এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। এটাকে ব্যাখ্যা করে পরের সূত্রে বলছেন **শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থতাৎ।।১৪৯।।** এর আগে আলোচনা করা হয়েছে যে আমরা যে জ্ঞান পাই সেটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণের দ্বারা পাচ্ছি। এখানে বলছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণ দিয়ে আমরা এই জগৎকে জানতে পারি। এই জগতের যা কিছু আছে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া, থাকা, চলাফেরা সব এই দুটো প্রমাণের দ্বারা চলছে। বিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ আর প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর চলে। বিজ্ঞান অনুমান প্রমাণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণে নিয়ে যাচ্ছে, থিয়োরিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যবহারিককে আবার থিয়োরিতে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগতের সমস্ত জ্ঞানকে আয়ত্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু এই জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়। ঈশ্বর থেকে যে জ্ঞান আসে সেটাই বিশুদ্ধ ও ঠিক ঠিক জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন, মা রাশ ঠেলে দেন। এই যে মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দিচ্ছেন এই জ্ঞান অন্য সমস্ত জ্ঞানের থেকে অনেক উচ্চমানের জ্ঞান, আর এই জ্ঞান কখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণ দিয়ে পাওয়া যায় না। তার মানে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণ দিয়ে হবে না। এটা ঠিকই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমরা সব কিছু চোখের সামনে দেখছি, যেটা নিজের চোখ দিয়ে দেখছি সেই জ্ঞানই তো সঠিক। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে আমাদের সব কিছুর জ্ঞান হয় না। সেইজন্য অনুমান প্রমাণের উপরেও নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যেখানে তত্ত্বের ব্যাপার বা ধর্মের ব্যাপার আসে সেখানে

অনুমান প্রমাণ চলবে না। অনুমান প্রমাণ মানে যুক্তি বিচার। এখানে বলছেন, তুমি যত যাই করে নাও যুক্তি তর্ক দিয়ে কখনই ধর্মের তত্ত্ব পরিষ্কার হয় না। ধর্মের তত্ত্ব বুঝতে হলে নিজের অনুভূতি চাই, যেটাকে বলা হয় শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি প্রমাণ মানে আগের আগের ঋষিরা সাক্ষাৎ দেখেছেন জিনিষটা এই রকমই। আপনি যদি বলেন আমি ঋষিদের কথা মানতে পারছি না, তাহলে আপনার জন্য ধর্মতত্ত্ব নয়। ধর্ম পথে প্রথমে তুমি বিচার করে তোমার পথকে ঠিক করে নাও। যেমনি তুমি ঠিক করে নিলে আমার এই পথ, এর পর তুমি ভুলেও আর ডান দিক বাম দিক তাকাবে না। এবারে তুমি সেই আচার্যের কথাই শুনবে, যাঁর কথা তোমার মত ও পথকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

এক ভদ্রলোকের খুব আগ্রহ ছিল সন্ন্যাসী হবেন। তিনি এক সময় চাকরি করতেন, আগ্রহ হওয়াতে তিনি সব ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে গেছেন। সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর তিনি অনেক বেদান্ত চর্চা করলেন আর প্রচুর তপস্যা করলেন। একদিন এক বাবাজী ওনাকে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামে বেদান্তের উপর খুব নামকরা একটা বই দিলেন পড়ার জন্য। তিনি বাবাজীর কাছ থেকে বইটি নিলেন, তখন সন্ধ্যাবেলা ছিল। পরের দিন সকালবেলায় দৌড়ে বাবাজীর কাছে বইটি ফেরত দিয়ে এলেন। বাবাজী সাধুটিকে জিজ্ঞেস করলেন বইটা না পড়েই ফেরত দিয়ে দিলেন? সাধুটি তখন বলছেন পড়েছি, বইটির দু পাতা পড়ে দেখছি তাতে সেই সব প্রশ্নের সমাধান দেওয়া আছে যে প্রশ্নগুলো সাধারণ অবস্থায় কোন মানুষের মনেই উঠবে না। এই হল ঠিক ঠিক নিষ্ঠা। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলতেন ব্রহ্মসূত্র বইয়ের কয়েক পাতা পড়ার চেষ্টা করে উনি পড়া বন্ধ করে দিলেন। অথচ যাঁরা ব্রহ্মসূত্র পড়েছেন তাঁদের অহঙ্কারের আর শেষ নেই। যে ব্রহ্মসূত্র পড়লে মানুষের অহঙ্কার নাশ হয়ে যাওয়ার কথা সেখানে অহঙ্কার বেড়েই যাচ্ছে। কারণ, ওর মধ্যে এমন সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যে প্রশ্নগুলো আমাদের মাথায় কোন দিন আসবে না। কিন্তু আমাদের সবাইকেই শাস্ত্র পড়তে হয়, কারণ শাস্ত্র না পড়লে বিশ্বাস জন্মায় না। যেমন রাজযোগ প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চলছে। খ্রীষ্টপূর্ব চারশ বছর আগে পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তার মানে যোগ আরও পুরনো। আমাদের পূর্বজরা আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার বছর ধরে রাজযোগের অনুশীলন করে আসছেন। তিন হাজার বছর ধরে ওনারা কি আমাদের বোকা বানিয়ে আসছেন, এটা কি কখন সম্ভব! কিন্তু পড়ার পর আমি জানলাম, জেনে বুঝলাম এগুলো অনুশীলন করলে এই রকম হয়, তখন আমিও একটা শক্তি পেয়ে গেলাম। তবে যাঁরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং সাধন-ভজন করেন তাঁদের জাগতিক লোকদের কথা বেশী শুনতে নেই, এই ধরণের লোকদের এড়িয়ে চলার জন্য একটা সময়ের পর থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যাওয়াটাও বন্ধ করে দিতে হয়। যারা ধর্মের পথে বাধা দেয় তাদের থেকে অনেক তফাতে থাকতে হয়। ঠাকুরও বলছেন নিজের স্ত্রী যদি বাধা দেয় তাহলে বলবে মুণ্ডু কেটে দেব খেপী, নিজের মা যদি বাধা দেয় সেই মাকেও ত্যাগ করে দিতে হয়। কারণ এরা ঘোর সংসারী, সংসার ছাড়া কিছু বোঝে না। এরা নিজেরাও ডুবে আছে আপনাকেও ডোবাবে। আপনি যখন আপনার পথ ঠিক করে নিলেন তখন প্রথমে আপনাকে আজেবাজে লোকের সঙ্গ করা বন্ধ করতে হবে, যারাই আপনার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলছে তাদের কথার কোন উত্তর দেওয়ারই দরকার নেই। পথ ঠিক হয়ে গেলে আর মত পাল্টানো যাবে না, এবার তুমি মর বাঁচো এগিয়ে চল।

একটা জিনিষকে উপলব্ধি করে, নিজের চোখে দেখে যে জ্ঞান হয় তখন ওই জ্ঞানটাই ঠিক ঠিক জ্ঞান। বই পড়ে বা শুনে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের কোন দাম নেই। ঠাকুরও বলছেন — পড়া থেকে শোনা ভালো, শোনা থেকে দেখা ভালো। দেখা বলতে এখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথাই বলা হচ্ছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আপনার মন যখন পুরো বিয়োগ হয়ে যাবে তখন জ্ঞানরাশি নিজে থেকে আপনার কাছে আসবে। এটাকেই বলছেন ঋতসুরা তত্র প্রজ্ঞা। আর যথাবৎ প্রকাশ, জিনিষটা যেমনটি আছে তেমনটিই দেখাবে। এই অবস্থাতে মন আর কখনই চঞ্চল হবে না। সেইজন্য বলা হয় নিজের মনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে মন আর চঞ্চল না হতে পারে। তখনই ঠিক ঠিক জ্ঞানরাশি আসতে শুরু হবে। তোমার চোখের সামনে আকর্ষণীয় যা কিছু দেখছ এর কোন দাম নেই। ধর্মের ব্যাপারেও যদি অনুমান করতে হয় তারও কোন দাম নেই। এগুলো থেকে যখন

তুমি সরে আসবে তখন তোমার ভেতরের সুপ্ত শক্তি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে বাইরে প্রকাশ হতে শুরু করবে। সবার ভেতরে সমান শক্তি বিদ্যমান, কোথাও শক্তির তারতম্য নেই, শুধু প্রকাশে তারতম্য।

উচ্চ সমাধিতে চিন্তে কেবল মাত্র একটিই বৃত্তি থাকে। ঐ একটি বৃত্তি বাকি সব বৃত্তিকে চাপা দিয়ে দেয়। এটাকে বলা হয় ব্রহ্মাকারাকার বৃত্তি। চাপা দিয়ে দিলে তখন আবার অন্য এক ধরনের জিনিষ হতে থাকবে। হাড়িতে চাল যেমন উনুনে টগবগ করে ফুটে থাকে, ঠিক তেমনি মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা, বিচারগুলো টগবগ করে ফুটে থাকে। চিন্তা ভাবনাগুলো আটকাতে চাইলেও আটকানো যায় না। যেমন চাপা দিতে যাওয়া হবে তখন আরও জোরে ওগুলো বেরিয়ে আসে। টগবগ করে ফোটার সময় ভেতের হাড়িতে ঢাকনা চাপা দিতে গেলে তখন ঢাকনাটা ঠেলে ফেলে দেবে। যারা খুব মদ খায়, কোন কোন সময় উৎসাহের বশে ঠিক করে নেয় যে আমি আর মদ খাবো না। যেমনি মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, তার দুদিন পরে সে চারিদিকে শুধু মদের বোতল দেখতে থাকে। কালিদাস বলছেন, কামী পুরুষ সব সময় চারিদিকে কামের বস্তুই দেখে। কারণ যখন কামের পূর্তি হয় না তখন কাম আরও তেড়েফুড়ে বেরোয়।

টলস্টয়ের খুব নামকরা একটা গল্প আছে, একটা ভালুক নিজের বাচ্চাকে নিয়ে একটা গাছের কাছে মধু খেতে এসেছে। মধুর চাকে দড়ি দিয়ে একটা বড় শালবল্লা লটকানো আছে। ভালুক মধু খেতে পারছে না বলে, ওটাকে সরিয়ে দিয়ে খেতে গেছে। কিন্তু শালবল্লাটা পেগুলামের মত তার সামনে চলে আসছে, কিছুতেই মধু খেতে পারছে না। শেষে খুব জোরে এক ধাক্কা মেরে বল্লাটাকে সরিয়ে দিয়ে মধু খেতে শুরু করেছে। এক চুমুক, দুই চুমুক, তিনি চুমুক খেয়ে যেই চতুর্থ চুমুক খেতে যাবে তখন শালবল্লাটা এমন প্রচণ্ড জোরে এসে ওর মাথায় মারলো যে তাতেই ভালুকটা মরে গেল। আমাদের সংসারে ঠিক তাই হয়। আমি যেমনি ভাবলাম এটা করবো না তখন সেটা আরও তেড়েফুড়ে আসবে। যখন হাঙ্কা করে সরাবো ততো হাঙ্কা মারবে, যত জোরে সরাবো তার থেকে আরও জোরে এসে মারবে। স্বামীজী বলছেন, যারা সাধু হতে আসে তাদের আশি ভাগ ঠগবাজ হয়ে যায়, বাকি পনের ভাগের মাথা খারাপ হয়ে যায়, আর অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ ঠিক ঠিক থাকে। কিন্তু একজন সাধু ঘরবাড়ি সব কিছু ছেড়ে সাধু হয়েছে তার তো এগুলো হওয়ার কথা নয়! আসলে সব কিছু ছেড়ে দিলেও এখানে সাধু তাঁর পুরনো অনেক সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু যেই সংস্কারকে সরাতে যাচ্ছে সেই সংস্কারই তাঁকে প্রচণ্ড জোরে এসে মারছে। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের যে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয় সেটা বাইরের লোকেরা ধারণাই করতে পারবে না। আর যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম না করেই সোজা ধ্যান করতে বসে গেলে মাথা খারাপ হওয়ারই তো কথা। যেমন ভৌতিক নিয়মকে কোন সময়ই নাকচ করা যায় না, নিউটনের সিদ্ধান্তকে কেউ না করতে পারবে না, ঠিক তেমনি মনের বিজ্ঞানকেও নাকচ করা যাবে না। মনের বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে বলছে, সংস্কারগুলোকে যদি সরাতে যাও সেই সংস্কারগুলো তোমাকে এমনটি মারবে যে তোমার মাথাটা বিগড়ে দেবে। হয় তোমাকে চালবাজ বানিয়ে দেবে নয়তো তোমার মাথা খারাপ করিয়ে দেবে, তৃতীয় কোন পথ নেই।

এটাকেই পঞ্চাশ নম্বর সূত্রে পতঞ্জলি বলছেন – **তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।।**

৫০।। আমরা এখানে যে কজন শাস্ত্র কথা শুনছি, আমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যিনি এখনও মিথ্যে কথা বলতে চাইছে, বদমাইশি করতে চাইছে। কেউই চাইছে না। আমরা সবাই সচ্চরিত্রবান হতে চাইছি। এটাই হল নৈতিকতার লক্ষণ। আমরা সবাই চাইছি ভগবানের পথে এগোই, তার জন্য একটু জপ-ধ্যান করি যাতে ঠাকুরের দিকে মনটা যায়। কিন্তু তাও জপ-ধ্যান হয় না, কারণ সংস্কার আমাদের করতে দিচ্ছে না। জোর করে যদি করতে যাই তাহলে একটা দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে কোন আনাড়ি লোককে বসিয়ে দিলে ঘোড়াটা যা করবে আমাদের মনটাও তাই করবে। যারা সাধন পথে এসে যদি এগোতে না পারে তাহলে একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ও অবসাদ এসে তাদের গ্রাস করে নেবে, আর তার জন্য সে এমন খিটখিটে হয়ে যাবে, সামান্য ব্যাপারেই এমন গালাগাল দিতে শুরু করবে যে তাকে সামলানো যাবে না। আসলে মন এখানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করছে। অথচ সাধুদের আশ্রমগুলিতে তাদের এই প্রতিক্রিয়াকে

সামলানোর কোন ব্যবস্থাই নেই। অনেকে বলতে পারেন তাহলে আগেকার সময় কি হত? কিছুই হত না, খুব সহজ পদ্ধতি ছিল, প্রথমে তুমি ব্রহ্মচারী থাকো, তারপর তুমি গৃহস্থ হয়ে ভোগটোগ মিটিয়ে নাও। ভোগ মিটে যাওয়ার পর পুরো দমে এগিয়ে যাও। আর যখন ভোগের মধ্যে আছ তখন একটু একটু করে বিচার করে করে এগোতে থাক। তাহলে তোমার ভেতরটা তৈরী হয়ে থাকবে। যোগপথে যাঁরা নামেন তাঁরা একেবারে দৃঢ় হয়েই নামেন, আর মধ্যবর্তীরা একটু একটু করে তেমন তেমন এগোতে থাকে। সংস্কারের প্রতিক্রিয়া কিন্তু দুজনকেই মারবে। প্রতিক্রিয়া হলে তখনকার দিনে গুরুরাই শিষ্যকে সামলে নিতেন। শিষ্যের হয়তো কোথাও একটা দুর্বলতা প্রচণ্ড ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, গুরু তখন যেভাবেই হোক কিছু একটা করে দিয়ে ব্যাপারটা সামলে নিতেন। কিন্তু এখন সেই গুরুও নেই। প্রথমত সাধুরা বুঝতেও পারেন না যে তাঁর এই সমস্যা আছে। যতক্ষণে বুঝতে পারছে ততক্ষণে এমন মার মেরে দিয়েছে যে তাঁকে ছিটকে ফেলে দিয়েছে। এমন জায়গায় ফেলেছে যে সেখান থেকে আর উঠতেই হয়তো পারলো না। কিন্তু চাপা তো সবাইকে দিতেই হবে। কামিনীর পেছনে যদি সারা জীবন দৌড়াতেই থাকে তাহলে যোগ করবে কখন! আজ হোক কাল হোক চাপা সবাইকেই দিতে হবে। সেইজন্য বলা হয় দুর্দান্ত ঘোড়ার পিঠে যে সওয়ারি হবে তাকেও দুর্দান্ত শক্তিশালী হতে হবে। তাই প্রথমে খুব সাধারণ ধরণের সমাধির অনুশীলন করে করে মনকে শক্তিশালী করতে বলা হয়।

প্রথমেই সবিতর্ক, সবিচার সমাধির অনুশীলন করা যাবে না। ভেতরে যে সংস্কারগুলো চাপা পড়ে আছে, সেগুলো সুযোগ পেলেই চাড়া দিয়ে উঠতে চাইবে। কিন্তু অনেক দিন ধ্যান করতে করতে একটা এমন অবস্থা আসবে যখন সমাধিজনিত সংস্কারটা প্রচণ্ড বলবান হয়ে যাবে, সেই সংস্কার তখন বাকি সংস্কারগুলোকে পুরো চাপা দিয়ে দেবে। ঠাকুর বলছেন কুণ্ডলীনি যখন কণ্ঠ দেশে এসে যায় তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলতে চায় না। এটাও একই জিনিষ। ওই ভাব অন্য সব ভাবকে চাপা দিয়ে দিয়েছে। ওই অবস্থায় তার শরীর যদি চলে যায় তাহলে হয়তো স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে। ফিরে আসার পর প্রথমে দিকে ধর্মের ভাব থাকবে, তারপর তার উপর জল ঢালা হলে আন্তে আন্তে বড় হবে, বড় হয়ে সেখানেই শেষ হয়ে যাবে, এছাড়া আর কিছুই হবে না। সেইজন্য বলছেন, ধ্যান গুরু হলেই তার ভালো মন্দ সব রকম সংস্কারগুলো জোরাল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে বাজে সংস্কারগুলো যখন সরাতে চাইছে, একেই সেগুলো জোরাল হয়ে গেছে, তাই তখন শুভ সংস্কারগুলোকে নাড়াচাড়া করে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে বাজে সংস্কারগুলোকে সরাতে হয়। এই যে বড় যেটা সংস্কার দিয়ে বাকিগুলোকে চাপা দেওয়া হল, তাকে প্রধান মল্ল বলছেন। একটা এলাকায় অনেক গুণ্ডা বদমাইশরা রাজত্ব করে যাচ্ছে, এবার একটা বড় দুর্দান্ত গুণ্ডাকে বানিয়ে দেওয়া হল সর্দার, এই সর্দারই এবার সব কটা গুণ্ডাকে সোজা করে দেবে। সব কটাকে যখন সোজা করে দিল এবার সর্দারকেও মেরে শেষ করে দিতে হবে। প্রথমে একটা বড় শক্তিশালী জিনিষকে এনে সব ছোট জিনিষকে ঠাণ্ডা করে দিতে হবে, তা নাহলে আপনি একা কতগুলোর সাথে লড়াই করবেন! ওকেই আপনার হয়ে লড়াই করতে দিন। যখন ঠাকুর অদ্বৈত সাধনা করছিলেন তখন মনকে নির্বিকল্প সমাধিতে নিয়ে যাওয়ার সময় মা কালীর মূর্তি বার বার সামনে চলে আসছিল। এখানে বাকি সব বৃত্তি চাপা পড়ে একটাই বৃত্তি মা কালীর বৃত্তিতে ঠাকুরের মনটা আটকে রইল। কিন্তু এই বৃত্তিটাকেও নাশ না করলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হবে না, নির্বীজ অবস্থায় যাওয়া যাবে না। ঠাকুরও মা কালীর এই বৃত্তিকে ছাড়তে পারছেন না।

এখানে এসেই বেশীর ভাগ সাধকরা আটকে যান। আমরা ঠাকুরকে অবতার রূপে দেখি, তাই ঠাকুরের জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নই নেই, কিন্তু ঠাকুরের অবতার রূপকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে একজন সাধক রূপে যদি ভাবা হয়, আর তিনি যদি এখানে এসে ছেড়ে দেন তখন তত্ত্বগত ভাবে বলতে গেলে বলতে হবে ঠাকুরকে কিন্তু আবার জন্ম নিতে হবে। কারণ এই সমাধি সবীজ সমাধি। সেইজন্য সমাধি-পাদের শেষ সূত্রে বলছেন – **তস্যাপি নিরোধে সর্ব নিরোধান্নিবীজঃ সমাধিঃ।।৫।।** শেষ যে বৃত্তিটা আছে যখন ঐটাকেও নিরোধ করে দেবে তখন সব শেষ, নির্বীজ সমাধি এসে গেল, জন্ম-মৃত্যুর চক্র

থেকে সে মুক্ত হয়ে গেল। অশুভ সংস্কারকে শুভ সংস্কার দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া হল। এরপর শুভ আর অশুভ দুটোকেই এবার ফেলে দেওয়া হয়ে গেল। রজো আর তমোগুণের যত বৃত্তি আছে সব কটাকে সত্ত্বগুণ দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া হল। তারপর সত্ত্বগুণকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া হল। শেষে শুদ্ধ সত্ত্বকেও ফেলে দিতে হয়। তিন ডাকাতের গল্পে ঠাকুর বলছেন সত্ত্বগুণীও ডাকাত। শেষ বৃত্তিটা চলে গিলে তখন কী হয়? তখন *তদাদ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থানম্*।

যাদের সাকার সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, তারা যখন সমাধিতে থাকবেন না, তাদের ব্যবহার চলতে থাকে, সবার সাথেই তিনি কথা বলবেন, তাঁর মধ্যে কোন ধরণের বিরক্তি ভাব আসবে না। কিন্তু যখনই তিনি সমাধির ঐ অবস্থাকে মনে করবেন তখনই বাকি সব কিছু চাপা পড়ে যাবে, তার কাছে অন্য সব বৃত্তিগুলি ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, ওগুলো আর তাঁকে বিপাকে ফেলতে পারবে না। আর শেষে যখন সমাধির অবস্থায় শেষ ঐ বৃত্তিটাকেও ছেড়ে দেবেন তখন সাক্ষাৎ পুরুষের মুখোমুখি হয়ে যাবেন।

পুরুষের মুখোমুখি হয়ে গেলে আর তার পুনর্জন্ম হবে না। অনেকে মনে করে পুনর্জন্ম আছে আবার অনেকে মনে করে পুনর্জন্ম নেই। প্রাচীন কাল থেকে পুনর্জন্ম নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়ে আসছে। এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু একটা জিনিষ আমাদের মাথায় রাখতে হবে, হিন্দু ধর্ম থেকে পুনর্জন্মবাদকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র বৃথা হয়ে যাবে, হিন্দু শাস্ত্রের আর কোন দাম থাকবে না। পুনর্জন্ম নিয়ে যেখানে যেখানে যেমন যেমন আসবে আমরা আলোচনা করবো। জ্ঞানের তরফ থেকে বলা হয় যদি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও হয়, ঠাকুর যাকে সবিবকল্প সমাধি বলছেন, তাতেও একটু বাকি থেকে যায়। একটু বাকি থাকা মানে, এই সূত্রে বলছেন শেষ যে বৃত্তিটা থেকে যাচ্ছে সেটাকেও ফেলে দিতে হবে। অভ্যাস করতে করতে এত হাজার হাজার বৃত্তিকে দমন করতে যখন শিখে গেছেন তখন ওই একটা বৃত্তিকে শেষ করা অসম্ভব কিছু নয়। আমরা এখন বৃত্তির সারূপ্যে ডুবে আছে, তাই আমাদের পক্ষে এগুলো ধারণা করা বা ভাবাটাই অসম্ভব। অনেকে এসে বলে অমুক বাবাজী তিন মাসের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধি করিয়ে দিচ্ছেন। তোতাপুরি ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা দেখে বলছেন ‘এই অবস্থায় পৌঁছতে আমার চল্লিশ বছর লেগেছিল’। সেই থেকে সবার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে ঠাকুর নাকি তিন দিনে নির্বিকল্প সমাধি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরেরও তার আগে বারো বছরের সাধনা আছে, সেটা কেউ দেখছে না। শুধু সাধনা নয়, একেবারে মুণ্ডকাটা তপস্যা। শুধু এই বারো বছর কেন তারও অনেকে আগে থেকেই অনেক রকম চলছিল। তাঁর মন যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সেটাও তো সাধনার অঙ্গ, যা কিনা পরবর্তি কালে এই নির্বিকল্প সমাধির ক্ষেত্র তৈরী করার সাহায্যে লেগেছিল। ঠাকুর যখন সাধনা করতে শুরু করেছেন সেই থেকে এই বারো বছর তিনি শুধু সম্প্রজ্ঞাত বা সবিবকল্প সমাধির এলাকায় ঘুরেছেন। ঠাকুরের যদি বারো বছর আর তোতাপুরির চল্লিশ বছর লেগে থাকে, আমরা এখানে এনাদের সাধক হিসাবেই দেখছি আর বাবাজীরা বলে দিচ্ছেন তিন মাসের মধ্যে তিনি সবাইকে নির্বিকল্প সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। মঠের মহারাজদেরও যে আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়, তাতেও দেখা যায় তখন ওনারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে কথাগুলো বলেন তার মধ্যে একটা ওজন থাকে। কথার ওজনও তো তাঁর একদিনে আসছে না, যবে থেকে তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তবে থেকেই তাঁর রগড়ানো শুরু হয়ে গেছে। এরপর কত রগড়াতে রগড়াতে একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থায় যাচ্ছেন, আবার সেখান থেকে হয়তো আবার পড়েও যাচ্ছেন। এইভাবে চলতে চলতে খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধু নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় পৌঁছান। তাহলে বুঝুন এরা কত বড় মিথ্যাবাদী আর লোক ঠকানোর কারবার করে যাচ্ছে যারা বলছে তিন মাসের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধি করিয়ে দেবে।

ঠাকুরের যে বার বার মা কালীর মূর্তি সামনে এসে যাচ্ছে, তিনি আর এগোতে পারছেন না, এটাই সেই শেষ বৃত্তি, এই বৃত্তি আপনাকে ছাড়তে দেবে না। ছাড়তে দেবে না মানে, একেবারেই অসম্ভব নয়। এত দিন ধরে যে এত বৃত্তিকে নাশ করতে করতে আপনি একটা বৃত্তিতে এসে পৌঁছেছেন, তারপরে ওই শক্তিই এই একটা বৃত্তিকেও নাশ করে দেয়। তখনই আত্মতত্ত্ব আপনার সামনে খুলে যায়,

আপনি দেখছেন আমিই সেই পুরুষ। উচ্চতম সম্প্রজাত সমাধি আর অসম্প্রজাত সমাধির মধ্যে খুব একটা তফাৎ বোঝা যায় না, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিটাই শুধু বাকি। ঠাকুর বলছেন হ্যারিকেনের লণ্ঠনের আলো যেমন কাঁচ দিয়ে ঢাকা থাকে। আলোটা ছোঁয়া যায় না, কাঁচটা ব্যবধান। কিন্তু কাঁচ রূপ ব্যবধান এত স্বচ্ছ যে আলোটা পরিষ্কার দেখা যায়। উচ্চতম সম্প্রজাত সমাধিতেও ঠিক লণ্ঠনের কাঁচের মত একটা ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিরাট কোন পার্থক্য থাকে না, ওই দিকটা সবিকল্প এই দিকটা নির্বিকল্প বা এই দিকটা সবীজ আর ওই দিকটা নির্বীজ। তবে যতই হোক একটা ব্যবধানের আলো আরেকটি আসল আলো, দুটোতে তফাৎ একটু থাকবেই। কথামত পড়ে অনেকে মনে করেন ঠাকুর যখন বলছেন ভক্তিও যা জ্ঞানও তাই। যোগে কিন্তু পরিষ্কার, উচ্চতম জ্ঞান যাই তোমার হয়ে থাকুক এটা সবীজ। সবীজ মানে, তোমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। তুমি ব্রহ্মা হয়ে জন্ম নিতে পারো, তুমি সৃষ্টির পুরো মালিক হয়ে জন্মাতে পারো কিন্তু থাকবে তুমি প্রকৃতির এলাকায়। হয়তো তোমার পতন হতে হতে কয়েকটা কল্পের পর আবার তুমি তোমার আগের জায়গায় নেমে যাবে। এই ভাবেই সৃষ্টির খেলা চলছে। কিন্তু একবার নির্বীজ হয়ে গেলে খেলা শেষ।

স্বামীজীও ঠিক এই জিনিষটা এখানে ব্যাখ্যা করছেন – যখনই চিন্তে কোন উত্তেজনা আসছে, আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন এগুলি অনুভূতি, এগুলো আবার চিন্তে উত্তেজনা তৈরী করছে, চিন্তে চেউ উঠছে। সেই চেউ গুলো আত্মা যিনি, যিনি পুরুষ আছেন তাঁকে চেকে দিচ্ছে। চেকে দেওয়ার ফলে আমরা আত্মার পরিষ্কার ও সঠিক ছবি দেখতে পারছি না। কিন্তু সব শেষে একটাই চেউ থেকে যায়, তখন কি হয়, একটা আলো আছে কিন্তু আলোর ওপরে একটা কাঁচের আবরণ দেওয়া হয়ে গেল। আলো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আলোর চারিদিকে যেন একটা আবরণ আছে, আর ঐ আবরণ ভেদ করেই আলো আমার কাছে আসছে। ঐ আবরণকেও যখন ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখনই আসল জ্যোতির্ময় আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ ঐ একটা চেউ আছে, সগুণ সাকার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিন্তু স্বরূপকে জানা যাবে না। সেইজন্য বলছেন প্রথমে মনের সমস্ত চেউ ওঠা বন্ধ করে একটা চেউয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে যাও। আর সব শেষে ঐ একটি মাত্র চেউকেও বন্ধ করে দিলে তবেই মুক্তি। এটাই মুক্তির একমাত্র পন্থা, তার আগে কোন মুক্তি আসবে না।

মানুষ নিজের দেহবোধ থেকে, দেহাত্মা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারে না। সাধারণ মানুষ নিজেকে দেহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। আর যাঁরা খুব উচ্চ সৃজনশীল ব্যক্তি, তাঁরা নিজেকে মনের সঙ্গে যোগ করে রাখেন। সবীজ সমাধিতে গিয়ে যাঁরা আটকে থেকে গেলেন, তাঁরা প্রকৃতির কোন একটা গুণ, হয়তো তিনি দেহ থেকে বেরিয়ে গেছেন কিংবা মন থেকেও হয়তো বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সমষ্টি অহঙ্কারে আটকে থেকে গেছেন, বা তারপরে বিশ্ব মনের সঙ্গে এক হয়ে আটকে আছেন, কিংবা প্রকৃতির যে গুণ তার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কোথাও তাঁর মধ্যে অপর কিছু সঙ্গ এক হয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি থেকে যায়। এই প্রবৃত্তিই তাঁকে আটকে রাখছে। সেইজন্য যাঁরা নেতি নেতি সাধনা করেন তাঁরা বলেন ভক্তিমাৰ্গে সাধনা করে কোন দিনই সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। কারণ এদের প্রবৃত্তিটাই দুর্বল, প্রবৃত্তি দুর্বল বলে একটা কিছুর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেঁসে থাকে। ঠাকুর কিন্তু দেখাচ্ছেন, তা নয়, মা কালীর সাধনা করেও নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছান যায়। কিন্তু এখানে বক্তব্য হল, একটু যদি বীজ থেকে যায়, ঠাকুর বলছেন সুতোয় একটু যদি আঁশ থেকে যায় ছুঁচের মধ্যে ঢোকান যাবে না। জ্ঞানের লেশ মাত্র যদি থেকে যায়, আমি আলাদা জ্ঞান আলাদা, এটাই সবীজ হয়ে আবার আপনাকে সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে আসবে। নির্বীজ মানেই আপনি শুদ্ধ আত্মার সাথে এক। সবীজের উচ্চতম অবস্থায় আত্মার প্রকাশকে চারিদিকে দেখতে পায়।

আপনি যদি সত্যিকারের মহাযোগীই হন আর মহাভোগীই হন, আপনাকে যা কিছু করতে হবে সব মনের দ্বারাই করতে হবে, কারণ মনের বাইরে তো কিছু নেই। যখন আপনি ঈশ্বরীয় কথা বলছেন সেটাও মন দিয়ে বলছেন আবার যখন ভোগের কথা বলছেন সেটাও মন দিয়ে বলছেন। এবার আপনি দেহ, মন, ইন্দ্রিয় থেকে টেনে টেনে সরিয়ে এনে যখন উচ্চতম অবস্থায় চলে যাচ্ছেন, এবার আপনার

মন চিন্তের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রকৃতির গুণের সঙ্গে মন জড়িয়ে নানা রকম খেলা শুরু করে, এভাবেই সবীজ সমাধি একটা থেকে আরেকটার মধ্যে ঘুরতে থাকে। তাই বলছেন যতক্ষণ নির্বীজ সমাধি না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার কোন ভাবেই মুক্তি নেই। এগুলো খুব উচ্চতম কথা, আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে ঠাকুর বলছেন সময় না হলে কিছু হয় না, তাই শুন রাখা ভালো। শুনতে শুনতে মনের উপর একটা ছাপ পড়ে, এটাই শুভ সংস্কার হয়ে অনেক রকম অশুভ সংস্কারকে চাপা দিয়ে দেয়। এরপর যে একটা বিশেষ সংস্কার তৈরী হচ্ছে, এই সংস্কারই আপনাকে জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করবে।

সমাধি-পাদ অধ্যায়ের সারাংশ

এখানে এসে সমাধি-পাদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমাধি-পাদে নানা রকমের সমাধির কথা বলা হল। সংক্ষেপে সমাধি-পাদের বক্তব্যকে আমরা আবার একটু আলোচনা করে নিলে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। যোগের উদ্দেশ্য হল সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করা। বৃত্তিকে নিরোধ করতে হলে ধ্যানের মাধ্যমে সমস্ত বৃত্তিকে কমিয়ে কমিয়ে একটি বৃত্তিতে নিয়ে যেতে হবে। পরে সেই একটি বৃত্তিকেও নাশ করে দিতে হবে। যোগ মতে যখন কেউ ধ্যান করে তখন সাধারণ মানুষ কোন উচ্চ ধ্যান বিশেষ করে নিজের স্বরূপের ধ্যান করতে পারে না। সেইজন্য প্রাথমিক স্তরে তাকে একটা বস্তুকে অবলম্বন করে ধ্যান করতে বলা হয়। যেমন বলছেন, যে জিনিষটা তোমার ভালো লাগে তার উপরই তুমি ধ্যান করতে পারো।

যখন কোন বস্তুর উপর আপনি ধ্যান করছেন, যেমন ধরুন এই চকের উপর ধ্যান করতে বলা হয়েছে। চকের উপর ধ্যান করতে হলে আগে এটা যে চক সেটা আপনাকে জানতে হবে। যখন আপনার গুরুর উপর ধ্যান করছেন তখন আপনি গুরুকে জানেন, গুরুর এই রূপ। গুরুকে জানেন বলে গুরুর উপর ধ্যান করছেন। এই জানার ব্যাপারকে বলছেন জ্ঞান। আপনি কোন বস্তুকে জানেন, তার মানে ওর মধ্যে জেয় ধাতু লাগা আছে। এটা হল প্রথম পাঠ। এরপর আপনি যখন বস্তুর উপর ধ্যান করছেন তখন সেই বস্তুর উপর আপনার মন পুরো একাগ্র হয়ে গেল। এই ধ্যানকে বলছেন সবিতর্ক। চকের উপর ধ্যান করতে করতে মনে করুন আপনার সমাধি হয়ে গেল। এই সমাধিকে বলছেন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত বলছেন এই কারণে, কারণ এর মধ্যে জ্ঞান জড়িত আছে। কিসের জ্ঞান? এই চকের জ্ঞান জড়িয়ে আছে বলে বলছেন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যখন বস্তুর উপর ধ্যান করা হচ্ছে তখন সেটা হয়ে যাবে সবিতর্ক সমাধি। এখন এই চক এই ক্লাশ রুমে এই সময়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আপনি ধ্যানের গভীরে গিয়ে চকের এই আকৃতিটা ভুলে গিয়ে চক জিনিষটার উপর ধ্যান করতে শুরু করলেন, অর্থাৎ শুধু চকের অর্থের উপর ধ্যান করছেন। এখানে কোন বিশেষ চকের উপর ধ্যান হচ্ছে না, চক জিনিষটার উপর ধ্যান হচ্ছে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি বা মূর্তির উপর ধ্যান না করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের উপর ধ্যান করা। তার মানে দেশ, কাল এমনকি ধর্ম এই তিনটেকেই ছাড়িয়ে গেল। এই বিশেষ চকটা এখন ইউনিভার্সিটির ক্লাশ রুমে সাড়ে তিনটের সময় এই টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যদি এখন কারুকে নাম ধরে সম্বোধন করি তখন তিনি এই সময়ে এই জায়গাতে এসে যাবেন। কিন্তু যঁাকে নাম ধরে সম্বোধন করলাম উনি একজন মানুষ, যখন মানুষ বলছি তখন দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশ কালের সীমাকে ছাড়িয়ে যখন ধ্যান করে তখন সবিতর্ক সমাধির ‘স’ টা কেটে গিয়ে নির্বিতর্ক সমাধি হয়ে যায়। ‘স’ লাগিয়ে দেওয়া মানে ওটাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল। যখন সীমাকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন তাকে বলছেন নির্বিতর্ক। এর মধ্যে কোন ধরণের বিতর্ক নেই, বিতর্ক নেই মানে কোন ধরণের conditioning নেই। আপনি মানুষ মানুষের উপরেই ধ্যান করছেন, চক মাত্রের উপরেই ধ্যান করছেন আর তখন যে সমাধি হবে সেই নির্বিতর্ক সমাধিও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে পড়ছে। কারণ, এখানেও কিন্তু একটা বস্তু আছে, আপনি সেই বস্তুর উপর ধ্যান করছেন। বস্তুটা কী? চকের উপর, যদিও দেশ কাল সীমা ছাড়িয়ে কিন্তু ধ্যান তো চকের উপরেই করা হচ্ছে, চকের সামগ্রিক অর্থের উপর ধ্যান হচ্ছে। যোগসূত্রে বলা হচ্ছে সবিতর্ক সমাধির থেকে নির্বিতর্ক সমাধি আর সূক্ষ্ম সমাধি। ঠাকুরের উপরের ধ্যান করার থেকে ঠাকুরের ভাব বা তাঁর অর্থের উপর ধ্যান করা অনেক উচ্চ পর্যায়ের ধ্যান। ঠাকুরের

মূর্তির উপর ধ্যান করে আপনার মন যদি পুরো মূর্তির উপরেই চলে যায় তখন ওটাও ধ্যান। যোগ বলেই দিচ্ছে মনে অন্য কোন বৃত্তি উঠছে না, এটাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কিন্তু যখন ধ্যান করছি ঠাকুরই সারা বিশ্ব জুড়ে আছেন তখন এটা হয়ে গেল নির্বিতর্ক সমাধি।

যোগ হল ঠিক ঠিক ধ্যানের বিজ্ঞান। যোগ আবার ঈশ্বর, ঠাকুর, দেবতার দিকে বেশী দৃষ্টি দেয় না। যে কোন জিনিষকে নিয়ে ধ্যান করলে একই জিনিষ হবে। ধ্যান করতে হলে, সমাধি লাভ করতে হলে তোমাকে ভক্ত হওয়ার কোন দরকার নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও চলবে। ধ্যান হল মনের খেলা, জিমে গিয়ে যেমন আমরা শরীরের ব্যায়াম করি, তেমনি মনেরও ব্যায়াম করা যেতে পারে। মনের ব্যায়াম কি রকম? যখন বস্তুর উপর ধ্যান করছেন তখন সবিতর্ক সমাধি, যখন বস্তুর উপর ধ্যান না করে তন্মাত্রার উপর ধ্যান করছেন তখন নির্বিতর্ক সমাধি। এই চক আসলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, যোগশাস্ত্র আবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে মানবে না। যোগ অন্য পথ দিয়ে যায়। যোগ বলবে এই চক পঞ্চ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী, ভূমি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। পঞ্চভূত তৈরী হয়েছে পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে। আপনি এখন এই পঞ্চ তন্মাত্রার যে কোন একটার উপর, যেমন এই চক, চকে ভূমি তন্মাত্রা অনেক বেশী। ভূমি তন্মাত্রা যদি বেশী না থাকে তাহলে আমরা সেই জিনিষ স্পর্শ করতে পারবো না। চকের ভূমি তন্মাত্রার উপর মনকে পুরো একাগ্র করছেন, অর্থাৎ চক না দেখে চক যে জিনিষ দিয়ে নির্মিত সেই জিনিষের উপর মনকে একাগ্র করছেন। এই তন্মাত্রার উপর যদি আপনার সমাধি হয়ে যায়, তন্মাত্রা ছাড়া আপনার মাথায় আর কিছু নেই, এবার আপনার মধ্যে কিছু ক্ষমতা এসে যাবে। ধ্যানের বস্তু এখানে তন্মাত্রা, বস্তু আছে বলে এটাও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে যাবে। এই বিশেষ চকের তন্মাত্রার উপর ধ্যান করে যে সমাধি হচ্ছে সেই সমাধিকে বলছেন সবিচার। এবার যে চক ভূমি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী সেই ভূমি তত্ত্বকে আপনি ধ্যান করছেন দেশ কালের সীমার বাইরে। শুদ্ধ ভূমি তত্ত্বের উপর ধ্যান করছেন, এবার যে সমাধি হবে সেই সমাধিকে বলবে নির্বিচার। জ্ঞেয়র জন্য এগুলো সব সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এইভাবে চার রকমের সমাধির কথা বলে দেওয়া হল। সূত্রে এই চার ধরণের সমাধির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু তার আগে বলা হয়েছিল এগুলো হল বস্তুর উপর ধ্যান। তারপর বলা হল চক যে জিনিষ দিয়ে নির্মিত সেই জিনিষের উপর ধ্যান। কিন্তু এই দুটো জিনিষকে জানা হচ্ছে বুদ্ধি দিয়ে। এবার যদি আমরা বস্তুকে ছেড়ে বুদ্ধির উপরেই ধ্যান করতে শুরু করি তাতেও তখন সমাধি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখনও ধ্যানের বিষয় আছে, এখানে ধ্যানের বিষয় নিজের মন বা বুদ্ধি। এখনও জ্ঞান লেগে আছে কারণ ধ্যান এখনও একটা জিনিষের উপর হচ্ছে, সেই জিনিষটা হল বুদ্ধি। এবার এখানে যে সমাধি হচ্ছে তাকে বলছেন সানন্দা। সানন্দার পর ষষ্ঠ হল সাস্মিতা, আমি ধ্যান করছি, এই আমার উপর এবার ধ্যান করছেন। সাস্মিতাই শেষ, কোথাও কোথাও বলে এটাই প্রকৃতির ধ্যান। কিন্তু আপনি বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, আপনি আর আপনার জগৎ বলতে যা বোঝায়, এর মধ্যে এই চারটেই হয় – বস্তু, বস্তু যে উপাদান দিয়ে তৈরী, যেটা দিয়ে আপনি ধ্যান করছেন আর বুদ্ধি যাকে আশ্রয় করে আছে। এই চারটেকে মিলিয়ে ছয় রকমের ধ্যান হয় – ১) সবিতর্ক, ২) নির্বিতর্ক, ৩) সবিচার, ৪) নির্বিচার, ৫) সানন্দা এবং ৬) সাস্মিতা। এনারা বলছেন যেমন যেমন বলা হচ্ছে তেমন তেমন আরও গভীরে যেতে থাকে। কিন্তু যেখানে বস্তুর ধ্যান বলছেন সেটা নির্বিচারেই শেষ। কারণ পরের দিকে যে সূত্রগুলো আছে সেখানে সানন্দা, সাস্মিতা নিয়ে আসেন না। ওনারের বক্তব্য হল সবিতর্ক নির্বিতর্ক সবিচার নির্বিচার একটার পর একটা গভীরে যেতে থাকে। গভীর হতে হবেই, কারণ এটা হল চক, চকের উপর ধ্যান করছেন। আর চকের যে মা, তার উপর যদি ধ্যান করেন তখন চককেও ধরা হয়ে গেল। বাচ্চাকে ধরলে বাচ্চাকেই ধরা হবে কিন্তু মাকে যদি ধরেন তাহলে মাকেও ধরা হয়ে গেল।

সাস্মিতাতে যখন সমাধি হয়ে যায় তখন প্রকৃতির সঙ্গে সে নিজেকে এক দেখে। প্রকৃতির সঙ্গে এক হলেও পূর্ণ জ্ঞান হবে না। প্রত্যেকটা ধাপে গিয়ে তার কিছু কিছু ক্ষমতা বাড়তে থাকে। আপনি যখন সংসারে আছেন, সেখানে আপনার যেমন পড়াশোনা হয়েছে, যে ধরণের পরিবার থেকে এসেছেন সেই অনুসারে আপনার ক্ষমতা হবে। ঠিক তেমনি যেমন যেমন আপনার সমাধি হবে তেমন তেমন আপনার ক্ষমতা বাড়বে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সাস্মিতাতে গিয়ে সব থেকে বেশী ক্ষমতা বাড়ে।

কারণ তখন আপনি প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছেন, তার মানে ব্রহ্মার যা ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আপনার মধ্যে এসে যাবে। জগতে এখন এমন কোন কিছু নেই যেটা আপনার অধীনে থাকবে না।

মানুষ কিসের ধ্যান করে? যেটা তার পছন্দের। দ্বিতীয় যেটা তার কাছে মূল্যবান। যে জিনিষের কোন দাম নেই সেই জিনিষের কখনই আমরা ধ্যান করতে যাবো না। আমরা তারই ধ্যান করি যাকে আমরা ভালোবাসি। দ্বিতীয়তঃ আমার কাছে যে জিনিষের দাম আছে সেটারই ধ্যান করি। আমার কাছে যে জিনিষের কোন গুরুত্ব নেই সেটাকে নিয়ে আমি কখনই চিন্তা ভাবনা করতে যাবো না, ধ্যান করার কোন প্রশ্নই নেই। আমরা কখনই কোন রিক্সাওয়ালার ধ্যান করি না, আপনি আপনার সন্তানের ধ্যান করবেন, গুরুর ধ্যান করবেন, ভগবানের ধ্যান করবেন। আমরা এতক্ষণ চক, কলমের উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু পতঞ্জলি এখানে ধ্যানের বিষয় করার জন্য কয়েকটি জাগতিক বস্তুকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন, জাগতিক বলতে যেমন কোন ফুলের কথা বলছেন। ফুল সবাই ভালোবাসে, তুমি ফুলের উপর ধ্যান কর। আপনি কিছু দিন ফুলের উপর ধ্যান করে দেখছেন আর তাই তো ফুলের তত্ত্বের উপর আমার ক্ষমতা এসে গেছে। আমি এখন যে কোন ফুল তৈরী করে দিতে পারি, কিন্তু এটাই আমার শেষ অবস্থা নয়। তখন আপনি ফুলের তন্মাত্রার উপর ধ্যান করবেন। এইভাবে একটা একটা ধাপ অতিক্রম করে এগিয়ে আপনি প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। এরপর আপনার ধ্যান করার মত কোন কিছুই নেই। আপনি নিজের একটি সন্তানকে ভালোবাসেন, রূপে গুণে তার মত আর কেউ নেই, বিদ্যাবুদ্ধিও তার প্রচুর। সন্তানের ধ্যান করে করে যখন আপনার সাস্মিতা সমাধি হয়ে গেল এবার ইচ্ছা মাত্র আপনি ওই রকম হাজারটা সন্তান দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন। তখন আপনি আর কিসের জন্য ধ্যান করবেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও আপনি প্রকৃতির বেড়াজালে আটকে থাকবেন।

কিন্তু প্রকৃতির এলাকায় আর কোন কিছু নেই যেটার উপর আপনি ধ্যান করবেন। তখন জেয়, অর্থাৎ যেখানে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলা হয়েছিল, সেটাকে ছেড়ে সে বেরিয়ে যায়। জ্ঞানের এলাকাকে ছেড়ে যখন বেরিয়ে যায় তখন তাকে বলছেন অসম্প্রজ্ঞাত। অসম্প্রজ্ঞাতে জ্ঞানের কিছু থাকে না। তাহলে সেখানে কিসের উপর ধ্যান করেন? তাঁর নিজের যে শুদ্ধ সত্তা, নিজের যে অস্তিত্ব, ঠিক ঠিক নিজের যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যের উপর ধ্যান করেন। চৈতন্য কিন্তু কোন বস্তু নয়, কারণ তিনি সেটাই। সেইজন্য সাত নম্বর সমাধি হল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক হয়ে যায়। এর আগে প্রকৃতির সঙ্গে এক ছিল, এবার সে হয়ে গেল প্রকৃতির মালিক। এর আগে পর্যন্ত জগতের দিকে তাকিয়ে আপনি দেখছিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড বিশাল আর আপনি একটি ক্ষুদ্র জীব। এরপর আপনি যখন ধ্যান করতে শুরু করলেন, আর যেমন যেমন আপনার সমাধি হতে শুরু করল, তেমন তেমন একটা একটা করে জগতের সব কিছুকে ফালতু মনে করে সেগুলোকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। তার মানে একটা জিনিষের যখন জ্ঞান হয়ে গেল, তখন সেটাকে ছেড়ে উপরের দিকে উঠে গেলেন। এইভাবে হতে হতে এবারে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যেটা দৃশ্য, যেটা দেখা যাচ্ছে আর যেটা দেখা যাচ্ছে না, অগ্রাহ্য, সবটার সঙ্গে আপনি এক হয়ে গেলেন। প্রকৃতিও যা আপনিও তাই। এর পরের ধাপে আপনি হয়ে গেলেন শুদ্ধ চৈতন্য। তখন দেখবেন, এর আগে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট দেখছিলেন, আপনিও সেই রকম বিরাট। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা আপনার পায়ের নখের থেকেও ছোট্ট হয়ে গেছে। তখন আপনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করে থাকবেন। এই হল সংক্ষেপে সাত রকমের সমাধি।

আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রকাররা এই সমাধিগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেইজন্য নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে, এই জিনিষটা এই রকমই হবে আর ওটা ওই রকমই হবে। কিন্তু যোগদর্শন এগুলোকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। স্বামীজী সমাধি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকাশ ও প্রাণকে নিয়ে অনেক কথা বলছেন। আমরা এখন যে লোকে আছি স্বামীজী এই লোককে বলছেন সূর্যলোক। এই যে দৃশ্য জগৎ, যে জগতকে আমরা দেখছি, এই জগত পুরো আকাশ তত্ত্ব ঘনীভূত হয়ে আকার নিয়ে বোতল, গ্লাস, ঘর, বাড়ি রূপে দেখাচ্ছে। সূর্যলোক বলতে স্বামীজী বলছেন যেখানে আকাশ তত্ত্বকে দৃশ্যমান জগৎ রূপে দেখাচ্ছে আর প্রাণকে দেখাচ্ছে physical force রূপে। Physical Force

মানে, এই যেমন বিদ্যুতের সাহায্যে পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে। আমি হাত নাড়ছি, কথা বলছি এগুলোও Physical Force এর জন্যই সম্ভব হচ্ছে। মহাভারতের এক জায়গায় বলছেন, সাধক যখন ভূমি তত্ত্বকে জয় করে নেয় তখন সে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা কুয়াশার মত দেখে। আর নিজেকে ভাবে ‘আমি যে কোন জিনিষ ইচ্ছামাত্রই তৈরী করে দিতে পারি’। সেখান থেকে তার মন যখন আরও গভীরে যায় তখন সে চন্দ্রলোকে চলে যায়, সেখানে তার মন আরও সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরতে পারে। চন্দ্রলোক সূর্যলোককে ঘিরে আছে। তার মানে চন্দ্রলোক সূর্যলোক অর্থাৎ এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে এর থেকেও বিরাট। এই চন্দ্রলোকে, যেটা সূর্যলোকের বাইরে, সেখানে দেবতারা বাস করেন। তাহলে এই দুটো লোকের মধ্যে আসা-যাওয়া কী করে হয়? কী করে আসা-যাওয়া করে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ ওটা সূক্ষ্ম জগৎ। সূক্ষ্ম জগৎ কী রকম হতে পারে বোঝার জন্য আপনি যদি কল্পনা করেন একটা লোহার বল আছে আর তাতে বড় বড় ছাঁদা আছে। ওই বড় বড় ছাঁদার মধ্যে পাথর ভর্তি আছে। তারপরে আবার একটা বড় লোহার রিং আছে, ওর মধ্যে বালি ভরা আছে। বালি থাকতে কি হচ্ছে, বালির যে লোক ওরা পাথরের মধ্যে ঢুকতে পারবে কিন্তু পাথর এই লোকে আসতে পারবে না। এবার মনে করুন ওই লোহার রিংএর বাইরে দিয়ে আরেকটা লোহার রিং আছে, তার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম বালি আছে। প্রথমটাতে পাথর, দ্বিতীয়টাতে মোটা বালি আর তৃতীয়টাতে আরও সূক্ষ্ম বালি। মোটা বালি এখন প্রথমটাতেও যেতে পারবে আবার দ্বিতীয়টাতেও যেতে পারবে কিন্তু তৃতীয়টাতে যেতে পারবে না। কিন্তু সূক্ষ্ম বালি তিনটেতেই যেতে পারবে। লোহা শুধু প্রথমটাতেই থাকবে, দ্বিতীয়তেও যেতে পারবে না আর তৃতীয়টাতেও যেতে পারবে না। আর তারপরেও মনে করুন একটা রিং আছে সেটাতে জল রয়েছে। জল এবার সব কটাতেই থাকতে পারবে। পাথর যদি চতুর্থটাতে আসতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে মোটা বালি হতে হবে, তারপর পাতলা বালি হতে হবে, তারপর তাকে জল হতে হবে। আর শেষে আরেকটা রিং আছে তাতে রয়েছে বাতাস। বাতাস আবার জলের থেকেও সূক্ষ্ম, বাতাস তাই জলের জায়গাতেও যেতে পারবে, আবার লোহাতেও যেতে পারবে, মানে সব জায়গাতেই যেতে পারবে।

স্বামীজী বলছেন প্রথমে হল সূর্যলোকে, সূর্যলোকের ওপরে চন্দ্রলোক। চন্দ্রলোক হল দেবতাদের বাসভূমি। তার মানে দেবতারা চন্দ্রলোকেও থাকতে পারেন আবার সূর্যলোকে আমাদের কাছেও আসতে পারেন। এখানেও থাকতে পারেন, হয়তো এই ঘরেই পাঁচজন দেবতা আমাদের কথা শুনছেন। স্বামীজী আকাশ ও প্রাণ নিয়ে অনেক কথা বলছেন। আকাশ হল পদার্থ আর প্রাণ হল শক্তি। জগতে পদার্থকে দৃশ্য রূপে দৃশ্যমান জগতকে দেখায়। এই জগৎ হল পঞ্চভূত আর শক্তির খেলা। চন্দ্রলোকে এই পঞ্চভূতকে পঞ্চভূত রূপে দেখায় না, তখন এটাকে শুদ্ধ তন্মাত্রা রূপে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ রূপে দেখায়। এখানে দেবতারা বাস করেন। তার মানে দেবতাদের শরীর বলে কিছু থাকবে না, কারণ এখানে পঞ্চভূত নেই। আর প্রাণকে মনের শক্তি রূপে দেখায়, সেখানে সব কিছু মনের শক্তি দিয়ে চলে, Physical Force সেখানে থাকবে না। দেবতারা যদি মনে মনে ভাবেন আমি এখান থেকে ওখানে যাব, তখন তাঁদের জন্য কোন যানবাহনের দরকার হবে না, নিউটনের laws of motion বা laws of force প্রযোজ্য হবে না, সরাসরি দেবতারা চলে যেতে পারবেন। মনের শক্তিতে ইচ্ছামাত্রই চলে যেতে পারবেন। চণ্ডীতে আমরা পাই দেবীর ইচ্ছামাত্রই হয়ে গেল, কারণ তাঁর সেই ইচ্ছামাত্রই করার শক্তি আছে।

কোন কোন মতে বলা হয় ভূমি তত্ত্বকে যখন কেউ জয় করে এগিয়ে যায় তখন কুয়াশার মত যেটা ছিল সেটা চলে গিয়ে জল তত্ত্ব এসে যায়। এখানে এসে এই দুটোর কিন্তু আর মিল থাকছে না। কারণ স্বামীজী বলছেন তন্মাত্রা নিয়ে, আর এখানে ভূমি তত্ত্ব, জল তত্ত্বকে আলাদা আলাদা করে বলছেন। যাই হোক, তখন দেখে সব কিছু জলময়। এই জল তত্ত্বকে যখন যোগী জয় করে নেয় তখন সে ইচ্ছা করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত জল আছে সবটাই সে পান করে নিতে পারবে। আসলে তিনি জলের সাথে নিজেকে এক মনে করেন। জল তত্ত্বকেও যদি জয় করে নেয় তখন অগ্নি তত্ত্বকে দেখতে পায়। আসলে যোগী তো কোথাও যাচ্ছে না, ওখানেই বসে আছে। কিন্তু নিজের মনকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম করতে থাকে। অগ্নি তত্ত্বকে যখন জয় করে নেয় তখন দেখে নিজের পুরো শরীরটা জ্বল জ্বল করছে। লোকেরা

তার দিকে আর তাকাতে পারে না। ঠাকুরেরও এই ধরণের অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়, এক সময় দেখা যেত তাঁর শরীর থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিতে হচ্ছে। তার মানে, তেজ তত্বকে জয় করা হয়ে গিয়েছিল। যখন অগ্নি তত্বকেও জয় করে নিল তখন বায়ু তত্ব এসে যায়। বায়ু তত্বকে জয় করার পর যোগীকে আর কোন অস্ত্র দিয়ে কাটা যাবে না। যোগী নিজেকে বাতাসের মত হালকা অনুভব করে। আর তার ভেতর এত শক্তি এসে যায় যে, সে যদি আঙুটা দিয়ে পাহাড়কে চেপে দেয় তাতেই পুরো পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। যোগী যখন আকাশ তত্বকেও জয় করে নিল তখন সে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে গেলে ইচ্ছামাত্রই সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে, যখন তখন নিজেকে সে অদৃশ্য করে দিতে পারবে।

তবে এগুলো মহাভারতে এভাবে বলা হয়েছে। আমরাও শুনে আসছি আর বড়রাও বলেন। কিন্তু আমাদের সামনে যাঁরা ছিলেন, ঠাকুর, স্বামীজী, শ্রীমা, ঠাকুরের সন্তানরা, যাঁদেরকে আমরা সবাই ব্রহ্মজ্ঞানী বলে জানি ও মানি, এঁদের কাউকেই আমরা এইসব কায়দা দেখাতে কোন দিন দেখিনি আর শুনিওনি। আর এনারাও কোন দিন কাউকে বলেনওনি যে এই রকম শক্তি তাঁরা কোথাও কারুর মধ্যে দেখেছেন। তাই আমাদেরও এগুলোর উপর বেশী জোর দিতে নেই। তবে যোগদর্শনে বলছে, যখন স্থূল জিনিষের উপর ধ্যান করা হয় তখন তার জ্ঞান এক রকমের হয় তার শক্তিটাও এক রকমের হয়। আর বস্তু যেমন যেমন সূক্ষ্ম হবে তেমন তেমন তার জ্ঞানের স্তরে পাল্টাবে। জ্ঞানের স্তর পাল্টালে তার মধ্যে ক্ষমতাও সেই রকম এসে যাবে। স্বামীজী আবার অন্য দিকে বলছেন, যখন চন্দ্রলোককেও অতিক্রম করে যায় তখন তার সামনে আসে দ্যুলোক। দ্যুলোকে আকাশ আর প্রাণ এক হয়ে যায়। আকাশ আর প্রাণের তফাৎ ধরা যায় না। কোনটা আকাশ আর কোনটা প্রাণ বলা খুব মুশকিল হয়ে যায়। ইলেক্ট্রিসিটিটা শক্তি না পদার্থ ধরা যায় না। মানে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওই ইলেক্ট্রিসিটির মধ্যেই দেখছে, তখন মানুষ, প্রাণী জগৎ বলে কিছু নেই। দ্যুলোকে পদার্থকে এই মুহূর্তে মনে হবে শক্তি আর শক্তিকে মনে হবে পদার্থ। পদার্থ বিজ্ঞান $E=MC^2$ এ যে তত্বটা নিয়ে আসা হয়েছে, এনার্জি থেকেই পার্টিকেলস্ তৈরী হয়েছে আবার পার্টিকেলটাই এনার্জিতে যাচ্ছে। এ্যাটোমিক বোমাতে যেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে জিনিষটাকে দেখাচ্ছে, দ্যুলোকের sphere এটাই। দ্যুলোককে যে জয় করে নিয়েছে সে তো এমনিতেই চন্দ্রলোকের মালিক হয়ে যাবে আর সূর্যলোকের মালিক তো হবেই।

আকাশ আর প্রাণ যদি এক হয়ে থাকে আর তাকে যদি কেউ জয় করে নেয়, অর্থাৎ যিনি দ্যুলোকের বাসিন্দা হয়ে যান, তখন সৃষ্টিতে তার মধ্যে কী ধরণের শক্তি এসে যাবে আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। আপনাকে যদি এক প্লেট রসগোল্লা দেওয়া হয়, এই এক প্লেট রসগোল্লা দিয়ে আপনি কত রকমের জিনিষ বানিয়ে পাঁচজনকে খাওয়াতে পারবেন? রস খাওয়াতে পারবেন, নিংড়ে ছানা খাওয়াতে পারবেন। কিন্তু আপনাকে যদি দুধ, চিনি আর আঙুন দিয়ে দেওয়া হয় তখন আপনি হাজার রকমের মিষ্টি তৈরী করে খাওয়াতে পারবেন। সূর্যলোকে সব রসগোল্লার মত তৈরী খাবার হয়ে এসেছে। আমরা এখানে ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে অনেক কিছু করতে পারছি ঠিকই। ইলেক্ট্রিসিটির সোর্স হল জল। ঐ জল দিয়ে কিন্তু আরও অনেক কিছু জিনিষ করা যাবে। ওই জল দিয়ে আমি চাষ করতে পারবো, আমার তেপ্টা মেটাতে পারবো, ওই জল দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী করতে পারবো। আমরা যত sourceএ যাবো সৃষ্টির ক্ষমতা ও সুযোগ তত বেড়ে যাবে। আপনি এখন এমন জায়গায় চলে গেছেন যেখানে আকাশ আর প্রাণ আলাদা করে বোঝাই যায় না যে, এটা আকাশ না প্রাণ। মিষ্টির দোকানের শো-কেসে যে মিষ্টি গুলো তৈরী হয়ে গেছে সেগুলো দিয়ে আর বেশী কিছু কেরামতি করা যাবে না। কিন্তু দুধ আর চিনির অবস্থায় চলে গেলে আপনার সাজাতিক ক্ষমতা হয়ে যাবে। এবার যদি আরও পেছনে চলে যান, যেখানে একটা ক্ষেত আছে, গরু আছে, তখন সেখানে আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করে দেওয়া যাবে। কারণ আপনি এখন গোবরও পাবেন, ঘুঁটেও পাবেন, জ্বালানিও পাবেন। যত আমরা সোর্সের দিকে যাবো সৃষ্টির সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে। দ্যুলোক হল ঠিক তাই। আপনার মন এখন এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে আপনি দ্যুলোকের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন, এখন যে কোন জিনিষকে আপনি ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি করে দিতে পারবেন। এই দ্যুলোকের পরে আসে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকে আকাশও নেই প্রাণও নেই।

তাহলে ব্রহ্মলোকে কী আছে? শুধু মহৎ তত্ত্ব, মানে বুদ্ধিই শুধু আছে। চেতনার যেটা সর্বোচ্চ স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব সেটা ছাড়া আর কিছু নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে পুরোটাই যেন মন, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মনই যেন একমাত্র বিরাজ করে আছে, যার জন্য পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টি মন ছাড়া আর কিছু দেখায় না। তাহলে সমষ্টি মন থেকে প্রথমে বেরোয় আকাশ আর প্রাণ। আকাশ আর প্রাণ যখন একটু এগিয়ে যায় তখন দেখা যায় আকাশ হল তন্মাত্রা আর প্রাণ হল psychic force। ওখান থেকে যখন আরেকটু এগিয়ে যায় তখন তন্মাত্রা হয়ে যায় এই জগৎ আর psychic force টা হয়ে যায় physical force। তার মানে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবাই উৎস হল সমষ্টি মন, সমষ্টি মন থেকেই এই জগৎ বেরিয়ে আসছে। এই অবস্থায় গিয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের অবস্থায় যেখানে শুধু সমষ্টি মন, তখন সব কিছুর মালিক হয়ে যায় আর নিজেকে সে প্রকৃতির সঙ্গে এক মনে করে। এই অবস্থাতে পৌঁছেও যখন জীব বলে আমার এই অবস্থাও লাগবে না তখন সে শুদ্ধ আত্মার স্বরূপে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

স্বামীজী বলছেন, দ্বৈতবাদীরা বলে মৃত্যুর পর জীব সূর্যলোক থেকে চন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক থেকে দ্যুলোক, দ্যুলোক থেকে ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মলোক থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলে আত্মা কোথাও যায় না, তাঁর কাছে এগুলো দৃশ্যরূপে উপস্থিত হয় মাত্র। স্বামীজী সব ধরনের মতকে সমন্বয় করে বলছেন, আসলে বাস্তবিক যে জিনিষটা হয় তা হল, যোগী যখন ধ্যান করে তখন তার মনে হয় আমি যেন চন্দ্রলোকে চলে এসেছি, আমি দেবতাদের সঙ্গে আছি। আবার মনে করে আমি দ্যুলোকে এসে গেছি বা ব্রহ্মলোকে। অদ্বৈতবাদীদেরও তাই মনে হয়। কিন্তু যখন অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন দেখে সে কোথাও যায়নি, যেখানে ছিল সেখানেই আছে, এগুলো শুধু দৃশ্য রূপে তার সামনে ভেসে উঠছিল। এগুলো দৃশ্য ছাড়া কিছু নয়, সে যা ছিল তাই আছে। যোগসূত্রে কিন্তু বলছে আমাদের সামনে যে দৃশ্যমান জগৎ রয়েছে ধ্যানের গভীরে এই দৃশ্যমান জগতকে দেখা যায়। কখন দেখা যাবে? যখন আপনি স্থূল তত্ত্বকে জয় করে নেবেন। দুই রকমের জয় হয়, একটা হল স্থূল তত্ত্বকে দেশ কালের মধ্যে দেখা আর দ্বিতীয়টা হল স্থূল তত্ত্বকে দেশ কালের বাইরে দেখা। তারপরে সবিচারে গিয়ে তন্মাত্রার উপর যে ধ্যান হবে সেটাও দেশ কালের মধ্যে আর তন্মাত্রার দেশ কালের বাইরে নির্বিচার ধ্যান। এই হল মোটামুটি সমাধির বিভিন্ন বর্ণনা। এরপর আমরা সাধন-পাদ অধ্যায় শুরু করব।

সাধন-পাদ

এতক্ষণ যা কিছু বলা হয়েছে সবই আমাদের কঠিন মনে হতে পারে, তাই এখানে আরেকটু সহজ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছন। যে সব সমাধির কথা বলা হল এগুলো যে আমরা কতটা করতে পারবো আর কতটা করতে পারবো না তা পতঞ্জলি মুনিও জানতেন। সেইজন্য আরেকটু সহজ ভাবে প্রথম পদক্ষেপ শুরু করলেন -

ক্রিয়াযোগ ও তার উদ্দেশ্য

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।।১।। বলছেন তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান – এই তিনটে হল ক্রিয়াযোগ। রাজযোগে ক্রিয়াযোগের প্রচণ্ড গুরুত্ব। এতক্ষণ আমাদের কাছে সাংখ্য ও যোগের তত্ত্বগুলিকে উপস্থাপন করে লক্ষ্যটা কি বলে দেওয়া হল, আর তার সাথে একটু প্রাণায়ামেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বাইরের কোন কিছুকে অবলম্বনের উপর নির্ভর করতে হয় না। যোগ বলবে, তুমি আছ এটা মানছো তো, তোমার খাওয়া-দাওয়া আছে আর তোমার দুর্বলতা আছে, তোমার শক্তি আছে, তোমার মন আছে। ব্যস্ এটুকু মেনে নিলেই তোমার জন্য যোগের পথ খোলা। এবার বলবেন, যোগীরা যাঁরা সাধনা করে এগিয়ে যান তাঁরা এই এই করেন। তোমার করার ইচ্ছা আছে? হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে। তখন বলবেন, তাহলে এই এই কর।

বৌদ্ধ ধর্মে জেন্ বলে খুব নামকরা একটা ধর্ম আছে, যাদের গুরুদের বলা হয় জেন্ মাস্টার। সংস্কৃতের ধ্যান যখন চীন দেশে গেল তখন ধ্যান শব্দটা পাল্টে সেখানে হয়ে গেলে চাং। ওখান থেকে জাপানীরা আবার শিখলো, জাপানে গিয়ে চাং উচ্চারণটা পাল্টে হয়ে গেল জেন্। জেন্ মাস্টাররা হলেন কিছুটা আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানীদের মত। গত দেড় দু হাজার বছর ধরে জেন্ মাস্টারদের নিয়ে প্রচুর মজার মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। সব কাহিনীর মধ্যে একটা বিশেষ জ্ঞান লুকিয়ে আছে। সাধারণ মানুষ ধরতেও পারে না জ্ঞানের কথাটা ঠিক কোন জায়গাটায় আছে। জেন্‌রা নৈঃশব্দকে খুব গুরুত্ব দেয়। একবার খবর ছড়িয়ে গেলে অমুক জায়গার অমুক একজন জেন্ মাস্টার আছেন। জেন্ মাস্টার মানে সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর কথা শোনার জন্য শত শত লোক ভীড় করে থাকে। ওখানেই একজন খুব নিন্দুক লোক ছিল। সে এক ঘর ভর্তি লোকের মাঝখানে চেঁচিয়ে জেন্ মাস্টারকে বলছে ‘শুনেছি তুমি নাকি বিরাট মাস্টার, আর তোমার কথা মত নাকি সবাই চলে। তাহলে দেখা যাক আমাকে তুমি তোমার ইচ্ছামত কীভাবে চালাতে পারো’। জেন্ মাস্টার বলছেন ‘ভাই! তোমাকে যেটা দেখাব তা কি করে দেখাব, তুমি তো অনেক দূরে আছ, আগে তুমি আমার কাছে তো এসে বসো’। লোকটি ভীড় ঠেলে ঠেলে জেন্ মাস্টারের সামনে এল। সামনে আসার পর জেন্ মাস্টার বলছেন ‘না, এভাবে সামনা সামনি কথা বলা যাবে না, তুমি আমার একটু বাঁ দিকে এসো’। বাঁ দিকে এসে বসেছে। তখন বলছেন ‘আমার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, তুমি একটু ডান দিকে এস’। বলার পর লোকটি ডান দিকে এসেছে। জেন্ মাস্টার তখন তাকে বলছেন ‘দেখলে তো আমি যেমন যেমন বলছি তুমি তেমন তেমন করে যাচ্ছ। এবার যাও, গিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে আমার কথা শোন’। ঠাকুরকে অধর সেন জিজ্ঞেস করছেন ‘মশাই! আপনার কি কোন সিদ্ধাই-টিদ্ধাই আছে?’ ঠাকুর বলছেন ‘যে ডেপুটিকে দেখে সবাই এত কাঁপে আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি’। অধর সেন যখনই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন যাওয়ার একটু পরেই নিজের অফিসের পোশাক খুলে ঠাকুরের ঘরে মাদুর পাতা থাকত, তার উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন আর নাক ডাকতে শুরু করে দিতেন। ঠাকুর কাউকে অধরের ঘুম ভাঙাতে দিতেন না। একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন ‘আপনার কি কোন সিদ্ধাই আছে?’ তখন এই কথা ঠাকুর অধর সেনকে বলেছিলেন।

এগুলো তো আমাদের বোঝাবার জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু এই যে শক্তি বা ক্ষমতা, আপনাকে যেমনটি বলবেন আপনি তেমনটিই করবেন, এই ক্ষমতা কীভাবে আসে? তার প্রথম ধাপ হল তপস্যা, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা। এখান থেকে সাধককে ঠিক ঠিক কি ধরনের অনুশীলন করতে

হবে, তার সম্বন্ধে বলা শুরু হচ্ছে, সেইজন্য এই অংশের নাম সাধন-পাদ। প্রথমটা ছিল সমাধি-পাদ। সাধন-পাদের শুরুতেই বলে দেওয়া হল প্রত্যহ সাধককে কি কি করতে হবে, রোজ তপস্যা, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান এই তিনটে করতে হবে। এই তিনটে যদি প্রত্যেক দিন না করা হয় তাহলে কিন্তু আরো উচ্চ আঙ্গিকের ধ্যানে প্রবেশ করবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে পারা যাবে না।

প্রথমে তপস্যা, তাপ থেকে তপঃ। সাধক যখন কোন একটা জিনিষকে নিয়ে এগিয়ে যায় তখন তার শরীর থেকে একটা তাপ সৃষ্টি হয়, এটাই তপস্যা। তপস্যা হল একটা বিশেষ কাজ করার জন্য যখন আপনার শরীর ও মনে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। যেমন বলছেন, ছাত্রাণং অধ্যয়নং তপঃ, ছাত্রাবস্থায় যখন পড়াশোনা করতে হয় তখন তাদের বড় কষ্ট হয়, কিন্তু ওটাই ছাত্রদের জন্য তপস্যা। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি রোজ ভোরবেলা দু ঘন্টা রেওয়াজ করে যাচ্ছেন, তার জন্য ওটাই তপস্যা। বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ, ভাগবত, উপনিষদে তপস্যাকে অনেক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরের মেলায় নাগা সন্ন্যাসীরা শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন সন্ন্যাসীকে দেখা যাবে কাঁটার উপরে শুয়ে আছেন। এগুলোও এক ধরনের তপস্যা। এখানে তপস্যা বলতে কৃচ্ছ সাধনকে বোঝাচ্ছে। রাজযোগ কিন্তু আমাদের এত কিছু করতে বলছে না।

কঠোপনিষদে তপস্যার উপরে খুব সুন্দর একটা মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রে বলা হচ্ছে একটা রথকে পাঁচটি ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াগুলোর স্বভাব রাষ্ট্রা থেকে নেমে গিয়ে মাঠের দিকে ছুটে যাওয়া। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, এই হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি এদেরকে রথের ঘোড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, ঘোড়ার মত এদেরও স্বভাব হল তাদের বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি, ভোগের দিকে দৌড়ানটা বন্ধ করাই প্রাথমিক কাজ। আমাদের স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে গিয়ে পূর্বোল্লিখিত কষ্টসাধ্য কিছু করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইন্দ্রিয়গুলো যখনই কোন ভোগের দিকে যাচ্ছে আর মনও সেইভাবে ছুটছে, যখন ঐ ভোগের থেকে, সে যে কোন ধরনের ভোগই হোক না কেন, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসার ফলে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান হয়ে গেল। যখন ঠিক করে নিল যে আমি আর এটার প্রতি আসক্ত হব না, তখন কিন্তু সে আর ঐ ভোগের বিষয় যতই সামনে আসুক না কেন ঐ বিষয়কে আর ভোগের জন্য কখনই প্রশ্রয় দেবে না। যেখান থেকে ঘোড়াটাকে টেনে আনা হয়েছে সেখানে আর ওটাকে যেতে দেওয়া চলবে না। এটাই হল তপস্যার খুব সহজ ব্যাখ্যা। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা শারীরিক কঠোরতার উপর কখনই বেশি জোর দেননি। অত্যাধিক শারীরিক কৃচ্ছতাও যোগীর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। যেটুকু ঝোল ভাত খাচ্ছিল সেটাও যদি তপস্যার নামে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তার শরীরটাই চলে যাবে, জীবনে আর ধ্যান করাই তার হলো না। জামা কাপড় যদি গায়ে না রাখে তাহলে মশা কামড়াবে, গায়ে পোকামাকড় উঠবে, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হবে। এগুলোকে তপস্যা বলে না। ঠাকুর স্বামীজী যেটাতে জোর দিয়েছেন তা হল – দ্যাখো, একবার যখন বুঝে গেলে এটা আমার পক্ষে ক্ষতিকারক তৎক্ষণাৎ ঐটাকে ত্যাগ করে দেওয়া, আর ত্যাগ যখন করে দিলে তখন এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আর কোন অবস্থাতেই ঐ বস্তুকে আর কখনই গ্রহণ না করা। এটাই ঠিক ঠিক তপস্যা।

তপস্যা দিয়েই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম পাঠ শুরু হয়। যদি তপস্যা না করা হয় তাহলে তার আধ্যাত্মিক জীবন এখনো শুরুই হয়নি বলতে হবে। দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষই এখন ইন্দ্রিয় ভোগের মধ্যে নিমজ্জমান, সে যে কোন ধরনের ভোগই হোক না কেন। ভোগের মধ্যে ডুবে থাকা মানে তপস্যা নেই। আমাদের পাঁচ যুক্ত পাঁচ দশটি ইন্দ্রিয়, এখানে মনকে বাদ রাখা হল, এই দশটি ইন্দ্রিয়ের দশ রকম ভোগের বস্তু আছে। যেমন আমাদের পা, পায়ের কাজ হাঁটা, এখন যার হাঁটতে খুব ভালো লাগে বা দৌড়ানটা খুব প্রিয়, সে কিন্তু আজ হোক কাল হোক গোলমালে পড়ে যাবে। শরীরের পক্ষে যতটুকু হাঁটাচলা, দৌড়ান দরকার তার বেশি করতে নেই। ঠিক এই রকম আমাদের যে কটি ইন্দ্রিয় আছে সব কটি ইন্দ্রিয়কেই কেবল মাত্র আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যতটা এগিয়ে নিতে সাহায্য করে ঠিক

ততটাই ব্যবহার করতে হয়। শুধু মাত্র বিষয় ভোগের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলিকে নিঃশেষ হতে দেওয়ার মত বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারেনা।

দ্বিতীয় স্বাধ্যায় – শাস্ত্রে বলে ‘আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাম বোধাদহপি গরীয়সি’। বলছেন – নিত্য শাস্ত্র পাঠ করা, আবৃত্তি করা শাস্ত্রের অর্থ বোধগম্য করে নেওয়ার থেকেও শ্রেষ্ঠ। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র সব বুঝে নিয়েছে, খুব ভালো এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু রোজ যদি গীতার অন্তত চারটে শ্লোক আবৃত্তি করে সেটা আরো অনেক ভালো। পতঞ্জলিও এই কথাই বলছেন। কেন আবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে? দুটো জিনিষ হয় – একটা জিনিষকে শুধু জেনে নিলেই হয়না, বারবার ঐ জিনিষটাকে নিয়ে যতক্ষণ না নাড়াচাড়া করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে গভীর ভাবে ছাপ পড়বে না। দ্বিতীয় যেটা সেটা হল আবৃত্তির ফলে সংসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। স্বাধ্যায় একেবারে নিয়মিত হওয়া চাই। যারা সাধক হতে চান, আধ্যাত্মিক জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান, তাহলে নিয়মিত ভাবে রোজ আধঘন্টা কি এক ঘন্টা শাস্ত্র আবৃত্তি করতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনের খুবই ছোট্ট একটি মন্ত্র – জপ-ধ্যান-পাঠ, ব্যাস্ আর কিছু নেই, এটাই সারা জীবন নিয়মিত নিষ্ঠা সহকারে করে গেলেই হবে। যোগ বারংবার বলবে গভীর ভাবে ধ্যানে ডুবে যাও, যদি ধ্যান না করতে পার তবে অনুরাগের সাথে অনন্য চিন্তে জপ করতে থাক। এখন কোন কারণে যদি ঐ জপটাও করতে না পারে, মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে তখন শুধু স্বাধ্যায়, যে কোন একটা শাস্ত্র নিয়ে আবৃত্তি করতে বলা হচ্ছে। এই যে নানান জিনিষ জানার জন্য যে বই পড়া হয়, গুচ্ছে খানেক বই পড়াকে স্বাধ্যায় বলছে না। ঠিক ঠিক স্বাধ্যায় মানে যেটাকে জানা হয়ে গেছে সেটাকেই পুনঃ পুনঃ বেশ কয়েক দিন ধরে পাঠ করে পাকাপোক্ত করে নেওয়া। আর সেটাই পড়তে হবে যেটা ভাবের সঙ্গে মিলবে। এটা গেলো স্বাধ্যায়ের প্রথম দিক। দ্বিতীয় দিক হল যেটা আগে থাকতে জানা আছে সেটাকে আরো দৃঢ় করার জন্য সেই জিনিষটাকেই বার বার পড়ে যাওয়া, এর বাইরে আর কিছু পড়ার দরকার নেই। চারটে বই বেছে নিতে হবে, আর ঐ চারটে বইকেই পারায়ণ করতে থাকবে। নিয়মিত যে কোন শাস্ত্রের পারায়ণ, চণ্ডী পাঠ, গীতা পাঠ, রামায়ণ পাঠ, কথামৃত পাঠ প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু পাঠ করা হচ্ছে স্বাধ্যায়। আর যে যত বেশী করবে তত তার পক্ষে মঙ্গল। কিছু বুঝতে হবে না। লীলাপ্রসঙ্গে আছে ঠাকুরের কাছে একজন রামাইত সাধু এসেছিলেন। সেই সাধু রোজ সকাল বেলায় একটা মোটা পুঁথি নিয়ে বসত। ঠাকুর একদিন সাধুর সেই মোটা পুঁথিটা খুলে দেখেন ওর মধ্যে কিছু নেই, প্রত্যেক পাতায় শুধু ‘রাম’ এই একটি শব্দই লেখা। পাতা উল্টে সেই রাম লেখা, যতবার পাতা উল্টাচ্ছে ততবার ঐ রাম লেখাটা দেখছে আর মুখে রাম উচ্চারণ করছে। লোকেরা মনে করছে সাধু কতই না পড়ছে। এটাই কিন্তু প্রকৃত স্বাধ্যায়। এতে কি হয়, যে জিনিষটা জানা আছে সেই ভাবটা আরো গভীরে গিয়ে দৃঢ় হয়ে বসে যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হল ভাব পাকা করা।

তৃতীয় পদক্ষেপ ঈশ্বর প্রণিধান – ঈশ্বর প্রণিধান মানে, যা কিছু কাজ কর্ম করা হচ্ছে তার সব ফল ঈশ্বরে অর্পণ করে দেওয়া। ঈশ্বরকে সব ফল অর্পণ করাটাই একটা খুব উন্নত মানের সাধন পদ্ধতি। যত বৃত্তি উঠছে সব বৃত্তিগুলোকে নিরোধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করার যত পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধান একটি অন্যতম শক্তিশালী পদ্ধতি। এখন কেউ যদি সকালে সার্কাস দেখে, দুপুরে রেসকোর্সে জুয়া খেলে আর বিকেলে সিনেমা দেখে, রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে ঠাকুরকে বলে – ঠাকুর সারাদিন আমি যা করেছি সব তোমাকে সমর্পণ করে দিলাম। এতে কি ঈশ্বর প্রণিধান হবে? করতেই পারে, না করা কিছু নেই। যে চোর-ডাকাত সেও তার সব অপকর্মের ফল সমর্পণ করতেই পারে। কিন্তু এইভাবে ঈশ্বরের কাছে ঠিক ঠিক সমর্পণ করতে পারলে একটা সময় আসবে যখন তার মনেই অনুশোচনা হবে – ছিঃ আমি কি আজ বাজে কাজ করছি, আর সব বাজে নোংরা কাজের ফল ঠাকুরকে সমর্পণ করছি! এক সময় তার লজ্জা বোধ হবেই হবে, কুণ্ঠা আসবেই আসবে। তখন হয় সে ভগবানকে ছেড়ে দেবে, তা নাহলে বাজে কাজ করা ছেড়ে দেবে। এখন সে যদি ভগবানকে ধরে রাখে তখন সে সাধক হয়ে যাবে, সাধক যদি হয়ে যায় বাজে কাজ, নোংরা কাজ করা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসবে। ঈশ্বর প্রণিধানকে তাই এত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান এই তিনটে হল ক্রিয়াযোগ। এই তিনটে ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য হল দেহকেন্দ্রিক জীবনকে দেহ থেকে সরিয়ে এনে জীবনকে উচ্চ মার্গে নিয়ে যাওয়া। তপস্যা মানে আপনি দেহ দিয়েও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করতে চাইছেন না আর মনের দিক থেকেও ভোগের চিন্তা করতে চাইছেন না। স্বাধ্যায় মানে, আমরা যত রকমের হিজিবিজি বই, তা সে নিউজপেপার থেকে শুরু করে ম্যাগাজিন, বটতলার উপন্যাস সব পড়ে যাচ্ছি, এগুলোকে বন্ধ করে শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলা হচ্ছে। আর ঈশ্বর প্রণিধান, আমরা যা কিছু করি তার সব কৃতিত্ব নিজে নিতে চাই, কিন্তু তা নয়, নিজে কৃতিত্ব নেওয়া বন্ধ করে সব কৃতিত্ব ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে দাও। আপনি বলবেন এর আগেই তো বলা হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের কৃপা এগুলো যতক্ষণ না দেখছি ততক্ষণ কি করে করবে! কিন্তু তা নয়, সরাসরি এর যোগের সাথে যোগ রয়েছে। যোগের দৃষ্টিতে সব কাজ বস্তুর উপরে ইন্দ্রিয় করছে, আমার আবার কিসের কাজ, আমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা বা পুরুষ। আমার সঙ্গে তো এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই।

কিন্তু আমাদের মন এতই জড় যে, জগৎ ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারি না, এই অবস্থায় আমরা এই উচ্চ মনোভাব নিয়ে কখনই কাজ করতে পারবো না। জগতের উপর আমাদের নির্ভরতা এত বেশী যে, যে কোন ভাব যদি মনে জাগে সেটার জন্য আমার বাইরের একটা বস্তুর দরকার হয়ে পড়ে। সেই ভাব ভালোবাসার ভাবই হোক, হিংসার ভাবই হোক, রাগই হোক বা ঘৃণার ভাবই হোক, যেটাই হোক তক্ষুণি বাইরের একটা বস্তুকে চাই। মুষ্টিযোদ্ধারা যখন অনুশীলন করে তখন তারা একটা বালির বস্তাকে ঝুলিয়ে তার মধ্যে ঘুষি মারতে থাকে। অফিসে, সমাজে, বাড়িতেও সবাই একটা এই রকম একটা বালির বস্তা ঠিক করে নেয়, যার উপর সব রাগ ঝাড়তে পারবে। অফিসে যে খুব গোবেচারা সবাই তার উপর সব রাগের ঝাল মিটিয়ে নেবে। অফিসের বস্ তার রাগ তার অধস্তন কর্মচারীর উপর ছাড়ছেন, এর আগে অফিসে আসার আগে বাড়িতে বস্ তার স্ত্রীর রাগের ঝালটা অফিসে বয়ে নিয়ে এসে তার অধস্তন কর্মচারীর উপর ছাড়ছে। অধস্তন কর্মচারী তার অধস্তন কর্মিকে উপর সেই ঝাল মেটাচ্ছে, সেখান থেকে নামতে নামতে পিওনের স্তরে এল, পিওন আবার দারোয়ানকে ঝাড় দেয়, দাড়ায়ে তার চা ওয়ালাকে ঝাড় দেয়। চা ওয়ালাকে যে ঝাড় দিচ্ছে সে আর কাকে রাগ দেখাবে! শেষ হয় রাষ্ট্রর যে নেড়ী কুকুর ঘুরে বেড়ায় তাকে একটা ইট ছুঁড়ে। একটা বাইরের বস্তু ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না। আমাদের মনের বিভিন্ন উদ্ভট আবেগগুলোকে বার করার জন্য বাইরের বস্তু না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। এই তো আমাদের দুরবস্থা, আর আমরা জন্ম জন্ম ধরে এই সংস্কার নিয়ে বড় হয়েছি যে, যা কিছু করবো তার সব কৃতিত্ব আমি নেব। অথচ সব কাজ যখন হয় তখন ইন্দ্রিয় বস্তুর উপর কাজ করছে কিন্তু নাম নিচ্ছেন আপনি। কারণ আপনি তো সেই শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্য কি করে কাজ করবে! আমরা এত উচ্চ কথা কিছু বুঝতে পারি না বলে আমাদের এত দুরবস্থা। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বস্তুর উপর কাজ করছে আর আমি ভাবছি আমি করছি, এটাকে আটকানোর জন্যই বলছেন যা কিছু করছ সব ফল ঈশ্বরে অর্পণ করে দাও।

এই যে এতগুলো সমাধির কথা বলা হল, এগুলো অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য প্রথমেই বলছেন তপস্যা। তপস্যা হল, আমি একটা পথ বেছে নিলাম, এবার যা কিছু হয়ে যাক আমি এই পথেই চলব। আমি ঠিক করে নিয়েছি পড়াশোনা করাটাই আমার জীবন, জপ-ধ্যান করাই আমার তপস্যা। এবার আমি সকালে দু ঘন্টা বই নিয়ে বসবো, এরপর যত বিঘ্নই আসুক আমি আমার স্বাধ্যায়কে ছাড়বো না। ঠাকুর দুই চাষীর গল্প বলছেন। দুজনেই খাল কেটে চাষের জমিতে জল আনবে। দুজনেই ক্ষেতে কাজ করছে। একজনের স্ত্রী তার মেয়েকে দিয়ে তেল পাঠিয়েছে স্নান করে খেয়ে নেওয়ার জন্য। সেই চাষী প্রচণ্ড রেগে গেছে, মেয়েকে এই মারতে আসে কি সেই মারতে আসে। মেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে। অন্যজনকেও এসে স্ত্রী বলছে স্নান করে খেয়ে নিতে। সে বলছে, আচ্ছা তুই যখন বলছিস স্নান করে খেয়ে নিই। তপস্যা মানে আমি ঠিক করে নিয়েছি এখন আমি এই কাজটাই করব। সমস্যা হল, সংসারে থেকে থেকে এত জিনিষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, এত কিছু প্রতি আমাদের ক্রোধ, দ্বেষ এসে গেছে যে, কোন কিছু থেকে সামান্য একটু প্ররোচনা এলে সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। আবার

করতে করতে এক সময় শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, কাজটাও কঠিন মনে হতে থাকে তখন মনে হয় একটু বিশ্রাম করে নিই। বিশ্রাম করা মানে ভোগ করা। বিষয় সুখে বসা মানে বিশ্রাম করা, বিশ্রাম আর বিষয় সুখ দুটোই এক। পুরোটাই এতে নষ্ট হয়ে যাবে না, কিন্তু কিছু দিনের জন্য আপনি আটকে গিয়ে পিছিয়ে পড়লেন। তপস্যায় যত আঁট থাকবে আপনার উন্নতিও তেমন হবে। যদি আঁট কম থাকে তাহলে সময়ও বেশী লাগবে।

স্বামীজী এখানে কঠোপনিষদে রথের উপমা দিয়ে যে মন্ত্র আছে সেটাকে তুলে এনেছেন। ইন্দ্রিয়গুলো হল ঘোড়া, মন হল রশ্মি, বুদ্ধি হল সারথি। সারথি যদি রশ্মি দ্বারা অশ্বগুলোকে টেনে রাখতে পারে তবেই রথ ঠিক পথে চলে। তপস্যা শব্দের অর্থও তাই, শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে না দিয়ে এদের রাশ ধরে আত্মবশে রাখা। আমি জেনে গেছি এই কাজ করা ঠিক নয়, এবার যতই প্ররোচনা আসুক আমি করবো না, এই যে ইন্দ্রিয়গুলোকে পথে রাখা হল, এটাই তপস্যা। ঠাকুর মেয়েদের ব্যাপারে সাধকদের সাবধান করতে গিয়ে বলছেন – যদি স্ত্রী ধর্ম পথে বাধা দেয় তাহলে বলতে হয় আমার পুরুষার্থ হানি করতে এসেছিস! মুণ্ডু কেটে দেব। মেয়ে সাধিকাদের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ প্রযোজ্য। তপস্যা মানে এটাই। আমার পুরুষার্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবার আমি সেই পথে এগোচ্ছি। এরপর যদি কোন বিঘ্ন বা প্ররোচনা আসে তখন এভাবেই বলতে হবে। একাদশীর উপবাস করা, তীর্থ করা এগুলো সেই তুলনায় কোন তপস্যাই নয়। উত্তর ভারতে ছুটির সময় মেয়েরা দুদিন তিন দিন উপোস করে থাকে, রাত জাগে। কেন? নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনার্থে। এটাও একটা তপস্যা, কারণ এর মধ্যেও একটা পুরুষার্থ আছে। কিন্তু পুরুষার্থটা এতই নিম্ন প্রকৃতির যে এর কোন মূল্যই নেই। ঠিক ঠিক পুরুষার্থ হল আমি ঈশ্বরের জ্ঞান পেতে চাই।

স্বাধ্যায়ও ঠিক একই জিনিস। এখানে সাধারণ লোকদের নিয়ে কোন আলোচনা হচ্ছে না। যাঁরা বলছেন আমি এবার যোগপথে নামলাম, এখানে তাঁদের জন্যই বলা হচ্ছে। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক যাত্রা যখন শুরু হয় তখনই এক কঠিন অধ্যায় শুরু হয়। যোগপথে নামার প্রথম শর্ত হল, তোমার পড়াশোনা সব হয়ে গেছে, যাবতীয় যত শাস্ত্র আছে সব জেনে নিয়ে একটা পথ ঠিক করে নিয়ে বলে দিয়েছে এটাই আমার পথ। এরপর কেউ যদি ওই পথের ব্যাপারে কোন উল্টোপাল্টা কথা বলে সেখানে সে কোন রকম মাথা গলিয়ে তর্কাতর্কিতে যাবে না। কাঁচা যোগী হলে প্রথমেই দেখবে লোকটি কি বলছে, এরপর তার উত্তর খুঁজে বেড়াতে থাকবে। এগুলো যোগের লক্ষণ নয়। যোগের লক্ষণ হল, যোগী বলবে – তোমার এই ব্যাপারে কোন আপত্তি আছে? খুব ভালো, আমাদের অনেক পণ্ডিত আছে তুমি তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বল, আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। যোগের প্রথম কথা হল, আমার আর জানার দরকার নেই। কিন্তু তার আগে যেটুকু জানার তার সবটাই জেনে নিতে হবে। শাস্ত্রীয় জ্ঞান যদি না থাকে তখন কোন বিপরীত কথা শুনলেই সে উল্টে ছিটকে পড়বে। যারা মনে করে আধ্যাত্মিক জীবনে অত বই পড়ার কি প্রয়োজন, তারা খুব ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে। মুর্খদের দিয়ে আর যাই হোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন কখনই হবে না। প্রথমে শাস্ত্র জানতে হবে, জানার পর ঠিক করে নিতে হবে আমার পথ এই। এরপর শুরু হয় স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায় মানে, যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছে এবার শুধু সেই পথের ব্যাপারে যত শাস্ত্র আছে সব তাকে অধ্যয়ন করে যেতে হবে যাতে তার ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হয় আর যাতে তার সাধনার জীবন মসৃন ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। যারা ঠাকুরের ভক্ত, তারা কি বই পড়বে? ঠাকুরকে যে জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছে তাকে এবার শুধু নিয়মিত কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজী রচনাবলী নিষ্ঠা সহকারে পড়ে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে তাকে বাকি সব কিছু জানা দরকার। না জানলে মন কাঁচা থেকে যায়। আমরা মনে করছি আমি বেশ এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু একটু সামান্য সংশয় হলে আমাকে ছিটকে ফেলে দেবে। সেইজন্য যোগীকে আগে শাস্ত্রের তাৎপর্য জেনে নিতে হয়, সেখান থেকে এবার ঠিক করে নেবে আমার জন্য এই পথ। স্বামীজী দুটো বাক্যে এখানে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন – *অজ্ঞানয়াবস্থায় মানুষ প্রথমোক্ত প্রকার জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, উহা তর্কযুক্ত স্বরূপ – প্রত্যেক বিষয়ের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়া বিচার করা; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায়-সমাধানে উপনীত হয়। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না।*

কথামূতে ঠাকুরের সব কথাই সিদ্ধান্ত বাক্য। উপনিষদের সব কথা সিদ্ধান্ত বাক্য, সেইজন্য সবাইকে উপনিষদ পড়তে দেওয়া হতো না। অত্রাঙ্কণদের জন্য তো পুরোপুরি নিষেধ ছিল আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাদের তপস্যা নেই তাদেরও উপনিষদ পড়া নিষেধ ছিল। কারণ উপনিষদ হল সব সিদ্ধান্ত বাক্য। সরাসরি সিদ্ধান্ত বাক্য পৌঁছানো মারাত্মক বিপজ্জনক। তার আগে সিদ্ধান্ত বাক্যের ধারণা মনে প্রগাঢ় হওয়া চাই, তার আগে কত তপস্যা, সাধনা করতে হয়ে আমাদের ধারণাই নেই, কিন্তু কথায় কথায় আমরা কথামূতের কথা, উপনিষদের কথা মুখে আউড়ে যাচ্ছি। স্বামীজীই বলে দিচ্ছেন *গুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্ত বিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে।* ঠাকুর যখন কথামূতের কথাগুলো বলছেন তার আগে তাঁর কত সাধনা, কত উপলব্ধি আছে সেগুলো দেখুন। আমাদের এক বিন্দু সাধনা নেই, কিন্তু ফড়র ফড়র করে কথামূত আউড়ে যাচ্ছি। কথামূত পড়ার জন্য আগে প্রচুর খাটনি চাই। অনেক আগেকার কথা, স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শেষ অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে কথামূত পড়ছেন। একজন নতুন ব্রহ্মচারী দেখে বলছেন ‘মহারাজ! আপনি এখনও এই বয়সে কথামূত পড়ছেন!’ মহারাজ বলছেন ‘বলো কী! এতদিনে তো কথামূত সবে বুঝতে শুরু করলাম’। আর ঠাকুরের কোন ভক্তকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কথামূত পড়েছেন? সঙ্গে উত্তর দেবে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কথামূত পড়ে ফেলা হয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলছেন সিদ্ধান্ত জেনে নিলে কখনই কিছু হবে না। সিদ্ধান্ত জানার আগে তোমাকে প্রচণ্ড খাটতে হবে। এমন কি আপনি যদি আগে জেনেও থাকেন তা হলেও ধারণাকে প্রগাঢ় করতে হবে। তার জন্য সব সময় যোগান দিয়ে যেতে হবে। যোগান না দিলে শাস্ত্রের কথা ধরে রাখতে পারা যাবে না, দুদিন পরেই কোন সংশয় এসে এমন ধাক্কা মারবে যে সব ছিটকে বেরিয়ে যাবে। অন্য দিকে কোন তর্ক বিচারে নামা চলবে না। স্বাধ্যয় মানে এটাই। এটাও জেনে নিলেন, ওটাও জেনে নিলেন এরপর নিজের সিদ্ধান্তটা ঠিক করে নিয়ে এবার ওই সিদ্ধান্তে অনবরত জল সিঞ্চন করে যাচ্ছেন। স্বামীজী আরেকটা কথা বলছেন, যোগী কখন কোন ধরণের তর্কযুক্তিতে যাবে না। যদি কেউ তর্ক করতে আসে তুমি কোন তর্ক না করে চুপ করে থাকবে, কিংবা সেখান থেকে উঠে চলে আসবে। যে কোন তর্ক, সেই তর্ক বাজারে সজী কেনা নিয়ে হতে পারে, ধর্মের ব্যাপারে হতে পারে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হতে পারে, সাধক কক্ষণ কোন তর্কাদিতে নামতে যাবে না।

শেষে বলছেন ঈশ্বর প্রণিধান, ঈশ্বর প্রণিধান মানে কোন কিছু জন্য তুমি কৃতিত্বও নেবে না ব্যর্থতাও নেবে না। ঠাকুর বার বার বলছেন সব ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। কিন্তু যোগশাস্ত্রে বলছে চৈতন্য সত্তা, যা কিছু হচ্ছে চৈতন্য সত্তা আছে বলেই হচ্ছে। তাহলে আমরা কেন কৃতিত্ব নেব না? কারণ আমরা তো নিজেকে চৈতন্য বলে জানি না, আমরা নিজেদের দেহ মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছি, কিন্তু আমরা তো দেহ মন ইন্দ্রিয় নই। আগে এই দেহ মন ইন্দ্রিয়ের সাথে একাত্ম হয়ে থাকা থেকে তো সরে আসতে হবে। একেবারের জন্য না হলেও অন্তত মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্যেও সরতে হবে, তা নাহলে তো শুরুই করা যাবে না। সেইজন্য আমাদের জন্য যোগশাস্ত্র প্রথমে ঈশ্বর প্রণিধান করার কথা বলছেন। ঠাকুরের হাত ভাঙা অবস্থায় ঠাকুর বলছেন, এর ভেতরে এক তিনি আছেন আর তাঁর ভক্ত আছে, ভক্তেরই হাতে লেগেছে। ঠাকুর এই কথা বলছেন না যে আমি আছি আর তিনি আছেন। ওই অবস্থায় আমিত্বের ব্যাপারটা আমরা যে অর্থে ভাবি সেই অর্থে আসবেই না, চেষ্টা করলেও আসবে না। জ্ঞানী দেখেন চৈতন্য সত্তাই সব করছেন, চৈতন্য সত্তা মানেই ঈশ্বর করছেন। সাধারণ মানুষ এই আমিত্বকে ছাড়তে পারে না। তাই প্রথমে তাকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে চৈতন্য সত্তা আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তাই তুমি আস্তে আস্তে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় থেকে বেরিয়ে এস। আমাদের সমস্যা হল, আমরা যখন বলি সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে, তখন আমরা সব সময় মনে করছি, আমি আছি আপনি আছেন আর তিনি উপরে বসে পুতুল খেলার মত কলকাঠি নাড়ছেন। আসলে চৈতন্যই আছে, সেই চৈতন্য সত্তা অন্তর্ধামী হয়ে সবার ভেতরে বিরাজ করছেন, তিনিই আবার সর্বব্যাপী। তিনি না থাকলে এই শরীরটা জড় হয়ে পড়ে থাকবে, এই শরীর দিয়ে কিছু করা যাবে না। তাঁর ইচ্ছাতে হয় যখন বলা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই সব হচ্ছে।

এই ক্রিয়াযোগের ঠিক ঠিক অনুশীলন সাধককে আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যায়। এখান থেকেই সাধনার পদ্ধতিগুলি ঠিক ঠিক শুরু হয়। সব থেকে বড় কথা হল, এতক্ষণ যেসব পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে পতঞ্জলি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিকেই অনুসরণ করবার জন্য বলছেন না। বলছেন না যে তোমাকে ঈশ্বরকে মানতে হবে, তোমাকে এতবার জপ করতে হবে, এতবার স্নান করতে হবে। এই যে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা বললেন, যারা ঈশ্বরকে মানে না তারা যে কাজই করুক না কেন, সেই কাজটা যদি সে অনাসক্ত ভাবে করে, তাতেও তার প্রভূত কল্যাণ হবে। অনাসক্ত ভাবে কর্ম করলে নতুন কোন কর্ম আর তৈরী হবে না।

ক্লেশজনক বিঘ্ন

এরপর বলছেন যদি এই ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করি তাহলে কি হবে। সেটাই পরের সূত্রে বলা হচ্ছে **সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ।।২।।** যখন এই তিনটে তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান ঠিক ঠিক করা হয়, তখন এগুলিই ধ্যান এবং সমাধির অভ্যাসে সহায়তা করে। এর থেকেও যেটা বড় সুবিধা, তা হল যেগুলো ক্লেশজনক বিঘ্ন সেগুলিকে কমিয়ে দেয়। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট-ব্যথার শেষ নেই। সবারই কিছু না কিছু ক্লেশজনক বিঘ্ন আছে। কিসের বিঘ্ন? সমাধির পথে বিঘ্ন। মন চাইছে ধ্যান করি, কিন্তু ক্লেশরূপ বিঘ্ন ধ্যানের পথে প্রাচীর তুলে রেখেছে। আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতি যে কোন কষ্টদায়ক অনুভূতিতে এসে আটকে যায়। কোন একটা তীর্থে যাবে বলে সব প্রস্তুতি শেষ করে রেখেছে, সেই সময় একটা খুব খারাপ খবর এসে গেল, তখন হয়তো আর তার যাওয়াই হল না, যদিও জোর করে বেরিয়ে পড়ে সারা তীর্থভ্রমণে শান্তি বা আনন্দ আসবে না। এই ধরনের ক্লেশজনক বিঘ্ন সাধারণ লোকের জীবনেও আসে আবার যারা সাধক তাদের জীবনেও আসে। কিন্তু যখন তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান এই তিনটির অনুশীলনে যেমন ধ্যান ও সমাধির অভ্যাসে সাহায্য করবে আবার এই ধরনের ক্লেশজনক বিঘ্নগুলিকে কমিয়ে দেবে। কেউ এসে যদি বলে – দাদা মহা দুঃখে আছি, কি করি বলুন তো? তার জন্য একটাই উপদেশ – ভাই, তুমি তপস্যা কর, স্বাধ্যায় কর আর ঈশ্বরে প্রণিধান কর। সে যদি এগুলো করে তার কষ্ট অবশ্যই কমে যাবে। জীবনে যদি কষ্ট কমাতে চাও তাও এই তিনটে করতে হবে, জীবনে যদি এগোতে চাও তাও এই তিনটে করতে হবে। আমরা কিছু একটা তো চাইছি। হয় আমাদের জীবনে প্রচুর কষ্ট আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। আবার আরেকজন বলছে আমার জীবনে কষ্ট নেই কিন্তু আমি জীবনে এগোতে চাই, ভালো মানুষ হতে চাই। এই দুটো ক্ষেত্রেই তপস্যা, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান হল একমাত্র নিদান।

তপস্যাতে প্রথমে দুটো চারটে জিনিষ নিয়ে এগোতে শুরু করতে হবে, ভোর পাঁচটায় উঠব, সকালে স্নান করে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজাব, গঙ্গা স্নান করব, এই রকম ছোট ছোট কয়েকটি জিনিষকে ঠিক করে নিয়ে নিয়মিত করে যাওয়া। কিন্তু জীবনে যত এগোতে চাইবেন তত তপস্যার পরিমাণটা বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রথম কথাই হল এরা কেউ কিছু করতে চাইবে না। এগুলো না বলে যদি কোন টোটকা দিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা একটা তাবিজ দিয়ে দিলে সেগুলি হাসি মুখে নিয়ে নেবে কিন্তু নিজে কিছু করতে চাইবে না। এরা আজ এই বাবাজী কাল ঐ বাবাজীর কাছে যাবে যদি কিছু টোটকা পাওয়া যায়। কিন্তু পরিণামে কিছুই হয় না, বরং দৌড়াদৌড়িটাই বিফল হয়ে পরে আরও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে। ঠাকুর বলছেন – রান্না করে খাবার বেড়ে দিয়েছি শালারা তবুও খেতে চায়না। যারা সাধক তাদের এই তিনটে করতে হয়, আবার যারা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরাও এগুলো করেন। যারা সংসারী, ঘোর কষ্টে আছে তাদেরকেও এটা করতে হয়, যারা আনন্দে আছেন তাদেরও এই তিনটে করতে হয়। তাতে কি হয়, যেটুকু এগিয়ে গেছে সেখান থেকে আর পতন হয় না।

রাজযোগ বলে দিল তপস্যা করা, স্বাধ্যায় করা আর ঈশ্বরে সব কিছু অর্পণ করা, এই তিনটে করলে জীবনে যত ক্লেশ আছে সব চলে যাবে। আমাদের সবার জীবনের মূল ক্লেশ তাহলে কোনগুলো? পরের সূত্রে সাধকদের পক্ষে ক্লেশজনক বিঘ্নগুলি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এই সূত্রটা আমাদের সবাইকে মাথায় একেবারে বসিয়ে নিতে হবে **অবিদ্যাহসিতারাগদেহাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।।৩।।**

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ এই পাঁচটিই ক্লেশজনক বিষয়। আমাদের যত গোলমাল এই পাঁচটির মধ্যে। আমাদের যত দুঃখ, যত কষ্ট সব এই পাঁচটির মধ্যেই আছে, এই পাঁচটিই ক্লেশ। এবার এক এক করে এই পাঁচটি ক্লেশের ব্যাখ্যা করছেন।

প্রথম ক্লেশ অবিদ্যা – অবিদ্যা হল অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বাকি চারটি ক্লেশের উৎপত্তির মূল কারণ, এই চারটির জননী। অবিদ্যা আছে বলে বাকি চারটে আছে। এই চারটে হল ফল আর ক্ষেত্র হল অবিদ্যা। অবিদ্যা আছে বলেই বাকি চারটে ক্লেশ আছে। কিন্তু মা আর চার সন্তানকে যোগ একটা গ্রুপে ফেলে দিচ্ছেন। একক ভাবে অবিদ্যাও একটা কষ্টের কারণ। একটা বাড়িতে চারটে দুষ্ট ছেলে আছে, আপনি বলছে এই চারটে মহা দুষ্ট ছেলে কিন্তু এদের মা ভালো। কিন্তু এখানে তা নয়, মাও বদমাইশ। মা সূক্ষ্ম বদমাইশ আর চারটে স্থূল বদমাইশ। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চারটেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু অবিদ্যা এত সূক্ষ্ম যে, এর বদমাইশিটা বোঝা যায় না। এখানে যদিও পাঁচটা ক্লেশের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আসলে প্রত্যেকটি চারটে অবস্থাতেই থাকে।

ক্লেশের চারটি অবস্থা

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্তনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্ ॥৪॥ এই ক্লেশ চারটে অবস্থাতে থাকে – প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন আর উদার। প্রসুপ্ত মানে ঘুমন্ত, তনু মানে হালকা, লঘু হয়ে যাওয়া। তৃতীয় বিচ্ছিন্ন, মানে অবিদ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। সবশেষে উদার, মানে বিস্তার করে আছে। অবিদ্যা বিভিন্ন রূপে আসে। অবিদ্যার মূল হল, পুরুষ তার নিজের আসল সত্তাকে ভুলে গেছে। পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য যখন প্রকৃতির সংসর্গে এসে পড়ে তখন সে নিজেকে ভুলে যায়। নিজের স্বরূপ ভুলে যাওয়াটাই অবিদ্যা। অবিদ্যা এই চারটে রূপে আসে।

যারাই এই জগতে আছেন, গান্ধীজী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রার ভিখারী, সবার মধ্যে এই পাঁচটি ব্যাখ্যা, অবিদ্যাকে ছেড়ে দিলে, যেহেতু সে বাকি চারটির জননী, এই চারটে ব্যাখ্যা প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন আর উদার এই চারটির যে কোন একটা আকারে রয়েছে। প্রসুপ্ত হল – একটা বাচ্চা শুয়ে আছে, এখন সে বড় হয়ে ডাকাত হবে না সাধু হবে কেউ বলতে পারেনা? কিন্তু বাচ্চা যা হবে সেটা ওর মধ্যে আগে থেকেই আছে, সে আর নতুন করে কিছু হচ্ছে না, ওটা ওর মধ্যে আগে থেকেই ছিল, এই যে সুপ্ত অবস্থাতে রয়েছে এটাকেই বলছে প্রসুপ্ত। তার মানে বাচ্চার মধ্যে অবিদ্যা সুপ্ত হয়ে আছে, সে জানেও না যে তার মধ্যে অবিদ্যা আছে। আমরা বলি লোকটি কি সরল, বিশেষ করে গ্রামের লোকেরা, আদিবাসীরা কত সরল। আসলে এদের বুদ্ধিই নেই, অবিদ্যা এদের এখন খুলতে শুরুই হয়নি। প্রলোভন কাকে বলে, মিথ্যা কথা কাকে বলে এরা জানেই না। আমরা মনে করছি কত শুদ্ধ সাত্ত্বিক। তাহলে প্রসুপ্ত আর সাত্ত্বিকের মধ্যে তফাৎ কোথায়? যদি সাত্ত্বিক হয় তখন তার মধ্যে ক্ষমতা থাকবে, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি, বদমাইশি করতে পারি কিন্তু আমি করছি না। কিন্তু মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতাই নেই, বদমাইশি করা কাকে বলে জানেই না, এরাই প্রসুপ্ত। তাহলে মনে করতে পারি প্রসুপ্ত অবস্থা থেকে যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলে যাই তাহলে কত ভালো। কিন্তু তা কখনই হবে না। প্রসুপ্ত থেকে সব সময় হবে উদারাগাম্, ছড়িয়ে যাবে। সেখান থেকে হবে তনু, তারপরে হবে বিচ্ছিন্ন। সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। স্বামীজীও অবোধ শিশুর কথা বলছেন। শিশুর মধ্যে এখন সব ঠাসা আছে, এখনও বেরোতেই শুরু হয়নি।

দ্বিতীয় তনু, তনু মানে ক্ষীণ হয়ে যাওয়া। অভ্যাস করতে করতে যেগুলো প্রসুপ্ত হয়ে রয়েছে সেগুলো ক্ষীণ হয়ে যায়, এটা সাধকদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যারাই জপ, ধ্যান নিয়মিত করতে থাকেন তাদের কিছু কিছু প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, একেবারে চলে যাবে না, কিন্তু সূতোর দাগের মত রেখামাত্র হয়ে থাকবে, পরে কোন সুযোগ পেলে হয়তো ঐ ক্ষীণ প্রবৃত্তিটাই জেগে উঠবে কিন্তু তার সেই ক্ষমতা থাকবে না, উঠেই আবার বিমিয়ে পড়বে।

ঠাকুরের গল্পে আছে – এক বহুরূপী সাধু সেজে এসেছে, তাকে জমিদার একটা টাকা দিতে গেলে সেই বহুরূপী টাকা নিলো না। পরে সাধুর পোষাক খুলে জমিদার বাবুর কাছে এসে বলছে ‘তখন কি দিচ্ছিলে সেটা এখন দাও’। জমিদার বলছে ‘তখন দিতে গেলাম নিলে না, এখন কেন আবার নিতে আসছ’। বহুরূপী বলছে ‘তখন সাধুর বেশে ছিলাম বলে নিতে পারিনি’। ব্রহ্মচারী অবস্থায় প্রথম দিকে খুব ত্যাগের ভাব থাকে। পরে দেখে কিছু টাকা না হলে চলেও না। আগে ছিল প্রসুপ্ত। কিন্তু যখন টাকার প্রয়োজন মনে করে সেই সময় যদি আবার কেউ দু-তিন লাখ টাকা দিতে আসে তখন আবার দম বন্ধ হয়ে যাবে, নিতে পারবে না, তার মানে এখন সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তনু হয়ে গেছে।

তৃতীয় বিচ্ছিন্ন overpowered। কোন একটা বিশেষ বৃত্তি এসে গেলে তখন অন্য বৃত্তিগুলো চাপা পড়ে যায়। যেমন মনে করুন কারুর মাংস ভাত খাওয়ার খুব বাসনা আছে। সে মাংস ভাত রান্না করে রেখেছে খাবে বলে। হঠাৎ খবর এলো তার পরিবারের কেউ মারা গেছে, তখন কি আর মাংস ভাত খেতে পারবে? গলা দিয়েই আর নামবে না। কিন্তু তাই বলে কি মাংস ভাত খাওয়ার প্রবল বাসনাটা চলে গেছে? মোটেই নয়। তাহলে কি তনু বা ক্ষীণ হয়ে গেছে? একেবারেই নয়। তাহলে কি প্রসুপ্ত হয়ে আছে? তাও নয়। তাহলে? It has been overpowered. যেমনি ঐ overpowering emotion চলে যাবে ওটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। বিচ্ছিন্ন বলতে এখানে বলছেন, খুব বড় একটা শুভ সংস্কার আছে, সেই সংস্কারটা বাকি সব সংস্কারকে চাপা দিয়ে দেয়। বিচ্ছিন্ন অবস্থাটা সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা নয়, এখানে সাধকের এগিয়ে যাওয়ার অবস্থা। যার ফলে ওই শুভ সংস্কারটা যদি কোন কারণে সরে যায় তখন সব সংস্কারগুলো বেরিয়ে আসার পথ খুলে যায়।

সব শেষে হল উদার – মানে বিস্তৃত। অনুকূল অবস্থা বা পরিস্থিতিতে সংস্কারগুলো প্রবল ভাবে কাজ করতে থাকে, তার মানে সংস্কারগুলো বিস্তৃত হয়ে আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সংস্কারগুলির সবটাই আছে, একটু ভোগ করার ইচ্ছে, একটু নাম যশ পাওয়ার ইচ্ছে – সব ধরণের ভোগের ইচ্ছা খুলে রয়েছে, যখন যেমন সুযোগ আসছে সংস্কারগুলো সেই সেই মত কার্য করতে থাকে। এইভাবে আমাদের সংস্কার গুলো চারটে অবস্থাতে কাজ করে। যতক্ষণ না জ্ঞান হচ্ছে, নির্বীজ সমাধি না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে এই চারটে অবস্থার মধ্যেই ঘুরপাক করে যেতে হবে। আমি মনে করছি এখানে থেকে বেরিয়ে অন্যটাতে চলে এলাম, আর নীচে যাবো না। কিন্তু তা হয় না, যেটা থেকে বেরিয়ে এলাম সেটা আবার প্রসুপ্তে চলে যাবে। প্রসুপ্ত থেকে আবার উদারে যাবে, সেখান থেকে হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে চাপা পড়ে যাবে, আবার হয়তো তনু হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য হল পুরোটাকে নাশ করে দেওয়া। এখানে যে অবিদ্যা বলা হয়েছে, এই অবিদ্যাকেই বেদান্তে বলা হয় অজ্ঞান।

অবিদ্যার ব্যাখ্যা

আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে অবিদ্যা জিনিষটা কী? তাই পরের সূত্রে অবিদ্যার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হচ্ছে – **অনিত্যাশুচিদুঃখানা ত্বসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।।৫।।** অবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে চারটে জিনিষের কথা বলছেন। রাজযোগ যে কত বিজ্ঞান সম্মত এই সব সূত্রে এসে বোঝা যায়। রাজযোগ তাই নিয়মিত অধ্যয়ন করে যেতে হয়, এতে জীবনের ব্যাপারে সমস্ত রকম সংশয় দূর হয়ে যাবে। এগুলো হল সাধনার condensed milk। বলা হয় ভগবান শিব তাঁর জটা থেকে এক ফোঁটা জল ছেড়ে দিয়েছেন, সেটাই গঙ্গা রূপে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের জন্য তপস্যা করছেন। তাতে গঙ্গা নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছেন। গর্বিনী হয়ে গঙ্গা বলছে আমি যখন মর্ত্যে অবতরণ করবো তখন আমার বেগ ধারণ করার মত জগতে কে আছে? আমি তো সোজা পাতালে প্রবেশ করে যাব। ভগীরথ দেখল সত্যিই এ এক সমস্যা। তাহলে এখন কী হবে? তখন তাঁর শিবের কথা মনে হল, একমাত্র শিবই গঙ্গার এই বেগ সামলাতে পারবেন। তাই শিবের সাধনা শুরু করলেন ভগীরথ। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব বললেন ‘তুমি কী চাও বল’। ভগীরথ বললেন ‘মা গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করবেন, কিন্তু গঙ্গার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না, আপনি যদি কৃপা করে এই বেগকে সামলে দেন’। শিব বললেন ‘ঠিক আছে হয়ে যাবে, অবতরণ করতে বলে দাও’। শেষে

গঙ্গা নামল। ভগবান শিব করলেন কি, তাঁর জটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গঙ্গা যখন মানুষ রূপে বেগ নিয়ে নামল, গঙ্গা শিবের ওই জটার মধ্যে হারিয়ে গেল, পথই খুঁজে পাচ্ছে না। ভগবান শিব জটাকে এবার বেঁধে গঙ্গাকে মাথায় ধারণ করে নিলেন। সেইজন্য পার্বতীর আবার খুব অভিমান। আমি হলাম শিবের স্ত্রী কিন্তু মাথায় বসিয়ে রেখেছেন গঙ্গাকে। ভগীরথের আবার সমস্যা হয়ে গেল। ভগবান শিব গঙ্গাকে জটার মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। ভগীরথ আবার তপস্যায় বসে গেলেন। তপস্যা করে বলছেন ‘আপনি তো গঙ্গাকে আটকে দিলেন এবার সে বেরোবে কী করে?’ তখন ভগবান শিব বললেন ‘ঠিক আছে, এই নাও গঙ্গাকে’। তখন তিনি এক ফোঁটা জল ছেড়ে দিয়েছেন। এই যে এক ফোঁটা ছেড়ে দিলেন সেটাই বিশাল গঙ্গা নদী হয়ে এত দীর্ঘ পথ ধরে সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে। গঙ্গা এখনও শিবের জটার মত ঘুরছে। পতঞ্জলিও গঙ্গার এক ফোঁটা দিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের বন্যা হয়ে যাবে। শিবের এক ফোঁটা জল মানে পুরো গঙ্গা নদী। পতঞ্জলি এই সূত্রগুলোকে এক একটা ফোঁটা করে রেখে দিয়েছেন। যত চিন্তা করতে থাকব ততই খুলতে থাকবে, আর পুরো বাস্তব সম্মত। এখানে ডান দিক বাম দিক বলে কিছু নেই, একেবারে সোজা। মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে গেলে তারা যেমন বেশী ঘুম হওয়ার ওষুধ, কম ঘুম হওয়ার ওষুধ, মানসিক সম্ভাপের ওষুধ দিয়ে দেয়। এখানেও তাই, আবেগজনিত অস্থির মানসিকতা থেকে কীভাবে আধ্যাত্মিকতায় যেতে হবে একেবারে খাঁচে খাঁচে জ্যামিতিক ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে কল্পনা বা ধারণা করার কিছু নেই।

এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই চারটে জিনিষই আমাদের সমস্যা। নিত্যকে অনিত্য মনে করা আর অনিত্যকে নিত্য মনে করা অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুকে আত্মা আর আত্ম বস্তুকে অনাত্মা মনে করাই অবিদ্যা। আর দুঃখ, অশুচি এবং অনাত্মা, যেটা প্রকৃতি, এগুলোর সঙ্গে যোগ করে দিচ্ছি নিত্য। যেটা অনিত্য সেটাকে মনে করছি নিত্য, যেটা অপবিত্র সেটাকে মনে করি পবিত্র, আর যেখানেই দুঃখ সেখানেই আমরা সুখ ভাবি এবং অনাত্মা যেখানে সেখানে আত্মা দেখি। আমরা আমি বলতে মনে করি আমাদের এই দেহ বা মনকে। কিন্তু দেহটাও প্রকৃতি আর মনটাও প্রকৃতির এলাকার, অথচ আমরা মনে করছি আমি দেহ, আমি মন। যেটা দুঃখের কারণ সেটাকেই সুখ পাওয়া, এই যে শাড়ি কিনছি, গয়না কিনছি, গাড়ি কিনছি, কেনার সময় কত সুখ, কিন্তু এগুলোই সব পরে দুঃখের কারণ হয়। কত খেটে পয়সা রোজগার করে এগুলো কিনতে হচ্ছে, এগুলো আবার যখন চলে যাবে তখন দুঃখ হবে। যেটাই অপবিত্র, অশুচি সেটাকেই মন করছি আহা কি আনন্দের। লোকেরা যখন মদ খাচ্ছে, হয়তো একটু অর্পণ করে দিয়ে ভাবছে পবিত্র হয়ে গেছে, কিন্তু এগুলো তো অপবিত্র পচানো পদার্থ। আমি দেবীকে অর্পণ করেই খাই আর যা করেই খাই জিনিষটা তো অপবিত্র। মাছ, মাংস খাচ্ছি, তাও অপবিত্র, কারণ একটা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়েছে। জগতের বেশির ভাগই লোক মনে করে আত্মা বলে কিছু নেই আর শরীর যেটা আছে সেটাকেই আত্মা বলে মনে করে, মানে এই শরীরটাই তাদের কাছে সব কিছু। দেহকে নিত্য বলে বোধ করছি বলেই সবাই ভোগে নেমে আছে। এই যে জগৎ সংসার এটাকেই আমরা চেতন বলে মনে করি, এবং একেই সত্য বলে দৃঢ় করে আঁকড়ে আছি। আর এই জগৎ সংসারের পেছনে যিনি আছেন তাঁকে আমরা মিথ্যা বলে মনে করি। বুদ্ধিকে আমরা মনে করছি চেতন অথচ বুদ্ধি হল জড় কিন্তু যেটা আসল চৈতন্য তাঁর অস্তিত্বের কোন ধারণাই করতে পারছি না। সুতরাং নিত্যকে অনিত্য মনে করা আর অনিত্যকে নিত্য মনে করা এটাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যার স্বরূপ হল অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, যেটা নয় সেই জিনিষটাকে পুরো উল্টো করে দেখাবে। মায়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন – বদমাইশ ছেলে, মাকে রোজ মারধোর করে, প্রচুর কষ্ট দেয়, মা কিন্তু তবুও সেই ছেলের প্রতি ভালোবাসা ছাড়তে পারে না, এটাই মায়ী। মা পুরোপুরি বন্ধনে পড়ে আছে, মায়ের সাথে ছেলে যে ব্যবহার করছে সেটা অশুচি ব্যবহার, কিন্তু তাতেও মায়ের কত আনন্দ, এটাই মায়ী। এই মায়ীকেই এখানে বলছেন অবিদ্যা। অবিদ্যাটা কী? অবিদ্যাকে এখানে একেবারে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, অনিত্যে নিত্য বোধ, অশুচিতে শুচি বোধ, দুঃখে সুখ বোধ আর যেটা প্রকৃতির এলাকা, অর্থাৎ যা কিছু অনাত্মা আছে, যেমন বস্তু, ইন্দ্রিয়, দেহ মন এগুলোতে আত্মবুদ্ধি, এটাই মায়ী, এটাই অবিদ্যা। অবিদ্যার সংজ্ঞা হল, জিনিষটা আছে এক রকম কিন্তু দেখাচ্ছে অন্য রকম, মায়ার ব্যাপারেও একই কথা বলা হয়,

মায়া হল আবরণ বিক্ষেপ। একটা জিনিষ আছে, সেটাকে ঢেকে দিল। ঢেকে দেওয়ার পর দেখাচ্ছে আরেক রকম, এটাই অবিদ্যা, এটাই মায়া।

অস্মিতার ব্যাখ্যা

অবিদ্যা প্রথম কি করছে? *দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্ত্বৈবাহস্মিতা।।৬।।* অবিদ্যার প্রথম পরিণাম অস্মিতা। অস্মিতা আসছে ‘অস্মি’ শব্দ থেকে, যার অর্থ আমি বোধ, অহঙ্কার বোধ। অহঙ্কার নিজেকে জড়ের ধর্মের সঙ্গে অভেদ ভেবে তার নিজের ধর্ম বলে মনে করে। প্রথমটা হলো ভুল বোঝা আর দ্বিতীয়টা নিজেকে এই অনিত্য বস্তুর সাথে এক করে ফেলা। আমরা মনে করি আমরা হলাম মন, মানে মনের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলছি, আমরা মনে করছি আমি আর আমার এই দেহ অভেদ, ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে অভেদ মনে করছি। আমার হাতে ব্যাথা লেগেছে, এখন আমার সমস্ত বোধ হাতের ব্যাথাতে জড়িয়ে গেছে, এখন যতবার আমি আমি করছি ততবারই হাতের উপরে সব জোর দিচ্ছি, আমার হাতে চোট লেগেছে, আমার হাতে ব্যাথা হয়েছে, আমার হাতে ওষুধ লাগাতে হবে। কিন্তু যার ঠিক ঠিক বোধ হয়ে গেছে যে আমি সেই আত্মা, তখন সে কি বলবে? ও হাতে লেগেছে একটু ব্যাথা করছে করুক, ও ঠিক হয়ে যাবে। এই জামাটা আমি পড়ে আছি, জামা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে আমি এই ছেঁড়া জামাটা পাল্টে আরেকটা জামা পড়ে নেব। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের জামা যদি ছিঁড়ে যায় চিৎকার করে কান্না শুরু করে দেবে। কারণ বাচ্চা ওর জামার সঙ্গে ওর আমিত্বকে জড়িয়ে রেখেছে। কোন মহিলা একটা দামী নেকলেস পড়েছে, এখন যদি নেকলেসটা চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তখন তার কি করণ অবস্থা হবে ভাবতে পারা যাবে না। কারণ তার আমিটা ঐ নেকলেসের মধ্যে এক হয়ে আছে। এই ধরণের লোকই জগতে বেশি দেখা যায়, যারা নিজেদের সম্পত্তি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, নিজের সম্মান, নিজের জাত্যাভিমান, নিজের পরিবারের সঙ্গে আমিটাকে এক করে রেখেছে। এর একটির যদি হানি হয়ে যায় তাহলে হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। এর কারণ এই অস্মিতা, আমি নিজেকে জড়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি।

অস্মিতা হল দৃগ্ আর দৃশ্য – দ্রষ্টা আর দৃশ্য মিলে যখন একাত্ম বোধ হয়ে যায় তখন সেটাকেই বলছেন অস্মিতা। একাত্ম বোধ হওয়া মানে, দ্রষ্টা যখন দৃশ্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে কিছু দেখছি, আমি আর দূরবীন দুটোই আলাদা। কিন্তু যদি দূরবীনের সঙ্গে নিজেকে এক করে দিই তাহলেই কিন্তু বিপদ। এটাই আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা। বুদ্ধি আর দশটি ইন্দ্রিয়, এগুলো সব যন্ত্র, শাস্ত্রের ভাষায় করণ, এই সব কটি যন্ত্রের সাথে এক করে করণ আর কর্তাকে এক করে ফেলছি। আপনি যখন বলছেন ‘কি হে কেমন আছ’? আমি বলছি ‘বেশ আনন্দেই আছি’। আমার কিন্তু এখানে কোন হুঁশ নেই, আমি নিজের মনের সঙ্গে নিজেকে এক করে আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা তিনি নিজেকে পুরো একাত্ম করে দিচ্ছেন দৃশ্যের সাথে। গীতায় বলছেন *অসজ্জিরনভিষ্ণুঃ পুত্রদারগৃহাদিসু*, সন্তান, দেহ, গাড়ি, বাড়ি এগুলোর সঙ্গে আমরা নিজেদের একাত্ম বোধ করছি। আমরা যদি একাত্ম বোধ না করি তাহলে আমরা পাগল হয়ে যাব। কারণ এই সব অনাত্ম বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করে শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থান করার ক্ষমতাই আমাদের নেই। শৈশব কাল থেকে আমরা যেভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছি আর জন্ম জন্মান্তর ধরে আমাদের যে সংস্কার তৈরী হয়ে আছে, তা হল আমি সব সময় নিজেকে এই প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে রাখব। প্রকৃতিতে মন আছে, দেহ আছে, ইন্দ্রিয় সমূহ আছে আর বস্তু আছে, জগৎ আছে। জুড়ে না রাখলে আমরা প্রত্যেকে মানসিক রোগী হয়ে যেতাম। শুধু তাই না, সিদ্ধ পুরুষ যখন হয়ে যাচ্ছেন, তখনও যখন আবার উচ্চ অবস্থা থেকে জগতের মাঝখানে ফিরে আসেন তাঁকেও সব মনে রাখতে হচ্ছে। ঠাকুরকে একজন বলছে, নরেন রাখাল এরা সব কায়েতের ছেলে, এদের উপর কেন মন দিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর বলছেন, ওদের উপর মন না রাখলে কী হয় এই দ্যাখ। ঠাকুর ওদের উপর থেকে মন তুলে নিতেই তিনি সমাধিতে চলে গেলেন, চুল দাড়ি, লোম সব সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে। মন হল সাইকেলের মত, দাঁড় করিয়ে দিলেই

পড়ে যাবে। যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ ঠিক থাকবে। মনও ঠিক তাই, মন যতক্ষণ কোন কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে ততক্ষণ মন ঠিক থাকবে, তা নাহলে মস্তিষ্কে বিকার এসে যাবে।

এই যে একাত্ম বোধ এটাকেই বলে অস্মিতা। অস্মিতাও একটা ক্লেশ। আপনি শুদ্ধ চৈতন্য আপনাকে কে কষ্ট দেবে! কিন্তু তাও তো কত কষ্ট পাচ্ছেন। কেন কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কারণ আপনার ছেলের জ্বর হয়েছে, নয়তো আপনার স্ত্রীর কোন সমস্যা হয়ে গেছে, নয়তো আপনার স্ত্রী কোন কথা শুনতে চায় না। কথামূতে ঠাকুরের সব বর্ণনা আছে, স্ত্রী হয়তো উপপতি করেছে, ছেলে অবাধ্য। উপপতি করেছে অন্য একজন, অবাধ্য হয়েছে অন্য একজন, তাতে আপনার কী ! কিন্তু অস্মিতা অর্থাৎ আপনি এদের সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন সেইজন্য আপনার এত কষ্ট। শুধু জুড়েই রাখে না, স্বামী স্ত্রীকে বলে বা স্ত্রী স্বামীকে বলে তুমি আর আমি এক। এটাই অস্মিতা। এই অস্মিতা যদি না থাকে তো শরীরই চলবে না, আবার এই অস্মিতাই অন্য দিকে ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাগ ও দ্বেষের ব্যাখ্যা

অস্মিতা থেকে আমাদের যত দুঃখ কষ্ট। এই দুঃখ-কষ্ট কি রূপে আসে? রাগ আর দ্বেষ রূপে আসে। এই রাগ মানে বাংলা রাগ নয়, এই রাগের অর্থ ভালো লাগা, রঞ্জনা ত্বক। সূত্রে বলছেন **সুখানুশয়ী রাগঃ।।৭।।**। আশয় মানে বিরাট বড় টিপি, যেমন জলাশয়, যেখানে প্রচুর জল ধরা আছে। যেখানে সুখ আশ্রয় পায়, সেটাকে বলছেন রাগ। প্রথমে ইন্দ্রিয় আর মনের সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়ে এক করে নিল তারপর মনের মধ্যে যা কিছু হবে সেটার সাথেও নিজেকে এক করে ফেলবে। মনের মধ্যে যা কিছুই আসছে তার সব কিছুই হয় সুখকর না হয় দুঃখজনক। যে জিনিষ থেকে সুখ বোধ হয় সেটাকেই আমরা আবার পেতে চাই, এই যে আবার পেতে চাওয়া, এটাকেই বলছেন রাগ। যে জিনিষটাকে ভোগ করে আবার ভোগ করতে ইচ্ছে হয় সেটাই সুখ। আম খেয়ে বলছি আমি এই আম আবার পেলে খাব, মানে আমের আশ্বাদ আমাকে সুখ দিয়েছে। আর অন্য একটা ফল খেয়ে আমার মুখটা তেতো হয়ে গেল, এখন কেউ ঐ ফলট যদি পুনরায় দিতে আসে আমি নেব না, অর্থাৎ ঐ ফলের প্রতি আমার এখন দ্বেষ এসে গেছে।

সেটাই পরের সূত্রে বলছেন **দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।।৮।।**। যে বস্তু ভোগ করার পর আর সেই বস্তু ভোগ করতে চাইছে না তখনই বুঝতে হবে সেখানে দুঃখ হয়েছে। আমরা প্রায়ই জীবনের পুরনো কোন অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লেই বলি ‘বাপরে! ঐ দিন যেন আর না দেখতে হয়’। মানে ঐ দিনগুলো আমার দুঃখের অভিজ্ঞতাকে মনে করিয়ে দেয়।

প্রথম শুরু হয় অবিদ্যা থেকে। অবিদ্যা হেতু আমার আসল সত্তাকে ভুলে গেছি। আসল সত্তা মানে চৈতন্য সত্তা, অবিদ্যা বশতঃ চৈতন্য সত্তা প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে অনিত্যকে নিত্য বলে বোধ হচ্ছে, দুঃখকে সুখ বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় যে বিপর্যয় আসে সেটা আসে অস্মিতা থেকে। অস্মিতাতে দ্রষ্টা দৃশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক করে রেখেছে। আপনি শরীরের সঙ্গে নিজেকে এক করে রেখেছেন, তারপর বাড়ি গাড়ি এগুলোর সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি জুড়ে রেখেছেন। ঠাকুর খুব সহজ সহজ গল্প দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাহাড়ের উপর কুঁড়ে ঘর, জোর বাতাস শুরু হয়েছে। ঘরের মালিক প্রার্থনা করছে হে ঠাকুর কুঁড়ে ঘরটাকে রক্ষা কর। একবার রামের নামে প্রার্থনা করছে, আরেকবার হনুমানকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করছে। তাও শেষ পর্যন্ত বাড়ি যখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তখন বলছে ‘শালার বাড়ি’। এখানে সে কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে নিজেকে এক করে রেখেছে। অথচ এক না করলে আমাদের জীবন চলবে না, আমরা পাগল হয়ে যাবো। যোগীরা তাই ধাপে ধাপে এগুলো থেকে নিজেকে আলাদা করেন। করতে করতে মনের শক্তিটা এমন হয়ে যায় তখন সে একা থাকতে পারে। সাধুরা আশ্রমে আছেন, সেখানে আরও সাধুর সঙ্গে থাকছেন বলে তাঁরাও স্বাভাবিক আছেন। তা নাহলে সাধুদেরও মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবে। অস্মিতা মানে একাত্ম বোধ। কার সঙ্গে একাত্ম বোধ? দৃশ্যের সঙ্গে। পুরুষই একমাত্র চৈতন্য, চৈতন্য বলে তিনিই একমাত্র জানতে

পারেন। আর প্রকৃতি দৃশ্য। পুরুষ যখন নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নেয় তখন সেটাকেই বলা হয় অস্মিতা। অস্মিতার জন্যই আসে রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে আসক্তি। যেটার প্রতি আমার ভালোবাসা বা আকর্ষণ আছে সেটার প্রতিই আমার আসক্তি আসে।

মানুষ আবার বিচিত্র বিচিত্র জিনিস নিয়ে আনন্দ লাভ করে। স্বামীজীও ঠিক এই কথা বলছেন, আমরা নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকে, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেলে, তাহা সর্বত্রই খাটে। মূল ব্যাপার হল সে আনন্দ পাচ্ছে। যেমন ডাক্তারি শাস্ত্র বলে অনেকে নিজের কষ্টের কথা ভাবতে খুব আনন্দ পায়। যত নিজের দুঃখের কথা বর্ণনা করবে তত তার আনন্দ হবে। শুধু তাই নয়, তার প্রতি যদি আপনি বেশী মন না দেন তাহলে সে হয়তো তার হাত কেটে দেবে, গলা কেটে দেবে, কিছু একটা করে নেবে, যাতে আপনার attention পায়। আমরা মনে করছি খুব দুঃখে সে বলছে বা করছে, কিন্তু তা নয়, তার কাছে এটাই খুব আনন্দের অভিব্যক্তি। মানুষ কখনই এমন জিনিস করে না যে সে দুঃখ পায়। কারণ এই সূত্রেই বলছেন *দুঃখানুশায়ী দ্বেষ*, যেখানেই দুঃখ সেখানেই সে দ্বেষ করবে। হাত কেটে দেওয়াতো দুঃখের কথা, তাহলে কাটছে কী করে? সে মনে করছে আমি হাত কাটলাম, যার শোকে আমি কেটেছি সে এবার আমার দিকে তাকাবে, আমার প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবে। মানুষ যখন আত্মহত্যা করে, তখনও এই একই মানসিকতা কাজ করছে। আত্মহত্যা করার সময় ভাবে মরে গেলে আমার এই দুঃখ ঘুচে যাবে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভাবে, আমি মরে গেলে তার কাছে খবর যাবে, সে এসে আমার মরা মুখটা দেখবে, এই ভেবেই সে আনন্দ পাচ্ছে। মানুষ কখনই এমন কোন কাজ করবে না যেটাতে তার রাগ নেই। যেখানেই মানুষ সুখ পাবে সেখানেই সে থাকবে, আর যেখানে দুঃখ পাবে সেখান থেকে সে পালাবে। থাকাটাও কার্য আর পালানোটাও কার্য। এটাকেই বেদান্তে বলছে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম।

আমার শুদ্ধ স্বরূপকে আমি ভুলে গেছি। আমার শুদ্ধাত্মার উপর অবিদ্যার আবরণ এসে গেছে বলেই ভুলে গেছি। অবিদ্যা থেকেই কাম বাসনা আসে। কাম আবার দুই প্রকার – সুখ আর দুঃখ। সুখ মানে যেটা পেতে চাইছি আর দুঃখ মানে যেটা থেকে সরে যেতে চাইছি। সুখ পেতে গেলে আমাকে কাজ করতে হবে। যখন একটা জিনিস থেকে পালাতে চাইছি তখনও আমাকে কাজ করতে হবে। ঠাণ্ডা থেকে আমি পালাতে চাইছি, তার জন্য আমার গরম জামা চাই, গরম জামা মানে পয়সা চাই, হীটার জ্বালাতে হবে তার জন্যও পয়সা চাই। পয়সা চাই মানে আমাকে কাজ করে পয়সা উপার্জন করতে হবে। যেখানেই কাম সেখানেই কাজ। যেখানেই কাজ হবে সেখানে অবিদ্যা আরও বাড়বে। অবিদ্যা বাড়া মানে অজ্ঞানের আবরণটা আর মোটা হওয়া। যেমনি অজ্ঞান আবরণ বাড়বে তখন কাম আর কর্ম বাড়বে। কাম ও কর্ম বাড়লে অজ্ঞান আরও বাড়বে। শেষে বলবে আমার আর কোন কিছুই ভালো লাগছে না, আমার প্রিয়জনের মুখ দেখতেও ভালো লাগছে না। প্রিয়জনের মুখও যখন দেখতে ভালো লাগছে না, তখন সে মদ খাওয়া ধরবে। মদেও যখন কিছু হবে না তখন ড্রাগ ধর। ড্রাগে চলে যাওয়া মানে অবিদ্যা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, এখন সে নিজের মনের সামনেও আসতে চাইছে না। অজ্ঞানের প্রথম ধাপে মনকে নিয়ে আনন্দ পায়, তারপরের ধাপে জগৎকে নিয়ে আনন্দ পায়, জগতের বস্তুকে নিয়ে আনন্দ পেতে চায়। শেষ ধাপে নিজের মনকেও ভুলে যেতে চায়, তখন তার গাঁজা চাই, মদ চাই, ভাঙ চাই। তারপরে ড্রাগ, যেখানে মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। তারপর আজ হোক কাল হোক আত্মহত্যার দিকে চলে যাবে। আত্মহত্যার করার পর সে প্রেতযোনিতে যাবে, প্রেতযোনিতে যাওয়ার পর সেখান থেকে মুক্ত হয়ে কোথাও সাপ বিছে হয়ে জন্মাবে। সেখান থেকে আবার তার যাত্রা শুরু হবে। এভাবেই প্রকৃতির খেলা চলতেই থাকবে, কোন দিন বন্ধ হবে না।

অভিনিবেশের ব্যাখ্যা

আমরা অবিদ্যা দেখলাম, অস্মিতা দেখলাম, সুখ আর দুঃখকেও ব্যাখ্যা করা হল, সুখ আর দুঃখের উৎপত্তি হচ্ছে রাগ আর দ্বেষ থেকে। সব শেষে আসছে অভিনিবেশ – *স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথারুণোহভিনিবেশঃ।।৯।।* অভিনিবেশ হল জীবনের প্রতি মমত্ব, জীবনকে ধরে রাখার আশ্রয়

চেপ্টা। সুখ-দুঃখের খেলা, অবিদ্যা অস্মিতার খেলা এগুলো তাও মানুষের মধ্যে বোঝা যায়। কিন্তু একটা পিঁপড়ের সুখ-দুঃখ হচ্ছে কিনা আমাদের জানার উপায় নেই। কিন্তু এটা আমরা জানি পিঁপড়ে মিষ্টি জিনিষের দিকে এগিয়ে যায় আর তেতো জিনিষ থেকে সরে আসে। কিন্তু একটা জিনিষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমান ভাবে দেখা যায়, সেটা হল অভিনিবেশ। তাই না, পাথরের মধ্যেও এই অভিনিবেশকে বোঝা যায়। অভিনিবেশ মানে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা, আমার আমিত্বটাকে বাঁচিয়ে রাখা। আমরা যে যতই বলি আমি মরে গেলেই ভাল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে আমরা কেউই মরতে চাইনা। যুধিষ্ঠির বলছেন পৃথিবীর সব থেকে আশ্চর্য হল আমরা সবাই দেখছি মৃত্যু এসে একদিন সবাইকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি মনে করছি আমার মৃত্যু হবে না, আসলে আমরা নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতেই পারিনা। একটা ছোট পিঁপড়েকেও মারতে গেলে সেও মরার আগে একটা মরণ কামড় দেবে। এই জগতে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই এই অবিদ্যার কারণে মনে একেবারে দৃঢ় ভাবে গেঁথে রেখেছে যে আমি মরব না। যাঁরা সাধক, যাঁরা বিবেক বিচার করেন, যাঁরা পণ্ডিত তাঁরাও অস্মিতাকে, অর্থাৎ আমি বোধটাকে ছেড়ে দেন, রাগ-দ্বেষকেও ছেড়ে দেন কিন্তু অভিনিবেশকে মানে বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে ছাড়তে পারেন না। মানুষ নিজের সন্তানের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চায়, সেইজন্য সে চায় তার যেন সন্তান হোক। বড় বড় মন্দির করিয়ে নেয়, বা কোথাও কিছু দান করার পর পাথরে নিজের নাম খোদাই করে অমর হয়ে থাকতে চায়।

অর্কিমিডিস জ্যামিতির উপর অনেক কাজ করেছিলেন। গ্রীস দেশে এক অপরের সাথে সব সময় লড়াই করতে থাকত। অর্কিমিডিসি জ্যামিতির কিছু ফিগার তৈরী করছিলেন, আর সেই সময় তার উপর কিছু লোক আক্রমণ করেছে। তিনি বলছেন ‘আমাকে আগে এগুলো শেষ করে নিতে দাও, আর আমাকে মেরে ফেলার পর এগুলো তোমরা নষ্ট করে দিও না’। লোকগুলো ঠিক তাই করল, ফিগারগুলো তৈরী হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অর্কিমিডিসকে শেষ করে দিল। জ্যামিতির ফিগারগুলোও তারা মুছে ফেলল না। তার মানে যারা বড় গণিতজ্ঞ, এদের আমিত্ব পুরোপুরি গণিতের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। আমি মরে যাই তো যাব কিন্তু এই বিদ্যাটা যেন থেকে যায়। কিন্তু এখানে দেহের দিক থেকেই বলা হচ্ছে। খুব সাধারণ অবস্থায় বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা থাকে দেহকে কেন্দ্র করে। সাধারণ থেকে আরেকটু উচ্চ অবস্থায়, বিশেষ করে যেখানে বিশেষ সংস্কৃতি থাকে, যারা সুসংস্কৃত সম্পন্ন, দেখা যায় তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না।

চীন দেশ প্রথম থেকেই রাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তবে রাজা বলতে আমরা যেমন বিরাট ক্ষমতাসালী ব্যক্তি রূপে মনে করি, চীনে সেই ধরনের খুব একটা ক্ষমতা রাজাদের ছিল না। একেবারেই যে ছিল না তা নয়, ক্ষমতা তাদেরও ছিল কিন্তু তার সঙ্গে একটা পরিষদ থাকত। আমাদের দেশে যেমন নিয়ম ছিল ক্ষত্রিয়রা রাজা হবে আর রাজার মন্ত্রী হবে ব্রাহ্মণ। চীনেও কিছুটা এই ধরনের ব্যাপার ছিল। অনেকবার এমনও হয়েছে যে চীনে পরিষদ সদস্যরা রাজাকে অনেক কাজ করা থেকে বিরত করে বলে দিত, আপনি ঠিক কাজ করতে যাচ্ছেন না। একবার কোন পরিষদ বলছে ‘রাজা যে এত মদ পান করেন আর এত মেয়েদের সঙ্গ করছেন, রাজা কিন্তু এটা ঠিক করছেন না’। রাজার কানে যখন এই কথা পৌঁছাল, তিনি শুনে রেগে আঙুন হয়ে গেছেন। পরিষদে যিনি ছিলেন তাঁকে রাজা আলাদা করে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাজার কাছে হাজির করার পর রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন ‘যে রাজার সঙ্গে এই ধরনের ঔদ্ধত আচরণ করে তার উপযুক্ত সাজা কি হতে পারে আপনি বলুন’। এখানে এক বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব তৈরী হয়ে গেছে। একদিকে রাজার সঙ্গে কেউ অভদ্র আচরণ করতে পারবে না, ঔদ্ধত হয়ে কথা বলতে পারবে না। আবার অন্য দিকে পরিষদের ক্ষমতা আছে রাজা যদি কোন দোষ করে পরিষদ সেটা রাজাকে সূচনা দিয়ে দেবে। পরিষদ রূপে তিনি রাজার দোষ দেখিয়ে বলে দিয়েছেন ‘আপনি কিন্তু এটা ঠিক করছেন না’। রাজা আবার এটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলছেন রাজার ব্যাপারে যদি কেউ এই ধরনের কোন ঔদ্ধত কথা বলে তার তখন কি শাস্তি হওয়া উচিত? তখন সেই সদস্য খুব ভদ্র ভাবে আর বিনয়ের সাথে বলছেন ‘তাকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলাটাই উপযুক্ত শাস্তি’। রাজা বলছেন ‘এই শাস্তিকে যদি একটু হালকা করা হয়’? ‘তাহলে ওকে গরম তেলে পুড়িয়ে মারতে হবে’। রাজা

আবার বলছেন, ‘এর থেকেও যদি আরেকটু লঘু করা হয়’। পরিষদের লোকটি জানেন রাজা তাঁর নামেই বলছেন। তিনিও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে, কোন তর্কাতর্কি না করে এইভাবে ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেষে বলছেন খুব হালকা শাস্তি হবে যদি তাকে এক কোপে কেটে দেওয়া হয়। তার থেকেও যদি হালকা করা হয়? তাহলে তাকে বলে দেওয়া হবে তুমি আত্মহত্যা করে নাও। লোকটি আইনে যা আছে সেটাই বলে যাচ্ছেন। রাজা লোকটির সততা দেখে এমন চমকে উঠেছেন যে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন ‘আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম’। পরে তাঁকে একটা রাজ্যের প্রধান করে পাঠিয়ে দিলেন। সততার যে একটা ক্ষমতা আছে, আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি সেটা পালন করলাম, সেই ক্ষমতাই লোকটি দেখিয়ে দিলেন। চীন দেশে দুই থেকে আড়াই হাজার বছর ধরে এই পরম্পরা চলে আসছে, এটাই চীনের সংস্কৃতি। আমাদের ভারতবর্ষে সাত আট হাজার বছর ধরে বেদের সংস্কৃতি চলে আসছিল আর আমরা কয়েক বছরের মধ্যে সেই সংস্কৃতিকে উড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছি। মানুষকে দেবতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা সংস্কৃতি আট হাজার বছর ধরে জানপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করে গেল, আর আমরা বিগত পনের কুড়ি বছরের মধ্যে মানুষকে বর্বর বানিয়ে দিয়েছি। চীন দেশেও তাই হল। ওর এত দিনের যে সংস্কৃতি যেখানে obedience ছিল মেরুদণ্ড। কয়েকটি লোক এসে আদর্শের নামে এমন বিপ্লব করল, যারা সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের সবার গলাটা কেটে রেখে দিল। দোষ ত্রুটি দুদিকেই আছে। কিন্তু এটাই মূল কথা যে, যারা সত্যিকারের সুসংস্কৃতবান তারা কখনই মৃত্যুকে ভয় পায় না। যেমন আমাদের সৈন্যবাহিনীর লোকেরা, এরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। যে মৃত্যুকে ভয় পায় সে সুসংস্কৃত নয়, কোথাও তার একটা গোলমাল থাকতে বাধ্য। ঠিক তেমনি যারা ভদ্রলোক তাদের নিকট কেউ মরে গেলে কাঁদেও না, যেটা হবার সেটা হয়েছে, যেটা হয়ে গেছে সেটাকে মাথা নত করে মেনে নেওয়াটাই সুসংস্কৃতির পরিচয়।

স্বামীজী এই সূত্রে অভিনিবেশের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যেগুলো আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজীর বক্তব্য হল কোন প্রাণীই মরতে চায় না, এমন কি একটা পিঁপড়েও মৃত্যুর আগে মরণ কামড় দেবে। মশাকে মারতে গেলে পালিয়ে যায়। যোগসূত্রে বলছেন স্বরসবাহী, এরা সবাই প্রবাহিত হচ্ছে। স্বামীজী খুব সহজ যুক্তি দিয়ে বলছেন, যে জিনিষটা আগে থেকে আমাদের অনুভব নেই, সেই জিনিষের জ্ঞান আমাদের থাকে না। আমরা যদি নাই জানি মৃত্যু জিনিষটা কি রকম, তাহলে মৃত্যুকে আমরা কেন ভয় পাই? এই নিয়ে আবার খুব যুক্তিতর্ক চলে। অনেকে বলেন, যে জিনিষটা আমি জানি না, সেই অজানা জিনিষের প্রতি স্বাভাবিক একটা ভয় থাকে, এটাকে এনারা বলছেন fear of the unknown। স্বামীজী এখানে দার্শনিক নন, একজন আচার্য রূপে বলছেন। যোগ যে কথা বলছে সেই কথাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করছেন। স্বামীজী বলছেন – ভারতবর্ষে – জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিস্বরূপ হইয়াছে। একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী বলছেন – যদি একটা মুরগীর ডিমকে একটা হাঁসের ডিমের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয় আর হাঁস আর মুরগী যদি দুটো ডিমকেই তা দিতে থাকে। যখন ডিম ফুটবে তখন হাঁসের বাচ্চা জলের দিকে ছুটবে আর মুরগীর বাচ্চা জমির দিকে যাবে। এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? সেই সময়কার প্রাণীবিজ্ঞানী যাঁরা ছিলেন তাঁরা এটাকে শরীরের ধর্ম বললেন। তারপর সেটা থেকে তারা নিয়ে এলেন ডিএনএ থিয়োরী (DNA)। DNA থেকে তারা এটাকে বললেন racial memory. Evolutionary Psychology বলে একটা নতুন পরিভাষা এসেছে, এটিও একটি অস্পষ্ট তত্ত্ব। সেখানে বলছে বেবুন জাতীয় ছোট জাতের বানর আছে, যারা সাপকে ভীষণ ভয় পায়, এমনকি যদি একটা খেলনা সাপও ওদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বানর গুলি আতঙ্কে পালিয়ে যাবে। এইসব Evolutionary Psychologistরা বলছে এটা সম্ভব হচ্ছে due to racial memory। যদি এদের প্রশ্ন করা হয় এই racial memory কোথায় থাকে? তখন তারা কোন উত্তর দিতে পারেনা। স্বামীজী বলছেন এরা শুধু একটা পরিভাষা ব্যবহার করছে মাত্র কিন্তু সেই শব্দের কোন ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই। বিজ্ঞানীরা কিছু দিন পরে পরেই তাদের থিয়োরি পাল্টাতে থাকেন। Racial Memoryটাও এদের নতুন একটা পরিভাষা। এগুলো শব্দ মাত্র। আগে বলতেন

hereditary, সেখান থেকে সরে এসে বলতে শুরু করলেন genetic, তারপর বলতে শুরু করলেন racial memory। বিজ্ঞানীরা আসলে থেকে থেকেই একটার পর একটা শব্দ পাল্টে যাচ্ছে। বেদান্তের থিয়োরী চার পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে, বেদান্তীরা কখনই তাঁদের থিয়োরীকে পাল্টাচ্ছেন না। অথচ বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক দিন থিয়োরী পাল্টে যাচ্ছে। আর পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো শব্দ মাত্র।

প্রথমে বিজ্ঞানীরা বলছিলেন পরিবেশ থেকে সব আসে, সেখান থেকে সরে এসে বলতে শুরু করলেন পরিবেশ নয়, এগুলো আসে বংশানুক্রমে। তখন যদি জিজ্ঞেস করা হত hereditaryটা আসলে কী একটু ব্যাখ্যা করুন তো! তখন তার কোন উত্তর দিতে পারতেন না, ডারউন বলে দিয়েছেন hereditary, তাই তখন থেকে hereditaryই চলছে। কিছু দিন বাদে বলতে শুরু করলেন জিন্। জিন্ থিয়োরীতে কী বলতে চাইছেন সেটাই পরিষ্কার নয়। আমাদের একটাই প্রশ্ন, এই জিনটা কেন অন্ হয় আর ওই জিনটা কেন অন্ হয় না। ক্যান্সার নিয়ে বলছেন, এই রোগ জেনেটিক সমস্যা জনিত। অন্য দিকে বলছেন সিগারেট খেলে ফুসফুসের ক্যান্সার হয়। সিগারেট খেলে যদি ক্যান্সার হয় তাহলে যারাই সিগারেট খায় সবারই ক্যান্সার হওয়ার কথা। আর যারা সিগারেট খায় না তাদের ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার কথা নয় কিন্তু তাও হচ্ছে। কেন হচ্ছে? ওনারা বলছেন সিগারেট খেলে জিনস্ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা দিয়ে হয় সেটা অন্ হয়ে যায়। এগুলো আর কিছুই নয়, আমাদের বোকা বানানো নিয়ে কথা। কোটি কোটি লোক ধূমপান করে যাচ্ছে তাদের অনেকেরই ক্যান্সার হচ্ছে না, যারা জীবনে ধূমপান করেনি তাদের অনেকেরই আবার ফুসফুসের ক্যান্সার হচ্ছে। এনারা নিজেরা যা বলছেন সেটা নিজেরাও জানেন না কী বলছেন। বেদান্তীরা পরিষ্কার বলছেন তোমাদের এগুলো শব্দ মাত্র, কিন্তু আমরাও যদিও বা শব্দ মাত্র বলছি তা সত্ত্বেও আমাদের থিয়োরী অনেক পরিষ্কার। মৃত্যুকে আমরা এত জন্ম জন্ম ধরে অনুভব করেছি, সেইজন্য আমাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয়টা চলে আসছে, তাই যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখতে চাইছি। এটাই যোগের পরিভাষায় অভিনিবেশ। আমাদের জীবনের যত ক্লেশ আছে তাকে এই পাঁচটার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় – অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। সন্ন্যাসী আবার জীবনের প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই আর মৃত্যুর প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা প্রবল। অবসাদগ্রস্ত মানসিক রোগীর আবার মৃত্যুর ইচ্ছা প্রবল। সন্ন্যাসী দুটোকেই অতিক্রম করে গেছেন। অভিনিবেশকে অতিক্রম করে যাওয়া মানে অবিদ্যাকেই অতিক্রম করে গেছে। অবিদ্যাকে পার না করলে অভিনিবেশকে কখনই পার করা যায় না।

স্বামীজী এখানে বলছেন – এখন প্রশ্ন এই অনুভূতিটা কার – জীবাত্মার অথবা কেবল শরীরের? এটা আমাদের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতা থেকে আসছে আবার শরীরের মাধ্যমেও আসছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলে এটা শুধু তার শরীরের ধর্ম। কিন্তু যোগী বলছে – এটা তার মনের মধ্যে একটা অনুভূতি রূপে ছিল আর যা কিনা শরীরের মাধ্যমে সঞ্চারিত হচ্ছে। হয়তো এই দুটো মতের মিশ্রণ থাকতে পারে। কেননা আমাদের যোগীরা কখনই পূর্বপুরুষদের অবদান আর প্রভাবকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের খুব সামান্যই প্রভাব আসে। তার থেকেও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, প্রথমেই বলে যে, যখন কোন আত্মা কোন গর্ভে যায় আগে সে দেখে নেয় এই গর্ভটা আমার পক্ষে উপযুক্ত কিনা। যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে ওখানে সে বাঁচবেই না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভেই তারা মারা যায়। আত্মা যদি ভুল জায়গায় ঢুকে যায় তখন ও ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য দেখা যায় অনেক শিশু গর্ভাবস্থাতেই মারা যায়, অথবা জন্মেই মরে যায়। আসলে জীবাত্মা যখন বুঝে নেয় আমি একটা ভুল জায়গায় এসে গেছি, ভুল পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে, কিছুদিন পরে বাচ্চা গুলো মরে যায়, হয় কোন দুর্ঘটনায় বা হঠাৎ করে কোন কিছু নেই দুম্ করে কোথেকে একটা রোগ হয়ে মরে যাবে, এ রকম পাঁচ ছয় বছরের অনেক বাচ্চাকেই মারা যেতে দেখা যায়।

আমাদের ভারতীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের যে পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতা পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে আসে না, আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমেই সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে চলতে থাকে। আপনার আমার ভেতরে যত রকমের সংস্কার, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি জমে আছে সব এই সূক্ষ্ম

শরীরে জমা থাকে আর সমস্ত সৃষ্টিই সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে চলতে থাকে। যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে তবে থেকে এটাই চলছে, আর কত দিন এই ভাবে চলবে? যত দিন না সূক্ষ্ম শরীরের মুক্তি হচ্ছে।

অবিদ্যা থেকে জন্ম নিচ্ছে সুখের প্রতি স্পৃহা, দুঃখের প্রতি দ্বেষ আর জীবনের প্রতি অভিনিবেশ, এই জিনিষগুলি প্রচুর জপ, ধ্যান, তপস্যা করেও যায় না। তাহলে যাবে কিভাবে? এগুলো যেখান থেকে এসেছে ঠেলে সেখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। ধ্যান জপের মাধ্যমে এদের স্থূল রূপগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম রূপটা থেকে যায়। যেমন ধরুন লোকের সাথে বারবার আমার ঝগড়া হয়ে যায়, ঝগড়া হলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়, এখন যদি আমি ধ্যান করা শুরু করি তাহলে আমার ঝগড়া করাটা বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু ঝগড়া হলে যে মন খারাপ হত, সেই মন খারাপ হওয়ার স্বভাবটা থেকে যাবে।

রাজযোগে কোথাও বলবে না যে সুখ ভালো না দুঃখ ভালো, বলছে সুখও ক্লেশ দুঃখও ক্লেশ। সুখ যতটা কষ্টদায়ক আবার দুঃখও ঠিক ততটাই কষ্টদায়ক। দুঃখ বৃত্তিকে নিরোধ হতে দেয় না, আর মনকে সমাধির দিকে যেতে দেয় না। আর সুখের সমস্যা হল সব সময় দুশ্চিন্তা লেগেই থাকে, এই বুঝি আমার সুখের দিন চলে গেল, এই সুখের দিন হয়ত আর আসবে না। এটাই ক্লেশ। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় বাধা ক্লেশ। আর এই ক্লেশ পাঁচটি রূপে আসে। এগুলো খুব সূক্ষ্ম রূপে কাজ করে, এই সূক্ষ্ম রূপকেই বলছে সংস্কার। সৃষ্টির আদি কাল থেকে আমরা একবার জন্ম নিচ্ছি আবার মরছি। কোন এক জন্মের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা পরের জন্মে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জন্মেই আমাকে মরতে হচ্ছে, মৃত্যুর অভিজ্ঞতা প্রত্যেক জন্মেই হচ্ছে, তাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যেক জন্মে আসবেই আসবে। কোন জন্মে কেউ ছাগল ছিল তখন সে ঘাস খেয়েছিল আবার কোন জন্মে সিংহ হয়ে জন্মেছিল তখন সেই জন্মে ঘাসের বদলে মাংস খেয়েছিল, সেইজন্য একই ধরণের স্মৃতি ধারাবাহিক ভাবে নাও থাকতে পারে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্মৃতি সব সময়ই থাকবে, সেটা এই মৃত্যুর স্মৃতি। মৃত্যুর অভিজ্ঞতার সংস্কারটি এতো প্রবল আর শক্তিশালী যে সে যত বড়ই বিজ্ঞানী আর পণ্ডিত হন না কেন কেউই এই সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা।

প্রতিপ্রসব আসলে কী

পরের সূত্রে বলছেন – **তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।।১০।।** আগে বলা হয়েছিল, যে সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম রূপে আছে সেই সংস্কারগুলি জপ, ধ্যান করে যাবে না, এই সংস্কার সমূহকে প্রতিপ্রসব করতে হবে। বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে, ক্লেশের মূলকে যদি উৎখাত করতে হয় তাহলে প্রতিপ্রসব করতে হবে। প্রসব মানে জন্ম দেওয়া। প্রসব যেটা হয়েছে সেটাকে প্রতিপ্রসব করতে হবে, অর্থাৎ তার উৎসে, মানে যেখান থেকে প্রসব হয়েছে সেখানে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। একটা আলুর বস্তা ফুটো হয়ে গেছে, সব আলু সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন কী করতে হবে? আলুগুলোকে আবার ওই ফুটো দিয়ে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফুটোটা সেলাই করে দিতে হবে, যাতে আলু আর না বেরিয়ে আসে। আমাদের সমস্যা হল আমরা কোন সমস্যার মূলে যেতে চাই না। আমরা ভাবি সমস্যা থাকলে সমস্যাটা দূর করে দিলেই হয়ে যাবে। আজকাল ছেলে-মেয়েরা প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ছে, তারপর একজন একজনকে ছেড়ে দিলেই কান্নাকাটি, গালাগালি, গলায় দড়ি কত কিছু হচ্ছে। এর মূলে কি প্রেমের সমস্যা? একটুও না। সমস্যা হল এদের ভেতরে কিছু নেই, ভেতরটা পুরো ফোঁপড়া। কারণ যদি কোন গুণ থাকে, লেখাপড়া, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা কোন একটা গুণ যদি থাকে কখনই তারা এসব আলতু-ফালতু জিনিষের জন্য চোখের জল ফেলতে যাবে না। যদি আপনি কারণের সমস্যাতে সাহায্য করতে চান, তাহলে আগে দেখুন ওর সমস্যাটা কোথায় আছে। সমস্যার জটটাকে যদি ধরতে পারেন, ধরার পর দেখুন এই সমস্যার নিদান হবে কি হবে না। যদি নিদান থাকে তাহলে তাকে বলুন। আর যদি কোন নিদান না থাকে? বলা হয়, যে সমস্যার কোন নিদান নেই সেটা আদপেই কোন সমস্যা নয়, সেটা পরিস্থিতি। ধরুন একটি ছেলের কম বয়সে তার বাবা মারা গেছে, এবার ছেলেটির যে সমস্যা হবে এই সমস্যার তো কোন নিদান নেই। এটা সমস্যা নয়, এটাকে বলে পরিস্থিতি। পরিস্থিতির কখন

নিদান হয় না। পরিস্থিতিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ভাবে মোকাবিলা করলে সামলানো যাবে সেটাই করতে হয়।

আমরা কোনটা পরিস্থিতি আর কোনটা সমস্যা বুঝতে না পেরে দুটোকে মিশিয়ে ফেলি। সমস্যাকে মনে করি পরিস্থিতি আর পরিস্থিতিকে মনে করি সমস্যা। সমস্যার নিদান মানেই সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। যোগ বলছে যতক্ষণ আপনি সমস্যার গোড়ায় গিয়ে ঘা না দিচ্ছেন ততক্ষণ আপনার সমস্যা মিটবে না। বাইরের সমুদ্রে ঝড় উঠলে আমরা যে বিশাল বিশাল ঢেউ দেখি, ওই একই ঢেউ আমাদের সবার মাথার মধ্যে উঠছে আর পড়ছে। এই ঢেউকে শান্ত করার কোন পথ নেই। জল আছে বাতাস আছে, ঝড় উঠবে আর ঢেউও উঠবে। তাহলে কী করতে হবে? জলটাকেই ছেঁচে পরিষ্কার করে দাও। অগস্ত্য মুনি যেমন পুরো সমুদ্রের জল পান করে নিয়েছিলেন, সেই রকম তোমার ভেতরের সব জল পান করে নাও। সমস্যাটাই উড়িয়ে দাও, তাহলে আর ঝড়ও উঠবে না, ঢেউও উঠবে না। কীভাবে করবে? *তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।*

কোথা থেকে আমাদের জীবন শুরু হয়েছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাস্তব জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরান। একজনের সাথে আপনার দেখা হল, তিনি আপনার সাথে মিষ্টি ব্যবহার করলেন। এটা অত্যন্ত স্কুল জিনিষ। এই স্কুল জিনিষটা সামনে থেকে চলে গেল। তিনি মিষ্টি ব্যবহার করে চলে গেলেন, মানে স্কুল জিনিষটা সরে গেল। কিন্তু তার যে একটা সংস্কার – আহা! লোকটির ব্যবহার কি মিষ্টি! এই মিষ্টি ব্যবহার আপনার মনের উপর একটা দাগ ছেড়ে দিয়ে গেল। আপনার একটা ভালো অনুভূতি এসে গেল। আপনি তখন আবার পাল্টা ওই লোকটির সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন। এই যে আপনার ভেতর থেকে একটা প্রতিক্রিয়া এল, এই প্রতিক্রিয়াও আপনার ভেতরে অত্যন্ত একটা সূক্ষ্ম ছাপ ছেড়ে দিয়েছে। পরে আবার যখন লোকটির সাথে দেখা হবে, এই যে সূক্ষ্ম ছাপটা ছিল এটাই এবার ঢেউ হয়ে বেরিয়ে এসে কার্যে পরিণত হবে। আপনার ব্যবহারটা স্কুল, এই স্কুলটাই সূক্ষ্ম হয়ে আপনার মনের ভেতরে একটা ছাপ ছেড়ে দিচ্ছে। এগুলোই জমে জমে একটা শুভ সংস্কার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য একজন ভদ্র সম্ভ্রান্ত বাড়ির লোকের আচার ব্যবহার আর ঝুপড়ি বাড়ির নিম্ন শ্রেণীর লোকের আচার ব্যবহার কখনই এক রকম হবে না। কারণ, স্কুল কাজ যেগুলো সে করেছে সেগুলো একেবারেই অন্য রকম, করে করে তার সমস্ত শুভ সংস্কারটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এবার মনে করুন রেল লাইনের ঝুপড়ি থেকে একটা খুব বাজে ছেলেকে তুলে নিয়ে হিমালয়ের কোন গুহায় অনেক দিন রেখে দেওয়া হয়েছে। এবার তার তো স্কুল কিছু থাকছে না, কারুর সাথে কথা বলতে পারছে না, কোন আজেবাজে কাজ করতে পারছে না। এরপর কিছু দিন পর তাকে আবার তার জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এবার কী হবে? যেমন আগে ছিল আবার ঠিক তেমনই থাকবে। স্কুলে শিক্ষকরা দুষ্টি বাচ্চাদের শাস্তি দিলে বাচ্চার কী পাল্টে যাবে নাকি, কখনই যায় না। ওরা কখনই মনে করে না যে আমি দোষ করেছি বলে শাস্তি পাচ্ছি, মনে করে আমি ধরা পড়ে গেছি বলেই সাজা পাচ্ছি, এবারে আরও সাবধানে দুষ্টিমি করতে হবে যাতে ধরা না পড়ে যাই। কারণ ওর ভেতরে দুষ্টিমির সংস্কার তৈরী হয়ে আছে। যোগ বলছে, এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে নাশ করা যায় না। এমনকি ধ্যান করে বা সমাধি হয়ে যাওয়ার পরেও এগুলোর নাশ করা যায় না। আমরা বলতে পারি ঠাকুরের খুব জপ করলে চলে যাবে। না, তাও যাবে না। সংস্কারগুলো কোন দিন যাবে না, ওগুলো থেকেই যাবে। নাশ করার একটাই পথ – প্রতিপ্রসব। যেখান থেকে এসেছে সেখানে তাকে ঢুকিয়ে দাও।

স্কুল জিনিষকে নাশ করা খুব সহজ। বাইরে থেকে যে বৃত্তিগুলি উৎপন্ন হচ্ছে ধ্যানের দ্বারা নিজের মনকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সেই স্কুল বৃত্তির প্রকাশ গুলিকে নষ্ট করে বা আটকে দেওয়া যায়। যেমন ধরুন একজন বিশেষ কাউকে দেখলেই আমার মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এখন দিনের পর দিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ধ্যান করে যাচ্ছি আর মনকে ধীরে ধীরে বোঝাচ্ছি আমি কিন্তু ওর প্রতি আর রাগব না, ওকে দেখে আমি আর উত্তেজিত হব না। এইভাবে মনকে এতটাই জোর করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব যে এরপর আর ঐ বিশেষ লোকটিকে দেখলে আমি আর উত্তেজিত হব না, কিন্তু ক্রোধের বৃত্তিটা যেহেতু

ভেতরে সূক্ষ্ম রূপে থেকে যাবে, সেইহেতু এখন অন্য কাউকে দেখে রেগে যাওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে থেকে যাবে। ক্রোধ বৃত্তি আসে রাগ আর দ্বেষ থেকে। যে জায়গায় আসক্তি, ভালোবাসা আছে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলে বা ভালোবাসাতে কেউ বাধা দিলে তখন তার প্রতি ক্রোধ হবে। তাই এই যে ক্রোধ বৃত্তি, এর পেছনে রয়েছে কিন্তু রাগ আর দ্বেষ। আবার রাগ আর দ্বেষের মা হল অবিদ্যা। এই যে অস্মিতা, আমি বোধ এরও মা অবিদ্যা। বলা হচ্ছে ধ্যান করে করে এই ক্রোধ বৃত্তিকে নাশ করতে পারবেন না। তবে কিভাবে নাশ হবে? যেখান থেকে এই ক্রোধ বৃত্তি এসেছে তার উৎসে তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে হয়। আবার কিছু জিনিষকে বোঝা যায় যে এটার এখন থেকে জন্ম হয়েছে, মনের শক্তিতে সেটাকে তার উৎসে ঠেলে দিতে হয় – রাখ নিয়ে বলতে হয় ‘আমি ওটাকে ওখান থেকে কিছুতেই আর আসতে দেবো না’। অন্ধদের এক ধরনের লাঠি থাকে, সেই লাঠি টানতে টানতে লম্বা হয়ে যায়, যখন ছোট করবে তখন একটু একটু করে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে লাঠিটাকে ছোট করতে হয়। মনের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ করা হয়। যেটা প্রথমে আছে সেটাকে দ্বিতীয়টাতে ঠেলে দেবে, আবার দ্বিতীয়টাকে তার মার কাছে ঠেলে দেবে। তার মাকে আবার তার মার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

আসলে পুরুষ বা শুদ্ধ চৈতন্য নিজেকে চিত্তের সঙ্গে এক করে রেখেছেন। একটা স্তর পর্যন্ত ধ্যান ও সমাধির দ্বারা এই সংস্কারগুলোকে আটকাতে পারি, কিন্তু সেই স্তরের পরে আর আটকানো যায় না। চিত্তের মধ্যে সব সংস্কারগুলো জমা হয়ে আছে, পুরুষ এই চিত্তের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে আছে বলে এগুলো যায় না। এই চিত্তকেই যতক্ষণ নাশ না করে দেওয়া হয় ততক্ষণ কোন পথ নেই। ধ্যান যখন করা হয় তখন তা চিত্তের সাহায্যেই করা হয়, যার ফলে সবিতর্ক, সবিচার সমাধি হলেও এই সংস্কারগুলো যাবে না। আমরা মনে করছি ঠাকুরের প্রসাদ খেলে, চরণামৃত পান করলে সব চলে যাবে। কিন্তু সংস্কার কিছুই পাল্টায় না। সেইজন্য রাজযোগ পড়লে সবারই মাথাটা খারাপ হয়ে যায়, কারণ রাজযোগ দেখিয়ে দিচ্ছে তুমি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। এখানে কোন চালাকি, চালবাজী চলবে না, রাজযোগে এসে সব ধরা পড়ে যাবে। অস্মিতাই আঠার মত পুরুষকে চিত্তের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। চিত্তের সংস্কার কখনই যাবে না, কারণ এটাই চিত্তের স্বভাব। সেইজন্য পুরুষ আর সংস্কার একসাথেই চলে। সংস্কার থাকলেই তার ব্যবহার আসবে। ব্যবহার থাকলেই তার পুনর্জন্ম হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। আপনি যাই করুন, আপনার ব্যবহার পাল্টে নিন, যতই জপ-ধ্যান করুন, ঠাকুরের নাম করুন, সংস্কার আপনার কোন দিন পাল্টাবে না। এমনকি সমাধি হয়ে গেলেও পাল্টাবে না। সংস্কারকে পাল্টানোর একটাই পথ কার্যকে কারণে লয় করে দাও, তার মানে যেখান থেকে এসেছে সেখানে তাকে পাঠিয়ে দাও। যতক্ষণ পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থিত না হচ্ছে ততক্ষণ এগুলো থাকবে।

এবারে বলছেন ধ্যান করলে কি হয় – **ধ্যানহেয়াস্তুদ্রুত্তয়ঃ।।১।।** বাইরের উদ্দীপনা থেকে ভেতরে যে তরঙ্গগুলি উঠছে এগুলোকে ধ্যানের দ্বারা প্রশমিত করা সম্ভব। আমাদের এই স্থূল শরীরকে রাজযোগ কোন গুরুত্বই দেয় না। এই শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে সেটাই যোগের আসল শরীর। যোগীরা এই দুটো শরীরকে স্পষ্ট আলাদা দেখেন – এটা আমার স্থূল শরীর আর এটা হল আমার সূক্ষ্ম শরীর। একজন যোগীর কাছে যেটা সব থেকে গুরুত্ব তা হল এই সূক্ষ্ম শরীরটাকে নাশ করা। স্থূল শরীরের কোন মূল্যই যোগীর কাছে নেই। ধ্যানের দ্বারা যে কোন জিনিষের স্থূল অভিব্যক্তিকে আটকে দেওয়া যায়। ভালোবাসা, দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান এই ধরনের যত রকম মনের বৃত্তি আছে, আর এগুলোর যে বাহ্যিক প্রকাশ আছে সেগুলোকে ধ্যানের দ্বারা নিজের বশে নিয়ে আসা সম্ভব, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা সংস্কারগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না। স্থূল রূপটা চলে যাবে কিন্তু সূক্ষ্ম রূপটা থেকে যাবে। আমার কোন প্রিয়জন মারা গেছে, তার স্থূল রূপটা সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু স্বপ্নে সেই প্রিয়জন আসছে, স্মৃতিতেও আসছে। তাহলে যে স্থূল আমার সমস্যা সৃষ্টি করছে, সেই স্থূল থেকে আমি কীভাবে বেরোব? ধ্যান করলে স্থূল রূপ থেকে সরে আসা যায়। স্থূলের সাথে আমাদের গভীর সমস্যা জড়িয়ে আছে, যদিও আমরা খুব হাঙ্কা করে সব কিছু নিয়ে থাকি, কিন্তু জিনিষটা অত হাঙ্কা করে নেওয়া যায় না। মূলে রয়েছে সংস্কার, যা একেবারে সূক্ষ্ম অবস্থায় রয়েছে। সেখান থেকে আসছে বিচার বা ভাবনা, সেই

বিচারের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বাইরের জগতে। যেমন যে চুরি করছে, চুরি করাটা তার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তারও আগে তার মাথায় ঘুরছে আমাকে চুরি করতে হবে। তারও পেছনে রয়েছে সংস্কার। আমরা তার বহিঃপ্রকাশকে আটকে দিতে পারি, তার মনে যে চুরি করার বিচার উঠছে সেটাকেও আমরা আটকে দিতে পারি। কিন্তু তার সংস্কারকে আমরা পাল্টাতে পারবো না। এরও গভীরে যে সংস্কার রয়েছে সেটা হল এই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এই পাঁচটা মূল কোন দিন যাবে না যতক্ষণ না পর পর এগুলোকে ঢুকিয়ে শেষে অবিদ্যাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো যায়। এখানে বৃত্তিকেও বহিঃপ্রকাশ বলা হচ্ছে। একজন বলছে আমার চুরি করার দুর্বলতা আছে। প্রথমে সেই জায়গা থেকে তাকে সরিয়ে আনতে হবে যেখান থেকে সে চুরি করছে। কিন্তু মনে ভাবনা উঠতে থাকবে। মনে যে ভাবনা উঠছে সেটাকে ধ্যান করে করে আটকে দেওয়া যায়। কিন্তু তার সংস্কারটা থেকে যাবে। সংস্কার যাবে এই দশ নম্বর সূত্রে, প্রতিপ্রসবে। প্রতিপ্রসব যোগের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এটাকেই পরের সূত্রে টেনে নিয়ে আলোচনা করছেন।

কর্মাশয়ের ধারণা

এই সূত্রের মধ্যে হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদের বীজ লুকিয়ে আছে – **ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।।১২।।** এখানে ‘কর্মাশয়ঃ’ এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, ‘কর্মাশয়ঃ’ মানে কর্ম+আশয় = কর্মাশয়ঃ। এই একটি শব্দের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। আশয় মানে যেখানে জমানো হয়, যেমন জলাশয়, জলকে যেখানে ধরে রাখা হয়। কর্মাশয় মানে যেখানে কর্ম জমা আছে, কর্মের পুকুর বলা যেতে পারে। সৃষ্টির শুরু থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের যত প্রাণী আছে, সেই এ্যামিবা থেকে শুরু করে দেবতা পর্যন্ত সবাইকে তার নিজের নিজের কর্মাশয়কে জন্মজন্মান্তরে বহন করে চলতে হয়। কর্মাশয়ে সমস্ত প্রাণির নিজের নিজের যত কর্ম আছে সব জমা থাকে। কিন্তু Dead Matter বা জড় পদার্থ বলে যাকে জানি তাদেরই শুধু কর্মাশয় থাকে না।

এবারে আরো বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে। আমরা ধরে নিচ্ছি প্রত্যেক মানুষ তার পিঠে একটা বস্তু নিয়ে চলছে। এই বস্তুর মধ্যে কি রাখা আছে? সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে যা কিছু করেছে, সব কিছু, ভালো যা করেছে, মন্দ যা করেছে, ভালো-মন্দ মিশ্রণ যা করেছে, আবার ভালো-মন্দ কোনটাতেই পড়বে না এই ধরণের যা কিছু করেছে, সমস্ত কর্ম বীজাকারে কর্মাশয়ে জমা হয়ে আছে। বীজাকার মানে সূক্ষ্ম হয়ে পড়ে থাকে। যদি বলে একটা গানের সিডিতে গান কোথায় লেখা আছে? বলতে হয় ওর মধ্যেই লেখা আছে। সিডিতে স্থূল আকারে গান খুঁজতে গেলে কোথাও পাওয়া যাবে না, অথচ পুরো গানটাই ঐ সিডির মধ্যে রয়েছে। প্রত্যেক প্রাণীর যে কর্মাশয় এটিও ঠিক এই রকম। আস্তরণের পর আস্তরণ ঐখানে সাজিয়ে রাখা আছে। আমি যা কিছু করছি, আমি যদি আপনাকে মনে মনে গালাগালি দিই আর মনে করছি আপনি তো জানতে পারলেন না, কিন্তু ঐ যে চিন্তা করলাম আপনাকে গালাগালি দেওয়ার, সেটাই সংস্কার রূপে পরিণত হয়ে ঐ কর্মাশয়ে চলে গেল। এই কর্মাশয়ের কোন ধরণের বিকার নেই, কোন তাড়াহুড়ো নেই, অনুকূল সুযোগ ও পরিস্থিতির জন্য সে চুপচাপ অপেক্ষা করে ওই ভাবে পড়ে থাকবে।

দৃষ্ট জন্ম আর অদৃষ্ট জন্মের যত কর্মবীজ সবই এই ভাবে বীজাকারে কর্মাশয়ে পড়ে থাকবে। অদৃষ্ট জন্ম বলতে এখানে দুটোকেই বোঝাচ্ছে, আগের আগের জন্মে যেগুলো হয়েছে সেগুলোও অদৃষ্ট জন্ম আর সামনে যে জন্ম আসছে সেটাও অদৃষ্ট জন্ম। যা কিছু করা হয়েছে তার অনেক কিছু এই জন্মে বেরোবে, অনেকগুলো আগের জন্মে বেরিয়ে গেছে আর অনেকগুলো আগামী জন্মে বেরোবে। এখানেই যোগদর্শনে পুনর্জন্মবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুনর্জন্মবাদ সরিয়ে দিলে যোগদর্শন আর দাঁড়াতে পারবে না। কারণ যোগদর্শনের অনেক কিছু পুনর্জন্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যোগদর্শন বলেই দেবে তুমি মান আর নাই মানো তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু এটাই বাস্তব।

দৃষ্ট জন্ম মানে বর্তমান জন্ম, এখন যে জন্মে আমি আছি। অদৃশ্য জন্ম মানে যে জন্মটা ভবিষ্যতে আসবে এবং যে জন্মগুলো আমি পেরিয়ে এসেছি। কর্মাশয়ে যত বীজ পড়ে আছে সব বীজই

একদিন না একদিন বেরোবেই। প্রত্যেকটি চিন্তা যেটা মনে মনে চিন্তা করেছিল, প্রত্যেকটি কর্ম যেটা করা হয়ে গেছে, সব আবার ফিরে আসবে। আমরা মনে করছি আমি একটা খারাপ কাজ করলাম কেউ দেখলো না, কেউ জানতে পারলো না, আমি বেঁচে গেলাম। আমাদের যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে শুনে আসছি অন্তর্যামী সব দেখছেন। রাজযোগ কিন্তু অন্তর্যামী বলে কিছু মানেও না আর জানেও না, রাজযোগ বিশ্বাস করে এই কর্মশয়কে। আমাদের জীবনে যা কিছু এখন হচ্ছে, যা কিছু ঘটে চলেছে সবই এই কর্মশয় থেকে হচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন যখনই কোন কিছু কর্ম করা হল, সেই কর্মটাই আমাদের চিত্তে একটা দাগ রেখে যায়, ঐটাই বীজাকারে কর্মশয়ে সঞ্চিত থেকে যায়। বীজাকারে আছে মানে চিন্তা রূপে খুব সূক্ষ্ম হয়ে জমে থাকে। অনুকূল পরিস্থিতি আর উপযুক্ত পরিবেশে ঐ সূক্ষ্ম বীজাকারে যেটা ছিল, সেটাই একটা বিরাট বানের জলের তোড়ের মত বেরিয়ে আসে। যাঁরা জপ-ধ্যানাদি করেন তাঁরা এগুলো আরো ভালো বুঝতে পারেন। বসে ধ্যান করছেন, হঠাৎ কোন কারণ নেই কিন্তু একটা প্রচণ্ড রাগ এসে গেল, কোন কারণ নেই পুরো শরীরটা ক্রোধ বৃত্তিতে আগুনের মত জ্বলতে শুরু করল। কোথা থেকে এই ক্রোধ বৃত্তি এলো? কোথা থেকেও আসেনি, ভেতরে জন্ম-জন্মান্তরের যে ক্রোধ বৃত্তিগুলি কর্মশয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে, একটু রাগ্না পরিষ্কার পেয়েছে সেই সুযোগে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখানে যেটা জমা হয় তা ঘটনামূলক রূপে জমা হয় না, একটা ছাপ থেকে যায়। আমরা এই ঘরে বসে আছি। এখন এই ঘরের একটা ছবি তুলে নিয়ে সেই ছবিটাকে ছোট করে করে একটা বিন্দু আকারে সেটাকে রেখে দেওয়া হল। ইন্টারনেটে গুগলস্ আর্থ বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, যেখানে পুরো বিশ্বের ছবি ছোট করে পয়েন্ট সাইজে রাখা আছে। যেমন যেমন ম্যাগনিফাই করতে থাকবে তেমন তেমন সেটা বাড়তে থাকবে, আর বাড়িয়ে বাড়িয়ে বেলুড় মঠের চূড়া পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। কর্মশয় ঠিক এই গুগলস্ আর্থের মত, একেবারে পয়েন্ট সাইজে সব কিছু জমা রয়েছে। যখনই কোন অনুকূল সুযোগ পাবে তখনই বুঝ করে বেরিয়ে আসবে।

ব্যাসদেবের এক শিষ্য ছিলেন, একদিন তাঁর গুরুদেব ব্যাসদেবকে বলছেন ‘গুরুদেব! আমি কাম জয় করে নিয়েছি’। ব্যাসদেব বলছেন ‘না না, ও ভাবে কামের ব্যাপারে কখনই নিশ্চিত হয়ো না’। শিষ্য তাও খুব দৃঢ়তার সাথে জোর দিয়ে বলে যাচ্ছেন ‘আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি যে আমার কাম জয় হয়ে গেছে, কাম আর আমাকে কিছু করতে পারবে না’। শিষ্যের বিশ্বাসের উপর ব্যাসদেব কি আর বলবেন, বলছেন ‘তা বেশ কথা, খুব ভালো খবর’। একদিন সন্ধ্যে বেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। ব্যাসদেব সেদিন আশ্রমে ছিলেন না। এক সুন্দরী যুবতী ঐ বৃষ্টির মধ্যে আশ্রমে এসে ব্যাসদেবের শিষ্যের কাছে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। শিষ্যতো কিছুতেই মেয়েটিকে আশ্রয় দেবেন না, রেগেমেগে একেবারে তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন। মেয়েটি খুব আতঁ ভাবে আকুতি মিনতি করে বলছে ‘এই বৃষ্টির মধ্যে তায় আবার অন্ধকার হয়ে গেছে এখন আমি একা একা কোথায় যাবো! আজকের রাতটুকু একটু আশ্রয় দিন, কাল ভোর হতেই আমি এখান থেকে চলে যাব’। শিষ্য তখন তাকে আশ্রমে ঢুকিয়ে বলছেন ‘ঠিক আছে তুমি ঐ কোণটিতে চুপটি করে বসে থাকবে’। এরপর আরও প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু হল, অন্ধকার খুব তীব্র হয়ে এসেছে। শিষ্য জিজ্ঞেস করছে ‘তুমি কোথা থেকে আসছিলে, আর এত রাতে কোথায় যাচ্ছিলে’? এই ভাবে একটা কথা হল, সেটা থেকে আরো দুটো কথা হল। এইভাবে অনেক কথা হতে হতে সব শেষে গিয়ে শিষ্য বলছে ‘তুমি আমাকে বিয়ে করবে’? মেয়েটি বলছে ‘কি করে বিয়ে করব আপনাকে, আপনি হলেন ব্রহ্মচারী, সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, এখন বলছেন বটে তবে দুদিন পরে তো আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন’। শিষ্য বলছেন ‘না না আমি তোমাকে কোন দিনই ছাড়বো না, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি’। তখন মেয়েটি বলছে ‘আমি বিশ্বাস করি না, তবে আপনি যদি দিব্যি খেয়ে আমাকে কাঁধে নিয়ে সাতবার এই ঘরটা পরিক্রমা করতে পারেন তাহলে আমি বিশ্বাস করতে পারি’। তখন শিষ্য মেয়েটিকে কাঁধে বসিয়ে দিব্যি খেয়ে বলছে ‘আমি তোমাকে কোন দিন ছাড়বো না’। দিব্যি খেতে খেতে শিষ্য পরিক্রমা করতে শুরু করেছে। একবার করে পরিক্রমা করে দিব্যি খাচ্ছে আর শিষ্যের

মাথায় প্রচণ্ড জোরে একটা করে চাটি পড়ছে। শিষ্য অবাক হয়ে ভাবছে আমার মাথায় কে চাটি মারছে! তখন দেখে ব্যাসদেবকেই কাঁধে করে শিষ্য পরিক্রমা করে চলেছে। ব্যাসদেব বলছেন ‘শালা, তুই নাকি কাম জয় করেছিস’। ব্যাসদেবই ঐ মহিলার রূপ ধরে শিষ্যের ভুল ভাঙ্গাতে এসেছিলেন।

এটা একটা ছোট্ট কাহিনী হতে পারে, কিন্তু এই ছোট্ট কাহিনীটাই কর্মাশয়ের আসল রহস্যটাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। কর্মাশয় যে কিভাবে মানুষকে কোথায় নিয়ে চলে যায় কেউ বুঝতেই পারেনা। ব্যাসদেবের শিষ্যের এই কাহিনীই এই কর্মাশয়ের সাক্ষী দিচ্ছে।

একজন মহারাজ, উনি প্রচণ্ড ত্যাগী, তপস্বী, এত ভালো সাধু যে সবাই তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিছু দিন ধরে উনি ডাইনিং হলে সাধুদের পঙ্কজিতে খেতে আসছেন না। খবর নিয়ে জানা গেল উনি ইদানিং বিভিন্ন ভক্তদের বাড়িতে যেতে শুরু করেছেন। এই রকম বেশ কয়েক দিন চলার পর একদিন এক সিনিয়র মহারাজ ডেকে জিজ্ঞেস করছেন ‘তোমাকে সারাটা জীবন কোন দিন কোথাও মঠের বাইরে যেতে দেখিনি, মঠের বাইরে তুমি কোন দিন কোথাও যেতে না, আর এখন এই বুড়ো বয়সে ভক্তদের বাড়িতে ভাঙুরা খেতে যাওয়া শুরু করলে কেন?’ উনি বললেন ‘তখন ইচ্ছে করত না, এখন ইচ্ছে করছে তাই যাচ্ছি’।

এটাই সঠিক উত্তর। তখন তার ইচ্ছে করত না, অর্থাৎ তাঁর কর্মাশয়ের মধ্যে যে বীজগুলি তখন প্রস্ফুটিত হচ্ছিল, যে সংস্কারগুলো ফল প্রসব করছিল সেগুলো ছিল ত্যাগের। তাই বলে কি এখন তাঁর ত্যাগ চলে গেছে? একেবারেই যায়নি। তিনি প্রতিদিন যে দিনলিপিতে এত দিন চলছিলেন, ভোর তিনটের আগে বিছানা ত্যাগ, তারপর সেই থেকে মন্দির যাওয়া, সেবা করা, এত কাজ করছেন, এই বয়সেও পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এখনও করে যাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে যে অন্য আরও সংস্কার ছিল সেগুলো এখন সামনে আসতে শুরু করেছে। এই জিনিষগুলো গৃহীদের ক্ষেত্রে কম হয়, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যাঁরা খুব জপ ধ্যান করেন তাঁদের হঠাৎ করে এমন একটা তোড় আসে, আর ঐটাই বেশ কিছু দিন ধরে চলতে থাকে। চলতে চলতে ঐটা শেষ হয়ে গিয়ে আবার অন্য ধরনের আচরণ চলতে শুরু করে। এর মূল হচ্ছে কর্মাশয়। কারুর কর্মাশয় ধীরে ধীরে ফল প্রসব করে, কারুর ক্ষেত্রে খুব দ্রুত গতিতে বেরোতে থাকে, দ্রুত গতিতে বেরোনটা আবার অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে।

এই কর্মাশয়ের শেকড় আবার সেই পাঁচটি বন্ধন রূপ ক্লেশে – অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ। এই পাঁচটার মধ্যেই যত আমাদের কর্মাশয় জমে রয়েছে। আমরা যা কিছু করছি তার মূলে এই পাঁচটা জিনিষই আছে। আমি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাইছি, আমি কারুর সাথে জড়িয়ে রয়েছি, আমার সুখ-দুঃখের বোধ হচ্ছে। আর সব কিছুর পেছনে আছে অবিদ্যা, অবিদ্যা মানে নিজের স্বরূপকে ভুলে যাওয়া। এই পাঁচটাকে যদি বট বৃক্ষের শেকড় মনে করা হয় তাহলে বৃক্ষের একমাত্র ফল হল এই কর্মাশয়। এই পাঁচটি দিয়ে সে তার রস সংগ্রহ করতে থাকে। অবিদ্যার কারণে আমরা কিছু করছি, রাগ ও দ্বেষ বশতঃ আমরা কিছু জিনিষ করছি ইত্যাদি, আর সমস্ত ব্যাপারটা এই কর্মাশয়ে জড়ো হতে থাকে। যেমন একটা জলাধার আছে আর পাঁচটা পাম্প লাগিয়ে পাঁচ জায়গা থেকে ঐ জলাধারে জল ভরা হচ্ছে। সমস্ত কর্মাশয়টাই ক্লেশযুক্ত, এখানে যা কিছু আছে সবটাই ক্লেশ, ভালো বলে কিছু নেই। যেটাই আছে সেটাই একটা প্রতিবন্ধক। কেন প্রতিবন্ধক? কারণ এর সবটাই সমস্ত ক্লেশের মূল। কারুর বাড়ির লোকেরা হয়তো খুব ভালো, বন্ধু ভাগ্য খুব ভালো, টাকা, পয়সা, শরীর, স্বাস্থ্য, রূপ সবই তার ভালো। নিজের ছেলেকে দেখে মানুষ কত সুখ পায়, নাতিকে দেখে দাদু-দিদিমারা কত আনন্দ পায়। কিন্তু যোগের দৃষ্টিতে এই সব কিছুই ক্লেশ। কারণ এই জিনিষগুলি থেকে একটা জিনিষ যদি চলে যায় তখন সে ভেঙ্গে পড়বে। যে জিনিষে আসক্তি সেটাও ক্লেশ আর যে জিনিষ থেকে পালাচ্ছি সেটাও ক্লেশ। বেদান্তেও বলছে সুখ দুঃখ দুটোই বন্ধন, আর যোগে বলছে দুটোই ক্লেশযুক্ত। সমস্যা হল, যখনই ভালো কিছু পাচ্ছি তখনই ইচ্ছা হয় আরেকটু পেলে হত। সেইজন্য বলছেন, যখনই মানুষ কোন কিছু ভোগ করে তখনই তার চাহিদা বাড়বে। ভোগ করা মানেই চাহিদা বাড়। চাহিদা বাড় মানেই আজ হোক কিংবা কাল হোক অশান্তি নিয়ে আসবেই আসবে।

কিছু কিছু সত্যিকারের ক্লেস আবার কিছু কিছু ক্লেস সুপ্ত থাকে, কিন্তু সবটাই ক্লেস। সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম বলে – দুঃখং দুঃখং সর্বং দুঃখম্। যখনই আমি কোন একটা জিনিষকে ভোগ করতে চাইছি, যে কোন জিনিষ, মনে করুন আমার কোন নেশা নেই, শুধু এই মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখা ছাড়া আর কোন নেশা নেই, যখনই কোথাও ম্যাচ হবে তখনই ইচ্ছে করবে মাঠে যেতে। তার জন্য টিকিট যোগাড় করতে হবে, এদিকে ওদিক যেতে হবে, টিকিট না পাওয়া গেলে এটা সেটা করতে হবে। যে কোন একটা ভোগের বাসনা থাকলেই এই একই ভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। প্রথমেই আসে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা এসে গেলেই নানা সমস্যা এসে গেল। আমরা সবাই এই রকম গভীর সমস্যার মধ্যে ডুবে রয়েছি – তার একমাত্র কারণ এই পাঁচটিই বিষয়স্বরূপ ক্লেস।

যে কাজই করতে যাবে ভেতরের এই সংস্কারগুলি তখন কাজ শুরু করে দেবে। আমরা যে সব সময় বলি কি আর করব সব কর্মফল, কিন্তু এই কর্মফল গুলি করে কি, একটা কর্ম করল সেটা একটা মনের মধ্যে ছাপ রেখে সংস্কার রূপে চলে গেল, সংস্কার রূপে চলে গিয়ে ওটা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফল প্রসব করবে না, অনেক দিন ওখানে পড়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। যখনই অনুকূল আর উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে যাবে তখনই তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসবে। সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার থাকে খুব শক্তিশালী আবার কিছু কিছু সংস্কার থাকে দুর্বল। মনুস্মৃতিতে আছে অতি গর্হিত কর্ম, এই অতি গর্হিত কর্ম যদি করে তখন এই কর্মের সংস্কার গুলো বেশী দিন বসে থাকবে না, খুব তাড়াতাড়ি ফল দিতে শুরু করে দেবে। মারাত্মক বিষাক্ত সাপ যদি দংশন করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। আর যদি অল্প বিষাক্ত সাপে দংশন করে তখন অত তাড়াতাড়ি মরবে না, আস্তে আস্তে সে মৃত্যুর কোলে চলে পড়বে। কিছু কিছু কর্মের ফল দেরীতে প্রসব করে, কতদিনে করবে বলা যায় না। যেমন ধরুন কেউ খুন করল, কেউ যদি কাউকে মারাত্মক ভাবে ঠকিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিল, কাউকে যদি খুব কষ্ট দেয় মানে এমন কষ্ট দিলেন তার সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল, তখন এই কর্মের ফলগুলি বেশী দিন বসে থাকবে না, এই জন্মেই নয়তো ঠিক পরের জন্মেই এই ধরনের কর্মের ফলগুলো প্রসব করতে শুরু করে দেবে। আবার এমন কিছু হালকা কর্ম আছে যেগুলোর ফল হয়তো দশ জন্ম কিংবা আরো অনেক জন্মের পর ফল প্রসব করতে শুরু করবে। এখন হয়তো এমন কোন কিছু হয়ে গেল যার জন্য সে ভাবছে এটা কোথা থেকে এলো, হয়তো দশ জন্ম আগে কিছু করেছিল তার ফল এখন আসতে শুরু করেছে। উপযুক্ত পরিবেশ আর সঠিক সময় পেলেই ঐ কর্মশয় থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করতে শুরু করে দেবে। আমরা বলি সুখ দুঃখ মিলিয়েই জীবন। সুখ-দুঃখ মিলিয়ে জীবন নয়, জীবন একটাই সেটা এই কর্মশয়, আর কর্মশয় মানেই ক্লেসদায়ক আর ফলদায়ক।

অনেকে আছেন যাঁরা সাত-আট বছর ধরে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে এখানে শাস্ত্র কথা শুনে যাচ্ছেন। কারণ শাস্ত্র শোনার সংস্কারটা এখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী, সব কিছু উপেক্ষা করে তেড়েফুড়ে চলে আসছেন। আবার অনেকে আছেন ছ'মাস কি এক বছর আসার পর বন্ধ করে দিচ্ছেন। কারণ এরা শাস্ত্রের কথা নিতে পারছে না, সংস্কারের সেই জোর নেই। তাহলে কোন সংস্কারের জোর আছে তাদের? এর আগে এরা হয়ত পশু জন্মে ছিল। পশুরা আহার, নিদ্রা আর মৈথুন নিয়েই থাকে, পরের জন্মেও এই তিনটেই চলতে থাকবে। শাস্ত্র পড়া, ঈশ্বরের নাম করা এই শুভ সংস্কার একমাত্র মানুষ জন্মেই হয়। যখন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ছিল তখন থেকে আহার, নিদ্রা আর মৈথুন চলে আসছে। যখন বানর, বনমানুষ, গরিলা ছিল তখনও এগুলো চলে আসছিল। তাই আহার, নিদ্রা আর মৈথুন হল সব থেকে শক্তিশালী সংস্কার। বঙ্কিম বাবু যখন ঠাকুরকে বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য আহার, নিদ্রা আর মৈথুন তখন তিনি ভুল কিছু বলেননি। এই কারণেই ভুল বলেননি, কারণ এই তিনটেই হল আমাদের সব থেকে শক্তিশালী সংস্কার। এখানে এটাই বলছেন, যে সংস্কারগুলো অত্যন্ত জোড়ালো সেই সংস্কারগুলো এই জন্মেই ফল দেবে। আর যে সংস্কারগুলো শক্তিশালী নয়, সেগুলো শেষ কখনই হয়ে যাবে না, সেগুলোও কর্মশয়ে জমে থাকবে। যারা এখানে অনেক দিন ধরে শাস্ত্র কথা শুনেছেন তাদের শুভ সংস্কারটা জোড়ালো হয়ে অন্য আবর্জনার সংস্কারগুলো ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে সেগুলো চলে যাবে না, ওগুলোও থাকবে। যেমনি এখান থেকে সরে গিয়ে বিয়ে বাড়ি বা কোন পার্টিতে যাবে তেমনি আগের

মত আবার নাচ গান করতে শুরু করে দেবে। মধুকর বৃত্তি, মানে শুধু ফুলের মধুই পান করবে, ঈশ্বরীয় কথা নিয়েই থাকবে সেটা আমাদের পক্ষে এখনই সম্ভব নয়। আমাদের হল মক্ষিকা বৃত্তি, এই সন্দেশে বসছি আবার পচা ঘায়েও বসছি। সেইজন্য সব সময় সচেতন ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সংস্কারগুলোকে শুভ সংস্কারে নিয়ে যাওয়া যায়।

অনেক সময় কারুর কারুর হঠাৎ রূপান্তর দেখা যায়। এই ধরণের রূপান্তরের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে সেখানে পরস্পর বিরোধী সংস্কার রয়েছে। এক ধরণের বিশেষ সংস্কার এক ভাবে কাজ করবে আবার কোথাও একটা সুযোগ পেয়ে গেল ঐ সংস্কারটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাই বলে অন্যটা চলে যাবে না, দুটোই থাকবে। কর্মশয় থেকে কোন কিছুই শেষ হয়ে যায় না। যেহেতু এগুলোকে শেষ করা যায়না তাই যে সংস্কার সুযোগ পাবে সেই সংস্কারই ফল দিতে শুরু করবে কিন্তু বাকীগুলো চাপা পড়ে থাকবে। সিনেমা হলে বসে যারা সিনেমা দেখছে সবারই বাড়িতে কিছু না কিছু সমস্যা আছে, সিনেমা হলে সমস্যাগুলো এখন চাপা পড়ে আছে। কিন্তু যেই সিনেমা শেষ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করবে, কিন্তু এতক্ষণ ওটা চাপা পড়ে ছিল। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এলে তখন ঐ সমস্যাগুলো আবার তাদের মাথায় ঘুরতে শুরু করে দেবে। এই মুহূর্তে এগুলো এখন চাপা পড়ে আছে। ঠিক সেই রকম এখন নিজের জগতে যে যে কাজগুলো করছে মানে সেই কর্মের বীজগুলো এখন তার কার্য করার উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে গেছে, আর বাকীগুলো এখন চাপা আছে। যেই এই কর্মগুলো শেষ হয়ে যাবে তখন বাকীগুলো খেলা করতে শুরু করবে। রোজ দুঘন্টা করে ধ্যান করতে শুরু করার কয়েকদিন পর থেকেই দেখা যাবে কোথা থেকে কত রকমের অদ্ভুত চিন্তা, কত ধরণের বিচিত্র অনুভূতি, কত রকমের আজগুবি ভাব আসতে শুরু করবে ভাবতেই পারা যাবে না। যেগুলো এসে গেছে সেগুলি কি শেষ হয়ে গেল? কখনই শেষ হয়ে যাবে না। যেটা বীজ ছিল সেটা চেউ হয়ে উপরে এলো, আবার যেটা চেউ উঠেছিল সেটাই আবার শান্ত হয়ে বীজ রূপে নীচে চলে গেল। এটাই চিরন্তন, সেই অনাদি কাল থেকে এই খেলাই চলে আসছে।

যোগীরা তাদের বাজে সংস্কারগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নিজের শরীরটাই পাল্টে নেন। ধরুন আমার মধ্যে হিংস্র ভাব আছে, কিংবা মাংস খাবার খুব প্রবৃত্তি আছে, আর আমি একজন বিরাট যোগী। আমি কিন্তু জানি ও বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে এই ধরণের মাংস খাওয়ার সংস্কার রয়েছে, আমি তখন আমার শরীরকে একটা ছাগলের শরীর বানিয়ে নেবো যাতে আর মাংসই খেতে না পারে। যোগীরা এইভাবে কখন হয়তো দেবতার শরীর নিয়ে নেয় বা পাথরের শরীর নিয়ে নিল যাতে ওখানে কোন সংস্কারই আর কাজ করতে না পারে। ফলে এই সংস্কারগুলি আর ঝামেলা করতে পারছে না, এই সুযোগে মনকে পুরো একাগ্র করে সাধনাতে ঢেলে দিতে পারছে। এই ভাবে সাধনা করতে করতে যেই সে নিবীজ সমাধি লাভ করে নিল তখন যে কর্মশয়ে সৃষ্টির সময় থেকে কর্মের যত বীজ জমা আছে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যোগীদের এমন ক্ষমতা হয়ে যায় যে, তাঁদের শুভ সংস্কারকে ধরে রাখার জন্য নিজের শরীরকেই শুভ বানিয়ে নেন।

কোন মানুষের ভেতরের শুভ চিন্তা আর তার বাইরের চোখ মুখ দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। সত্যিকারের সুন্দর চেহারা দেখলে আমরা বলি এর চেহারাট কি সৌম্য। সৌম্য চেহারা যাদের তাদের সংস্কারগুলো খুবই শুভ। অনেক মহারাজদের বলতে শোনা যায়, সুন্দর শরীর পাওয়া ঈশ্বরের কৃপা। ঈশ্বরের কৃপা এই হিসাবে যে, এটা একটা শুভ লক্ষণ। শুভ সংস্কার না থাকলে শুদ্ধ শরীর পাবে না। তা নাহলে এই রোগ সেই রোগ লেগেই থাকবে। দুদিন হয়তো ভালো চেহারা থাকবে, পরে রোগ শোক আসার পর তার ছাপ চেহারাতেও এসে পড়বে। বাজে জিনিষের ফল এই জীবনে আসে আবার শুভ সংস্কারের ফল এই জীবনেই আসে। যোগীদের ক্ষমতা এত বেশী হয়ে যায় যে, তাঁরা শরীরটাই পাল্টে নেন। শরীরটা পাল্টে নিয়ে শুভ সংস্কারকে কার্যকর করার জন্য সেই শুভ সংস্কারকেই ধরে রাখেন। যোগীরা ভালো ভাবেই জানেন যে ধ্যান করে, সাধনা করে এই কর্মশয়কে নাশ করা যাবে না। কিন্তু সব থেকে মঙ্গলজনক গোলমালে জিনিষ গুলিকে সামনে আসতে না দেওয়া। বেলুড় মঠের পরিমণ্ডলে

সন্ন্যাসীরা কিছু জিনিষ করতে পারেন আবার কিছু জিনিষ করা যাবে না। কিছু জিনিষ করা থেকে যখন তাকে বিরত রাখা হচ্ছে তখন সেই সংস্কারগুলি তার থাকলেও সেগুলো সামনে আসতে পারছে না। এখন সেই সংস্কারগুলি দীর্ঘ দিন পড়ে থাকতে থাকতে দুর্বল হয়ে যাবে। আমাদের মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল এটাই, আমাদের মধ্যে যে শুভ সংস্কারগুলো আছে এগুলোকে ধরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অশুভ আবর্জনা যেগুলো পড়ে আছে সেখানে আমাদের করার কিছু নেই, যেমন পড়ে আছে পড়ে থাক, ওই নিয়ে চিন্তা করতে নেই। শুভ সংস্কারকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ভারতে কত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র পড়াশুনা করতে যায়, কিন্তু তারা সবাই বড় বড় স্কলার হয় না। তাই বলে কি সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া উচিত? কখনই তা করা যায় না। প্রথম হল, যাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করার সংস্কার রয়েছে সেটা যাতে জেগে ওঠে তার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়। আর দ্বিতীয়ত আমাদের মধ্যে এমন অনেক আজো বাজে সংস্কার ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা আর কমিয়ে আনার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার। বিদ্যাকেন্দ্রগুলি তৈরী হয়েছে ছাত্রদের অনুশাসনের মাধ্যমে চরিত্র গঠন করার জন্য। ইদানিং চারিদিকে ছাত্রদের মধ্যে যে এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এই উচ্ছৃঙ্খলতা থাকবে না যদি যখনই কোন ধরণের অন্যায় করতে যাচ্ছে তখন ধরে প্রথমেই আগে খুব কড়া শাস্তি দিয়ে তাকে পথে নিয়ে আসা হয়। যারা নিজেদের ভালো মন্দ বিচার করবার বয়সেই পৌঁছাতে পারল না, তাদের স্বাধীনতা দিলে উচ্ছৃঙ্খলতা কখনই বন্ধ করা যাবে না, সেইজন্য আগেকার দিনে শিক্ষকরা প্রথমেই ধরে দুটো চড় মেরে দিতেন তারপরে ছাত্রের কথা শুনতেন, আগে অন্যায় করেছ সেটা ঠিক না বেঠিক পরে দেখা হবে আগে ছাত্রকে পথে নিয়ে এসো। এই সব প্রতিষ্ঠান গুলো কেন করা হয়েছে? কিছু ভালো সংস্কারকে সামনে নিয়ে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আর কিছু কিছু বাজে সংস্কারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সঠিক পথ দেখাতে সহায়তা করার জন্য।

কর্মাশয়ের মধ্যে সমস্ত ধরণের সংস্কার রয়েছে। সবারই ভেতরটা সংস্কারে গিজগিজ করছে। আমরা এখন যাই করি না কেন এখন কিন্তু প্রত্যেকেই একজন প্রচ্ছন্ন সুপ্ত দাগী আসামী। আমরা মানি আর নাই মানি এখন একজন দাগী আসামী সেও কিন্তু একজন সুপ্ত প্রচ্ছন্ন সাধু, আর এখন যিনি একজন সাধু তিনি হয়ত একজন সুপ্ত ক্রিমিনাল। রাজযোগ তাই একেবারে খোলাখুলি বাস্তবকে দেখিয়ে বলবে – বাপু এটাই সত্য, এটা এভাবেই চলে। সেইজন্য এমন অনুকূল পরিবেশ খুঁজে বার কর যেখানে তোমার অশুভ সংস্কার মাথা চাড়া দিতে না পারে। সবাই কিছু দিন যোগাভ্যাস করেই বলবে আমি মস্ত বড় যোগী। যদি একটু ভোগের সুযোগ তাকে দিয়ে দেওয়া হয় সব ধরা পড়ে যাবে কে কত বড় যোগী। ঠাকুরের কোলে যখন যুবতী মেয়েকে বসিয়ে দেওয়া হল, ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। তাঁর মনে কোন ধরণের কিছু বিকারই হল না। যে চরম বাসনাগুলো আমাদের অতৃপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সেই বাসনার বিষয়ে ফেলে দিলেই আমরা সবাই ধরা পড়ে যাব। কিন্তু ঠাকুরের মন এমন অবস্থাতে চলে গেছে তাঁকে এগুলো কিছুই করতে পারছে না। কিন্তু যে যতই নিজেকে বাবাজী বলুক আর যাই বলুক আসল জায়গায় ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে সে কত বড় যোগী। কেন সন্ন্যাসীরা হাত তুলে বলে দেয় হে প্রভু আমি গেরুয়া পড়ে নিয়েছি তুমি আমাকে রক্ষা কর? কারণ সন্ন্যাসী জানে আমার মধ্যেও অশুভ সংস্কার আছে। কুকুরের গলায় যদি বকলেস লাগান থাকে তখন বোঝা যায় যে এই কুকুরের একজন প্রভু আছে। ঠিক সেই রকম গেরুয়া বলে দিচ্ছে সন্ন্যাসী এখন ভগবানের দাস, ওকে যেন আর কেউ বিরক্ত করতে না পারে। কিন্তু সন্ন্যাসী যদি একবার কামিনী-কাঞ্চন ভোগের মধ্যে পড়ে যায়, দেখা যাবে এতদিন ভোগ করেনি বলে হয়তো আরো তিন গুণ উৎসাহে ওই ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সন্ন্যাসীকে সব কিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়, এই ভাবে চলতে চলতে হয়তো কোন দিন তাঁর নির্বীজ সমাধি লাভ হয়ে যাবে। নির্বীজ সমাধি হয়ে গেলে কর্মাশয়ের মধ্যে যত মাল মশলা ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর তাঁর আর কোন কিছুতেই বিকার আসবে না।

তাই প্রথম লক্ষ্য খুব সন্তুর্পণে পা ফেলা। সন্ন্যাসীকেও প্রথমে খুব সামলে চলতে হয়, কারণ সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারেন কিন্তু পাকা খেলোয়াড় হননি। ঠাকুরের কাছে সবাই যাচ্ছেন কিন্তু নরেনকে

বলছেন – ও হচ্ছে দাবানল, ওর মধ্যে কলাগাছ ফেলে দিলেও পুড়ে যাবে। আর অন্যান্য ছোকড়া ভক্তদের তিনি সামলে সুমলে রাখছেন – তুই এটা করবি না, তুই এখানে বেশি যাবি না, তুই ওর সাথে বেশি মিশবি না, তুই এগুলি বেশি খাবি না। স্বামীজী এমন অবস্থায় ছিলেন, যে অবস্থায় তাঁর বীজ বলে কিছুই ছিলনা। কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে সব ধরণের বীজ রয়েছে, ভালো বীজও আছে খারাপ বীজও আছে। যোগীরা শরীরকে শুভ তৈরী করার জন্য শুধু মনের শক্তি দিয়ে নিজের শরীরকে যোগ সাধনার উপযুক্ত করে তোলেন। যারা লড়াই করে তাদের শরীর এক রকম হয়, যারা পড়াশোনা নিয়েই থাকে তাদের শরীর আরেক রকম হয়, এর জন্য খাওয়া-দাওয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যোগীদের শরীরটাই এমন ভাবে তৈরী হয়ে যায় যে সেই শরীরের দ্বারা যোগ সাধন খুব সহজেই করতে পারেন। আমাদের যে শরীরের গঠন, এই শরীর দিয়ে কোন দিন ধর্ম সাধনই হবে না, যোগ সাধন তো দূরে। ঠাকুর বলছেন – যেমন যেমন সাধন করে গভীরে যায় তেমন তেমন তার শরীরটাও পালাতে থাকে, তখন সবটাই তার দিব্য হয়ে যায়। এই শরীর আর তখন থাকে না। ঠাকুরের শরীর কত বলিষ্ঠ ছিল কিন্তু পরে কেমন পাল্টে গেল, স্বামীজীরও শরীর কেমন পাল্টে গিয়েছিল।

আমরা একজন মহা আসক্ত ভোগীকে আর একজন মহা ত্যাগপ্রবর সন্ন্যাসীকে আলাদা দেখি, কিন্তু একজন সত্যিকারে যোগী এই দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। কেননা যখন যার মধ্যে যেটা কাজ করবে সেই অনুসারেই সে তখন হয়তো সন্ন্যাসী আর আমি হয়তো কোন ভোগী। তবে আসল যেটা দেখার বিষয়, সাধু বা সন্ন্যাসী নিজেকে এই অশুভ সংস্কার থেকে বাঁচিয়ে চলছে কিনা। কর্মশয়ের ব্যাপারটা খুবই জটিল। কার ভেতরে কোন অশুভ সংস্কারের বীজ বসে আছে আমরা কোন দিন জানতে পারবো না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – হারা জেতা তাঁর হাতে। কে আগে ভগবানকে পাবে কে পরে ভগবানকে পাবে এটা তাঁর হাতে।

আলোচনা করতে করতে এখানে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন আমাদের মনও তড়িৎ শক্তির ধর্মের মত। আশ্চর্য হল, স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন তখনও নিউরোলজি বিজ্ঞান আসেনি। মনের ভেতরে যা কিছু চলছে এটা তড়িৎ শক্তির ধর্মানুসারেই কাজ করে। অনেক পরে এটাকেই নিউরোলজির বিজ্ঞানীরা বলছেন Electro Chemical Activity। স্বামীজী বলছেন আমরা যখন কোন তড়িৎ শক্তি প্রেরণ করতে চাই তখন আমাদের তারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকৃতি যখন তড়িৎ শক্তি প্রেরণ করে তখন বিনা তারেই বহু পরিমাণে এই বিদ্যুৎ শক্তি প্রেরণ করে। ঠিক তেমনি আমাদের মনের যা কিছু হয় সব তড়িৎ শক্তির নিয়মেই হয়। এই স্থূল শরীর থেকে মনের শক্তিই সব থেকে কার্যকরী। কিন্তু শরীর চালাতে গেলে সমাজে থাকতে হবে, আর সমস্যা তখনই আসে। সেইজন্য যোগীরা এই শরীরে স্নায়ুর মাধ্যম দিয়ে প্রাণ শক্তি সংগ্রহ না করে তারা সরাসরি অন্য কোন কিছুর দ্বারাই (যোগশক্তি) তাঁর প্রয়োজনীয় শক্তিকে আহরণ করে নিতে পারেন। যেমন ধরুন, আমি একটা কিছু আপনাকে বলতে চাইছি। এখন আমার মস্তিষ্কে মনের কিছু কার্য হচ্ছে, সেটাই পরে শব্দ হয়ে আপনার কর্ণে যাচ্ছে। আপনার কর্ণে গিয়ে সেখানে আবার তড়িৎ শক্তিতে কাজ হচ্ছে। সেই থেকে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন। যোগীরা এত কিছু করতে যাবেন না। যোগী শুধু মনে মনে চিন্তা করবেন আর তাতেই আপনার মন পাল্টে যাবে। ঠাকুরও দৃষ্টি মাঝে অনেকের জীবন পাল্টে দিয়েছেন। এগুলো করার জন্য অত্যন্ত শুভ সংস্কার অর্জন করতে হয়। শুভ সংস্কার যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ এই ক্ষমতাগুলো হয় না।

স্বামীজী বলছেন পুরুষ বা চৈতন্য সত্তা যতক্ষণ স্নায়ু প্রণালী ভেতর দিয়ে কাজ করছে ততক্ষণ আমরা বলি একটা শরীর জীবিত। চৈতন্য সত্তা যখনই কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখন আমরা বলি লোকটি মারা গেছে। কিন্তু যোগীরা এই জীবনমৃত্যুর পারে। যোগীরাও কাজ করছেন কিন্তু তাঁরা এই স্নায়ু প্রণালীর মাধ্যমে কাজ করেন না, কিন্তু কাজ করছেন। মারা যাওয়া মানে, চৈতন্য সত্তা মস্তিষ্ক দিয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছেন। যোগীরা এই মস্তিষ্ক দিয়ে কোন কাজ করেন না। শুদ্ধ চৈতন্য তখন সমষ্টি মন থেকে সরাসরি কাজ করে দিচ্ছে, যার জন্য জৈবিক মস্তিষ্ক দিয়ে যোগীকে কোন কাজ করতে হয় না। এখন আপনি যদি শরীর গঠন করার ক্ষমতা পেয়ে যান, তাহলে আপনি যেমন খুশী আপনার

শরীরকে সাজিয়ে নিতে পারেন। যোগীদের এটাই বৈশিষ্ট্য। যোগী তাঁর সংস্কারগুলিকে ঠেলে ঠেলে একেবারে প্রকৃতিতে নিয়ে গেছেন। কিন্তু সংস্কারগুলোকে কাজ করতে হলে শরীর দরকার। তখন যোগীরা তাঁর শরীরকেও সেই রকম বানিয়ে নেন যাতে ওই সংস্কারগুলো কাজ করে। যিনি যোগী তিনি এই স্থূল শরীরের উপর নির্ভর করেন না। বেঁচে থাকা বা জীবনধারণের জন্য যা কিছু শক্তি সংগ্রহ করি সবই সেই সূর্যেরই শক্তি। এই সূর্যের শক্তিকে গাছপালা আহরণ করছে, ছাগল, গরু এই গাছপালা খাচ্ছে, মানুষ এই পশুর মাংস খাচ্ছে, গরুর দুধ খাচ্ছে, সেই সূর্যেরই শক্তি বিভিন্ন পথ ঘুরে ঘুরে আমাদের কাছে আসছে। এখন যদি স্থূল শরীরের গঠনকে পাল্টে নেওয়া যায় তখন সেই শরীর দিয়ে সরাসরি সূর্যের শক্তিকে গ্রহণ করে সেটাকে শরীরের প্রাণশক্তিতে রূপান্তরিত করে নিতে পারা যাবে, তখন এই স্থূল শরীরের আর কোন প্রয়োজনই রইল না। স্বামীজী উপমা দিয়ে বলছেন, আমরা ইলেকট্রিসিটি তারের মাধ্যমে পাঠাই, অথচ প্রকৃতি কোন কিছুর মাধ্যম ছাড়াই কয়েক কোটি ভোল্টের ইলেকট্রিসিট আকাশের বিদ্যুৎএর মাধ্যমে অনায়াসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা এই নয় যে ইলেকট্রিসিটি তারের মাধ্যম ছাড়া পাঠান যায় না, নিশ্চয়ই পাঠান যায়, প্রকৃতিই দেখিয়ে দিচ্ছে। ঠিক সেই রকম এই শরীর ছাড়া আমরা আর অন্য কোন মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবো না, এটা একেবারেই ঠিক নয়।

একজন লোক অফিস যাওয়ার জন্য একটা জামা পড়ল, জামা পড়ে গাড়িতে বসল, গাড়িতে বসার আগে ঘরে তালা লাগাল কেননা সারাদিন সে বাড়িতে থাকবে না। ভালো করে ড্রেসট্রেস দিয়ে চলল, কোথায় চলল? কাজে। কতক্ষণের জন্য কাজ? আট ঘন্টার জন্য। কেন এই আট ঘন্টা পরিশ্রম করবে? যাতে ওই বাড়িটা, যে বাড়িটাতে সে বেশি সময় তালা দিয়েই রাখে, নিজের মালিকানায় রাখতে পারে। ওই গাড়িটার জন্য, যে গাড়িটার প্রিমিয়াম সে এখনও দিয়ে যাচ্ছে সেটা মেটাতে পারে, আর যে জামাটা সে পড়েছে সেই জামাটা যেন আবার কিনতে পারে। যার গাড়ি বাড়ির প্রয়োজনই নেই সে কি করতে আট ঘন্টার পরিশ্রম করতে যাবে। শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তিকে এই প্রকৃতি থেকেই টেনে নেওয়ার কৌশল ধ্যানের মাধ্যমেই আয়ত্ত করা সম্ভব হবে। কিন্তু যেই মুহূর্তে প্রকৃতি থেকে এই প্রাণ শক্তিকে টেনে নিতে চাইবে প্রকৃতিও এই শরীরকে টানতে থাকবে, আর তখনই যত রকমের সমস্যা আসবে। যদি সেই রকম কোন উপায় জানা থাকে যাতে একটা আলাদা শরীর বানিয়ে নিতে পারে, মন কিন্তু সব সময়ই সেখানে থাকবে, কিন্তু এখন যে দেহটা আছে একে ছাড়াই প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারবে, তখন এই শরীরের কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা যারাই আছি, সন্ন্যাসীদের কথা ছেড়েই দিন, যারাই এখানে আছেন সবাই পদে পদে কারুর না কারুর দাসত্ব করে যাচ্ছি। কেউ স্ত্রীর দাস, যারা মহিলা আছেন তারা তাদের স্বামীর দাসত্ব করছেন, নিজেদের বাচ্চাদের দাস, এই সরকারের দাস, সমাজের যত গুণ্ডা বদমাইস আছে তাদের দাস, কর্মক্ষেত্রের মালিকের বা অফিসারের দাস, কোম্পানির দাস, প্রত্যেকেই প্রতি পদে পদে কারুর না কারুর দাসত্ব করে চলতে হচ্ছে। আমরা ক্রীতদাস কেন? কেননা আমরা এই বর্তমান অবস্থাতে বেঁচে থাকার যে এই স্থূল শরীরের উপরেরই নির্ভর করে আছি আর কোন উপায় আমাদের জানা নেই। কিন্তু একবার যদি এর থেকে আরও ভালো উপায় আমাদের জানা থাকে তখন কেন আমরা আর দাসত্ব করতে যাব সেখানে! যাঁরা যোগী তাঁরা এই জিনিষটাই করেন। প্রথমে যত ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খল আছে সব কটাকে খট্ খট্ করে কেটে উড়িয়ে দেন। যাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ককে কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে চাইনা। কিন্তু যোগীরা এই জাগতিক সম্পর্কগুলিকে আগে নষ্ট করে দেন। তাই বলে তাঁরা কি কারুর সাথে সম্পর্ক রাখবেন না? নিশ্চয়ই রাখেন। তাঁর যখন দরকার পড়বে তখন তিনি সবার কাছেই যাবেন, আমার যখন তাঁকে প্রয়োজন হবে তখন আমি তাঁর কাছে গেলে তিনিও আমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। আমরা মনে করি এগুলি পাগলের লক্ষণ, কিন্তু যোগীর কাছে এগুলো তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ। সবাইকেই সমস্ত রকমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে, কিন্তু আমাদের কাছে শেষ বন্ধন এই শরীর। আর এই শরীরে নানান ব্যাধি লেগেই আছে। এখন যদি সেই ক্ষমতা থাকে যে এই শরীর থেকে নিজেকে বের করে এনে আরকেটা শরীরকে নিয়ে নিলেন আর সেইটাকে নিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন আর সেই রোগগ্রস্ত শরীরটাকে কারখানায় পাঠিয়ে

দিলেন সেখানে সারান হতে থাকল। বাড়িতে দুটো কম্পিউটার আছে, একটা খারাপ হয়ে গেলে সেটাকে সার্ভিস সেন্টারে পাঠিয়ে দিলেন আর অন্যটা দিয়ে কাজ করতে থাকলেন।

আমাদের যেটা ব্লুপ্রিন্ট সেটা রয়েছে সূক্ষ্ম শরীরে, আর এই সূক্ষ্ম শরীর ইচ্ছে করলে অতি সহজে যে কোন শরীর নিয়ে নিতে পারে। যোগীর এটিই একটি মস্ত বড় সুবিধা, তিনি তাঁর এই স্থূল শরীরকে যেমন খুশী চালাতে পারেন। স্বামীজীর এই ধরনের একটা ঘটনা আছে। স্বামীজী দেখছেন দুর্গাপূজার সময় সব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা খুব খাটাখাটনি করছে, এই সময় যদি কেউ একটু ভুল-ত্রুটি করে ফেলে আর স্বামীজী যদি খুব বকাবকি করে ফেলেন তাহলে এদের মনে কষ্ট হবে, তাই তিনি পূজার তিন দিন শরীরে জ্বর ডেকে নিয়ে ঘরে পড়ে রইলেন। পূজার তিন দিনই তিনি জ্বরে পড়ে রইলেন। শ্রীশ্রীমা এসে বলছেন ‘বাবা নরেন পূজো শেষ হয়ে গেছে’। স্বামীজী তক্ষুণি বলছেন ‘হ্যাঁ মা, এই আমি জ্বরটাকে ছেড়ে দিচ্ছি’। স্বামীজী ছিলেন সত্যিকারে যোগী, তিনি ইচ্ছে করলেই শরীরে ব্যাধিকে ডেকে নিয়ে আনতে পারেন আবার ইচ্ছে করলেই ব্যাধিকে শরীর থেকে চলে যেতেও বলতে পারেন। আমাদের মত খুব সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিন। কিন্তু এগুলো সবাই মঠে নিজের চোখে দেখেছেন বলে আর অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই আসে না।

রাজযোগে যে অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে, সেই অনুশীলনের অন্যতম প্রধান একটি উদ্দেশ্য আমাদের এই কর্মশয়ে সঙ্ঘত কর্মের বীজকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায়, আর এই কর্মশয়কে নিয়ে কিভাবে দৈনন্দীন জীবনে চলব। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমাদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, একজন ভালো ম্যানেজার হতে গেলে কিভাবে হবে, কিভাবে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে হবে, জীবন-যাপন কিভাবে করতে হবে, মূলতঃ এরা কিন্তু এই কর্মশয়কে নিয়েই অজান্তে আলোচনা করছে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্যে কর্মশয় থেকে যে নানান ধরনের সংস্কার চাড়া মেরে উঠবে তখন তাকে কিভাবে সামলাতে হবে, সেটারই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য হল আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে জানা। অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য থাকে একটা বিশেষ বিষয়ে সফল হওয়া আর তার জন্য আমাকে কিভাবে তৈরী হতে হবে আর সেই তৈরীর পেছনে আমাদের যে আবেগগুলি কাজ করে তাকে কি করে মোকাবিলা করতে হবে সেই ব্যাপারে অবহিত করা। কিন্তু রাজযোগ যে এত কথা বলছে, এত কিছু করতে বলছে তার একমাত্র লক্ষ্য নিজেই জানা।

একবার যদি কেউ বুঝে নেয় আমিই সেই শুদ্ধ চৈতন্য আর শুদ্ধ চৈতন্যই প্রকৃতির মালিক, তখন সে আর জগতের ছোট খাটো জিনিষের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখবে না। জুড়ে রাখাটা বন্ধ করবে কীভাবে? সেটাই এই সূত্রে বলছেন, আমাদের প্রত্যেকের যে কর্মশয়ে কর্মের যে এত পোটলা রয়েছে, এর পেছনে রয়েছে পাঁচটি জিনিষ – অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বेष আর অভিনিবেশ। এগুলোই আমাদের দৃশ্য আর অদৃশ্য জন্মে কাজ করতে থাকে। এগুলো থেকে নিস্তার পাওয়ার একটাই পথ, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া।

পরের সূত্রে বলছেন – **সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।।১৩।।** বৃক্ষের শেকড় যত দিন থাকবে তত দিন সেই বৃক্ষে ফল হতেই থাকবে। আমাদের শরীর মন জুড়ে রয়েছে আমাদের সংস্কারের সাথে। সংস্কারটাই শেকড়। শেকড় আছে মানে ফল আসবেই। এই ফল তিন ভাবে আসে। তার মানে, তিন ভাবে এই কর্মশয় কাজ করে। জাতি দিয়ে ফল আসে, আয়ু দিয়ে ফল আসে আর ভোগ দিয়ে ফল আসে। এখানে ভোগ মানে সুখ দুঃখের ভোগ। জাতি মানে বিভিন্ন প্রজাতি। যেমন ভবিষ্যতে যে জন্ম হবে, হয় সে দেবতা হয়ে জন্ম নেবে কিংবা মানুষ কিংবা কোন পশু বা কীট রূপে জন্ম নিতে পারে। এই জন্মটা নির্ধারিত হয় যার যার কর্মশয়ের দ্বারা। দ্বিতীয় যেটা আসে সেটা হল সে কত দিন বাঁচবে, তার জীবনকাল স্বল্প না দীর্ঘ হবে সেটাও ঠিক করে দিচ্ছে এই কর্মশয়। কিছু মানুষ তাড়াতাড়ি মরে যায়, কিছু মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকে। তৃতীয়, জীবনে কতটা আনন্দ ভোগ আর

কতটা দুঃখ ভোগ করতে হতে পারে, সুখ-দুঃখের ভোগকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে এই কর্মশয়। কেউ খুব দুঃখ কষ্টে পড়লে ভক্তরা বলবে সব ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছার কোন অর্থই হয় না, ঠাকুর কেন কাউকে অযথা কষ্ট দিতে যাবেন! আপনি বলবেন, কেন! ঠাকুরও তো এই রকম কথা বলেছেন, শ্রীমাও এই রকম বলেছেন। আসলে সাধারণ মানুষের জীবন এমনতেই দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ, এরপর তারা নতুন করে আর কোন দুঃখ নিতে পারে না, তাদের সেই সময় কর্মশয়ের কথা বললে কিছই বুঝবে না। দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানুষের মনে বল ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য এগুলো বলতে হয়। সবই যদি ঠাকুরের ইচ্ছাতে হয় তাহলে তো ঠাকুরে মধ্যে বৈষম্য দোষ এসে যাবে। তিনি কাউকে কেন বেশী সুখ দেবেন আবার কাউকে দুঃখ কষ্ট দেবেন? বেছে বেছে আপনাকেই কেন তিনি রাজা করছেন আর আমাকেই বা তিনি ফকির করতে যাবেন? হিন্দুরা এই জিনিস একেবারেই মানবে না। কিন্তু ইসলাম আর খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাবে আমাদের মধ্যে এই ধরণের কিছু উল্টোপাল্টা ধারণা ঢুকে গেছে। ঠাকুর, শ্রীমা যখন এই কথা বলছেন তখন তাঁরা মুর্খদের একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেন। তা নাহলে এটা কেন হল ওটা কেন হল না, এই ভাবে ভাবে তাদের মাথা আরও খারাপ হয়ে যাবে। হিন্দুরা কক্ষণ বলবে না তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা বলা মানে, আমার উত্তর জানা নেই, এর উত্তর কোথায় খুঁজতে যাবো তাও আমার জানা নেই, তার চেয়ে বরং এগুলোর দিকে নজর না দিয়ে তাঁর ইচ্ছা বলে দিয়ে এবার নিজের পথে এগিয়ে যাও। আমরা কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বলে দিয়ে ওখানেই বসে পড়ি, নিজের পথে যে এগিয়ে যেতে হবে এই নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই। রাজযোগ এই ব্যাপারে একেবারে পরিস্কার। তোমার কেন এত দুঃখ-কষ্ট, ওর এত সুখ কেন? সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, তোমার কর্মশয়ই ঠিক করে দিচ্ছে তুমি কোন যোনিতে জন্ম নেবে, তোমার আয়ু কত দিনের হবে আর তোমার সুখ দুঃখের ভোগ কেমন হবে।

এবার যদি কেউ বলে অনেক হয়েছে আর আমি দুঃখ চাই না। খুব ভালো কথা, দুঃখ না চাওয়ার আগে তুমি এইটি ভালো করে বুঝে নাও, তুমি যে দুঃখ পাচ্ছে, তুমি এর আগের আগের জন্মে যা যা করেছ সেইজন্য দুঃখ পাচ্ছে। দুঃখ যদি না পেতে চাও তাহলে এখন থেকে তুমি খাটতে শুরু কর। এবার তুমি খাটতে শুরু করলে। খাটতে খাটতে ওই কর্মগুলো বৃত্তিতে পাল্টাবে, বৃত্তিগুলো সংস্কারে পাল্টাবে। সেই সংস্কার অনেক দিন থাকার পর আবার বৃত্তি রূপে আসবে, ওই বৃত্তিই আবার কর্ম রূপে আসবে। এই পুরো চক্রটা অন্য রকম হয়ে যাওয়ার পর তোমার দুঃখগুলো আস্তে আস্তে সুখে পাল্টাতে শুরু করবে। ঠাকুর তোমার কষ্টের জন্যও দায়ী নন আর সুখের জন্যও দায়ী নন। গীতাতেও ভগবান এই কথা বলছেন *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ*। ভগবান আমাদের অশুভ কিছু দেন না, শুভও কিছু দেন না। তাহলে কী করে সব হচ্ছে? গীতাতেই ভগবান এর উত্তর দিয়েছেন *স্বভাবস্ত প্রবর্ততে*, স্বভাবে চলছে। প্রকৃতির নিয়মে তোমার নিজের কর্মের জন্যই এগুলো চলছে। এখানে মিছিমিছি ঠাকুরকে টেনে আনার কোন মানেই হয় না। ঠাকুর মানে অন্তর্যামী, ঠাকুর মানে শুদ্ধ চৈতন্য। তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

যোগদর্শন বৃত্তি দিয়ে শুরু করে আমাদের কোথায় এনে ফেলছে দেখুন। তোমার যে এখন সুখ আসছে এটা তোমার নিজের জন্য, কাল যদি তোমার দুঃখ আসে সেটাও তোমার জন্যই আসবে। যে পরিবারে তুমি জন্ম নিয়েছ সেটাও তোমার নিজের কর্মের জন্য, এই যে এতদিন বেঁচে আছ এটাও তোমার নিজের কর্মের জোরে। তোমার সংস্কার তোমার জাতি, আয়ু আর ভোগ এই তিনটে তোমাকে খেলিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী বার বার বলছেন, তুমি যে শুভ কাজ করছ, এই শুভ কাজ তোমাকে আজ হোক কাল হোক সুখ দেবেই, অশুভ কাজ করলে তোমাকে দুঃখ দেবেই। জগতে যা কিছু বৈষম্য দেখছি সবই যার যার নিজের কর্মের জন্য। মানুষের কর্ম কেমন তার চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। যোগীরা মানুষের চেহারা দেখলেই বলে দিতে পারেন লোকটির জীবনে সুখ-দুঃখের ভোগ কেমন হবে, লোকটি কত দিন বাঁচবে। কিন্তু যোগীরা এগুলো কাউকে বলতে যান না। বলে দিলে লোকটির জীবনে অনেক সমস্যা তৈরী হয়ে যাবে বলে যোগীরা কিছু বলেন না। আর তাঁরা কারুর কর্মে হস্তক্ষেপও করবেন না। কারণ কর্মের একটা নিজস্ব গতি আছে। কোন যোগী জোর করে কারুর কর্মের গতিকেও পাল্টাতে চাইবেন না, তিনি পাল্টে দিতে পারেন, এমনকি তার ব্যক্তিত্বকেও পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কিছু

দিনের জন্য হলেও তার কর্মের গতি পালেট যাবেই। কিন্তু এর পরিণাম খুব একটা ভালো হতে দেখা যায় না। কারণ কিছু দিন পরে ওর সংস্কার ওর নিজস্ব জাতি, নিজস্ব আয়ু আর ওর নিজস্ব ভোগের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তার মানে, একটা পাথর যার মাটিতে থাকার কথা তাকে আপনি উপরে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সত্যিই তাই হয়, মাটি ছেড়ে পাথর আকাশে চলে যায়। কিন্তু আকাশে কতক্ষণ থাকবে? পাথরকে নীচে নামতেই হবে। আর যখন নামবে তখন গোটা পাথরটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাবে। সেইজন্য যোগীরা কর্মের গতিতে কখনই হস্তক্ষেপ করতে যান না। মানুষ যেখানে যেমন আছে সেই রকমই থাকবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন বিষকীট, বিষকীট বিষেই থাকতে ভালোবাসে। আপনি ওকে ওখান থেকে বার করে আনুন, কিছুক্ষণ পরে মরে যাবে। এই কারণে জাতি, আয়ু আর ভোগে কোন যোগীই হস্তক্ষেপ করেন না। ছেলে মৃত্যু শয্যায়, মা হাউ হাউ করে কাঁদছে আর চেঁচাচ্ছেন ‘মহারাজ! আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান’। কোন যোগী বাঁচাতে যাবেন না। যদি বাঁচিয়েও দেন তাহলে এরপর কোথায় যে কাকে কীভাবে মারবে কল্পনাই করা যাবে না।

কেউ লটারীতে কয়েক কোটি টাকা পেয়েছে। তার কর্মে কিছু ছিল বলে পেয়েছে। আপনি যদি এখন বলেন কর্ম-টর্ম বাদ দিন এটা দৈবাৎ, তখন আপনিও সেই একই কথা বলছেন। স্বামীজীও এটাই বার বার বলছেন। আপনি একে দৈবাৎ বলুন, কর্ম বলুন আর ঠাকুরের ইচ্ছাই বলুন, এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কর্মবাদের বৈশিষ্ট্য হল, অন্যান্য মডেলের থেকে কর্মবাদ অনেক ভালো মডেল, আমাদের জীবনের অনেক কিছুকে কর্মবাদের সাহায্যে খুব সহজে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। এই মডেলের প্রথম ভালো দিক হল, এতে শুভ অশুভ যা কিছুই হোক সেটা মানুষ নিজের উপর নিয়ে নেয়। দ্বিতীয় ভালো হল, কর্মবাদ মানুষকে ভালো করার চেষ্ঠায় নিজের উদ্যমের উপর জোর দেয়।

মজার জিনিষ হল এই যে বলছে *সতি মূলে তদ্বিপাকো* – অনেক বিজ্ঞানীর লেখাতেও দেখা যায় কোন এক কর্মের ফেরে তাদের অনেক গবেষণা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম থিয়োরির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন পলি উড। কোয়ান্টাম থিয়োরিতে তাঁর বিরাট অবদান আছে। জনা দশেক বিজ্ঞানী মিলে এই কোয়ান্টাম থিয়োরিকে দাঁড় করিয়েছেন। থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি যেমন আইনস্টাইনের একক অবদান। কিন্তু কোয়ান্টাম থিয়োরি শুধু একজন বিজ্ঞানীর নয় প্রায় জনা দশেক বিজ্ঞানীর এতে অবদান আছে। পলি ছিলেন পুরোপুরো তাত্ত্বিক। লোকে বলে পলির নামে এমন গুজব ছড়িয়েছিল যে, যদি কোন খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলে আর সেই শহরে যদি পলি হাজির থাকেন তাহলে হয় কোন যন্ত্র ভেঙ্গে যাব, নয়তো আগুন লেগে যাবে, মানে এমন তার কর্ম ছিল যে ওই experiment কোন না কোন ভাবে বিঘ্ন হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এই ব্যাপারে ভীষণ ভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন, এই ঘটনা বিভিন্ন জার্নালে এখনও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এমন হয়েছিল পলি যখন নিজের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা দেবেন, তিনি ল্যাবরেটরিতে কোন মেশিনকে দাঁড় করাতেই পারলেন না। বাইরে থেকে যিনি পরীক্ষক এসেছিলেন তিনি পলিকে ফেল করিয়ে দিয়েছেন। তখন তাঁর প্রফেসররা পরীক্ষককে বলছেন – স্যার, এর মত মেধাবী ছাত্র ইউনিভার্সিটি কোন দিন দেখেনি আর কোন দিন দেখবেও না, আপনি ওকে ফেল করিয়ে এই অবিচার করবেন না, প্র্যাক্টিক্যালে পারে না ঠিকই কিন্তু থিয়োরিতে ওর ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এরপর ওকে পাশ করিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু খুব কম নম্বর দিয়ে, এতো কম নম্বর দিয়েছিল যে পরে কোথাও প্রফেসর হওয়ার সুযোগই পাচ্ছিলেন না। পলির এক বন্ধু ছিল সে আবার প্রচণ্ড Experimentalist, পলির কাছে যখন ওর কিছু জানার ছিল তখন ল্যাবের সব দরজা জানলা বন্ধ করে পলিকে ডেকে ল্যাবের দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখত আর দরজার তলা দিয়ে একটা স্লিপ গলিয়ে দিত, আমার এই জানার আছে তুমি বল, পলি বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, ওখানেই ওর প্রশ্নের উত্তর লিখে আবার দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিত। পলিকে ল্যাবের ভেতর ঢুকতে দেবে না, কারণ জানে ও যদি এই ল্যাবের ভেতর ঢুকে যায় তাহলে তাদের সব Experiment গুলি খারাপ হয়ে যাবে, নয়তো কোন যন্ত্র ভেঙ্গে যাবে অথবা খারাপ হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীদের কাছে এ সবার কোন ব্যাখ্যা নেই, কাকতালীয় বলে এড়িয়ে যাবে। আমাদের কাছে রাজযোগের দৃষ্টিকোণ দিয়ে পলির এই সমস্যাকে ব্যাখ্যা করা খুব সহজ। রাজযোগ বলছে তোমার যে কর্মশয় আছে এই কর্মশয় তিন ভাবে কাজ করে – জাতি, আয়ু আর সুখ-দুঃখ ভোগের মাধ্যমে। আনন্দ বা সুখ ভোগ পূণ্য কর্মের জন্য, যদি কখন ভালো কাজ করে, ধর্ম যদি ভালো থাকে তখন সেটা সব সময় সুখ ও আনন্দ রূপে ফিরে আসবে আর অপূণ্য যদি কিছু করা থাকে তার ফল হবে দুঃখ। যদি কারুর অনেক পূণ্য কর্ম করা থাকে আর সে পরের জন্মে জঙ্গলেও যদি চলে যায়, সেখানেও সুবিধা পেয়ে যাবে, কেউ না কেউ এসে যাবে তার দেখাশোনার জন্য। আর যাদের অনেক অপূণ্য কর্ম থাকে তাহলে সে যদি রাজমহলেও থাকে সেখানেও তাকে বিপদ ও ঝামেলা তাড়া করে বেড়াবে।

কারুর জীবন খুব ভালো করে অনুধাবন করলে দেখা যায় যাদের কর্মে গোলমাল আছে তাদের কিছু না কিছু হতেই থাকবে। এই হতে থাকটা তিন ভাবে কাজ করে – প্রথম হল সে কোন যোনিতে জন্ম নেবে, দ্বিতীয় কতদিন বাঁচবে। অনেক সময় আমরা দেখি সব কিছুই ভালো কিন্তু খুব অল্প বয়সে মারা গেল, আবার অনেকে রোগ-বার্ধক্যেও দিব্যি বেঁচে আছে। আপনার আমার সবার জাতি, আয়ু ও ভোগ কেমন হবে সব কর্মশয়েই ঠিক করা আছে। আর তৃতীয় সুখ-দুঃখ। এখন যত ভালো কর্মই করুক আর পূণ্য কর্মই করুক না কেন, তার ফল কিন্তু এখন পাবে না। উত্তরাখণ্ডে সাধু মহাত্মারা মজা করে বলেন – একটা বড় হাড়িতে রান্না হচ্ছে, জল টগবগ করে ফুটছে, একটা হাতা নিয়ে সেই হাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়া দিয়ে হাতাটা হাড়ি থেকে বার করল। হাতাতে কি উঠবে? হাড়িতে যা দিয়ে রেখেছে সেটাই বেরোবে, যদি চাল দিয়ে থাকে তাহলে চাল বেরোবে, যদি ডাল থাকে ডাল বেরোবে আর যদি আলু পটল দিয়ে থাকে তাহলে আলু পটল বেরোবে। আর যদি কিছুই না দিয়ে থাকে তাহলে কিছুই বেরোবে না, শুধু জলই বেরোবে। আমরা যখনই কোন কাজ করি, কাজ করা মানে কর্মশয়ের মধ্যে হাতাটা চালালাম। যদি আগে থেকে কিছু করা থাকে তাহলেই হাতাতে কিছু পাব। এখন কেউ যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাই বলে কি সে এখনই শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে যাবে? কখনই না। কিন্তু এগুলো এখন চাল, ডাল, আলু, পেপে, করলা হয়ে পড়ছে। এবার হাতাটা যখন ভেতরে দেবে তখন হাতার মধ্যেও আগে থাকতে কিছু লেগে রয়েছে, সেগুলো গিয়েও হাড়িতে পড়ছে। পরের বার যখন হাতাটা মারবে তখন এখন যা কিছু হাড়িতে পড়েছে সেগুলোকে তুলে নিয়ে আসবে।

এগুলো কীভাবে কার্যকর হয়? সেটাই পরের সূত্রে বলছেন **তে হ্লাদপরি তাপফলাঃ পূণ্যা পূণ্যাহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥** জাতি, আয়ু আর ভোগ এগুলো আনন্দও দেয় আবার কষ্টও দেয়। যদি শুভ কর্ম করা থাকে তাহলে সেই কর্মের ফল আনন্দ দেবে আর অশুভ কর্মের যে ফল আসবে তা সব সময় কষ্ট দেবে। সেইজন্য যখনই কোন কাজকর্ম করা হয় তখন এই ব্যাপারটা ভালো করে মাথায় রেখেই কাজকর্ম করতে হবে, শুভ কাজ করলে আজ হোক কাল হোক আমাকে সব সময় সুখদায়ক ফল দেবে আর অশুভ কর্ম সব সময় আমাকে কষ্টদায়ক ফল দেবে। যোগে কল্পনার কোন কিছু নেই, তুমি মানো আর নাই মানো এটা এভাবেই হয়। যদি মানো তাহলে তোমার জীবন শান্তিময় হবে আর না মানলে তুমি কষ্ট পাবে। যাদেরই খুব নাম-যশ আছে, ফিল্মস্টারই বলুন, লেখক, রাজনৈতিক নেতা, খেলোয়াড় যেই হোন না কেন, যখন এদের বিরাট কোন বিপর্যয় আসে তখন মনে হবে এগুলোর কোনটাই যেন তাঁদের প্রাপ্য ছিল না। আইনস্টাইন যেদিন তাঁর থিয়োরি নিয়ে জগতের মাঝখানে হাজির হলেন সেদিন থেকে তিনি সবার ওপরে রয়ে গেলেন, প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে তার বিষয়ে কিছু না কিছু লেখা হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের কাছে আইনস্টাইন হলেন এক আশ্চর্য পুরুষ। এগুলো সবই কর্মের ব্যাপার। আর যাদের সারা জীবন ধরে খুব নাম-যশ, তাদের মধ্যে সব সময় কিছু পূণ্য কর্ম থাকবেই, এনারা খুবই বিনয়ী হন, আইনস্টাইনও অত্যন্ত বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। আর যারা স্বল্প সময়ের জন্য নাম-যশ পান তাদের মধ্যে এই জিনিষগুলি থাকে না। যাদের সারাটা জীবন সফলতা আর নাম-যশে পূর্ণ তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই বিনয়ের ভাব থাকবে, তার মানে তিনি তাঁর পূর্ব জীবন থেকেই এই বিনয়ী ভাবকে বহন করে এনেছেন। আর এটাতে প্রমাণ করে যে তার সফলতা পূর্ব পূর্ব জন্মেও ছিল। যারা সব সময়

দেখবেন বিরক্ত আর ক্রোধের ভাব নিয়ে আছে জানবেন তারা এখনও জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যের মুখ দেখেনি অথবা সে এখনও কোন রকম কোন পূণ্য কর্ম করেনি। দুটোই হতে পারে হয় তার মধ্যে অনেক কর্মই সুপ্ত রয়েছে নয়তো কিছুই কর্ম নেই। কিন্তু যার পূণ্য কর্ম সুপ্ত আছে, তার যদি একবার সাফল্য আসা শুরু হয় সে তখন আস্তে আস্তে আরো সাফল্য পেতে থাকবে। তার মানে তার অনেক পূণ্য কর্ম করা আছে। তাই বলা হয় সুখ, আনন্দ কোথা থেকে আসে? সব সময় পূণ্য কর্ম থেকে আসে। একমাত্র যখন পূণ্য কর্ম করা থাকে তখনই তার ফল সুখপ্রদ হবে। আমরা সুখ বলতে কি বুঝি – নাম-যশ, টাকা-পয়সা, গ্ল্যামার ইত্যাদি, আর এগুলো সর্বদা আমাদের অতীতের পূণ্য কর্মের উপরই নির্ভর করবে। হাওড়া স্টেশনের একজন কুলি আট ঘণ্টা ধরে কাজ করে, কি অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম করে কত টাকা আর আয় করে! অথচ অফিসে বাবুরা কত কম কায়িক পরিশ্রম করে কত বেশী অর্থ রোজগার করছে। এগুলো সবই নির্ভর করে আছে আগের আগের পূণ্য কর্মে।

এটাই ঠিক ঠিক ভারতের ঐতিহ্য। আমি নির্ধন হই আর ধনী হই, আমি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে রয়েছি কিংবা সুখের মধ্যে আছি, আমি যা কাজ করছি সবই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি যে কাজই করছেন তাতেই সাফল্যের মুখ দেখছেন, তাহলে এর জন্য কে দায়ী? অপর কেউই দায়ী নয়, আমি নিজেই সব কিছুর জন্য দায়ী। কাউকেই এর জন্য কোন ভাবেই দায়ী করা যাবে না। তুমি আগের আগের জন্মে এমন এমন কর্ম করেছ যার জন্য তুমি আজ এই অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছ। আর তুমি যদি এখন থেকেই এই কর্মকে ঠিক করতে থাক তাহলে আগামী দিন থেকে তোমার এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু হবে। দুঃখ-কষ্ট, আপদে-বিপদে সব ব্যাপারেই ভগবানের কাঁধে দোষ চাপিয়ে বলি ভগবান আমার সহায় নন, ভগবান যদি আমাকে সত্যিই মেরে থাকেন, তাহলে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম আর এই যোগদর্শনকে বলা হয় Optimistic Religion। হিন্দু ধর্মকে যখন অনেকে Pessimist Religion বলে, তখন কিছু না জেনেই বলা হয়। হিন্দু ধর্ম highly Optimist Religion। যদি আমি এখন কোন সমস্যার মধ্যে পড়ি, এই সমস্যা আমিই তৈরী করেছি। আমিই যখন তৈরী করেছি, তখন আমিই আবার পারব এর সমাধান করতে, রাজযোগ আমাদের এই কথাই বলছে।

আমাদের পরম্পরাতে যে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার সমস্ত শাস্ত্রে ছড়িয়ে রয়েছে, সবটাই ধ্যানের গভীর থেকে উঠে এসেছে। ধ্যানের গভীরে গেলেই প্রকৃত সত্যকে জানা যায়। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা আজকে চিন্তা করে যে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করছে, আগামীকালই আরেকজন তাত্ত্বিক তার মন বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করে আগের তত্ত্বটাকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে দিচ্ছে। ভারতীয় সমাজে এ ধরনের চিন্তা ভাবনার কোন মূল্যই নেই। কারণ চিন্তা ভাবনা করছে মন আর বুদ্ধি, কিন্তু আমাদের কাছে মন বুদ্ধি জড় বস্তু মাত্র, চৈতন্যের কাছে জড় কিছুই নয়। মন জড় হওয়াতে সে বেশি দূর যেতে পারে না, মনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ভারতের মুনি ঋষিরা কখনই কেউ বলবেন না যে চিন্তা ভাবনা করাই জ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায়। ভারতের মুনি ঋষিরা জানতেন বই পড়া, কথা বলা, চিন্তা ভাবনা এগুলো জ্ঞান লাভে বেশি সহায়ক নয়; প্রকৃত জ্ঞান আসে কেবল মাত্র ধ্যানের গভীর থেকে।

একটি বাচ্চা কোন দিন বড় হতে পারছে না। স্কুলে পড়ছে। সক্রোটস থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় দার্শনিকরা একে একে এসে তাকে পড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এখন প্রথম শিক্ষক এসে পড়িয়ে গেলেন। পরের শিক্ষক এসে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি কি জান। ছেলেটি প্রথম শিক্ষকের কাছে যা যা শিখেছিল সব বলল। তিনি শুনে বললেন – ও সব ফালতু জিনিষ, তুমি কিছুই শেখোনি। তখন তিনি তাকে আবার নতুন করে শিখিয়ে গেলেন। বেচারি ছেলেটি সব মুখস্ত করে নিল। এর পর তৃতীয় শিক্ষক এলেন। তিনিও আগের মত বললেন তুমি যা জান সব ফালতু। এইভাবে এক একজন করে শিক্ষক আসছেন, আর তার আগের শিক্ষক যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন তার সবটাই ফালতু বলে উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এখন বেচারি ছাত্রটি কোনটাকে প্রকৃত সত্য বলে জানবে! গত পঞ্চাশ বছর ধরে পাশ্চাত্যের সর্ব ক্ষেত্রে, ভৌতিক বিদ্যা থেকে শুরু করে দর্শন সবতেই এই ব্যাপারটাই হচ্ছে,

একজন এসে একটা থিয়োরি নিয়ে আসছেন, তার কিছু দিন বাদে সেটাকেই তুলোধুনো করে মিথ্যা প্রমাণ করে আরেকটা থিয়োরি চলে এল, আর প্রত্যেকেই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাচ্ছেন। বায়োলজিতে একজনকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল, তার সাত বছর পরে আরেকজনকে বায়োলজিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল যিনি আগের থিয়োরীটাকে ভুল প্রমাণ করে দিলেন, যেটার জন্য সাত বছর আগে আরেক জনকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল। আজকে যেটা ওরা বলছে, দুদিন পরেই আরেক জন এসে সেটাকে ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছেন।

কিন্তু যোগে এই ধরণের কোন সমস্যাই হয় না। যোগ বলছে – তুমি ধ্যান কর, ধ্যানের মধ্যেই তুমি প্রকৃত জ্ঞান পেয়ে যাবে, তুমি যা জানার সব ধ্যানের গভীরেই পেয়ে যাবে। আমরা এখানে কর্মশায়কে নিয়ে আলোচনা করছি। কর্মশায় কি করে? কর্মশায় সুখ-দুঃখের ফল প্রসব করে। সুখ আর দুঃখ মানে পূণ্য আর অপূণ্য কর্মের ফল। সেইজন্য শাস্ত্র যেটাকে পূণ্য কর্ম বলছে সেই কর্মই করতে হবে আর শাস্ত্র যেটাকে অপূণ্য কর্ম বলছে সেই কর্ম করতে নিষেধ করা হচ্ছে। যোগীরা পাপ শব্দ কখন ব্যবহার করেন না, এনারা পূণ্য আর অপূণ্য এই দুটি জিনিষকে মানবেন। যদি কেউ নিরপেক্ষ কর্ম করে, ধরুন একজন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ঠিক করল আজ সারাদিন আমি খবরের কাগজটা কাঁচি দিয়ে কাটতে থাকব। সারাদিন ধরে কাগজ হাজার হাজার টুকরো করতে থাকল। এখন এটা পূণ্য কর্ম না অপূণ্য কর্ম? এই কর্ম অবশ্যই অপূণ্য কর্ম মাত্র, এই ধরণের কাজ তাকে কোন ব্যাপারে কিছুই সাহায্য করবে না। পাপ কর্ম যেটা করা হয় সেটাকেও বলছে অপূণ্য কর্ম। সুখ দায়ক, আনন্দ দায়ক যা কিছু আসে, সব আসে শুধু মাত্র পূণ্য কর্মের দ্বারাই। কেউ যদি রোজ এই ভাবে খবরের কাগজ কাটতে থাকে তাহলে কিছু দিন পরে তার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে।

এখানে সুখ আর দুঃখের কথা বলা হল। তারপরেই বলছেন – **পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখেৰ্ণবৃত্তিবিরোধেচ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।।১৫।।** এই সূত্রটি যে কোন ধর্মের মূল ভাব। যারা ঠিক ঠিক বিবেকী তারা সবটাই দুঃখ দেখেন, সুখটাকেও দুঃখ রূপে দেখেন। কিছু আছে যা প্রথমেই দুঃখ দেয়, আবার কিছু জিনিষ এখন ভালো লাগছে কিন্তু পরে গিয়ে দুঃখ দিচ্ছে। টাকা উপার্জন করতে কত পরিশ্রম করতে হয়। মানুষ তার সন্তানকে বলে ‘জানো বাবা! রক্ত জল করে টাকা আয় করতে হয়েছে’। এখন না হয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উন্নত হয়ে গেছে, কিন্তু আগেকার দিনে টাকা জমিয়ে রাখা ছিল মারাত্মক যন্ত্রণা। কারণ চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে, ডাকাতি হয়ে যেতে পারে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা এসে টাকা চাইবে। এখন আবার অবশ্য ইনকাম ট্যাক্সের ভয় আছে। তারপর যখন টাকা হাত থেকে বেরিয়ে যায় তখন আবার কষ্ট হয়, আমার হাত থেকে এতগুলো টাকা চলে গেল! সেইজন্য বলছেন, বিবেকী পুরুষরা জানেন, এখন যে সুখ পাচ্ছি প্রথমেও সেই সুখ কষ্ট দেবে, যখন সুখ চলছে তখনও কষ্ট দেবে, আর তা শেষ হওয়ার পরেও কষ্ট দেবে। জ্ঞানীরা সবটাই কষ্ট দেখেন।

স্বামীজী এখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন ‘চতুর্দিকে মূর্খদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পণ্ডিত – শুধু আমরাই মূর্খশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। সর্বপ্রকার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালোবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালোবাসা’। আমার আপনার সবারই চারিদিকে শুধু মূর্খদের বাস। আপনি যাকে মহামূর্খ মনে করছেন সেও মনে করে তার চারিদিকে মূর্খরাই ঘুরছে। এই ভাবনাটা আমাদের প্রকৃতিতেই আছে। আসলে সবাই মূর্খ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মত কজনই বা আছেন। কিন্তু স্বামীজীকে কি লোকেরা মূর্খ মনে করত? কখনই না। কিন্তু স্বামীজীর দিদিমা, স্বামীজীর বাড়ির লোকেরা তাঁকে মূর্খ মনে করছেন। দিদিমা স্বামীজীকে মূর্খ মনে করছে বলেই বলছেন ‘নরেন! অনেক তো হল, এবার তুই একটা বিয়ে কর’। তার মানে, তুমি যে সন্ন্যাসী হয়ে জীবন যাপন করছ তাতে তোমাকে আমি মূর্খই মনে করছি। এখানে সম্পর্কের কথা ভুলে যান, দিদিমা বা মার কথা ভুলে গিয়ে ভাবুন, একজন মহিলা এক সন্ন্যাসীকে বলছেন, যে সন্ন্যাসী পুরো আমেরিকা আর ইউরোপ তোলপাড় করে দিয়ে এসেছেন, এখনও যাঁর চিন্তা ভাবনা পুরো জগৎকে নাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই সন্ন্যাসীকে বলছেন – অনেক তো হল এবার তুই একটা বিয়ে কর। মহিলা

নিজেকে বুদ্ধিমান আর নরেনকে মূর্খ ভাবছেন বলেই এই কথা বলতে পারছেন। সংসারে একটি লোক পাওয়া যাবে না, যে নিজেকে মনে করে না তার মত বুদ্ধিমান জগতে আর কেউ নেই আর পুরো জগৎটা মূর্খের দল। একটা বাচ্চা ছেলেও মনে করে আমার বাবা-মা মহামূর্খ। আশ্চর্য হল, আমি মনে করছি আপনারা সবাই মূর্খ আবার আপনিও মনে করছেন সবাই মূর্খ, আপনার সেই মূর্খদের দলে আমিও আছি। এই জিনিষ শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে সবারই প্রতি আমাদের এই একই দৃষ্টিভঙ্গী। সন্ন্যাসীরা মনে করেন যারা বিয়েথা করে সংসার করছে তারা অতি মূর্খ বলেই সংসার করছে। আবার সন্ন্যাসীর বাবা-মায়েরা মনে করছেন আমার ছেলে মহামূর্খ। অনেকে হয়তো বলবেন আমি সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করি। কোন সন্দেহই নেই যে অনেকেই সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর অনেক ব্যাপারে তাঁরা মনে করে উনি এত বোকা লোক! সন্ন্যাসীকেও এমন অনেক কিছু করতে হয় যেটা নিরুপায় হয়েই তাঁকে করতে হয়, সেখানে আমরা ভাবছি সন্ন্যাসী কি বোকা! কিছু করার নেই, কারণ আমরা এমনই জৈব উপাদান দিয়ে তৈরী যার জন্য সব সময় আমরা নিজেকে পণ্ডিত আর অপরকে মূর্খ ভাববই।

জর্জ বার্গাড'শ এক কোম্পানীর অফিসে চাকরী করতেন, কিন্তু ওনার চাকরীটা ভালো লাগতো না। সেখানে তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন যিনি খুবই শান্ত আর চুপচাপ থাকতে ভালোবাসতেন। একদিন তিনি জর্জ বার্গাড'শকে বলছেন 'জানো! জগতে সবাই মনে করে সে একজন ব্যতিক্রম'। দুনিয়ার সব প্রেমিক প্রেমিকারাও বলে তোমার আমার ভালোবাসা একটা বিশেষ ভালোবাসা, এই ভালোবাসা আগে কোন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দেখা যায়নি। ঠিক এভাবেই ওই লোকটি বার্গাড'শকে বলছেন সবাই মনে করে জগতে আমি একজন বিশেষ কিছু। বার্গাড'শ লিখছেন 'শুনে আমি চমকে উঠেছি, লোকটি কী বলছে! আমিও তো চিরদিন নিজের ব্যাপারে এটাই ভেবে এসেছি'। আমাদের এখানে যাঁরা শাস্ত্র শুনছেন তাঁরা মনে করছেন আমি একজন বিশেষ কারণ আমি Spiritual Heritage এর ক্লাশ করি আর যারা অফিসে মুখ গুঁজে কাজ করছে তারা মূর্খ। এই ভাবনাই আমাদের জীবনে অশেষ কষ্টের কারণ। নিজেকে ওস্তাদ মনে করে ভাবছি 'এটা কোন ব্যাপারই নয় আমি ঠিক ম্যানেজ করে বেরিয়ে আসব'। তারপরেই মরে। ঠাকুর বলছেন 'যত সেয়ানাই হও না কেন, কাজলের ঘরে ঢুকলে দাগ লাগবেই'।

বৈরাগ্য কোথা থেকে শুরু হয়? যখন জগৎ থেকে ক্রমাগত প্রচণ্ড আঘাত পেতে শুরু করে। যাকে আমরা সব থেকে ভালোবাসি তার কাছ থেকেও যখন প্রত্যাখ্যানরূপী আঘাত আসতে থাকবে তখন বৈরাগ্য আসবে, তার আগে নয়। ভর্তৃহরি ছিলেন একজন রাজা। ভর্তৃহরি রানীকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন একটি খুব দামী মুক্তার নেকলেস রানীকে ভালোবেসে উপহার দিলেন। অন্য দিকে রানীর আবার মন্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ছিল। তিনি রাজার দেওয়া মুক্তার হার মন্ত্রীকে উপহার দিলেন। মন্ত্রী আবার একটা বেশ্যার প্রতি আসক্ত ছিল। ওই হার মন্ত্রী বেশ্যাকে দিয়েছে। বেশ্যাটি আবার রাজা ভর্তৃহরির প্রতি প্রচণ্ড অনুরক্ত ছিল। এবার মুক্তার নেকলেস ঘুরে রাজার কাছেই ফিরে এসেছে। মুক্তার হার দেখে ভর্তৃহরি স্তম্ভিত হয়ে বলছে 'এই কী জগৎ!' সেই মুহূর্তে ভর্তৃহরির মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। এই রকম চড় খাপ্পড় যখন জগৎ থেকে খাবে তখনই জগতের প্রতি বৈরাগ্য আসতে শুরু করবে। নিবেদিতাকে স্বামীজী বলছেন – Tell me Margaret how much you have suffered then I will tell you how great you are। সংসারের তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার আঘাত যতক্ষণ না কাউকে মাটিতে ধরাশায়ী করছে ততক্ষণ তার মধ্যে বৈরাগ্য আসবে না। বৈরাগ্য এসে গেলে প্রথমেই সে ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বেরিয়ে আসে। ঠাকুরকে একজন বলছেন রাজা জনকও তো সংসার করেছিলেন। ঠাকুর শুনে খুব অসম্ভব হয়ে বলছেন – এর আগে রাজা জনক হেঁটমুণ্ড হয়ে কত তপস্যা করেছিলেন! তপস্যার সময় তো জনক ইন্দ্রিয় সুখ থেকে অনেক দূরেই ছিল। এই কথা শুনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলবেন আমরাও তো ইন্দ্রিয় সুখ ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে বিচার করে ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়তে হয় না, প্রকৃতিই ছাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতি যেটা ছাড়িয়ে দিয়েছে ওই ত্যাগ ত্যাগ নয়। ত্যাগ বৈরাগ্যের অনুশীলন অনেক কম বয়সে শুরু করতে হয়। ইন্দ্রিয় আর মনের ক্ষমতা যখন থাকে তখন যদি ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করতে পারে তবেই এগোতে পারবে।

ভগবান বুদ্ধ বলছেন – সর্বং দুঃখম্। ভগবান বুদ্ধের এই সর্বং দুঃখম্ এর সমালোচনা করে অনেকে বলে – বুদ্ধ চারিদিকে খালি দুঃখই দেখে গেছেন। ভগবান বুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা এই কথা বলে তারা রাজযোগের এই সূত্রটাকে ছেড়ে গেছে। শুধু ভগবান বুদ্ধই নন, কেবল যোগদর্শনেই নয়, মানব জীবনের ধর্ম শুরুই হয় দুঃখ দিয়ে। যদি কারুর মনে হয় আমার সব কিছুই ভালো আছে, আমার সব কিছু ভালোই চলছে, ধর্ম তার জন্য নয়। স্বামীজী পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন Religion begins with tremendous dissatisfaction with present state of affairs। সেইজন্য যিনি বিবেকী পুরুষ তিনি সবটাই দুঃখ দেখেন, সুখটাকেও দুঃখ দেখেন, দুঃখটাকেও দুঃখ দেখেন। জন্ম নিলাম দুঃখ, বড় হচ্ছে দুঃখ, বিয়ে হচ্ছে, সন্তান হচ্ছে সব দুঃখ। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও একই কথা বলছেন – জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্। কিন্তু তাই বলে কি সুখ নেই? সুখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সুখই জন্ম দিচ্ছে ভবিষ্যতের দুঃখকে। তাহলে দুঃখটা কি? দুঃখ হচ্ছে চিন্তবৃত্তি নিরোধের সব থেকে বড় বাধা। তাই আজ যে সুখ ও আনন্দ আমি ভোগ করছি, আগামীকাল সেটাই দুঃখে পরিণত হবে, আর সেই দুঃখই যোগের সব থেকে বড় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে। তাই বলা হচ্ছে সুখ ও দুঃখ এই দুটোকেই তুমি পরিত্যাগ কর। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পুণ্য-অপুণ্য থেকে বেরিয়ে এসো। উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ সবাই এই একটি কথাই ঘুরে ঘুরে বারবার বলতে চাইছেন ভালো-মন্দের পারে চলে যাও। মুক্তি মানে ভালো কিছু হয়ে যাওয়া নয়, মুক্তি মানে সব কিছুর ভালো-মন্দের পারে চলে যাওয়া। সুখ পাওয়াটা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়, সুখ-দুঃখের পারে যাওয়াটাই জীবনের উদ্দেশ্য। সুখ-দুঃখের জন্ম পুণ্য-অপুণ্য থেকে, পুণ্য-অপুণ্যের জন্ম কর্মশায় থেকে, আর কর্মশায়ের মা হল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। সবার মূলে অবিদ্যা।

সাধক সাধনা করতে করতে দেখে, তাইতো, জগতে সুখ বলে কিছু নেই। তখন এই জগতে যত রকমের গভীর ভালোবাসা হতে পারে – বাবা-মার ভালোবাসা, সন্তানের ভালোবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা, বন্ধু বান্ধবদের ভালোবাসা, সব যেন জঞ্জাল মনে হয়। এই বোধ যখন আসে তখন ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এসে গেল। তাহলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আমার মধ্যে এসেছে কি করে বুঝব? যখন আমি মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছি যে এই জগতে শুধু দুঃখই আছে, আর যত রকমের এই আপাত সুখ দেখছি, ভালোবাসা দেখছি সব অনিত্য, এই অবস্থা যখন কারুর হয় তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে সত্যিকারের বৈরাগ্য এসেছে।

কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষ যদি দেখে এই জগতে এমন কেউ নেই যাকে সে ভালোবাসতে পারছে, জগতে এমন কেউ নেই যে তাকে ভালোবাসতে পারে তবে তো সবাই পাগল হয়ে যাব। এই জগতে কেউই ভালোবাসা ছাড়া বাঁচতে পারেনা, ভালোবাসা না পেলে আর কাউকে ভালোবাসতে না পারলে আমাদের স্থান হবে পাগলা গারদে। তাহলে কেন বলা হচ্ছে যে সব ভালোবাসাকে জঞ্জাল মনে করতে? কারণ ভালোবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে একমাত্র বৈরাগ্যবান যোগী আর বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী। বৈরাগ্য একমাত্র তখনই আসবে ভালোবাসার সব উৎস গুলিকে যখন ছিন্নভিন্ন করে সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে দু হাত উপরে তুলে মন প্রাণ দিয়ে বলতে পারবে ‘হে ভগবান! এই জগতে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই’। কেউ যদি সন্ন্যাসী বা যোগী না হন, আর যদি কাউকে সে ভালোবাসতে না পারে আর যদি ভগবানকেও না ধরে রাখতে পারেন তাহলে তার জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ, রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াবে। সেইজন্য জীবনকে ধরে রাখার জন্য অনেকে কুকুর, বেড়াল, পাখি পুষে একাকীত্বকে সরিয়ে রাখে, পোষা জীবজন্তুকে অবলম্বন করে ভালোবাসাটা মিটিয়ে নেয়। তাই বলা হয় সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের পথ পুরো আলাদা। A thing that will make you mad that may be thing makes a saint a saint.

এই সূত্রে বললেন যখন মানুষ সত্যি সত্যিই দেখে এই জগতে চিরন্তন সুখ বলে কিছু নেই এবং শুধু দুঃখ আর দুঃখই, দুঃখ ছাড়া জগতে কিছু নেই, তখন মানুষের মধ্যে ত্যাগের বহিঃশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। এই সূত্রের আগের সূত্রে বললেন যখন বাজে জিনিষগুলো ত্যাগ করে দিচ্ছে তখন তার কর্মগুলো

ভালো হতে শুরু করে। কর্মশায় যদি ভালো হতে শুরু করে তাহলে জাতি, আয়ু আর ভোগ পাল্টাতে শুরু হয়ে যায়। এইভাবে যেতে যেতে যোগ এবার আমাদের আসল জায়গায় টেনে নিয়ে এসেছে যেখানে মূল ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মূল কথা একটাই, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ না হচ্ছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবনে এগোনের কোন সম্ভবনা নেই। সেটাই এই পনের নম্বর সূত্রে এসে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হল।

মানুষ কোথাও একটা নোঙর ফেলতে চাইছে। কারুর জীবনে যদি নোঙর ফেলার জায়গা না থাকে তাহলে সারাটা জীবন সে শুধু কষ্টই পাবে। তাই কোথাও একটা নোঙর ফেলতে হয়। আমরা ভুল করে নিজের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, টাকা, গাড়ি, বাড়িকে সব থেকে নিরাপদ নোঙর ফেলার জায়গা ভাবছি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না যে এগুলোর নিজেরই নোঙর দরকার। তার নিজের যেমন একটা নোঙর দরকার তেমনি তার বউএরও একটা নোঙর দরকার, তার ছেলেরও একটা নোঙর দরকার। ধরুন গঙ্গা দিয়ে চারটে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। এবার কোন একটা নৌকার যদি নোঙর ফেলতে হয় সে তার পাশের নৌকাতে নোঙর ফেলছে। কিন্তু সেই নৌকাও তো গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছে, সেতো নোঙর ফেলা নৌকাকেও টেনে নিয়ে চলে যাবে। সে কি নোঙর ফেলার আগে দেখেছে যেখানে আমি নোঙর ফেলছি সেটি ডাঙা কিনা? ঠিক তেমনি আমরা যেখানে নোঙর ফেলছি সেটা নিজেই স্থির নেই, কালের গতিতে বয়ে চলেছে, সে আমাদের কী করে ধরে রাখবে! এই যে বলা হয় অনিত্যে নিত্য বোধ, এটাই মায়া। যেটা কালের গতিতে প্রবাহিত হয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে, আমি মনে করছি তার মধ্যে নোঙর ফেলে দিলে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু সেতো নিজেই আমাদের টেনে নিয়ে চলে যাবে। আমরা মনে করছি এই জগতে, এই সংসারে চিরস্থায়ী সুখ পাবো। যতক্ষণ নাতির চাঁদমুখ দেখে শান্তি পাচ্ছে, যতক্ষণ নিজের স্ত্রীকে, নিজের স্বামীকে দেখে আনন্দ হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু গোলমাল চলতেই থাকবে। এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই কথাই বলছেন *দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ*। বিবেকী পুরুষের কাছে জগতের সবটাই দুঃখ। সেইজন্য মানুষ যখন বুঝে নেয় এই জগতে কোথাও আমি সুখ পাবো না তখন সে ঈশ্বরের দিকে যায়। ঈশ্বরের দিকে যাওয়া মানে আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

এত কিছু বলার পরে বলছেন – *হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥১৬॥* দ্যাখো বাপু যে দুঃখ তোমাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে আর যে দুঃখ তোমার জীবনে এসে গেছে, এটাকে আর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু যে দুঃখটা অনাগত, ভবিষ্যতে তোমার উপর আছড়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে এটাকে আটকান যায়। আগামী দিনে মন্দ যেটা হবে সেটাকে আটকানোর ক্ষমতা ও উপায় তোমার হাতে আছে। কোনটা? *দুঃখম্ অনাগতম্*। যেটা এখন আসেনি, যেটা আগামী কাল থেকে কাজ করতে শুরু করবে এটাকে আটকাও। যোগী বলছেন তোমার কপালে যে দুঃখটা আছে সেটাকে তুমি আটকাতে পারবে না, কিন্তু তার তীব্রতাকে একটু কম করে দিতে পার। শ্রীশ্রীমা যেটা বলছেন – যেখানে ফাল লাগার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটবে। কিছু না কিছু ফুটবেই, কর্ম তোমার কিছু ভোগ কমিয়ে দেবে। মানে এটাও কাজ করবে ওটাও কাজ করবে। বাতিল কোনটাই হয়না, সংস্কারকে কখন খণ্ডন করা যায় না। কেননা যদি এই ভাবে খণ্ডন করা যেত তাহলে কর্মশায় বলে কিছু থাকতই না। যখন ঠাকুরের জপধ্যান করছে, ঈশ্বরে যখন নিজেকে সমর্পণ করে দিল তখন এটাও আসবে ওটাও আসবে, এ এক রকম ধাক্কা মারবে, ও আরেক রকম ধাক্কা মারবে, কিন্তু পুরোটা খণ্ডন কখনই হয় না। কারণ এই কর্মশায়, সবটাই যদি খণ্ডন হয়ে যেত তাহলে কর্মশায় বলে কিছু থাকত না। তাই বলছেন এই জন্মে তুমি বাপু বাঁচবে না, কিন্তু পরের পরের যে জন্মগুলো আসছে সেই জন্মের কর্মগুলো আটকানো যায়। কি ভাবে আটকানো যায়? এই নিয়েই পুরো রাজযোগ।

এই সূত্রের মূল বক্তব্য হল, তোমার যেটা হওয়ার হয়ে গেছে, সেখানে আর কিছু করা যাবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যেটা আসার অপেক্ষায় আছে সেটাকে আটকানো যায়। যদি আমাদের বলা হয় সামনে তোমার জীবনে বিরাট ঝামেলা আসছে। আমার তখন একটাই জানার আছে। বলুন এই ঝামেলা থেকে বাঁচার কী উপায় আছে? যোগশাস্ত্র এটাই বলছে, তোমার একটি দুঃখ নয় অনেক দুঃখ আসছে, ওই

দুঃখগুলোকে এখন থেকেই আটকাও। আমাদের কর্মবাদে অনেক রকম মত আছে। যেমন বলা হয়, ধনুকে তীর সন্ধান করা হচ্ছে, এর আগে একটা তীর চালান হয়ে গেছে, আরেকটা তীর এর আগে লক্ষ্য ভেদ করে দিয়েছে আর কিছু তীর তুনিরে জমা হয়ে আছে। যে তীরগুলো ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে সেখানে কিছু করার নেই, কিন্তু যে তীরটা সন্ধান করা হয়েছে সেটাকে ধনুক থেকে নামিয়ে রাখা যায়, আর তুনির থেকে তীরগুলো ফেলে দেওয়া যায়। এগুলো উপমার সাহায্যে কর্মবাদের একটা মতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আসলে এগুলো সবই বুদ্ধির খেলা। বুদ্ধি থাকলে আপনিও অনেক উপমা দিয়ে অনেক কিছু নামিয়ে দিতে পারবেন। তবে মূল কথা হল যোগশাস্ত্র এইসব মতবাদের দিকে যাচ্ছে না, কোনটা ফলীয়মান, কোনটা ক্রিয়মাণ, কোনটা সঞ্চিৎ কর্ম এগুলোর কোনটাতেই যাবে না। যোগের কাছে খুব সহজ বক্তব্য, *হেয়ং দুঃখমনাগতম্*, যে দুঃখগুলো আসছে সেগুলো আটকানো যায়। কীভাবে? সেটাই পরের সূত্রে বলছেন।

দুঃখের মূল

সব দুঃখের মূলে হল দ্রষ্টা আর দৃশ্যের সংযোগ। এটাই পরের সূত্রে বলছেন – *দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ* ১১৭।। দুঃখের মূল হল দ্রষ্টা আর দৃশ্যের সংযোগ। এই সংযোগটা কেটে দাও সব দুঃখের অবসান হয়ে যাবে। খুব সামান্য কারণ, কিন্তু তাতেই হাজার রকমের সমস্যা। পুরুষ দ্রষ্টা, আর প্রকৃতি দৃশ্য। পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সাথে এক মনে করছে। এখানে প্রকৃতির কোন ব্যাপারই নেই, সে নিজের মত আনন্দে আছে। প্রকৃতির এই ব্যাপারে কোন মাথা ব্যাথাই নেই। কিন্তু কেন পুরুষ প্রকৃতির কাছে যায় আর কেন সে প্রকৃতির সাথে নিজেকে এক করে ফেলে আমরা কেউই জানিনা। কিন্তু পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সাথে এক করে নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছে। আর তাতেই যত রকমের সমস্যা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তুমি কি মানছ যে তোমার দুঃখ আছে? হ্যাঁ আমি মানছি। তুমি কি মানছ যে এই সুখ আর দুঃখ একই গাছের ফল? হ্যাঁ মানছি। এটা থেকে বাঁচতে চাও? হ্যাঁ চাই। তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এটা কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে এসেছে এসব ব্যাপারে অযথা প্রশ্ন করে মাথা ঘামিও না। কেন তুমি মাথা ঘামাবে না? তোমার উদ্দেশ্য হল এই দুঃখ থেকে কিভাবে বেরোনো যায়।

এই দৃশ্য আর দ্রষ্টার মধ্যে কি কি হয়, আর কিভাবে সব হয়? বলছেন প্রকৃতি তিন ধরণের – প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতি, এই তিনটিকেই বলা হয় সত্ত্ব, রজো আর তম। যদিও পরের সূত্রে এটাকেই আরও বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সত্ত্ব, রজো আর তমো আদিত্তে সাম্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে এই সাম্য অবস্থার মধ্যে আলোড়ন তৈরী হয়। সাম্য অবস্থা নষ্ট হয়ে যেতেই তারপর সেখান থেকে সৃষ্টির কার্য শুরু হয়। প্রথমে আসে মহৎ, তারপর সেখান থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে পঞ্চ তন্যাত্রা ইত্যাদি। তখন কি হয়, পুরুষ এই খেলাই দেখতে থাকে আর তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়। খুব ভালো জমাটিয়া কাহিনীর সিনেমা যখন আমরা দেখতে থাকি, তখন অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে কখন সে সিনেমার ঐ চরিত্রগুলোর সাথে আমরাও একাত্ম হয়ে যাই টেরই পাই না, আর আমরা সত্যি সত্যিই নিজদের হারিয়ে ফেলি, বুঝতেই পারিনা আমরা কোথায় আছি। পুরুষেরও ঠিক এই অবস্থাই হয়।

এটা খুবই আশ্চর্যের যে যাদের কাছ থেকে আমরা সুখ পাচ্ছি, তার যে কি পরিমাণ দুঃখ আমাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। জীবন থেকে এরা যদি সরে যায় কিছু দিন পর মনে হয় কী শান্তি পেলাম। চিলের মুখ থেকে মাছ পড়ে গেলে চিল যেমন শান্তি পায়, এরা আমাদের জীবন থেকে সরে গেলে চিলের মত শান্তি পাই। তাহলে অশান্তির মূলে কী? দ্রষ্টা আর দৃশ্যের সংযোগ। দ্রষ্টা মানে পুরুষ আর দৃশ্য মানে প্রকৃতি। পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগই সব দুঃখের মূল। যে মুহূর্তে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে সব দুঃখের অবসান হয়ে যাবে, আর কোন দুঃখই থাকবে না। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ঠাকুরের হাত ভেঙে গেছে, কোন দুঃখ নেই। ঠাকুরের ক্যাম্পার হয়েছে, কোন দুঃখ নেই। কারণ ঠাকুর দ্রষ্টা আর দৃষ্টের সংযোগ কেটে দিয়েছেন। আলেকজান্ডার সেই ব্রাহ্মণকে বলছে ‘তুমি যদি আমার সাথে না যাও তাহলে তোমার গলা কেটে দেব’।

ব্রাহ্মণ বলছে ‘জীবনে তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা বলোনি’। ব্রাহ্মণ দ্রষ্টা আর দৃশ্যের সংযোগ কেটে দিয়েছেন – তোমার দুঃখে আমি আর দুঃখী হতে যাচ্ছি না। এই শরীরের সঙ্গে মন জড়িয়ে আছে, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় জড়িয়ে আছে। আমাদের একটা ইন্দ্রিয় যদি খারাপ হয়ে যায়, তাতেই আমরা ভেঙে পড়ি। ধরুন কারুর চিংড়ি মাছ খেলেই শরীর খারাপ হয়। বেচারী চিংড়ি মাছ খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসে। চিংড়ি মাছ খেলে পেট খারাপ হয়ে গেলে তার কী দুরবস্থা হবে! খারাপ হচ্ছে পেট, পেটের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে মনের। ইন্দ্রিয়, মন আর দেহ এরা একটা গ্রুপ। চিংড়ি মাছ খেয়ে যে সুখ পাচ্ছিল সেই সুখটা না পেলে মন তো খারাপ হওয়ারই কথা। মাঝখান থেকে পুরুষ মনের দুঃখ দেখে কাঁদছে। অথচ মনের সাথে পুরুষের কোন সম্পর্কই নেই। একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবেসেছে, মেয়েটির আবার একটা পোষা কুকুর আছে। এখন ছেলেটি সকাল বিকেল কুকুরকে নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু করার নেই, তা নাহলে মেয়েটি তার জীবন থেকে ছেলেটিকে বার করে দেবে।

সুইটজারল্যান্ডে একটা খুব মজার ঘটনা আছে। কিছু দিন আগে একটা উইকলি ম্যাগাজিন থেকে ঘটনাটা জানা গেছে। এক বড় কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর খুব আদরের একটা কুকুর ছিল। কুকুরের জন্মদিনে বড় করে পার্টি দেওয়া হয়। কুকুরের জন্মদিনের পার্টিতে যাদের আমন্ত্রণ জানান হবে নিয়ম হল সবাইকে কুকুরের জন্য উপহার নিয়ে আসতে হবে। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক ওই কোম্পানী থেকে অনেক কন্ট্রাস্ট পেতেন। একবার কুকুরের জন্মদিনে ওই ভারতীয় ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি মালিকের স্ত্রীর জন্য সোনার কিছু উপহার নিয়ে গেছেন, কিন্তু কুকুরের জন্য যে কিছু নিয়ে যেতে হয় সেটা তার জানা ছিল না। যার জন্য মহিলা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে নিজেকে অপমানিত মনে করেছেন। এত রেগে গেছেন যে স্বামীকে বলে দিলেন কোন অবস্থাতেই যেন ওই ভদ্রলোক কোন কন্ট্রাস্ট না পায়। তারপর তো বেচারী চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কোম্পানির মালিক আবার এই ভদ্রলোককে একটু স্নেহ করতেন। তিনিও একদিন ডেকে বললেন আমার কিছু করার নেই, আমার মিসেসের কুকুরের জন্মদিনে কুকুরের জন্য তুমি কোন উপহার নিয়ে যাওনি সেই থেকে উনি খুব রেগে গেছেন। ভারতীয় এই ভদ্রলোকও একজন নামকরা ব্যবসায়ী, এরও খুব বুদ্ধি। উনি সব শোনার পর মালিকের স্ত্রীকে ফোন করেছেন – ম্যাডাম! সেদিন আমাকে খুব তাড়াছড়ো করে আপনাদের ওখানে যেতে হয়েছিল বলে কুকুরের জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারিনি আর তাছাড়া আপনার কুকুরের জন্য একটা বিশেষ ডায়মণ্ড নেকলেস অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম কিন্তু ওটা তখনও রেডি হয়নি। আজকেই এইমাত্র সেটা আমার হাতে ডেলিভারি এসেছে, তা আপনি আমাকে যেদিন ডেট দেবেন সেদিন আমি ওটা নিয়ে আসব। শুনে ভদ্রমহিলা মহা খুশী হয়ে গেলেন, এরপর থেকে আবার কন্ট্রাস্ট পাওয়া শুরু হয়ে গেল। এটাই পুরুষ প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতি প্রকৃতির মত চলছে। মন, দেহ আর ইন্দ্রিয় এরা এক রকম। এদের একটা খারাপ হচ্ছে অন্য দুটো ভেঙে পড়ছে। অন্য দিকে যিনি বিশুদ্ধ পুরুষ, যাঁর সঙ্গে এদের কোন লেনাদেনা নেই, কিন্তু সেও এদের সাথে জুড়ে রেখেছে বলে পুরুষও ভেঙে পড়ছে। তাই বলছেন ভবিষ্যতের দুঃখকে কাটানোর একটাই পথ, পুরুষ প্রকৃতির যে সংযোগ হয়ে আছে, এই সংযোগটা বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসা। কেন বেরিয়ে আসবে? আঠারো নম্বর সূত্রে সেটাই বলবেন।

আমাদের যোগদর্শন অতি উচ্চমানের। সেইজন্য এই সব দর্শন সব ধরণের লোকেদের দেওয়া হতো না। কারণ এখানে যে সত্যগুলোকে রাখা হয়েছে এগুলোই খাঁটি সত্য। এখানে কোন স্তুতি নেই, প্রার্থনা নেই, মানুষের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করার কোন প্রচেষ্টাই নেই, কোন তাবিজ কবচের নিদান নেই। পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন *হেয়ং দুঃখমনাগতম্*, যোগ ভালো মতই জানে আর স্বীকারও করে নিচ্ছে তাই সরাসরি বলে দিচ্ছে এখন তোমার যে দুঃখটা চলছে এই দুঃখকে যোগ কখন সারাতে পারবে না। তাহলে যোগ কোন দুঃখকে ঠিক করতে পারবে? যে দুঃখগুলো এখনও আসেনি। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, গঙ্গা স্নান করলে সব পাপ কেটে যায় কিন্তু চোখের অন্ধত্বটা যায় না। তোমার একটা চোখ যে কানা হয়েছে এটা আগের জন্মের দোষে, সেটা সারবে না। কিন্তু পাপগুলো কেটে যাবে। যখন স্তুতি করে বলা হয়, ঠাকুরের কাছে এসেছ, তাঁর নাম করেছ এবার তোমার সব দুঃখ কেটে যাবে। কাটে ঠিকই, কিন্তু এখন যে দুঃখটা চলছে এই দুঃখটা কাটবে না, পাপগুলো মিটে যাবে। আপনি বলবেন, কেন

সুদামার তো সব হয়ে গেল। হয়ে গেছে ঠিকই, সুদামার হয়েছে কিন্তু কত লোকের হয়নি সেটা দেখুন। যোগ কখনই জাগতিক স্তরে নামবে না, যোগ বলে দিল তোমার যা কিছু দুঃখ সব পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে। যদি তুমি পুরুষ প্রকৃতির এই সংযোগের উপর বিচার কর তাহলে তোমার দুঃখ কেটে যাবে। মাটি খুব পবিত্র, জলও খুব পবিত্র। কিন্তু দুটো জিনিষ এক সঙ্গে মিশে গেলে কাদা তৈরী হয়ে যাবে। যেখানেই পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগ হচ্ছে সেখানেই গোলমাল সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সব দুঃখের মূলে পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন। পুরুষ মানে চৈতন্য, আমরা হলাম সেই শুদ্ধ চৈতন্য। সেই শুদ্ধ চৈতন্য জড় প্রকৃতির সাথে যখন বন্ধুত্ব করতে যায়, তখনই তার যত দুঃখের কারণ হয়। তাহলে পুরুষ প্রকৃতির কাছে কেন আসছে? এটাই স্বভাব, প্রকৃতির স্বভাবেই এটা রয়েছে। এগুলোর কেন প্রশ্ন করা যায় না। এটাই বাস্তব। সেইজন্য কেন টেন প্রশ্নে যেতে নেই, তুমি এখান থেকে বেরোবার পথ বার করে নাও।

প্রকৃতি কেন এই নাটক করতে থাকে? প্রকৃতি জিনিষটা কী? এই যে মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট, এই দুঃখ-কষ্ট যদি না হত তাহলে তো কেউ ধর্ম পথে আসতো না। ভালো ভাবে খেয়ে পড়ে থাকাটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, আর এটাতেই যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকে তাহলে কেন সে ঈশ্বর চিন্তন করতে যাবে, কেনই বা অন্তর্মুখী হবে। আসলে মানুষ শুধু খাওয়া-পড়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তার আরও কিছু চাই। পশুপাখির যাদের সঙ্গে বড় হয়েছে তারা যদি কেউ মরে যায় তখন তাদেরও কষ্ট হয়ে কিন্তু একটু পরেই ভুলে যায়। মানুষ কিন্তু তার প্রিয়জনের মৃত্যুকে সহজে ভুলতে পারে না। তখন সে ভাবতে শুরু করে মৃত্যুর পরে আমার প্রিয়জন কোথায় চলে গেল! মৃত্যুর পরে কিছু আছে কিনা! সেখান থেকে মানুষ এই ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, এই প্রকৃতি কেন, প্রকৃতি কেন এই রকম করে? তখন যোগীরা বলছেন পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগেই যত দুঃখ। প্রকৃতি কিন্তু নিজের মত আছে। এখানে মাথায় রাখতে হবে যে, যোগদর্শন বেদান্তের সঙ্গে পুরোপুরি মিলবে না। যোগ পুরোপুরি আলাদা একটা দর্শন। স্বামীজী আবার বেদান্তের দৃষ্টিতেই যোগকে দেখেছেন। যোগ যেন বেদান্তেরই একটি অঙ্গ, সেইভাবেই স্বামীজী যোগকে আমাদের সামনে রেখেছেন।

প্রকৃতি যে যে রূপে ও যে যে অবস্থায় থাকে

প্রকৃতি কি বলতে গিয়ে পরের সূত্রে বলছেন **প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্বকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥১৮॥** যা কিছু জগতে আছে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, যেটাকেই বোধ করা যায়, এর সবটাই প্রকৃতি। পুরো জগতের প্রকৃতি কি? **প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং**, জিনিষটা হয় স্থিতি রূপে আছে, জড় রূপে আছে বা ক্রিয়া রূপে আছে আর না হলে প্রকাশ রূপে আছে। আসলে বলতে চাইছেন প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ, এই তিনটে গুণই প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতি আর এই তিনটে গুণ একই জিনিষ। প্রকাশ হল সত্ত্বগুণ। প্রকৃতি মূল, মানে যেখান থেকে শুরু হয়, সেটা হল প্রকাশ। দ্বিতীয় হল ক্রিয়া, ক্রিয়া মানেই রজোগুণের খেলা। আর তৃতীয় হল স্থিতি, স্থিতি মানে তমোগুণ। পরের দিকে গিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে এই তিনটে গুণকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু যোগ দর্শনে যখন সত্ত্ব, রজো আর তমের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় তখন এভাবেই করা হয়, প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতি। রজোগুণ দৌড়াতে চায় আর তমোগুণ তাকে আটকে রাখে। আমরা অনেক সময় বলি সত্ত্বগুণ দুটোর মধ্যে ভারসাম্য দিয়ে ধরে রাখে। এখানে তা বলা হচ্ছে না, যোগদর্শনে সত্ত্বগুণ মানে প্রকাশ। সব কিছুর প্রকাশই সত্ত্বগুণাশ্রিত। যেমন বুদ্ধির প্রকাশ যেখানে সেখানেও সত্ত্বগুণের আধিক্য, আলোর প্রকাশ সেটাও প্রকাশ। যেখানেই আলোর প্রভাব বেশী, তা জ্ঞানের আলোই হোক আর জাগতিক আলো হোক, আলো মানে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। আবার আলোরও তিনটে গুণ হয়ে যাবে। কারণ এই যে আলো আমরা দেখছি এই আলোও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ নয়। কোথায় সেই সত্ত্বগুণ ছিল? সেই কথাই এখানে বলছেন, সেখান থেকে মহৎ হয়েছে, মহৎ থেকে অহঙ্কার হয়েছে, অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রা হয়েছে, তন্মাত্রা থেকে স্থূল জগৎ হয়েছে, সেখান থেকে আলো হয়েছে। তাই এই আলোর মধ্যে তিনটেই মিশে আছে। তিনটে মিশে থাকলেও যখন সাদা আলো দেখছে তখন বলবে এটা সত্ত্বগুণ, লাল আলোকে বলবে রজোগুণ, অন্ধকার থাকলে বলবে তমোগুণ। এগুলো নানা রকমের ব্যাখ্যা। মূল কথা হল যেখানে প্রকাশ বেশী সেখানে

সত্ত্বগুণ। যাই হোক, প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতি এগুলো হল ভূতেন্দ্রিয়াত্বকং, যত রকমের বস্তু আছে আর ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বস্তুকে যে ধরতে পারবে, প্রকৃতি মানেই বিষয় আর কর্মের সম্পর্ক যার মধ্যে থাকে।

কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব হল ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্। দৃশ্যম্ মানে প্রকৃতি। প্রকৃতি কিসের জন্য? দ্রষ্টা যিনি, তার ভোগের জন্যই প্রকৃত। প্রকৃতির একটাই কাজ – ভোগাপবর্গার্থং, পুরুষকে ভোগ করানো আর প্রকৃতির স্বরূপ দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রকৃতির এই একটাই কাজ, পুরুষকে নিজের দৃশ্য, আমার এই সৌন্দর্য, আমার এই ক্ষমতা সব দেখিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। কোন জিনিষকে ভোগ করা মানে, সেই জিনিষের সঙ্গে এক হতে হবে। রেস্তোরাঁতে খেতে গেলে আমাকে রেস্তোরাঁর ভেতরে যেতে হবে, খাওয়া-দাওয়া করে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে আসাটাই মুক্তি। যে কোন কিছু ভোগের জন্য আমাকে আগে তার ভেতরে ঢুকতে হবে। এবার আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কি পারবো না, বা বেরিয়ে আসতে কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করবে আমার বেরিয়ে আসার নিজস্ব কতটা তাগিদ আছে আর তার জন্য ভেতরে কত শক্তি আছে। আর নির্ভর করে যেখানে ভোগ হচ্ছে সে আমাকে কত তাড়াতাড়ি ছাড়ছে। বিয়ে করলে বউ আর ছাড়বে না, যতক্ষণ না আপনি ডিভোর্স দিচ্ছেন। সেদিক থেকে প্রকৃতি অনেক ভালো, প্রকৃতি একদিকে ভোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আবার মুক্তির দিকেও নিয়ে যায়। আসলে সব ভোগের মধ্যে অপবর্গ নিজে থেকেই আছে। ভোগ করতে করতে এক সময় ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। বিতৃষ্ণা এসে গেলে আপনি বলবেন, আমার আর লাগবে না। একটা ভোগ থেকে না হয় বেরিয়ে আসা গেল কিন্তু আরও তো অনেক ভোগের উপকরণ আছে যেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসা যায় না। যেমন বিয়ে করলে আর বেরিয়ে আসা যাবে না। আপনি বিয়ে করেছেন মানে একজনের দায়িত্ব নিয়েছেন, দুটো সন্তান হয়েছে এদের ছেড়ে আপনি এখন কোথায় যাবেন!

প্রকৃতি আমাদের রোজ নতুন নতুন খেলনা দিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন। বন্ধুর ছোট্ট ছেলেটি আপনাকে তার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার আঁকা দেখাবে, খেলনা দেখাবে, নিজের গান শোনাবে। সব দেখানো হয়ে যাওয়ার পর ছেলেটি বলবে ‘আমার যা কিছু দেখানোর সব দেখান হয়ে গেছে, চল এবার বাবার কাছে যাই’। প্রকৃতি ঠিক এটাই করে। কিন্তু প্রকৃতি আর বাচ্চা ছেলে নয়, তার অনন্ত দৃশ্য, তার অনন্ত খেলনা। ওই অনন্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে পুরুষ ওর মধ্যে মত্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির মধ্যে আবার প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতি আছে। আপনি কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন, প্রকৃতি এবার আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাও প্রকৃতির কাজ। ভোরবেলা যখন উঠছেন তখন সব পরিশ্রান্ত দূর হয়ে আপনি সতেজ হয়ে গেলেন, আবার কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এইভাবে বছরের পর বছর, জন্মের পর জন্ম চলছে। একটা সময় আপনার মনে হল কোনটাই আপনার আর ভালো লাগছে না, দৌড়াতেও ভালো লাগছে না আবার চুপ করে বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। তখন প্রকৃতি আপনাকে জ্ঞানের একটু আলো দিয়ে দেবে। আপনি তখন কবিতা লিখতে শুরু করে দেবেন, বিজ্ঞানী হয়ে নানা রকম চিন্তা করতে শুরু করবেন।

প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতি এই তিনটির বাইরে প্রকৃতির কাছে আর কিছুই নেই। কিন্তু এই তিনটির সংমিশ্রণে, সেই সংমিশ্রণের সাথে পুনরায় সংমিশ্রণের ফলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাই কেউ যদি মনে করে একটা একটা করে ভোগ করে করে প্রকৃতির পারে যাব, সে কোন দিন পারবে না। মহাভারত যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করার জন্য অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। কৌরব পক্ষ চাইছে জয়দ্রথকে বাঁচাতে, জয়দ্রথকে যদি অর্জুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করে যাবে। সেইজন্য সেদিন দ্রোণাচার্য জয়দ্রথকে বাঁচানোর জন্য সূচীব্যূহ রচনা করে জয়দ্রথকে সূচের একেবারে পেছনে বসিয়ে রেখেছেন। এখন জয়দ্রথকে মারতে হলে একটা একটা করে বড় বড় যোদ্ধাকে পরাস্ত করে তার কাছে পৌঁছাতে পারবে। মোটামুটি দুপুর পর্যন্ত অর্জুন লড়াই করে গেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – এভাবে একটা একটা যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি জয়দ্রথের কাছে পৌঁছাতে হয় তাহলে আমরা কোন দিন পৌঁছাতে পারবো না, এর জন্য অন্য একটা পথ বার করতে

হবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলে দিলেন সব যোদ্ধাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে। এরপর অর্জুন সব যোদ্ধাদের উপেক্ষা করে ক্রমশ জয়দ্রথের দিকে এগিয়ে চলে গেল।

আমরা যদি মনে করি জগতে যত ভোগ আছে, সব ভোগকে একটা একটা করে ভোগ করে ভোগ থেকে নিবৃত্তি নিয়ে কৈবল্যের দিকে যাবো, তাহলে আমাদের কোন দিনই মুক্তি হবে না, প্রকৃতিতে আরও ফেঁসে থাকতে হবে। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো আর এতটুকু নয়, কোথাও আমাদের ভোগের বিষয়কে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। খুব ভালো করে বিচার করে বুঝে নিতে হবে, প্রকৃতির যা কিছু ভোগ আছে সবই একটা স্থিতির জন্য। ঠাকুর বলছেন বাপ-মা বলে ছেলের একটা বিয়ে দিতে হবে, খেটেখুটে এলে একটা ছায়ার তলায় বসে প্রাণ জুড়াবে। এখানেও একটা স্থিতি হচ্ছে। এরপর ক্রিয়া, কাজকর্ম। প্রমোশন হচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে এই যে নানা রকমের জিনিষ হচ্ছে সবটাই ক্রিয়া। আর প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের আলো। কিন্তু প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতি এই তিনটে মিলে প্রকৃতি পুরুষকে ভোগ সরবরাহ করে যাচ্ছে, পুরুষও আনন্দ পায়, সেখান থেকে প্রকৃতিই আবার পুরুষকে অপবর্গের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতির তাই আরেকটি কাজ অপবর্গ, অর্থাৎ মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। ভোগ বলতে সমস্ত রকম ভোগের কথাই বলছেন। যা কিছু আমরা ভোগ করছি এবং এই ভোগের ফলে যে সুখ-দুঃখ আমরা ভোগ করছি সেটাই ভোগ, আর অপবর্গ মানে মুক্তি। তন্ত্রও এই অপবর্গের কথা বলছে। ভোগ আর অপবর্গকেই বেদে বলছে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি জাগতিক কর্তব্যের দিকে নিয়ে যায় আর নিবৃত্তি জাগতিক কর্তব্য থেকে নিবৃত্ত করে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। ভোগ আর অপবর্গও ঠিক তাই, ভোগ আপনাকে জগতের দিকে নামিয়ে আনে আর অপবর্গে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কারণ পুরুষ প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পুরুষ তো আসলে চৈতন্য, কিন্তু প্রকৃতির ঐশ্বর্য দেখে ভাবে দেখি তো প্রকৃতি জিনিষটা কি। ভেবে প্রকৃতির মধ্যে যেই ঢুকে পড়ল তারপর খেলা আর শেষ হতে চায় না।

প্রকৃতিকে পুরুষ কিভাবে ভুলে যায় আর ভুলে গিয়ে প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়ে পুরুষের কি হাল হয় এই নিয়ে আমাদের পুরাণে অনেক কাহিনী আছে। ঠাকুর বরাহ অবতারের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, ভগবান বরাহ শরীর ধারণ করেছেন। বরাহ শরীর নিয়ে অবতারের কার্য শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যে ঠাকুরকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে হবে ভুলেই গেছেন। পরে শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে বরাহকে এফোড়-ওফোড় করে দিতেই ভগবান হি হি করে হাসতে হাসতে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। স্বামীজী আবার এই কাহিনীটাই এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রের নামে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আমরা নারদের কাহিনী জানি, নারদ বিষ্ণুর সঙ্গে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে বিষ্ণুর জল পিপাসা লেগেছে। বিষ্ণুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নারদ জল আনতে গেছেন। জল আনতে গিয়ে একটি যুবতীকে দেখে নারদ মোহিত হয়ে তাকে বিয়ে করে ঘর সংসারে ডুবে গেলেন, তারপর বন্যা হল, বন্যার জলে নারদের স্ত্রী-সন্তানাদি সবাই ভেসে গেল ইত্যাদি। মূল কথা হল, প্রকৃতি পুরুষকে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে প্রকৃতি তার খেলা দেখাতে শুরু করে। প্রকৃতির জালে ফেঁসে গেলে সবাইকেই ডুবতে হবে, প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। পুরুষ, নারী, সাধু, মহাত্মা, কুকুর, বেড়াল সবারই এক অবস্থা। কিন্তু আমার আপনার ব্যাপারে কী হচ্ছে? যেমন আমি একদিকে, আমার ভেতরে পুরুষ সত্তা আছে, আমার কাছে আপনারা সবাই প্রকৃতি। আপনার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, আপনি নিজের কাছে পুরুষ আর আমরা আপনার কাছে প্রকৃতি। যাকে ভোগ করা হয় সে সব সময় প্রকৃতি। যিনি ভোগ করছেন তিনি সব সময় পুরুষ। যেহেতু প্রকৃতির এলাকায় প্রবেশ করে গেছি বলে আমাদের এই দুরবস্থা, তা নাহলে আমি আপনি সবাই সব সময় শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষ আসলে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। পুরুষ মানে এটাই, সৎ চিৎ আনন্দ তাঁর গুণ নয়।

এই তিনটে ভগবানের গুণ নাকি এটাই তিনি, এই জায়গাতে এসে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈতের মধ্যে বিরাট তর্ক লাগে। বিশিষ্টাদ্বৈতীরা অর্থাৎ রামানুজমের মতে যিনি ভগবান, সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটে তাঁর গুণ। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলছি যোগীশ্বর, যোগীশ্বরটা শ্রীকৃষ্ণের গুণ। সেই রকম সত্ত্বাত্মম্ তিনি আছেনই আছেন, আর শুদ্ধ জ্ঞানঘন আর আনন্দ এগুলো ভগবানের গুণ। তিনি সব সময় আনন্দে পরিপূর্ণ, তাই যাঁর উপর তাঁর কৃপা হয় তিনিও আনন্দের আনন্দ পান। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা

এই তত্ত্ব একেবারেই মানবেন না। অদ্বৈতবাদীরা বলবেন, যেটাই সৎ সেটাই চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ, যেটাই আনন্দ সেটাই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম। সৎ, চিৎ ও আনন্দ সচ্চিদানন্দের গুণ নয়, এটাই তাঁর সার। সার মানে তত্ত্ব, এটাই তিনি। যেমন চিনির গুণ মিষ্টত্ব আর লবণের গুণ লবণত্ব। কিন্তু মিষ্টত্ব যেটা সেটা সব সময় মিষ্টি হবে, মিষ্টত্বের সারই হল মিষ্টি। চিনির মিষ্টিতে কম বেশী হতে পারে কিন্তু মিষ্টত্বের মিষ্টি কখনই কম বেশী হবে না বা পালাবে না। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দের সারই হল এই তিনটে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যার ফলে যেখানেই সচ্চিদানন্দের প্রতিবিম্ব পড়বে সেখানেই এই তিনটে গুণকে সেই বস্তুর মধ্যে দেখা যাবে। তাই বলে কি সাধারণ অবস্থায় এই তিনটে জিনিষকে দেখা যাবে? কখনই দেখা যাবে না। আপনি যদি ভগবানকে সচ্চিদানন্দ রূপে দেখতে চান, কোন দিনই দেখতে পারবেন না। কিন্তু সচ্চিদানন্দের প্রতিবিম্ব যেখানে পড়বে সেখানেই আলোকিত হয়ে যাবে। যখন পেনে বা রকেটে করে দিনের বেলা কেউ আকাশ পথে উড়ে যায় তখন সে সূর্যের আলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সূর্যের আলোকে কখনই বোঝা যাবে না। সূর্যের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে ওখানে সূর্য আছে। যেখানে কোন বস্তু নেই সেখানে কখনই সূর্যের আলো বোঝা যাবে না। সূর্যের আলো তখনই বোঝা যাবে যখন কোন বস্তুকে দেখব, বস্তুর উপর সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বলেই বস্তুকে দেখা যাচ্ছে। সচ্চিদানন্দও ঠিক তাই, যিনি পুরুষ, যিনি আত্মা তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। কিন্তু যেমনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির এলাকায় আসে তখনই এই তিনটে গুণ পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন আমার বোধ আছে যে আমি আছি, তার মানে আমি সৎ, আমি জানি আমার বুদ্ধি আছে তাহলে আমি চিৎ আর আমার ভেতরে আনন্দ আছে বলে আনন্দকে চাইছি। বস্তুর উপর যেমনি পড়বে আর যেমন বস্তু হবে তেমন তার সৎ, চিৎ ও আনন্দের প্রকাশের তারতম্য হবে। সাদা কাপড়ে আলো এক রকম প্রতিফলিত হবে, কালো কাপড়ে অন্য রকম প্রতিফলিত হবে। আলো কিন্তু সব জায়গায় সমান ভাবে বিদ্যমান। সচ্চিদানন্দকে কখনই বোঝা যাবে না, সর্বব্যাপী আলোকেও কখনই বোঝা যাবে না। ফিজিক্সের অনেক কিছুতে দেখা যায়, পার্টিকেলস্ আছে কিন্তু বোঝা যায় না যে ওগুলো আছে। বোঝা যায় তাদের কার্য দিয়ে। কার্য মানে যখন তারা বস্তুর উপর কার্য করে, তখন বোঝা যায় হ্যাঁ জিনিষটা আছে।

স্বামীজী এখানে বলছেন, আমাদের সবারই এক অবস্থা। এই যে জগৎ এটি স্বপ্নময়। স্বপ্নময় জগৎ এই তত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্মে খুব নামকরা। বেদান্ত যখন জগৎকে স্বপ্নবৎ বলছে তখন তাঁরা বলতে চাইছেন না যে স্বপ্নে যেভাবে আমরা সব কিছু দেখছি এই জগৎটাও সেই রকম। স্বপ্নাদৃষ্ট বস্তুর যেমন কোন সত্তা নেই, তেমনি বেদান্তে যখন জগৎকে স্বপ্নবৎ বলছে তখন জগতের পুরোপুরি নিজস্ব সত্তা আছে। কিন্তু আমাদের বাস্তবিক সত্তা পুরোপুরি আলাদা, সেই সত্তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা এর সাথে নিজের সত্তাকে জুড়ে রেখেছি। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন – এখানে কয়েকটি সুবর্ণ গোলক গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা সবাই সেগুলো পাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করছি। কখন পেয়ে যাচ্ছি বলে আনন্দ করছি, যখন পাচ্ছি না তখন এক অপরের সাথে খেয়োখেয়ি করছি, কান্নাকাটি করছি। এই আনন্দ আর এই কান্না এই নিয়েই জগৎ চলছে। অথচ এগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থায় আমাদের যে অনুভূতি হয়, এই অনুভূতি থেকেই আমাদের ঠিক ঠিক অভিজ্ঞতা হয়। কারণ মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন একই বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে, যে পাখিটি নীচের ডালে বসে আছে সে কটু ও মধুর দু রকমের ফলই আশ্বাদ করছে। মধুর ফল খেলে তার খুব ভালো লাগে, ভালো লাগার জন্য আবার সেই ফল খেতে চাইছে। কটু আর তিক্ত ফল খেলে তার ভালো লাগে না, খাওয়ার পর বলে আর না আর না। বিপরীত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে এগোতে থাকি। দুই বিপরীত অনুভূতি না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই।

এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন সব কিছুর মধ্যে এই তিনটে জিনিষই আছে – প্রকাশ, গতি ও স্থিতি। বুঝে নেওয়ার পর তাঁরা বলেন আমার এই তিনটে জিনিষ লাগবে না। যেমনি বলে দিলেন আমার এই তিনটে জিনিষ লাগবে না, তখনই দেখা যাবে তিনি প্রকৃতির পারে যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। একই জিনিষকে আমরা অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছি। এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো, এই তিনটেই সংসার। এর বাইরে গেলেই মুক্ত পুরুষ। প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ

ততক্ষণই বন্ধন, প্রকৃতির বাইরে গেলে তারপর তো সেই শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষ। মুক্তি মানে এই তিনটে গুণের পারে যাওয়া, এই তিনটে গুণ তিনটি রূপে আসে – তমো গুণে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে, রজোগুণে আমাদের কাজের মধ্যে দৌড় করাবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই দুটোর সংমিশ্রণেই চলে। তার মধ্যে আসে সুখের একটা আশা, প্রকাশ আর সুখ দুটো মিলেমিশে রয়েছে। কখন আমরা দৌড়ে সুখ পাই কখন থেমে সুখ পাই। এই অনুভব দিয়ে যখন বুঝে গেলেন যে এটাই প্রকৃতির স্বরূপ, তখন পুরো জগতের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে যাবে।

স্বামীজী বলছেন *অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র মহান শিক্ষক, কিন্তু ঐ সুখদুঃখগুলিকে কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে। এগুলি ধাপে ধাপে আমাদের কাছে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের মতো মনে হইবে।* এই যে স্বামীজী বলছেন ‘জগৎ তখন যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের মতো মনে হইবে’ কত উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক কথা! এইভাবে কি আমরা ভাবতে পারি না? আমরা মনে করছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিশাল জগৎ, তার কাছে আমরা সবাই অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা বিন্দুর মত, যেখানে আমাদের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নদীর মত একটা ছায়াপথ আছে, যাকে আকাশগঙ্গা বলে, সেই আকাশগঙ্গায় সূর্যের থেকেও কোটি গুণ বড় কোটি কোটি নক্ষত্র নদীর জলের মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে বহু কষ্টে দেখা যায় একটা অতি সাধারণ তারা, সেই তারার নাম সূর্য। এই সূর্যের মত, সূর্যের থেকেও অনেক সহস্র গুণ বড় কোটি কোটি তারা ঐ আকাশগঙ্গাতে ভেসে চলেছে। আকাশগঙ্গা যেন কোটি কোটি নক্ষত্র সমূহের একটা নদী। সেই আকাশগঙ্গাতে সূর্য একটি অতি সাধারণ নগণ্য তারা। তার আবার এতগুলো গ্রহ, সেই গ্রহের মধ্যে পৃথিবীও অত্যন্ত সাধারণ একটি গ্রহ। সেই পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ একটা ছোট্ট দেশ, সেই ছোট্ট দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অতি ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের হাজার হাজার শহরের মধ্যে বেলুড়ের মত একটা ছোট্ট শহরে বসে আছি। এবার ভাবুন আমাদের অস্তিত্ব কোথায় পড়ে আছে! ইলেক্ট্রন প্রোটন যেমন আমাদের কাছে কিছুই নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের অস্তিত্ব তার থেকেও নগণ্য। আর তাতেই আমাদের কত অহঙ্কার! কিন্তু যখন কেউ নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে ওই সর্বব্যাপী চৈতন্য সত্তার দিকে নিয়ে যেতে শুরু করবে, তখন এই পরিস্থিতিটা অতি দ্রুত পাল্টাতে শুরু হয়ে যাবে। এতক্ষণ আমরা নিজেকে একটা ছোট্ট বিন্দুর মত ভাবছিলাম, এই বিন্দুটাই এবার আকারে ক্রমশঃ বড় হতে শুরু করে। বড় হতে হতে জিনিষটা পুরো পাল্টে গিয়ে আপনি আমি হয়ে যাবো বিরাট, *সহস্রশিরসা পুরুষঃ*, আর পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা ছোট্ট অণুর মত হয়ে যাবে। বাস্তবিকই পুরো ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায়।

সৎ, চিৎ আর আনন্দই সচ্চিদানন্দ, এটাই তত্ত্ব। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা বলবে তা কেন হবে, এই তিনটে সৎ, চিৎ আর আনন্দ ভগবানের গুণ। শুধু তাই নয়, দ্বৈতবাদীদের মতে ভগবান হলেন অনন্তগুণনিধান, সচ্চিদানন্দটা তাঁর আসল গুণ। দ্বৈতবাদীদের মতকে মেনে নিয়ে এগোলে একটা মারাত্মক সমস্যা এসে যাবে। যেমনি আমরা মেনে নেব সৎ, চিৎ আর আনন্দ ভগবানের গুণ, তখন আমাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে যাতে আনন্দ প্রাপ্তি হয়, যাতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়। কিসে আনন্দ হবে? ভগবানের পূজা অর্চনা করলে আনন্দ হবে। কারণ আনন্দ ভগবানের গুণ এই গুণ আমার মধ্যেও নিয়ে আসতে হবে। তিনি অনন্তগুণনিধান, যা যা গুণ আছে সেই সেই গুণ আমাদের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে হবে, যেমন করুণা, ভালোবাসা, প্রেম এগুলো আমাদের অর্জন করতে হবে। জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যাবে ভগবানের গুণকে আমাদের ভেতরে নিয়ে আসা। অদ্বৈতবাদীরা বলবে, করুণা, ভালোবাসা এগুলো সত্ত্বগুণের মধ্যে পড়ে, এগুলোও বন্ধন। অদ্বৈতবাদীদের মূল সাধনা হল, তুমি যেমনটি আছ তোমাকে তেমনটি হতে হবে, তোমাকে কিছুই অর্জন করতে হবে না। তাই এখানে ক্রিয়ার কোন ব্যাপারই নেই। কারণ ক্রিয়া মানেই রজোগুণ, ক্রিয়া দিয়ে তোমাকে গুণগুলো অর্জন করতে হবে। কিন্তু অদ্বৈত বলবে দুর্ভাগ্যগুলো ত্যাগ কর তাহলে তোমার ভেতরের প্রকৃত গুণগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে, তুমি তো আগে থেকেই সৎ, চিৎ ও আনন্দই আছ। তুমি তো সৎ আছই, এখন তুমি মনে করছ আমি মারা যাব, কারণ

মৃত্যুকে তুমি সত্য বলে মনে করছ। আর সেইজন্য তুমি ডাক্তার, হাসপাতাল করে বেড়াচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি জেনে যাও আত্মা রূপে তুমি চিরন্তন, তাহলে তুমি মিছিমিছি এই দৌড়াদৌড়ি কেন করতে যাবে! তোমার যে বোধ আমি মারা যাবো, আমি মুর্খ, উনি পণ্ডিত ইত্যাদি, কারণ তোমার মধ্যে মিথ্যা একটা মায়ার আবরণ রয়েছে বলে তুমি এই রকম ভাবছো। অদ্বৈত মতে সাধনা হল মায়ার এই আবরণকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ওই গুণগুলোকে পূজো অর্চনা করে বাইরে থেকে আনতে হবে। সেই কারণে দ্বৈতবাদী আর অদ্বৈতবাদীদের পুরো জীবনধারাটাই আলাদা। তবে অদ্বৈতবাদীরা কখনই জপ ধ্যান করতে আপত্তি করবেন না, তাঁরা কখনই বলবেন না যে জপ করলে বা ধ্যান করলেই জ্ঞানলাভ হবে। জপ ধ্যান করতে কেন তাহলে আপত্তি করছেন না? কারণ জপ-ধ্যান করলে মনের শুদ্ধি হবে, মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি হবে। জ্ঞান যেটা হওয়ার সেটা নিজে থেকেই হবে। কি জ্ঞান হবে? সচ্চিদানন্দের জ্ঞান, যেটা আপনার স্বরূপ বা স্বভাব সেটাই ভেসে উঠবে।

এখানে স্বামীজী যে বলছেন এখন তোমার মনে হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট আর সেখানে তুমি অতি নগণ্য, এটাই জ্ঞানের পর তুমি দেখবে তুমি বিরাট আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রে একবিন্দু জলের মত, দ্বৈত মতে কখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রে একবিন্দু জলের মত হবে না। দ্বৈতবাদীতে কখনই নিজেকে বিরাট বলবে না, সে নিজেকে সব সময় বলবে ‘আমি অতি অধম, ভগবানের কাছে আমি কিছুই না’। কিন্তু প্রকৃতির সত্তা তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে, কারণ প্রকৃতিও ভগবানের। সেখানেও সে নিজেকে ছোট মনে করবে, সেখানে বলবে – একটা বৃক্ষ, বৃক্ষে যেমন ডালপালা-পাতা-ফুল-ফল থাকে আমিও তেমনি একটা ক্ষুদ্র পাতা। স্বামীজী এখানে ওখানে যত রকম চিন্তা-ভাবনা ছিল সব কটাকে নিয়ে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু স্বামীজীর ভাব ছিল ঘোর বেদান্তী। ঘোর বেদান্তী না হলে তিনি কখনই এই ধরণের ভাবদ্যোতক কথাগুলো বলতে পারতেন না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খসে পড়ে যাবে, সম্পদ ভবগোপ্পদ এই ধরণের কথা বলতেন না। আপনি তো শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দ, সৎ, চিৎ আর আনন্দ মানে ওর সামনে প্রকৃতি কোথাও দাঁড়াতে পারবে না। তাহলে আমরা প্রকৃতির জালে ফাঁসলাম কী করে?

যোগে কুশল নর্তকীর উপমাটা খুব ব্যবহার করা হয়। বলছেন প্রকৃতি একজন কুশল নর্তকী, পুরুষের সামনে সে নাচ দেখাতে শুরু করে। এমন মনোমুগ্ধকর নৃত্য দেখাতে থাকে যে, পুরুষ সেই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এখন পুরুষ যদি বলে আমার আর নাচ দেখার ইচ্ছে নেই – তোমার নাচে আমার কোন আগ্রহ নেই, তখন প্রকৃতি অন্য জায়গায় নাচ দেখাতে চলে যাবে। প্রকৃতি যতক্ষণ নাচ দেখাচ্ছে ততক্ষণ সে পুরুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ভোগের জন্য। যখন সে নাচ বন্ধ করে দিচ্ছে তখন অপবর্গ। প্রকৃতি পুরুষের হাত ধরে বলে এই দ্যাখো আমার এই রূপ, এই দ্যাখো আমার এই খেলা, এইভাবে সে খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে পুরুষকে বিভিন্ন যোনি থেকে যোনিতে ঘোরাতে থাকে, তারপর পুরুষ যখন আর নাচ দেখতে চায়না, তখন প্রকৃতি পুরুষের হাত ধরে আস্তে আস্তে তাঁকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। পুরুষকে যেন হাত ধরে মা প্রকৃতি আবার মুক্তির দিকে এগিয়ে দেয়, এই মা কথাটা যোগেও ব্যবহার করা হয়েছে। তন্ত্রেও আমরা এই তত্ত্ব ও ভাষা দেখতে পাই – তন্ত্রে বলছে মা আদ্যাশক্তি ভোগ ও অপবর্গ দুইই দেন। দৃশ্যের কি কাজ? প্রথমে পুরুষকে ফাঁদে ফেলে, তারপর তিনিই আবার হাত ধরে পুরুষকে অপবর্গের দিকে নিয়ে যান। যদি প্রশ্ন করেন মা প্রকৃতি এরকম কেন করেন? এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। বলবে তাঁর ইচ্ছা। এখানে বেদান্ত এক ভাবে ব্যাখ্যা করবে, যোগ আরেক ভাবে বলবে, বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করবে।

পুরুষের স্বভাব সচ্চিদানন্দম্ – সৎ, চিৎ ও আনন্দ। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রেম। পুরুষের স্বভাবই এই তিনটে, এটাই তাঁর স্বরূপ। পুরুষ কখনই অস্তিত্বহীন হয় না, পুরুষের কখনই জ্ঞানের ঘাটতি হয় না, পুরুষের কখনই প্রেমে কমতি হয় না। জ্ঞান, প্রেম, অস্তিত্ব, আনন্দ পুরুষের এগুলো নিজস্ব স্বরূপ, তার মানে, প্রকৃতির এই গুণগুলো নেই। কিন্তু কি হয়, স্ফটিকের সামনে যদি লাল জবা ফুল রাখা হয় স্ফটিককে লাল দেখাবে, যদি হলুদ জবা থাকে স্ফটিককে হলুদ দেখাবে। পুরুষ যেমনি প্রকৃতির কাছে চলে আসে জড় প্রকৃতি আলোকিত হয়ে ঝলমল করে ওঠে। পুরুষের যা যা গুণ আছে প্রকৃতি সেগুলি

নিজের মধ্যে নিয়ে নেয়। প্রকৃতি যত পুরুষের সংস্পর্শে আসে ততই প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের এই গুণগুলি প্রতিবিস্তৃত হতে থাকে। পূর্ণ সত্ত্বগুণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রেম ও জ্ঞানের প্রকাশ অনেক বেশী ছিল। সত্ত্ব গুণের মাত্রা যত বেশি হবে প্রেম ও জ্ঞানের প্রকাশের মাত্রাও তত পরিষ্কার হবে। আর যত তমো গুণের প্রভাব বাড়তে থাকবে তত প্রেম ও জ্ঞানের প্রকাশ কম হতে থাকে। যার মধ্যে অপরের প্রতি ভালোবাসা নেই, যার মধ্যে আত্মজ্ঞানের অভাব, বুঝতে হবে তার মধ্যে তমো গুণের প্রভাব অনেক বেশি। একজন বিজ্ঞানীর মধ্যে জগতের সমস্ত জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যে আত্মজ্ঞান নাও থাকতে পারে, বিজ্ঞানী নিজেকে আর নিজের সন্তান ও স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতে পারে কিন্তু অপরের প্রতি তার ভালোবাসা নাও থাকতে পারে। কিন্তু সত্ত্ব গুণের যখন বৃদ্ধি পায় তখন এই দুটো জিনিষ – অপরের প্রতি ভালোবাসা আর আত্মজ্ঞান বাড়তে থাকে। আমি কে, কোথা থেকে আমি এসেছি, এখানে আমি কেন এসেছি, এই ধরনের প্রশ্ন তখন মনের মধ্যে আসে।

স্ফটিকের মধ্যে আলো পড়েছে, স্ফটিক মনে করছে এটা আমারই আলো। আমি ভাবছি আমার শরীরটা এখন সক্রিয়, এই শরীরকে আমিই সক্রিয় করছি, আমি মনে করছি আমার মন বুদ্ধি হচ্ছে চৈতন্য সম্পন্ন। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারছি না যে, এই শরীরে পুরুষ চৈতন্য আছেন বলেই শরীর সক্রিয়। এখন আমি যে সাধনা করছি বা করার চেষ্টা করছি, এই সাধনা করার উদ্দেশ্য এই ধরনের অজ্ঞানতা থেকে বেরিয়ে আসা। সাধনা যখন করতে থাকে তখন পুরুষের অজ্ঞানটা সরতে থাকে আর জ্ঞানের আলোটা বাড়তে থাকে। যখন আত্মজ্ঞান যেমন যেমন উন্মোচন হতে থাকে তেমন তেমন সে তত নিজেকে বিস্তার করতে থাকে, প্রকৃতি যেমন থাকার তেমনই রইল। তারপর একটা সময় আসে যখন নিজেকে সর্বব্যাপী দেখে আর প্রকৃতি হয়ে যায় একটা যেন ছোট্ট জলীয় বাষ্পকণার মত। মুক্তি মানে কি? মুক্তি মানে নিজেকে বিস্তার করা, এত বিশাল তার অস্তিত্ব হয়ে যায় যে এই প্রকৃতি তার কাছে অতি নগণ্য হয়ে যায়। প্রকৃতি এতো ছোট হয়ে যায় যে নখের ডগায় একটা পিঁপড়ে বসলে যেমন ভাবে আঙুল টোকা দিয়ে ফেলে দেন, সেই ভাবে প্রকৃতিকেও তিনি পরিত্যাগ করে দেন। কিন্তু প্রকৃতি প্রকৃতির মতই থাকবে, প্রকৃতি কখনই শেষ হয়ে যাবে না।

এখন যে সূত্রটি আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তাতে প্রকৃতির চারটে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। এই সূত্রে সাংখ্য দর্শনকেও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে – **বিশেষ্যবিশেষ্যলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।।১৯।।** চারটে কি কি রূপ? বলা হচ্ছে – বিশেষ্য, অবিশেষ্য, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ। এর আগে প্রকৃতির তিনটে গুণের কথা বলা হয়েছিল, সত্ত্ব, রজো ও তমো, এবারে বলছেন এই তিনটে গুণ চারটি অবস্থায় থাকে।

বিশেষ্য রূপে মানে, যে জগৎ আমরা দেখছি, এই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ, মানুষ দেখছি, গাছপালা দেখছি, যা কিছু দেখছি এই দৃশ্যমান স্থূল জগতকেই বলছেন বিশেষ্য। বিশেষ্য বলছে এই কারণে যে, সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। অবিশেষ্য হল, এই বিশেষ্যের পেছনে যে শক্তিটা কাজ করছে, অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা দিয়ে এই স্থূল জগৎ তৈরী হয়েছে, তাকে বলছেন অবিশেষ্য। আর লিঙ্গমাত্র, জিনিষটা আছে শুধু বোঝা যাচ্ছে, এটাই মহৎ বা বুদ্ধি। সমষ্টির স্তরে বলছে মহৎ আর ব্যষ্টির স্তরে সেটাকেই বলছে বুদ্ধি, দুটো একই জিনিষ। অলিঙ্গ হল প্রকৃতি। লিঙ্গ মানে চিহ্ন, যেটা দিয়ে বোঝা যায় একটা কিছু আছে। *লিঙ্গমাত্রম্* কেন বলছেন? মহৎ হল প্রথম প্রকাশ, তাই *লিঙ্গমাত্রম্*। প্রকৃতি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রকৃতিকেও দেখা যায় না, কোন কিছু দিয়ে বোঝাও যায় না, সেইজন্য প্রকৃতিকে বলছেন অলিঙ্গ, কোন চিহ্ন নেই, চিহ্ন-শূন্য। এইসব সূত্রগুলো এতই কঠিন যে গুরু বা উপযুক্ত আচার্যের কাছে অধ্যয়ন না করলে এর অর্থ কখনই বোঝা যাবে না।

তাহলে দাঁড়াল, স্থূল জগৎকে বলছেন বিশেষ্য, অবিশেষ্য হল তন্মাত্রা, মহৎ লিঙ্গমাত্রম্ আর প্রকৃতি অলিঙ্গ। এখানে অহঙ্কারকে বলা হয়নি, কারণ অহঙ্কারকে বুদ্ধি অর্থাৎ মহতের সঙ্গে ধরা হয়েছে। তাহলে এবারে দেখা যাক সৃষ্টি কীভাবে চলছে। প্রথমে আসছে প্রকৃতি, প্রকৃতির পরে আসে মহৎ, যখন আমি আছি এই বোধটা আসে তখন সেটাকে বলছেন অহঙ্কার, মহতের পর অহঙ্কার এসে গেল। অহঙ্কার থেকে জন্ম নিচ্ছে তন্মাত্রা, এই তন্মাত্রা থেকেই আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের জন্ম। আর ওই তন্মাত্রা

থেকেই এই স্কুল জগৎ তৈরী হয়। যদি মানুষকে সরিয়ে দিয়ে শুধু সৃষ্টির এটুকুকেই নেওয়া হয়, তাহলে এর মধ্যে থাকবে তন্মাত্রা আর স্কুল জগৎ। তার সঙ্গে থাকবে বুদ্ধি আর প্রকৃতি। যেমনি এর মধ্যে আমি আপনি সৃষ্টি হয়ে গেলাম তখন ওর মধ্যে অহঙ্কার চলে আসে আর আসে একাদশ ইন্দ্রিয়। এইভাবে পাঁচটি সূক্ষ্ম ও পাঁচটি স্কুল তন্মাত্রা মিলে দশ হল, তার সাথে একাদশ ইন্দ্রিয় যোগ হয়ে গেল একুশ, আর এদিকে অহঙ্কার বাইশ, মহৎ তেইশ আর প্রকৃতি চব্বিশ, এই চব্বিশটিই হল তত্ত্ব, শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় চতুর্বিংশতিতত্ত্ব।

এইভাবে যোগের দর্শনকে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করা হল। প্রথমে বললেন, প্রকৃতি আছে ভোগ আর অপবর্গের জন্য। প্রকৃতির কি গুণ? প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। কি কি অবস্থায় এই গুণগুলো থাকে? চারটে অবস্থায় থাকে – বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্রম এবং অলিঙ্গ। মহৎকে লিঙ্গ আর প্রকৃতিকে অলিঙ্গ কেন বলছে? এখানে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে লিঙ্গ, লিঙ্গ মানে চিহ্ন। একটা জিনিষকে ইঙ্গিত করার ক্ষেত্রে এই লিঙ্গকে ব্যবহার করা হয়। খ্রিষ্টানরা লিঙ্গকে পুরুষ নারীকে পার্থক্য করতেই শুধু ব্যবহার করে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে লিঙ্গকে সব সময় যোগ্যতা নির্ণায়ক চিহ্ন রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণু আর শিবকে কোন জিনিষটা আলাদা করছে? এই প্রশ্ন করলে বলা হবে, লিঙ্গই আলাদা করছে। এখানে মহৎকে বলা হচ্ছে লিঙ্গ। মহৎকে লিঙ্গ বলা হচ্ছে কারণ প্রকৃতিকে জানা যায় না, আর প্রকৃতির প্রথম যেটা পরিণাম হয় সেটাই মহৎ। তার পেছনে রয়েছে অলিঙ্গ। অলিঙ্গ হল মহৎএর মা, কিন্তু মাকে জানা যায় না, মানে তাঁকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সব কিছু একমাত্র উৎস প্রকৃতি, কিন্তু তাঁর কোন রূপ নেই। এই জিনিষগুলিকে সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারেনা, তাই পরবর্তি কালে যেসব দার্শনিকরা এলেন তারা প্রকৃতিকে বানিয়ে দিলেন সীতা মাঈয়া, কালী মাঈয়া, দুর্গা মাঈয়া। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে, যেটা আমরা এখন আলোচনা করছি, প্রকৃতির কোন রূপ নেই, বলা হয় অলিঙ্গ। কার্যক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার জন্য বলা হয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি বা পুরুষ আর প্রকৃতি বা আত্মা আর প্রকৃতি এক। কিন্তু একটা মৌলিক পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা হয় চৈতন্যকে নিয়ে। পুরুষ বা আত্মা হলেন চৈতন্য আর প্রকৃতি জড়। আমাদের কার্যক্ষেত্রে সমস্যাটা কি হয়, পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন প্রকৃতি পুরুষের চৈতন্যের আলোকে নিয়ে নেয়, প্রকৃতির নিজস্ব কোন আলো নেই, প্রকৃতির যে আলো সেটা পুরুষের কাছ থেকে ধার করা আলো। যেমন চাঁদ, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোতে সে আলোকিত হয়ে আছে। গ্যালিলিওর আগে লোকে জানত চাঁদ নিজেই একটি আলোকিত নক্ষত্র, কিন্তু আজ কেউ এই কথা বিশ্বাস করবে না। প্রকৃতিরও কোন নিজস্ব আলো নেই, পুরুষের আলোকে সে আলোকিত হয়। তাই মনে হয় যেন প্রকৃতির বুদ্ধি আছে, কিন্তু প্রকৃতির বুদ্ধি নেই। প্রকৃতির কোন আকার নেই, শুধু এর তিনটে গুণ আছে – সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ। আর এই গুণ গুলো কোন বস্তু কণা নয় যে এগুলোকে নির্দিষ্ট করে ধরতে পারবে। প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি হয় মহৎএ। তাই মহৎ কে বলা হয় লিঙ্গ আর প্রকৃতিকে বলছেন অলিঙ্গ। মহৎ মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে বুদ্ধি তার সমষ্টি মহৎ। আমি, আপনি সবাই সেই মহৎ এর ছোট ছোট অংশ। সমস্ত মানুষের যত বুদ্ধি আছে সব বুদ্ধিকে একত্র করে আর যে বুদ্ধির এখনও ব্যক্ত হয়নি সেই বুদ্ধিকেও একত্র করে যে সমষ্টি বুদ্ধি তাকে বলা হয় মহৎ। যে স্কুল উপাদানগুলিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে বলছেন বিশেষ আর যে বস্তুগুলিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে তন্মাত্রা, এই তন্মাত্রাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এটাকে বলছেন অবিশেষ। যখন সাধক ধ্যান করতে শুরু করে এবং ধ্যান করে করে যখন গভীরে যায় তখন সে সত্যিই এই তন্মাত্রাগুলিকে আলাদা আলাদা দেখতে পায়। তবে এই তন্মাত্রা গুলিকে স্কুল চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সাধকের এই চোখের পেছনে যে power of perception রয়েছে সেটা আরো সূক্ষ্ম হয়ে যায়। এইখানে এসে বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের তফাৎ হয়ে যায়।

সাংখ্য মতে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ আর তার উপাদান কারণ দুটোই প্রকৃতি। উপাদান কারণ মানে যে উপাদান দিয়ে সৃষ্টি হয় আর নিমিত্ত কারণ মানে, যিনি সৃষ্টিকর্তা। যেমন মাটির ঘট তৈরীতে উপাদান হল মাটি আর এর নিমিত্ত কুম্ভকার। সাংখ্য মতে সৃষ্টি সব সময় প্রকৃতি থেকে হয়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা বলছেন, তার মধ্যে একটি কথা খুব বেশি

শোনা যায় তাহল, এভাবে যদি পরিবেশ দূষিত হতে থাকে তাহলে বিশ্বের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে আর বেশি দেবী হবে না। সৃষ্টি কোথা থেকে হয় এই প্রশ্নের উপর আমাদের খুব পুরনো ঝগড়া। ব্রহ্মসূত্র বলছে *জন্মাদস্য যতঃ*, যেখান থেকে সৃষ্টি। কোথা থেকে সৃষ্টি? সাংখ্যবাদীরা এবং যোগের দার্শনিকরা বলবেন সৃষ্টি প্রকৃতির। কিন্তু প্রকৃতি তো সম্পূর্ণ জড়। জড় প্রকৃতি থেকে যদি সৃষ্টি হয় তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্নিং নিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যা বলছে সব ঠিকই বলছে, সত্যিই পরিবেশের জন্য খুব বিপদ। প্রকৃতি জড়, জড় নিজেকেই সামলে রাখতে পারে না। কিন্তু বেদান্ত মতে সৃষ্টি ভগবানের। ভগবানের যদি সৃষ্টি হয় তাহলে ভগবানের ঠিক করা আছে তিনি কী করবেন। পুরাণাদিতেও একই কথা, সৃষ্টি সব সময় হয় ভগবান থেকে। পৃথিবী যখন দেখে সে আর ভার সামলাতে পারছে না, তখন পৃথিবী গরুর রূপ ধরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথা বলে। ব্রহ্মা তখন বলেন ‘আচ্ছা ঠিক আছে, ভগবানকে পাঠাচ্ছি’। ভগবান এসে কী করবেন? একটা প্রবল বন্যা এনে কিছু জীবনকে ভাসিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে কিছু জীবন বাঁচিয়ে রাখবেন। কীভাবে? মীন অবতার হয়ে। এরপর আবার যদি সমস্যা হয়? তখন একটা লড়াই বাঁধিয়ে দেবেন। যখন যেমন যেমন সমস্যা হবে তিনি এসে একটা কিছু করে দিয়ে আবার আগের অবস্থায় নিয়ে আসবেন। এটা আমাদের অনেক পুরনো থিয়োরী। গ্লোবাল ওয়ার্নিংএ যদি বলে প্রবল বন্যা হবে। তাতে কী হবে? সৃষ্টিটা ডুববে। কারণ সৃষ্টিটাও ভগবানের আর সংহারটাও ভগবানের। এতে উদ্ভিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। উদ্ভিগ্ন হওয়ার ছিল যদি সৃষ্টিটা প্রকৃতির হতো। এগুলো আমাদের খুব পুরনো ঝগড়া, আজকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে পরিবেশবিদরা অনেক বড় বড় কথা বলতে পারেন, কিন্তু হিন্দুরা এগুলো অনেক দিন আগে থেকেই জানে যে একদল দার্শনিকরা বলছেন সৃষ্টি প্রকৃতি করে আরেক দল দার্শনিকরা বলেন সৃষ্টি ভগবানের। আচার্য শঙ্কর রামানুজরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে সৃষ্টির ব্যাপারে সাংখ্যের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ জড় থেকে কখন সৃষ্টি হতে পারে না। তবে সাংখ্যবাদীদেরও অনেক যুক্তি আছে, তাঁদেরও তর্কের সুযোগ আছে। কিন্তু আমরা যেহেতু যোগ অধ্যয়ন করছি তাই এই তর্কের মধ্যে আমরা যাবো না। বেদান্তীরা বলছেন সৃষ্টি যদি ভগবানরই হয়, তাহলে আমি আপনি সেখানে কী আর করতে পারবো। তিনি যদি সংহারই করতে চান তখন কার বুকের পাটা আছে যে ভগবানকে আটকাতে যাবে! আর ভগবানের কাছে সব সমান। মূল কথা হল সাংখ্য মতে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ আর উপাদান কারণ দুটোই প্রকৃতির।

তার সঙ্গে সাংখ্য মনে করে পুরুষের সংখ্যা অসংখ্য। অনেকে এসে বোকার মত প্রশ্ন করেন আপনারা যদি পুনর্জন্ম মানেন তাহলে জনসংখ্যা কী করে বেড়ে যাচ্ছে? এর উত্তর হল, এই যে পুরুষ বা চৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত, সেইজন্য সৃষ্টিও অনন্ত। যদি মনে করা হয় বিশ্বে যত লোক আছে সবারই মুক্তি হয়ে গেল, তাহলে কি সৃষ্টি কার্য থেমে যাবে? কোন দিন থামবে না, কারণ বলাই হচ্ছে পুরুষের সংখ্যা অনন্ত, অসংখ্য পুরুষ আছে। সেখান থেকে আবার সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাবে। পুরো সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিলেও প্রকৃতির কিছু আসে যায় না। আর পুরুষ অনন্ত, প্রকৃতি পুরুষের মত অনন্ত ঠিক না হলেও ওই অনন্তের মতই বিরাট। সেইজন্য কোথাও না কোথাও পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হবেই। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীটাই চলে যাবে, কিন্তু সৃষ্টি অন্য রূপে অন্য কোথাও চলতে থাকবে।

তন্মাত্রার উপর স্বামীজীর মৌলিক ব্যাখ্যা

স্বামীজী এখানে অবিশেষকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তন্মাত্রার ব্যাপারে অনেক মূল্যবান কথা বলছেন। প্রত্যেক মানুষের এবং প্রত্যেকটি জিনিষের কিছু নিজস্ব তন্মাত্রা থাকে। হিন্দুদের এটি একটি খুব প্রচলিত ধারণা যে প্রত্যেক মানুষের স্থূল শরীর একটা আলোতে ঢাকা থাকে। অনেক খ্রিস্টান সাধকদের মধ্যেও এই ধরণের ভাবনা কাজ করে, তারা যখন কোন ছবি বা মূর্তি তৈরী করে তখন ছবির পেছনে একটা আলোর আভা দিয়ে দেয়, এর নাম দিয়েছে Halo। বলা হয় যারা মহাপুরুষ তাদের এই হ্যালো এত প্রবল থাকে যে সেটা আর তন্মাত্রা অবস্থায় থাকে না, ওটা স্থূল অবস্থায় চলে আসে এবং পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকাতে একজন মহিলা ভক্ত ওখানকার আশ্রমের বড় মহারাজের ক্লাশ শুনতে যেতেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলছেন – বক্তৃতা দিতে দিতে মহারাজ

যেন অন্য জগতে চলে যেতেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম ঐ সময় মহারাজের পুরো শরীরটা আলোর শরীর হয়ে যেত, আলোর আকারে যেন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাঁর হাত পা গুলিকে মানুষের বলে মনে হত না। চোখ সরান যেত না। ক্লাশ যখন শেষের দিকে চলে আসতে থাকত তখন তাঁর শরীরটা আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক আকারে চলে আসত।

আসলে খ্রিষ্টান সাধকদের হ্যালো বা এই মহিলা ভক্তের বিবরণ এগুলো সবই তন্মাত্রার ব্যাপার। যিনি যত সন্তুগুণ সম্পন্ন তাঁর তন্মাত্রার আলো তত উজ্জ্বল আর কমনীয় হবে। যারা রাজসিক তাদের তন্মাত্রার আলো একটু লালচে আলো, আর যারা তামসিক তাদের কালো তন্মাত্রা। তন্মাত্রার আলোর রকমফের সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা দেখতে পাইনা। প্রত্যেক মানুষের আসল ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় এই তন্মাত্রার দ্বারা, তন্মাত্রা যেমন ধরণের হবে তার ব্যক্তিত্ব, স্বভাব সেই ধরণেরই হবে। যদিও বড় বড় সাধুরা সবার সাথে মেলামেশা করতে চান না কিন্তু তাও কারুর সাথে কথা বলার আগেই তিনি বুঝে নেবেন লোকটি কি ধরণের তন্মাত্রা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। সেইজন্য সাধকদেরও বলা হয় সবার সাথে মেলামেশা করতে নেই। দেখতে সুন্দর, ভালো কথা বলতে পারেন, বুদ্ধি ভালো – এ সবার কোন দাম নেই, দামী হল তন্মাত্রাটা কি রকম! তন্মাত্রা তন্মাত্রায় পরস্পর মেলামেশা হওয়ার সময় যার মধ্যে তামসিক তন্মাত্রা বেশী সে অন্য তন্মাত্রাকে গ্রাস করে ফেলে। সেইজন্য খারাপ লোকেরা অতি সহজে ভালো লোকদের খারাপ পথে নিয়ে যেতে পারে। যদি কারুর কোন উপায় না থাকে, যেখানে তাকে এ ধরণের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবেই, বা সে যে পরিবারে আছে সেই পরিবারেই যদি তামসিক তন্মাত্রার লোক থাকে, তখন এই তন্মাত্রার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য তাকে অনেক বেশী খাটতে হয়। যেমন ধরণের মানুষের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করব তেমন তেমন তার তন্মাত্রা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ভালো সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে গেলে মনের মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর ভাব জাগ্রত হয়, অন্য দিকে দৃষ্ট, অসৎ লোকের কাছে গেলে আমাদের অস্বস্তি বোধ হতে থাকে।

যেমন মানুষের সঙ্গে তন্মাত্রার ব্যাপার জড়িয়ে থাকে তেমনি দ্রব্যের সঙ্গেও তন্মাত্রা জড়িয়ে থাকে। স্বামীজী যখন সহস্রদ্বীপে ছিলেন, সেখানে তাঁর অনেক শিষ্য-শিষ্যা ছিল। একদিন স্বামীজী কয়েকজন শিষ্যদের নিয়ে ভ্রমণ করছেন। রাহুয় একটা চিরুনি পড়েছিল। চিরুনিটা তুলে স্বামীজী খুব আগ্রহ নিয়ে বলছেন ‘বল বল! এই চিরুনিটা তোমাদের মধ্যে কার’। সঙ্গে যে দুজন ছিলেন, তাঁরা দুজনেই বললেন ‘এই চিরুনি আমাদের নয়’। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, যেন একটা তপ্ত লৌহ দণ্ডে তিনি হাত দিয়েছেন, হাত যেন পুড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে চিরুনিটা তুলেছিলেন এই কারণে, নিজের পরিচিতদের যেন একটা সেবা করে দিচ্ছেন। কিন্তু যখন দেখলেন অজানা লোকের চিরুনি তখন সেটা স্পর্শ করলেও যার চিরুনি তার তন্মাত্রা এসে যাবে। সন্ন্যাসী অন্য সন্ন্যাসীর বিছানাতেও বসবেন না, অপরের চেয়ারে বসবেন না। এগুলো সবই তন্মাত্রার ব্যাপার। যেখানে দশকর্মা, ষোড়শকর্মা হয়ে থাকে, যেমন বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ির খাবার-দাবারে, সেখানকার জিনিষপত্রে তন্মাত্রা একেবারে পোকার মত গিজ্গিজ্জ করে। যাঁরাই আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছেন প্রথমেই তাঁদের এইসব নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াটা একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়। তন্মাত্রার ব্যাপারে স্বামীজী খুব জোর দিয়ে এখানে অনেক কথা বলেছেন।

স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – যেমন ফুলের সৌরভ বায়ুতে প্রবাহিত হয়ে আমাদের নাসিকায় সুগন্ধ বহন করে আনে কিন্তু আমরা ফুলের গন্ধ দেখতে পাইনা, কেননা এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণিকা মাত্র। যে তন্মাত্রার কথা এখানে বলা হচ্ছে এগুলোও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণিকা মাত্র। প্রকৃতি থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসছে সবটাই সূক্ষ্ম কণিকা। প্রকৃতি হল তিনটে গুণের সংমিশ্রণ। সেখান থেকে মহৎ যেই বেরিয়ে এলো সেটাই সব থেকে সূক্ষ্ম কণিকা। সেখান থেকে অহঙ্কার, সূক্ষ্মতা আরেকটু কমল, অহঙ্কার থেকে যখন পঞ্চ তন্মাত্রা বেরিয়ে এলো তখন ওগুলো একটু ভারী হল। কিন্তু ভারী হলে কি হবে, এই চোখ দিয়েতো দেখাই যাবে না, এমনকি মাইক্রোস্কোপ বা টেলিস্কোপ দিয়েও দেখা যাবে না। আমরা

খালি চোখে ইলেকট্রনই দেখতে পাইনা, তন্মাত্রা তো আরো অনেক দূরের ব্যাপার। তন্মাত্রাগুলো যখন পরস্পর মিশতে শুরু হয় তখন আরো একটু ভারী হয়, এখনও এদের দেখা যাবে না। এরপর আরও যখন পরস্পর সংমিশ্রণ হতে হতে ওখান থেকে যখন স্থূল জগতের রূপ নেবে, মাটি, গাছপালা জীব জন্তু তৈরী হয়ে যাবে তখন সব কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। চোখের সামনে যা কিছু দেখছি সবই সূক্ষ্মভূত দিয়ে তৈরী, এই সূক্ষ্মভূত গুলি তৈরী হয় আরও সূক্ষ্ম ভূত দিয়ে, শেষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মনে, এই মনও খুব সূক্ষ্মভূতের কণিকা দিয়ে তৈরী। মন বলতে আমরা ভাবি মন যেন কোন বায়বীয় পদার্থ। কিন্তু তা নয়, মনও খুব সূক্ষ্ম ভূত দিয়ে তৈরী। ফুলের গন্ধ আমরা দেখতে পাই না, কারণ ফুলের গন্ধও খুব সূক্ষ্ম কিছু কণিকার সংমিশ্রণ। এখানে তন্মাত্রাগুলো কিছুটা বোঝা যায়। স্নো, পাউডার আমরা দেখতে পাই, কারণ এর particles গুলি darker and heavier। কিন্তু ফুলের গন্ধকে দেখা যাচ্ছে না, ফুলে পৃথিবী তত্ত্ব আর জল তত্ত্ব আছে। কিন্তু সেটাই যখন বায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসছে তখন খুব সূক্ষ্ম হয়ে গন্ধ তৈরী করে আমাদের নাকে আসছে আর বলছি ফুলের কি সুন্দর গন্ধ।

ঠিক সেই রকম, যে পদার্থ কণিকা, যাকে আমরা তন্মাত্রা বলছি, এই তন্মাত্রা দিয়ে আমাদের স্থূল শরীরও তৈরী। তন্মাত্রা আমাদের যেমন ঘিরে রেখেছে তেমনি শরীরও শরীরের তন্মাত্রাগুলি অনবরত বাইরে ছেড়েই যাচ্ছে। শুধু যে শরীরই তন্মাত্রা ছাড়ছে তা নয়, শরীরের দ্বারা যা কিছু ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে, সেও একই তন্মাত্রা ছেড়ে যাচ্ছে। যেমন আমার হাতঘড়ি, আমার মানসিকতা যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী আমার হাতঘড়িকেও সেই একই তন্মাত্রা ঘিরে রেখেছে। একই কোম্পানির ঘড়ি যদি অন্য কেউ ব্যবহার করে থাকে তখন ওর তন্মাত্রা অবশ্যই আলাদা হবে। এই ঘড়ি আমার শরীর থেকে, আমার যে স্বভাব, সংস্কার আছে সেখান থেকে কিছু তন্মাত্রা গ্রহণ করছে, অন্য একজনের কাছে যদি ঐ একই কোম্পানির ঘড়ি থাকে তাহলে সেই ঘড়ি তার শরীর, স্বভাব, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তন্মাত্রা নিয়ে নেবে। আর ঘড়ির যে নিজস্ব তন্মাত্রা সেটা আমি গ্রহণ করছি। যেমন কারুর হাতে যদি একটা তরবারি দিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার সেটাকে নিয়ে ঘোরাতে ইচ্ছে হবে, মানে তরবারির তন্মাত্রা তাকে ঘিরে ফেলেছে। একটা পিস্তল হাতে নিলেই ইচ্ছে হবে একটা কিছুকে তাগু করে গুলি ছুড়ি। ভেতরে হিংসা বৃত্তি যেটা সূক্ষ্ম হয়ে রয়েছে পিস্তলের তন্মাত্রা সেই হিংসা বৃত্তিকে জাগিয়ে দিল। দুজনে একই সঙ্গে বাজারে গিয়ে একই দোকান থেকে একই কোম্পানীর ঘড়ি একই সময়ে কিনল। কিছু দিন ব্যবহার করার পর যদি কোন যোগীকে দেওয়া হয় তখন তিনি পরিষ্কার বলে দেবেন – এই ঘড়ি যিনি ব্যবহার করেছেন তিনি একজন ভালো লোক আর এই ঘড়ি যিনি ব্যবহার করেছেন তিনি একজন মন্দ লোক। যোগীরা এগুলো স্পষ্ট দেখতে পান। সেইজন্য ভক্তরা তাদের গুরুর ব্যবহৃত কোন জিনিষ, সাধুদের ব্যবহার করা কোন জিনিষ কোনভাবে সংগ্রহ করে নিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তাঁরাও মনে করেন ঐ জিনিষ গুলির সাথে ভালো তন্মাত্রা জড়িয়ে আছে। সাধুদের তাই খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়, কোন সন্ন্যাসী যেন গৃহস্থের কোন ব্যবহৃত জিনিষ ব্যবহার না করেন, এমনকি কাছেও যেন না রাখেন, এক সেকেণ্ডের জন্যও নয়। শুধু তাই নয়, গৃহস্থের যে জিনিষটার প্রতি আসক্তি পড়ে গেছে সেই জিনিষটাও সাধুরা ব্যবহার করবেন না। কারণ তন্মাত্রা মারাত্মক ভাবে প্রভাব ফেলে। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তো ভগবানই সন্ন্যাসীদের রক্ষা করেন। যে পাত্রে রান্না হচ্ছে সেই পাত্রে তন্মাত্রার ভাইরাস কম্পিউটারের ভাইরাসের মত গিজ্জিগ্জ করছে।

স্বামীজী তন্মাত্রাকে আবার অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে বলছেন – মন্দিরাদি কোন পবিত্র জায়গায় কিছুক্ষণ বসলে আমাদের মন শান্ত পবিত্র হয়ে ওঠে, এর পেছনেও একই কারণ, ওখানকার তন্মাত্রা ভালো তাই। বেলুড় মঠের মন্দিরে ঠাকুরের মূর্তি আছে বলে কি ওখানকার সব তন্মাত্রা ভালো হয়ে গেল? আদপেই না। ওখানে যাঁরাই গেছেন তাঁরা সং চিন্তন করেছেন, সং চিন্তন করে করে যে তন্মাত্রা ওখানে ছাড়ার ফলে ওখানকার তন্মাত্রাগুলি সত্ত্বগুণে পূর্ণ হয়ে গেছে, যার জন্য মনটাও সত্ত্বগুণে ভরে যাচ্ছে। কয়েক মাস বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দিরে সব সাধুদের ঢোকা বন্ধ করে দিয়ে যত ডাকাত, স্মাগলার, চোর, বদমাইসদের ওখানে নিয়ে আসতে থাকুন, কয়েক দিন পর পবিত্র বেলুড় মঠের মন্দিরকেই একটা কষাই খানার মত মনে হবে। আবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির যান, সেখানে বেলুড় মঠের

মত মনের মধ্যে শান্ত পবিত্রতার ভাব আসে না। বেলুড় মঠের মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই সবারই অন্য রকম মনের ভাব হয়ে যায়। ইদানিং কালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সব কিছুই হচ্ছে, আর যা হচ্ছে তা দক্ষিণেশ্বরের ভালো ভালো তন্মাত্রা গুলিকে খারাপ করে দিচ্ছে, যেমন তেমন তন্মাত্রা নয়, অবতার বরিষ্ঠ সাধনা করে করে যে প্রচণ্ড শুভ শক্তিশালী তন্মাত্রা ওখানে তৈরী করে গিয়েছিলেন সেই শক্তিশালী তন্মাত্রাকেও নষ্ট করে দিয়েছে। সত্যিই খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেইজন্য সাধকদের নিষেধ করা হয় এদিক সেদিক বেশি ঘোরাঘুরি করতে, বিশেষ করে যারা রাজযোগের সাধনা করেন তাদেরকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয় ভিড় ট্রেনে বাসে বেশী ঘোরাঘুরি করতে, যার তার সঙ্গে মেলা মেশা করতে। কারুর সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা বাক্যালাপ করতেও কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়। আরও বাজে হয় যদি কোন দুশ্চরিত্র বদ লোকের কাছাকাছি দাঁড়িয়েও থাকে তাতেও তার যে শুভ ভালো তন্মাত্রা তৈরী হয়েছে সেগুলিকে নষ্ট করে দেবে। সে যদি হাত ধরে, পায়ে হাত দেয় তাতেও অপরের তন্মাত্রা খারাপ হয়ে যাবে। আর এই ধরণের লোকের কোন জিনিষ যদি বদলা-বদলি হয়ে যায় তখন তার সর্বনাশ হতে আর বেশি দেরী হবে না। বাইরে হোটেল রেস্টুরেন্টে যে সব প্লেটে খাবার পরিবেশন করা হয় সেগুলিতে যে কি পরিমাণ অশুভ তন্মাত্রা রয়েছে ভাবাই যায় না। বাধ্য হয়ে আমাদের খেতে হয়, কিছু করার থাকে না। কিন্তু যাঁদের শুভ তন্মাত্রা খুব শক্তিশালী তাঁদের এসব জায়গায় খেতে গেলে বমি এসে যাবে। অবশ্য আমাদের মত সাধারণ লোকেদের এগুলোকে নিয়ে বেশী চিন্তা করলে শুচিবাদ এসে যাবে, তাই একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়, তা নাহলে আমরা কোথাও চলা ফেরাই করতে পারবো না। কিন্তু যেটা বলা হল এটা ঘটনা, তন্মাত্রা এই ভাবেই কাজ করে। আর যাঁরা যোগী হতে চাইছেন তন্মাত্রার ব্যাপারে তাঁদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।

বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই তন্মাত্রার উপর খুব জোর দিতে দেখা যায়। বৈষ্ণবদের কোন দ্রব্য কেউ ছুঁয়ে দিলেও তার মধ্যে স্পর্শ দোষ এসে যাবে। বৈষ্ণবরা স্পর্শ দোষকে খুব বেশী মানে। সাধু সন্ন্যাসীদের স্পর্শ দোষের বাইরে আরেকটা আছে পণ্ডত দোষ। সাধু সন্ন্যাসীরা যেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন সেখানে গৃহীদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এমনকি বাইরের সম্প্রদায়ের সাধুদেরও অনেক জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হয় না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রামানুজ তিনটে দোষের কথা বলেছেন – আশ্রয়দোষ, নিমিত্তদোষ আর গুণদোষ। কিছু জিনিষ আছে তার গুণটাই খারাপ। যেমন আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা পেঁয়াজ রসুন খেতেন না, মুরগী খেতেন না, এগুলো গুণদোষের মধ্যে পড়ে, জিনিষটার মধ্যেই দোষ। আশ্রয়দোষ মানে, জিনিষটা কার বা কে নিয়ে এসেছে, আজকের দিনের ভাষায় বলা যেতে পারে কে স্পনসর্ করেছে। আগেকার দিনে বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে রেলওয়ে স্টেশনে হকাররা হিন্দু পানি, মুসলমান পানি বলে চেষ্টাত। হিন্দুরা তো কোন মতেই মুসলমানের হাতে জল খাবে না, কারণ হিন্দুরা মুসলমানদের ম্লেচ্ছ মনে করে। মুসলমান, খ্রিষ্টান মানেই ম্লেচ্ছ, এদের ছোঁয়া জল হিন্দুরা কোন মতেই খেতো না। এটাই আশ্রয় দোষ। তাহলে এখন আমরা যার হাতে জল না খাওয়া আর মানছি না কেন? এখন আমরা ধর্মই মানি না। আশ্রয়দোষের পর আসে নিমিত্তদোষ, যেমন শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে নেই, এটাই নিমিত্ত। কিসের নিমিত্ত? পিতৃদের নিমিত্তে অন্ন নিবেদন করা হয়েছে। যাঁরা ঈশ্বরের সাধন-ভজন করছেন তাঁদের জন্য পিতৃদের অন্ন একেবারেই ভালো নয়।

অনেক দিন আগে তারাপীঠে একজন সন্ন্যাসী গিয়েছিলেন। সেখানে একজন তাঁর পরিচিত এক মহিলার সঙ্গে দেখা হতেই সন্ন্যাসীকে খুব করে অনুরোধ করেছে আমার বাড়িতে চলুন। যাই হোক উনি গেছেন, মহিলাটিও ভাত ডাল, পাঁচ ছয় রকমের ব্যঞ্জন করে সাধুকে খাওয়াচ্ছেন আর খুব শ্রদ্ধা নিয়ে হাতজোড় করে মহিলাটি সাধুর সামনে বসে আছেন। সাধুটি বলছেন ‘আপনি এত শ্রদ্ধা ভক্তি করে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াচ্ছেন! কী ব্যাপার বলুন তো?’ ‘হ্যাঁ বাবা, আমার ছেলের খুব অসুখ, কিছুতেই সারছে না, একজন তান্ত্রিক বলেছেন কোন সাধুকে খাওয়ালে ছেলে ঠিক হয়ে যাবে’। ব্যস্, শুনেই সাধুটির তো খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠে গেছে। শুনেই ওখানেই যতটুকু খাওয়া হয়ে গিয়েছিল বাকি সব খাবার ফেলে রেখে চলে এলেন। পরে সাধুটির প্রচণ্ড শরীর খারাপ হতে শুরু করল যার জন্য তাঁকে অনেক দিন ভুগতে হয়েছিল, এটাই নিমিত্তদোষ। যাঁরা যোগী হতে চান তাঁদের প্রথমেই নিজের

চারিদিকে লক্ষণ রেখা দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। যেদিন আপনি ঠিক করে নিলেন আমি ঈশ্বরের পথে এগোতে চাইছে, আমি ধর্মের পথে এগোতে চাইছে, প্রথমেই আপনাকে লক্ষণ রেখা টেনে দিতে হবে। ওই গণ্ডির মধ্যে যে কজন আছে তাদের বাইরে বেশী কারুর সঙ্গে কথা বলা, মেলামেশা করা, সম্পর্ক রাখা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। যে কোন পথের আধ্যাত্মিক সাধনার জীবনে তন্মাত্রার যে কী প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষ ধারণাই করতে পারবে না।

ঠাকুর স্বয়ং অবতার, তিনিও কুলপি খেতে গিয়ে দেখছেন এক দেড়ে মুসলমানের হাত থেকে নিতে হচ্ছে, তিনিও কুলপি খেতে পারলেন না, সেখান থেকে ফিরে চলে এলেন। আমাদের মন এখন কাঁচা। কাঁচা মনের উপমা দিতে গিয়ে বলেন যখন মাটির হাড়ি তৈরী করা হয় তখন কাঁচা থাকে, একটু জল পড়লেই নষ্ট হয়ে যাবে। হাড়ি আঙনে পোড়ানো হয়ে যাওয়ার পর ওতে যতই জল ঢালুন কিছু হবে না। স্বামীজী আমেরিকাতে যাদের বাড়িতে থাকছেন তারা যা দিচ্ছে সবই নির্বিচারে খেয়ে যাচ্ছেন। সেই খাবারে কিসের মাংস দিচ্ছে কেউ জানতোও না। আর জানার দরকারই বা কি। কালাপানি পেরিয়েছেন বলে স্বামীজীর নামে বাংলার পণ্ডিতরা কত ভাবে নিন্দা করছিলেন, তারপর বিদেশে যার তার হাতে রান্না খাওয়া নিয়ে কত কথা। স্বামীজী শুনে বলছেন, তোমাদের পণ্ডিতদের বলো কলকাতা থেকে কয়েকটা ব্রাহ্মণ রাঁধুনি আর গঙ্গাজল পাঠিয়ে দিতে। স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্ব অন্য ধাঁচের, তাঁর মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা এসে গেছে যে যেখানে তন্মাত্রার কোন শক্তিই নেই যে স্বামীজীকে প্রভাবিত করবে। যারা সাধনার অবস্থায় আছে এগুলো তাদের জন্য।

যে কেউই সাধনা করে করে যখন গভীরে যাবে তখন তন্মাত্রা ও তার কার্যাবলীকে সে পরিষ্কার দেখতে সক্ষম হবে। ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনায় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। কোন খারাপ লোক জল নিয়ে এসেছে, ঠাকুর না জেনে একটু মুখে দিয়েই ওয়াক্ থু করে ফেলে দিয়েছেন। ঠাকুর তাকে চেনেনই না, সে কে, কি করে, কোথায় থাকে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তি কালে ঐ লোকটির ব্যাপারে অনুসন্ধান নিয়ে দেখেন লোকটি সত্যিই খুব দুশ্চরিত্র ছিল। আরেকবার ঠাকুরকে একবার পরীক্ষা করার জন্য নরেন তাঁর বিছানার চাদরের তলায় একটা এক টাকার মুদ্রা লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঠাকুর এসে বিছানায় বসতেই ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত লাফিয়ে উঠলেন। ধাতুর তন্মাত্রাকে ঠাকুর কিছুতেই নিতে পারতেন না। যেহেতু তিনি কোন ধাতু দ্রব্যকে স্পর্শ করতে পারতেন না তাই বিছানাতে বসতে গিয়েই ঐ ধাতুর তন্মাত্রা তাঁকে বিদ্যুতের মত শক্ মেরেছে, তিনিও তাই লাফিয়ে উঠলেন। একদিন রাজা মহারাজ, তখন তিনি ছিলেন রাখাল, বন্ধুদের কাউকে কোন মিথ্যে কথা বলে বাইরে থেকে ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর রাখালকে দেখেই বলছেন ‘আমি তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। তুমি কোথায় কি গোলমাল করে এসেছিস’? মিথ্যে কথা বলাতে রাখালের তন্মাত্রা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওখানে আর কেউ রাখালের চেহারার পরিবর্তনটা ধরতেই পারলেন না। আমরা এগুলো গালগল্প মনে করতে পারি, কিন্তু গালগল্প তিনি কেন করতে যাবেন যাঁর জীবনে এই ধরণের প্রচুর ঘটনা দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে এই কথা বলতে যাচ্ছেন না যে পরে ওনার নামে বই লেখা হবে, আর সেই বইতে এই ঘটনার উল্লেখ থাকবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, পরবর্তি কালে রাখাল মহারাজ নিজে তাঁর স্মৃতি কথাতে এই ঘটনাকেই উল্লেখ করেছেন। নিজেকে ছোট করা হবে না ভেবে তিনি স্বীকার করে বলছেন ‘হ্যাঁ, তিনি আমাকে এই কথা বলেছিলেন’। এগুলো ঘটনা, আর সত্যিই এই রকমই হয়।

স্বামীজী এই সূত্রে তন্মাত্রার ব্যাপারটা খুব বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন অসৎ চরিত্রের লোকগুলো যদি সৎ জায়গায় যেতে শুরু করে তাহলে ঐ সৎ জায়গাটা অসৎ লোকের তন্মাত্রাতে সৎ জায়গার পরিবেশটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। বৃন্দাবনেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একই জিনিষ হয়েছিল। বৃন্দাবনের অনেক স্থানেই ঠাকুর গিয়েছিলেন কিন্তু সব জায়গাতে তাঁর কিছুই ভাব বা অনুভূতি হয়নি। কিন্তু অন্য এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে যেতেই তিনি ভাবে বেহুঁশ হয়ে গেলেন কারণ শ্রীকৃষ্ণের সময়কার তন্মাত্রাগুলো এখনও সেখানে আগের মতই প্রভাবশালী রয়েছে।

সাধনা করে করে অনুভূতি যত গাঢ় হতে থাকবে তত এই তন্মাত্রাগুলিকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। এইভাবে এগোতে থাকবে যখন মহৎ তত্ত্বে চলে যাবেন তখন তিনি cosmic mindকেও দেখতে পান। Cosmic mind কে যখন দেখতে সক্ষম হয়ে গেলেন তখন তিনি ইচ্ছে করলে সবার মনের কি ভাব, সবাই মনে মনে কি চিন্তা করছে সব জেনে নিতে পারবেন। শুধু জেনে নেওয়াই নয়, ইচ্ছে করলে কারুর স্বভাব, চরিত্রকেও তিনি পাল্টে ঈশ্বরাত্মিমুখী করে দিতে পারেন। যারা সত্যিকারের বড় মহাত্মা বা সাধু তাঁরা ইচ্ছে করলে আমাদের স্বভাবকেই পাল্টে দিতে পারেন। আমরা বুদ্ধের জীবনে, যীশুখ্রীষ্টের জীবনে এই ধরণের বহু ঘটনা দেখতে পাই। একটা শব্দ ব্যবহার করেই তাঁরা কত লোকের জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন। কোথা থেকে তাঁদের এই শক্তি এসেছে? কারণ তাঁরা মহৎ এর মালিক হয়ে গিয়েছিলেন, cosmic mind কে এনারা জয় করে নিয়েছিলেন।

ধ্যানের মধ্যে নিজের সব তন্মাত্রাকে যখন পরিষ্কার দেখতে সক্ষম হবে, তখন সে অন্য সবার তন্মাত্রাকেও দেখতে পারবে। যেমন ইলেকট্রিক লাইন করা, ইলেকট্রিক টেস্ট কীভাবে করতে হয় যদি কেউ শিখে নেয়, তখন সে নিজের বাড়িতেও ইলেকট্রিক টেস্ট করতে পারবে আবার অপরের বাড়িতেও ইলেকট্রিক টেস্ট করতে পারবে। তন্মাত্রার ক্ষেত্রে যেমন হবে, মনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হবে। যখনি নিজের মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে নেবে তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মনের নিয়ন্ত্রণও সে করতে পারবে। তবে যোগীরা বিশেষ কোন পরিস্থিতি ও কারণ ছাড়া এগুলো কখনই করতে যান না।

আমরা দেখলাম অলিঙ্গম্ মানে প্রকৃতি। কিন্তু লিঙ্গম্ হল মন। মন হল দুই – সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন। মনের এই তত্ত্ব সাংখ্য থেকে বেদান্তও নিয়েছে। সমষ্টি মনকে বলা হয় মহৎ আর ব্যষ্টি মনকে মন বলছেন। এখানে একটা জিনিষ সব সময় মাথায় রাখতে হবে, যোগে যখনই মন বলা হয় তখন দুটো পরিভাষা পরিষ্কার ভাবে আলাদা করে নেওয়া হয়, একটা চিত্ত আরেকটি বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু আমাদের ভেতরে যাচ্ছে তাতে চিত্তে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং এই চিত্ত বিক্ষিপ্তের জন্যই আমরা জগৎকে জানতে পারছি। নিদ্রা, স্মৃতি, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প সবটাই এই চিত্ত বিক্ষিপ্তের মধ্যে পড়ে। যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি সেটাও যেমন আছে, তেমন কল্পনা দিয়ে জানছি সেটাও আছে, সেই রকম ভুল, ভ্রান্তি, স্বপ্ন, স্মৃতি যা কিছু দেখছি সবটাই এই চিত্ত বিক্ষিপ্তের অন্তর্গত। এর থেকে বুদ্ধি আবার সম্পূর্ণ আলাদা। চিত্ত শুধু তথ্য সংগ্রহ করে আর বুদ্ধি দিয়ে এই জগৎ চলে। তথ্য সংগ্রহ করা বুদ্ধির কাজ নয়।

সৃষ্টি কি চৈতন্য থেকে হয়, নাকি জড় থেকে

জগৎ আগে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি বুদ্ধি আগে সৃষ্টি হয়েছে? এই প্রশ্ন নিয়ে প্রচুর বিতর্ক চলে। বৈজ্ঞানিকরা সব সময় বলবে প্রথমে জগতের সৃষ্টি। যেমন বিগ ব্যাঙ থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে বুদ্ধির জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকরা আবার বুদ্ধি না বলে বলেন চৈতন্য। চৈতন্যের সৃষ্টির উপর ইদানিং বিজ্ঞানে প্রচুর সেমিনার, গবেষণাদি হচ্ছে। কিন্তু যেখানেই ধর্ম আছে, তা যে ধর্মই হোক, উচ্চমানের ধর্ম হোক, সাধারণ মানের ধর্ম হোক, সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন সৃষ্টি সব সময় হয় চৈতন্য থেকে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আর ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনা করে স্বামীজী বলছেন – প্রত্যেক ধর্মই বলছে এই জগৎ চৈতন্যশক্তি থেকে এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে প্রথমে জড়ই ছিল, জড়ের মধ্যে বিবর্তন হতে হতে জীবকোষ, উদ্ভিদ, জীবানু, ব্যাকটেরিয়া, তারপরে জীবজন্তু থেকে মানুষের সৃষ্টি হল। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে চৈতন্যও উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে। কিন্তু বেদান্তের মত এই ধারণার ঠিক বিপরীত। বেদান্ত বলছে *জন্মাদস্য যতঃ*, সৃষ্টি ভগবান থেকে এসেছে। অর্থাৎ প্রথম থেকে চৈতন্যই আছেন, আর চৈতন্যের উন্নতির ধারা অনুসারে বিভিন্ন স্থূলভূতের প্রকাশ হতে থাকে আর এইভাবেই আজকের মানবজাতির আবির্ভাব হয়েছে। অন্য দিকে মুসলমানরা বলছে আল্লা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাতো জড় নন, তিনিও চৈতন্য সত্তা। খ্রিস্টানরা বলছে *God created this world*। খ্রিস্টানদের যে গড় তিনিও চৈতন্য সত্তা। বৌদ্ধ ধর্মও চৈতন্যকেই শেষ কথা বলছেন। ধর্মের পথে যাঁরাই এসেছেন, সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথমেই বলবেন চৈতন্য থেকেই সৃষ্টি এসেছে। বিজ্ঞানীরা

বলছেন, সৃষ্টি হয়েছে তারপর চৈতন্য এসেছে, সৃষ্টি আগে চৈতন্য পরে। স্বামীজী এখানে খুব মজার একটা কথা বলছেন যে বক্তব্য অন্য কোন দর্শনে পাওয়া যায় না। তিনি বলছেন এই দুটি সিদ্ধান্তই সত্য। স্বামীজী বোঝাবার জন্য বলছেন – একটি অনন্ত শৃঙ্খল কল্পনা কর, যেমন ক+খ+ক+খ+ক+খ এইভাবে। ‘ক’ হচ্ছে চৈতন্য আর ‘খ’ হচ্ছে জড়। চৈতন্য থেকে জড় এসেছে তারপর আবার জড় থেকে চৈতন্য, আবার চৈতন্য থেকে জড়, আবার জড় থেকে চৈতন্য – এটা যেন একটা অনন্ত শৃঙ্খল, অনন্ত কাল ধরে চলছে, জড় বুদ্ধিকে জন্ম দেয় আবার বুদ্ধি জড়কে জন্ম দেয়। এখন এই শৃঙ্খলটাকে কে কোথায় ধরছে তার ওপর নির্ভর করে বলবে জড় থেকে চৈতন্যের জন্ম না চৈতন্য থেকে জড়ের জন্ম। যদি তুমি শৃঙ্খলের প্রথমে ‘ক’ ধর তাহলে বলবে চৈতন্য আগে এসেছে আর যদি ‘খ’ ধর তাহলে বলবে জড় আগে এসেছে। ভারতীয়রা বা বিশ্বের সব ধর্মই ওপর থেকে নীচের দিকে গেছে আর বিজ্ঞানীরা এর ঠিক বিপরীত দিক থেকে, মানে নীচ থেকে ওপরের দিকে গেছে। সৃষ্টি যখন আসছে আমরা প্রথমে দেখছি শুধু জড় পদার্থ, সেখান থেকে বিবর্তন হয়ে হয়ে ধীরে ধীরে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মধ্যে আবার বুদ্ধির প্রকাশ সবার থেকে বেশী। আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিষ্কার মনে হয় জড় থেকেই বুদ্ধি আসছে। কিন্তু তার আগেই বুদ্ধি থেকে জড় এসেছে। আবার এই সৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার এখান থেকেই জড় পদার্থের জন্ম হবে। সেখান থেকে আবার বুদ্ধি বেরিয়ে আসবে। এটা এক অনন্ত শৃঙ্খল। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে কোন ধারণাই নেই সৃষ্টিতে যখন সব কিছু নাশ হয়ে যায় তখন ঠিক কি হয় বা সৃষ্টি যেখান থেকে শুরু হল সেখানে তার আগে কি ছিল। বিজ্ঞানীরা বলছেন না যে কিছু ছিল না, ওনারা বলেন এরপরে আমাদের ইকুয়েশন কোন কাজ করে না। যেহেতু কাজ করে না, সেইহেতু আমরা আর কিছু বলবো না।

কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হয় এই তিনটে ধর্মকে নিয়ে, জহুদি, খ্রিস্টান আর ইসলাম। এদের সবার বক্তব্য হল গড বা আল্লা বা জিহোবা ইনি ইচ্ছা মাত্রই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই পর্যন্ত তাও কিছুটা মানা যায় কিন্তু এরপরে আরও মারাত্মক যেটা বলছেন তা হল তিনি একবারই সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এরপর আর কোন সৃষ্টি হবে না। তাহলে এই সৃষ্টি কত দিন চলবে? তার কোন উত্তর এই ধর্মগুলির কাছে নেই। তাহলে সৃষ্টি কবে থেকে শুরু হয়েছে। বাইবেলে তার পরিষ্কার উত্তর আছে, যার হিসাব নিউটনও করে গেছেন, তা হল চার হাজার বত্রিশ বছর খ্রীষ্টপূর্বে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে ভগবান সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এসে যাওয়ার পরে এখনও সমস্ত খ্রিস্টান সমাজ বাইবেলের এই হিসাবকে অন্ধের মত আঁকড়ে আছে। আরও দুর্ভাগ্য যে এই হিসাব জহুদিরাও মানে আর মুসলমানরাও মানে। কারণ মুসলমানরাও ওল্ড টেস্টামেন্টকে অস্বীকার করছে না। মুসলমানদের যদি জিজ্ঞেস করেন সৃষ্টি কবে হয়েছে, ওরাও চোখ কান বুজে বলে দেবে ছয় হাজার বছর আগে। ইদানিং চীন আর অন্যান্য জায়গাতে ভূতাত্ত্বিকদের অনেক খনন কার্যের ফলে যেসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে এবং যেসব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তাতে এখনই বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে দু লক্ষ বছর আগে যে মানুষ ছিল এগুলো তাদের জীবাশ্ম।

আসলে গোলমালটা হল, ধর্মের দুটো সাধন, একটা অন্তরঙ্গ সাধন আরেকটি বহিরঙ্গ সাধন। ধর্মের এই ব্যাপারটা এই সব ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের মাথাতেই ছিল না। যে কোন বিদ্যা যখন মুর্খদের হাতে পড়ে সেই বিদ্যাই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যে পরিবারে সংস্কৃতির চর্চা থাকে সেই পরিবারের সবাই দাঁড়িয়ে যায়, একজন দুর্বল হলে তাকেও তারা এগিয়ে নিয়ে যায়। যে পরিবারে সংস্কৃতির চর্চা নেই, দেখা যায় একজন কোন ভাবে খেটেখুটে বংশে বিরাট বড় কিছু হয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে পেছনে সবাই মুর্খই থেকে যায়। এই তিনটে ধর্মের এটাই সমস্যা। এককালীন সৃষ্টি তত্ত্বের জন্য সমস্যা হল, বিশ্বের যত বিজ্ঞানী হয় তারা খ্রিস্টান নয়তো জহুদী, এরপর বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের পর এরা যখন দেখছে বাইবেলের এই সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কোন কিছু মিলছে না তখন আস্তে আস্তে এরা আর ধর্মকেই মানতে চাইছে না। যার ফলে বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী ধর্ম বিরোধী হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা যখন নিজেদের ধর্ম বিরোধী বলছে, তার মানে তারা খ্রিস্টান ধর্মের বিরোধী। বেদান্তীরাও খ্রিস্টানদের সৃষ্টি তত্ত্ব মানবে না। আমাদের কাছে সৃষ্টি অনন্ত কাল থেকে চলছে আর অনন্ত কাল চলতে থাকবে।

এরপর তোমার বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তই নিক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। স্বামীজী এটাই বলছেন জড় আর বুদ্ধি ‘ক’ ও ‘খ’ এর মত একটা অনন্ত শৃঙ্খল। এখানে মনে রাখতে হবে, জড়ের মধ্যে শুধু চৈতন্যের যে প্রতিবন্ধ পড়ে সেটাকেই আমরা বুদ্ধি বলি। প্রকৃতির কোথাও বুদ্ধি নেই। বেদান্তের দৃষ্টিতে চৈতন্যের সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্কই হবে না। চৈতন্য একমাত্র ব্রহ্মের, একমাত্র আত্মার, একমাত্র ভগবানের, একমাত্র পুরুষের। আমরা যে নামেই বলি না কেন, তাঁকে অন্তর্যামী বলি, আত্মা বলি, পরমাত্মা বলি, ব্রহ্ম বলি, ভগবান বলি এই চৈতন্য তাঁরই। যেমনি জড়ের মধ্যে এই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় তখন তাঁকে বুদ্ধি রূপে দেখায়। ইলেক্ট্রিসিটি এই তারের মধ্যে দিয়ে টিউবলাইটে যাচ্ছে, সেখানে আলো জ্বলছে, টিউবলাইটটাই বুদ্ধি। কারণ সুইচ অফ করে দিলে টিউবলাইটকে একটা আলো বিহীন জড় পদার্থের মত দেখাবে। যেই বিদ্যুৎ প্রবাহ এসে গেল টিউবলাইট পুরো আলোকিত হয়ে গেল। এখন আমরা এই টিউবলাইটকে দেখতে পারবো, টিউবলাইটের আলোর সাহায্যে এক অপরকে দেখতে পারবো। ইলেক্ট্রিসিটি আছে বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। ইলেক্ট্রিসিটিকে কখন ধরা যাবে না, জানা যাবে না।

চৈতন্য সত্তার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। চৈতন্য সত্তা যখনই জড়ের কাছে চলে আসে জড় চৈতন্যের আলোতে ঝলমল করে ওঠে। তখন তাকে বুদ্ধি রূপে দেখায়। ওই বুদ্ধি থেকে যখন মহৎ বা সমষ্টি মন তৈরী হয় তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে স্থূল জগৎ তৈরী হয়। ওই স্থূল জগতে আবার চৈতন্যকে যখন ব্যক্তির স্তরে দেখা যায় তখন ওই সমষ্টি মনই ব্যক্তি স্তরে বুদ্ধির প্রকাশ রূপে দেখায়। সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন এই দুটোতে তফাৎ আছে। দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি সব সময় হয় সমষ্টি মন থেকে। আবার যখন বলছি জড় থেকে বুদ্ধি দেখাচ্ছে, তখন সেটা ব্যক্তিগত স্তরেই দেখাচ্ছে। এই শৃঙ্খল চলতেই থাকে। বিজ্ঞানীরা প্রথমে জড়কে ধরে সেইজন্য বলে বুদ্ধি পরে এসেছে। আর ধর্মপ্রাণ লোক তাঁরা বুদ্ধি মানে ভগবানকে আগে ধরছেন বলে বলছেন চৈতন্য সত্তা থেকে সৃষ্টি এসেছে। যোগদর্শনে এগুলোকেই খুব গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের আগে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতি অর্থাৎ যে তিনটে গুণের কথা বলা হয়েছে, সত্ত্ব, রজো আর তমো এরা চারটে অবস্থায় থাকে – বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্রম্ ও অলিঙ্গম্। অর্থাৎ স্থূল জগৎ, স্থূল জগতের পেছনে তন্মাত্রা, তন্মাত্রার পেছনে বুদ্ধি আর তিনটিরই মা হল প্রকৃতি।

কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো শুধু তথ্য মাত্র, আমাদের কাছে মূল ব্যাপার হল উদ্দেশ্যটা কি জানা। আমাদের উদ্দেশ্য সব কিছুর পারে যিনি পুরুষ বা আত্মা রয়েছেন তাঁকে জানা। পুরুষ, তিনি প্রকৃতির পারে। অথচ পুরুষের চৈতন্যের আলোতে সমগ্র প্রকৃতি আলোকিত। আমি যখন কারুর প্রশংসা করে বলি – এ খুব ভালো লোক, ওকে দেখতে কত সুন্দর, তাকে কি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমি সবার কিসের প্রশংসা করছি? হয় শরীরের প্রশংসা করছি, নয়তো বুদ্ধির প্রশংসা করছি আর তা নাহলে চরিত্রের প্রশংসা করছি, কিন্তু শরীর, মন, বুদ্ধি এগুলো সবই জড় পদার্থ। যেহেতু পুরুষ সব কিছুর পেছনে অবস্থান করে আছেন, সেইহেতু এদের সবাইকে চৈতন্যবান বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হল সেই পুরুষের দিকে আমরা কেউ তাকাই না, পুরুষের যে আলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সেই প্রতিবিম্বিত আলোতেই মুগ্ধ হয়ে জড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, উৎসের দিকে দৃষ্টি দিই না।

সবাই চাঁদের প্রশংসা করে, চাঁদের কী শোভা, চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে প্রকৃতি কি সুন্দর রূপ ধারণ করেছে ইত্যাদি। কিন্তু সূর্য যে পরিমাণ আলো চাঁদকে বিতরণ করছে তার মাত্র শতকরা ছয় ভাগ আলো চাঁদ বিকিরণ করে ফেরত দেয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চাঁদ আসলে একটা আয়না, সাধারণত যে ধরণের আয়না আমরা ব্যবহার করি সেই তুলনায় চাঁদ অতি জঘন্য একটি আয়না। চাঁদের মত আয়না দিলে মেয়েরা হয়তো আছাড় দিয়ে ভেঙ্গেই ফেলবে, কারণ চাঁদের উপরিভাগ এত এবড়ো-খেবড়ো যে এর প্রতিফলন ক্ষমতা মাত্র ছয় শতাংশ। একটা বেলজিয়াম আয়নার প্রতিফলন ক্ষমতা ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। বেলজিয়াম আয়নাকে নিয়ে কবিরী এখনো পর্যন্ত কোন কবিতা রচনা করেন নি। আর চাঁদের এত জঘন্য প্রতিফলন ক্ষমতা হওয়া সত্ত্বেও যে কোন কবি তার জীবনের প্রথম কবিতাই রচনা শুরু করবে চাঁদকে নিয়ে। এটাই অজ্ঞানের লক্ষণ।

পুরুষ দ্রষ্টামাত্র

এরপরের সূত্রে এটাই বলা হচ্ছে *দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।।২০।।* আঠারো আর উনিশ নম্বর সূত্রে এতক্ষণ শুধু প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রকৃতি মানে সত্ত্ব, রজো ও তমো। এই সত্ত্ব, রজো ও তমো চারটে অবস্থায় থাকে। প্রকৃতি কিসের জন্য আছে? ভোগের জন্য আর অপবর্গ মানে মুক্তির জন্য। কুড়ি নম্বর সূত্রে পুরুষের কথা বলা হচ্ছে। প্রকৃতি একটি সত্ত্বা, তার থেকে পুরো আলাদা একটি সত্ত্বা হল পুরুষ। এখানে পুরুষকে বলছেন দ্রষ্টা। কি রকম দ্রষ্টা? বলছেন *দৃশিমাত্রঃ*, দেখা ছাড়া পুরুষের অন্য কোন কাজ নেই। সেইজন্য অনেক সময় আমাদের ভাষায় গালাগাল দেওয়া হয়, ‘সাংখ্যের পুরুষ’। সাংখ্যের পুরুষ কোন কাজ করবে না, চুপচাপ বসে শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া কোন কাজ নেই। ঠাকুর এরই উপমা দিচ্ছেন – বিয়ে বাড়ি। সবাই দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করছে আর বাড়ির কর্তা এক জায়গায় বসে শুধু ভুরুড় ভুরুড় করে তামাক খেয়ে যাচ্ছে। গিন্নী মাঝে মাঝে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে কিছু বললে ‘হুম্’ বলে কর্তা ঘাড়টি নেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতিই শুধু কাজ করে যাচ্ছে।

পুরুষ দ্রষ্টা, এই দ্রষ্টাই একমাত্র শুদ্ধ পবিত্র। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির মাধ্যম দিয়ে সব কিছু দেখে। শুদ্ধ আলো যদি থাকে আমরা কখন সেই শুদ্ধ আলোকে দেখতে পাবো না। কোন একটা বস্তু না থাকলে শুদ্ধ আলোকে দেখা যাবে না। দিনের বেলায় সূর্য যখন পূব আকাশে থাকে সেই সময় পশ্চিম আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তখন কোন আকাশের দিকে তাকালে বোঝা যাবে না কোন আলো আছে কিনা। কারণ সেখানে কোন বস্তু নেই। কিন্তু যেখানে গাছ আছে, বাড়ি আছে সেগুলো পরিষ্কার দেখা যাবে। ঠিক তেমনি চৈতন্য সত্ত্বা যখন কিছু দেখতে চায় তখন তাঁরও একটা বস্তুর দরকার পড়ে। সেইজন্য দেখার ব্যাপারটা পুরুষকে প্রকৃতির মাধ্যমেই করতে হয়। প্রকৃতি যদি না থাকে পুরুষ কাছে কোন কিছুই দেখার থাকে না। মজার ব্যাপার হল পুরুষ একেবারে পবিত্র, শুদ্ধ এবং তাঁর একটাই কাজ *দৃশিমাত্রঃ*। তাহলে এই যে সে কখন বলছে ‘আমি এখন রেগে আছি’, ‘আমার এখন মন খারাপ’, এই যে ‘আমি’ ‘আমি’ করে যাচ্ছে তার সঙ্গে কখন বলছে ‘আমি দুখী’, ‘আমি সুখী’, অন্য দিকে বলছে ইনি দ্রষ্টা, ইনি আত্মা ইত্যাদি। এগুলো তাহলে কী হচ্ছে? সেইজন্য এনারা স্ফটিক আর লাল ফুলের উপমা নিয়ে আসেন। স্ফটিকের পাশে যদি একটা লাল ফুল রেখে দেওয়া হয় স্ফটিকটাও লাল রঙ দেখাবে। তেমনি নীল রঙের কিছু রেখে দিলে নীল দেখায়, হলুদ থাকলে হলুদ দেখাবে।

আমরা যা কিছু করছি সব মন করে। মনের মধ্যে রয়েছে রাগ আর দ্বেষ, পছন্দ আর অপছন্দ, ভালোবাসা আর বিদ্বেষ ইত্যাদি। পছন্দের মত জিনিষ পেলে আমরা আনন্দ পাই, অপছন্দের জিনিষ পেলে অসন্তুষ্ট হই। সন্তুষ্ট হই আর অসন্তুষ্ট হই দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের কাজ করতে হবে। সন্তুষ্ট হই পেলে তার দিকে এগিয়ে যেতে হয়, অসন্তুষ্ট হই পেলে তার থেকে সরে আসতে হয়। শুদ্ধ পুরুষ বা শুদ্ধ আত্মা এমন ভাবে মনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন যে, মনের খেলা দেখে নিজেকে মনে করে ‘আমি সুখী’ বা ‘আমি দুখী’। কম্পিউটার মানে, শুধু জিরো আর ওয়ানের খেলা। প্রকৃতির তো তাও সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণ কিন্তু কম্পিউটারের এই দুটো গুণ জিরো আর ওয়ান। যখন কম্পিউটারে সিনেমা দেখছি, গান শুনছি, মেল পাঠাচ্ছি, মেল রিসিভ করছি, কম্পিউটারে খেলা করছি যা করছি কম্পিউটার শুধু বোঝে আমার সুইচ অন্ আছে নাকি অফ আছে। জিরো আর ওয়ানের কন্ট্রোলের মধ্যেই কম্পিউটার ঘুরপাক করছে। এই কন্ট্রোলের খেলার মধ্যে গেমস্ খেলে বেশী স্কোর করলে বাচ্চাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, কম স্কোর হলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চলছে জিরো আর ওয়ানের খেলা, কিন্তু এই খেলার মধ্যে সবাই এমন একাত্ম হয়ে যাচ্ছে যে, কখন মন খারাপ হচ্ছে আবার কখন আনন্দে লাফিয়ে উঠছে। সিনেমা মানেও তাই, শুধু আলো আর ছায়ার খেলা। আলোছায়ার খেলায় হারিয়ে গিয়ে আমরা কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। ঠিক তেমনি শুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে এমন জড়িয়ে যায় যে প্রকৃতির খেলাকে নিজের খেলা বলেই মনে করে, তাই পুরুষ কখন বলে ‘আমি সুখী’ কখন বলে ‘আমি দুখী’।

যদিও সে দ্রষ্টা মাত্র, প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই কিন্তু তবুও সে নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দিয়ে, প্রকৃতির সব কিছুকে নিজের মনে করে কখন কষ্টে ভেঙে পড়ছে আবার কখন আনন্দে মেতে উঠছে। এবার আমাদের সবার কথা একবার ভাবুন, আমরা জানি সিনেমা দেখছি তাও নায়ক-নায়িকার বিরহে যখন চোখের জল ফেলছি তখন ভুলে গেছি যে আমি পয়সা খরচ করে এখানে কাঁদতে আসিনি। তাও আমরা সিনেমা দেখি, টিভির সিরিয়াল দেখি আর চোখের জল ফেলি আর তা নাহলে উপন্যাসের মধ্যে ডুবে গিয়ে সেখানেও চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছি। তাহলে ভেবে দেখুন বাস্তব জগতে মা আসক্তি বশতঃ নিজের সন্তানের জন্য কী করবে! নিজেরা সিনেমা দেখে চোখের জল ফেলছে তাও আবার টাকা খরচ করে চোখের জল ফেলতে আসছে সেখানে বাস্তব জগতে তাদের সন্তানের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আর বলার কিছু থাকবে না। অভিনয় মানেই তো মিথ্যা, আমি যেটা নই সেটা করে দেখানোই তো অভিনয়। একজন বিখ্যাত অভিনেতা বলেছিলেন, যদি নিজের ছেলেকে অভিনয় করা শেখাতে চান তাহলে প্রথমে ওকে এমন ভাবে মিথ্যে কথা বলতে শেখান যাতে কেউ ধরতে না পারে। এবার ভাবুন, আপনি যদি দেখেন আপনার ছেলে মিথ্যে কথা বলছে আপনি তাকে গিয়ে একটা চড় মেরে বলছেন ‘জীবনে আর যেন তোমার মুখ থেকে মিথ্যে কথা না শুনি’। অথচ আপনিই আবার অভিনয় দেখার জন্য সিনেমা, টিভি সিরিয়াল দেখার জন্য দৌড়ে যাচ্ছেন। আমাদের শঠতা কোন স্তরে রয়েছে বুঝতে পারছেন! তাহলে পুরুষ আর প্রকৃতির যে মেলবন্ধন হয়ে আছে সেখানে পুরুষের কি দূরবস্থা হবে ভাবাই যায় না। সেইজন্য আমাদের মত লোকেদের প্রশ্ন তুলতেও নেই যে, কেন পুরুষ মনে করে ‘আমি দুখী’ ‘আমি সুখী’। আমাদের সমস্যা এত সাধারণ স্তরের যে ওই উচ্চস্তরের দর্শনের সমস্যা বোঝার ক্ষমতাই আমাদের নেই। এই কারণেই ঠাকুর বলছেন একসের ঘটতে পাঁচ সের দুধ কী করে ধরবে!

যাই হোক, এনারা বলেন আমাদের সবারই মধ্যে কোথাও একটা অমৃতের ভাব সব সময় কাজ করে যাচ্ছে – আমি অমর, আমার মৃত্যু নেই বা আমি কোন দিন মারা যাবো না। কিন্তু অমর মানে যে জিনিষ কখন ওঠা নামা করে না, বাড়েও না কমেও না। কিন্তু যেখানে বুদ্ধির ব্যাপার আসছে, সেখানে নিজেকে সুখী বা দুখী মনে করার ব্যাপারও আসবে, তার মানে সেখানে ওঠা নামা ও বাড়ি কমা থাকবে। শুধু তাই না, শৈশবে বুদ্ধি আমার এক রকম ছিল, আজ সেই বুদ্ধি অন্য রকম। বুদ্ধিরও ওঠা নামা আছে, বুদ্ধিও অনবরত পাল্টে যাচ্ছে। তার মানে, মানুষ যে মনে করে আমি বুদ্ধি, এই মনে করাটা ভুল। এর আগে আমরা আলোচনা করেছি যেখানে আধ্যাত্মিক ব্যাপার আসে সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাজ করে না আর অনুমান প্রমাণও কাজ করে না। ধর্মের ব্যাপারে একমাত্র কাজ করে ঋষিদের কথা। এগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। ঋষিরা বলছেন তুমি অজর, অমর। এই কথা বলে ঋষিরা ছেড়ে দিলেন। এরপর আমি যখন বিচার করছি তখন জানছি আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন আমি এক রকম ছিলাম, আজকে গোঁফ-দাড়ি হয়ে অন্য রকম হয়ে গেছি। তাহলে শরীরতো কখন অজর, অমর হতে পারে না। তাহলে মন অজর অমর। কিন্তু মন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দিত ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে রূপ পরিবর্তন করছে, তাহলে মনও অমর হতে পারে না। মন যদি অমর না হয় তাহলে বুদ্ধি অমর। বুদ্ধি বাচ্চা বয়সে এক রকম ছিল, আজকে অন্য রকম হয়ে গেছে। শরীর, মন ও বুদ্ধি এই তিনটির কোনটাই অজর অমর নয়। কিন্তু শরীর, মন ও বুদ্ধি এই তিনটে বোধের মধ্যেই একটা বোধ সব সময় থাকছে সেটা হল ‘আমি আছি’। ক্লাশ ফাইভে যখন পড়তাম তখন এই বোধ ছিল যে এই নামে আমি আছি, আজ সত্তর আশি বছর হয়ে যাওয়ার পরেও এই বোধটা আছে যে এই নামে আমি আছি। এই আমিভূত্বের বোধটা প্রথমে থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। তাহলে এমন একটা চিরন্তন কিছু আছে যার উপর এই জিনিষগুলো খেলা করছে। ওই একটি চিরন্তনকে কেন্দ্র করে শরীর, মন ও বুদ্ধি ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। সেইজন্য বৌদ্ধবাদীরা বলে ক্ষণিক বিজ্ঞান। যেমন গঙ্গা নদী ক্রমাগত তার জল পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে আমরা একই গঙ্গাকে দেখে যাচ্ছি। বেদান্তীরা আবার বৌদ্ধদের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মানবে না। বেদান্তীরা আরও অনেক যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে বলে বৌদ্ধরা যে বলছে ক্ষণে ক্ষণে নদীর জল পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু নদী একই নদী থেকে যায়। এখানে বলছেন যেখানেই প্রকৃতি আসবে

সেখানেই কার্য-কারণ-সম্পর্ক এসে যাবে। কারণ প্রকৃতি মানেই সত্ত্ব, রজো ও তমো। সত্ত্ব, রজো ও তমো মানে প্রকাশ, গতি ও স্থিতি। যেখানেই প্রকাশ, গতি ও স্থিতি সেখান থেকেই আসে মহৎ, মহৎ মানে মন। মহৎ থেকে আসে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়াদি এই জগৎ সব কিছু আসছে। যেখানেই প্রকৃতির এই খেলা সেখানেই কার্য-কারণ সম্পর্ক আসবে। সেইজন্য কার্য-কারণ সম্পর্ক সব জায়গায় চলে না। কার্য-কারণ সম্পর্ক চলে একমাত্র প্রকৃতির এলাকায়।

আমাদের বাস্তবিক সত্তা শুদ্ধ চৈতন্য, পুরুষই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি। সেইজন্য আমাদের ভেতরে সব সময় দুটো পরস্পর বিরোধী বিচার ধারা চলতে থাকে। প্রথম বিচার ধারাতে বলে, আমি যা খুশী করতে পারি। ‘আমি স্বাধীন’ এই জোরালো বোধটি সব সময় আমাদের ভেতরে যেন ধাক্কা মেরে যাচ্ছে, আর ‘আমি স্বাধীন’ এই মনোভাবই আমাদের দিয়ে বলায় আমি যা খুশী করতে পারি। কিন্তু বাস্তব জগতে সব কিছুই এর বিপরীত। আমি দেখছি সব দিক থেকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে আছি। খিদে পেলে আমাকে খেতে হয়, তৃষ্ণার্ত হলে জলের দিকে ছুটে যেতে হয়। দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে আমি যেতে পারবো না, অথচ মনে করছি আমি যা খুশী করতে পারি। স্বামীজী বলছেন আমাদের মধ্যে এই দুটো সত্তাই আছে – পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনিই অসীম ক্ষমতাবান। যার জন্য জ্ঞানী পুরুষ কোন কিছুতে আবদ্ধ থাকেন না। কিন্তু তিনি যখন এই প্রকৃতির মধ্যে খেলা করেন তখন নিজেও আবদ্ধ হয়ে যান আর তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে তাকেও আবদ্ধ মনে করেন। এটাই এখানে বলা হচ্ছে, যখনই আমি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে রাখবো তখন আমি কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যেও আবদ্ধ হয়ে গেলাম, প্রকৃতির রাজ্যে আমার হাত পা বাঁধা। যেমনি নিজেকে পুরুষের সঙ্গে এক করে দেখবো, যখন নিজেকে চৈতন্য রূপে দেখবো তখন আমি মুক্ত। তাহলে যারা ভক্ত তারা কি দেখছে? ভক্ত জগৎকে সত্য রূপে দেখে, আর এই সত্য রূপ জগতের মালিক হলেন ঈশ্বর। সেইজন্য ভক্তের সম্পর্ক হয়ে যাবে – তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস। ভক্তের অনেক কিছু হয়ে যাবে কিন্তু ওই বোধটুকু থেকে যাবে। যারা ঘোর সংসারী, ঘোর বিষয়ী, সংসারীই হোক আর বিষয়ীই হোক, সে মানুষ আর নাই মানুষ চৈতন্য সত্তা তো তাদের মধ্যেও আছে। ফলে তাদের মধ্যে এই আবদ্ধ ভাবটা বেশী থাকে। যখনই কিছু হারানোর কথা আসে তখন তারা সেটা মেনে নিতে পারে না, ছটফট করে ওঠে। বিদেশীরা সেইজন্য মৃত্যুর কথা শুনতে চায় না, মৃত্যুর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে। আমি একদিন মারা যাব তারা ভাবতেই পারে না, আমাকেও একদিন মরতে হবে ভাবলেই ভয় পায়। কিন্তু যার মধ্যে চৈতন্যের ভাব খুব জাগ্রত তারা মৃত্যুকে বেশী ভয় পায় না।

দ্বিতীয়তঃ এই যে আমাদের ভেতরের ভাব ‘আমি সব কিছু করতে পারি’, বাকি সব কিছু পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু এই ভাবটা কখনই পাল্টাচ্ছে না। এগুলোকে একটু বিচার করলেই বোঝা যায় অনিত্যের মধ্যে নিত্য একটা কিছু আছে। যতক্ষণ আমরা অনিত্যকে ধরে থাকবো ততক্ষণ আমাদের জীবন এক রকম চলবে। অনিত্যকে ছেড়ে যখন নিত্যে চলে আসব তখন জীবন অন্য রকম চলবে। আমরা যদি এই মুহূর্তে ঠাকুরকে তাঁর অবতার রূপকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে শুধু একজন সাধক বা মানুষ রূপে দেখি তখন কামারপুকুরে বা দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে দিকে ঠাকুর সাধারণ মানুষের মতই সব কিছু করলেন। অন্য দিকে তিনি যখন চৈতন্য সত্তাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন, যখন তাঁর হাত ভেঙে যাচ্ছে তখন আবার কোন হুঁশ নেই, দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, খেতে পারছেন না, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাতেও তাঁর কোন হুঁশ নেই। আবার যখন তিনি শরীরের উপর মন নামিয়ে আনছেন তখন তিনি বলছেন আমার হাতে বড্ড ব্যাথা। যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে তখন যিশুরও এই একই জিনিষ হচ্ছে। যখন তাঁর মন অনিত্যে আছে তখন তিনি ভগবানকে উদ্দেশ্যে করে বলছেন ‘হে প্রভু! তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ!’ বলে চুপ করে গেছেন। চুপ করে গেছেন মানে আবার তিনি অনিত্য থেকে নিত্যে চলে গেছেন। প্রকৃতি আর পুরুষের এই নিরন্তর খেলা চলছে তো চলছেই। আমাদের সমস্যা হল, যদিও পুরুষের বোধ থাকে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ। জ্ঞানী পুরুষ যাঁরা, তিনি অবতারই হোন আর সিদ্ধ পুরুষই হোন, তাঁরা বাচ খেলতে পারেন, এই পুরুষের সঙ্গে আছেন আবার এই প্রকৃতির সঙ্গে আছেন। পুরুষ সত্তাতে যখন থাকছেন তাঁর আচরণ এক রকম, প্রকৃতির সত্তাতে যখন

থাকছেন তাঁর আচরণও একটু পাল্টাবে ঠিকই কিন্তু আমাদের মত দূরবস্থা হবে না। আমাদের মত সব কিছুতে ভোগে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, বা কষ্ট থেকে আমাদের মত প্রাণ ছেড়ে পালাবেন না। তাই বলে কি তাঁর কোন কষ্ট থাকবে না, অবশ্যই থাকবে, কিন্তু কষ্ট কষ্টের জায়গায় পড়ে থাকবে।

যোগদর্শন এই ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার, বুদ্ধি পর্যন্ত প্রকৃতির এলাকা। বুদ্ধির কাছে যা কিছু তথ্য আসছে সব তথ্যকে নিয়ে গিয়ে সে রাজার সামনে রেখে দিচ্ছে। এরপর রাজা যেমনটি করেন তেমনটিই হয়। এই রাজা হলেন আত্মা। কঠোপনিষদে রথের উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে আত্মাকে ঠিক এভাবেই উপস্থাপনা করা হয়েছে, যিনি রথে বসে আছেন তিনি সেই আত্মা। আত্মা হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, চৈতন্য তাঁর প্রকৃতি নয়, তাঁর স্বভাব। বুদ্ধি হল সেই শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব। যখনই পুরুষ আর প্রকৃতি পরস্পর কাছাকাছি আসে তখন এক উভয়ের প্রকৃতি পেয়ে যায়। পুরুষ তখন নিজেকে আবদ্ধ মনে করে আর বুদ্ধি মনে করে আমিই চৈতন্য। বুদ্ধির চৈতন্যকে চৈতন্য বলা হয় না, বুদ্ধিই বলা হয়, ইংরাজীতে ওনারা Inteligence বলে। মজার ব্যাপার হল বুদ্ধি দিয়েই সব কাজ হয় বলে বিজ্ঞানীরা এবং সাধারণ মানুষ বুদ্ধিকে আত্মা বলে মনে করে। ধর্মে পথে যাঁরা আছেন, তিনি যেই হোন না কেন, ধর্ম পথে যেমনি কেউ এসে যান, অনিত্যের মধ্যে তিনি তখন নিত্যকে অনুসন্ধান করেন, পরিবর্তনশীলের মধ্যে অপরিবর্তনীয় কী আছে তার অনুসন্ধান করেন। আমাদের বেশী গভীরে যাওয়ারও দরকার নেই, অত্যন্ত সাধারণ স্তরেও যখন চিন্তন করবো এই জগতে স্থায়ী কিছু আছে কিনা, তখনই দেখবো ‘আমি’ বোধটা স্থায়ী। আমি শ্রীযুক্ত অমুক, কুড়ি বছর আগেও আমি শ্রীযুক্ত অমুক ছিলাম, আজও শ্রীযুক্ত অমুক আছি, অথচ আমার শরীরটা পাল্টাচ্ছে। আর আমার মন সকালে এক রকম থাকছে, বিকেলে এক রকম, রাত্রিবেলা অন্য রকম থাকছে। মনও পরিবর্তনশীল। বাচ্চা বয়সে আমার এক রকম বুদ্ধি ছিল আজকে বুদ্ধি অন্য রকমের হয়ে গেছে, তাহলে বুদ্ধিটাও পরিবর্তনশীল। শরীর, মন, বুদ্ধি সব কিছুই যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে এর মধ্যে স্থায়ী জিনিষ কোনটা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হতে পারে, এর মধ্যে স্থায়ী বলে কি আদৌ কিছু আছে? এখান থেকেই আধ্যাত্মিক দর্শনের শুরু। আধ্যাত্মিক দর্শন বলবে, ঠিকই বলছ এগুলো সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু এদের সবার পেছন একটা অপরিবর্তনশীল স্থায়ী নিত্য বস্তু আছে। কঠোপনিষদে পরিবর্তনশীলের পেছনে যে অপরিবর্তনশীল বস্তু রয়েছে তাকে এইভাবেই বলছেন *নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং*, তিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য আর বুদ্ধিরও চেতনা তিনি, যিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন এবং তিনিই সব কামনার গতি করেন। তিনিই আত্মা, কঠোপনিষদে আত্মাকে এভাবেই পরিভাষিত করা হয়েছে।

এর আগে আমরা দেখলাম যেখানেই আলো আছে, যেখানেই ক্রিয়া আছে আর যেখানেই স্থিতি আছে সেটাই প্রকৃতির এলাকা। প্রকাশ, ক্রিয়া আর স্থিতিকে যিনি দেখছেন তিনিই পুরুষ। আমি এই জগৎকে দেখছি তার মানে আমি পুরুষ। আমি আমার ইন্দ্রিয়ের কার্য দেখতে পারছি, তার মানে ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেটা আছে সেটা পুরুষ। আমি আমার মনেক বুঝতে পারছি, আমার মন এখন ভালো নেই, আমার মন এখন ভালো। তার মানে মনের বাইরে যেটা আছে সেটাই পুরুষ। আমার বুদ্ধি আগে এক রকম ছিল আজ অন্য রকম। বুদ্ধি কখন সৎকার্যে প্রবৃত্ত হয় কখন অসৎকার্যে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধিরও পরে যেটা আছে সেটাই আসল। বুদ্ধির পরে কী আছে? তারপরেই মৌন। ওই অবস্থাটা তোমাকে বোধে বোধ করতে হবে। ওটাকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। সেইজন্য বলছেন *দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ*। যাকে একমাত্র বোধে বোধ করা যায় তিনিই আত্মা। জ্ঞানীর এই অবস্থাকেই গানের মাধ্যমে শিবের উপমা দিয়ে বলা হয় ভাং খেয়ে শিব একেবারে বিভোর হয়ে আছেন। ভাং খেয়ে বিভোর ভোলা মানে শিব নিজের স্বরূপে মত্ত হয়ে আছেন। যে কোন সিদ্ধ পুরুষ যখনই নিজের স্বরূপে চলে যান, তখন তিনি নিজের স্বরূপেই মত্ত হয়ে যান, ওখান থেকে আর বেরোবেন না, এটাই *দৃশিমাত্রঃ*। জগৎ বলে তাঁর কাছে কিছু নেই। তবে কখন সখন সেখান থেকে নেমে এসে কারুর স্তুতি করছেন। ঠাকুরের জীবনের দিকে অবলোকন করলে, বিশেষ করে ঠাকুরের সমাধির অবস্থা আর সমাধির বাইরে তাঁর অবস্থা দিয়ে বোঝা যায় পুরাণে আমাদের ঋষিরা ভগবান নারায়ণের, শিবের যে বর্ণনা করছেন, তার সবটাই কিরকম একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। পুরাণে শিবের বা বিষ্ণুর যে নানান রকম বর্ণনা করা হয়েছে সেই বর্ণনা দিয়ে

বোঝা যায় শুদ্ধ আত্মা কীভাবে থাকেন। ঋষিরা জানতেন সাধারণ লোক শুদ্ধ আত্মার কথা ধারণা করতে পারবে না, তাই তাঁরা শিব, বিষ্ণুর কাহিনী নিয়ে এসেছেন। কথামতে ঠাকুরের সমাধির ছবি মাস্টারমশায় যতই বর্ণনা করে থাকুন না কেন, সমাধির ওই অবস্থায় সত্যি সত্যি ঠাকুরের কী হচ্ছে আমরা কখনই ধারণা করে বুঝতে পারব না। এখনও কিছু প্রাচীন মহারাজরা আছেন যাঁরা ঠাকুরের সন্তানদের দেখেছেন, তাঁরা যখন আমাদের ঠাকুরের সমাধির কথা বলেন আমরা বিশ্বাস করছি। আমরা মনে করছি আমাদের ঠাকুরের উপর, মায়ের উপর খুব বিশ্বাস, এগুলো কিছুই নয়, সব মুখের কথা মাত্র। আরও দুশো বছর পর মানুষ কী বুঝবে! বোঝার ক্ষমতাই নেই। তখন পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে বলতে হবে শিব ভাং খেয়ে বিভোর হয়ে আছেন। ভগবান কি কখন ভাং খাবেন! এগুলো সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য বলা হয়।

কিন্তু আত্মা যে নিত্য এর প্রমাণ কি? এই প্রশ্নই হয় না। কারণ আত্মার কখন কোন প্রমাণ হয় না। আত্মা যখনই প্রমাণিত হয়ে যাবে তখনই আত্মা কোন একটি বিষয় হয়ে যাবে। যেমন দৃশ্য আর দ্রষ্টাতে দ্রষ্টা কখনো দৃশ্য হবে না। দ্রষ্টাকে যদি প্রমাণিত করে দেওয়া হয় তখন দ্রষ্টা দৃশ্য হয়ে যাবে। Subject কখনই Object হয় না। আত্মা হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি সব কিছুকে জানছেন তাঁকে কোন কিছু দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে না। কি কি প্রমাণ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয় দিয়ে আত্মাকে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবাদীরা এসে বলে ভগবান বলে কেউ যদি থাকে তাহলে আমাকে দেখিয়ে দিক তো। তাঁকে দেখাবে কী করে? ভগবান কি কোন বস্তু যে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে! বস্তু রূপে যদি দেখতে চাও তাহলে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের বিগ্রহ দর্শন করো। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে যেমন প্রমাণ করা যাবে না, ঠিক তেমনি অনুমান প্রমাণ অর্থাৎ যুক্তি-তর্ক দিয়ে কোন দিন আত্মাকে প্রমাণিত করা যাবে না। বলা হয় যুক্ত-তর্ক দিয়ে যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণকে সিদ্ধ করে দেওয়া হয় সেই ভগবান কোন ভগবানই নন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ দিয়ে যদি আত্মা বা ভগবানকে বুঝতেই না পারি তাহলে জানবো কী করে? কেন! শব্দ প্রমাণ দিয়ে জানতে হবে! ঋষিদের কথা আমাদের মানতে হবে। আত্মাকে তাঁরা বোধে বোধ করেছেন। আত্মা হলেন স্বতঃসিদ্ধ, তিনি নিজেই নিজের প্রমাণ। আপনি বলতে পারেন ঠাকুর তো মা কালীকে দর্শন করতেন। ঠিকই বলছেন, তবে আমরা যেভাবে বোতল, গ্লাস দেখছি, মা কালী কি সেইভাবে ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেতেন? কখনই না, ঠাকুরও বোধে বোধ করতেন। কারণ আত্মাকে একমাত্র আত্মাই বোধ করতে পারেন। ঋষিরাও বোধে বোধ করেছেন। সেইজন্য বেদান্তে ঋষিদের এই অনুভূতিকে বলা হয় অপরোক্ষানুভূতি। কারণ যেটা প্রত্যক্ষ নয় সেটা পরোক্ষ হবে, এবার পরোক্ষের উল্টো অপরোক্ষ। কেউ যদি বলে আমি এগুলো বিশ্বাস করবো কী করে? তাকেও বলা হবে ‘তুমি সাধনাতে নেমে পড়, নামার পর ঋষিরা যা যা করেছেন তুমিও ঠিক তাই করে যাও, এরপর তোমার যখন জ্ঞান হবে তখন তোমারও বিশ্বাস হবে’।

আমরা যা কিছু জানছি, বুঝছি, ধারণা করছি মনে করছি এগুলো বুদ্ধি দিয়ে হয়, কিন্তু ঠিক ঠিক জানা আত্মা দিয়েই হয়। বুদ্ধির পেছনে যে চৈতন্য সত্তা আছেন তিনিই একমাত্র সব কিছু জানেন, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। আমরা হলাম শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা ছাড়া আমরা কিছুই না, তাই আমরা মনে করি আমি স্বাধীন। আমি যা খুশি করতে পারি, পুরো জগৎ আমার মুঠোর মধ্যে। কিন্তু আমাদের এই আত্মা জড়িয়ে আছে বুদ্ধির সঙ্গে। যেমনি সে বিরাট কিছু করতে যায় তেমনি বুদ্ধি তাকে আটকে দেয়। তাহলে যত আত্মজ্ঞানী আছেন তাঁরা সবাই কি স্বামী বিবেকানন্দের মত কাজ করতে পারবেন? স্বামীজীর মত কখনই তাঁরা করতে পারবেন না, সম্ভবই নয়। কারণ তাঁদের মস্তিষ্ককে বাচ্চা বয়সে ওই ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। কাঁচ কাঁচই, ছোট কাঁচও কাঁচ আবার বড় কাঁচও কাঁচ। সূর্যের প্রতিবিম্ব যখন বড় কাঁচে পড়বে তখন যে প্রতিবিম্ব পড়বে সে একই সূর্যের প্রতিবিম্ব ছোট কাঁচেও পড়বে, দুটো কাঁচে একই সূর্যকে দেখা যাবে। কিন্তু যেমনি আপনি কাঁচের আয়তন দিয়ে সূর্যকে মাপতে যাবেন তখন দুটো আলাদা হয়ে যাবে। যখন বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখবেন তখন লাটু আর নরেন আলাদা, কিন্তু যেমনি জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখবেন তখন দুজনই সমান। একটা ঘরের দেওয়ালে একশটা আয়না লাগানো আছে, ওই ঘরে ঢুকলে সব কটি আয়নাতে আমারই ছবি প্রতিফলিত হবে, কিন্তু আয়নার উপর নির্ভর করবে আমার ছবিটা কেমন। ছবির

দৃষ্টিতে সব আয়না সমান, কিন্তু ছবিটা কেমন দেখাচ্ছে সেটা আয়নার আকার আর কাঁচের গুণগত মানের উপর নির্ভর করবে। ঠাকুরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ‘কি মশাই! ইংরাজী-টিংরাজী জানা আছে?’ ‘আট দশটা শব্দ জানা আছে, এর বাইরে কিছু জানা নেই’। ‘আর সংস্কৃত জানা আছে?’ ‘আমি তো কথামতে বলেই দিয়েছি সংস্কৃত নাই বা জানলাম’। অবতার হোন আর যেই হোন, ভাষার জ্ঞান অর্জন করতে হলে আপনাকে ভাষা ঘশে মেজে শিখতে হবে। তবে এটা ঠিকই, ঠাকুর যদি ইংরাজী ভাষা শেখা শুরু করতেন তখন আমাদের থেকেও অনেক ভালো আর তাড়াতাড়ি ইংরাজী ভাষা রপ্ত করতে পারতেন। কিন্তু সেটা আলাদা কথা। এখানে আমরা যেমনটি আছেন সেটাকে তেমনটি নিয়েই আলোচনা করছি। আমার আপনার সবার একই অবস্থা। যেমনি বুদ্ধি দিয়ে দেখতে যাবো তখন অনেক সীমাবদ্ধতা এসে যাবে। যেমনি আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তখন সেই অনন্তকেই দেখবে।

স্বামীজী যখন বলছেন all knowledge is within you, all power is within you, তখন তিনি আত্মার দৃষ্টিতেই বলছেন। কিন্তু আমরা তো অনেক কিছুই জানি না, অনেক কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও করতে পারি না। কারণ সমস্যা হল আত্মা আর বুদ্ধি জড়িয়ে রয়েছে। মন যখন একটু অন্তর্মুখী হতে থাকে তখন মনে হয় আমি সব করে নিতে পারবো, যেমনি বহির্মুখী হয় তখনই নিজের সীমাবদ্ধতার কাছে নিজেকে অসহায় মনে হয়। দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, বাড়ির লোক কথা শোনে না, অফিসের বস্ গালাগাল দিচ্ছে, তখন মনে হয় all knowledge is within you, all power is within you কোথায়? কিন্তু বাস্তবিকই আছে। স্বামীজী কোন উৎসাহ দেওয়ার জন্য, আমাদের ভেতরে উদ্দীপনা জাগাবার জন্য এই কথা বলছেন না, বাস্তবিকই আছে।

এত কথা বলার পর বলছেন – **তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।।২১।।** এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি রূপে আছে, এই প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য। আগে বলা হল প্রকৃতি কেন আছে। বলছেন ভোগ আর অপবর্গের জন্য। চৈতন্য সত্তা যখনই পুরুষের কাছে আসে তখন সে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রকৃতির জালে যখন আটকা পড়ে যায় তখন প্রথমে প্রকৃতি তাকে দিয়ে ভোগ করিয়ে নেয়। নাচঘরে গেলে নর্তকী প্রথমে তার মনোমুগ্ধকারী নৃত্য দেখিয়ে তাকে মোহিত করে দেবে, দেড় ঘন্টা পর নৃত্য শেষ হয়ে গেলে নাচঘর থেকে বার করে দেবে। এখানে প্রকৃতি নিজে থেকে কাউকে বার করে দেবে না, চৈতন্য সত্তা যখন বলবে ‘তোমার নাচ দেখে আমার মনে ভরে গেছে, আমি আর দৃশ্য দেখতে চাই না’, তখনই প্রকৃতি পুরুষের কাছ থেকে সরে আসবে। কিন্তু প্রকৃতি অত সহজে ছেড়ে দেয় না, এরপর প্রকৃতি আরেক ধরণের খেলা শুরু করে দেবে, সেটা শেষ হয়ে অন্য ধরণের খেলা নিয়ে আসবে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, বাচ্চা যখন কাঁদে মা তার মুখে একটা চুসনি ধরিয়ে দেয়। বাচ্চা যখন চুসনি ফেলে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে তখন মা দরকার পড়লে উনুন থেকে হাড়ি নামিয়ে দৌড়ে এসে বাচ্চাকে কোলে নেয়। এটা হল ভক্তি পথের বর্ণনা। যোগ পথেও একই জিনিষ হয়, যখন চৈতন্য সত্তা বা পুরুষের প্রকৃতির রাজ্যের কোন কিছুকেই আর ভালো লাগে না, তখন সে প্রকৃতির এলাকা বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে অপবর্গের দিকে এগিয়ে যায়।

এখানে বলছেন যিনি দ্রষ্টা তিনি দৃশ্য থেকে আলাদা। যিনি দ্রষ্টা তিনিই তাঁর দৃশ্যকে আলো দিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে আলো সেখানেই আমাদের দৃষ্টি যায়, অন্ধকারকে আমরা কখনই দেখতে যাই না। কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতির ক্ষেত্রে মজার কাণ্ড – প্রকৃতি ঘন অন্ধকার, অন্ধকারকে দেখার জন্য চাই আলো, সেই আলোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন দ্রষ্টা নিজেই। প্রকৃতির নিজের কোন প্রকাশ নেই, যদিও আমরা বলছি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ। সত্ত্বের কাজ হল প্রকাশ, কিন্তু এই প্রকাশ তার নিজের নয়। আত্মা যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন সে আলোকিত হয়ে ওঠে। আলোকিত প্রকৃতিকে দেখেই পুরুষ মুগ্ধ। আরও পরিহাসের ব্যাপার হল – ঐ অন্ধকারকে দেখে দ্রষ্টা মুগ্ধ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ রাজা কিন্তু তাঁর বন্ধু সুদামা খুব গরীব আর অতি সাধারণ লোক। শ্রীকৃষ্ণ কিছু সম্পদ সুদামার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ একদিন সুদামার বাড়িতে গেছেন, সেখানে সুদামার ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু সুদামাকে বলছেন ‘আরে বাব্বা! সুদামা তুমি করেছ কি! তোমার এতো

সম্পদ, এটা তোমার, ওটা তোমার, এই প্রাসাদটা তোমার’! আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা। সুদামার যে সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখে শ্রীকৃষ্ণ হতবাক হয়ে গেছেন সেই ঐশ্বর্য তাঁর অনন্ত ঐশ্বরের অতি ক্ষুদ্র কণা মাত্র, উপরন্তু এই সম্পদ সুদামাকে তিনিই দিয়েছেন অথচ শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে বলছেন – সুদামা! তোমার এতো ঐশ্বর্য! আমরাও জগতকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। এই জগতের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড আকর্ষণ, কিন্তু জানি না যে, আমাদের আকর্ষিত করার জগতের যে এত ক্ষমতা তা আমার কাছ থেকেই জগৎ পেয়েছে।

প্রকৃতির এখানে কোন উদ্দেশ্যই নেই। যদি জিজ্ঞেস করা হয় মানব জীবনের কী উদ্দেশ্য, হিন্দু ধর্মে এর একটাই উত্তর, কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু খ্রিস্টান, জহুদী বা মুসলমান ধর্মে উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য কখন থাকে? যখন কোন কার্য করা হয় তখন তার একটা ফলের দরকার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠলাম, বাসের কণ্ডাক্টর আমাকে আমার গন্তব্যস্থল জিজ্ঞেস করবে। কার্য যখন করা হয় তখন সেই কার্যের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। এখন ভগবান যদি সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তাঁর সৃষ্টি করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকবে। যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে মানবজাতী যেহেতু সৃষ্টির অঙ্গ সেইহেতু তারও উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু হিন্দুদের কোন শাস্ত্রই বলছে না যে, ভগবান একদিন সব কিছু সৃষ্টি করে দিলেন। উদ্দেশ্যটা তাই খ্রিস্টানদের জন্য, মুসলমানদের জন্য। কারণ এরা বলে ভগবান একদিন সৃষ্টি করলেন। কিন্তু আমাদের মতে সৃষ্টি নিজের মত চলছে। আমাদের এখানে তাই জীবনের সার্থকতার কথা বলা হয়। সৃষ্টিতে তুমি একটা মানব শরীর পেয়েছ। যদি মানব শরীর না পেয়ে গাধার শরীর পেতে তাহলে গাধার জীবনের সার্থকতা যেটা সেই সার্থকতাই তুমি পূরণ করতে থাকতে। গাধার সার্থকতা কিসে? অপরের বোঝা বহন করাতে। ঘোড়ার সার্থকতা হল মানুষকে পিঠে নিয়ে দৌড়ান। ঠাকুর যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলছেন বা আমাদের শাস্ত্র যে কথা বলছে, তখন কিন্তু একটা লক্ষ্য পৌঁছানোকে নিয়ে বলা হচ্ছে না, এখানে সার্থকতার কথাই বলছেন। এই শরীর দিয়ে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। একটা গাধা বাড়িতে রেখে অনেক কিছুই গাধাকে দিয়ে করানো যেতে পারি। যে কাজই করাই না কেন ঠিক ঠিক সার্থকতা হবে যদি গাধাকে দিয়ে বোঝা বহান যায়। মানব দেহের বিশেষত্ব হল বুদ্ধি, বুদ্ধির বিকাশ একমাত্র মানব দেহেই সম্ভব। আর এই বুদ্ধির বিশেষত্ব হল, বুদ্ধি ঈশ্বর চিন্তন করতে পারে আর আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। ঠাকুর যে বলছেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, সেটা এই অর্থেই বলছেন। যে বুদ্ধি দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ বা পরমার্থ সিদ্ধি হতে পারে, সেই বুদ্ধিকে যদি কোন কাজেই না লাগাও তাহলে কিছুই হবে না, যেমন আছ তেমনই থাকবে। বাজারে গিয়ে আমরা খোঁজ করি কম দামে বেশী ভালো জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়। আমরা এই দুর্লভ মানবজীবন পেয়েছি। এই জীবন দিয়ে খাওয়া-পড়া, ভোগ করা সবই করতে পারি। ভোগ আমরা কিসের করছি? প্রকৃতিরই ভোগ করছি। কিন্তু প্রকৃতির এখানে কোন দায় নেই, প্রকৃতি শুধু ভোগ্য। প্রকৃতি হল বাচ্চাদের খেলনার মত, ব্যাটারি দিয়ে দিলে খেলনাগুলো লাফাতে শুরু করে, ব্যাটারি খুলে দিলে শ্ববির হয়ে পড়ে থাকে। প্রকৃতি ঠিক তাই। আমরা আছি বলে প্রকৃতি নাচ করছে।

প্রকৃতি জড়, মানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু আছে সবই জড়, অচেতন আর পুরুষই একমাত্র চৈতন্য। প্রকৃতি আর চৈতন্য এই দুটো যোগের পরিভাষা মাত্র। পরবর্তি কালে এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে নারী ও পুরুষ বানিয়ে দিয়ে বলছে শিব ও শক্তি। এখানে রাজযোগে শিব ও শক্তি বলবে না, এখানে শিব ও শক্তির সংযোগকে বলবে চিজ্জড়গ্রন্থি – পুরুষের চিৎ আর প্রকৃতি জড়ের সঙ্গে সংযোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে চিজ্জড়গ্রন্থি। এসব তত্ত্ব কথা সাধারণ লোকদের বোঝান খুব মুশ্কিল। তাই ওনারা এত কিছু না বলে শুধু বলে দিলেন ‘দ্যাখো বাপু, উনি হলেন শিব আর উনিই আসল। শিব আছেন বলেই মা কালী আছেন। তিনি নাচছেন তো নাচছেনই, আর শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। শিব কিছুই করেন না, তাই তিনি শুয়ে আছেন’। পুরুষ কি করেন? কিছুই করেন না। প্রকৃতি কি করে? নাচ দেখায়। এটাই বোঝাবার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছেন শিব শুয়ে আছেন আর শিবের উপর কালী তাণ্ডব নৃত্য করে যাচ্ছেন। কালী কেন নৃত্য করছেন, কেননা পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অথচ পুরুষ না থাকলে প্রকৃতি কিছুই না, সেইজন্য এই ভাবটাকে প্রতীক করছে শিব যেন শব হয়ে পড়ে আছেন। এটাই তো যোগ দর্শনের মূল কথা।

সবার মধ্যে মুক্তির অনুভব যেমন আছে তেমনি বন্ধনের অনুভবও আছে। কারণ সমস্ত মানুষের মধ্যে, মহিলা হোক আর ছেলেই হোক, যেইই হোক না কেন সবারই মধ্যে সেই নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত আত্মাই বিদ্যমান এবং সেই আত্মনের অনুভূতি আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে সব সময় পেতে থাকি। আমরা স্বভাবতই মুক্ত কারণ আমাদের মধ্যে সেই আত্মানুভূতি রয়েছে। কিন্তু সেই আত্মা আমাদের বুদ্ধির সাথে, শরীরের সাথে এক হয়ে রয়েছে। শরীরের আবার যেমন অনেক রকম প্রতিবন্ধকতা আছে তেমনি প্রচুর সীমাবদ্ধতাও আছে। কেউ ইচ্ছে করলেই দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে চলে যেতে পারবে না। প্রতি পদে পদে শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে আমরা ভালো ভাবেই অবহিত হচ্ছি। ভেতরে যিনি আত্মা আছেন তাঁর যে ক্ষীণ আওয়াজ, সেই আওয়াজ থেকেই বুঝতে পারি আমাদের বন্ধন আছে আবার আমাদের মুক্তিও আছে। কিন্তু যখনই এই ক্ষুদ্র আমিকে বিস্তার করতে থাকব তখনই ধীরে ধীরে মনে হতে থাকবে যা কিছু দেখছি সবই প্রকৃতির খেলা, তখন আমাদের মধ্যে মুক্তির স্পৃহা জাগতে থাকবে। যতক্ষণ শরীর, মন, বুদ্ধি এগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকব ততক্ষণ মুক্তির স্পৃহা জাগার কোন প্রশ্নই হতে পারেনা। প্রথম বাধা আসে তন্মাত্রা থেকে, যখন কেউ এই তন্মাত্রার বাধাকে অতিক্রম করে নেবে, তখন অবাক হয়ে শুধু ভাববে – আরে! এই নোংরা শরীরটার মধ্যে আমি আবদ্ধ হয়ে আছি! তন্মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এসে যাওয়া মানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হাতের মুঠোয় চলে এল। এখন সে এই পাঁচটা তন্মাত্রার মালিক হয়ে গেছে, তার মনে যা যা ইচ্ছের উদয় হবে সব ইচ্ছাই তক্ষুণি সে পূরণ করে নিতে পারবে। কারণ সে এখন জেনে গেছে, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখছি এই ব্রহ্মাণ্ড তো তন্মাত্রারই যত কারসাজি। তাই এখন যোগী যা কিছু ইচ্ছা করবেন তাই এসে যাবে, এ ধরনের ক্ষমতা যোগীদের সত্যি সত্যিই হয়ে থাকে। তবে যোগীরা এই ধরনের ক্ষমতার খেলা দেখাতে যান না, প্রকৃতি প্রকৃতির মত চলছে, কেন আমি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে যাব।

ঠাকুর খুব সুন্দর করে বলছেন – যজ্ঞ বাড়ির কর্তা ভাঁড়ারের কাজ কর্ম দেখার জন্য একজনকে দায়িত্ব দিয়েছে। ভাঁড়ারী যখন ভাঁড়ারের ভার নিয়ে নিল, তখন মালিকের কাছে এসে যদি কেউ কিছু চায় তখন মালিক বলে দেয় ভাঁড়ারে একজন আছে তার কাছে চেয়ে নাও। সে কর্তা, ভাঁড়ারে এখন একজন রয়েছেন, তিনি এখন তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে যাবেন না। ঠিক সেই রকম প্রকৃতির নিয়মকে দেখাশোনার জন্য প্রকৃতিই আছে, যোগী এখন প্রকৃতিরও ওপরে, ইচ্ছে করলে তিনি প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ একজনকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেখানে আরেক জনের হস্তক্ষেপটা অশোভনীয় হয়ে যায়। কখন সখন যে করেন না তা নয়, ঠাকুরের জীবনে আছে, তিনি কাশীপুরে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন, নীচের ঘরে শ্রীশ্রীমা বসে কাজ করছেন, হঠাৎ দেখেন ঠাকুর সিঁড়ি দিয়ে তীর বেগে নেমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তীর বেগে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীমা ভাবছেন যিনি নড়তে পারেন না, একজনের সাহায্য ছাড়া যিনি বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে পারেন না, তিনি কি করে এইভাবে সিঁড়ি দিয়ে একবার নেমে দৌড়ে গেলেন আবার তীর বেগে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন। শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞেস করতে ঠাকুর বলছেন – খবর পেলাম ছেলেরা আজকে রাতে খেজুর গাছের রস খাবে। কিন্তু দেখলাম ওই গাছের তলায় এক কাল সর্প রয়েছে, দংশন করলেই শেষ, সেইজন্য ওকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। প্রকৃতির নিয়ম বলছে, ওখানে সাপ আছে, সাপের যে বিষ, দংশন করলে সেই বিষের প্রভাবে তুমি মারা যাবে। কিন্তু কাশীপুর উদ্যানবাটীতে প্রকৃতিরও মালিক বসে আছেন। প্রকৃতির নিয়মে তাঁর শরীর এখন ভেঙ্গে বিছানায় পড়ে রয়েছে কিন্তু অসুস্থ শরীরের জন্য প্রকৃতিতে যে নিয়ম করা আছে সেই নিয়মে হস্তক্ষেপ করে একটা সুস্থ শরীর দাঁড় করিয়ে সাপটাকে সরিয়ে দিয়ে এলেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কারণে প্রকৃতির নিয়মেও হস্তক্ষেপ করা যায়। ঠাকুর যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে তিনি তাঁর ঐ রোগগ্রস্ত শরীরকে আরো অনেক সুস্থ সতেজ করে খুব সহজেই ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু এনারা কথায় কথায় প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে সব ব্যাপারে মাথা গলাতে যান না।

কিন্তু যাদের যোগশক্তি আছে, কামিনী-কাঞ্চনে যদি একবার তাদের মন নেমে যায় তাহলে ওখানেই সব যোগশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয় ভোগের কাজে যখনই এই শক্তিকে ব্যবহার করতে নেমে

যাবে তখনই সে প্রকৃতির ফাঁদে পড়ে গেল, যোগশক্তিও আর কাজ করবে না। মন জগতের মধ্যে ছড়িয়ে গেলে তন্মাত্রার অবস্থা থেকে তার মনটা নেমে যাবে। ঠাকুরের আগে ব্রাহ্মণীর এক জন শিষ্য ছিল, তারও এই ধরনের কিছু যৌগিক শক্তি ছিল, সে অদৃশ্য হয়ে চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু সে নিজের ইন্দ্রিয় লালসার চরিতার্থ করতে যোগশক্তিকে ব্যবহার করার ফলে আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে হতে শেষে তার পুরো যোগশক্তিটাই চলে যায়।

এরপরে বলছেন **কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।।২২।।** এই সূত্রে এসে যোগ বেদান্ত থেকে আলাদা হয়ে যায়। যোগ বলছে **কৃতার্থং প্রতি নষ্টম্**, যিনি কৃতার্থ হয়ে গেছেন, কৃতার্থ মানে যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যিনি চৈতন্য সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁর জন্য প্রকৃতি নষ্ট হয়ে গেল। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন, এক বহুরূপী বাঘের মুখোস পড়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। একজন তাকে চিনে ফেলেছে, ‘আরে! তুই তো আমাদের হরি!’ যে মুখোস পড়ে ভয় দেখাচ্ছিল সে আর তাকে ভয় দেখাবে না। এবার অন্যদের ভয় দেখাতে চলে যাবে। এখানেও তাই, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর কাছে প্রকৃতির খেলা শেষ। কিন্তু বাকিদের কাছে প্রকৃতি খেলা চলতে থাকবে। আমার জন্য আপনারা সবাই প্রকৃতি আর আপনারদের সবার জন্য আমিই প্রকৃতি। কিন্তু আমার ভেতরে যিনি পুরুষ চৈতন্য সত্তা আছেন, সেই চৈতন্য সত্তা আপনার ভেতরেও আছেন। কিন্তু বেদান্ত বলে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তিনিই শুধু আছেন। যোগ কিন্তু এই কথা বলবে না। যোগ বলবে প্রত্যেকটি জীবের পুরুষ আলাদা আলাদা, তাই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমার ভেতরে যিনি পুরুষ আছেন আর আপনার ভেতরে যে পুরুষ আছেন তাঁরা আলাদা। ফলে আমি যদি কৃতার্থ হয়ে যাই, যেমন ঠাকুর, স্বামীজী, লাটু মহারাজ এনারা সবাই কৃতার্থ হয়ে গেছেন, তাঁরা সবাই মুক্ত, তাঁদের কাছে প্রকৃতির কোন খেলা নেই, কিন্তু বাকিদের কাছে থাকবে। স্বামীজী নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলছেন, তখন রাজস্থানের দিকে স্বামীজী ছিলেন। রোজ জানলা দিয়ে তাকাতেই দেখতেন দূরে একটা জলাশয় দেখা যাচ্ছে। একদিন হাটতে হাটতে তাঁর জল পিপাসা পেয়েছে। তিনি সেই জলাশয়ের দিকে এগোচ্ছেন। কিন্তু কিছু পরেই দেখছেন জলাশয়টা নেই। তখন বুঝলেন এটাই মরীচিকা। পরের দিন আবার দেখছেন সেই জলাশয়। কিন্তু স্বামীজীকে সেই জলাশয় আর ভোলাতে পারছে না। প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। যিনি আত্মজ্ঞান পেয়ে গেছেন তাঁর তো শরীর চলে যায়নি, শরীর এখানেই রয়েছে। তোতাপুরী তো দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বুঝে নিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্বতা বলে কিছু নেই, আমিই এর মালিক। আমি যেমনটি চাইব তেমনটিই হবে। কিন্তু আত্মজ্ঞানীর আশেপাশে বাকি লোকদের কী হবে? কি আর হবে, নরেনের দিদিমা নরেনকে বলছেন ‘নরেন! সবই তো হল, এবার তুই একটা বিয়ে করে নে’। স্বামীজীর জন্য মায়ার খেলা শেষ হয়ে গেছে, প্রকৃতির খেলা চলে গেছে, কিন্তু তাঁর দিদিমার কাছে প্রকৃতি নষ্ট হয়নি। যোগের কাছে তাই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত, পুরুষ কখন শেষ হবে না, প্রকৃতি একটাই। সেইজন্য সবাই যদি মুক্তি পেয়েও যায় তাতেও প্রকৃতির কিছু আসবে না। কারণ পুরুষ অনন্ত, আর প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ ফাঁসতেই থাকবে আর প্রকৃতির খেলা চলতেই থাকবে। বেদান্ত বলে পুরুষের সংখ্যা অনন্ত হয় না। এর উপর বেদান্তের অনেক যুক্তি আছে। মূল কথা হল এই জায়গায় এসে বেদান্ত আর যোগ আলাদা হয়ে যায়।

পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনে দুজনেরই লাভ

কিন্তু মুক্তির জন্য প্রকৃতিকেই বা এত কিছু করতে হয় কেন? তখন বলছেন **স্বস্বামিশক্ত্যাঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।।২৩।।** এই যে পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগ হয় আর যখন এই সংযোগ কেন্দ্রে চলে যাবে তখন সে পুরুষ আর প্রকৃতির আসল স্বরূপকে জেনে যাবে। যেমন হাওড়া ব্রীজের মাঝখানে এসে দাঁড়ালে এক দিকে হাওড়া স্টেশন কেমন আর ওই দিকে বড়বাজারটা কেমন স্পষ্ট জানতে পারা যায়। পুরুষ হলেন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। তিনি নিত্য, এটাই তিনি। শুদ্ধ, একবারে পবিত্র, প্রকৃতির মধ্যে এসে গেলেও কোন ধরনের কালিমা তাঁর লাগে না। আর তিনি বুদ্ধ মানে চৈতন্যবান এবং মুক্ত। কিন্তু পুরুষ তাঁর নিজের এই স্বভাবকে ভুলে যান। ভুলে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে

নিজেকে হাতড়ে বেড়ায়। এর খুব সাধারণ উপমা, মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ভালো-মন্দ সব কিছু ভুলে থাকে। ছেলে হয়তো খুব অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল, ছেলেকে নিয়ে মায়ের খুব কষ্টও হয় কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সব অন্যায় মেনে নেয়। আদিবাসী মেয়েরা সারা দিন ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সব কাজ করে যায়, আর এদের স্বামীরা সারাদিন বসে বসে মদ খাবে আর বিকেলে বাড়ি ফিরে বউকে পেটাবে। তবুও বউ তার স্বামীকে ছাড়তে পারে না। ছাড়লে আবার অনেক রকম সমস্যা এসে যাবে। এই যে মোহ মায়া, যেটা আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে দেখতে পাই, আধ্যাত্মিক স্তরে এটাই পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন। সাধারণ জীবনে মোহ মায়াতে পড়ে গিয়ে আমরা যেমন নিজেদের মর্যাদা ভুলে যাই, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে পুরুষ তাঁর সব মর্যাদা ভুলে যায়।

আমাদের সাধারণ মনে প্রশ্ন আসে সৃষ্টি কেন? সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? বেদান্ত বলে দেবে এর কোন উত্তর নেই, কারণ বেদান্ত মতে সৃষ্টিই মায়া। এক অনির্বচনীয় শক্তি যখন চৈতন্য সত্তাকে ঢেকে ফেলে তখন অনেক কিছু ভেলকি দেখানো শুরু হয়ে যায়। এই অনির্বচনীয় শক্তিও ভগবানেরই শক্তি। চৈতন্যও ভগবানের আবার জড় প্রকৃতিটাও তাঁর। কিন্তু সাংখ্য আর যোগ দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ মানে যেখানে দুটো সত্তাকে মেনে নেওয়া হয়। সাংখ্য ও যোগদর্শনে দুটো সত্তা, চৈতন্য সত্তা আর জড় সত্তা। দুটোই বাস্তবিক সত্তা। কেউ কারুর উপর নির্ভরশীল নয়। চৈতন্য যেমন আছে জড়ও তেমন আছে। আর সৃষ্টি যেখানে হচ্ছে সেখানেই চিহ্নিত, চৈতন্য আর জড়ের মিলন। সাংখ্যের কাছে জড় নিত্য আর চৈতন্যও নিত্য। চৈতন্য আর জড় যেন দুটো নদী, যারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যেখানে এই দুটো নদীর সংযোগ হয় সেখানেই সৃষ্টি। চলতে চলতে দুটো নদী যখন আলাদা হয়ে গেল তখন সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। এটাই অনাদি কাল থেকে চলছে আর অনাদি কাল চলবে। কেন চলছে? এর কারণ হল স্বস্বামি সংযোগঃ। এই সংযোগে প্রকৃতি নিজের ক্ষমতাটা বুঝতে পারে, আমি কত কিছু করতে পারি। আর পুরুষও এতে নিজের স্বরূপের ব্যাপারে জানতে পারে। দুজনেরই ফায়দা, সাংখ্যরা তাই বলে অন্ধ খঞ্জবৎ। অন্ধ আর খঞ্জের যদি মিলন হয়, তাহলে অন্ধ খঞ্জকে কাঁধে বসিয়ে নেয় আর খঞ্জ অন্ধকে পথ দেখাতে থাকে। ফলে দুজনেই এক অপরের সাহায্যে নিজের নিজের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু দুজন দুজনকে যদি সাহায্য না করে তাহলে দুজনেই যেখান পড়ে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে। সেইজন্য বলছেন প্রকৃতি আর পুরুষের যখন মিলন হয় তখন দুজনেই লাভবান হয়। প্রকৃতি জানতে পারে আমার কত রকম ক্ষমতা, আমি কত রকম রূপ দেখাতে পারি। আর পুরুষের লাভ, যখন তাঁর কৈবল্য হয়ে যায়। যখন পুরুষের জ্ঞান লাভ হয়ে যায় তখন দেখে আরে আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য, আমি এত দিন কার পাল্লায় পড়েছিলাম! এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে পুরুষ আর প্রকৃতির যে মিলন এই মিলন সম্পূর্ণ অমিল(mismatch), কারুর সাথে কোন মিল নেই। প্রকৃতি জানে পুরুষের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই, ওর সাথে আমার কোন দিন মিলন হবে না।

এই সূত্রে বলছেন স্বরূপোপলব্ধিঃ, এটিও যোগের এক বিচিত্র জিনিষ। এখানে কিন্তু যোগ বলবে না পুরুষ প্রকৃতির বন্ধনে এলো কেন। যোগ বাস্তবে যেমনটি আছে তাকে তেমনটি গ্রহণ করছে। তুমি কি বুঝতে পারছো যে তুমি বন্ধনে আছো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ব্যস্! এখান থেকেই শুরু করে দাও। তোমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয় যা কিছু দেখছো আর এদের যত রকম খেলা দেখছ এগুলো প্রকৃতি। আর এর ভেতরে যিনি চৈতন্য সত্তা আছেন তিনি পুরুষ। তোমার এই দেহটি পুরুষ প্রকৃতির মিলন। এই মিলনের ফলে প্রকৃতি নিজেকে অনুভব করতে পারে। কী অনুভব করে? প্রকৃতির নিজের কী ক্ষমতা আছে সেটাই অনুভব করে। প্রকৃতির কী ক্ষমতা আছে? এই দেহ দিয়ে কত কি হতে পারে আর এই দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে কত রকম ভাবে জানা যেতে পারে এই ক্ষমতাটা প্রকৃতি দেখাতে পারে। প্রকৃতি ততক্ষণই নিজের ক্ষমতা দেখাতে পারে যতক্ষণ তার সঙ্গে পুরুষ আছে। আর স্বরূপ উপলব্ধির যে কথা বলছেন, যোগ বলছেন প্রকৃতির মাধ্যম ও সাহায্য না পেলে পুরুষ কখনই স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না।

এখানে দুটো অর্থ আছে। একটা হল অবিদ্যার দরুণ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হয়ে গেছে। দুজনের স্বভাবই আলাদা। প্রকৃতির সাথে যে পুরুষের মিলন হয় অবিদ্যা হেতুই এই মিলন। পুরুষ

নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, এটাই পুরুষের অবিদ্যা। পুরুষ নিজেকে ভুলে গেছে। কিন্তু যখন পুরুষ তাঁর স্বরূপকে জানতে চায় তখন তাঁকে প্রকৃতির সাহায্যেই জানতে হবে। কীভাবে জানতে পারে? নেতি নেতি করে, আমি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই, আমি মন নই। এইভাবে নেতি নেতি করে যেখানে পৌঁছায় সেটাই তাঁর স্বরূপ। আমার যে এই দেহ, এই দেহের পেছনে এক বিরাট সত্তা আছে, সেটাই প্রকৃতি। আমি বাস্তবে কে, এই চিন্তন যিনি করছেন তিনিই পুরুষ। পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগের ফলে এই স্থূল শরীর এসেছে। আসলে এসেছে মানে কি, দেহ তো অনবরত পাল্টাচ্ছে। আমি গতকাল যা খাদ্যদ্রব্য আহার করেছি সেটাই আজ রক্ত হয়ে আমার শরীরের প্রবাহিত হচ্ছে। কিছু দিন আগে যেটা রক্ত ছিল সেটাই আজকে পেশী, হাড়, মজ্জা হয়ে গেছে। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন পদার্থের মহা সমুদ্র। এই সমুদ্রের মধ্যে পুরুষ আছেন বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবিরত শরীর তৈরী হয়ে চলেছে। পদার্থের এই মহাসমুদ্রের উদ্দেশ্য দুটো – একটা উদ্দেশ্য হল যিনি পুরুষ তিনি যাতে নিজের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি, যিনি ভোগ্যা, তাঁর যত রকম ক্ষমতা আছে সেটা দেখানো।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের হেতু

এই সংযোগের হেতু কি? বলছেন *তস্য হেতুরবিদ্যা।।২৪।।* যোগের অবিদ্যা আবার বেদান্তের অবিদ্যার সঙ্গে মিলে যায়। অবিদ্যা, অজ্ঞানই পুরুষ প্রকৃতির সংযোগের হেতু। আমরা জানিনা অজ্ঞান কোথা থেকে আসে, অবিদ্যা কোথা থেকে আসে, এটাই রহস্য। আমাদের কাছে এখন অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি সব কিছুকে এক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালে এই শব্দগুলিকে আলাদা আলাদা করে ব্যবহার করা হত। প্রকৃতি জড়, অবিদ্যা হেতু। কিসের হেতু? অবিদ্যাই পুরুষকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করে দিচ্ছে। এই নিয়ে সাংখ্য এক রকমের ব্যাখ্যা দেবে আবার যোগ অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু যোগ আরো উন্নত বিজ্ঞান। আবার বেদান্ত যোগের থেকে আরো উন্নত বিজ্ঞান। যোগ যে পদ্ধতিতে চলে সেই পদ্ধতিতে চলতে চলতে একটা জায়গায় গিয়ে সমস্যা আসবে। আবার বেদান্ত যেভাবে নিয়ে যায়, সেই ধারাতে গেলে অন্য ধরণের সমস্যা আসবে, কিন্তু বেদান্তের সমস্যা অনেক কম হয়। কারণ যোগ পুরুষ আর প্রকৃতি দুটোকেই সত্য বলে মনে করছে। কিন্তু বেদান্তে প্রকৃতি হল মায়া বা মিথ্যা আর অবিদ্যার সাথে প্রকৃতিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বেদান্তের এই তত্ত্বটি দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক কিছুকে সহজ করে দেয়। ঐ জায়গায় সত্যিকারের কি হয়ে থাকে কেউ জানে না, আর যিনি জানেন তিনি আবার সেটাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন না। আমরা এখানে কত সহজ করে বলে দিচ্ছি যে এইভাবে পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগ হয়, এইভাবে চললে মুক্তি হয়, কিন্তু আমরা জানিই না মুক্তি হলে কি হয়। অথচ যাঁরা জানেন তাঁরাও বলতে পারেন না। ফলে কেউ জানতেই পারেন না পুরুষ কেন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলে। এখানে সাংখ্যের কোন উত্তর নেই। যোগ সাংখ্য থেকে একটু এগিয়ে এসে বলছে – *তস্য হেতুরবিদ্যা*। পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগে অবিদ্যাই মূল কারণ। যোগদর্শনকে যদিও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র বলা হয়, সব কিছুকে যোগ যদিও ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় – অবিদ্যাটা কি? যোগের কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, তাই যোগশাস্ত্রেও অনেক ফাঁক দেখা যায়। সেইজন্য শঙ্করাচার্যও যোগের অনেক কিছুতেই আপত্তি করেছেন। অন্য দিকে প্রকৃতির যে তিনটে গুণের কথা বলা হয়েছে সেটা যোগও মানছে আবার অদ্বৈত বেদান্তও মানছে। বেদান্তও মানে প্রকৃতি ভোগ করিয়ে করিয়ে পুরুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।

বেদান্তে একটা কথা বলা হয়, অনুতে যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে। আমার আপনার শরীরের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই একই জিনিষ হয়ে চলেছে। আমরা যে নিজের শরীর, মনের সঙ্গে এক করে রেখেছি, অবিদ্যার কারণেই এক করে রেখেছি। আমরা সব সময় ‘আমি’ আর ‘আমার’ ‘আমার’ করে চলেছি। যে অফিসে কাজ করি সেখানে বলি ‘এটা আমার অফিস’, ‘ইনি আমার বস’। ‘আমার বাড়ি’, ‘আমার গাড়ি’, ‘আমি বড়লোক’, ‘আমি বিদ্যান’, ‘আমি মুর্থ’, এই যে সবাই ‘আমি’ ‘আমি’ ‘আমার’ ‘আমার’ করে যাচ্ছে এটাই অবিদ্যা। আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলে গেছি। এটা গেল ব্যষ্টির স্তরে, সমষ্টির স্তরেও একই জিনিষ হয়। সমষ্টির স্তরে পুরুষ আর প্রকৃতির যে

সংযোগ, এই সংযোগের হেতু অবিদ্যা। প্রকৃতি সাথে সংযোগ হয়ে গেলে পুরুষ প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে অনন্ত কাল ঘুরতে থাকবে যতক্ষণ না তার বৈরাগ্য আসছে। বৈরাগ্য মানে প্রকৃতির খেলা দেখতে দেখতে পুরুষের মধ্যে বিরক্তি এসে যায়, বিরক্তি এসে গেলে এক সময় বলতে শুরু করে ‘আর না বাপু অনেক হয়েছে’। ব্ল্যাকে কত কষ্ট করে টিকিট কেটে আজকে যে সিনেমাটা দেখছি। কাল আর ব্ল্যাকে কেন, কেউ টিকিট কেটে দিলেও দেখতে ইচ্ছে করবে না। যদিও দ্বিতীয় বার বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে দেখে নেয়, তৃতীয় বার সে কোন ভাবেই আর ওই সিনেমা দেখতে যাবে না। তার মানে ওই সিনেমা থেকে তার বৈরাগ্য এসে গেছে।

জিবস্ সিরিজে একটা সুন্দর গল্প আছে। একটি ছেলে একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে ফাঁসিয়ে রেখেছে। ছেলেটিকে মেয়েটির কাছ থেকে কোন রকমে সরাতে হবে। জিবস্ ছিল বাড়ির চাকর কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। ওকে সব বলা হল। চাকরটি বলল ‘আচ্ছা দেখছি’। একটা বড় প্রোগ্রাম হবে, সেখানে চাকরটি বলে দিয়েছে যে মেয়েটি নাকি খুব ভালো গান করে। ছেলেটিকে দিয়ে মেয়েটিকে বলানো হয়েছে তুমি যদি অমুক গানটি কর খুব ভালো হয়। অন্য দিকে জিবস্ মেয়েটির আগে পর পর তিনজনকে দিয়ে ওই একই গান গাইয়েছে। আগে থেকেই তিনজনকে আলাদা আলাদা করে বলে দেওয়া হয়েছে আপনি যদি এই গানটি করেন তাহলে শ্রোতৃমণ্ডলী খুব খুশি হবে। প্রথম গায়ক এসেছে, সে এসে ওই গানটি করেছে। শ্রোতারা খুব খুশী হয়ে জোর হাততালি দিয়েছে। দ্বিতীয় গায়ক এসে একই গান করেছে, এবারে হাততালিটা একটু কম পড়েছে। তৃতীয় গায়ক এসে ওই একই গান করেছে, শ্রোতারা এবার গালাগাল দিতে শুরু করেছে। চতুর্থ গায়ক ছিল এই মেয়েটি। তাকে আগেই খুব করে উৎসাহ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে, এই গানটি যদি করেন তাহলে স্যার খুব খুশি হবেন, এই সব বলে মেয়েটিকে খুব তাতিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনি মেয়েটি ওই একই গান করতে শুরু করেছে, শ্রোতাদের থেকে পচা টমেটো ছুঁড়তে শুরু করেছে। শ্রোতারা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। মেয়েটি বলছে এগুলো কী হচ্ছে! তখন মেয়েটিকে বলা হয়েছে ‘আপনার আগে তিনজন এই একই গান গেয়ে গেছে’। ‘তাহলে আমাকে কেন এই গান করতে বলা হল? ছেলেটি কি আগে জানতো?’ ‘হ্যাঁ! একই গান তিনজন গাইবেন উনি জানতেন’। সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেটি ওর পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল, বিয়ের কথাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল, সেটা তখনই ভেঙে দিল। ছেলেটি কিন্তু কিছু জানতই না যে এত সব কিছু করা হয়েছে। বাটলারের এত বুদ্ধি যে কায়দা করে দুজনকে আলাদা করে সরিয়ে দিল। কীভাবে সরিয়ে দিল? একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি করিয়ে করিয়ে। যখনই পুরুষের ভোগের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে যায় তখন পুরুষের মধ্যে বিরক্তি এসে যাবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন ছোটখাটো বাসনাগুলো মিটিয়ে নিতে হয়। বড় বাসনা হল কামিনী-কাঞ্চন। কামিনী-কাঞ্চনের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল পথ। এর মধ্যে পড়ে গেলে আর বেরনো যাবে না।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, আমরা যত দুঃখ পাই, সব দুঃখের মূল একটাই, আর তা হল পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ। কিন্তু এখানে সংযোগ মানে আসক্তি। বিভিন্ন দর্শনে এই শব্দগুলো পাল্টে যায়। আমাদের দুঃখ-কষ্টের মূলে আসক্তি। আমি একটা জিনিষকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, সেই জিনিষটা চলে গেলে আমি কষ্ট পাই। মা সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, সন্তান মারা গেলে বা ছেড়ে চলে গেলে মা কেঁদে ভাসায়। কেঁদে ভাসাচ্ছে কেন? সংযোগ হয়ে গেছে। কার সাথে? সন্তানের সাথে। মা সন্তানের সাথে জুড়ে গেছে। আসল সংযোগটা হয় পুরুষ আর প্রকৃতির। মহৎ হল সমষ্টি বুদ্ধি আর ব্যষ্টিতে শুধু বুদ্ধি বলা হয়। যখন ব্যক্তি স্তরে কারুর বুদ্ধির কথা বলা হয় তখন তাকে বুদ্ধি বলছে আর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধির কথা বলা হয় তখন সেই বুদ্ধিকে দর্শনের পরিভাষায় মহৎ বলছেন। বিশেষ কারুর প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ, কারুর প্রতি যে আমাদের রঞ্জনা ত্বক ভাব, এটাই যখন পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে হয় তখন সেটাকেই বলছে সংযোগ। এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু সে নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে নেয়। আমাদের জীবনের যা কিছু দুঃখ-কষ্টের মূল হল আমরা সব কিছুর সঙ্গে জুড়ে রেখেছি। স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জুড়ে

রেখেছি কষ্ট, নিজের বাড়ি, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের সঙ্গে জুড়ে রেখেছি কষ্ট, দেহের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছি তাই কষ্ট, আমাদের মন ও বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে রেখেছি তাই এত কষ্ট।

নিজের ভেতর থেকে কষ্ট কখনই আসে না। একজনের একটা আম বাগান আছে। সেই আম বাগানের পাশে আরেকজনেরও একটা আমের বাগান আছে। কিন্তু সে নিজের আম বাগান ছেড়ে পাশের আম বাগান থেকে আম চুরি করতে গেছে। পাশের বাগানে এমনই কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা যে ভেতরে ঢুকলেই ধরা পড়ে যাবে, আম পেড়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেবে। ধরে নেওয়ার পর মালিক বলবে ‘তুমি চুরি করে আম পেড়েছ এবার জরিমানা দাও’। ‘কি জরিমানা’? ‘বাগানের সব আম গাছে জল আর সার দাও’। এবার জল ও সার দিতে দিতে তার খিদে পেয়ে গেছে। খিদে পেলে কি খাবে? বাগানে আম আছে। আম খাবে, আম খেতে হলে গাছ থেকে আম পাড়তে হবে, আম পাড়তে গিয়ে আবার ধরা পড়বে। ধরা পড়লে আবার জরিমানা দিতে হবে। আরও জল দিচ্ছে আরও সার দিয়ে যাচ্ছে। কাজ করতে করতে আরও পরিশ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, পরিশ্রম হওয়া মানে তাকে এখন খেতে হবে, কারণ খিদে পেয়ে যাবে। সেই আমই আবার খেতে যাবে। ওই আম খেলে আরও জরিমানা দাও। এখন সে সারা জীবনের মত তার গোলাম হয়ে পড়ে থাকবে। গোলামী থেকে তার আর নিস্তার নেই।

আমাদের জীবনেও একই জিনিষ হয়ে চলেছে। আপনি হলেন সেই শুদ্ধ পুরুষ, আপনার ভেতরে অনন্ত জ্ঞান আর অনন্ত আনন্দ, কিন্তু আপনি বলছেন আমি প্রকৃতির আনন্দ পেতে চাই। প্রকৃতির আনন্দ নিতে গিয়ে আপনি ফেঁসে যাচ্ছেন, জরিমানা দিতে গিয়ে আরও কাজ করতে হচ্ছে। ওই কাজ করতে গিয়ে আবার একটু আনন্দ দরকার। সেই আনন্দ যখন পেতে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আরও জরিমানা দিতে হচ্ছে, আরও কাজ করতে থাকুন। এইভাবে হয়ে হয়ে আপনি এমন দুরবস্থায় জড়িয়ে গেছেন যে অপরের বাগানের আম পেড়ে আপনাকে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হচ্ছে। আর আপনার যত পরিশ্রম, খাটনি সব জরিমানা দিতেই চলে যাচ্ছে। যে লোকটি সারা মাস ট্রেনে বাসে বুলে কষ্ট করে অফিসে গিয়ে কাজ করে মাসের শেষ ধরলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে সে নিজের জন্য কতটা খরচ করছে? মেরে কেটে দু-তিন হাজার। আর বাকি টাকা জরিমানা দিতেই চলে যাচ্ছে। একটা বউ রেখেছে, তার জন্য জরিমানা দিতে হচ্ছে। বউ আছে বলে ছেলে-মেয়ে হয়েছে, তার জন্যও জরিমানা দিতে হচ্ছে। সারা জীবন জরিমানা দিতেই থাকছে। বুড়ো হয়ে পেনসান পাচ্ছে, সেটাও জরিমানা দিতেই চলে যাচ্ছে। কোন পথই নেই যে এর থেকে বেরোতে পারবে। পুরুষ আর প্রকৃতির ঠিক এই খেলাই চলছে। অবিদ্যাই একমাত্র এর কারণ। পুরুষ জানে যে আমার নিজের বাগান আছে, সেখানে আমি স্বাধীন ভাবে যত খুশি আম খেতে পারি। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ অপরের বাগানের প্রতি নজর চলে গেছে। আর অপরের বাগানে ঢুকেছে কি ফেঁসেছে। পুরুষ সংস্করণ, চিত্তস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ – তাঁর ভেতরেই অনন্ত আনন্দ সাগর কিন্তু সেই আনন্দকে ছেড়ে প্রকৃতির মধ্যে আনন্দ খুঁজতে গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছে আর জরিমানা দিয়েই চলছে।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে যা হয়

কিন্তু কোন ভাবে এই সংযোগটা যদি কেটে যায় তখন কী হবে? পরের সূত্রে সেটাই বলছেন –
তদভাবাৎ সংযোগাত্বাবো হানং তদ্বশেঃ কৈবল্যম।।২৫।। অজ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যা আছে বলেই সংযোগ আছে, সংযোগ আছে বলেই প্রকৃতির মধ্যে ফেঁসে গিয়ে প্রকৃতির এলাকায় ঘুরপাক খাচ্ছি। প্রকৃতির এলাকায় থাকলে আমাদের মধ্যে রাগ আর দ্বेष আসবে। কিছু জিনিষকে পছন্দ করবো আবার কিছু জিনিষকে অপছন্দ করবো। যাকে আমার পছন্দ তার দিকে আমাকে এগোতে হবে, এগোন মানে আমাকে কাজ করতে হবে। যাকে অপছন্দ করছি, তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। তার মানে সবেতেই আমাদের কাজ করতে হবে। যত কাজ করব তত রাগ আর দ্বেষ বাড়তে থাকবে। রাগ আর দ্বেষ বাড়লেই আরও বেশি কাজ করতে হবে। এই জিনিষ চলতেই থাকবে কোন দিন শেষ হবে না। আমি যদি ভেবে থাকি এইভাবে আস্তে আস্তে একদিন আমার সমস্ত কর্মক্ষয় হয়ে যাবে, তাহলে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ভাবনা নিয়ে বসে আছি। এইভাবে কোন দিন কর্মক্ষয় হবে

না। কারণ কর্মক্ষয় করতে গিয়ে আমাকে আবার কর্ম করতে হবে। সেই কর্ম থেকে আবার রাগ ও দ্বেষ সৃষ্টি হবে। তখন যোগ বলবে তোমার সংযোগটা আগে কেটে দাও। সংযোগ কাটতে গিয়ে দেখছি কাটা যাচ্ছে না, আষ্টপৃষ্ঠে চেপ্টে রয়েছে। ঠাকুর বলছেন জীব আষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা, তার উপর আবার ইক্ষুপ মারা। পুরুষ প্রকৃতির এলাকায় আষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে আছে। কী দিয়ে বাঁধা? অবিদ্যা দিয়ে বাঁধা। অবিদ্যা মানে? পুরুষ শুধু ভাবছে আমি বন্ধনে পড়ে আছি।

আরেকটি মজার গল্প আছে, তাতে লগুনে একটি ছেলের প্রচুর টাকা-পয়সা আছে। ছেলেটির একজন সৎমা আছে, সেই সৎমা তাকে চালায়। ছেলেটির বাবাও সৎমার অধীনে। বাড়ির যত কর্মচারী সবাই সৎমার কথাতে ওঠে বসে। ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছে। সৎমা মেয়েটিকে আবার পছন্দ করে না। ছেলেটি একজনের কাছে বুদ্ধি চেয়েছে। সে ছেলেটিকে বলছে ‘তুমি এখান থেকে প্যারিসে চলে যাও’। ছেলেটি বলছে ‘সৎমা তো তাহলে আমাকে শেষ করে দেবে’। যে বুদ্ধি দিচ্ছে সে বলছে ‘আরে ভাই! সৎমা থেকে তোমার সমস্যা কোথায়! তোমার টাকা-পয়সা কার কাছে আছে?’ ‘সব তো আমার কাছেই আছে, আমার নামে আলাদা একাউন্টে রাখা আছে’। ‘তাহলে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?’ ‘তাই তো! সারা জীবন আমি বুঝতে পারিনি আমি সৎমাকে কেন ভয় পাই’। পরের দিনই সে মেয়েটিকে নিয়ে প্যারিস চলে গেছে। বাড়িতে থাকতে থাকতে তার মাথায় ঢুকে গেছে সৎমাই আমার মালকিন, সৎমাই আমার সব কিছু করবে। অথচ ঠাকুরদার সময় থেকে প্রচুর সম্পত্তি তার নামে আলাদা করে রাখা আছে। যেদিন আঠারো বছর হয়ে যাবে সে নিজেই সেই সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে। এখন তার পঁচিশ বছর হয়ে গেছে, পুরো ব্যাঙ্কের টাকা তার নামে, সম্পত্তি তার হাতে। কিন্তু তার মাথায় ঢুকে আছে সৎমাই সব। যেদিন বুঝে গেল সেদিন সঙ্গে সঙ্গে লগুন থেকে বেরিয়ে প্যারিস চলে গেল। পুরুষ যে প্রকৃতির বন্ধনে পড়ে আছে, কে তাকে বন্ধনে রেখেছে? কেউ রাখেনি, পুরোটাই অবিদ্যা। তুমি মনে করছ বন্ধনে পড়ে আছ বলে বন্ধনে আছ। এই সূত্রেই স্বামীজীর একটি বিখ্যাত উক্তি পাই *প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাই সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য।* আমরা তো পুরোপুরি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আছে, জগৎ আমাদের বশীভূত করে রেখেছে।

বলছেন যে মুহুর্তে অবিদ্যার নাশ হয়ে যাবে সেই মুহুর্তেই পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগটা ছিন্ন হয়ে যাবে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দ্রষ্টা আর দৃশ্য চিরদিনের মত আলাদা হয়ে যাবে। সাংখ্য দর্শন ও যোগদর্শন হল ঘোর দ্বৈতবাদীদের দর্শন, যেখানে দুটো সত্তাকে মানা হয়। এদের কাছে পুরুষ আর প্রকৃতি দুটো আলাদা সত্তা। দুজনের সাথে কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ওরা দুজন মিলে যায়। এই যে বলছেন অবিদ্যার কারণে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন হয়, কিন্তু অবিদ্যার এই কারণকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এটাকেই যখন দার্শনিক দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে দেখে তখন বলবে ‘ঈশ্বর কেনই বা সৃষ্টি করেন?’ অনেকে বলবেন তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যখন বলছে তখন এটা কোন উত্তরই হলো না, মানে আমি কিছু জানিনা। অন্য এক জায়গায় স্বামীজী বলছেন হিন্দুরা এই জায়গাতে খুবই সৎ। হিন্দুরা শব্দজালে কোন কিছুকে লুকোয় না, পরিষ্কার বলে দেয় ‘আমার জানা নেই এটা কেন হয়’। সেইজন্য এনারা একটা শাস্ত্রীয় পরিভাষা দিয়ে রেখেছেন, যার নাম অবিদ্যা বা মায়া। অবিদ্যা শব্দটা সাংখ্যযোগের। অবিদ্যাকেই পরে বেদান্ত নিয়েছে, কিন্তু বেদান্তে অবিদ্যার ঠিক ঠিক শব্দ হল মায়া। ঈশ্বরের মায়ার দরণ অবিদ্যা এসে যায়, অবিদ্যা যখন চৈতন্য সত্তাকে ঢেকে দেয় তখন চৈতন্য সত্তা নিজেকে জড় সত্তার সঙ্গে সংযোগ করে নেয়। সংযোগ হয়ে যাওয়ার পর দুটোর সঙ্গে এমনই মেল হয়ে যায় যে জড়কে চৈতন্যের মত মনে হয়। এই ব্যাপারটা সরাসরি আমাদের জীবনেও দেখতে পাই, আমাদের মন, বুদ্ধিকেই আমার চৈতন্য রূপে ভাবি। যার ফলে আমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা সব সময় মন বুদ্ধিকে জড়িয়ে থাকে। এটাই অবিদ্যা। কারণ আসল চৈতন্য ভাব রয়েছে পুরুষের মধ্যে। পুরুষ যখনই প্রকৃতির কাছে আসে তখন প্রকৃতিকে মনে হয় যেন সে চৈতন্যময় হয়ে গেছে। প্রকৃতি এবার নিজের মত চলতে শুরু করে। আর পুরুষ হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এমন জড়িয়ে যায় যে, প্রকৃতিতে যা কিছু হয় সে মনে করে আমারই হচ্ছে। সৃষ্টি মানে এটাই।

ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিয়েছেন। উনুনে হাড়ি চাপানো আছে, তাতে আলু, পটল দেওয়া আছে। হাড়ির জল গরম হলে আলু পটলগুলো লাফাতে থাকে। আলু পটল ভাবছে আমরা লাফাচ্ছি। আসলে তলায় আগুন আছে, আগুনের তাপে জল গরম হয়ে ওঠানামা করতে থাকে বলে আলু পটলও লাফাতে থাকে। ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফরমারেও একই জিনিষ হয়ে থাকে। সমস্ত ট্রান্সফরমারে যেখানে এসি কারেন্ট পাওয়ার হাউস থেকে আসে সেখানে দুটো কয়েল থাকে, প্রাইমারি কয়েল আর সেকেন্ডারি কয়েল। প্রাইমারি কয়েলে ইলেক্ট্রিসিটি আসে। এসি কারেন্ট যখন প্রাইমারি কয়েলে আসা যাওয়া করতে থাকে তখন সেখানে চৌম্বকীয় শক্তি তৈরী হয়। এর সাথে সেকেন্ডারি কয়েলের কোন সংযোগ নেই, পুরো আলাদা। কিন্তু ওর চৌম্বকীয় শক্তি এর মধ্যে এসে যায়, এসে যাওয়ার পর সেখান থেকে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী হতে থাকে। ঘরে ঘরে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে আমরা মনে করছি থার্মাল থেকে আসছে, কিন্তু থার্মাল থেকে কখনই আসছে না। থার্মাল থেকে ট্রান্সফরমারে যে বিদ্যুৎ আসছে সেটা প্রাইমারি কয়েলে এসে চৌম্বকীয় শক্তি তৈরী করেছে। সেকেন্ডারি কয়েলের সাথে প্রাইমারি কয়েলের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও প্রাইমারি কয়েলের বিদ্যুতের চৌম্বকীয় শক্তি সেকেন্ডারি কয়েলকেও চৌম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে। একে বলে induce হওয়া। ঠিক একই শব্দ সাংখ্যবাদীরাও বলে, চৈতন্য induce হয়ে যায়। সাপ্লাই লাইনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বিদ্যুৎ আসছে প্রাইমারি কয়েলে, কিন্তু এত জোর চৌম্বকীয় শক্তি তৈরী হয় যে, সেই চৌম্বকীয় শক্তি সেকেন্ডারি কয়েলে ট্রান্সফার হয়ে যায়। চৌম্বকীয় শক্তি ওঠা নামা করেছে বলে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে। সেই ইলেক্ট্রিসিটি ঘরে ঘরে চলে আসছে। আমরা মনে করছি থার্মাল প্ল্যান্ট থেকে আসছে। আমাদের বিদ্যুৎতো আসছে ট্রান্সফরমার থেকে, এর সাথে থার্মালের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে থার্মাল প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে গেলে কি বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে আসবে? কখনই আসবে না। থার্মাল প্ল্যান্ট যদি চলে আর ট্রান্সফরমার যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলেও বিদ্যুৎ আসবে না। ট্রান্সফরমার ডাউন হয়ে যাওয়া মানে মানুষের মৃত্যু হয়ে যাওয়া। শুদ্ধ চৈতন্য সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার নিজের ট্রান্সফরমার ডাউন হয়ে গেছে। পুরুষ প্রকৃতির সম্পর্ক পুরোপুরি ট্রান্সফরমারের ইনডাকশান কয়েলের সঙ্গে মিলে যায়। দুজনের সরাসরি কোন সম্পর্কই নেই।

আমাদের বোধ সর্বক্ষণ এই শরীরের সঙ্গে। যখন শরীরের কিছু হয় তখন বলি আমার ব্যাথা লাগছে, আমার শীত করছে, আমার গরম করছে। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, যখন আমরা খুব আনন্দে কিংবা অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে থাকি, তখন কিন্তু ব্যাথা বোধ, শীত বোধ, গরম বোধ থাকে না। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে আমাদের যখন শরীর বোধ থাকে না তখন শরীরের কোন কিছুই আমাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। অর্থাৎ আমরা সেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ স্থলে যখন পৌঁছে যাই তখন পরিষ্কার দুটো আলাদা জগৎকে দেখতে পাই। তাই বলছেন অবিদ্যাই সংযোগের হেতু, অবিদ্যাই এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে এক করে দিচ্ছে। এই অবিদ্যাতে পৌঁছানই আমাদের লক্ষ্য, যেখান থেকে আমরা পরিষ্কার পুরুষ আর প্রকৃতিকে আলাদা দেখতে পারব। একবার যদি বুঝে নেওয়া যায় অবিদ্যার জন্য যত খেলা হচ্ছে তখনই এই দ্রষ্টা আর দৃশ্যকে যে এক করে রেখেছে সেটা চিরকালের মত আলাদা হয়ে যাবে। একটা গাদাবোট যাচ্ছে তার সঙ্গে একটা নৌকা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, এখন যে গাদাবোটে বসে আছে সে দড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দিল, তখন কি হবে – গাদাবোটের সাথে নৌকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এই সূত্রেই স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ পাই – Each soul is potentially divine, the goal is to manifest this divinity, by controlling nature external and internal – *আত্মামাদ্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।* আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ আমরা স্বামীজীর এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে পাই তা হল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে মনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়, তার রূপরেখা স্বামীজী এইখানে বর্ণনা করেছেন। একটা সাপ চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে তার মধ্যে জল রয়েছে, জলের মধ্যে পদ্মফুল, রাজহাঁস আর উদীয়মান সূর্য।

যো সো করে আমাদের এই ব্রহ্মভাবে ব্যক্ত করতে হবে, মুক্তি আমাদের পেতেই হবে। *তন্নোহংসঃ প্রচোদয়াৎ*, আমাকে সেই পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছাতে হবে। কিভাবে পৌঁছাবে? বলছেন – বাইরে যে সপর্টা ঘিরে রয়েছে সেটা হল রাজযোগের প্রতীক, উদীয়মান সূর্য জ্ঞানযোগের প্রতীক, তরঙ্গায়িত জল কর্মযোগ আর পদ্মফুল ভক্তিযোগকে বোঝাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন এই চারটে যোগের মধ্যে যে কোন একটি পথকে অবলম্বন করে অথবা সব কটি পথকে সমন্বয় করে ঐ রাজহংস অর্থাৎ পরমহংসের কাছে পৌঁছাতে হবে তারপর তুমি ঐ হংসের সাথে এক হয়ে যাও। এটাই সমস্ত ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ তুমি এই অজ্ঞানকে এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করে তোমার যে সত্যিকারের স্বরূপ সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। *তন্নোহংসঃ প্রচোদয়াৎ* - মানে, পরমহংস আমাদের বুদ্ধিকে জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত করুন। *প্রচোদয়াৎ* মানে নিয়ে যাওয়া অথবা প্ররোচিত বা উৎসাহিত করা, তিনি আমাদের বুদ্ধি দিন, আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করুন, হংস সেই পরমেশ্বর ভগবান। এই উক্তিকে ভিত্তি করেই স্বামীজী বেলেড় মঠের প্রতীকটি তৈরী করেছিলেন।

তদ্বশেঃ কৈবল্যম্, কৈবল্য মানে মুক্তি। কিসের মুক্তি, মুক্ত তো তুমি আছই। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষ একটা কাল্পনিক বন্ধন তৈরী করে রেখেছে, ওই কাল্পনিক বন্ধনটা কেটে দিলেই মুক্তি। বন্ধন যদি আসল বন্ধন হতো তাহলে আজ যদি মুক্তি হয়ে যায় তাহলে কাল আবার বন্ধনে পড়ে যাবে। বন্ধনটা আসল নয়, এটাই অবিদ্যা। আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা জেনে নিলে আর কোন দিন সে বন্ধনে পড়বে না। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন *Each soul is potentially divine*। বাস্তবে তুমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য। মানবজীবনের উদ্দেশ্যই হল তোমার ভেতরের এই শুদ্ধ চৈতন্যকে ব্যক্ত করা। এখানে উদ্দেশ্য বলতে বোঝাচ্ছে এই মানবশরীর দিয়ে অব্যক্ত আত্মাকে ব্যক্ত করা সম্ভব। সেইজন্য এই শরীর দিয়ে এটাই করা উচিত। কীভাবে করবে? এখানেই স্বামীজী চারটে যোগের সমন্বয় করেছেন। স্বামীজী বলছেন *কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাবে ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও*। কিসের থেকে মুক্ত হওয়া? প্রকৃতির যে প্রভাব, সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

স্বামীজী বলছেন – *যিনি অন্তঃপ্রকৃতি জয় করিয়াছেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার বশীভূত, তাঁহার দাসস্বরূপ*। সেইজন্য বলা হয়, যারা বলে আমি এখন জগতের ভালো করতে যাচ্ছি, আমি এখন সংসার, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি, জগতের প্রতি কর্তব্য করছি – কর্তব্য অবশ্যই করতে হবে কিন্তু তার আগে নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করতে হবে, নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে, মনের লাগামকে শক্ত হাতে ধরতে হবে, একমাত্র তখনই সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হয়ে যাবে। তখন কারুর ক্ষমতা হবে না যে তোমার কোন কথা কে না করে দেবে। তুমি যদি বল পাহাড়টা ঐখান থেকে সরে যাক, পাহাড় সরে যাবে। এই ব্যাপারে স্বামীজীর খুব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি আমাদের এত জোর দিয়ে বলছেন। এগুলো আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বলেই নয়, সত্যি সত্যি এই রকমই হয়, এর কোনটাই অযৌক্তিক নয়, প্রত্যেকটি কথা বলিষ্ঠ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

একটি ছেলে তার মাকে ভালোবাসে, আবার তার গুরুকেও ভালোবাসে, সাথে সাথে যে মেয়েটির সাথে তার বিয়ে হবে তাকেও ভালোবাসছে। একাধিক ব্যক্তির প্রতি এখানে ভালোবাসা আছে। তাহলে ভালোবাসাটা কী? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করা হয়েছে। কোন মানুষ কোন বস্তুকে বস্তুর জন্য ভালোবাসে না। ওই বস্তুর মধ্যে সে নিজের ছবি দেখে বলে ভালোবাসে। নিজের স্ত্রীর মধ্যে, নিজের স্বামীর মধ্যে, নিজের সন্তানের মধ্যে সে নিজের আত্মার ছবি দেখে বলে তাদের ভালোবাসছে। আত্মা খুব উচ্চ ভাবের কথা, আমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, যেখানে গিয়ে নিজেকে সে মুক্ত দেখে, যেখানে নিজেকে ডানা মেলা বিহঙ্গের মত বিস্তার করতে পারে সেখানেই ভালোবাসা আসে। একটা পাখি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। যখন খাঁচার মধ্যে থাকে তখন সে ঐ খাঁচটুকুর মধ্যে মুক্ত বলে খাঁচাকে ভালোবাসে। কেউ যদি তাকে খাঁচা থেকে বার করে একটা ঘরের মধ্যে ছেড়ে দেয় তখন সে ওই ঘরের মধ্যে নিজেকে মুক্ত দেখে ঘরটাকেই ভালোবাসে। এবার আরেকজন এসে পাখিটাকে ঘরের বাইরে খোলা আকাশে ছেড়ে দিল। এবার সে

খোলা আকাশকেই ভালোবাসবে। কারণ আকাশে সে নিজেকে বিস্তার করতে পারছে। আবার অন্য রকমও আছে। এক ভদ্রলোকের একটা টিয়া পাখি ছিল। ভদ্রলোকের মনে একটু করুণা হয়েছে ‘আহা! বেচারী খাঁচাতে বদ্ধ হয়ে আছে’! তিনি টিয়া পাখিকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু টিয়া পাখিটা লোকটিকে ছেড়ে কোথাও যায় না। লোকটি যেখানে যায় পাখিটাও লোকটির কাঁধের উচ্চতায় উড়তে উড়তে তার সাথে চলতে থাকে। লোকটি যদি কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলে টিয়া পাখিটা ওর কাঁধে বসে চোঁচাতে শুরু করে। খুব মজার ব্যাপার। মানুষ যে জায়গাতে নিজেকে খোলামেলা ও স্বাধীন অনুভব করে, সে সেই জায়গাকে ভালোবাসে। যে জিনিষের কাছে গিয়ে আপনি নিজেকে মুক্ত মনে করবেন, সেটাই আপনার বাস্তবিক স্বভাব। আর আপনার জীবনে এমন কোন ব্যক্তিত্ব যদি থেকে থাকে যার কাছে গিয়ে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত মনে হয়, যাকে আপনি আপনার মনের সব কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন, দেখা যাবে তাকেই আপনি আপনার তন-মন-ধন পুরো সমর্পণ করে দেবেন। শিশুরা মায়ের কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত, ভাবে মা যতক্ষণ আমার কাছে ততক্ষণ আমি যা খুশি করতে পারি। সেইজন্য মায়ের প্রতি শিশুদের ভালোবাসা সবার থেকে বেশী। কিছু দিন পর সন্তান যখন বড় হয় তখন তারা বাবার কাছে নিজেকে বেশী মুক্ত মনে করে। কারণ বাবা এখন হাত ধরে ধরে তার চলাফেরার গপ্তীটা বড় করে দিয়েছেন। দুই ছেলেদের থেকে বাবা তাকে রক্ষা করছে। তখন বাবাকে বেশী ভালোবাসতে শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় কিছু বাচ্চা বাবা-মার থেকে কাকার কাছে থাকতে ভালোবাসে, কারণ কাকার কাছে গিয়ে সে নিজেকে বেশী স্বাধীন মনে করছে, নিজেকে বেশী করে উন্মোচন করতে পারছে। বড় হতে হতে একটা বয়সে গিয়ে সে এবার একটা মেয়েকে ভালোবাসতে শুরু করে। তখন তার মা বলে ‘হ্যাঁরে খোকা! কালকেও তো তুই আমাকেই ভালোবাসতিস, এখন এগুলো আবার কি শুরু করলি’? মা বুঝতে পারছে না, তোমার ছেলে যদি এভাবে না পাল্টায় তাহলে বুঝতে হবে ওর মাথায় কিছু গোলমাল আছে। কারণ এতদিন মাকে নিয়ে তার যা কিছু চলছিল সেখানে এক ধরণের স্বাধীনতার আনন্দ পাচ্ছিল, কিন্তু এরপর যখন তার জীবনে একটা মেয়ের আবির্ভাব হচ্ছে তখন তার স্বাধীনতার অনুভূতি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কদিন পর ওখানে থেকে যখন মার খেতে শুরু করে তখন সে সাধুবাবাদের কাছে যাওয়া শুরু করে। সেখান থেকে তার একজন গুরু লাভ হল। গুরু তাকে একজন ইষ্ট দিয়ে দিলেন। ইষ্ট পাওয়ার পর গভীর ভাবে ইষ্টের চিন্তন করতে শুরু করে। কিন্তু সবাই ইষ্টের চিন্তন করতে পারে না। কারা পারে না? যাদের ওটা ঠিক ঠিক স্বভাব নয়। যাদের ঠিক ঠিক স্বভাব তারা ঈশ্বরের চিন্তনেই ডুবে যাবে।

নৈরাশ্য ও হতাশার ভাব দূর করার উপায়

সারা দিন পরিশ্রান্ত হয়ে রাত এগারোটায় আপনি শুতে গেছেন, সেই সময় যদি আপনাকে কোন কাজ দেওয়া হয় স্বাভাবিক ভাবেই আপনি বিরক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো আমাদের জীবনে এমন কোন কাজ কি আছে, যে কাজটা রাত এগারোটায় সময় বিছানায় শুয়ে পড়ার পরেও করতে বলা হলে লাফিয়ে সোজা হয়ে বসে যাব? যাঁরা খুব ভালো গান-বাজনা করেন, দেখা যায় ক্লান্ত হয়ে আসার পর তাঁকে তাঁর নিজের পছন্দের গান-বাজনার একটা যন্ত্র ধরিয়ে দিন, সব ক্লান্তি ভুলে ওর মধ্যেই ডুবে যাবেন। যাদের বই পড়ার নেশা, তারাও বই পেলেই মত্ত হয়ে যাবে। যারা ছবি আঁকে, সারাদিন অফিসে টানা কাজ করে আসার পর যেমনি রঙ তুলি পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর মন থেকে সব ক্লান্তি চলে গিয়ে চাঙ্গা হয়ে ছবি আঁকতে বসে যাবে। এগুলো হল তার source of sustenance। যাদের একটা source of sustenance থাকে তাদের কখন মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না, আর কোন রকম depressionও কখনই হবে না। কারুর যদি depression থাকে, বুঝতে হবে ওর জীবনে ভালোবাসার কেউ নেই। কারুর জীবনে যদি এমন কোন মানুষ থাকে যার কাছে নিজেকে সে পুরোপুরি খুলে দিতে পারে, তারও কখনই depression হবে না। আর এর সঙ্গে যদি তার কোন একটা বিদ্যা থাকে, সত্যিকারে বিদ্যা হতে হবে, যতই ক্লান্ত থাকুক যখনই সেই বিদ্যার বিষয়কে দিয়ে দেওয়া হয় তার মানসিক ও শারীরিক energy level বেড়ে যাবে। এরপর তার জীবনে কোন দিন depression আসবে না। তাই বলা হয় জীবনে অন্ততঃ একজনের প্রতি সত্যিকারের

ভালোবাসা নিয়ে আসতে হয়, সে যে কেউ হতে পারে, মা হতে পারে, বাবা হতে পারে, প্রেমিক হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, গুরু হতে পারেন। যার গলার আওয়াজ শুনলেই মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এরপর depression বলে কিছু আছে কিনা বুঝতেই পারবে না। এই দুটো, যে কোন একটা বিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগ বা একজন কারুর প্রতি সত্যিকারের গভীর ভালোবাসা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু যে কোন মুহুর্তে তার জীবন বিশাল সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তার অন্তরাত্মা নিজেকে মুক্ত মনে করতে পারে।

স্বাধীনতার অনুভব যখন আসে তখন ঠিক আছে। কিন্তু ছেলে যখন কোন মেয়েকে ভালোবাসে তখন কি ছেলেটির sense of freedom আসে? ছেলেটি বলবে, ‘হ্যাঁ আসে, ওর কাছে গেলে আমার মন-প্রাণ যেন উন্মুক্ত হয়ে যায়, মনে হয় কবিতা লিখি’। আর তারপর মেয়েটি যদি আরেকটি ছেলেকে ভালোবাসে তখন তোমার কী হবে? তখন তোমার সব কবিতা বন্ধ হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে শুধু দুঃখের গান বেরোতে শুরু করবে। তাহলে এখানে তোমার sense of freedom কোথায় গেলো? সুতরাং এই freedom তোমার natural freedom নয়, এটা তোমার artificial freedom। Natural freedom কোথায় হয়? আমি আমার গুরুকে খুব ভালোবাসি, গুরু আরও দশ জনের সঙ্গে কথা বলছেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, গুরুর কাছে থাকলেই আমার freedom আসে। Freedom মানে এটাই। Freedom কখন বন্ধন তৈরী করে না। ছেলে যখন কোন মেয়েকে ভালোবাসে আসলে এটাও এক ধরনের বন্ধন। এটাও একটা খাঁচা, তোমাকে কিছু জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে তোমাকে বদ্ধ করে দিচ্ছে। আমরা যে ভালোবাসা শব্দ ব্যবহার করি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভালোবাসা হয় না, ভালোবাসার নামে আসক্তিই জড়িয়ে থাকে। জগতে বেশীর ভাগ ভালোবাসা মানে, আমিও তোমার কাছে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই, তুমিও আমার কাছে আবদ্ধ হয়ে থাকো। জগতে আমরা three legged race করে বেড়াচ্ছি। সত্যিকারের ভালোবাসা আমাদের মুক্ত করে দেয়, কিন্তু আমরা যে ভালোবাসা খুঁজি তাতে বলি তোমার পা আমার পায়ের সাথে বেঁধে নাও, তারপর আমরা দুজনে মিলে দৌড়াব। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমই বলুন, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাই বলুন জীবন মানে three legged race।

স্বামীজী এখানে এটাই বলছেন, তুমি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছ, যার ফলে দিনরাত দুঃখ-কষ্টে কাতরাচ্ছ। তুমি অনন্ত, তোমার মধ্যে অনন্তের সত্তা বিদ্যমান, কিন্তু তুমি নিজেকে সীমিতের মধ্যে সিঁদিয়ে রেখেছ। তাই তোমার তো সব সময় জ্বালা-যন্ত্রণা হবেই। এই জ্বালা যন্ত্রণা হওয়ার তো কোন কারণ নেই, তুমি যে নিজেকে বন্ধনে ফেলে ভাবছ আমি বন্ধনে পড়ে আছি, এই বন্ধনটা তোমার কাল্পনিক বন্ধন, অবিদ্যাকে আশ্রয় করে তোমার এই দুরবস্থা। স্বামীজী তাই বলছেন, তোমার মধ্যে সেই দিব্যত্ব আছে তুমি সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। উদ্দেশ্য হল অব্যক্ত ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা। জো সো করে এই জেলের খাঁচা থেকে বেরিয়া আসা। কীভাবে বেরিয়ে আসবে তদভাবাৎ সংযোগাভাবো, অবিদ্যাকে যদি নাশ করতে হয়, তুমি যদি নিজেকে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তবে সদা সর্বক্ষণ তোমার নিজের স্বরূপের চিন্তন করে যেতে হবে। তখনই অবিদ্যার নাশ হয়ে যাবে, অবিদ্যা নাশ মানে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ নাশ। সংযোগ নাশ হয়ে গেলেই কৈবল্যম্, যেমন ছিলে তেমনই থাকবে। কৈবল্যম্ শব্দটা এসেছে কেবল থেকে। কেবল মানে শুধু মাত্র। একমাত্র পুরুষই থেকে যান। চৈতন্য ছাড়া কিছু থাকে না, ওর আর কারুর সাথে যোগাযোগ নেই। এটাই মুক্তি, এটাই নিজের স্বভাবে অবস্থান করা। আমরা মনে করি যেভাবে বিএ, এমএ ডিগ্রী পায় ঈশ্বর দর্শনও সেই রকম কোন কিছু। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন কোন অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করা নয়। ওটা সব সময়ই আমাদের প্রাপ্ত হয়েই আছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিটা এখন অন্য দিকে আছে, শুধু দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে আসতে হবে।

যেমন অবিদ্যা থেকে সরে আসছে তেমন মনের উপর তার পুরো নিয়ন্ত্রণ এসে যাবে। যার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে তার পদার্থের উপর নিয়ন্ত্রণ এসে যাবে। প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রা, তন্মাত্রা থেকে এই স্থূল জগৎ। আমরা এখন রয়েছি স্থূল জগতের

কয়েদি হয়ে। সাধনা করতে গিয়ে দেখছি স্থূল ভূতের কোন ভূমিকা নেই, তন্মাত্রাও কোন ভূমিকা পালন করে না। মন, সেই মনেরও উপরে আপনার অবস্থান। মনের যে মালিক হয়ে গেল, সেতো নীচের সব কটারই মালিক হয়ে যাবে। যে ভারত সরকারের মালিক, সে বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা সব কটা রাজ্যেরও মালিক হয়ে গেল। ভারতে যত জেলা আছে, মহকুমা আছে সবারই সে মালিক হয়ে গেল। একটা একটা করে কাউকে জয় করতে হবে না। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন সব সময় অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করতে, অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে নিলে বাহ্য প্রকৃতিকেও জয় করা হয়ে যাবে। আমরা সব সময় বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিকে কিছুতেই জয় করা যাচ্ছে না। নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করলে বাহ্য প্রকৃতি আপনা থেকেই জয় করা হয়ে যাবে।

আমাদের শরীর রয়েছে, আর আমাদের মনও আছে, কিন্তু এই শরীর মনেরই একটি বাহ্যিক আবরণ মাত্র। মন বহির্জগৎ থেকে সমস্ত ধরণের বস্তুকে গ্রহণ করছে, সে যেমন যেমন বস্তু গ্রহণ করে শরীরের গঠনও সেইভাবে তৈরী হয়। আমরা যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে আমরা যে ধরণের খাবার খাচ্ছি, সেই খাবার থেকে যেমন যেমন ক্রিয়া বিক্রিয়া হচ্ছে সেই সেই ভাবে আমাদের শরীরও পুষ্টি লাভ করছে। একমাত্র মনই বাইরের সব স্থূল বস্তুকে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের মত ভেতরে টানছে। কোথা দিয়ে টানছে? শরীরে ছিদ্র যত গুলো আছে, সব কটা ছিদ্র দিয়ে টানছে। যেমন যেমন নাক দিয়ে বাতাস টানছে, কান দিয়ে কথা নিচ্ছে, চোখ দিয়ে দৃশ্য নিচ্ছে, নাক দিয়ে সুগন্ধ-দুর্গন্ধ নিচ্ছে, মুখ দিয়ে খাবার নিচ্ছে তেমন তেমন এই দেহটাও সেই ভাবে তৈরী হচ্ছে।

এখানে স্বামীজী বলছেন, যদিও এর সাথে পতঞ্জলি যোগের কোন ব্যাপার নেই, যে কোন প্রাণী বাইরের খাদ্যকে গ্রহণ করে নিজের মত করে নিয়ে তার নিজস্ব স্বকীয়তাকে পরিস্ফুট করে দেয়। যেমন বাগানে একই মাটি, একই জল, একই সার, তাতে গোলাপ, ডালিয়া, গঁদা ও জবা চার রকম ফুলের গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চার রকম ফুলের গাছ একই মাটি থেকে একই খাবার নিচ্ছে কিন্তু গোলাপ গোলাপের মত পাপড়ি ছড়িয়ে বিকশিত হচ্ছে, ডালিয়া ডালিয়ার মত, গঁদা গঁদার মত ফুল ফুটিয়ে দিচ্ছে, সবটাই আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই কাজটা করে জেনেটিক জিনস্, যদিও স্বামীজীর সময় জিনস্ আবিষ্কার হয়নি। বর্তমানে জিনস্কে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, গবেষণাও চলছে।

রিচার্ড ডকিন্স নামে একজন খুব নামকরা বিজ্ঞানী, সেলফিস জিনস্ নামে তাঁর খুব বিখ্যাত বই আছে, তাতে তিনি বলছেন জিনই এই জগতের মাস্টার। কিন্তু স্বামীজী কখনই এই কথা বলবেন না, স্বামীজীর মতে বুদ্ধির জোরেই সব কাজ হয়। মনই হল মূল কেন্দ্র। মন যেমনটি বলবে শরীর তেমনটি বাইরের থেকে জিনিষ নিয়ে শরীরকে ঠিক সেই ভাবে তৈরী করে। এই ধারণাটা স্বামীজীর কমপ্লিট ওয়ার্কসে অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাপারটা খুব সহজ, জগৎ জগতের মত আছে। যখন জগৎ থেকে পদার্থ ভেতরে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, যেমন গরু বাইরে থেকে ঘাস ভেতরে টেনে নিয়ে আসছে, সেই ঘাস থেকে গরু দুধ তৈরী করে বাইরে বার করে দিচ্ছে। আমরা যখন সেই দুধ পান করছি তখন সেটাই আমার শরীরে রক্তে রূপান্তরিত হয়ে আমার বুদ্ধিকে সতেজ করছে। যার ভেতরে যেমন জেনেটিক পদার্থ আছে, সে বাইরের পদার্থকে ঠিক সেই কাজে লাগায়।

মাঝখানে অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করছিলেন জিন আমাদের মনকে চালনা করে, কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে মন আর জিন পুরো আলাদা আর জিনের শক্তির সাথে মনের শক্তির কোন তুলনাই করা চলে না, মনের শক্তি অনেক গুণ বেশী। মন চাইলে জিনকেই পুরো পাল্টে দিতে পারে। ইদানিং মনস্তাত্ত্বিকরা যে ধরণের ড্রাগ ব্যবহার করছেন তাতে মনের গঠনটাই পুরো পাল্টে যায়। এর সহজ দৃষ্টান্ত হল, যাদের মদ বা ড্রাগসের নেশা আছে তারা ইচ্ছে করলেও মদের নেশা ছাড়তে পারে না। কিন্তু যখন De-addiction Centre এ যায়, সেখানে তাদের এমন ভাবে রাখা হয় আর এমন এমন ওষুধ খাওয়ানো হয় যার ফলে ধীরে ধীরে তাদের মদ খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে যায়। তার মানে ওষুধ গুলো মস্তিষ্কে এমন কাজ করছে যে, যে জিনস্ গুলোর ইচ্ছে হচ্ছিল আমি নেশা করি তাদের সেই ইচ্ছেটাই চলে গেছে। সাধনা করে করে মানুষ এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে যেতে পারে যেখানে তার মনের উপর

পুরো নিয়ন্ত্রণ এসে যায়। কিন্তু এখন আমাদের মনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কেউ একটা কটু কথা বলে দিলে আমরা রেগে আঙুন হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে মত কাজ না হলে মন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আসা মানে কারখানার মূল উৎসটাই হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

আমাদের জ্বল শরীরটা ছোটখাটো অথচ খুব জটিল এক কারখানা। কোন রোগের ভাইরাস যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন প্রথমে তারা আমাদের শরীরে যেখানে cells গুলো তৈরী হয় সেখানে আক্রমণ করে। কিন্তু এই কারখানা খুব highly protected security zone, ওর মধ্যে সহজে ঢোকা যায় না। কিন্তু ভাইরাসগুলো ওই securityর passwordটা জোগাড় করে নিতে পারে। তাই সহজে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। ভেতরে প্রবেশ করে তারা প্রথম যে কাজটা করে তা হল, এক হুকুমে যা কিছু প্রোডাকশানের কাজ হচ্ছে সব বন্ধ করে দিতে তারা বাধ্য করে। তাহলে কী প্রোডাকশান হবে? আমি যে রকমটি আছে ওই রকমটি সব কিছু তৈরী করতে হবে। এরপর শুধু ভাইরাসই তৈরী হতে থাকে। আমাদের শরীরে যখন ভাইরাস প্রবেশ করে তখন একটা কি দুটোই যাচ্ছে, কিন্তু এরপর আমাদের শরীরই হাজার হাজার ভাইরাস তৈরী করতে শুরু করে দেয়। আমার শরীরে কীভাবে তৈরী হতে পারে? যেখানে ভালো cell তৈরী হওয়ার কথা, ভাইরাস সেখানে ঢুকে ওখানকার production systemএর পুরোটাই takeover করে নেয়। কিছুক্ষণ পরেই আমার শরীরে জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে জ্বর এসে গেছে। এরপর চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পর আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধক যে পদ্ধতি আছে বা এন্টি-বায়োটিক ড্রাগস দিয়ে ওই ভাইরাসগুলোকে মারতে শুরু করে দেয়। এইভাবে এক লম্বা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু এখানে মূল কথা হল আপনি যদি পুরো কারখানাটাই অধিকার করে নেন, তখন আপনার কথা মত সেখানে সব উৎপাদন হবে আর উৎপাদিত সামগ্রি আপনি যেখানে ইচ্ছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এই মন আপনাকে নিজের মত একটা শরীর দিয়ে রেখেছে, সেই শরীরে রোগ, ভোগ, যোগ সব কিছুই সম্ভবনা আছে। আমরা যদি শরীরকে সারাতে চাই কোন দিন সারাতে পারবো না। মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন, মনই হল একমাত্র যে এই শরীরকে তৈরী করেছে। মন জিনসগুলোকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, জিনসগুলো আবার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলোকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, সেই অনুসারে আমাদের শরীর তৈরী হয়। আমাদের শরীরে যা কিছু আছে, এর সব আমি নিজে তৈরী করেছি, বাইরের কেউ এসে এই শরীরের কোন কিছু তৈরী করে দেয়নি। যদি আমার শ্বাসকষ্ট হয় সেই কষ্ট আমারই তৈরী, আমার যদি হার্টের সমস্যা হয় সেটাও আমিই বাঁধিয়েছি। কিন্তু যদি শরীরের মূল উৎপাদিকা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়, তখন শরীরের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

স্বামীজী তাই বলছেন, মনই আসল। কচ্ছপের বাইরে যেমন একটা খোলস থাকে, ঠিক তেমনি এই টাউস শরীরটা হল মনের খোলস। এক একটা শরীর এক একটা খোলস। কার খোলস? আমাদের যে মন, সেই মনের খোলস। সেইজন্য শরীরের গঠন, মুখের ছাপ দেখলে বোঝা যায় লোকটির মানসিকতা রকম। চিকিৎসা বিজ্ঞানও আজ এটা মেনে নিয়েছে। সেইজন্য কোন ডাক্তার রোগীকে না দেখে কখনই ওষুধ প্রেসক্রাইব করবে না। রোগের ছাপ চোখে মুখে এসে পড়ে। তেমনি আনন্দে, শোকে মনে যে ছাপ পড়ে সেটা মুখে এসে ধরা পড়ে। আমাদের সবার চরিত্রের পুরো ছবি মুখে বসানো আছে। শুধু মুখ নয়, ঠাকুর আবার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেখে তার স্বভাব কি রকম বলে দিতেন। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি পশু পাখিদের শরীর দেখেও তাদের অনেক কিছু বোঝা যায়। কোন ঘোড়া কিছুক্ষণ খুব জোরে দৌড়াবে, কোন ঘোড়া অনেকক্ষণ দৌড়াতে পারে, ঘোড়ার শারীরিক গঠন দেখলেই বলে দেওয়া যায়। কফ, খুতু, প্রস্রাব, পায়খানা, যে জিনিসগুলো আপনি শরীর থেকে ছেড়ে দিয়েছেন সেটাকে পরীক্ষা করে প্যাথলজিস্টরা বলে দিচ্ছে আপনার শরীরে কি রোগ আছে। সেইজন্য বলা হয় মনের উপর যতক্ষণ আপনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না আসছে ততক্ষণ কখনই আপনার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসবে না।

এইসব বলে স্বামীজী শেষে বলছেন, জগতে যত রকম শক্তি আছে, তা জ্বলই হোক, সূক্ষ্মই হোক, আর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি যাই বলা হোক না কেন, সবটাই এক। মানুষ যোগ

সাধনা করে উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে দেখে সবটাই সেই মনেরই শক্তি। কারণ প্রকৃতি থেকে প্রথম আসে মহৎ, মহৎ মানে সমষ্টি মন। সমষ্টি মন থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে অনেক নীচে এসে প্রাণের সৃষ্টি হয়। প্রাণ মানে physical manifestation of force। আমরা যে বাহ্য জগৎ বলছি, ইলেক্ট্রিসিটি বলছি, চৌম্বকীয় শক্তি বলছি বা যে কোন ধরনের শক্তির কথা বলছি, এগুলো সবই বিভিন্ন ধরনের প্রাণ শক্তি। এই প্রাণ শক্তি থেকে ক্রিয়া শক্তি আসে, এগুলো অনেক নীচে। তাহলে ভাবুন আপনি যদি মহতের সঙ্গে এক হয়ে যান তখন জগতের যাবতীয় শক্তি আপনার মুঠোয় চলে আসবে।

এখন যদি সে এই শরীর আর মনকে বশীভূত করে নেয় তাহলে যে কোন সময় সে যে কোন একটা শরীর তৈরী করে নিতে পারবে। মনের শরীর তৈরী করতে এই মুহূর্তে দরকার একটা মুখ, একটা পাকস্থলী, আর হজম প্রক্রিয়া। এখন যদি মন খুব শক্তিশালী হয়ে যায় তখন আর হজম প্রক্রিয়ার কিসের জন্য দরকার হবে! খেতে হলে আমাদের চাল, গমই তো খেতে হবে, না হয় ছাগল, মুরগী খাব। ছাগল, মুরগী আসলে কি, চাল গমই তো। চাল গম কোথা থেকে এসেছে? সূর্যের শক্তি থেকে এসেছে। সূর্যের শক্তি গাছপালাতে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই গাছপালা ছাগল মুরগীতে যাচ্ছে, ছাগল মুরগীর মাধ্যমে আমরা সেই সূর্যের শক্তিই গ্রহণ করছি। সূর্যের শক্তি মুখ দিয়ে পাকস্থলীতে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে হজম হয়ে সেই সূর্যের শক্তির দ্বারা আমাদের শরীরের সব কিছু ঠিকমত চলছে। বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে হয়ে সেই সূর্যের শক্তিই এত কিছু করে যাচ্ছে। কিন্তু যিনি যোগী তাঁর মন এখন যোগ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে গেছে, তাঁর এখন এত ভায়া মিডিয়াতে যাওয়ার আর কোন দরকার নেই। সূর্য রয়েছে, বায়ু রয়েছে আর জলও রয়েছে, যোগী বসে বসেই এগুলো সরাসরি নিয়ে নিতে পারছেন, ভায়া মিডিয়া দিয়ে নিতে তখন তাঁর আর কোন দরকারই নেই। যাঁরা যোগী তাঁরা সত্যি সত্যিই এইভাবেই তাঁদের প্রয়োজনীয় শক্তিটুকু আহরণ করে নেন। কারণ তাঁদের কাছে এই খাওয়া-দাওয়া, হজম করা সব ফালতু কাজ। স্থূল শরীরটাই তাঁদের কাছে একটা বিরক্তিকর জিনিষ। শরীর একটা যন্ত্র মাত্র। একটা গাড়ি খুব জোর কত দিন চলবে? মেরে কেটে দশ থেকে পনের বছর। সরকার থেকে তো বলেই দিয়েছে পনের বছরের পুরনো হয়ে গেলে গাড়িকে স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে ফেলে দিতে হবে। আর আমাদের শরীরটা পঞ্চাশ ষাট হয়ে গেছে কিন্তু এখনও টেনে চলেছি, আরও কত বছর টানতে হবে ভগবানই জানেন।

তাই যোগীরা কয়েক বছর পর পর শরীরটাকে পাল্টে নেয়। কিন্তু শরীর পাল্টাতে গেলে আবার জন্ম নিতে হবে, জন্ম নিতে গেলে আবার কারুর গর্ভে আশ্রয় নিতে হবে, যেটা একেবারেই কোন যোগীর কাম্য নয়, তাঁদের কাছে এগুলো সত্যিই জঞ্জাল। তাই তাঁরা সূক্ষ্ম শরীরকে বার করে নিয়ে এমন একটা শরীর নিজের মত তৈরী করে নেন যার জন্য তিনি সূর্য, বায়ু আর জল থেকে সরাসরি শক্তি গ্রহণ করে সচ্ছন্দে সেই শরীরের সব রকম ক্রিয়া-কর্মাদি চালিয়ে যান আর সাথে সাথে নিজের সাধনাকে চালিয়ে যেতে থাকেন। কেন সাধনা করতে থাকেন? কেননা তিনি তন্মাত্রাকে বশীভূত করেছেন, কিন্তু তাই বলে তিনি মুক্ত হয়ে যাননি। ভাবা যায়, একজন যোগী যিনি তন্মাত্রাকে বশীভূত করে নিজের ইচ্ছে মত শরীর নিয়ে নিচ্ছেন, সমস্ত প্রকৃতির সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তিনি অর্জন করে নিয়েছেন, এই অবস্থাতেও যোগের রাজ্যে তিনি কিছুই নন, এখান থেকে তাঁর মুক্তি এখনও অনেক দূরে। আর আমরা ভাবছি দুবেলা একশ আট বার নাম করলেই ঠাকুর কোলে করে আমাদের রামকৃষ্ণলোকে নিয়ে যাবেন। আধ্যাত্মিকতা এতো সহজ নয়। প্রত্যেকেই এই পথ দিয়েই যেতে হবে। ভক্তই হোক, জ্ঞানীই হোন আর কর্মযোগীই হোন সবাইকেই রাজযোগের এই পথ দিয়েই যেতে হবে।

যতদিন কেউ সাধনাতে না নামছে আর বেশ কিছু বছর ধরে রাজযোগের সূত্রগুলির ভাষ্য বিশেষ করে স্বামীজীর রাজযোগ গভীর ভাবে অধ্যয়ন না করছে ততদিন এই তত্ত্ব গুলোর ধারণা হবে না। রাজযোগের আবার বেশ কিছু জিনিষ আছে যেগুলো খুবই সহজ আর সবার অনুশীলনের জন্যই সেগুলো বলা হয়েছে। কিন্তু যখন বলছেন তন্মাত্রা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, স্থূলভূত গুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, এগুলো বুঝতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আর প্রকৃতি, চক্ৰিশ তত্ত্বাদি এগুলো অনেক দিন অধ্যয়ন করলে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। এমনিতেই যে কোন জিনিষ প্রথমবার শুনলে একটু কঠিন লাগারই

কথা। তবে শাস্ত্র শুনে রাখা ভাল, পরে যখন আবার সুযোগ আসবে তখন পুনর্বার শুনলে বুঝতে ততটা আর কঠিণ মনে হবে না। শাস্ত্রের কথা তাই বার বার শুনে যেতে হয়।

উপনিষদ, যোগ ও ভাগবতে পুরুষের ধারণার তুলনামূলক আলোচনা

রাজযোগে অবিদ্যাকে কোথাও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না। যিনি পুরুষ তিনিই সচ্চিদানন্দ, এখানে সচ্চিদানন্দ বলতে পুরাণে যে ভগবানের কথা বলা হয়েছে সেই ভগবান নন। এখানে সচ্চিদানন্দ হলেন সৎ, চিৎ ও আনন্দ, যিনি আত্মা এই তিনটি তাঁর সহজাত গুণ। গুণ দুই রকমের – যেমন কোন ফুল লাল হয়, কোন ফুল নীল আবার কোন ফুল হলুদ হয়। এখানে ফুলের গুণের কথা বলা হচ্ছে, যদি বলা হয় লাল রঙের গোলাপ, তখন লাল রঙটা গোলাপের সহজাত গুণ নয়, লাল রঙ গোলাপে আরোপিত গুণ। এই ধরণের কথা শুনলে প্রথমেই মনে হবে কি সব কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে শাস্ত্রের মধ্যে ঢুকব তখন এই শব্দগুলিই হয়ে যায় প্রচণ্ড দরকারি ও চিন্তনযোগ্য শব্দ। এই কথাগুলো ঠিক মত ধরতে না পারলে দর্শনের মূল ভাবটাই মান্বাখান থেকে হারিয়ে যাবে। এখন এই লাল রঙের গোলাপ যে কোন অবস্থাতে লাল রঙই থাকে। কিন্তু অন্য কোথাও সাদা বা হলুদ গোলাপও থাকতে পারে। এবার অন্য দিকে যদি একটা স্ফটিক রাখা হয় আর তার পাশে যদি একটা লাল গোলাপ রেখে দেওয়া হয় তখন স্ফটিকের রঙ লাল হয়ে দেখাবে। স্ফটিকের লাল রঙ আর গোলাপের লাল রঙের মধ্যে একটি মৌলিক তফাৎ আছে। লাল গোলাপের লাল রঙ যতই জল দিয়ে ধোয়া হোক না কেন ওটা লাল রঙই থাকবে। কিন্তু স্ফটিকের পাশ থেকে লাল গোলাপটা সরিয়ে যদি একটা সাদা গোলাপ রেখে দেওয়া হয় তখন স্ফটিকের রঙ সাদা দেখাবে। তার মানে স্ফটিকের যে রঙ সেটা অর্জিত রঙ, যে রঙের বস্তু রাখা হবে স্ফটিক সেই বস্তুর রঙে রাঙায়িত হয়ে উঠবে। কিন্তু লাল গোলাপের পাশে সাদা রঙের গোলাপ রাখলে লাল গোলাপ লালই থাকবে, সাদা কখন হয়ে যাবে না। তবে লাল গোলাপের ক্ষেত্রে সমস্যা হল লাল গোলাপের যে রঙ ওটাও তার সংযোজিত গুণ, তার আরও অনেক কিছু মध्ये ঐ লাল রঙটাও একটা গুণ। তাও ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন রাসায়নিক দিয়ে দিলে রঙটা অন্য রকম হয়ে যাবে।

উপনিষদের পুরুষ, যোগের পুরুষ আর ভাগবতের পুরুষ, দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই তিন পুরুষই আলাদা। সবচেয়ে বড় তফাৎ হল বেদান্তে যাঁকে পুরুষ বলা হচ্ছে, সেখানে বলছে তিনিই আছেন, তাঁর বাইরে আর কিছুই নেই। যোগের পুরুষ যিনি তিনি হলেন অনন্ত। আমার মধ্যে যিনি আত্মা, আপনার মধ্যে যিনি আত্মা সব আলাদা। সেইজন্য কি হয়, যখন কারুর মুক্তি হয়ে গেল তখন আমি কিন্তু বন্ধনে থাকব। স্বামী বিবেকানন্দের মুক্তি হয়ে গেছে অর্থাৎ স্বামীজীর মধ্যে যে আত্মা আছেন সেই আত্মা মুক্তি পেয়ে গেছে, কিন্তু আমার ভেতরে যিনি আত্মা আছেন তাঁর এখনো মুক্তি হয়নি। বেদান্ত মতে কিন্তু তা হয়না, বেদান্তে বলা হয় সেই একই আত্মা, আর আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। এগুলো খুব সূক্ষ্ম তফাৎ, কিন্তু এইটুকু সূক্ষ্ম তফাৎএর জন্য পুরো দর্শনটাই পাল্টে যায়।

যোগের পুরুষ হলেন সৎ, মানে কোন অবস্থাতেই তাঁর নাশ হবে না। দ্বিতীয় তিনি চিৎ, সব সময় তাঁর চৈতন্য আছে, মানে এখন তাঁর বুদ্ধিটা প্রখর। বুড়ো বয়সে বহু কষ্টেও স্মরণ করতে পারছে না চাবিটা কোথায় রেখেছে, এই দুরবস্থা যোগের পুরুষের কখনই হবে না। আর তৃতীয় তিনি আনন্দস্বরূপ, সকাল বেলায় খবরের কাগজে দেখলাম একটা এক কোটি টাকার লটারি পেয়ে গেছি, খুব আনন্দ হচ্ছে, বিকেলের দিকে জানা গেল ওটা অন্য কারুর নম্বর, তখন মুষড়ে পড়লাম, পুরুষের এই রকম কখন আনন্দ কখন নিরানন্দ ভাব আসবে না, আনন্দই তাঁর স্বরূপ। তাই এই সচ্চিদানন্দ লাল গোলাপের মত নয়। এই সচ্চিদানন্দ লাল স্ফটিকের মতও নয়। এটাই তাঁর স্বভাব। এই তিনটিকে তাঁর গুণ বললেও ঠিক বলা হবে না, এই তিনটে তাঁর স্বভাব, বলা হয় সহজাত স্বভাব। যেমন আমরা বলি উনি ভদ্রলোক আর উনি অভদ্র লোক, ভদ্র ও অভদ্র এদের গুণ। কিন্তু বরফ হল ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডাটাই বরফের স্বভাব। যদি ঠাণ্ডা না হয় তাহলে বুঝতে হবে ওটা আদপেই বরফ নয়। বরফকে গলিয়ে জল করতে পারেন, জলকে আরও গরম করে বাষ্প করে দিতে পারেন। কিন্তু পুরুষকে আপনি যা খুশি করে দিন না

কেন কিন্তু তাঁর সৎ কখনই অসৎ হবে না, চিৎ কখনই অচিৎ হবে না আর আনন্দ কখনই নিরানন্দ হবে না। তাই বলা হয় সৎ, চিৎ ও আনন্দ পুরুষের স্বভাব, এটাই পুরুষ।

আমাদের বর্তমান অবস্থা ঠিক স্ফটিকের মত। স্ফটিকের পাশে যে রঙের জিনিষ রেখে দেবে স্ফটিক সেই রঙের আকার ধারণ করে নেবে। পুরুষের সমস্যা হল, পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে আসে তাতে প্রকৃতির কিছু হয় না, সে নিজের মত নাচছে কিন্তু মাঝখান থেকে প্রকৃতির নাচ দেখে পুরুষ মনে করে সে নৃত্য করছে। যখন কোন জিনিষ বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে তখন ঘুরন্ত জিনিষটার দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমাদের মাথা ঘুরতে থাকে। এটাই মনের লক্ষণ। আমাদের চারিপাশে যা কিছু ঘটতে থাকে মন ওগুলোর সাথে নিজেকে এক করে ফেলে, আর সেও তখন তাই করতে শুরু করে। ঠিক সেই রকম প্রকৃতি নিজের মত নাচ করেই চলেছে, পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন পুরুষ এই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য রূপে একাত্ম করে নেয়। একাত্ম করে নিয়ে প্রকৃতির যা কিছু ভালো মন্দ ঘটছে সেটাকেই দেখে পুরুষ নিজেকে কখন সুখী মনে করে আবার কখন নিজেকে দুখী মনে করে। ভালো আর মন্দটা আসলে কার? ভালো আর মন্দ যা কিছু হচ্ছে পুরুষ এগুলো নিজে থেকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়। আমার জন্য এটা ভালো আমার জন্য এটা মন্দ।

জর্জ বার্গাড ‘শয়ের একটা নামকরা নাটক আছে, যে নাটককে অবলম্বন করে পরে My Fair Lady নামে বিখ্যাত সিনেমা হয়েছিল। ওখানে একটা চরিত্র আছে সে যা টাকা পয়সা পায় সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু খুব মজার চরিত্র। এদিকে এই মাতালকে একজন নামকরা বিখ্যাত লোক বিরাট বড় স্বীকৃতি দিয়েছেন যে ইনি হলেন লণ্ডনের সব থেকে চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব, প্রতিভাবান ইত্যাদি। কিছু দিন পরে এই মাতাল লোকটি যে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে গালাগাল দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সেই মাতাল লোকটির যে বাচ্চা মেয়ে ছিল, তাকে রাষ্ট্র থেকে তুলে কিছু লোক লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে দিয়েছে। যারা শেখাচ্ছে তারা ভাবছে তার মেয়ের জন্যই হয়তো গালাগাল দিতে এসেছে। মাতাল লোকটা বলছে ‘না, মেয়েটাকে আপনারা রেখে দিন, ওতে আমার শান্তি হবে, আমি সেজন্য আসিনি’। ‘তাহলে কিসের জন্য এসেছেন?’ ‘আমি এত লক্ষ ডলার উত্তরাধিকারি সূত্রে পেয়েছি আপনার এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য’। ‘আমার জন্য’! ‘কেন! আপনি যে আমার নামে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাই দেখে একজন খুব বড়লোক মরার আগে আমাকে এই এত টাকা উইল করে গেছে, আর আমার জীবনের সর্বনাশ করে গেল’। ‘এতে আপনার কি সর্বনাশ হয়ে গেল?’ ‘আরে দেখছেন না আমাকে এখন ভদ্রলোকের মত জামা-কাপড় পড়তে হচ্ছে, দিনে দুটো করে ভাষণ দিতে হবে, কেননা শর্তে তাই লেখা রয়েছে। যারা আমাকে এতদিন অবজ্ঞা করত, আমার কোন খোঁজ নিত না তারা সবাই এখন সাহয্যের প্রত্যাশা নিয়ে আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। পঞ্চাশ বছরে আমার কোন আত্মীয় ছিলনা আর এখন শত শত আত্মীয় দাঁড়িয়ে গেছে’। বার্গাড’শ খুব সুন্দর মজা করে বর্ণনা করেছেন। তখন ঐ ভদ্রলোক বলছেন ‘তোমার টাকা নিতে হবে না, ছেড়ে দাও। এর আগে তোমাকে আমি দশ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলাম তুমি নিলে না, মাত্র এক পাউণ্ড নিয়েছিলে।’ মাতাল বলছে ‘তুমি ঠিক কথা বলছ, তখন আমি নিইনি, কিন্তু আজকে কি আমার সেই ত্যাগের ক্ষমতা আছে? আমাকে এত টাকা নিয়ে নিতে হয়েছে, আমি না করতে পারিনি’। এই যে লোকটার এখন এত নাম হয়ে গেছে, এত নামডাক হয়েছে, সে এই নামযশকেই এখন গালাগাল দিচ্ছে। আর যার জন্য তার এত নাম হয়ে গেল তাকেও এখন সে গালাগাল দিতে শুরু করেছে। মানে – তুমি আমার সর্বনাশ করে দিয়েছ। তখন এখান ওখান থেকে দু-চারটে পয়সা যোগাড় করে মদ খেয়ে পড়ে থাকতাম, তাতেই আমার ঝঞ্জাট বিহীন শান্তির জীবন চলে যাচ্ছিল। আগে সে একজন মহিলার সঙ্গে থাকত, সেই মহিলা আগে তাকে বিয়েই করতে চাইত না, এখন টাকা পেয়ে গেছে শুনে সে এখন এক্ষুণি বিয়ে করার জন্য অনবরত বিরক্ত করে যাচ্ছে, যাতে আমি মরে গেলে সেই টাকাটা যেন মহিলাটি পেয়ে যায়। অনেক ধরণের জটিলতা তৈরী হয়ে গেছে।

এই কাহিনীকে আমরা কিভাবে নেব? বার্গাড'শর এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। সমাজে যা কিছুকে ভালো মনে করা হয় বার্গাড'শ খুব সূক্ষ্ম ভাবে ওই ভালোকেই বাজে বলে দেখিয়ে দিলেন। মানুষতো এটাই চাইছে, একটা সুস্থির জীবন হবে, টাকা পয়সা হবে, মান সম্মান হবে। একজন মাতালকে দিয়ে ঐগুলোকেই গালগাল দেওয়ানো হচ্ছে। কোনটা ঠিক? কোনটাই নয়। ঘটনা ঘটনাই। আপনার আমার নিজের চিন্তা ভাবনাকে যখন সেই ঘটনার উপর ফেলব তখন বুঝব কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, গৃহস্থদের যখন বিপদ হয়, তাদের যদি ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, টাকা পয়সার অনটন হয়ে যায় তখন সেটাই তার বিনাশের কারণ হয়ে যাবে। কিন্তু এটাই যদি সন্ন্যাসীর জীবনে নেমে আসে তখন তার পক্ষে সেটাই মহা সৌভাগ্যের। তুমি তো ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যই সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছ। তাই সন্ন্যাসীকে যেখানেই থাকতে দেওয়া হোক না কেন তার কিছুই যায় আসে না। কিন্তু একজন গৃহস্থকে তার কর্মস্থল থেকে বদলি করে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হলে তাকে পরিবার পরিজনকে ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে, এর ফলস্বরূপ তার যে কী অবস্থা হবে চিন্তা করা যাবে না। যেটা আপনি ভালো মনে করছেন সেটাই আবার অন্যজনের কাছে খারাপ মনে হবে।

পুরুষের ঠিক তাই হয়। প্রকৃতি নিজের মত নাচ করছে, তার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, এসবের কোন কিছুতেই সে নেই। কিন্তু পুরুষ নিজের মত ভেবে নেয় – এটা আমার ভালো এটা আমার খারাপ। বাচ্চা ছেলে যেমন মনে করে চকলেট খাওয়া ভালো, পড়াশুনা না করা ভালো, শুধু খেলাটাই ভালো, এগুলো সবই বাচ্চার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা। সেইজন্য এই সব জিনিষের শেষ কথা নেই। এগুলোর মূলে অজ্ঞানতা। অজ্ঞানটা কি? এবারে সেই স্ফটিকের কথা ভাবুন। মনে করুন স্ফটিকের চৈতন্য আছে, স্ফটিকের বুদ্ধি হয়ে গেছে। এবার একটা লাল রঙের গোলাপ ফুল স্ফটিকের সামনে এসে গেল। এখন স্ফটিক মনে মনে নাচতে শুরু করেছে আমি লাল, আমি লাল। তারপরেই একটা হলুদ জবা এসে গেল। তখন স্ফটিক বলছে আমি কেন হলুদ হয়ে গেলাম। তারপর কালো রঙের কিছু এসে গেল – আমি কেন কালো হয়ে গেলাম, ছি ছি, আমি কি বিচ্ছিরি কালো হয়ে গেছি। কাল্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আসলে কিছুই তো তার হচ্ছে না। তাহলে হচ্ছেটা কি? দৃশ্যটা শুধু পাল্টাচ্ছে। রঙ অনবরত পাল্টাচ্ছে আর স্ফটিক বোকার মনে করছে আমি পাল্টে যাচ্ছি। আর এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকলে এটাই ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

এখন কোন ভাবে, গুরু বা সাধু মুখে শুনে বা সংসারে অনেক ধাক্কা খাওয়ার পর পুরুষের যখন নিজের স্বরূপের বোধ হতে করে, তখন আস্তে আস্তে পুরো অবস্থাটাই পাল্টাতে শুরু করে দেয়। তারপর একটা সময় আসে যখন সে বুঝতে পারে, যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তনটা আলাদা আর আমি আলাদা। এক সময় তার ঠিক ঠিক বোধ হয় যে ‘আরে তাই তো! যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে এর সঙ্গে তো আমার কোন ব্যাপারেই সম্পর্ক নেই’। তখন এক আশ্চর্য কাণ্ড হয়, ওর চারিদিকে যে পরিবর্তনটা এতক্ষণ হয়ে যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তনটা হচ্ছিল এই কারণেই যে এর মধ্যে সে মজা পাচ্ছিল, যেই সে মজা পাওয়াটা বন্ধ করে দেয়, তখন পরিবর্তন হওয়াটাও বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর কথামতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন – একজন বাঘের মুখোশ পড়ে এসে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। তারপর একজন দেখে বলল ‘আরে তুই আমাদের পোদো না’! তখন পোদো খিক্খিক্ করে হেসে আরেক জনকে ভয় দেখাতে চলে গেল। পুরুষও বুঝে ফেলে আমার চারিদিকে যে পরিবর্তন হচ্ছে এর সাথে আমার কোন কিছুর লেনাদেনা নেই, আমি স্ফটিক, আমি নির্লিপ্ত, আমি নির্বিকার আমার কোন পরিবর্তন নেই। এই সূত্রের মূল বক্তব্য এটাই, স্বামীজীও এই ব্যাপারটাকেই এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। যা কিছু হচ্ছে সব অজ্ঞানতা, অবিদ্যার জন্য। অবিদ্যা বলতে তাই বোঝায় – আমাদের আসল স্বরূপকে ভুলে গিয়ে অন্য কোন কিছুর সাথে নিজেকে একাত্ম করে নেওয়াকেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলে। স্ফটিক কি করছিল? সে নিজের স্বভাব ভুলে গিয়েছিল আর অপরের যে স্বভাব সেটাকেই সে মনে করছে এটাই আমার আসল স্বভাব। আমরাও তাই করছি – আমরা আমাদের পরিবার, আমাদের মর্যাদা, আমাদের সম্পদের সাথে একাত্ম হয়ে আছি আর আমার যে স্বভাব, আমার যে প্রকৃত স্বরূপ সেটাকে ভুলে আছি।

আরো যেটা সমস্যা তা হল, যদি রাজযোগ পড়ে জগতের সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে যোগ অভ্যাসে নেমে পড়লাম, বাড়ি গাড়ি, ভালো পোষাক, দামি মোবাইল ফোন সব ফেলে দিলাম। এতে কি হবে? আমার জীবনে চরম সর্বনাশ নেমে আসবে। কেন? আমার কর্মশায়ের কারণে। বাইরের সব কিছু আমি ত্যাগ করে দিয়েছি, কিন্তু কর্মশায়তো থেকে যাচ্ছে। আমার কর্মের যে পুঁটলিটা বয়ে নিয়ে চলেছি, সেটা তো রয়ে গেছে। কয়েক দিন পরেই কর্মশায় থেকে একটা তোড় আসবে। কিসের? মনে করুন রোগ-ব্যাদি, রোগ-ব্যাদির যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি আমার এখনও আসেনি। আমাকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, হাসপাতালের খরচা মেটাবার পয়সা কোথায় পাব? তখন আমি আফশোষ করতে থাকব, আর বলব – এ আমি কি করলাম, আমি কোথায় এসে পড়লাম। সাধনা করে করে মনের আবর্জনাগুলো আগে পরিষ্কার করতে হবে, সাধনা করতে থাকলে দেখা যায় এই ধরনের বামেলার সংখ্যাও কমে যায়। সেইজন্য ঠাকুরও বলছেন কাঁচা ঘায়ের মামড়ি জোর করে তুলতে নেই। যা না শুকিয়ে থাকলে জোর করে তুলতে গেলে যা আরো বেড়ে যাবে।

মানুষ বুড়ো বয়সে জীবন থেকে কত বিরক্ত হয়ে যায়, বিরক্ত হয়ে বলে – আর না, আর না। অথচ মরে গিয়ে আবার যখন নতুন জন্ম নিচ্ছে তখন সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। কারণ, এই জীবনের মত যত কর্ম ছিল সেই পুঁটলিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু বাকী হাজার হাজার জন্মের যে কর্মের পুঁটলিটা আছে সেটা কোথায় যাবে? সেইজন্য বলা হয় যতক্ষণ না সমাধি নির্বীজ সমাধি হচ্ছে তত দিন কোন নিশ্চয়তা নেই, আবার যে কোন অবস্থা থেকে পতন হতে পারে। যদিও সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও অনেক উচ্চ সমাধি, যেখানে ব্রহ্মার সমান ক্ষমতা যোগীর হয়ে যায়, কিন্তু এই সমাধিতেও কর্মবীজ থেকে যাচ্ছে। কোন জন্মে একটা মশা হয়ে একটা মোষকে কামড়ে ছিলে, সেই বীজটা কিন্তু থেকে গেছে। এই কর্মবীজের শেষ নেই। কোন অবস্থাতেই কর্মশায়ের বীজগুলি শেষ হয় না, শেষ হয় যদি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে বীজগুলোকে ভস্ম করে দেওয়া যায়। এই আগুন লাগে একমাত্র নির্বিকল্প সমাধিতে – যোগে নির্বিকল্প শব্দটা ব্যবহার করা হয় না, এখানে বলা হয় নির্বীজ সমাধি। সমস্ত বীজকে পুড়িয়ে ফেলার পর তখন এই কর্মশায়ের আর কোন ক্ষমতা থাকে না। ছড়া আছে ‘মরবে সাধু উড়বে ছাই তবে সাধুর গুণ গাই’। সাধু যখন মৃত্যু শয্যায় থাকে তখনও তাঁর পতনের সম্ভাবনা আছে, তাই মরে গেলে এবার পুড়িয়ে দিলেন ছাই হয়ে গেল তখন তাঁর গুণ গাইব। যতক্ষণ না নির্বীজ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

তবে যেটা কার্যকরী হয় সেটা হল, যেহেতু সারাটা জীবন সাধু জীবন-যাপন করেছেন তাই তাঁর সংস্কার খুব জোরাল ও বলিষ্ঠ হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় ওই সংস্কার গুলি খুব ক্রিয়াসম্পন্ন ও শক্তিশালী থাকে বলে তিনি আবার সেই ধরনের শরীরই ধারণ করবেন যে শরীর তাঁর সাধনার বাকী পথটুকু অতিক্রান্ত করতে সাহায্য করবে। বহু জন্মে জন্মে সাধনা করতে করতে কোন জন্মে তাঁর মধ্যে এমন একটা জোর এসে যাবে যে তখন মনে হবে, যে করেই হোক আমাকে নির্বীজ সমাধি লাভ করতেই হবে। তখন যা কিছু তাঁর ছিল, ভালো মন্দ, সব কিছুতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। এটাই যোগের লক্ষ্য। রাজযোগে ঈশ্বর দর্শনের কোন গুরুত্বই নেই। জ্ঞানযোগেও তাই, ঈশ্বর দর্শন তাদের কাছে কিছুই নয়। যাঁরা বলছেন, তিনিই ভক্তি মুক্তি সব দেন, তাঁদের কাছে এটা একটা কথা হিসাবে ঠিক আছে। কিন্তু যোগদর্শনে এর কোন মূল্যই নেই। কারণ যতক্ষণ বীজ চলতে থাকবে, আর ঈশ্বর দর্শনও কর্মশায়ের অনেক বীজের মধ্যে একটি অন্যতম বীজ, কারণ সেখানেও আকার থেকে যাচ্ছে।

ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীরাও ভয়তরাসে, এখানে ঠাকুর জ্ঞানী বলতে তাঁদেরকেই বলছেন যাঁরা সবিকল্প সমাধিতে পৌঁছে গেছেন। বিজ্ঞানীর কোন ভয় নেই, কারণ আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে আর পতনের ভয় থাকে না। হিন্দুদের এটা একবারে তাদের ভেতরকার জিনিষ, আত্মজ্ঞান না হলে কিছুই হবে না, যত দিন না তুমি তোমার নিজের স্বরূপকে জানতে পারছো ততদিন তোমার কোন কিছুই কিছু নয়, ঈশ্বর দর্শনও কিছুই নয়। সেইজন্য ভক্তরা বলে – হে ঠাকুর তোমার স্মৃতি, তোমার ভাব আমার মন থেকে যেন কখন না চলে যায়।

অবিদ্যার নাশ কীভাবে হবে

তাহলে উপায় কি? ঠাকুরকে অনেকে প্রশ্ন করতেন ‘মশাই! উপায় কি?’ এই অবিদ্যাকে কিভাবে নাশ করা যায়? বলছেন – *বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।।২৬।।* বিবেকখ্যাতি মানে অবিদ্যার নাশ। নিরন্তর বিবেক বিচারের অভ্যাসই এই অবিদ্যা নাশের একমাত্র উপায়। সব সময় বিচার করে যেতে হবে। কি বিচার করবে? আমিই সেই সৎ চিৎ ও আনন্দ, কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমি নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছি। আমি হলাম সেই আত্মা, কিন্তু ভুলে গিয়ে জড়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে নিজেকে এক করে রেখেছি, আর জড়ের ধর্মকে আমার নিজের ধর্ম মনে করছি। নিরন্তর যদি এই বিচারের অভ্যাস না করা হয় অবিদ্যা কোন দিন যাবে না। এই বাক্যকে যে উপলক্ষিবান পুরুষ মনে করিয়ে দেবেন, তিনিই আমার গুরু, পথপ্রদর্শক, আপনজন।

আপনি বলবেন ‘রাজযোগের এই সূত্র পড়ার পর পুরো জগৎ থেকে আমার মনকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। কারুর প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই, শুধু আমার স্বামীর প্রতি আসক্তিটা রেখে দিয়েছি’। হবে না, ওই একটি আসক্তি থেকেই সব ফেকড়িগুলো আবার এক এক করে বেরিয়ে আসবে। যখনই কোন জিনিষের প্রতি আসক্তি আসছে, কোন কিছু ভালো লাগছে তখনই সব সময় মনে বিচার নিয়ে আসতে হবে, আমার এই জিনিষটা কেন ভালো লাগছে? এটা কি বুদ্ধির এলাকার? এটা কি প্রকৃতির এলাকার? হ্যাঁ প্রকৃতির এলাকার। তাহলে আমার লাগবে না। কিন্তু আমার শরীর ধারণের জন্য এতটুকু দরকার। তাতে কোন ক্ষতি নেই, শরীরকে তো রক্ষা করতে হবে। কিন্তু পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার এসে গেলেই তুমি ফেঁসে যাবে। এরপর আবার প্রতি মুহুর্তে বিচার করে দেখতে হবে আমার মনে যে ক্রোধ আসছে, আনন্দ হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে, সুখ হচ্ছে এগুলো কি পুরুষের ধর্ম নাকি প্রকৃতির ধর্ম, এটা চৈতন্যের ধর্ম নাকি জড়ের ধর্ম? নিরন্তর সর্বদা এইভাবে বিচার করে যেতে হবে। যদি দুঃখী হই তাহলে ভাবুন, পুরুষ যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি কি কখন দুখী হন? চৈতন্য তো কখন দুখী হবে না। তবুও তো আমি দুঃখ বোধ করছি। কেন করছেন? কারণ আপনি প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন। প্রকৃতি দুঃখ বোধ করে। প্রকৃতি কখন দুঃখ বোধ করে? তার মনের মত কোন জিনিষ যদি সরে যায় তখন সে নিজেকে দুখী বোধ করে। আর পুরুষ এই প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে নিয়ে এক হয়ে গেছে। চোখ সুন্দর দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে, সুন্দর দৃশ্য সরিয়ে দেওয়া হল। চোখের মন খারাপ হয়ে গেল। চোখের মন খারাপ তার জন্য মন যেটা তারও মন খারাপ। মনের মন খারাপ কিন্তু পুরুষ মনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাই পুরুষেরও মন খারাপ। পুরুষ তখন মনে করছে আমি দুখী। পুরুষ কেন দুখী হতে যাবে, চোখ প্রকৃতির, দৃশ্য প্রকৃতির, মন প্রকৃতির, পুরুষের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু বোকা পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হয়ে আছে তাই প্রকৃতির কোথায় কি হচ্ছে তাতে পুরুষ কেঁদে ভাসাচ্ছে। এই যে বিবেকখ্যাতি, অর্থাৎ জ্ঞান উপলক্ষি, এই জ্ঞান উপলক্ষি না হলে কখনই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।

রাজযোগের খুব উচ্চ অবস্থার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ সমস্ত সাধনা করে নিয়েছেন, কিন্তু এখনও মনটা তাঁর ছটফট করে যাচ্ছে, মন এখনও নির্বিকল্প সমাধিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারছে না। ঠিক এই জায়গার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। তখন মনে হবে অবিদ্যা অজ্ঞানতা আমাকে ঘিরে ফেলছে, তারপর আসবে প্রলোভন, আসবে আতঙ্ক, ভয়। কিন্তু যোগী সমস্ত বাধা কাটিয়ে উপরে উঠে যাবেন। যখন ভয় দেখাচ্ছে তখন যোগী ভয় পাবেন না, যখন প্রলোভন দেখাচ্ছে তখন প্রলোভিত হবেন না, যোগী তখন বুঝে গেছেন যে এগুলো সব অজ্ঞানতা থেকে আসছে। যিশুর শেষ প্রলোভন যখন এসেছিল, ভগবান বুদ্ধকে যখন মাড় এসে ভয় দেখাচ্ছে, এই সূত্রে সেই সময়ের কথাই বলা হচ্ছে।

যোগের সাতটি ভূমি

বলছেন *তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।।২৭।।* আমরা কি করে জানব যে আমাদের অজ্ঞান কমতে শুরু করেছে? কি করে বুঝবো যে আমরা যোগের পথে এগোতে শুরু করেছি? আমার যে প্রকৃত স্বরূপ সেটা ধীরে ধীরে উন্মোচন হচ্ছে কি করে বুঝব? রাজযোগ এর সাতটি লক্ষণ বা সপ্তভূমির কথা

বলছে। কুণ্ডলীনিতে যেমন সাতটি চক্রের কথা বলা হয়, আবার ঠাকুরও বলছেন ‘বেদে সপ্তভূমির কথা আছে’, তেমনি এই সূত্রে যোগও সাতটা ভূমির বা সাতটা স্তরের কথা বলছে। কেউ যোগী হয়েছেন বোঝা যাবে তাঁর বিবেকখ্যাতি হয়েছে কিনা, মানে জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে কিনা। যোগীর জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে কিনা এটা আমি আপনি কিভাবে ধরতে পারবো? বোঝা যাবে এই সাতটা ভূমিতে যোগী কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। যোগীর জ্ঞান এই সাতটা ভূমি দিয়ে উপরে উঠে আসে। এগুলো খুবই অতি উচ্চস্তরের যোগীদের অবস্থা, আমাদের মত সাধারণের লোকের কথা বলা হচ্ছে না। স্বামীজী তাই শেষে বলবেন – আমরা এতক্ষণ অনেক উচ্চতর কথা বললাম, এটা অনেক উঁচু কথা, অনেক দূরের ব্যাপার।

প্রথম ভূমিতে গেলে কী হয় বলতে গিয়ে স্বামীজী সংস্কৃতে বলছেন *জ্ঞাতব্যং ন কিঞ্চিৎ অস্তি*। সমাজে অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের সবজান্তা মনে করেন। সমাজে একটি লোক পাওয়া যাবে না যে মনে করে আমি সবজান্তা নই। ক্লচিং এক আধজনকে পাওয়া যাবে যার মনে হয় আমি তো কিছুই জানি না। কিন্তু এই অবস্থায় এলে যোগীর মনের মধ্যে এতদিনের যে ছটফটানি ভাবটা ছিল, একটু এটা জানব, একটু ওটা করব, একটু ওটা দেখব, এগুলো সব বন্ধ হয়ে যায়। যোগীর তখন মনে হয় যা জানবার আমার জানা হয়ে গেছে, যা দেখার সব দেখা হয়ে গেছে, যা শোনার সব শোনা হয়ে গেছে আমার আর জানা, দেখা বা শোনার কিছু নেই। চার পাঁচ জায়গায় দৌড়ে দৌড়ে আমাকে আর জ্ঞান অর্জন করতে যেতে হবে না। তাহলে কী যোগী এবার স্বাধ্যায় বন্ধ করে দেবেন? কখনই নয়। যেমন ধরুন বর্তমান কালের ঠিক ঠিক ভাব হল বেদান্ত। বেদান্তের ভাবকে যোগী বুঝে নিয়েছে, কিন্তু এবার এই ভাবকে পুষ্ট করার জন্য, বেদান্ত ভাবকে আরও দৃঢ় করার জন্য যোগীকে নিয়মিত স্বাধ্যায় করে যেতে হবে। এখানে যোগীর কাছে জ্ঞাতব্য কিছু নেই। আমাকে এটাও জানতে হবে, ওটাও জানতে হবে, একটু ব্যাকরণ, একটু ইতিহাস, একটু দর্শন, একটু সাহিত্য, একটু বিজ্ঞানের ব্যাপার এগুলো জানতে হবে, এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ‘আমার পথ পরিষ্কার, আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছি’ এই বোধটা যোগীর পাকাপাকি ভাবে এসে যায়।

এর নীচের যে ধাপ সেটা আবার ঘোর তামসিক। এই ধাপের লোকেরা কিছু না জেনেই মনে করে বসে আছে যে আমার সব জানা হয়ে গেছে। এরা একেবারেই নিম্নস্তরের, এদের যোগ কোন ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না। এদের থেকে একটু উপরে যারা, দু-চারটে বই পড়ছে, এদেরকেও যোগ হিসাবের মধ্যে রাখছে না। বাচ্চাদের হাতে যখন টিভির রিমোট থাকে তখন তারা একবার এই চ্যানেল, একবার সেই চ্যানেল অনবরত চ্যানেল ঘুরিয়েই যাচ্ছে, কোন চ্যানেলই ঠিক মত দেখতে পারছে না, মন এমন চঞ্চল যে অনবরত চ্যানেল পাল্টাতেই থাকে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও এই রকম চ্যানেল পাল্টালে চলবে না। একটা জায়গাতে নিজেকে ধরে রাখতে হবে, একটা ভাবকে পাকা করতে হবে। ঠাকুরও আগে ভাব পাকা করতে বলছেন। প্রথম ভূমিতে এই কথাই বলা হচ্ছে, যোগী বুঝে গেছে আমার পথ পরিষ্কার, এই আমার পথ, আমাকে এই পথ দিয়ে যেতে হবে। এরপর আমি আর দশটা বিষয় জানতে দৌড়াব না, দশ রকম কাজে জড়াবো না।

আঁটপুরের এক ভক্ত ঠাকুরের কাছে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর জানতে চাইলেন মাইক্রোস্কোপটা কি জিনিষ, এটা দিয়ে কি করা হয়? ঠাকুরকে বোঝান হল। এবার তিনি যখন চোখটা মাইক্রোস্কোপে দেবেন তার আগেই তাঁর মন সমাধিতে চলে গেল। কথাযুতে আছে, সূর্যগ্রহণ হয়েছে। ঠাকুর মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করছেন সূর্যগ্রহণ কি করে হয়। বলছেন ‘অত দূরের খপর তোমরা জানো কি করে?’ মাস্টার মশাই তখন মাটিতে দাগ কেটে সূর্য, চন্দ্র এঁকে এঁকে ঠাকুরকে বোঝাতে আরম্ভ করেছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখছেন ঠাকুরের মনটা অন্য দিকে চলে গেছে। ঠাকুর কি অমনোযোগী? মোটেই না, কারণ তাঁর মন এখন হাজারটা বিষয়কে জানতে আগ্রহী নয়। ঠাকুর ওই একটা জিনিষকে ধরে নিয়েছেন উনি আর তার বাইরে যাবেনই না। এই রকম পঞ্চাশটা জিনিষ যা আগে করে যাচ্ছিল, সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। উপনিষদেও এই ধরনের ভাব আসে – *কস্মিন নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি* - হে প্রভু, যে বিদ্যাটা জানলে সব বিদ্যা জানা হয়ে যায় আমাকে সেই বিদ্যাটা

শিখিয়ে দিন। ওই বিদ্যাটা যখন জানা হয়ে গেল, তারপর সাধনার দ্বারা মন উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থাতে চলে গেছে, তখন সেখান থেকে নেমে এসে হাজারটা বিষয় জানার আর কোন ইচ্ছেই হবে না। সাংসারিক বিদ্যা এর থেকে অনেক নীচে।

হরিদ্বারের দিকে একজন বড় মহাত্মা ছিলেন। অন্য এক সম্প্রদায়ের সাধু সেই মহাত্মাকে একটা চিঠি দিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে বলছেন ‘আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই’। উনি সেই চিঠির উত্তরে বলছেন ‘যদি তোমার সিদ্ধান্ত জানার ইচ্ছে থাকে তাহলে এসো, আর যদি আমার সাথে যুক্তিতর্ক করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আমার কাছে এসে কাজ নেই, আমি আর ওগুলো করি না’। উনি একদিকে যেমন বড় মহাত্মা আবার অন্য দিকে খুব বড় পণ্ডিতও ছিলেন। তারপরেও সেই সাধুটি এসে মহাত্মার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করতে শুরু করেছে। উনি বলছেন ‘তোমার শাস্ত্রজ্ঞানের এইতো দৌড়, এরপর তোমার সাথে কী যুক্তিতর্ক করতে যাব’! জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, অদ্বৈত ঠিক না দ্বৈত ঠিক এর উপর পণ্ডিতদের কোন লেখা বই আর এই নিয়ে ওনাদের যুক্তিতর্ক পড়তে ও শুনতে গেলে আমাদেরই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যুক্তিতর্ক করতে গিয়ে এখনও পণ্ডিতরা নিজেদের মধ্যে রীতিমত কুস্তি লড়তে শুরু করে দেয়, আর গালাগাল যা দেয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ঠাকুর তাই পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন – যতক্ষণ আমি বোধ ততক্ষণ তুমি বোধও থাকবে, যার আমি বোধ থাকবে তার দ্বৈত বোধ থাকবেই। যার আমি বোধ আছে সে সব সময় দেখবে কৃষ্ণই আছেন বা কালীই আছেন। যে যা ভাব নিয়ে সাধনা করেছে সে সেই ভাবেই দেখবে। কৃষ্ণভক্ত দেখে কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, কালীভক্ত দেখে মা কালী ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু আমি বোধটা যখন চলে যাবে তখন দেখবে তিনি ছাড়া কিছু নেই। এটাই অদ্বৈত। তার মানে দ্বৈতও একটা অবস্থা, অদ্বৈতটাও একটা অবস্থা। ‘আমি’ চলে যাওয়াটাই শেষ অবস্থা কিনা বলাও খুব মুশকিল। তবে এই আমি বোধ অতি সাধারণ থেকে অতি অসাধারণ জীবের মধ্যেই দেখা যায়। সেইজন্য আমি নাশ হওয়াটাই উচ্চতম হবে। সেই উচ্চতম অবস্থায় যাওয়ার পর তিনি যদি আমিটা রেখে দেন তখন সেই আমিটা আবার অন্য ধরণের আমি হবে, ঠাকুর এই আমিকেই ‘পাকা আমি’ বলছেন। পাকা আমি থাকলে আবার দ্বৈত দেখবে, যত বড় জ্ঞানীই হন না কেন আমি থাকলেই তুমিও দেখবে। সেইজন্য অদ্বৈতের অবস্থা লাভের পরেও আবার দ্বৈত অবস্থায় এসে থাকতে পারে, আবার যাঁরা দ্বৈত সাধনা করছেন তাঁরাও সাধনার শেষে গিয়ে অদ্বৈতই দেখেন। সেইজন্য আমরা কখনই বলতে পারিনা শেষ কথা কোনটি। তাই যাদের মারামারি করার ইচ্ছে থাকে তারা করুক। আমাদের কাছে পথ পরিষ্কার, আমরা গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, গুরু ইষ্টমন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন, সাধনার পথ বলে দিয়েছেন, এরপর এর বাইরে আর কিছু করার নেই। যদি অধ্যয়ন করতে হয় নিজের সাধন পথের সহযোগী যে সব গ্রন্থ আছে সেগুলোই সে অধ্যয়ন করুক। তার বাইরে আর কোন গ্রন্থ পড়ার বা জানার দরকারও নেই। কিন্তু আমাদের মনে হাজারটে প্রশ্ন, ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছেন, অমুক কেন বড়লোক আমি কেন সাধারণ লোক, অমুকের কোন অসুখ নেই আমার এত অসুখ কেন, ভগবানের মধ্যে বৈষম্য দোষ আছে কি নেই ইত্যাদি। যোগের প্রথম ভূমিতে এই প্রশ্ন ওঠাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদের ঋষিরা কয়েকটি শব্দ তৈরী করে দিয়েছেন। প্রথম হল কর্ম। তোমার শরীর সব সময় খারাপ কেন থাকে? কর্মের জন্য। আর তা নাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে। এটুকু জেনে বাকি সব কিছু মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাও, পঞ্চাশটা প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় করতে যেও না।

দ্বিতীয় ভূমি হল ক্ষীণ মে ক্লেশঃ সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি। মনের যে ব্যাথা, ক্লেশ, বেদনা, দুঃখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। সংসার এতো তুচ্ছ নগণ্য হয়ে যাবে যে কেউ আর কোন ভাবেই দুঃখ, আঘাত দিয়ে যোগীকে ব্যাথা বেদনায় জর্জরিত করতে পারবে না। কারণ জগৎ সংসারের কারণ উপরই যোগীর সুখ দুঃখ নির্ভর করে না। তাহলে কিসের উপর তিনি নির্ভর করে আছেন? যোগী এখন নিজের উপরেই নিজে নির্ভর করে আছেন। এই জগতটা তাঁর কাছ থেকে আস্তে আস্তে খসে পড়ে যাচ্ছে, আর অন্তর্ভুক্তিতে ক্রমশ বিস্তার হচ্ছেন। সমস্ত ব্যাথা চলে যাবে কিন্তু তাই বলে হাত পা কেটে গেলে কি তাঁর

তখন ব্যাথা লাগবে না? লাগবে, কিন্তু সে বলবে ও ওটা চামড়ার ব্যাথা করছে, আমার কিছু হয়নি। ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছিল, ঠাকুর ডাক্তারকে বলছেন – বাপু, আমার বডড লাগছে, তুমি এই আমার হাতটার আরাম করে দাও দিখিনি। কিন্তু ঠাকুর সেই অবস্থাতেও সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। তাই দ্বিতীয় লক্ষণটি খুবই তাৎপর্য, অন্তর ও বাহ্য জগতের সমস্ত রকমের ব্যাথা বেদনা চলে যাবে।

দুঃখ-কষ্টের মানে কি? আপনার মন এখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, ইন্দ্রিয়গুলো স্বাভাবিক ভাবে তার বস্তুর পেছনে ছুটে গেলে মনও তার সাথে যাবে। এটাই ইন্দ্রিয় আর মনের স্বভাব, এখানে কিছু করার নেই। ইন্দ্রিয় যদি তার পছন্দের মত বস্তু পায় তাহলে তার আনন্দ হবে। পছন্দের মত বস্তু না পেলে তার দুঃখ হবে। ইন্দ্রিয়ের দুঃখ হলে মনেরও দুঃখ হবে। কিন্তু আপনি যখন বুঝতে পারবেন ইন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়ের বিষয় এরা অন্য এলাকার বাসিন্দা, এদের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তখন আপনার আর কোন দুঃখ-কষ্ট আসবে না, আপনার ক্লেশ অনেক ক্ষীণ হয়ে যাবে। পাকিস্তানে বোমা ফেটে পাঁচজন মারা গেছে, এখানে আপনার তাতে কি এসে গেল! তাই বলে কি আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মাকে দেখাশোনা করবো না? অবশ্যই করতে হবে, না করাটাই শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সন্তানের অসুখ হয়েছে, সন্তানকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে হবে, ওষুধ আনতে হবে, ওষুধ খাওয়াতে হবে। ব্যস্ ওখানেই মিটে গেল, এবার নিজের মত চলুন। কিন্তু সেতো আমরা করি না, সঙ্গে সঙ্গে সব আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের ফোন করে জানাচ্ছি, মনে মনে ভাবছি ডাক্তার ঠিক ওষুধ দিয়েছে তো, অসুখ ভালো হবে তো, কি হবে কে জানে বাপু! যা হবার হবে, খারাপ হওয়ার থাকলে আপনি ভাবলেও খারাপ হবে, না ভাবলেও খারাপ হবে। কিছু করার নেই। কিন্তু আপনার কর্তব্যটুকু আপনাকে করে যেতে হবে, ওখানেই শেষ। তাতে ক্লেশটা হয় না। গীতায় যে বলছেন *দুঃখে স্নানুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*, সুখটাও ক্লেশ দুঃখটাও ক্লেশ। যখন দুঃখ হয় তখন যোগী দেখেন এই দুঃখতো ইন্দ্রিয়ের দুঃখ আমার তাতে কি, আবার যখন সুখ হয় তখনও বলেন এই সুখতো ইন্দ্রিয়ের সুখ আমার তাতে কি।

তৃতীয় ভূমিতে *অধীগতং ময়া জ্ঞানম্*, তখন বোধ করেন আমার জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে গেছে। প্রথম ভূমিতে আপনার পাঁচটা জিনিষ জানার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ভূমিতে আরও অনাসক্ত হয়ে গেছেন। অনাসক্ত না হলে কখনই ক্লেশের ক্ষয় হবে না। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে যোগ সাধনা শুরু হচ্ছে। যোগ সাধনা করতে করতে একটু অগ্রসর হয়েছেন। এগোতে এগোতে একটা সময় ‘ঠাকুরই একমাত্র সত্য’ এই বোধটা এসে গেছে। তখন মনে হয় আমার আর পাঁচটা জিনিষ জানার দরকার নেই, যদি কিছু জানার দরকার হয় তিনিই আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমার শরীর, মন, প্রাণ সব এখন ঠাকুরের সেবায় বা কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত। এরপর যখন সাধনা করে করে আরও উপরে উঠে গেলেন তখন আপনার নিজের মন, ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই তিনটেকে পরিষ্কার আলাদা আলাদা দেখতে পাবেন। এবার যখনই কোন সুখ-দুঃখ আসবে তখন বলতে পারবেন এগুলো ইন্দ্রিয় রাজ্যের, এগুলো আমার কিছু না। তখন ক্লেশ ক্ষীণ হয়ে যাবে, কষ্ট কম হবে। সেইজন্য যার যত বেশী আসক্তি তার কাল্লা তত বেশী, তাদের দুঃখ-কষ্টের বোধটাও বেশী থাকে, এদের দ্বারা যোগ সাধনা কখনই সম্ভব নয়। যোগ এখনও আমাদের খুব বেশী উপরে নিয়ে যাচ্ছে না, একেবারে প্রথমের দিকে দ্বিতীয় ভূমিতেই যোগ বলে দিচ্ছে তোমার যদি জগতের কোন কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে তোমার দ্বারা যোগ হবে না। যখন এর থেকে আরও একটু উপরে যোগী চলে এসেছে, তখন বলছে *অধীগতং ময়া জ্ঞানং*, যোগী এখন বলছে জগতের যত জ্ঞান আছে সবটাই আমার মুঠোয়।

এই জ্ঞান মানে জাগতিক জ্ঞানের কথাই বলা হচ্ছে – এই পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিষ নেই যেটাকে যোগী জানতে ইচ্ছে করলে জানতে পারবেন না। যদি দেখা যায় কোন সাধু এখনও মুর্থ বুঝতে হবে সাধু হয়েছেন ঠিকই কিন্তু এখনও কোন সাধনা করেননি। সাধু মানেই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হবে। প্রথমে বলেছিলেন এটা সেটা জানার আগ্রহের ব্যাপারটা থাকে না। কিন্তু এখানে বলছেন যদি তাঁর জানবার ইচ্ছে হয় তো তিনি যে কোন বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। মেরী লুই বার্কের খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে – স্বামীজী আমেরিকাতে আছেন, একদিন এক ঘরোয়া আলোচনাতে কেউ স্বামীজীকে

হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন, স্বামীজী হিন্দু ধর্মের উপরে বলতে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্ম নিয়ে বলার পরেই একজন পাশ্চাত্য দর্শনের উপর কিছু বলতে বললেন, স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্মের উপর বলতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ একজন পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করতেই স্বামীজী নিমেষের মধ্যে পদার্থ বিদ্যার উপরে বলতে আরম্ভ করলেন, শুধু তাই নয়, সেই সময়কার ফিজিক্সের যত বই ছিল তার নাম করে কার লেখা বইতে নতুন কি বলা হয়েছে, কার বইটা এখন সব থেকে ভালো, সব কিছু ঝড়ের বেগে বলে গেলেন। তারপর একজনের অনুরোধে রসায়ন বিদ্যা নিয়ে বলতে শুরু করলেন। তবে সব থেকে যেটা অবাক কাণ্ড, এর পরেই কেউ কেউ খ্রিস্টান ধর্মের উপরে কয়েকটা ভালো ভালো বইয়ের নাম করার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করে বসলেন। ভাবা যায়! আমেরিকাতে খ্রিস্টানরা হিন্দু ধর্মের এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করছেন খ্রিস্টান ধর্মের উপরে ইদানিং কি কি ভালো বই আছে! মুহূর্তের মধ্যে গোটা ঘর নিস্তব্দ হয়ে গেল। যাই হোক স্বামীজী কয়েকটি বইএর কথা তাদের বলে দিলেন। ভাবুন স্বামীজীর কি পরিমাণ জ্ঞানের দখল ছিল। আরেকটা ব্যাপার এই যে, স্বামীজী ছিলেন কলা বিভাগের ছাত্র, ছাত্র জীবনে বিজ্ঞান তাঁর বিষয় ছিল না।

আরেকটি ঘটনা, স্বামীজীর সঙ্গে একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ডায়নামো নিয়ে কথা হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলছেন ‘স্বামীজী, দেখছি ইলেকট্রিসিটির এমন কিছু নেই যে যেটা আপনি জানেন না’। সেই সময় ইলেকট্রিসিটি একেবারেই নতুন জিনিস, এডিশনের আবিষ্কার তখন সবে আমেরিকার বাজারে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কিন্তু স্বামীজী এই বিষয়ের জ্ঞানকেও আয়ত্ত করে ফেলেছেন। এই হচ্ছে সর্বজ্ঞের লক্ষণ। যে কোন অজানা দুর্বোধ্য বিষয় একটু ধরিয়ে দিলেই দেখা যাবে চটপট তিনি পুরো বিষয়টা আয়ত্ত করে নিয়ে তার পুরো জ্ঞানটা দখল করে নিয়েছেন। কোন সমস্যা নিয়ে যান, আপনি যতক্ষণে সমস্যার কথা বলতে শুরু করেছেন ততক্ষণে তিনি বুঝে গেছেন আপনি কি বলতে চাইছেন আর তার সমাধানও তাঁর মাথায় এসে গেছে। এগুলো কোন কল্প কাহিনী নয় বা ফ্যান্টাসি নয়, এগুলো এই রকমই হয় আর এটাই হয়। আমরা বলি ঠাকুর কিছুই জানতেন না, কিন্তু কথামৃত পড়ে দেখুন, হেন জিনিস নেই যে ঠাকুর জানতেন না। এই নিয়ে সন্ন্যাসী ও ঠাকুরের ভক্তরা আবার খুব মজা করে বলেন – চড়াই পাখি কতবার কি করে, আর সেই তুলনায় সিংহ কি করে সব ধরণের তথ্য ঠাকুরের জানা ছিল। আবার অধ্যাত্ম রামায়ণে কি আছে সেটাও বলে দিচ্ছেন। একজন বলছে – আপনি তো পড়াশুনা করেননি, এসব জানলেন কি করে? ঠাকুর বলছেন – কি বলছ গো, আমি শুনেছি কত! তোতাপুরীকে বলছেন – যত দিন না তুমি আমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছ তত দিন তোমাকে আমি এখান থেকে যেতে দিচ্ছি না। যে তোতাপুরী তিন রাত্রির বেশি কোথাও থাকতেন না, সেই তোতাপুরী ঠাকুরের জন্য এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে গেলেন। কথামৃতের কোথাও বেদান্তের সার তত্ত্বের সাথে কোন বিরোধ কেউ পাবেন না। অনেকে বলে যে লাটু মহারাজ কিছু জানতেন না। কিন্তু তাঁরও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, হতে পারে তাঁর স্কুল কলেজের ডিগ্রী ছিল না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীও ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করে বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দেখুন তাঁরও কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর শাস্ত্র জ্ঞানের পরিধি আর তার সাথে ইংরাজী ভাষায় তাঁর সাবলীল বিচরণ ক্ষমতার কথা ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। বোকা মুর্খদের জন্য শুধু যোগ সাধনা কেন জগতের কোন কিছুই তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তৃতীয় ধাপে যোগ বলেই দিচ্ছে সে সর্বজ্ঞ হয়ে যাবে।

চতুর্থ ধাপে *প্রাণ্ডা বিবেকখ্যাতি*। জ্ঞান বোধ হওয়ার জন্য পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিবেক মানে, নিত্য বস্তু আর অনিত্য বস্তুর তফাৎকে বুঝে নিয়ে অনিত্য বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া। অনেক বলেন – আমি জানি এগুলো করতে নেই, কিন্তু তাও করে ফেলি, করতে ভালো লাগছে তাই করে ফেলছি। তার মানে, তাঁর এখনও বিবেক হয়নি। বিবেকখ্যাতিতে বুঝে গিয়েছেন এ আলাদা, ও আলাদা। এই ভূমিতে তাই প্রথমেই যোগীর কার্যমুক্তি হয়ে যায়। কার্যমুক্তি মানে যোগীর সমস্ত ধরণের কর্তব্য বোধের অবসান হয়ে যাবে। কর্তব্য বোধ হল – অনেকে মনে করেন দেশের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে, সমাজের প্রতি আমার কর্তব্য আছে, আমার পরিবারের প্রতি, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্তব্য আছে। চতুর্থ ধাপে এই ধরণের সমস্ত কর্তব্য বোধ খসে যাবে। এই কার্যমুক্তিকেই

ভগবান গীতাতে একটু অন্য ভাবে বলছেন – *নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ।।* কর্তব্যের বেড়া জালে এখন সে আর আবদ্ধ নয়। তাই বলে কেউ যদি বলে কাল থেকে আমি আর অফিস যাবো না, সংসারের কোন কাজ করব না। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে ‘আমি আর রান্নাবান্না করব না, কেননা তোমার প্রতি আমার আর কোন কর্তব্য নেই’। তাহলে কি হবে? স্ত্রী স্বামীকে গালাগাল দেবে নয়তো স্ত্রীকে স্বামী গালাগাল দেবে। রাজযোগ বলবে তোমার যে কার্যমুক্তি হয়ে গেছে বলছ কিন্তু তার আগে তুমি কি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছ? না, আমি এখনও অনেক কিছুই জানি না। তোমার মন থেকে কি সব দুঃখ বেদনা চলে গেছে? না যায়নি। যখন কেউ এগুলোকে অতিক্রম করে যাবে, কেবল তখনই সে বলতে পারবে যে আমার আর কোন কর্তব্য নেই, আমার কার্যমুক্তি হয়ে গেছে। যদি বলে আমার আর কোন কর্তব্য নেই, আর তখন যদি কেউ এসে তার গালে দুটো চড় মারে তার কিন্তু কোন দুঃখ বা অপমান বোধ হবে না। এগুলোই এক একটা ধাপ, এই ধাপগুলো পেরিয়ে এলে শুধু তখনই আর কর্তব্য থাকবে না।

চারিদিকে এত দুঃখদারিদ্র্য, এত অশিক্ষা, এদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। কিন্তু মানুষের অশ্রমোচন করা যোগীদের বা সন্ন্যাসীদের কাজ নয়। প্রথমে দিকে যারা যোগের পথে নামছে চিত্তশুদ্ধির জন্য তাদের নিঃস্বার্থ ভাবে এই ধরনের প্রচুর কাজ করতে হবে। স্বামীজী দেশবাসীর কাছে যে সেবার আদর্শ দিয়ে গেছেন, সেটা সাধারণ মানুষদের জন্যই দিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই প্রচণ্ড স্বার্থপর, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। এদের এই স্বার্থপরতার গণ্ডি থেকে বার করে আনার জন্য স্বামীজী সেবার আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে বলছেন – ভগবান যদি তোমার সামনে সাক্ষাৎ এসে দাঁড়ান তাহলে তুমি কি তাঁর কাছে কটা হাসপাতাল আর ডিসপেন্সারি চাইবে? তার মানে সমাজ সেবা কখনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধুরা যখন সমাজসেবা করেন তখন তার পেছনে একটা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে। প্রথম হল তাঁরা নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কার্য করেন, দ্বিতীয় হাতে একটু সময় যখন আছে তখন সমাজের সেবার জন্য না হয় ভালো একটু কিছু করে দিলাম, আর এরা যদি সুস্থ থাকে, শিক্ষার সুযোগ যদি পেয়ে যায় তাহলে এরা আরও ঈশ্বরের দিকে এগোতে প্রেরণা পাবে। কিন্তু কোন সন্ন্যাসীই কর্তব্য বোধে কিছু করবেন না। সন্ন্যাসীর আবার কর্তব্য বলে কিছু হয় নাকি! অনেক আগেকার সময়ের একটা মজার ঘটনা আছে।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তখন মঠ মিশনের সহ সম্পাদক ছিলেন। তখনকার সময় অফিসে কাজকর্ম করার লোকজন সত্যিই খুব কম ছিল। একদিন আরতির সময় মহারাজ মঠের পুরনো অফিসে বসেছিলেন। সেই সময় বাইরে থেকে একজন শেঠজী এসেছেন। শেঠজীর সঙ্গে মহারাজের দু-চারটে কথাবার্তা হয়েছে। মহারাজ খুবই উচ্চমানের সাধু ছিলেন। ওনার সঙ্গে কথা বলে শেঠজীও খুব প্রভাবিত হয়েছেন। শেঠজী কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করছেন ‘একটা গান ভেসে আসছে শুনছি, কোথা থেকে গান ভেসে আসছে?’ মহারাজ বললেন ‘মন্দিরে এখন আরতি হচ্ছে’। শেঠজী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করছে ‘আপনি কেন আরতিতে যাননি?’ মহারাজ বললেন ‘আমার এখন এখানে বসে থাকার ডিউটি আছে’। ভদ্রলোক তখন হতবাক হয়ে বলছে ‘সন্ন্যাসীর আবার কিসের ডিউটি, যার জন্য সে আরতিতে যাবে না’! স্বামী ভূতেশানন্দজী পরে কাউকে এই ঘটনার কথা বলে বলছেন ‘সন্ন্যাসীর আবার কিসের ডিউটি?’ আসলে শেঠজীর বোঝার ভুল হয়ে গেছে, সন্ন্যাসী আর মঠ পরিচালনা করা দুটো আলাদা জিনিষ। লোকেদের মঠের সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বিচিত্র ধরনের কল্পনা থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ সন্ন্যাসীর বা যোগীর কারুর প্রতিই কোন ধরনের কর্তব্য বোধ থাকবে না।

পঞ্চম ধাপে বলছেন *চরিতার্থা মে বুদ্ধি*, আমার বুদ্ধি পুরোপুরি চরিতার্থ হয়ে গেছে। এটাই চিত্তের বিমুক্তি। চিত্তের বিমুক্তি হয়ে যাওয়া মানে মনের মধ্যে এর আগে যে নানান রকমের রূপান্তর হচ্ছিল সেটা আর হচ্ছে না। রূপান্তর না হওয়া মানে এখন ইন্দ্রিয়ের সাথে, ইন্দ্রিয়ের বস্তুর সাথে তার আর কোনও একাত্ম বোধ নেই। স্বামীজী এবং ভাষ্যকারদের ভাষ্যেও একই কথা বলা হয়েছে, সেখানে বলছেন মনের যে নানা রকম ওঠা-পড়া চলছিল সব এই ভূমিতে এসে বন্ধ হয়ে গেছে। আজ ঘুম থেকে

উঠে বলছি আজ আমি বেশে ভালো আছি। এই ভালো থাকার কোন দাম নেই, কেননা কালই বলবে ভালো নেই। আবার একদিন ঘুম থেকে উঠে বলছি আজ আমার কিছু ভালো লাগছে না। এই ভালো না লাগারও কোন দাম নেই, কারণ আগামীকালই এই মন আবার ঠিক হয়ে যাবে। জীবনের হতাশা মানেই তাই, মন এই উঠছে এই নেমে যাচ্ছে। স্বামী যদি একটা দামী শাড়ি নিয়ে আসে তক্ষুণি মনটা উপরে উঠে যাবে, আবার স্বামী যদি বাপের বাড়ি যেতে বাধা দেয় তক্ষুণি মনটা নেমে যাবে। আমাদের সবারই মন এইভাবে সব সময় পেণ্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে। পঞ্চম ধাপে এসে মনের এই দোদুল্যমানতাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। উপমা দিতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে, পাথরটা গড়াতে গড়াতে মাটিতে এসে পড়ে থেমে গেল। মাটিতে এসে যাওয়ার পর আর তাকে গড়াতে হবে না। ঠিক তেমনি এতক্ষণ মন যে নানান ধরণের রূপ নিচ্ছিল, রূপে নেওয়ার ফলে যত রকম কামনা-বাসনা উঠছিল পঞ্চম ধাপে এসে সব বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার মন পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে একেবারে সানুদেশে এসে পড়ার পর স্থির হয়ে গেছে, মনের সব খেলা ওখানেই শেষ। এর আগে সমাধি-পাদে ‘প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ’ এই পাঁচ ধরণের যে বৃত্তির কথা বলা হয়েছিল, এখানে এসে মন এই পাঁচ ধরণের বৃত্তির রূপ আর নেবে না। কুণ্ডলীনি জাগরণের কথা বলতে ঠাকুর বলছেন কণ্ঠদেশে যদি কুণ্ডলীনি এসে যায়, সেখান থেকে কুণ্ডলীনি আর নামবে না, বিষয়-আশয়ে মন আর জড়াবে না। তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কোন কথাই তার আর ভালো লাগবে না, যেখানে জাগতিক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয় সেখান থেকে সে উঠে যায়। ঠাকুরের এই কথাগুলো যোগের পঞ্চম ভূমির সাথে প্রায় মিলে যায়।

ষষ্ঠ ভূমিতে কি হয় বলছেন। যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতির যে তিনটে গুণ, তার মধ্যে চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে যায়, বলছেন প্রবীলয়ম্, প্রকৃষ্ট রূপে বিলয় হয়ে যায়। আমাদের যা কিছু সব মনকে নিয়েই, এই মনের সার্বজনীন পরিভাষা হল চিত্ত। এই মনেরই বিভিন্ন অবস্থাকে কখন বুদ্ধি বলছে, কখন অহঙ্কার বলছে, কখন চিত্ত বলছে। বুদ্ধি এসেছে সেই প্রকৃতি থেকে, প্রকৃতি মানে তিনটি গুণ – সত্ত্ব, রজো ও তমো, সেখানেই এই বুদ্ধি বা চিত্ত বরফের মত গলে যেতে থাকে (melting away)। তিনটে গুণের মধ্যে বিলয় হয়ে যাওয়া মানে আপনি এখন ব্রহ্মার মত হয়ে গেলেন। আপনি এখন পুরো সৃষ্টির সব কিছুর মালিক।

সপ্তম ভূমিতে কি হয় বলতে গিয়ে বলছেন স্বপ্তি ভূতচ্চ আর এর অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করেন স্বাত্ত্বিভূতচ্চ, একেবারে কৈবল্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। এবার তিনি প্রকৃতিকেও অতিক্রম করে চলে গেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে আর তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। বরফের পাহাড়ে যখন বরফের ধ্বস নামে তখন একটা বিরাট বরফের চাঁই নীচের দিকে গড়াতে থাকে, গড়াতে গড়াতে নীচে পাহাড়ের পাদদেশে মাটির সংস্পর্শে এসে থেমে গেল। সপ্তম অবস্থায় এখন আর তাকে গড়াতে হচ্ছে না, এখন কি হবে? পাহাড়ের উপর যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ ছিল, কিন্তু এখন সে নীচে পড়ে গেছে, এখন সে গলতে শুরু করবে। বরফের চাঁইয়ের মত চিত্ত এখন তার উৎসের সাথে ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে। চিত্তের উৎস মহৎ। মহৎ এসেছে প্রকৃতি থেকে। চিত্তের তখন নিজস্বতা বলে আর কিছু থাকে না। একটা বিশাল বরফের চাঁই যদি সমুদ্রের মধ্যে ভেঙে পড়ে তখন সে ঐ জলের মধ্যেই বরফের চাঁই গলে যেতে থাকবে। প্রথমে ভাবতে থাকে এ আমার কি হল, কিছুক্ষণ পরে দেখে সে আর সে নেই। আর অবশেষে সে তার নিজের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, সে যা ছিল তাই হয়ে যায়। বরফ তো জলই ছিল কিন্তু কোন কারণে বরফ হয়ে গিয়েছিল, বরফের চাঁই সেই সমুদ্রের জলেই পড়েছে, এখন সে গলে গলে সেই সমুদ্রের জলই হয়ে গেছে, সেতো সমুদ্রের জলই ছিল। যদি বলে বরফের ঐ বলটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি সে সমুদ্র ছিল সমুদ্রই হয়ে গেছে। আমরাও ঠিক এই বরফের বলের মত। গড়াচ্ছি তো গড়াচ্ছিই, কত যুগ, কত জন্ম ধরে গড়িয়েই চলেছি। গড়াতে গড়াতে একদিন এই সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়ে গেল, এখন সে এই সমুদ্রেরই একটা অংশ, গলতে শুরু করল, গলে গলে সচ্চিদানন্দ সাগরের জলে মিশে গেল, এখন সে আর অংশ নেই, সচ্চিদানন্দের সাথে একীভূত হয়ে গেল।

প্রকৃতি আর পুরুষের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়। এই হল যোগের সাতটা ধাপ। সপ্তম অবস্থাতে পুরুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এটাই যোগের কৈবল্য প্রাপ্তি। এই অবস্থায় অবস্থিত হয়ে যাওয়ার পর সে তখন দেখে ‘মাগো! এত দিন কী করছিলাম আমি’! স্বপ্ন ভঙ্গের মত সে ভাবে ‘এগুলো তো সবই স্বপ্ন, কিন্তু এই স্বপ্নগুলোকে নিয়ে আমি বোকার মত হাসছিলাম, কাঁদছিলাম, মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিলাম! এই সৃষ্টি, সৃষ্টির খেলা, এর সাথে তো আমার কোন সম্পর্কই নেই। ইন্দ্রিয় তার বস্তুর উপর কাজ করে যাচ্ছে, মন নিজের মত চলছে। আমার সাথে তো এদের কোন সম্পর্কই নেই, আমার তো এই জগতের কোন কিছুই দরকার নেই’। যিনি প্রকৃতিকেই ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আর কিসের জন্য কি জিনিষের প্রয়োজন হবে! তিনি স্পষ্ট দেখতে পান আমার সাথে প্রকৃতির কোন মিল নেই। পুরুষ যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি আনন্দময়, যিনি সত্ত্বাত্মক, আর প্রকৃতি যার মধ্যে না আছে কোন চৈতন্যের ভাব, না আছে কোন আনন্দের ভাব, তাহলে কি দুঃখের ভাব আছে, কোন ভাবই নেই। প্রকৃতি শুধু দুটো জিনিষ জানে, আকর্ষণ আর বিকর্ষণ। চুম্বক ও তড়িৎএর ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিষ হয় আকর্ষণ হলেই তার আনন্দ হয় আর বিকর্ষণ হলেই তার কষ্ট হয়। জগতে এই দুটোরই খেলা, আমরা সবাই এক একটা জীবন্ত সজীব চুম্বক ছাড়া কিছু নয়। জীবন্ত চুম্বক হওয়ার জন্য, চুম্বকের যেমন বিকর্ষণ হয় আর আকর্ষণও হয়, তৃতীয় সে কিছু জানে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সে নিউট্রাল থাকে। আকর্ষণ আর বিকর্ষণের জন্য চুম্বকের প্রধান যে কার্যটা হয় তা হল, আপনি যদি আকর্ষণকে সুখের সাথে আর বিকর্ষণকে দুঃখের সাথে জড়িয়ে রাখেন তাহলে যেখানেই সুখ সেখানেই আপনি দৌড়ে যাবেন আর যেখানেই দুঃখ সেখান থেকেই দৌড়ে পালাবেন। সারাটা জীবন সবাই শুধু দৌড়েই যাচ্ছে, আর দৌড়াতে দৌড়াতেই একদিন মুখ খুবড়ে পড়ে মারা যাচ্ছে। যোগী যখন বুঝে যায় আমি আলাদা প্রকৃতি আলাদা তখন আকর্ষণ আর বিকর্ষণ কোনটাই তাকে আর কিছু করতে পারে না, তাই সুখ-দুঃখেও সে উদাসীন হয়ে যায়, প্রকৃতির কোন কিছুই তাকে আর আকর্ষিত করতে পারে না আবার বিকর্ষিতও করতে পারে না।

আপনি বলবেন প্রকৃতি আছে বলেই তো সৃষ্টি চলছে, আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে বলেই তো সৃষ্টি চলছে। আরে ভাই! সৃষ্টি যার চালানোর তিনি চালাবেন, ভগবানের সৃষ্টি ভগবানই চালাবেন, তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা করার কোন দরকার নেই। আমরা মনে করি যারা কামী পুরুষ তারাই সৃষ্টি চালিয়ে যাবে। মুসলমানদের যতই বোঝান তারা কি কখন জনসংখ্যা কম করতে চাইবে! ভারত সরকারও কিছুই করতে পারছে না, জনসংখ্যা দিনে দিন বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার কথা ভেবে আপনি কি করবেন, আপনি আগে নিজের বেরোবার পথটা দেখুন, কিভাবে এই প্রকৃতির খপ্পড় থেকে বেরোবেন সেটা ভাবুন।

এত কিছু বলার পর স্বামীজী বলছেন এগুলো খুবই উচ্চ অবস্থার কথা, আমাদের পক্ষে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য আমরা এর থেকে আরও সহজতম পন্থা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যেগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ এবং অনুশীলনও আয়ত্তের মধ্যে। তাই এখন বলছেন এগুলো তো অনেক উঁচু কথা হল, এখন ঐখানে কিভাবে পৌঁছাতে হবে সেই কথা বলা হচ্ছে।

অষ্টাঙ্গযোগ এবং যম ও নিয়মের অনুশীলন

তখন পতঞ্জলি বলছেন *যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।।২৮।।* যোগ এতক্ষণ তার দর্শনকে তত্ত্বতঃ ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সেখান থেকে সোজা নেমে আসছেন বাস্তব সাধনাতে। আমি তো বুঝলাম আমার মনে অনেক আবর্জনা আছে, আমার ক্লেশ আছে আর যোগ বলছে আমার মনের আবর্জনা দূর হয়ে যাবে, আমার মনে ক্লেশ বলে কোন পদার্থ থাকবে না, কিন্তু আমি এই যোগ সাধনা করবো কি ভাবে? অর্থাৎ আমি যদি যোগী হতে চাই, তাহলে আমি কি উপায়ে যোগী হতে পারব? তখন বলছেন এই যে তোমাকে বিবেকখ্যাতির কথা বলা হল, যে জ্ঞানদীপ্তির কথা বলা হয়েছে, যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বিবেকখ্যাতি বা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যদি এর আগে তুমি যোগের এই আটটি অঙ্গের অনুশীলন করতে পারো।

পরের সূত্রেই পতঞ্জলি অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলছেন। যোগী হওয়ার জন্য যোগের এই আটটি অঙ্গকে ধাপে ধাপে সবাইকে অনুশীলন করে যেতে হবে। সূত্রে কী বলছেন? **যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাদয়োহষ্টাঙ্গানি।।২৯।।** যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই আটটি অঙ্গ – এক সাথে সন্ধি করে বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ।

প্রথমে যম অভ্যাস করতে হবে, এটা প্রথম ধাপ এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও যমকে আমরা ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে পারি। যম অনুশীলন যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ যোগশাস্ত্রের মতে কেউ যোগ পথে এগোতে পারবে না। **অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।।৩০।।** অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে একসাথে বলা হয় যম। যোগাভ্যাস আরম্ভ করার শুরুতে, অর্থাৎ কিনা আধ্যাত্মিক জীবনের যাত্রা শুরু করতে যারাই আসবে প্রত্যেক নবাগত সাধককে এই পাঁচটা দিয়েই শুরু করতে হবে। এই পাঁচটা কিভাবে করা যাবে, করলে কি হয়, সেই সম্বন্ধে পর পর এখন আলোচনা চলতে থাকবে।

প্রথমে অহিংসা, অহিংসা হল কোন প্রাণীকে কোন ধরণের কষ্ট না দেওয়া। অহিংসাতে যে কোন ধরণের হিংসা, বাইরে হিংসা দেখানো তো দূরের কথা মনের মধ্যেও হিংসা ভাব থাকবে না। আমি কারুর মুখের উপর সরাসরি কটু কথা বলে দেওয়াতে যে হিংসা করলাম, তেমনি মনে মনে চিন্তা ভাবনার মধ্যেও কাউকে কষ্ট দিচ্ছি সেটাও হিংসা। প্রাণীবধ না করাটাই একমাত্র অহিংসা নয়। কারুর প্রতি কোন রকম হিংসা ভাব না রাখাটাই অহিংসা। মনেও কোন হিংসার ভাব থাকবে না, মুখেও কোন হিংসা থাকবে না আর কার্যেও কোন হিংসা ভাব পরিণত হবে না। হিংসা খুব জটিল একটি শব্দ। জৈনরা অহিংসাকে তো মারাত্মক বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাঁরা সন্ধ্যাবেলা আলো পর্যন্ত জ্বালাতে চাইবেন না, মুখে কাপড় দিয়ে রাখবেন যাতে কোন প্রাণহানি না হয়। হিংসা বা অহিংসা আসলে মনের একটি বিশেষ অবস্থান। মনের অবস্থানটাই ঠিক ঠিক অহিংসা। যেমন আমরা যে মাছ খাই, এই খাওয়াটা ঠিক হিংসার মধ্যে পড়ে না। কারণ মাছ খেয়েই আমাকে বাঁচতে হবে, যাদের জীবন ধারণের জন্য মাছ খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তারা কি করবে? আসলে হিংসা মানে কারুর ক্ষতি করতে চাওয়া বা আমি চাইছি তোমার কোন ক্ষতি হয়ে যাক। ঘরে প্রচুর মশা, সন্ধ্যার পর বসে যে নিশ্চিত ভাবে জপধ্যান করব মশার জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। আমি এখন জানলায় নেট লাগাতে পারি, অল আউট জ্বালাতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মশার উপদ্রব না কমলে আমাকে বাধ্য হয়ে স্প্রে করতেই হবে। আমি যে মশা মারতি চাইছি তা তো নয়, আমার নিজের শরীরকে রক্ষা করতে হবে। ঠাকুরও ছারপোকা মারতেন আবার তাঁর শিষ্যকে বলছেন আরশোলা গুলোকে মারতে কিন্তু শিষ্য না মেরে সব আরশোলাগুলোকে ছেড়ে দেওয়াতে শিষ্যকে ঠাকুর তিরস্কার করছেন। এগুলো হিংসার মধ্যে ধরা হয় না। গান্ধীজী যখন সাবরমতি আশ্রমে থাকতেন, সেই সময় সেখানে একটা বাছুর হয়েছিল যার চোখ অন্ধ ছিল আর পা বিকলাঙ্গ হওয়াতে হাটেতে পারতো না। বাছুরটা সত্যিই খুব কষ্ট পাচ্ছিল। এত কষ্ট পাচ্ছিল যে চোখে দেখা যেত না। গান্ধীজী গুলি করে মেরে দিতে বললেন। পরে এই নিয়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হয়েছে। একদিকে তিনি অহিংস আন্দোলন করছেন অন্য দিকে নিজেই তিনি হিংসা করছেন। যোগের দৃষ্টিতে কিন্তু এটা অহিংসা। কারণ এই কাজের মধ্যে গান্ধীজীর মনে কোথাও হিংসার ভাব ছিল না। তিনি মনে করছেন আমি বাছুরটাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিচ্ছি। চেঙ্গিজ খাঁ তার সৈন্যদের বলত ‘যুদ্ধের সময় মানুষকে মারা কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় শান্ত মনে একটা মানুষকে মারা খুব কঠিন। সেইজন্য বুকটা কঠোর করতে শেখ’। এক শহরে চেঙ্গিজ খাঁর সৈন্যরা আক্রমণ করেছে। সেই শহর তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি। চেঙ্গিজ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন পুরো শহরটাকে মাটিতে মিটিয়ে দিতে আর বুড়ো, বুড়ি, শিশু জোয়ান সবার গলাটা কেটে দিতে। সবাই লাইন করে দাঁড়াল, একটা একটা করে লাইন এগোচ্ছে আর সৈন্যরা শান্ত মনে ওদের গলা কাটতে লাগলো। শহরের বাসিন্দাদের তো কোন দোষ ছিল না। চেঙ্গিজ খাঁ শুধু তার সৈন্যদের মনের মধ্যে নিষ্ঠুরতার ও হিংস্রতার ভাবকে কঠোর করার জন্য এই জঘন্য নরসংহার করালেন।

সত্যিকারের অহিংসা হল – আমাকে কেউ একটা গালাগাল দিল, তার প্রত্যুত্তরে আমি তাকে একটা চড় মারলাম, আমার এই আচরণকে সবাই বলবে হিংসা। কিন্তু এখানে প্রকৃত হিংসা হবে না। আবার মনে করুন একজন ভদ্রলোককে আমি গালাগাল দিলাম উনি উল্টে আমাকে চড় না মেরে, চুপচাপ সহ্য করে গেলেন। কিন্তু তাঁর শরীরের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকল এবং তিনি সেটাকে চেপেও দিলেন, এখানেও কিন্তু অহিংসা হল না। আপনি কাউকে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলছেন, কিন্তু মনে মনে আপনি তার ক্ষতি চাইছেন, তার মানে আপনি ভেতরে হিংসা পুষে রেখেছেন। এটাই ঠিক ঠিক হিংসা। যোগে হিংসা একেবারেই চলবে না। তিন বছরের শিশু দাদুর কোলে উঠে দাদুর গালে চড় মারছে, কান ধরে টানছে, তাতে দাদুর ব্যাথাও লাগছে কিন্তু দাদু কি নাটিকে তার জন্য মারতে যাবে? দাদুর মনে কোন ধরনের হিংসা বৃত্তিই উঠছে না। অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত থাকলে এই ধরনের কোন রকমের অনুভবই আসবে না। অহিংসা মানে এই নয় যে আমাকে কেউ মারল আর আমি তাকে আরেক গাল বাড়িয়ে দেব। যিশু বলছেন তোমাকে যদি কেউ মারে তাহলে তুমি তোমার আরেকটা গাল বাড়িয়ে দাও। অন্য গালটা বাড়িয়ে দেওয়ার মানেটা কি? এই নিয়ে জর্জ বার্গাড’শর একটা খুব সুন্দর কৌতুক গল্প আছে – একজন মল্লবীর খ্রিস্টান ধর্ম নিয়েছে। একদিন এক রোগা প্যাটকা খ্রিস্টান তাকে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কি খ্রিস্টান? হ্যাঁ। যেই হ্যাঁ বলেছে সে ঐ মল্লবীরের গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলছে – যিশু বলেছে তোমার গালে কেউ চড় মারলে তুমি তোমার অন্য গালটাও বাড়িয়ে দেবে। মল্লবীর তখন তার অন্য গালটাও বাড়িয়ে দিয়েছে। রোগ প্যাটকা লোকটা ঐ গালেও ঠাস করে আরেকটা চড় মেরেছে। তখন মল্লবীর বলছে – আমার এই দুটো গালই আছে, তৃতীয় গাল নেই। এই বলে তাকে বেধড়ক পেটাতে লাগল।

রাজযোগে এখানে বলছে না যে তুমি আরেকটা গাল বাড়িয়ে দেবে। মনে যদি কোন ধরনের প্রতিক্রিয়াই না আসে, তবেই সেটাই ঠিক ঠিক অহিংসা হবে। প্রতিক্রিয়া এলো আর সেটাকে দমিয়ে দেওয়াটাকেও এখানে অহিংসা বলছে না। আমাকে যদি কেউ গালাগাল দেয় প্রথমে শরীরটা গরম হতে শুরু করবে, তারপরে চোখ, কান, মুখ সব লাল হতে শুরু হবে। এরপরেই মুখ দিয়ে পাল্টা গালাগাল হবে, শেষে হাত থাকতে মুখে কেন, শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। এগুলো এত দ্রুত ঘটে যায় যে আমরা ধরতেই পারিনা। যোগের ক্ষেত্রে অহিংসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এত প্রয়োজনীয় যে যোগী হতে হলে অহিংসা দিয়েই শুরু করতে হয়। অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনই যোগী হওয়া যাবে না। সত্যি সত্যিই সে কাউকে আঘাত দিতে চাইছে না, কিন্তু কিছু এমন একটা করে ফেলল যার ফলে একটা হিংসার কার্য হয়ে গেল, তখন কিন্তু এটা তাকে স্পর্শ করবে না। এই কার্যের জন্য মনে অনুশোচনা ও অন্য অনেক কিছু হবে কিন্তু ওর জন্য তার কোন দাগ লাগবে না। মশার কামড়ে আমাদের অনেক ধরনের অসুখ হয়ে যেতে পারে, তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশা যাতে না আসে তার সব ব্যবস্থা করলে হবে আর দু চারটে মশা তাতে যদি মরেও যায় তাতে কোন হিংসা হবে না, কেন না আমাদেরও তো বাঁচতে হবে। সাবরমতিতে গান্ধীজীর আশ্রমে সাপ মারা নিষেধ ছিল, সাপেরা ওখানে নিজেদের মত ঘুরে বেড়াত, কিন্তু তার জন্য সবাইকে অনেক সাবধাণতা অবলম্বন করতে হত, সতর্ক থাকতে হত। নিজের রক্ষার জন্য আগে ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি সেটাতেও না হয় তাহলে তখন আত্মরক্ষার জন্য কিছু কিছু প্রাণীর প্রাণ নাশ করতে হয়, কিন্তু এটা অবশ্যই হিংসা এবং ক্ষতি করে। গায়ে মশা কামড়ালে যে মশা মারছি এতে অবশ্যই আমাদের পাপ লাগছে, কিন্তু এখন আমরা কি করব! আবার না মেরেও উপায় নেই। সেইজন্য আগে থেকে জাল লাগিয়ে, মশার ধূপ জ্বালিয়ে ব্যবস্থা করে নিতে হয়, যাতে হিংসাটা না করতে হয়। মশা যখন কামড়ায় আর তখন শরীরে যে জ্বালা তৈরী হয় সেটাই আমাদের মনের মধ্যে হিংসা বৃত্তিটাকে জাগিয়ে দেয়। হিংসা বৃত্তি যেই জেগে গেল তখন এই বৃত্তিটাই আমাদের মনকে টেনে নামিয়ে দেবে।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে রাত্রে গিরিশ ঘোষ আর স্বামীজী বসে ধ্যান করছেন। গিরিশ ঘোষ ঠকাস্ ঠকাস্ করে মশা মেরে চলেছেন আর তার পাশে স্বামীজী বসে আছেন দেখছেন স্বামীজীর গায়ে এত মশা বসে আছে মনে হচ্ছে যেন স্বামীজী কম্বল চাপা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু কোন বোধই নেই, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যানের গভীরে ডুবে গেছেন। যখন তাঁর ধ্যান ভাঙবে, যখন শরীর বোধ ফিরে আসবে

তখন তাঁর জ্বালা অবশ্যই করবে, বিষ গুলো যাবে কোথায়। আমরা জানি যে স্বামীজীর মধ্যে নাকি হিংসা বৃত্তি কখনই ছিল না। তার ফলে মশা যখন কামড়াত তাঁর তখন কিছুই বোধ হতো না।

দ্বিতীয় হল সত্য। সত্যও তাই, মন থেকে, বচন থেকে আর ব্যবহারে সব সময় সত্য থাকতে হবে। এখানে সত্য মানে মনে কোন ধরণের দুরভিসন্ধি, কাউকে ঠকানো, নিজের রাগ ও দ্বেষবশতঃ মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া। মহাভারতে কৌশিকী মুনির কাহিনীতে একজন পথিককে হত্যা করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ে কিছু ডাকাত তাড়া করেছিল। বেচারী পথিক তাড়া খেয়ে কৌশিকী মুনির আশ্রমের এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ডাকাতরা এসে কৌশিকী মুনিকে পথিকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। মুনি সত্য বই মিথ্যা বলবেন না, তিনি ঝোপের দিকে পথিককে দেখিয়ে দিলেন। ডাকাতরা পথিককে ধরে নিয়ে তাকে খুন করে সব কেড়ে নিল আর পুরো পাপটা কৌশিকী মুনির লেগে গেল। কিন্তু রাজযোগের আদর্শ অনুসারে ঐ অবস্থায় যোগী কি করবে? স্পষ্ট করে সে ডাকাতদের বলে দেবে - আমি বলব না তোমাকে, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো তো, আমি তোমাকে বলব না। কিংবা মৌন থাকবে। সত্যের জন্য আমি জানি না, এই মিথ্যে কথাটাও সে বলবে না। আবার সে এমন কিছু বলবে না যার ফলে কোন হিংসার কারণ হবে। সত্য আর অহিংসার মধ্যে বাক্য মানে কি বলছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মনের অভিপ্রায়। অহিংসা আর সত্য যোগ অভ্যাসের প্রথম ধাপ।

অস্তেয় মানে চুরি না করা। অস্তেয় শব্দের সহজ অর্থ চুরি না করা হলেও এই শব্দটির ভাব ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর। চুরি করা মানে, কারুর জিনিষ না বলে নেওয়া। কিন্তু অস্তেয় আর লোভ অঙ্গঙ্গী ভাবে জড়িত। কারুর একটা ভালো জিনিষের প্রতি নজর গেছে, তার সাথে ভাবছে যদি কোন ভাবে ঐ জিনিষটা ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারি, যদি দিয়ে দেয়, এই ধরণের সমস্ত মনোভাবই অস্তেয় বৃত্তির মধ্যে এসে যাবে। যারা চুরি করে তাদের অনেকেই অভাবে চুরি করে আর অনেকের স্বভাব হয়ে যায়, আর বাকীরা করে লোভে পড়ে।

তারপর আসছে ব্রহ্মচর্য। আধ্যাত্মিক জীবনে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য। ব্রহ্মচর্য ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন অসম্ভব। যে পথের আর যে ধর্মেরই সাধক হয়ে থাকুক না কেন, জ্ঞানমার্গীই হোক, কি ভক্তিমার্গীই হোক, খ্রিস্টান হোক কি মুসলমান হোক, যখনই বলবে আমি সাধক তখনই দেখতে হবে সে ব্রহ্মচর্য ঠিক ঠিক অনুশীলন করছে কিনা। ক্যাথলিক বা বৌদ্ধরা আবার বিয়ের অনুমতিই দেয় না। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের সাথে বিয়ের কোন সম্পর্ক নেই, সন্তান হয়েছে তার সাথেও ব্রহ্মচর্যের কোন সম্পর্ক নেই। যেদিন বলবে - আমি আজ থেকে সাধনা করব, সেদিন থেকে তার মন থেকে, বচন থেকে আর আচরণে কোন ধরণের অব্রহ্মচর্যের প্রকাশ তো থাকবেই না, আচরণ আর কথার ব্যাপার ভুলে যান, বলছে মনের মধ্যেও অব্রহ্মচর্যের কোন ধরণের চিন্তা আসবে না। যদি অবচেতন ভাবেও এ ধরণের কিছু এসে যায় তাহলে তাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, আর সচেতন ভাবে করার তো প্রশ্নই আসে না। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বা কোন পত্রিকা হাতে এসে গেল তাতে এমন কিছু ছবি বা দৃশ্য চোখে পড়ে গেল, আর সেখান থেকে মনটা একটা বৃত্তি নিয়ে নিলো, বলছে এগুলো থেকেও সাধককে নিজেকে বাঁচাবার প্রয়াসী হতে হবে। সেইজন্য প্রাচীন কালে সাধু সন্ন্যাসীরা বনে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতেন, গুহায় আশ্রয় নিতেন, যাতে ঐ ধরণের কোন কিছু চোখের দৃষ্টির মধ্যে না আসে। ব্রহ্মচর্য ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন কল্পনাই করা যায় না। যে ব্যক্তি নারীকে নারী রূপে দেখে সেই ব্যক্তি এখনও যোগ সাধনায় এগোতে পারবে না। প্রথমেই হয়তো ঝামেলায় পড়বে না, কিন্তু পরে একটা সময় সে ফাঁসবেই ফাঁসবে। সেইজন্য বলা হয় প্রথম থেকেই ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করতে হবে। আপনি হয়তো প্রথম থেকেই মন থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারবেন না, সম্ভবও নয়। তাই প্রথমে মন থেকে একটু সংযম করলো, তারপর বচন থেকে সংযম করলো, এইভাবে ধাপে ধাপে এগোতে হয়। এই কারণেই বেশীর ভাগ লোক মনে করে ভক্তি পথ অনেক সহজ পথ, ভক্তি পথে এত ঝামেলা নেই। কিন্তু যে পথেই আপনি যান না কেন, এই পাঁচটি জিনিষ সবাইকেই পালন করতে হয়।

যমের শেষ ধাপ অপরিগ্রহ – কারুর কাছ থেকে কোন ধরণের উপহার না নেওয়া। যোগ পথের সাধককে এসে একজন বলল – বাবাজী আপনার জন্য মাংস রান্না করে নিয়ে এসেছি। এরপর লোকটির প্রতি করুণাবশেই হোক আর নিজের মাংস খাওয়ার লোভেই হোক, যদি সে ওই রান্না করা মাংস গ্রহণ করে নেয় তক্ষুণি যোগী একশ হাত নীচে নেমে যাবে। কারণ এর মধ্যে তন্মাত্রার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। যে এই মাংস রান্না করে নিয়ে এসেছে এই রান্না করা মাংস ঐ ব্যক্তির তন্মাত্রাকেও বহন করছে, যেই সাধককে দিয়ে দিল সে তার নিজের তন্মাত্রা এখন তাকে হস্তান্তর করে দিল, ধীরে ধীরে এই তন্মাত্রাই যোগীকে বিষিয়ে দেবে। যোগীর মন এতই পবিত্র হয়ে যায় যে একেবারে সাদা কাপড়ের মত ধ্বংসবে। সাদা কাপড়ে বিন্দু পরিমাণ কালো দাগ পড়লে ওই দাগ দূর থেকেও দেখা যাবে। কিন্তু কালো পোশাকে দাগ লাগলে বোঝা যাবে না। সেইজন্য সাধারণ লোকের কাছে এগুলো কিছুই নয়, কিন্তু একজন যোগীর কাছে এগুলোই মারাত্মক আকার ধারণ করে নেয়।

অপরিগ্রহের দ্বিতীয় যেটা খুব মারাত্মক দিক, তা হল, যখন দান সামগ্রী উপহার এগুলো আসতে থাকে তখন যোগীর মনটা অন্য দিকে চলে যায়, একাগ্রতটা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাহলে কি যোগী কিছুই নেবে না? বলছেন – যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নেবে, তার অতিরিক্ত একটুও নয়। এখন প্রয়োজন কতটা? সেখানেও বলছেন – জীবন ধারণ করতে গেলে, জীবন নির্বাহের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই তাঁর প্রয়োজন তার বাইরে কিছুই নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু জিনিষ যদি যোগীর কাছে থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত নয়। যোগ সাধনায় অপরিগ্রহ হওয়া একেবারে বাধ্যতামূলক। আপনি বলবেন, আমি অর্থোপার্জন করছি আমি ভোগ করতে পারবো না? নিশ্চয়ই ভোগ করতে পারেন, কিন্তু আপনি কোন দিন যোগী হতে পারবেন না।

এতটা বলার পর পতঞ্জলি বলছেন **এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৩১॥** এই যে বলা হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, এগুলো শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই অপরিহার্য নয়, যে কোন দেশের, যে কোন জাতির, যে কোন সমাজের মানুষের জন্য, যে কোন যুগে এই পাঁচটিকে বলা হয় মহাব্রত। যে কোন দেশ, আফ্রিকা হোক, ভারত হোক বা আমেরিকাই হোক, আজ থেকে দু হাজার বছর আগে হোক বা আজ থেকে দু হাজার বছর পরে হোক যে কেউ এই পাঁচটি ব্রতকে পালন করবে তার আর বাকী যা আছে সব এসে যাবে। গান্ধীজী বলেছিলেন সত্য আর অহিংসা এই দুটোকে পালন করলেই হবে। বলা হয় এই পাঁচটিই যোগের পথে প্রথম ধাপ, কিন্তু যদি কোন সাধারণ মানুষও, যার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি কোন আগ্রহই নেই, সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, সেও যদি যে কোন দেশে, যে কোন সময়ে অনুশীলন করে তাহলেই তার জীবনের ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। পতঞ্জলি দু হাজার বছর আগে এই কথাগুলো বলেছিলেন, গান্ধীজী কিছু বছর আগে মাত্র এর দুটো অহিংসা আর সত্য অনুশীলন করে জগৎ বিখ্যাত হয়ে গেলেন, আর এই কিছু দিন আগে নেলসন মেণ্ডেলা এই দুটোকে অনুশীলন করে কোথায় উঠে গেলেন।

হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, খ্রিস্টান হোক বা বৌদ্ধই হোক, যে ব্যক্তির মধ্যে এই পাঁচটা জিনিষ আছে সেই ব্যক্তিকেই সমাজ সব থেকে বেশী সম্মান করে। যিশুকে সারা পৃথিবী কেন এত সম্মান করে? কারণ তিনি ত্যাগী পুরুষ, তিনি চুরি করতেন না, তিনি দান উপহারাদি নিতেন না আর তিনি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যে দেশ থেকে ইসলাম ধর্ম জন্ম নিয়েছে, সেই আরব দেশের লোকেরা প্রথমে একেবারে জংলী ছিল। আগে আরব দেশে কোন মেয়েক বিয়ে করার পর তার স্বামী হয়তো বলে দিল, তুমি এবার বিদায় নাও, আমার কাছে তোমার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। পরে সেই মেয়েটির জীবন ধারণের আর কোন উপায় থাকতো না। মেয়েটিকে অন্য কেউ বিয়ে করে নিল তো বেঁচে গেল, কিন্তু তা নাহলে পথে বসে গেল। এইভাবে দেখা যায়, এক একটি লোক জীবনে কম করেও একশটি বিয়ে করতো। কিন্তু মহম্মদের আবির্ভাবের পর তিনি ঠিক করে দিলেন, তোমরা বিয়ে একটার বেশী করবে না। মহম্মদের অনুগামীরা তো এই নিয়ে রীতিমত বিপ্লব করে দিয়েছিল। এত দিন কোথায় একশ দুশো বিয়ে করা হত আর এক ফতোয়া দিয়ে সেটাকে মহম্মদ একে নামিয়ে দিয়েছেন। শেষে

মহম্মদ চারটে বিয়ের অনুমতি দিলেন, কিন্তু চারটের পর কোন মতেই নয়। অনুমতি দিয়ে মহম্মদ শর্ত করে বলে দিলেন, তখনই চারটে বিয়ে করতে পারবে যদি চারজনকে সমান ভালোবাসতে পারো। বলেই আবার মহম্মদ বলছেন, এক পুরুষের পক্ষে চারজনকে সমান ভালোবাসা সম্ভব নয়। তার মানে তুমি চারটে বিয়ে করতে পারো না। এটাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মচার্য। হিন্দীর প্রবাদেই আছে ‘এক নারী ব্রহ্মচারী’, যে একটি মেয়েকে নিয়েই থাকে সে ব্রহ্মচারী। মহম্মদও ব্রহ্মচার্যকে নিয়ে এসেছেন। আরবিয়ানদের মধ্যে যে চুরি, ছিনতাই, লুঠ তরাজ ছিল সেটাকে মহম্মদ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। যে কোন ধর্মে যখনই মূল্যবোধের কথা বলা হয় তখন এগুলোকেই মূল্যবোধের তালিকায় রাখা হয়। এর আগে আমরা মৈত্রী-করণা-মুদিতোপেক্ষাণাং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এগুলোও এই একই জিনিষ। আপনি যখন চাইছেন আমারই প্রমোশন হোক অপরের যেন না হয়, আমারই মাইনে বাড়ুক অন্যদের যেন না বাড়ে, এগুলোই ঠিক ঠিক হিংসা। আপনি মাছ খেলেন কি খেলেন না, মাংস খেলেন কি খেলেন না, এগুলো দিয়ে হিংসা অহিংসার বিচার হয় না। জীবই যখন জীবের খাদ্য, অপর প্রাণীকে ভক্ষণ না করে কোন প্রাণীই জগতে বেঁচে থাকতে পারে না। হিংসা বৃত্তি পুরো আলাদা ব্যাপার। হিংসা, লোভ, মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা এগুলো এক দিনে চলে যাবে না। কিন্তু প্রত্যেকটি দেশে, যে কোন জাতিতে, যে কোন কালে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচার্য আর অপরিগ্রহ এই পাঁচটা হল মহাব্রত। এই পাঁচটার যে কোন একটাকে যদি কেউ জীবনে অবলম্বন করে নেয় সেই কিন্তু বিরাট মহৎ হয়ে যাবে। আপনি হয়তো বলতে পারেন, আমার পক্ষে সব সময় সত্য কথা বলা, অহিংসাতে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু অস্তেয় অর্থাৎ চুরি আমি কখনই করি না। বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে মোটামুটি যেটা দেখা যায়, চুরি আমরা করি না। এখন বলছেন চুরি করি না, কিন্তু যদি অভাবে পড়ে যান, সন্তানের চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার কিংবা সন্তানের পড়াশোনার জন্য অর্থের দরকার, তখন যদি চুরি করার সুযোগ আসে সেই মুহুর্তে আপনি কি করবেন বলা মুশকিল। কিন্তু অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচার্য আর অপরিগ্রহতেই আসল পরীক্ষা হয়ে যায়।

গান্ধীজী প্রথমেই যে পথ নিলেন তাতে তিনি অহিংসা আর সত্যের কথাই বলে দিলেন। তাঁর কাছে অস্তেয় তো কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মচার্য পর্যন্ত যেতে যেতে বেশীর ভাগ লোকেরই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। গান্ধীজীরও হয়েছিল। সেইজন্য তিনি এর নামই দিয়েছিলেন My experiments with truth। আমরা প্রায়ই ভুল মনে করি যে, গান্ধীজী অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচার্য পালন করতে বলছেন। উনি কিন্তু তা বলছেন না, উনি বলছেন আমি এগুলোকে নিয়ে experiments করছি, আমার জীবনকে এটাতে ঢালার চেষ্টা করছি, চেষ্টা করে দেখছি আমি এগুলোকে কত দূর নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু একটা অবস্থার পর দেখছেন তিনি আর পারছেন না, উনি নিজেও বলছেন আমি fail করে যাচ্ছি। ওই অবস্থার মধ্যেও তিনি পুরো দেশকে সত্যগ্রহের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই সত্যগ্রহ শব্দটাও এসেছে যোগদর্শন থেকে, সত্য থেকে সত্যগ্রহ। গান্ধীজী কখন নিজেকে একজন সাধু বা সন্ন্যাসী বলছেন না। উনি শুধু বলছেন আমি experiments করছি, দেখি আমার কোন গোলমাল কিছু হয় কিনা। কারণ উনি জানেন এগুলো পালন করা খুব কঠিন। আসলে ওই উচ্চ স্তরে গিয়ে অনেকেরই মাথা বিগড়ে যায়, তখনই নানা রকমের গোলমাল হতে শুরু হয়। সন্ন্যাসীরা তাই প্রথম থেকেই যে কোন উত্তেজনা থেকে দূরে থাকেন, প্রথম কথা সমাজে কোথাও মেলামেশা করবেন না। সেইজন্য তাঁকে মিথ্যে কথা বলতে হয় না। সমাজে মেলামেশা না করার জন্য ব্রহ্মচার্যের ঝামেলাকে সামলাতে হয় না। সমাজের সঙ্গে কোন মেলামেশা নেই তাই কারুর কাছে কোন উপহার নেওয়ার সুযোগও আসবে না। আর চুরির তো কোন প্রশ্নই উঠবে না। আর বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রেও তাঁরা অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। আশ্রমে যদি দু একটা সাপও থাকে তার সাথে তাঁদের মুখ চেনাচেনি হয়ে যায়, ওরাও আর কাউকে কামড়ায় না। কিন্তু কেউ সমাজে থাকবেন আর এই পাঁচটি জিনিষ পালন করবেন, এই জিনিষ অকল্পনীয়। কিন্তু সমাজে থেকে অহিংসা ও সত্যকে গান্ধীজী যে পর্যায়ে নিয়ে গেলেন এটা চিন্তাই করা যায় না। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন অবতার তাঁর পক্ষে এগুলো করা অসম্ভব কিছু না, তিনি কিছু করে দিলেন সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু একজন যোগী সমাজে থাকবেন আর নিজেকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবেন, আর শুধু নিজেই না, সাথে সাথে অপরকেও প্রেরণা দিয়ে যাবেন, এই জিনিষ গান্ধীজী ছাড়া আর কারুর মধ্যে কল্পনাই করা যায় না।

অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হল নিয়ম। প্রথমে অর্থাৎ যমের যে পাঁচটা মহান ব্রতের কথা বলা হল, এগুলো আমাদের ভদ্র সভ্য করে। কিন্তু যম থেকে আসল যোগ শুরু হয় না, যোগ শুরু হয় নিয়ম থেকে। যমের পাঁচটিকে বহিরঙ্গ সাধন আর নিয়মের পাঁচটিকে অন্তরঙ্গ সাধন বলা হয়। সমাজে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা করার সময় যে মূল্যবোধের অনুশীলন করার কথা বলা হয় সেগুলো এই পাঁচটি যমের মধ্যে পড়ে। আর যখন নিজেকে নিয়ে আছি বা নিজের অন্তর্জগতের মধ্যে আছি তখন নিয়মের এই পাঁচটিকে অনুশীলনের মধ্যে রাখতে হয়। নিয়ম অনুশীলন শুরু করা মানে যোগ সাধনা শুরু হল। আমি ঠিক করলাম আগাছা আর ঝোপঝাড় ভর্তি জমিতে একটা বাগান তৈরী করব। সবার আগে আমাকে জমির যত জঙ্গল, আগাছা আছে সব পরিষ্কার করতে হবে। তারপর ট্রাক্টর দিয়ে জমির মাটিকে ঠিক করতে হবে, তারপর সার দেওয়া, বীজ দেওয়া ইত্যাদি পর পর চলতে থাকবে। যম মানে জঙ্গল পরিষ্কার করা আর নিয়ম হল ট্রাক্টর দিয়ে জমির মাটিকে বীজ বপনের উপযুক্ত করে তোলা।

সূত্রে বলছেন **শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রদানানি নিয়মঃ।।৩২।।** নিয়মের প্রথম হল শৌচ। এখানে শৌচ মানে বহিঃশৌচের কথাই বলছেন। নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, স্নান করা, রোজ দাঁত মাজা, জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা আর ঘর-বাড়ি সাফসুতরো রাখা। অনেকে বলেন শৌচ মানে মনের পবিত্রতা। এখানে কিন্তু শৌচ মনের পবিত্রতাকেই বোঝাচ্ছে না, কেননা মনের পবিত্রতার জন্যই পাঁচটি নিয়মের অনুশীলন করা। তাই এখানে পরিষ্কার বহিঃশৌচের কথাই বলা হচ্ছে। আজকাল বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েরা স্নান না করে বডি স্প্রে লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে এতেই সব কিছু হয়ে যাবে। কিছুই হবে না, স্নান না করে বডি স্প্রে লাগানো শৌচের মধ্যে পড়ে না। যোগ সাধনায় শৌচ কেন গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়ে পরে বলবেন।

নিয়মের দ্বিতীয় হল সন্তোষ, অর্থাৎ সব কিছুতে সন্তুষ্টির ভাব। যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা আর যা নেই তা নিয়ে অসন্তোষ না করা। মাথার মধ্যে সব সময় ঘুরছে এটা পেলে হয়, ওটা পেলে হয়, যোগ সাধনায় এই ধরনের মনোভাব যেন একেবারেই না থাকে। যা পেলাম, যা আমার কাছে আসছে তাতেই নিজের সন্তুষ্টিকে ধরে রাখা।

তৃতীয় হল তপঃ – তপঃ মানে তপস্যা। তপস্যা মানে, যখন কোন একটি জিনিষকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করার চেষ্টা করা হয় তখন শরীর মনে একটা তাপ সৃষ্টি হয়, এই তাপকে বলা হয় তপস্যা। এখানে তপস্যা মানে শারীরিক কৃচ্ছ সাধন, শরীরকে একটু কষ্ট দেওয়া, মানে উপোস করা, সকালে উঠে রোজ স্নান করা। যেমন আমি একাদশী ব্রত করছি, কেউ সপ্তাহে একদিন উপোস করছে, এগুলোও এক ধরনের তপস্যা। অনেকে রাতে উপোস করে থাকেন, এটাও তপস্যা। মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে অনেক ধরনের তপস্যার বর্ণনা আছে। যখনই ধর্মকে সামনে রেখে শরীরের কৃচ্ছ সাধন করে কোন কিছু করা হচ্ছে, যার ফলে শরীর মনে একটা তাপ সৃষ্টি হয়, তাকেই তপস্যা বলা হয়। তপস্যা সবারই খুব দরকার। যদি কেউ এসে বলে আমি একজন সাধক তাহলে বলবে খুব ভালো কথা, তা তোমার কি কি তপস্যা, মানে তুমি প্রতিদিন কি ধরনের শারীরিক কৃচ্ছতা করছ? এখনো গ্রাম দেশের ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন যে ধরনের শারীরিক কৃচ্ছতা করেন সেটাও তাদের কাছে তপস্যা বলে মনেই হয় না। কিন্তু এনারা প্রত্যেক দিন নিয়মিত ভাবে এই কৃচ্ছ সাধন বংশ পরম্পরায় করেই যাচ্ছেন। সকাল বেলায় সূর্যোদয়ের আগে গিয়ে নদীতে স্নান করবেন, বাড়িতে এসে সব ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন, খালি পায়ে মন্দিরে আসবেন, জল ঢালবেন, পূজো করবেন, যতক্ষণ পূজো না শেষ হবে ততক্ষণ কিছু অন্ন-জল গ্রহণ করবেন না, ইত্যাদি। আগেকার দিনে এবং এখনও অনেক বিধবারা কত রকমের উপোস করে – এগুলোও তপস্যা।

জৈনদের বিশেষ পরব আছে, যাতে পনের দিন যাবৎ সাধুরা কোন কিছুই খাওয়া-দাওয়া করেন না, শুধু গরম জল পান করা ছাড়া আর কিছুই খাবেন না। ভারতীয় সেনা বিভাগ থেকে জৈনদের এই উপোসের উপর গবেষণা করে অনুসন্ধান করছেন, এই যে পনের দিন ধরে না খেয়ে থাকেন তাতে এদের শরীর ও মনের মধ্যে কি ধরনের প্রভাব পড়ে। কারণ সৈন্যদের এমন অনেক পরিস্থিতির মধ্যে

পড়তে হয় যখন তারা কোন খাবার পানীয় কিছুই পায় না। জৈন সাধুদের এই ধরনের তপস্যাকে কিভাবে সেনাদের কাজে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে এখন গবেষণা শুরু হয়েছে।

এই ধরনের তপস্যাতে একটা সমস্যা কি হয়, এই যে শরীরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, এই জায়গাতে এসেই অনেকে আটকে থাকে, এখন থেকে যে লক্ষ্যের দিকে আরো এগিয়ে যেতে হবে সেটাই ভুলে যায়। তখন শরীরকে কষ্ট দেওয়াটাই যেন জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটা যে শুধু তপস্যাতেই হয় তা নয়, শৌচ করতে করতে অনেকের মধ্যে মারাত্মক ধরনের শুচিবাদ এসে যায়।

তারপর আসছে স্বাধ্যায়। নিয়মিত স্বাধ্যায় যদি না করা হয় ধর্মজীবনে কখনই এগোন যায় না। এখানে স্বাধ্যায় মানে জপ করা আর নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করা। জপ ধ্যান করার সাথে সাথে যদি নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করা হয়, শাস্ত্রের কিছু স্তোত্র বা স্তব যদি আবৃত্তি না করা হয়, মন কোন দিনই নিয়ন্ত্রিত হবে না, মন সব সময়ই চঞ্চল থেকে যাবে। বহিরঙ্গের সাধন অর্থাৎ যম আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনে। আর নিয়ম ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। আপনি ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন, বাইরে কারুর সঙ্গে মেলামেশা করেন না, নিয়ম অনুশীলন না করা থাকলে আপনার মনের ভেতরে চাঞ্চল্য তৈরী হবে। বড় বড় যোগী বা সাধকদেরও এই সমস্যা হয়। থেকে থেকে কোন কারণ নেই মনটা চঞ্চল হয়ে যায়। যম ও নিয়ম ভালোভাবে অনুশীলন করা থাকলে এই ধরনের মনের চাঞ্চল্য ভাবটা কমে যায়। যারা মনে করেন যে আমরা ভালো জীবন যাপন করতে চাই, তাহলে তাদের দিনপঞ্জীকে এভাবে সাজাতে হবে – সকালে যত তাড়াতাড়ি পারলেন ঘুম থেকে উঠে স্নান করে গীতা এক অধ্যায় পাঠ করলেন কিংবা চণ্ডী এক অধ্যায় পড়লেন বা রামায়ণ পড়লেন, কিংবা হনুমান চালিশা পাঠ করলেন, বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন প্রথা আছে, তবে যাই প্রথা হোক না কেন যেটা করবেন প্রত্যেক দিন নিয়মিত ভাবে করে যেতে হবে। এটাই স্বাধ্যায়, আরেকটি স্বাধ্যায় জপ, যত পারা যায় জপ করে যেতে হয়। স্বাধ্যায় এমন একটা জিনিষ যেটা আমাদের সবার জন্যই খুব দরকার।

শেষে আসছে ঈশ্বরপ্রণিধান। ঈশ্বরপ্রণিধান মানে ঈশ্বরে পুরোপুরি মনকে লাগানো, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না। এর জন্য নিয়মিত ভগবানের পূজা, ভগবানের কোন বিগ্রহ বা পটে নিয়মিত পূজা-অর্চনা করা আর সব সময় ঈশ্বরের উপর কায়িক, মানসিক ও বাচিক দ্বারা কৃত সব কর্মের ফল সমর্পিত করা। এখানে মনে রাখতে হবে যোগের ঈশ্বর কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর নন। যোগের ঈশ্বরকে বলছেন তিনি গুরুরও গুরু। কিন্তু সেখানেও বলছেন এই ঈশ্বরেই প্রণিধান যদি হয়, এই ঈশ্বরেই যদি মন পুরোপুরি দেওয়া হয় তখন এটাই যোগের নিয়মের মধ্যে পড়ে যায়। যদিও যোগে প্রথমের দিকে দেখানো হয় যে যোগে ঈশ্বরের তেমন কোন ভূমিকা নেই, কিন্তু যোগ সাধনায় যম আর নিয়ম সবারই জন্য বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক দশটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম হল এই ঈশ্বরপ্রণিধান। বাকি নটি হয়ে গেলে আসে ঈশ্বরপ্রণিধান। কারণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যাই হোক, তাকে আপনি ঈশ্বরই বলুন, আত্মাই বলুন আর পুরুষই বলুন, এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে যদি মনের মধ্যে সব সময় জাগিয়ে না রাখা হয়, তাহলে একটু পরে পরেই আপনার স্বভাবই আপনাকে প্রকৃতির এলাকার মধ্যে টেনে নিয়ে আসবে। প্রকৃতির এলাকা থেকে বাঁচার একটাই পথ সব সময় ঈশ্বরে মন রাখা। সংসারে যা কিছু হচ্ছে সবই প্রকৃতির এলাকার মধ্যেই হচ্ছে। সেইজন্য যতটুকু করার করে দিয়ে কেবল ঈশ্বরে মন রাখা।

এর পরের সূত্রে বলছেন – **বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।।৩৩।।** যোগ সাধনায় আমাদের মনে নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা এসে যোগের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে, এগুলোই যোগবিঘ্ন। যোগবিঘ্ন মানে, যে বিঘ্নগুলি আমাদের মনকে যোগ থেকে সরিয়ে মনকে চঞ্চল করে দেয়। এই বাধাগুলিকে আটকাতে হবে। এখন এই বাধাগুলিকে কিভাবে আটকাতে হবে? বলছেন – **প্রতিপক্ষভাবনম্**, অর্থাৎ মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলো বিঘ্ন সৃষ্টি করছে সেই ভাবনার বিপরীত ভাবনার অনুশীলন করতে বলা হচ্ছে।

যেমন কারুর মধ্যে রেগে যাওয়ার স্বভাব আছে, ক্রোধ হওয়া মানে যোগ সাধনার জন্য একটি বড় বিঘ্ন। যোগীদের একটা বড় বিঘ্ন হল এই রাগ। আবার আসক্তি সেটাও বিরাট বড় বিঘ্ন। টাকা-পয়সার প্রতি, নারীর প্রতি, নারীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, এগুলোও বড় বিঘ্ন। এগুলোকে আটকাবার জন্য বলছেন, *বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্*, মনে যে ভাবটা আসছে তার উল্টোটা ভাব। যেমন ঠাকুর বলছেন নারী শরীরে কী আছে একবার ভেবে দেখ। মানুষ মাদ্রেই নারী শরীরের প্রতি আসক্ত, কিন্তু এই শরীরে কী আছে ভাবো, দেখবে হাড়, মাংস, মজ্জা, রক্ত, মূত্র, কফ এছাড়া আর কিছু নেই। এটাই প্রতিপক্ষ ভাবনা। যে বৃত্তিটা আমাদের যোগ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তার ঠিক উল্টো বৃত্তিকে মনের মধ্যে এনে সেটাকে নিয়ে ভাবতে হবে। যেমন আমার মধ্যে কারুর প্রতি প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধের বৃত্তি এসেছে তখন আমি যাকে খুব ভালোবাসি তার কথা ভাবতে হয়। তার মানে ভালোবাসার, প্রেমের ভাব দিয়ে ক্রোধ বিঘ্নকে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, রাগ ক্রোধ যা কিছু হয় এগুলো বাইরে কিছু হয় না, সব সময় আমাদের ভেতরেই হয়। মনের ভেতরেই যদি হয়ে থাকে তাহলে মনের মধ্যে এর বিপরীত কোন কিছু করলেই হয়ে গেল। আমাদের সবারই জীবনে কেউ না কেউ আছে যাকে আমরা প্রচণ্ড ভালোবাসি।

এখানে আমরা যোগীর কথা বলছি, সাধারণ মানুষ বৃত্তির সঙ্গে সব সময় নিজেকে এক করে রেখেছে, এদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, এরা এখনও পশুর স্তরে। কিন্তু যাঁরা যোগ পথে এসেছেন তাঁদের মনের উপর একটু নিয়ন্ত্রণ থাকে, যার জন্য তাঁরা যখন দেখেন কারুর প্রতি তাঁর মনে রাগ বা ক্রোধ বৃত্তির উদয় হয়েছে তখন তাঁরা সেই মানুষটির কথা ভাবতে শুরু করেন যাকে তিনি খুব ভালোবাসেন। তখন ক্রোধ বৃত্তিটা আস্তে করে প্রশমিত হয়ে যায়। পদার্থ বিজ্ঞানে বলা হয় যখন কোন তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তখন ওই তরঙ্গকে নাশ করতে হলে তারই একটা বিপরীত তরঙ্গ পাঠাতে হবে। বিপরীত তরঙ্গ পাঠালে দেখা যাবে আগের তরঙ্গ উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর বিপরীত তরঙ্গ নীচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মাঝখান থেকে দুটো তরঙ্গই সমান হয়ে নিউট্রাল হয়ে যাবে। কোন কারণে যদি দেখা যায় কারুর মধ্যে হতাশার ভাব চলছে তখন এমন কিছুর দিকে তার মনকে নিয়ে যেতে হবে যেটার কথা ভাবলে তার হতাশার ভাবটা কেটে যাবে। এই কারণে রাজযোগ কখনই সবার জন্য এক ধরনের নিয়ম বেঁধে দেয় না, কেননা এক জনের ক্ষেত্রে যেটা বিতর্ক সেটা অন্যের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। সেইজন্য দেখে নিতে হয় কোন কোন অবস্থা ও পরিস্থিতি তার জীবনের পক্ষে আনন্দদায়ক, তার জীবনের খুব সুন্দর, খুব প্রিয় জিনিষগুলি কি। যদি দেখেন আপনার মনের মধ্যে বিমর্ষ ভাব আসছে তখন সেই ঘটনা বা বস্তুকে আপনি ভাবতে থাকুন যেটা আপনার খুব আনন্দদায়ক ও প্রেরণাদায়ক। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে সব হতাশার ভাব সরে গিয়ে আপনার মনটা শান্ত হয়ে গেছে। মনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধ আসছে তখন যার প্রতি খুব ভালোবাসা আছে তার কথা ভাবতে হবে, তার কথা চিন্তা করতে থাকলে আস্তে আস্তে ক্রোধ বৃত্তিটা চলে যাবে। ঠিক তেমনি যদি কারুর বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি খুব আসক্তি আছে, এই আসক্তিই এক ধরনের অপবিত্র বৃত্তি, এই ধরনের বৃত্তিকে আটকানো যেতে পারে কেবল শুধু পবিত্র চিন্তার দ্বারা। তখন কোন পবিত্র কিছুর চিন্তা করতে হবে। আমাদের কাছে পবিত্রতা হল যেমন গঙ্গা স্নান করা, ঠাকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। আর শ্রীশ্রীমা হলেন পবিত্রতাস্বরূপিনী, যদি সেই সময় মনকে একমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের ওপরে ফেলে রাখা যায় তখন ধীরে ধীরে মনের ঐ অপবিত্র ভাবটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন আপনি বলতে পারেন যে – ওঃ ঐ সময় অনেক চেষ্টা করে দেখেছি কিছুই হয় না। শুধু আপনারই নয়, অনেকেরই হয় না। কেন হয় না? কারণ তার যম ও নিয়ম ঠিক মত অনুশীলন করা হয়নি। এই *বিতর্কবাধন* তখনই কার্যকর হবে যখন যম ও নিয়ম ঠিক ঠিক অনুশীলন করে আসবে।

সবাইকেই কিছু কিছু অতীতের ভালো ও আনন্দদায়ক ঘটনাকে স্মৃতিতে রেখে দিতে হয়, যখনই কোন নেতিবাচক চিন্তা আসতে থাকে তখন ওই স্মৃতি গুলিকে সামনে এনে নেতিবাচক ভাবটাকে আটকে দিতে হয়। এটাও সব সময় খেয়াল রাখতে হবে মনে যেন কখনই নেতিবাচক ভাবের উদয় না হয়। স্বামীজী খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলছেন – মা তার স্বামীর উপরে প্রচণ্ড রেগে আছেন, এম্পার কি

ওস্পার হয়ে যাবে। আর সেই সময় তার ছোট্ট শিশুটি এসে মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, দেখা গেলো মার ক্রোধটা গলে জল হয়ে গেল। কি করে হল? ক্রোধ বৃত্তি এসেছিল, সেখানে ভালোবাসার বৃত্তি এসে ক্রোধ বৃত্তিটাকে ব্যর্থ করে দিল।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য মনকে কোন ভাবেই চঞ্চল হতে না দেওয়া। বিতর্ক হল বিদ্ব, যেগুলো মনকে চঞ্চল করে দেয়। বিতর্ক কোনগুলো? সেটাই পরের একটি বড় সূত্রে বলছেন –

**বিতর্কী হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা
দুঃখজ্ঞানান্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৪॥**

যমে যে পাঁচটি ব্রতের কথা বলা হয়েছে তার বিপরীত যা কিছু হবে সবটাই সমাজের পক্ষে পাপ বা নিন্দনীয় কাজ রূপে গণ্য করা হয়। যেমন অহিংসা, অহিংসার বিপরীত হিংসা, সত্যের বিপরীতে অসত্য, অস্ত্রের উল্টো চুরি বা লোভ, ব্রহ্মচার্যের উল্টো অব্রহ্মচার্য আর অপরিগ্রহের উল্টো পরিগ্রহ। এগুলোই প্রধান বিতর্ক। এর আগে বলেছিলেন এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহব্রতম্ - যমের পাঁচটি ব্রতকে বলা হয় মহাব্রত। শুধু যোগশাস্ত্রের জন্যই মহাব্রত নয়, যে কোন জাতির জন্য, যে কোন দেশের জন্য আর যে কোন সময়ে এগুলো সব সময় মহাব্রত। আর এগুলোর বিপরীত হলে মহাব্রত থেকে হয়ে যাবে মহা অব্রত। যখনই হিংসা বৃত্তি আসছে তখন এই হিংসা আবার লোভকেও নিয়ে আসে, ঘৃণাও এক ধরনের হিংসা। কারুর নামে যখন কেউ নিন্দা করছে তখন তার মনে কোথাও লুকিয়ে আছে ওর এই হোক সেই হোক, তাই অপরের নিন্দা করাও প্রত্যক্ষ ভাবে হিংসার সঙ্গে যুক্ত। একটা শব্দ ‘হিংসা’ বলে দিয়েছে, এখন এই শব্দকেই বিচার করতে করতে, ভাঙতে ভাঙতে দেখা যাবে অনেক কিছুই এই হিংসা বৃত্তির সাথে জড়িয়ে রয়েছে। সত্যকেও যদি বিশ্লেষণ করা হয় তখন দেখা যাবে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কত ভাবে যে আমরা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি, কত ভাবে যে মিথ্যার আশ্রয় নিই, অসৎ আচরণ করি কল্পনাও করতে পারব না। যদি নিজেই নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কত কিছুতে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মিথ্যার সাথে যুক্ত থাকি যে অবাধ হয়ে যেতে হয়, বিশেষ করে মানসিক দিক থেকে। ব্রহ্মচার্যতেও একই জিনিষ দেখতে পাওয়া যাবে। ঠাকুর বলছেন – সন্ন্যাসী যুবতী মেয়ের ছবি পর্যন্ত দেখবে না। আমরা কি স্তরে যে অব্রহ্মচার্যকে আদর করে যাচ্ছি ভাবলে শিউড়ে উঠতে হবে। ভাগবতে এক জায়গায় খুব সুন্দর বর্ণনা আছে যেখানে বলছেন, ব্রহ্মচার্যের সঙ্গে মানুষ কত রকম ভাবে আপোশ করে চলে। একা একা কারুর সাথে কথা বলা, কিংবা নিজেই একা একা চিন্তা করা, লুকিয়ে চুপি চুপি কথা বলা, যার প্রতি দুর্বলতা আছে তার কোন জিনিষ কাছে রেখে দেওয়া, এগুলো সবই অব্রহ্মচার্য। বৃদ্ধ হোক, নপুংসক হোক, অব্রহ্মচার্য থেকে কারুর রেহাই নেই, সবারই মাথায় এই পোকা বসে আছে। তাদের বাইরের ইন্দ্রিয় অক্ষম বা দুর্বল হয় যেতে পারে, কিন্তু এখানে বাইরের ইন্দ্রিয়ের কোন ভূমিকাই নেই, সেই মস্তিষ্কের স্নায়ুতে যে ইন্দ্রিয়টা রয়েছে সেইখানে অব্রহ্মচার্যের পোকা কিলবিল করছে, ওখান থেকেই যে মুহূর্তে সে সুযোগ পাবে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাই একে উৎস থেকেই নাশ করতে হবে।

এখানে বলছেন বিতর্ক তিনটি আকারে হয় – কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। কৃত মানে নিজে করেছে, কারিত মানে করিয়েছে আর অনুমোদিত হল আমি নিজে করিনি কিন্তু অনুমোদন করেছি। কেউ নিজে খুন করেছে, না কাউকে দিয়ে খুন করিয়েছে অথবা অনুমোদন করেছে – রাজযোগের তত্ত্বে সবাই একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে। দেশের বর্তমান আইনের পরিকাঠামোতে এই তিনটির মধ্যে অপরাধের মাত্রা আর তার দণ্ড বিধানে অনেক তারতম্য থাকবে কিন্তু যোগে এই তিনটিই সমান অপরাধ, কোন তারতম্য নেই। এর সঙ্গে যেটা আসছে তা হল লোভক্রোধমোহপূর্বকা, যে তিনটে আকারের কথা বলা হল, এই তিনটির আবার উৎস হল এই তিনটি – লোভ, মোহ ও ক্রোধ। লোভের বশবর্তী হয়ে যদি নিজে কিছু করি, মোহে পড়ে যদি করি আর ক্রোধে যদি করি বা কাউকে দিয়ে যদি করাই বা করার জন্য যদি অনুমোদন করি তাহলে তিনটে ক্ষেত্রেই সমান পাপ হবে। মোহ মানে, আমি ঠিক জানিনা ভালো হবে না খারাপ হবে, এই অজ্ঞানবশতঃ যদি করি, কাউকে দিয়ে করাচ্ছি এটাও কিন্তু

পাপ। লোভ, মোহ আর ক্রোধের জন্য কি কি করছি? মিথ্যা কথা বলছি, হিংসা করছি ও চুরি করছি। এগুলোই বিতর্ক, যা মানুষকে যোগ পথ থেকে সরিয়ে দেয়। আমি হয়তো নিজে চুরি করছি না কিন্তু অপরকে দিয়ে চুরি করাচ্ছি। কেন করাচ্ছি? আমার মধ্যে লোভ এসেছে, কিংবা আমি খুব রেগে গিয়ে একজনকে শেষ করে দিতে চাইছি, কিন্তু নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই আবার ভয়ও আছে তখন অপরকে দিয়ে তার ক্ষতি করিয়ে দিচ্ছি। রাজযোগের দৃষ্টিতে এরা সবাই সমান অপরাধী। সেইজন্য কোন অবস্থায় এই পাঁচটা জিনিষ করতে নেই।

তারপরে বলছেন - *মৃদুমধ্যাধিমাত্রা* – মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রা – কম, মাঝারি ও বেশি। আমি এক কোটির জায়গায় দশটি টাকা চুরি করেছি, কিংবা দশ হাজার টাকা চুরি করেছি, রাজযোগে তিনটে ক্ষেত্রে তিনটেই সমান অপরাধ। হয়তো রাগের মাথায় আমি কাউকে দুটো কটু কথা শুনিয়ে দিলাম, বা একটা চড় মারলাম বা তার মাথাটা ফাটিয়ে দিলাম। এই ধরনের মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রায় যেটাই করি না কেন, এর ফল সব সময় আমাকে *দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা*, অনন্ত দুঃখ দেবে নয়তো অনন্ত অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। সেটাই এখানে বলছেন, যে কোন মানুষ হিংসা করুক, সে নিজে করুক বা অপরকে দিয়ে করুক কিংবা শুধু মাত্র অনুমোদন করুক, যার পেছনে লোভ, মোহ ও ক্রোধ আছে, এর ফল কিন্তু সে সব সময় পাবে। কি ফল পাবে? আগামী জন্মে কি তার অশান্তি হবে? তা কখনই নয়, এই জন্মে এখানেই পাবে, আজ হোক কাল হোক দুঃখ তুমি পাবেই, আজ হোক কি কাল হোক তোমার মন অজ্ঞানে আরও ডুবে যাবে। এ হবেই, এর থেকে কখন নিস্তার সে পাবে না, আজ এই ঝামেলা, কাল সেই ঝামেলা, তারপর মাথা খারাপ ইত্যাদি লেগেই থাকবে। যারা সত্যিই খুব ভালো লোক তাদের শরীর খারাপ হতে পারে কিন্তু মানসিক সন্তাপ বা মাথা খারাপ কখনই হয় না। যখনই দেখা যাবে কেউ জীবনে শুধু দুঃখই পাচ্ছে বুঝতে হবে তার প্রচুর গোলমাল আছে। প্রথমে বলেছিলেন যখন সবার সঙ্গে নিজেকে ঘোর আসক্তি নিয়ে জড়িয়ে রেখেছে তখনও দুঃখ পাবে। কিন্তু তারপরের ধাপে যে দুঃখ আসছে তাতে বোঝায় তার গোলমাল আছে। অকারণে যদি দুঃখ আসে তাহলে নিশ্চিত যে সে গোলমালে লোক। আর যদি কোন কিছুকে পরিস্কার ধারণা না করতে পারে, তার মানে সেও গোলমালে।

পাঁচটি যমের কথা বলা হয়েছিল – অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, বলছেন এই পাঁচটার সঙ্গে যদি বিতর্ক করেন – হিংসা, মিথ্যা, চুরি, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ এগুলো যদি কেউ নিজে করে বা অপরকে দিয়ে করায়, কিংবা করার জন্য অনুমোদন করেছে, কম হোক, মাঝারি হোক বা বেশি হোক আর এগুলো লোভে পরে হোক বা মোহে পরে হোক বা ক্রোধে পরে হোক বা অজান্তেই করে এর ফল সর্বদাই অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞান। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, আমি হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু মায়ার জালে ফেঁসে আছি, কিন্তু এই বিতর্কগুলিকে যদি প্রশ্রয় দিই বা নিজে করি বা কাউকে করার জন্য প্রেরণা দিই বা অনুমোদন করি তাহলে মায়ার জালটা আরো ঘন হয়ে গেল। গোলমালটা ছোট করেছিল কি বড় করেছিল এখানে কেউ সেটা দেখতে আসবে না। নিজে করেছিল বা কাউকে দিয়ে করিয়েছিল বা অনুমোদন করেছিল সব ক্ষেত্রে সে সমান ভাবে দায়ী হবে। আমরা মনে করি ধর্মের পথ কত সহজ, কিন্তু অত সহজ নয়। ধর্মের গতি কেন অতি সূক্ষ্ম, এই সূত্রে এসে বোঝা যায়।

সেইজন্য আমাদের সব সময় ভাবতে হবে – আমি যদি ব্রহ্মচর্য পথ থেকে সরে যাই তাহলে তো আমাকে অনন্ত দুঃখ পেতে হবে আমাকে অনন্ত অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ পথ থেকে একবার সরে এলে এরপর সে শুধু সরতেই থাকবে, সাথে সাথে দুঃখ ও অজ্ঞানও সমানুপাতে বাড়তেই থাকবে। আমাদের ভাবতে হবে, আমি যদি সত্য কথা না বলে মিথ্যা বলি, অপরের সাথে দুর্ব্যবহার করি এবং এগুলো করে সাময়িক একটা কিছু লাভ হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু এর জন্য আমাকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে। দুর্ব্যবহারটাও এক ধরনের হিংসা। হিংসা থেকে সব থেকে বেশী দুঃখ জন্ম নেয়। আর অজ্ঞানের জন্যই দুঃখ, দুঃখ মানেই চোখের জল। যারই চোখে জল বুঝবেন তার জীবনে অনেক গোলমাল আছে, থাকতে বাধ্য। এগুলো তো গেলে নেতিবাচক দিক। এর ইতিবাচক দিকটা তাহলে কি হতে পারে?

যম ও নিয়মের ইতিবাচক দিক

ইতিবাচক দিকের কথা বলতে গিয়ে এক এক করে যম ও নিয়মের দশটি ব্রত কিভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলছেন। এগুলো পালন করতে গিয়ে যোগীকে এই জগতের অনেক সুখ ও আনন্দকে বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু তার পরিবর্তে কিছু ভালো জিনিষও যোগীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। যোগী ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পথে এগোচ্ছে কিনা তার মাইলস্টোন হল এই ভালো জিনিষগুলো। প্রথমেই বলছেন – **অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।।৩৫।।** যখন অহিংসাতে কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন তার সামনে কোন রকমের হিংসাত্মক কিছু হবে না। তার সামনে ঝগড়া-ঝাটি করার প্রবৃত্তি কারু মধ্যে আসবে না। এটাই যোগসিদ্ধি। আমরা অনেক কাহিনীতেও পাই, এক মুনির আশ্রম ছিল, সেই মুনির আশ্রমে বাঘ আর হরিণ পাশাপাশি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, কেউ কাউকে হিংসা ও ভয় করত না। আমাদের কাছে এগুলো গালগল্প বলে মনে হতে পারে কিন্তু যোগে এগুলো শুধু কাহিনীই নয়, পুরোপুরি বাস্তব। কেন বাস্তব? যখন কেউ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন তার শরীর মন থেকে যে মৈত্রী তন্মাত্রা গুলো বেরোবে সেগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী তন্মাত্রা হয়ে বেরোবে আর এই মৈত্রী তন্মাত্রা ভালোবাসা ও প্রেমের তন্মাত্রায় একেবারে পরিপূর্ণ। এই ধরনের যোগী যেখানেই থাকবেন সেখানেই ওই তন্মাত্রাটা ছড়িয়ে যাবে, এরপর সেখানে যদি বাঘ আর হরিণ একসাথে জল খেতে আসে, এদের দুজনের মধ্যে যে বৈরী তন্মাত্রা তাতে হিংসা আর ভয়ের তন্মাত্রা অত্যধিক মাত্রায় রয়েছে, এই বৈরী তন্মাত্রাকে যোগীর মৈত্রী তন্মাত্রা দুর্বল করে দেবে। কোন দম্পতি যদি সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চেষ্টামেচি করে থাকে, তাদের কোন সাধুর কাছে নিয়ে গেলে দুজনের মনটাই শান্ত হয়ে যাবে। সেখানেও যদি তারা চেষ্টামেচি করতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সাধুর যোগশক্তি কম। সাধু যদি অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাহলে তার সামনে বসে কেউ কোন ঝগড়া বিবাদ করতে পারবে না, সাপও তাঁর সামনে কেঁচো হয়ে থাকবে। যদি কম প্রতিষ্ঠিত হন তাহলে অপরের মনটাও কম বৈরী শূন্য হবে। কিন্তু মন তার শান্ত হয়ে যেতে বাধ্য। এগুলো যে সন্ন্যাসীর গেরুয়া দেখে, সাধুর সৌম্য চেহারা দেখে হচ্ছে তা নয়, তাঁর উপস্থিতিটাই এমন যে তিনি যে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেই সবারই মন শান্ত হয়ে যেতে বাধ্য। এগুলোর দ্বারাই বোঝা যায় যোগী সত্যি সত্যি অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত কিনা।

জিম করবেটের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে – রুদ্রপ্রয়াগের মানুষকে চিতাবাঘ। এই মানুষকে চিতাবাঘ কম করে প্রায় পাঁচশ লোককে মেরেছিল। বাঘটাকে তাড়া করে করে একটা অঞ্চলের মধ্যে ওর চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চল দিয়ে জনা পঞ্চাশেক লোক বদীনাথের দিকে যাচ্ছে, রাত হয়ে যাওয়ায় তারা এখানেই কোন একটা জায়গায় মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে আছে। ওদের মধ্যে একজন মহিলা, পাশের গ্রাম থেকে এসেছিল। মানুষকে চিতাবাঘের কথা শোনার পর থেকে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। তার আর ঘুমই আসছে না। বাকি সব যাত্রীরা বলল যে আমরা পঞ্চাশ জন লোক এখানে আছি চিতা এসে কিছু করতে পারবে না। মহিলাটি তবুও ভয় কিছুতেই কাটাতে পারছে না। তখন সবাই বলল যে ঠিক আছে আমাদের সবার শেষ প্রান্তে মহিলার বিছানা করা হোক। চিতা যদি আসে মহিলাকে আক্রমণ করার আগে চিতাকে তো এই পঞ্চাশ জনকে টপকাতে হবে। মহিলা নিরুপায় হয়ে কোন রকমে রাজী হয়ে গেছে। রাত্রিবেলা ওই চিতা এসেছে, ওই পঞ্চাশটি লোককে টপকেছে, তাদের ওপর দিয়ে গিয়ে ওই মহিলাকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। মহিলাকে যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কেউ কোন টেরই পেলো না। সকালে যখন পূজারী এসেছে দেখে ওই মহিলা নেই। তখন খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। মহিলার শরীরের কয়েকটা অঙ্গ আর শাড়িটা এক জায়গায় পড়ে থাকতে সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। জিম করবেট এখানে খুব দারুণ একটা কথা বলছেন। চিতা বাঘের যদি খিদেটাই ব্যাপার থাকত তাহলে যে কোন একজনকে তুলে নিলেই খিদে মিটিয়ে নিতে পারত। পঞ্চাশ জনকে টপকে যাওয়া চারটি খানি কথা না, আর যে ভয় পেয়েছিল তাকেই গিয়ে ধরল। তিনি এই কথা বলে শেষ করছেন – Is it some way that the fear of that lady was transmitted to the leopard, who came and took her. এটা সত্যিই এক

রহস্য। জিম করবেট এই জিনিষ গুলো জানতেন তাই যখনই এই ধরনের কিছু ঘটনা তিনি দেখতেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখাতে উল্লেখ করে দিতেন। ওই মহিলা ভয়ের তন্মাত্রাকে ছাড়ছিল, ওই তন্মাত্রা চিতার মধ্যে সঞ্চারিত হতে চিতা এসে ঠিক ওই মহিলাকেই তুলে নিয়ে গেল।

গৌহাটি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের শিষ্য, এক সময়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক সময় তাঁকে বোমা, গুলি, বন্দুক প্রচুর ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর তিনি খুব শান্ত স্বভাবের হয়ে যান, আর তার মিষ্ট স্বভাবের জন্য সবারই খুব প্রিয় ছিলেন। গৌহাটির অধ্যক্ষ থাকাকালীন একবার উনি ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন। ডাকাতি করার জন্য সেই ট্রেনে এক দল ডাকাত উঠেছে। মহারাজ খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন, আশ্রমের কাজের জন্য বেশ কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন। ভাবছেন টাকাগুলোকে কিভাবে লুকোবেন। ডাকাতরা ওনার কাছে এসে বলছে ‘বাবাজী আপনার ভয় টয়ের কিছু নেই, আপনাকে আমরা ছেঁব না’। ডাকাত গুলো ডাকাতি করে যখন ট্রেন থেকে নেমে যাবে তখন ওদের সবাই মহারাজকে প্রণাম করে ট্রেন থেকে নেমে গেল।

অঙ্গুলীমালের গল্পেও ঠিক এই জিনিষই পাই। দৌড়ে এসেছে ভগবান বুদ্ধকে মারবে বলে। বুদ্ধকে দেখেই সে ভেঙ্গে পড়ল আর তার তরোয়াল হাত থেকে খসে পড়ে গেল। এই জিনিষ হতে বাধ্য, এই রকম যদি না হত তাহলে রাজযোগের দর্শন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যেত। যারা কিছু মাত্র অহিংসা অভ্যাস করেন তাদের কাছে বাঘ আর ছাগল হয়তো শান্ত হয়ে নাও বসে থাকতে পারে, কিন্তু দেখা যায় তাদের কাছে গেলে মানুষের মনটা আপনা আপনি শান্ত হয়ে যায় আর তাদের সামনে বেশি ঝগড়া-ঝাটিও হয় না বা কারুর ঝগড়া করার ইচ্ছেটাই হবে না। চেরাপুঞ্জীর কাছে একটা পাহাড়ী উপজাতি আছে যারা কুকুরের মাংস খায়। ওই ট্রাইবদের থেকে কেউ যদি চেরাপুঞ্জীতে বা শিলং এ আসত, তাকে দেখলেই রাষ্টার সমস্ত কুকুর গুলো তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করত। শিলংয়ের এক মহারাজ বলতেন – আমরা কুকুরের আওয়াজ শুনেই বুঝে যেতাম যে ওই ট্রাইবদের থেকে কেউ এখানে এসেছে। এখন কুকুরগুলো জানে কি করে যে এই লোকটা কুকুর খায় আর এ তাদের ধরতে পারে? কিছুই না, কুকুরের মধ্যেও সেই তন্মাত্রার খেলা চলছে।

কুকুর আর বানরের মধ্যে দেখা হলেই মারামারি হবে। একজন মহারাজ ছিলেন তার দুটো কুকুর ছিল। আর উনি যেখানে ছিলেন সেখানে অনেক বানরও ছিল। কোথা থেকে একটা বানর ওখানে এসে পড়ে, পরে কিছুদিন বাদে দেখা গেল বানরটা কুকুরের গায়ের উপরে শুয়ে থাকত। এগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু রাজযোগে বলছে এগুলো সম্ভব, যখন মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যায় তখন আগেকার তন্মাত্রা বন্ধ হয়ে অন্য ধরনের তন্মাত্রার বিকিরণ হতে থাকে।

এরপরে বলছেন – **সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়তুম্।।৩৬।।** যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, মনেও যাঁর মিথ্যা কথা ওঠে না তখন তার **ক্রিয়াফলাশ্রয়** হয়ে যায়। **ক্রিয়াফলাশ্রয়ের** অর্থ হচ্ছে, কোন কাজ না করেও যদি সেই কাজের ফল আকাজক্ষা করেন তিনি সেই কর্মের ফলটা পেয়ে যান। সত্যে প্রতিষ্ঠিত কোন যোগী গ্রামে ভিক্ষা করতে গেছেন, একজন মহিলা এসে তাঁকে সম্মান দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভিক্ষা দিলেন। যোগী সেই মহিলার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে আশীর্বাদ করলেন ‘পুত্রবতী ভব’। এখন সেই মহিলার যদি স্বামী মরে গিয়ে থাকে, কিংবা সে যদি বন্ধ্যা নারীও হয় তার সন্তান হবেই হবে। কেন? **ক্রিয়াফলাশ্রয়তুম্।** একটা ক্রিয়া করলে যে ফল হয়, সেই ফলটা তাঁকে আশ্রয় করে নেয়। আশ্রয় করে নেয় মানে? তিনি যেটা বলে দেবেন সেটা হবেই হবে, যেভাবেই হোক না কেন সেটা ফলবেই ফলবে। যোগীরা যেটা একবার বলে দেবেন, সেটা যদি অসম্ভবও হয়, কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে। যিশু ল্যাজারাসকে গিয়ে বলছেন ‘ল্যাজারাস, তুমি উঠে এসো’। ল্যাজারাস মৃত, কিন্তু সে যিশুর আহ্বান শোনা মাত্র কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে দিল। সত্যিকারের মহাত্মা যাঁরা হন তাঁরা কিছু বলে দিলে সেটা হবেই হবে, তাঁরা হলেন প্রকৃতিরও ওপরে। জীবন ও মৃত্যু এগুলো প্রকৃতির ব্যাপার, এখন তিনি প্রকৃতির মালিক, তিনি যদি মরা লোককেও বলেন উঠে দাঁড়াও, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য। তবে সত্যিকারের মহাত্মারা প্রকৃতির নিয়মে কখন হস্তক্ষেপ করতে চান না।

কিন্তু তাঁরা ইচ্ছে করলে জগতের হিতের জন্য প্রকৃতির নিয়মে হস্তক্ষেপ করে নিয়মকে পাল্টে দিয়ে অনেক কিছু করে দিতে পারেন। নিজের স্বার্থের জন্য এনারা কিছু করতে যাবেন না, যা কিছুই করবেন জগতের সবার মঙ্গলের জন্যই করবেন।

অনেক আগে মঠে একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন। অল্প বয়সী ব্রহ্মচারীরা ওনার সাথে সব সময় খুব হাসিমুখে করে আনন্দ করত। যোগের এই সূত্রকে আধার করে ব্রহ্মচারীরা একদিন মজা করে মহারাজকে বলছে ‘মহারাজ! আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায়, আর আজকেই যেন দর্শন হয়’। মহারাজ বলছেন ‘তা কি করে হবে’! ‘কেন হবে না! আপনি এত দিনের সাধু, আর যোগে বলছে *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়তুম্*, তা এত দিনে আপনি সত্যে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত। আপনি যেটা বলে দেবেন কাজ না করেই তার ফল পেয়ে যাবে, আপনি আশীর্বাদ করলেই তো আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাবে। আর আমাদের যদি ঈশ্বর দর্শন না হয় তাহলে আমরা আপনার সত্যকে নিয়ে সন্দেহ করবো’। যদিও মজা করার জন্য বলা, কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যোগীরা যদি কাউকে বলে দেন তোমার এই রকমটি হবে, তার কিন্তু সেই রকমটিই হতে দেখা যায়। এর মধ্যে আরেকটা ব্যাপার হল, যদি কোন কারণে কারুর দৈব বাধা হয়ে থাকে, মানে সে অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু দৈব তার বাধা হয়ে আছে, যোগীদের কথাতে ওই দৈব বাধাও পুরোপুরি উড়ে যাবে। *ক্রিয়াফলাশ্রয়তুম্*, মানে ক্রিয়া না করেই ক্রিয়ার ফল পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ ক্রিয়ার যে ফল হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত যোগীকে সব সময় সেই ফল আশ্রয় করে থাকে।

তারপরে আছে – *অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্।।৩৭।।* যদি অস্তেয়তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সে যে কোন ধনরত্ন ইচ্ছামাত্রই পেয়ে যাবেন। নিজে থেকেই সব কিছু এসে যাবে। যোগীরা সেই কারণে কখন টাকা টাকা করে অস্তির হন না, কারণ যোগী তো নিজে জানেন আমি কখন চুরি করি না, তাই টাকা পয়সা যা দরকার তা নিজে থেকেই এসে হাজির হয়ে যাবে, তার জন্য তাঁকে কোন চেষ্টাদি করতে হয় না। তিনি যদি চান একটা মন্দির করব, তখন কোথা থেকে টাকা পয়সা চলে আসবে টেরই পাওয়া যাবে না। অস্তেয় মানে শুধু চুরি না করাকেই বোঝায় না, লোভ না করাকেও ধরতে হবে। অমুকের গাড়িটা কি সুন্দর, ইস্ আমার যদি এই রকম একটা গাড়ি থাকত, অমুকের বাড়িটা কি ভালো, অমুকের শাড়িটা কি দামী, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে তাহলে কিন্তু আর অস্তেয় হল না, যদিও এখানে চুরি করা হচ্ছে না, কিন্তু অপরের জিনিষ দেখে মনে মনে আকাজ্জা করছে। যার অর্থ হল পুরোপুরি নির্বাসনা থাকতে হবে। এই নির্বাসনা যার এসে যাবে জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ তার পায়ের তলায় এসে লুটাবে। স্বামীজী এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই তোমায় অনুসরণ করিবে, আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে।*

অনেকে বলতে পারেন ‘আমি কিন্তু অস্তেয়তে প্রতিষ্ঠিত আছি। কেননা সত্যিই তো আমরা কি কখন কারুর জিনিষ না বলে নিই? কখনই নিই না, আমাদের ভদ্রতাতেও এই কাজ শোভা পায়না’। কিন্তু ‘আমি চুরি করি না’ এই কথা আমরা কেন বলতে পারবো না? কেননা আমরা এখনও সেই ধরনের কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। মহাভারতে বিশ্বামিত্রের একটা কাহিনী আছে। যখন সারা দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে তখন বিশ্বামিত্রের মত ঋষি খিদের জ্বালায় চণ্ডালের বাড়িতে গিয়ে কুকুরের মাংস চুরি করে খেতে গেছেন। আমরা এখন প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছি, তাই আমাদের চুরি করতে হচ্ছে না। তাই বলে কি আমাদের সব তন্মাত্রা পরিষ্কার হয়ে গেছে? মোটেই না। সময় ও পরিস্থিতির নিরিখে এখনো আমাদের অস্তেয়র পরীক্ষা দিতে হয়নি। সত্যিকারে যোগী যখন হবে তখন তাঁকে প্রকৃতিই অনেক রকম পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারকে বলতে শুনি, ‘আমার তো দরকার নেই আমার বউএর জন্য চুরি করেছি, আমার ছেলের জন্য চুরি করেছি’। কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়লে তখন যদি নিজেকে ঠিক রাখতে পারা যায় তখন বলা যেতে পারে যে আমি চুরি করছি না।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥৩৮॥ ব্রহ্মচর্যে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তার বল আসে। বল মানে এখানে ওজঃ শক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে শক্তির দ্বারা তার আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বগুলি ধারণা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মচর্য অভ্যাসে এই ওজঃ শক্তির বৃদ্ধি হয়। স্বামীজী তাই ব্রহ্মচর্যের ওপরে খুব জোর দিতেন। স্বামীজী নিজেই খুব ওজঃ শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সে সবাই ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারে কিন্তু সেই সময়ে আর ওজঃ হয় না। যখন কাম ও আসক্তির তোড় আসে তখন যদি ব্রহ্মচর্য পালন করা হয় তখনই এই শক্তি ঠিক মত আসে। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আমি যে কোন জিনিষ করে দিতে পারি, পাহাড়কে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারি, সমুদ্রকে শুকিয়ে দিতে পারি, এই বোধটা তাঁর মধ্যে চলে আসে। ঠাকুর বলছেন কামজয়ী পুরুষ কি না করতে পারে। ঠাকুর পাহাড় ভেঙে দেওয়া, সমুদ্র শুকিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন না, কিন্তু বলছেন সে চাইলে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করে নিতে পারে। ঈশ্বর দর্শনই জগতের সব থেকে কঠিন কাজ। বীর্য মানে শক্তি, কিন্তু পরের দিকে শাস্ত্রগুলোতে জৈব বীর্যাদি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বীর্যের আসল অর্থই হল শক্তি। তার নিজের মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস এসে যায় যে জগতের যে কোন কাজ, যে কোন সমস্যাকে সে সমাধান করে দিতে পারবে।

আর হচ্ছে **অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥৩৯॥** যদি কেউ অপরিগ্রহতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে সে তার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা, আগের আগের জন্মে সে কি ধরনের যোনিতে ছিল আর কিভাবে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে সব জেনে যাবে। আমরা কেউই আমাদের পূর্ব জন্মের কথা জানি না, পূর্ব জন্মের কথা না জানার জন্য পূর্ব জন্মে আমাদের বিশ্বাসও নেই। যে যা দিচ্ছে সেটাই হাভাতের মত নিয়ে নিচ্ছি, আমরা তাই অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত নই, অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত না হলে আমরা পূর্ব জন্মের কথা জানবাই কী করে বা পূর্ব জন্ম বলে কিছু আছে কিনা বিশ্বাস হবে কী করে! আমরা নিজেদের পূর্ব জন্মের কথা জানি না, অপরের পূর্ব জন্মের কথা জানি না, তাই আমাদের বিশ্বাসও নেই যে মৃত্যুর পর আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। কিন্তু যেদিন নিজের পূর্ব পূর্ব সব জন্মের কথা জেনে যাব, আমি আগের জন্মে কুকুর বেড়াল ছিলাম, তারও আগে হয়ত সাপ, কেঁচো, বিছে ছিলাম, আবার যখন জন্ম নিতে হবে তখন কোথায় জন্মাব জানি না, এসব ভাবলেই আতঙ্ক লেগে যাবে। তখন বলবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচে, তখন তার মধ্যে সত্যিকারের মুক্তির ইচ্ছা জাগে, আমি এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। মুক্তির ইচ্ছা তখনই জাগবে যখন পুনর্জন্মে বিশ্বাস আসবে, পুনর্জন্মে তখনই বিশ্বাস আসবে যখন আপনি বাস্তবিক দেখবেন – তাইতো! আগের জন্মে আমি একটা শূয়ার হয়ে কাদার মধ্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতাম, তাইতো! আগের জন্মে আমি কুকুর বেড়াল হয়ে ঘুরে বেড়াইতাম! পূর্ব জন্মের কথা তখনই আপনি জানতে পারবেন যখন আপনি অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হবেন। অপরিগ্রহ মানে শুধু মাত্র অপরের থেকে কোন উপহার নিচ্ছি না তা নয়, অপরের থেকে তো কোন কিছু নেওয়া তো চলবেই না তার সাথে আমার জীবন চালাতে যতটুকু দরকার তার বাইরে একটু বাড়তি কিছু নিজের কাছে না রাখা। এই না হলে কারুর পূর্ব জন্মের স্মৃতি ফিরে আসবে না।

যমের এই পাঁচটি ব্রত ঠিকমত অনুশীলন করলে এই ক্ষমতাগুলো যোগীর ভেতরে চলে আসে। অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, মানে সমস্ত ধরনের বৈরীভাব ত্যাগ করে দিল, তার সামনে কেউ আর ঝগড়া-ঝাটি করবে না। যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তখন তাকে আর চিন্তা করতে হবে না যে আমার কাজটা হবে কি হবে না। যদি অস্ত্রের প্রতীকিত হয় তখন যা টাকা পয়সা লাগবে সে যে করেই হোক সব এসে যাবে। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তার মধ্যে শৌর্য, বীর্য, ওজঃ শক্তি চলে আসবে। আর সব শেষে যদি অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হলে কি হবে? নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের সব বৃত্তান্ত জেনে যাবে।

পূর্ব জন্ম বলে কিছু আছে এই কথা আমাদের কাছে কথার কথা মাত্র, এই কথা আমরা বিশ্বাস করি মাত্র কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা আমাদের কারুর নেই। এখন অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব জন্মের কথা জেনে গেলে আমাদের এই জন্ম-মৃত্যু চক্রের হাতে থেকে পালিয়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। আমি আগের জন্মে এই ছিলাম, তার আগের জন্মে এই ছিলাম, ছিঃ ছিঃ এই কুকুর বেড়াল হয়ে

ঘুরেছি, এর পরের জন্মে কি হবে? ভগবান জানেন কি হবে? এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পালাও পালাও ভাবটা এসে যাবে। যদি কেউ খবর পায় যে তার বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, আর দ্রুত গতিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, এখন সে কি ঘরে বসে টিভি দেখবে না ঘর থেকে প্রাণ ছেড়ে পালাবে? একবার জেনে গেল এই এই ধরনের কাণ্ড তার সাথে আগে আগে করা হয়েছে আর ভবিষ্যতেও যে হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তখন এই চক্র থেকে যত তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচতে চাইবে – ‘অনেক হয়েছে বাবা আর নয়, এখান থেকে পালাও পালাও’।

এই হচ্ছে যোগশক্তি। এখন কেউ এসে যদি বলে আমি রাজযোগের যম-নিয়মের দশটি ব্রতের মধ্যে এই কটি ব্রত অনুশীলন করি, তখন আগে দেখতে হবে ওই ব্রত অনুশীলন করলে কি কি যোগশক্তি হয়, এবার ওই যোগশক্তি ওনার এসেছে কিনা দেখলেই বোঝা যাবে তিনি কতটা কি করেন। যোগীরা সব কটি ব্রতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যার জন্য ভগবান শিবকে যোগীশ্বর বা যোগীরাজ বলা হয়, শিব গায়ে ভস্ম আর একটা বাঘের ছাল পড়ে বসে আছেন, কিন্তু তিনি যখন যেটা ইচ্ছা করেন সেটাই হয়ে যায়। *ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ*, অথচ তাঁর স্ত্রী হলেন পার্বতী, আর কুমারসম্ভব বইতে শিব পার্বতীর রতিক্রীড়ার বর্ণনা যেভাবে করা হয়েছে, বর্তমান কালে কোন পর্ণোগ্রাফির লেখকেরও ওই রকম বর্ণনা করার বুকুর পাটা হবে না। অথচ দেখুন তাঁর কিরকম বীর্যলাভ, রাবণ যখন কৈলাসকে তুলতে গেছে তখন শিব পায়ের আংটা দিয়ে একটু চেপে দিতেই রাবণ ছিটকে পড়ে গেল। তার মানেটা কি? বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাথে অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্কই নেই।

স্বামীজী যখন আমেরিকাতে Sisters & Brothers বলে সম্বোধন করলেন তখন সমস্ত লোক সম্মোহিত হয়ে গেল। পরে স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – ওই শব্দের পেছনে অথচ ব্রহ্মচর্য ছিল। সেইজন্য বিশ্বের কোন শক্তি ছিল না যে স্বামীজীর সামনে দাঁড়াবে। স্বামীজী ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হলে কি হবে? *বীর্যলাভঃ*। বীর্যলাভ হলে কি হবে? সিংহ যদি তার সামনে চলে আসে কুকুর হয়ে তার পায়ে পড়ে যাবে। স্বামীজীর জীবনে আলোকপাত করলেই দেখতে পাই, কেউ তাঁর সামনে কখন দাঁড়াতে পারেনি। এটাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিতের লক্ষণ। রাজযোগের এই সূত্রে এসে সব ধরা পড়ে যাবে কে কতখানি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত। শুধু যে রাজযোগের ক্ষেত্রেই এগুলো প্রযোজ্য তা নয়, যারা ভক্তি পথে আছে, যারা বৈষ্ণব তারাও তো অহিংসাকে পরম ধর্ম বলছে, আর সব মেয়ের মধ্যে ভগবতীকে দেখতে বলছে।

এবার নিয়মের পাঁচটি করলে কি কি হয় বলা হচ্ছে। *শৌচাৎ স্বাক্ষজুগুপ্তা পরৈরসংসর্গঃ।।*
৪০।। আধ্যাত্মিক জীবনে সব থেকে বড় বিঘ্ন হল, অপরের দ্রব্য আর অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষণ। বিশেষ করে অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষণ সাধককে একেবারে শেষ করে দেয়। বলছেন শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে *স্বাক্ষজুগুপ্তা*, মানে নিজের শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরের প্রতিও বিতৃষ্ণা এসে যায়। ঠাকুর বলছেন – বেদান্ত সাধনা করার সময় তাঁর এমন পেট খারাপ হয়েছিল যে বার বার পায়খানা যেতে হচ্ছিল। ঠাকুর দেখছেন শরীর থেকে শুধু মলই বেরচ্ছে, বলছেন – ওই দেখে শরীরের প্রতি ঘেন্না এসে গেল। আর *পরৈরসংসর্গঃ*, অন্য কারুর শরীর, সে যেই হোক মা, বাবা, বাচ্চা, নারী যেউ হোক, অপরের শরীরের সংস্পর্শ হলেই ঘেন্নায় দশ হাত ছিটকে যাবে। অপরের শরীরের সংস্পর্শে ঘেন্না এসে গেলে ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করাও অনেক সহজ হয়ে যাবে। শৌচে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা যোগশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধনা। শৌচে প্রতিষ্ঠিত না হলে যোগ সাধনা খুব কঠিন হয়ে যায়। অনেকে অন্তঃশৌচ বলতে মনকে বোঝায়, কিন্তু এখানে মনের কথা বলা হচ্ছে না, শৌচ মানেই অন্তঃশৌচ আর বহিঃশৌচ, বাহ্য আর আন্তর উভয় শৌচের কথা বলা হয়। নিজের শরীরকে পরিষ্কার রাখা, জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা, ঘর-বাড়ি সব ঝকঝকে রাখা। যোগীরা প্রচণ্ড পরিষ্কার হন, তাঁদের জামা কাপড় বেশি থাকে না কিন্তু সব সময় পরিষ্কার আর ফিটফাট থাকেন। ঠিক ঠিক শৌচে প্রতিষ্ঠিত না হলে অনেক সমস্যা আসে, হয়তো কারুর নকুই শতাংশ ঘেন্না ধরে গেছে, কিন্তু একজন বা দুজনের শরীরের প্রতি আকর্ষণ থেকে গেছে, এটাই পরে গিয়ে তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে। তবে যোগীদের কাছে এটা কোন সমস্যা নাও

হতে পারে কেননা যখন তিনি নব্বুই শতাংশ পার করে দিয়েছেন বাকীটাও পার করে দেবেন, তাছাড়া এর সাথে তিনি অন্য যা কিছু অভ্যাস করে চলেছেন সেগুলিও তাঁকে এটুকু থেকে রক্ষা করে দেবে।

তারপরে বলছেন – **সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্বদর্শনযোগ্যত্বানি চ।।৪১।।**
 শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধকের মন খুব গোছাল হয়ে যায়। শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে কি হয় বলতে গিয়ে প্রথমে বললেন তাঁদের অপরের সঙ্গে সংসর্গে আর ইচ্ছে থাকে না এবং নিজের শরীরের প্রতিও আসক্তি চলে যায়। কিন্তু শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বিতীয় আরেকটি মূল্যবান যেটা হয় তা হল তাঁদের সত্ত্বশুদ্ধি হয়ে যায়। সত্ত্ব মানে সত্ত্ব, রজো আর তমো গুণের একটা গুণ কিন্তু সত্ত্বের আরেকটি অর্থ বুদ্ধি। শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হচ্ছে *আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ঋবাসূতিঃ*। আহার, মানে যা কিছু আমাদের ভেতরে আসছে তার সবটাই যখন শুদ্ধ হয়, এটাই শৌচ, তখন সত্ত্বশুদ্ধি হয়। সত্ত্বশুদ্ধি মানে, যেটা বলা হল, বুদ্ধি নির্মল হয়ে যায়। সত্ত্বশুদ্ধি হলে ঋবাসূতি, মানে ঈশ্বরের কথা সব সময় মনে থাকে, গুরুমুখে বা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে যে জ্ঞান হয়েছে সেটা সব সময় স্মৃতিতে জাগরুক হয়ে থাকে। কিন্তু যারা অশুদ্ধ আচরণ করছে, যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে, যার তার ছোঁয়া খেয়ে নিচ্ছে, এদের বুদ্ধি আর নির্মল থাকে না। বুদ্ধি নির্মল না থাকলে স্মৃতিও ঠিক থাকে না। স্মৃতি ঠিক না থাকা মানে, ঈশ্বরীয় কথা মনে থাকবে না, আর শাস্ত্রে যে বাদ-বিচার করা হয়েছে সেগুলোও মনে থাকে না। যার ফলে যখন তখন, যেখানে সেখানে বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক অনেক অনৈতিক কাজ করে বসবে। এর সাথে সাধারণ ভাবে কোন কিছু মনে না থাকার ব্যাপারটাও যোগ হয়। যাদের দেখা যায় কিছু মনে রাখতে পারে না, ভুলভাল আচরণ করে বসে, বুঝতে হবে তার স্মৃতিতে গোলমাল আছে। স্মৃতি গোলমাল মানে বুদ্ধি নির্মল নয়। বুদ্ধিকে যদি নির্মল করতে হয় তাহলে আগে তার আহারকে ঠিক করতে হবে। আহার বলতে শুধু খাবার-দাবার নয়, খাদ্য তো বটেই কিন্তু তার সাথে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে যা কিছু আহরণ করছে, যা কিছু দেখছে, শুনছে, স্পর্শ করছে এর সবগুলোকে ঠিক করতে হবে। শৌচকে খুব স্থূল ভাবে নেওয়া হলে তখন তা হবে রোজ স্নান করা, নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি।

সত্ত্বশুদ্ধি হলে যোগীর মন খুব গোছালো হয় যায়, যোগী যখন একটা কাগজ ভাঁজ করবে তখন তাঁর ওই কাগজ ভাঁজ করা দেখেই বোঝা যাবে তার মন কতটা উন্নত। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ একবার সব ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলছেন ‘আয় তোদের কার কেমন ধ্যান হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি’। তিনি সবাইকে একটা করে খোসা সমেত সেন্দ্র আলু দিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে আনতে বললেন। সবাই ছাড়িয়ে নিয়ে আসার পর একটা আলুকে দেখিয়ে বলছেন ‘এই আলুটা যে ছাড়িয়েছে তার ধ্যান ভালো হয়’। পরবর্তি কালে ওই মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের গুণগত মান মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব ধরনের ব্যবহারিক কর্মকেও সরাসরি প্রভাবিত করবে। আবার যারা যেমন নিষ্ঠা আর গোছান মন নিয়ে দৈনন্দিন কাজ করছে সেটা আবার তাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রভাব ফেলে। যারা খুব সংস্কৃতবান, সম্ভ্রান্ত লোক হন তাঁদের কাজকর্ম খুব পরিচ্ছন্ন ও গোছাল হয়, এত নিখুঁত ভাবে কাজ করেন দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, এঁদের মন আগে থাকতেই উন্নত, আধ্যাত্মিক জীবনে একটু চেষ্টা করলেই এঁরা অনেক এগিয়ে যাবেন। আর যাদের মনের ভেতরটা অগোছাল, অনিয়ন্ত্রিত তাদের বাইরের আচরণেও মনের ভাব ধরা পড়ে যায়, তাদের সব কিছুই অগোছাল হয়। এর কোন ব্যতিক্রম হতেই পারে না। ঠাকুর প্রত্যেকটি জিনিষ কত নিখুঁত ভাবে জায়গায় গুছিয়ে রাখতেন। তিনি নিজেই বলছেন – ‘আমার কোমরের কাপড়ের ঠিক থাকে না, কিন্তু আমারও কোন কিছুতে ভুল হয় না’। তিনি মুহূর্মুহু সমাধিতে চলে যাচ্ছেন কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে তার সব কিছু গোছান থাকত।

এই সূত্রে বলা হচ্ছে যখন কেউ শৌচতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, অর্থাৎ যার মন সুসংগঠিত থাকে তখন তার মধ্যে অন্য অনেক কিছু জিনিষ হতে থাকে। আগে যেমন বলেছিল নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণা এসে যায়, অপরের শরীরকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয় না। এর সাথে আরো যেটা হচ্ছে, তার মন আরো শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়। মন যত শুদ্ধ হতে থাকবে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিকে ধারণা করার ক্ষমতাও প্রচণ্ড

ভাবে বাড়তে থাকবে। তৃতীয় যেটা হয় তা হল, মনের মধ্যে সর্বদা প্রফুল্ল ভাব চলে আসে, কোন অবস্থাতে তার মনে কখনই বিষন্ন, বিমর্ষ, দুঃখ ভাব আসবে না। গোমড়া মুখ হয়ে থাকা মানেই মনের মধ্যে কিছু গোলমাল চলছে। হি হি করে হেসে বেড়াবার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে শব্দটা হল *সৌমনস্য*, যোগীর চেহারায়, চোখে মুখে সব সময় একটা আনন্দের প্রকাশ থাকবে। স্বামীজী এখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – *বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা ভয়ঙ্কর। এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সারাদিন ঘরে কাটাইয়া দাও। সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে?* খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটা ধারণা যে সাধু সন্ন্যাসীরা সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকবে, সাধু সন্ন্যাসীরা হাসাহাসি করবে ওদের চিন্তার বাইরে। স্বামীজীকেও একজন খ্রিষ্টান আপত্তি করে বলেছিল ‘স্বামীজী! আপনি এতো হাসাহাসি করেন কেন? আপনি কি কখন গম্ভীর হতে পারেন না?’ স্বামীজী বলছেন ‘হ্যাঁ গম্ভীর হই, যখন পেটে ব্যাথা হয়’। মুখ ভার করে থাকাটা কখনই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ নয়, আধ্যাত্মিকতার লক্ষণই হল চেহারা দিয়ে সব সময় আনন্দ বিচ্ছুরিত হবে, চোখে মুখে একটা প্রশান্তির ছাপ লেগে থাকবে। শৌচে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত থাকলে চেহারার মধ্যে এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যেখানেই দেখা যাবে কেউ মুখ ভার করে আছে, তখন বুঝবেন সে কোন পাপ গ্রস্থিতে ভুগছে।

ঠাকুর ব্যাকুলতার কথা বলছেন, তিনি নিজেও মা কালীর দর্শন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা বশতঃ যে কান্না আর জাগতিক দুঃখের জন্য যে কান্না এই দুটোতে চেহারার মধ্যে আলাদা ছাপ থাকবে। মানসিক চাপ ও উদ্বেগ থাকলেই চেহারাটা ভারাক্রান্ত দেখাবে, এটা আমরা সবাই জানি। বিষয় বস্তুকে নিয়ে মানুষ যখন খুব বেশী চিন্তা ভাবনা করে, চিন্তা ভাবনা করে যখন দেখে সেটা আর পাওয়ার আশা নেই বা হাত থেকে কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে তখনই তার মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। স্বামীজী এই উদ্বেগকে পাপ বলছেন, স্বামীজী পাপকে এখানে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগের অর্থে নিচ্ছেন। মানুষ যখন সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখনই তার ভেতরে দুঃখ-কষ্টের জন্ম হয়। আর যেখানে পাপবোধ এসে পড়ে তখন তার চেহারায় সেটা পরিষ্কার ধরা পড়ে। যারই মধ্যে মানসিক চাপ আছে, উদ্বেগ আছে, চোখের জল পড়ছে, তাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে হয় – বাপু! তুমি কি পাপ করেছ? তার মনকে বিশ্লেষণ করতে করতে দেখা যাবে ভেতরে তার কিছু একটা পাপ বোধ আছে। পাপ যদি নাও থাকে বুঝতে হবে কোন কিছুর প্রতি তার মোহ তৃষ্ণা আছে। এই মোহ সাধারণ কোন মোহ নয়, অত্যন্ত গভীর মোহ। একটা বাচ্চা তার মায়ের জন্য কাঁদে, তার খেলনার জন্য কাঁদে, তার চোখের জল সাময়িক। একটু অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে দিলে, খেলনা নাও দিলে বাচ্চা কান্না থেকে বেরিয়ে আসে। বড়রা সহজে কান্না থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, কারণ তার মোহটা সহজে মিটেতে চায় না। যে মানুষ শৌচে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, সেতো প্রথমেই এগুলো থেকে বেরিয়ে আসবে। *সৌমনস্য*, মানে তার মন সুন্দর হয়ে যাবে, মনে সব সময় প্রফুল্লতার ভাব থাকবে। তাই বলছেন কোন সাধু বা সাধকের মুখ যদি সব সময় গোমড়া হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে শৌচে প্রতিষ্ঠিত নয়।

শৌচের চতুর্থ লক্ষণ মনের একাগ্রতা। শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে মনের একাগ্রতার মান অনেক বেড়ে যায়। যদি বাইরের কাজে কর্মে মন অগোছাল হয় তাহলে ধ্যান কোন মতেই ভালো হবে না। তারপরে আসছে ‘*একাগ্রেন্দ্রিয়*’, ইন্দ্রিয়গুলো তার সব সংযত হবে। বেশির ভাগ লোক যখন কোন কাজ নেই চুপচাপ বসে আছে, দেখা যাবে বসে বসে হয় হাত নাড়ছে, নয় পা নাচাচ্ছে, আর তা নাহলে নখ খুটছে। আর নয়তো হঠাৎ করে বলবে এই চল বেড়িয়ে আসি, এই চল সিনেমা দেখি, মানে তার ইন্দ্রিয়গুলো একেবারেই বশে নেই। ইন্দ্রিয়গুলো যার বশে থাকবে তখনই সে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য প্রস্তুত বুঝতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখা, মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির একটাই পথ, শৌচকে ঠিক করা। যোগের উদ্দেশ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা। যত আলোচনা চলছে তাতে শুধু বলছেন, চিত্তবৃত্তি কীভাবে নিরোধ করতে হবে। এখানে পথগুলো বলে দিচ্ছেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পথ হল শৌচ। শৌচ মানে রোজ স্নান করবে, জামা-কাপড় কাচবে, ঘরদোর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। তবে মনুস্মৃতিতে বলে দিচ্ছে পশমের জামা-কাপড় কখন অশুদ্ধ হয় না। পশমের পোশাক,

লেপ-তোষক রোদে দিলেই শুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধি অশুদ্ধি যাই বলি না কেন, সবটাই আমাদের মনে। সেইজন্য গীতায় ভগবান বলে দিয়েছেন ‘ওঁ তৎ সৎ’ বলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে বা স্পর্শ করে দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। মূল কথা হল মনে যেন কখন কোন অশুদ্ধির ভাব না থাকে। তাই বলে স্নান না করে মাথায় ‘ওঁ তৎ সৎ’ বলে জল ছিটিয়ে দিলেই স্নানের কাজ হয়ে যাবে? কখনই হবে না। এগুলো হল যখন কোন উপায় না থাকে অথচ মনের মধ্যে খুঁতখুঁত লাগছে তখন এভাবে করলে সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। শৌচে প্রতিষ্ঠিত হলে মন স্বাভাবিক ভাবেই একাগ্র হয়। সেইজন্য দেখা যায় স্নানের পর পূজো বা জপ করতে বসলে সহজে মন বসে যায়।

এখন কেউ মনে করতে পারে যারা বড়লোক, সম্ভ্রান্ত পরিবার, তাদের সব কিছুই তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ফিটফাট থাকে, তারা কেন যোগী হয় না। কিন্তু এদের বাড়িতে অনেক বেতনভোগী কাজের লোক থাকে, আর এরাই সব কিছু করে। এদের কাজের লোকদের কয়েক দিনের জন্য যদি ছেড়ে দিয়ে বলা হয় একা থাকতে তখন ধরা পড়ে যাবে এরা কতটা গোছালো আর অগোছালো।

পঞ্চম বলছেন ইন্দ্রিয় জয়। একাগ্রতায় মনকে নিয়ে বলা হয়েছে আর ইন্দ্রিয় জয়ে বলছেন মন ছাড়া বাকি পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব আসে। শৌচ যোগীকে ইন্দ্রিয় জয়ে সাহায্য করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যারা মদ্যপানে আসক্ত, সকালে স্নান করে আসার পর মদ দিলে তারাও পান করবে না। বিদেশেও কেউ সকালে মদ খায় না। মায়েরা যখন বাড়িতে সকালবেলা বিছানা ঝাড়পোছ করেন, জামা-কাপড় পরিপাট করে ভাঁজ করেন তখন তাঁদেরও মন, ইন্দ্রিয় সব গোছাল হয়ে যায়। বরিষ্ঠ মহারাজরা যখন স্নানের পর তারে ধুতি চাদর মেলেন তখন ওই কাপড় মেলাটাও একটা দেখার মত দৃশ্য। চল্লিশ পেরিয়ে গেলে সবারই জীবনটা পুরো অভ্যাসের উপর চলে, প্রথম থেকে যে জিনিষগুলো নিয়মিত করে এসেছে সেগুলোই তখন অভ্যাসে করতে থাকে, এর বাইরে কোনটাই কিছু করতে পারবে না। সেইজন্য ছোট ছোট কাজগুলোকে একটা অভ্যাসে পরিণত করে নিতে হয়, যেমন সুন্দর করে কাপড় ভাঁজ করা, পাট পাট করে বিছানার চাদর পাতা, ঘরদোরের জিনিষগুলো ঠিক জায়গায় সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা ইত্যাদি। জয়রামবাটীতে খাবার জন্য আসন পাতা হয়েছে। শ্রীমা এসে দেখছেন আসন গুলো এক লাইনে সমান ভাবে পাতা হয়নি। দেখে মা খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন। শ্রীমা নিজের সেবককে বলে দিলেন আসন, পাতা, গ্লাশ সব সোজা করে পাততে। সোজা করে যখন রাখা হচ্ছে তখন মনটা সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে। সংগঠিত মন মানে, একাগ্র, ইন্দ্রিয় জয় আর সৌম্যস্যা।

শেষে বলছেন আত্মদর্শনযোগ্যত্বানি। শৌচে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আত্মদর্শন বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে না। আপনি যখন বলছেন আমি যোগ পথে আসতে চাইছি তখন ধরেই নেওয়া হয়েছে জগতে যে সুখ আছে সেখান থেকে আপনি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় হল, এরপর আপনি যতটা ঢালবেন ততটা ফল পাবেন।

স্বামীজী এখানে মনের প্রফুল্লতা নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা তমোগুণপ্রসূত। যার মধ্যে প্রচুর মানসিক সন্তাপ রয়েছে, দুঃখ-কষ্টে যার জীবনটা শুধু বিষন্নতায় ভরে আছে, বুঝতে হবে তমোগুণ তাকে ঘিরে ফেলেছে। যে মানুষ সব সময় আনন্দে আছে, তাই বলে নেশা করে আনন্দে থাকার কথা বলা হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে যে তার তমোগুণ অনেক কমে গেছে। কিছু কিছু লোককে দেখলেই মনে হবে যেন সারাটা জীবন দুঃখের মধ্যেই আছে, কখনই তাদের মুখে প্রসন্ন ভাব দেখা যায় না। বাচ্চারা সব সময় চনমনে, চোখ-মুখ মধ্যে সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকে তত তাদের মধ্যে তমোগুণটা ঢুকতে শুরু করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মনের মধ্যে যখন নানান ধরণের বাসনা, জটিলতা আসতে শুরু হয় তখন তাদের চেহারাটা কখন বিষন্নতায়, কখন বিশাদে ভরে যায়, এগুলো সবই তমোগুণের লক্ষণ। দুঃখের প্রধান উৎস হল পাপবোধ। আমাদের সবারই মধ্যে পাপবোধ আছে। যদি পাপকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তখন পাপকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। একজনের কাছে যেটা পাপ বোধ আর অপরের কাছে সেটা পাপবোধ নাও হতে পারে। পাপ বোধ ব্যক্তি বিশেষে আলাদা আলাদা হতেই পারে। গীতাতে ভগবান বলছেন – *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। শ্রীকৃষ্ণ

যদি কারুর গলা কেটে দেন তাহলে তাঁর কোন পাপবোধ হবে না, কারণ তাঁর পূণ্যবোধ বলেও কিছু নেই। কিন্তু আমাদের সবার মনে পাপ-পুণ্যের বোধ পূর্ণ মাত্রায় আছে। তাই পাপ এমন জিনিস যা ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে তফাৎ হবেই। কারুর নিজস্ব পাপবোধের জায়গাতে যদি হাত পড়ে যায় তখনই তার মনের মধ্যে ওই পাপবোধটা ঘুরপাক খেতে শুরু করবে আর আস্তে আস্তে চেহারার মধ্যে মলিনতার ছাপ আসবে, কারণ তমস এখন তাকে আশ্রয় করে নিয়েছে। সেইজন্য যেটাকে পাপ বলে মনে হবে, কক্ষণ ওই ধরণের কিছুকে প্রশ্রয় দিতে নেই। আর তা যদি না করতে পারে তাহলে তার পাপের পরিভাষাকেই পাল্টে দিতে হবে। যেমন ক্রিমিনালরা তাদের পাপবোধের পরিভাষাটাই পাল্টে দিয়েছে, যার জন্য এত অন্যায় কাজ করার পরেও তাদের মনের মধ্যে কিছু মাত্র অনুতাপ হয় না। সন্তাসবাদীরা এতো লোক খুন করছে, এরা পাপকে নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে নিয়েছে। কিন্তু যার কাছে পাপ কাজ আর পাপবোধের সংজ্ঞা পরিষ্কার, কখনই তাদের ওই ধরণের কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না। আর যে ব্যক্তি চারিদিকেই পাপ দেখতে থাকে তাহলে কোন মহাত্মা বা গুরুজনের সঙ্গে কথা বলে তাকে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, তা নাহলে ওই পাপের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে ঘুরপাক খেতে হবে, যার ফলে জীবনে তার কোন দিন শান্তি আসবে না। জীবনে যদি শান্তি না আসে, হাসি না আসে তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনের রাস্তা চিরতরে বন্ধই থাকবে। স্বামীজী খুব জোর দিয়ে বলছেন বিষণ্ণতা তমোগুণপ্রসূত। তমোগুণকে সরানোর একটাই পথ, মনকে সত্ত্বগুণে রাখা। সত্ত্বগুণ মানেই শৌচ। শৌচ যদি না থাকে কখনই তমোগুণের নাশ হবে না। স্বামীজী এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন সুস্থ, সবল, দৃঢ়, যুবা ও সাহসী না হলে যোগী কোন দিন হতে পারবে না। আমরা মনে করি বুড়ো বয়সে গিয়ে ধর্মকর্ম করবো। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন বয়স কম, সুস্থ শরীর, দৃঢ় আর সাহসীরাই যোগী হবার উপযুক্ত। যত কম বয়সে ধর্ম পথে নামা যায় তত ভালো। ঠাকুরের কাছে কত লোকই তো আসত, কিন্তু তিনি বেছে বেছে শিষ্য করেছেন সব যুবকদের।

তারপর বলছেন – **সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥৪২॥** সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সুখ লাভ হয়ে যায়। আমার কাছে যা আছে, যা নিজে থেকে আসছে সবচেয়েই আমি নিজেকে একটা সন্তুষ্ট ভাবের মধ্যে ধরে রেখেছি। আমাদের শরীর একটা যন্ত্রের মত। যন্ত্রকে যদি ঠিক রাখা হয় তাহলে আমি যা চাইবো যন্ত্র সেই কাজটা করে দেবে। যদি যন্ত্রকে নিজের মত ফেলে রাখা হয় তখন যন্ত্রটাই আমার কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে যাবে। গাড়ির কাজ হল আমাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু গাড়ির দেখাশোনা যদি না করি তাহলে ওই গাড়িকেই রাখায় বার করার পর কিছুক্ষণ পরে পরে আমাকে ঠেলে স্টার্ট দিতে হবে, বালতি করে জল ঢালতে হবে। এই শরীর আমাকে আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। কিছু দিন বেদান্ত চর্চা করে অনেকেই ভাবতে শুরু করে দেন শরীর কিছু না, কিন্তু শরীরটাই সব কিছু। অসুররা মনে করে শরীরটাই সব। সেটাও নয়, শরীরটা আসলে একটা যন্ত্র। টাকা-পয়সাও একটা বিরাট যন্ত্র। যার টাকা নেই সে কেঁদে মরছে। টাকা যদি আপনার মালিক হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনাকে কাঁদিয়ে দেবে। ঠিক তেমনি শরীরটাও যদি আপনার মালিক হয়ে যায় আপনাকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। তেমনি স্ত্রীও একটি যন্ত্র, কিন্তু যদি আপনার মাথায় চড়ে বসে তাহলে আপনার জীবনে শুধু কান্নাই কান্না। শরীর, টাকা, স্ত্রী এরা আপনার আধ্যাত্মিক যাত্রা পথের সহায়ক। এদের থেকে যদি সন্তোষ আসে তাহলেই সুখ আসবে। যদি আপনার কোথাও সুখের অভাব থাকে তাহলে বুঝবেন কোথাও আপনার অসন্তোষ আছে। অসন্তোষ মানে, গীতার ভাষাতে বলা যায় মোহ। মোহ মানে কিছু পেতে চাইছি। মোহ যদি পূর্ণ হয়ে যায় তখন সন্তোষ হয়ে গেল, মোহ যদি অপূর্ণ থাকে তাহলেই অসন্তোষ এসে যাবে। গীতা বার বার বলছেন শোক মোহটাই সংসার। শোক মানে যেটা ছিল সেটা চলে গেছে বা হারিয়ে গেছে, আর একটা জিনিস আমার নেই সেটা পেতে চাইছি, এটাই মোহ। অসন্তোষ মানে আমি যেটা পেতে চাইছি সেটা পাচ্ছি না। কিন্তু একবার যদি মনে সন্তোষ এসে যায় তখন দুঃখ আর কোথা থেকে আসবে! সুখী কে? যে সন্তুষ্ট। তাই বলে কি আমরা কাজ কর্ম করা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবো, কোন চেষ্টা করবো না? অবশ্যই সব কাজকর্ম করতে হবে, পূর্ণদ্যোমে তোমার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সারা মাস কাজ করার পর আমাকে যদি মাইনে না দেয় আমাকে অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতে হবে, আমার প্রাপ্য

আদায় করে নিতে হবে। এখানে অসন্তোষের কিছু নেই। এই প্রতিবাদ করাটা আমার কর্তব্য, আমার অধিকার আছে আমার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার। তারপরে হয়তো জানা গেল এই এই অসুবিধা হওয়ার জন্য এই মাসে মাইনে দেবীতে হবে। তখন আবার প্রতিবাদ করার দরকার হবে না। সুখ যদি চাই তাহলে যা আছে তাতেই সন্তোষ থাকতে হবে। কেউ যদি বদমাইশি করছে বা চালাকি করছে সেটা আলাদা, সেখানে আপত্তি জানাতে হবে। এই আপত্তিটা অসন্তোষের জন্য নয়, ধর্মের জন্য জানানো হচ্ছে, এটা আমার কর্তব্য আমাকে প্রতিবাদ করতে হবে।

এরপর তপস্যার ব্যাপারে বলছেন **কায়েন্দ্ৰিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপস্যঃ।।৪৩।।** তপস্যা করলে আমাদের শরীর আর ইন্দ্ৰিয়ের মধ্যকার মলিনতাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়। শরীর ও ইন্দ্ৰিয়ের অপবিত্রতা গুলি পুড়ে গেলে শরীর ও ইন্দ্ৰিয়গুলি আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে। দর্শন শক্তি আরো তীব্র হয়ে যায়, শ্রবণ শক্তি আরো জোর পেয়ে যায়, দ্রাণ শক্তি আরো বেড়ে যায়। যেমন প্রাণায়ামাদি করলে শরীরের অশুদ্ধিগুলি পরিষ্কার হয়ে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয়। তপস্যা হচ্ছে – যে জিনিষগুলি করব বলে একবার ঠিক করে নেওয়া হল, এবার বাড়িতে আগুন লেগে যাক, ভূমিকম্প হয়ে যাক, বন্যা হয়ে যাক, যাই হয়ে যাক ওগুলোকেই করে যাওয়া। যেমন আমি সকালে উঠে স্নান করব, রোজ পূজা করব, সপ্তাহে এত দিন বা মাসে এই কদিন উপোস করব, এবার এগুলোই নিয়মিত করতে থাকলে ইন্দ্ৰিয় গুলো খুব সতেজ ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এখানে ইন্দ্ৰিয় মানে বাইরের হাত পা চোখ কান নাককে বলছে না, আমাদের মনের মধ্যে যে ইন্দ্ৰিয় গুলো আছে তার কথাই বলা হচ্ছে। যদি শরীরে রোগ ব্যাধি থাকে, ইন্দ্ৰিয় যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, ভেতরে যদি পাপ বোধ থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার তপস্যার অভাব আছে। পাপ বোধ পরিষ্কার কীভাবে করতে হবে বলাটা রাজযোগের কাজ নয়, কিন্তু মনুস্মৃতিতে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে পাপ বোধ থাকলে সেটাকে কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তপস্যা কি, প্রায়শ্চিত্ত কি এগুলো মনুস্মৃতিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তারপরে বলছেন স্বাধ্যায় করলে কি হয় – **স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।।৪৪।।** এখানে স্বাধ্যায় একটি ব্যাপক অর্থে বলা হচ্ছে, স্বাধ্যায়ে জপও আছে আর যার যার নিজের ইষ্ট দেবতার তত্ত্ব ও লীলা বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন। যাঁরা ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা যেমন ঠাকুরের মন্ত্র নিয়মিত জপ করবেন সাথে সাথে কথামৃত, মায়ের কথা, লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজীর রচনাবলীও রোজ পাঠ করতে হবে। এগুলো সব স্বাধ্যায়ের মধ্যে অন্তর্গত। আর তার সঙ্গে বাকি যে শাস্ত্র রয়েছে যেমন গীতা, উপনিষদ, ভাগবত, শ্রীশ্রীচণ্ডী এগুলোরও একটা দুটো করে অধ্যায় নিয়মিত পাঠ করে যেতে হবে। স্বাধ্যায় করলে যার যে ইষ্ট দেবতা, বা যাঁকে নিয়ে সে সাধনা করছে, তাঁর দর্শন হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলতেন গীতার একটা শ্লোককে নিয়ে এক মাস ধরে চিন্তন করে গেলে ওই শ্লোকের ঠিক ঠিক অর্থ ও ভাব মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যাবে। ওই এক মাস অন্য কিছু পড়বে না, আর অন্য কোন কিছু চিন্তাও করবে না, তাহলেই শ্লোক নিজে থেকেই তার অর্থকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে দেবে। ঠিক তেমনি কেউ হয়তো অনেক বছর ধরে গণেশ ঠাকুরের মন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন, তখন গণেশ ঠাকুর তার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করে দেন। এটাই ঠিক ঠিক স্বাধ্যায়। যিনি আত্মানুভূতি পেতে চাইছেন, যাঁরা এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, তখন তাঁর আর দশটা শাস্ত্র পড়তে বা জানতে ইচ্ছে করবেন না। আমি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে চাই, কি করে সম্ভব হবে? সম্ভব করার জন্য একটা উপায়, তা হল এই স্বাধ্যায়। একট মন্ত্রই জপ করে যাবে আর একট বইকেই পারায়ণ করে যেতে হবে। এটাই যখন দীর্ঘকাল ধরে করে যাবে, তখনই মন্ত্র বা শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব বা অর্থ উন্মোচিত হয়ে যাবে।

নিয়মের শৌচ, সন্তোষ, তপঃ আর স্বাধ্যায়ের পর শেষে আসছে ঈশ্বরপ্রণিধান। ঈশ্বরপ্রণিধান মানে ঈশ্বরে মন দেওয়া। ঈশ্বরপ্রণিধান করলে কি হয়, এর গুরুত্ব কি, সেটাই পরের সূত্রে বলছেন। **সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।।৪৫।।** বলছেন – মানুষ যদি আর কোন কিছুর দিকে মন না দিয়ে সব কিছুর ব্যাপারে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে থাকে, সব কিছু যদি ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিয়ে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ

শরণাগত হয়ে যায় তখনই সে সমাধি লাভ করে। এখানে সমাধির অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রিত মন, তার মনে ঈশ্বর বৃত্তি ছাড়া আর অন্য কোন বৃত্তি নেই।

এতক্ষণ অষ্টাঙ্গযোগে যম আর নিয়মকে নিয়ে বলা হল। যম আর নিয়মকে ব্যাখ্যা করে বললেন যম আর নিয়ম কি, এই দুটো করলে কি হয়, কেন এই দুটো আধ্যাত্মিক জীবনে দরকার। এরপর অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ হল আসন। এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, এই অষ্টাঙ্গযোগে একটি অঙ্গকে সাধনা করে সেটাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরের অঙ্গের সাধনাতে যেতে হবে তেমন কিছু নয়। যেমন দ্বিতীয় অঙ্গে নিয়মের কথা বলা হয়েছে, নিয়মেই পাঁচটা ক্রিয়ার মধ্যে এসে যাচ্ছে ঈশ্বরপ্রণিধান, আর ঈশ্বরপ্রণিধানেই সমাধি লাভের কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেই আসছে আসন। সমাধি হয়ে গেলে আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আর কি দরকার! তাই এগুলো আলাদা আলাদা একটার পর একটা যে করতে হবে সেরকম কিছু নয়, সব কটিরই অনুশীলন এক সঙ্গে চলে। যম, নিয়ম, আসন চলবে তার সঙ্গে প্রাণায়ামও চলবে, তার সঙ্গে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আটটা এক সঙ্গেই চলবে।

আসন স্থির করা

এখন বলছেন আসন বলতে কি বোঝায় – *স্থিরসুখামাসনম্ ॥১৪৬॥* যে আসনে বসলে একাসনে স্থির হয়ে সুখপূর্বক অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায় সেটাই ঠিক ঠিক আসন। জিম করবেট এক জায়গায় বলছেন – যখন তিনি বাঘ শিকারে যেতেন, তখন রাত্রি বেলা গাছের যে কোন একটা ডালে বসতেন আর সেই গাছের ডালে তিনি সারা রাত বসে কাটিয়ে দিতেন বা সারা রাত ওই এক আসনে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতেন। এগুলোই ঠিক ঠিক যোগীর লক্ষণ। আমাদের কি হয়, কিছুক্ষণ বসতে না বসতেই একবার ঘাড় চুলকাবো, দুবার পা চুলকাচ্ছি। *স্থিরসুখামাসনম্* মানে দু ঘন্টা, চার ঘন্টা, ছ ঘন্টা বসে আছে তো বসেই আছে, তার কোন রকম অনুভূতিই নেই যে আমি বসে আছি, আমার পা আছে কিনা, শরীর আছে কিনা এই ধরনের সমস্ত অনুভব চলে যাবে। আসনে বসার প্রথম নির্দেশে বলা হয় মেরুদণ্ড সোজা থাকা চাই। কারণ মেরুদণ্ড সোজা না থাকলে কখনই উচ্চ চিন্তন করা যাবে না। স্বামীজী আবার বলছেন *কিন্তু সাধারণভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, শরীরে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিতে থাকিবে, কিন্তু যখনই তুমি এই স্থূলদেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়া ফেলিবে।* শুধু শরীরবোধটাই চলে যায় তাই না, নানানপ্রকার সুখ-দুঃখ বোধের প্রবাহটাও বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি সময়ের বোধও ধীরে ধীরে চলে যায়। ঠিক ভাবে আসনে যদি বসা হয় তার সাথে যদি প্রাণায়াম করা হয় শরীরের খুব ভালো বিশ্রাম হয়ে যায়।

পতঞ্জলি এত কিছু না বলে শুধু বলে দিলেন *স্থিরসুখামাসনম্*। কিন্তু পরের দিকে হঠযোগীরা এই আসনকে কেন্দ্র করে যোগের আলাদা একটা শাখা তৈরী করে তাতে বিভিন্ন রকম আসন নিয়ে এলেন। আজকাল লোকেরা যোগ বলতে বোঝেন আসন আর প্রাণায়াম। পতঞ্জলি এত কিছু না বলে শুধু বলে দিলেন যে আসনে বসলে তুমি অনেকক্ষণ সুখপূর্বক স্থির হয়ে বসতে পারবে ওটাই আসন। এটাকেই অনেক বাবাজীরা পতঞ্জলির সাইনবোর্ড লাগিয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে সারা দেশে আসন প্রাণায়াম শিখিয়ে শত শত কোটি টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন।

পরের সূত্রে বলছেন *প্রযত্নশৈথিল্যান্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥১৪৭॥* আমাদের প্রত্যেকেরই মনে একটা অস্থিরতার ভাব আছে, এই অস্থিরতা ভাবের জন্য দেখা যায় সব সময় হয় পা নাড়তে থাকে নয়তো নখ কামড়াচ্ছে, স্থির ভাব কখনই থাকে না। এই অস্থির ভাবকে খুব সচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে এই বদভ্যাসগুলো দূর করতে হয়। খবরকাগজ পড়ার সময় অনেকের ঠোঁট নড়তে দেখা যায়, এটা অত্যন্ত বাজে অভ্যাস, এতে পড়ার সময়ও অনেক বেশী লাগে। আসলে এদের পড়াশোনা খুব একটা নেই। পড়াশোনা জানা থাকলে কখনই ঠোঁট নড়বে না। দ্বিতীয় ধাপে শব্দগুলোর উচ্চারণ মনে মনে হতে থাকে। ওই উচ্চারণটাও বন্ধ করতে হবে। এরপর পড়ার আসল গতিটা আসে। জপের ক্ষেত্রেও প্রথম

ঠোঁট নড়াটা বন্ধ করতে হয়, তারপর মনে যে উচ্চারণটা হচ্ছে সেটাও বন্ধ করতে হয়। তখনই মস্তের ঠিক ঠিক জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়।

সাধনা করে করে মনের এই অস্থির ভাবটা যেমন যেমন স্তিমিত হতে থাকে আর তেমন তেমন আমরা যদি সেই অনন্তের ধ্যান করতে থাকি তখন ওই আসনটাই আপনা আপনি স্থির হয়ে যায়। মনে করা যাক ঘরের একটা টেবিলের উপরে ধ্যান করতে বসলাম। এখন এই ঘরে অনেক কিছুই আছে, লাইট আছে, পাখা আছে, জানলা আছে, দরজা আছে, চেয়ার আছে আর আমিও আছি, এত কিছু মধ্য মন স্বাভাবিক ভাবেই এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে চাইবে, কিন্তু যদি ভাবতে থাকি যে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হল অনন্ত, আর এই অনন্ত আমার অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। যেমন সমুদ্র আছে আর সমুদ্রের মধ্যে একটা সিলিঙার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিলিঙারের ভেতরেও জল এসে গেছে আর তার বাইরেও জল। আমাদের স্থূল শরীরটাই এই বাহির আর ভিতরকে পৃথকীকরণ করে রেখেছে। কিন্তু শরীরবোধ চলে গেলে ভেতরেও অনন্ত বাইরেও অনন্ত। এইভাবে অনন্তকে যখন আসনে বসার সময় যেমন যেমন চিন্তা করা হবে তেমন তেমন আসন ধীরে ধীরে দৃঢ় হতে থাকবে। যাদের এখনও আসন জয় হয়নি তাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন খুব কঠিন।

তাই এখানে বলা হচ্ছে – *প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।* পতঞ্জলি বলে যাচ্ছেন কোনটা করলে কি হয়, এখানে ইনি একটা উপায় বলে দিলেন যে যখন তুমি আসনে বসতে যাচ্ছ তখন যদি এই ভাবে অনন্তের ধ্যান করা হয়, মানে একটা অনন্ত সমুদ্র আছে, তার মধ্যে আমিও আছি, আমি সেই অনন্তেরই একটা অংশ, আর এই অনন্ত আমার অন্তর ও বাহিরে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তখন আসনটা স্থির হয়ে যায়। যখন এই ভাবে নিজেকেই অনন্তের মধ্যে চিন্তা করতে থাকবে তখন তার শরীরের কোন অংশেরই নড়াচড়া হবে না, আর তখনই আসন *স্থিরসুখামাসনম্* হবে। আসন যতক্ষণ না স্থির হচ্ছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কিছুই আশা করা যায় না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি আর আসন পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। যাদের back pain হয়, তারা মেঝেতে বসতে পারেন না, কিন্তু তারা যদি চেয়ারেও বসেন কোন অসুবিধা নেই, একই ব্যাপার, মেঝেতে বসাও যা চেয়ারে বসাও বসা। মেঝেতেই হোক আর চেয়ারেই হোক, যেখানেই বসা হোক না কেন, নড়াচড়া যেন না করতে হয়। কিন্তু বসতে গেলে শুতে ইচ্ছে করছে, শুতে গেলে বসতে ইচ্ছে করছে, এই রকম যেন না হয়।

এর পর বলছেন – *ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।।৪৮।।* আসন যখন স্থির হয়ে যাবে, অর্থাৎ ঘন্টার পর ঘন্টা এক আসনে বসতে পারছে, এইভাবে আসন জয় করা হয়ে গেলে তখন দ্বন্দ্ব-পরস্পরা, যেমন প্রচণ্ড গরম লাগা, খুব শীত করা, জল তেষ্ঠা পাওয়া, এই ধরনের সমস্ত বিষয় গুলো কেটে যায়। দ্বন্দ্বই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রধান বিষয় – সুখ-দুঃখ, ক্ষুৎ-পিপাসা, শীত-উষ্ণ, জীবন-মৃত্যু, দিন-রাত ইত্যাদি সমস্ত ধরনের দ্বন্দ্ব আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সমস্ত রকম দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে না এলে কোন কিছুই করা যাবে না। আসন জয় আর শরীর জয় এই দুটো পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। দেহের নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা বোঝা যাবে আসন জয় দিয়ে। আসন যার নিয়ন্ত্রিত তার দেহও নিয়ন্ত্রিত থাকবে। দেহ যার নিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্ব তাকে কম ঝামেলা দেবে। দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ এই নয় যে সব দ্বন্দ্ব চলে যাবে। দ্বন্দ্ব গুলি কখনই যাবে না, এগুলো চলতেই থাকবে কিন্তু নিজেকে এই দ্বন্দ্বাত্মক বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে হবে। তারপরেও দ্বন্দ্ব আসবে যাবে, কিন্তু তা সাধককে বিচলিত করতে পারবে না। এগুলি থেকে নিজেকে তখনই বার করে আনতে সক্ষম হবে যখন আসন স্থির ও দৃঢ় হয়ে যাবে।

প্রাণশক্তিকে যোগ যেভাবে কাজে লাগায়

অষ্টাঙ্গযোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম। প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন *তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।।৪৯।।* শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিকে যখন বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তাকেই তখন প্রাণায়াম বলা হয়। বিচ্ছেদ মানে নিয়ন্ত্রিত করা। শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রাণায়াম বলা হচ্ছে। এখানে মনে রাখতে হবে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস ভেতরে আসছে আর বাতাস

বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রাণের ক্ষেত্রে এগুলোর খুব একটা গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল আমাদের শরীরের যে প্রাণন ক্রিয়া বা প্রাণের যে গতি চলছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল আয়ত্ত করা। প্রাণ হল মহাজাগতিক শক্তি (Cosmic Energy), যে শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছে, সেই মহাজাগতিক শক্তি আমাদের শরীরের মধ্যেও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বেদের নাসদীয় সূক্তে আকাশ ও প্রাণের কথা বলা হয়েছে, স্বামীজীর কাছে আকাশ ও প্রাণ খুব প্রিয় বিষয় ছিল। আকাশ হল পদার্থ আর প্রাণ মানে শক্তি। প্রাণ যখন আকাশের উপর কাজ করে তখনই সৃষ্টির প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। জগতে যা কিছু হয়ে চলেছে, যে কোন ধরণের ক্রিয়া যেখানে সংঘটিত হচ্ছে সেখানেই প্রাণ শক্তির খেলা চলছে। আমাদের এই শরীর এই মুহূর্তে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, প্রাণের শক্তিতেই শরীর দাঁড়িয়ে আছে। শরীরে এই প্রাণশক্তি মূলতঃ আসছে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করছি, সেই খাদ্যের মাধ্যমে। খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে যে প্রাণশক্তি তৈরী হচ্ছে সেই প্রাণশক্তিতেই এই শরীর চলছে, এই প্রাণশক্তির জন্যই আমরা কাজ করছি, চিন্তা-ভাবনা করতে পারছি। মানুষের শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলে শরীরটাও সমস্ত রকম ক্রিয়াহীন হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। যখন কেউ কোমাতে অনেক দিন পড়ে থাকে, তখনও তার শরীরে পচন ধরে না, মস্তিষ্কও কাজ করছে কিন্তু সবটাই কৃত্রিম ভাবে রাখা আছে। কারণ তখনও তার শরীরে প্রাণশক্তি রয়েছে। কিন্তু মারা গেলে শরীরে আস্তে আস্তে পচন ধরতে শুরু করে। যতই ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা হোক না কেন ওই শরীর দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। প্রাণ আছে বলেই শরীর কাজ করছে, প্রাণ একবার বেরিয়ে গেলে শরীর আর কাজ করবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জুড়ে যে প্রাণশক্তির খেলা চলছে, এই প্রাণকে যতক্ষণ কাজে লাগাতে পারছে ততক্ষণই সে প্রাণি। যে কোন জিনিষ, এই যে বাতাস চলছে, টিউবলাইট জ্বলেছে, সবই সেই প্রাণেরই বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র।

আমাদের শরীরে যে প্রাণশক্তির খেলা চলছে, প্রধানতঃ সেই প্রাণ নিঃশ্বাস দিয়ে ভেতরে আসছে। তাই শ্বাস প্রশ্বাসটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল প্রাণ। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন একটা গাড়ি, সেই গাড়িতে চেপে প্রাণ আমাদের ভেতরে ঢুকছে, ঢুকে তার কাজটুকু করে দিয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রিসিটিতেও তাই হয়, ইলেক্ট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে আর টিউব লাইটে ইলেক্ট্রন আর নিউট্রন গুলো ঢুকছে আর বেরচ্ছে তাতেই তার কাজ হয়ে যাচ্ছে। স্টিম ইঞ্জিনে যখন স্টিম কাজ করে সেখানেও এই একই ব্যাপার ঘটছে, স্টিম ঢুকছে আবার স্টিম বেরিয়ে আসছে। ঢোকা আর বেরনোর প্রক্রিয়া যদি না হয় তাহলে স্টিম ইঞ্জিন চলবে না। পেট্রলের সাহায্যে যে গাড়িগুলো চলছে সেখানেও এই একই জিনিষ হচ্ছে। প্রাণক্রিয়া যখন চলে তখনই কাজ হয়।

অসংগঠিত প্রাণ ও সংগঠিত প্রাণ

এই প্রাণশক্তি বেশীর ভাগ সময় unpattern থাকে। একটা বাড়ি আছে, ওই বাড়ির উপর অনবরত প্রাণক্রিয়া হয়ে চলেছে। সূর্যের আলো পড়ছে, বাতাস এসে দেওয়ালে লাগছে, বৃষ্টির জল পড়ছে, এইভাবে প্রাণশক্তি অনবরত বাড়িটার উপর কাজ করে চলেছে। এই প্রাণশক্তিকে বলা হয় unpattern energy। এই unpattern energyর জন্য বাড়িটা আস্তে আস্তে একদিন ক্ষয় হতে হতে ভেঙে পড়বে, বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় এ্যানট্রপি। আমাদের ভাষায় বলি কালের প্রবাহে একদিন সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। এই unpattern energy থেকে বাড়িকে বাঁচাতে হলে বাড়ির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। বাড়িটা যেন প্রাণশক্তির সমুদ্রের মধ্যে ভাসছে আর শক্তি তাকে চারিদিক থেকে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে, একটা সময়ে বাড়িটা ধ্বংস স্তপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত যাতে না হয়ে যায় তার জন্য pattern energy পাঠাতে হবে। Pattern energy কি? ইঞ্জিনিয়াররা জানেন, রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে বাড়িকে বাঁচাতে হলে এর দেওয়ালে একটা বিশেষ রঙ লাগাতে হবে, পাথরগুলোকে পালিশ করতে হবে ইত্যাদি। এবার বাড়ির জায়গায় আমাদের শরীরকে নিয়ে আসুন। আমরা জন্ম নিয়েছি, খাওয়া-দাওয়া করছি বলে বেঁচে আছি, এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু সব কিছু বন্ধ করে আমাদের যদি সব সময়ের জন্য বাইরে খোলা আকাশের মধ্যে ফেলে রাখা হয়, তাহলে শরীরের ভেতরে প্রাণ থাকতেও unpattern energy শরীরটাকে শেষ করে দেবে। Unpattern

energy পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছেয়ে আছে, জগতের কোন জিনিষকে সে এখানে থাকতে দেবে না। তাহলে আমাদের এর হাত থেকে বাঁচার কি উপায়? এই unpattern energy থেকে জিনিষকে যদি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় তখন কিন্তু আমাদের ওখানে একটা info energy supply করতে হবে। Info মানে Information, যেমন ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে Technical knowledge আছে, ওই Technical knowledge এর সাহায্য নিয়ে প্রাণশক্তিকে একটা বিশেষ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে। আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি, এই খাবারগুলোকে আমাদের শরীরের জেনেটিক মেশিনগুলো একটা রূপান্তর করে দেয় যাতে আমাদের শরীরে একটা pattern energy প্রবাহ হতে পারে। আমাদের শরীরে ঠিক যে ধরণের energy দরকার, জেনেটিক মেশিনগুলো খাদ্যগুলিকে ঠিক ওই ধরণের energyতে convert করে দিচ্ছে। এভাবেই আমাদের শরীরটা চলছে। একটা অবস্থার পর জেনেটিক মেশিনগুলো আর convert করতে পারে না, তখনই শরীরটা আন্তে আন্তে শেষ হতে শুরু করে। আমাদের জীবনের যে মূল লড়াই, সেই লড়াই হল fight between pattern energy and unpattern energy। কিন্তু এই pattern energy কোথা থেকে আসবে, তার পেছনে একটা ট্রেনিং থাকতে হবে। এই ট্রেনিংকে বলছে information। Information আর energy মিলিয়ে একটা শব্দ তৈরী হয় info energy। যেখানেই জীবন আছে, সেই জীবনের বিকাশ আছে, সেখানেই info energyর ব্যাপার জড়িয়ে আছে। যেমন একটা গাছ, গাছের মধ্যেও একটা info energy আছে, যেটা তার genetic material এর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ওকে যদি খাদ্য দেওয়া হয় ওটাকে নিয়ে গাছ নিজের মত বড় হতে থাকে। গাছের ভেতরের জিন্ আর বাইরের খাদ্য এই দুটো মিলিয়ে গাছকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এই pattern energyই প্রাণি জগতের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে।

আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি সব সময় সচেতন থাকি যাতে টাটকা জিনিষ খেতে পারি। পচা খাবার আমরা কেন খাই না? পচা খাবার মানে ওই খাবারটা এখন unpattern energy হয়ে গেছে, ওই খাবার ভেতরে গেলে আমাদের pattern energyকে শেষ করে দেবে। অথচ দেখা যায় আমরা সবাই প্রচুর পচা জিনিষ খাই। দই তো পচা জিনিষই হল। সুইজারল্যান্ডে যে চিজ্ তৈরী করা হয় সেগুলো এক ধরণের পোকা দিয়ে তৈরী হয়। পোকা যত বড় হবে সেই চিজের দাম তত বেশী। মদও পচান পানীয়। শুটকি মাছ তো পুরো পচানো মাছ। শুটকি মাছ যাদের কাছে খুব উপাদেয়, তারা এক চামচ শুটকি মাছ দিয়ে এক হাড়ি ভাত খেয়ে নেবে। এই নয় যে আমরা পচা জিনিষ খাই না। যারা পচা জিনিষ খাচ্ছে তাদের কাছে ওটাই pattern, শরীরটা ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, এটাই তাদের একটা systemএ চলে এসেছে। কিন্তু আবার কাঁচা চাল আমরা খেতে পারবো না, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন বনমানুষ ছিলেন তখন খেতেন। আমাদের সবারই পেটে এ্যাপেনডিক্স আছে, যেটা দিয়ে ঘাস হজম করা হয়, অপারেশন করে অনেকের এ্যাপেনডিক্স বাদ দিয়ে দিতে হয়। কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু তাও মানুষের শরীরে এ্যাপেনডিক্স থাকে, এতেই বোঝা যায় কোন এক কালে আমরা ঘাস খেতাম, কাঁচা কাঁচাই সব খেতাম। এখন আমরা কাঁচা ঘাস, কাঁচা গাছপালা খেতে পারি না, এগুলো আমাদের জন্য আর pattern energy নয়। গরু মোষ যেমন ঘাস খেয়ে দুধ দিতে পারে, আমরা দিতে পারবো না। জীবনটা পাল্টে গেছে বলে তার pattern energyটাও পাল্টে গেছে।

প্রাণায়ামের দ্বারাই অসংগঠিত প্রাণ সংগঠিত হয়

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা সবাই অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বেলায় একেবারেই সচেতন নই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে, তরকারিতে সজী কাঁচা থাকলে, ভাত চাল চাল থাকলে বাড়িতে তুলকালাম লেগে যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা সব সময় কত হিসেব করতে থাকি, মশলা কতটা থাকবে, ঝাল কি রকম হবে, খাবারে ক্যালোরি কতটা থাকবে, ফ্যাট কি পরিমাণে থাকবে। এসব ব্যাপারে আমরা কত সচেতন। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের কারুরই কোন হুঁশ নেই। খাবার-দাবারে একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে আমাদের কত কিছু হয়ে যাবে মনে করছি, পেটে খারাপ হয়ে যেতে পারে, ব্লাড সুগার বেড়ে যেতে পারে, কত

কিছু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে, সারাদিন আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি আর শ্বাস ছাড়ছি পুরোটাই বেনিয়মে করে যাচ্ছি। সেইজন্য বলা হয় তপস্যা করলে, প্রাণায়ামাদি করলে শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে। কারণ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে যে প্রাণশক্তি আসছে প্রাণায়াম ও তপস্যা করলে সেই প্রাণশক্তিটা পুরো pattern হয়ে ভেতরে আসবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে সারা জীবন আমাদের এই প্রাণশক্তি unpatternই থেকে যায়। খাবার-দাবার ব্যাপারে আমরা সব সময় সচেতন কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় আমাদের কোন চেতনা থাকছে না। সেই কারণে আমাদের শরীরের এই দুরবস্থা, আর ডাক্তার, নার্সিং হোমকে কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে যাচ্ছি। যোগদর্শন তাই বলে দিচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করা মানে, প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করা। প্রাণশক্তিকে সুশৃঙ্খল করার সহজ উপায় হল প্রাণবায়ুর গতি বিচ্ছেদ করা। এই প্রাণশক্তি আবার শরীরে পাঁচ ভাবে কাজ করে, শরীরের যেখানে প্রাণশক্তি যেভাবে কাজ করে সেই জায়গার প্রাণের আলাদা আলাদা নাম, যেমন প্রাণ, আপান, ব্যায়ানা, উদানা ও সমানা। এই পাঁচটি প্রাণই সব থেকে ভালো নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দোবদ্ধ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা। ছন্দোবদ্ধ নিঃশ্বাসকেই আধুনিক কালের যোগীরা প্রাণায়াম বলছেন।

পরের সূত্রেও প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলছেন **বাহ্যাত্তরন্তত্ত্বতিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।।৫০।।** প্রাণায়াম অনেক রকমের হলেও মূলতঃ তিন ধরনের – নিঃশ্বাস নেওয়া, প্রশ্বাস ছাড়া আর নিঃশ্বাস বন্ধ রাখা। নিঃশ্বাস বন্ধ করা মানে প্রাণকে ধরে রাখা, হয় বাইরে নয়তো ভেতরে, যাকে আমরা কুম্ভক বলি। নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রিত ভাবে নিচ্ছি, এটাও এক ধরনের প্রাণায়াম, নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় আবার নিয়ন্ত্রিত করে সচেতন ভাবে ছাড়ছি, এও আরেক রকম প্রাণায়াম। ভেতরে নিঃশ্বাস টানার পর বায়ুকে ভেতরে ধরে রাখা, আবার শ্বাস ছাড়ার পর বাইরে বায়ুকে ধরে রাখা, এই দুটোকেই কুম্ভক বলে। যখন প্রাণবায়ুকে শরীরের বিশেষ একটা অঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তাকে বলছেন দেশ। আর কত সময় ধরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি বা ছাড়ছি বা ধরে আছি, তাকে বলছেন কাল এবং কত বার করে করা হচ্ছে সেইভাবে প্রাণায়ামের কাল পাল্টে যায়। হঠাৎযোগে এই প্রাণায়ামই একটা আলাদা শাস্ত্র হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষ যাদের বয়স হয়ে গেছে, জীবন যাদের অতটা সুশৃঙ্খলিত নয়, তাদের জন্য হল একটা নির্দিষ্ট আসনে বসে নিজের ফুসফুসের ক্ষমতা অনুযায়ী গুণে গুণে একটা সময় ধরে নিঃশ্বাস নেওয়া আবার গুণে গুণে নিঃশ্বাস ছাড়া। এটুকুতেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। এতেই শরীরের অনেক রোগ কমে যাবে, মনের অনেক চাপল্যতাও কমে আসবে। বলছেন, এই ভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ যদি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তখনই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। যোগের মতে প্রাণকে যতক্ষণ না নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, প্রাণায়াম যদি না করা হয় ততক্ষণ কুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে না।

এই তিন ধরনের প্রাণায়ামের বাইরে চতুর্থ আরেকটি প্রাণায়াম আছে। সেটাই পরের সূত্রে বলছেন **বাহ্যাত্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।।৫১।।** যদি বাইরের কোন বিষয়কে নিয়ে অথবা ভেতরের কোন কিছুকে নিয়ে খুব গভীর ধ্যান করা হয় তাতেও কিন্তু প্রাণায়াম হয়ে যায়। প্রাণায়াম মানে যে সব সময় শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে করতে হবে তা নয়। মনকে যদি বাইরের বা ভেতরের কোন বিষয়ে খুব একাগ্র করা হয় তখন তাকেও প্রাণায়াম বলা যায়। ঠাকুর এর উপমা দিয়ে বলছেন – কেউ যখন হাঁ করে অবাক হয়ে কিছু দেখে তাকে বলে ‘তোর কি কুম্ভক হয়েছে নাকি’! বায়ু স্থির হয়ে যাওয়া মানে কুম্ভক। যাঁরা খুব একাগ্র মনে জপ করেন, লক্ষ্য করলে তাঁরা দেখতে পাবেন যখন খুব একমনে জপ হতে থাকে বা খুব গভীর ভাবে ইস্টের চিন্তন করছেন তখন নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যায়। কুম্ভক না হলে কোন বড় কাজ হয় না। যখন কোন লক্ষ্য বস্তুর উপর বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়া হয় তখন তারা দমটাকে আটকে দেয়, এখানেও প্রাণশক্তিটাকে একটা জায়গায় আটকে রাখা হচ্ছে। বায়ু স্থির হয়ে যাওয়া মানে তার সমস্ত শক্তিটা একটা জায়গায় এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। তার মানে এবার সে বিরাট কোন কাজ করতে যাচ্ছে। যাঁরা ধ্যান করেন তাঁদের এই জিনিষ সহজে হয় না, এর জন্য সময় লাগে।

প্রাণায়াম হল জাগতিক শক্তির সমষ্টি, সমস্ত জগতব্যাপী যে প্রাণ পরিব্যাপ্ত, সেই প্রাণের উপর নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। যেখানে কোন কিছুই নেই সেখানেও প্রাণশক্তি রয়েছে। এই প্রাণশক্তিই জড় জগতের সমস্ত ক্রিয়াশীলতার কারণ। আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরিতে বলছেন জড় আর শক্তি এক। এই প্রাণশক্তিই আমাদের শরীরের উপরে কাজ করে এবং তার ফলেই শরীরের যা কিছু হচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনে করে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সবাই এই শক্তিকে আহরণ করছে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রাণ শক্তির সব কিছু নয়। যারা যোগী তাঁরা শুধু নিঃশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমেই প্রাণশক্তিকে আহরণ করেন না, প্রকৃতি থেকে যোগীরা সরাসরি এই প্রাণ শক্তিকে নিজেদের প্রয়োজনে যখন ইচ্ছে টেনে নেন। গাছপালা সব সময় অক্সিজেন নিচ্ছে না, তাহলে তারা কিভাবে বেঁচে থাকে, কারণ তারা যে পদ্ধতিতে প্রাণকে গ্রহণ করছে সেটা একেবারেই পৃথক একটি পদ্ধতি।

এখন দেখতে হবে যে এই প্রাণশক্তি আমাদের সমগ্র দেহ ও মনে একটা সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে চলছে কিনা। এটা গেল একটা দিক। আরেকটা দিক হল, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এই প্রাণশক্তিকে, যে কোন সময়, নিজের ইচ্ছে মত, শরীরের যে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবাহিত করা। মনে করুন আমি এই হাত দিয়ে এক পালোয়ানকে একটা ঘুষি মারতে চাইছি, আর এক ঘুষিতেই সে যেন কুপোকাৎ হয়ে যায়। তাহলে এখন আমাকে করতে হবে কি, আমার শরীরের যত প্রাণশক্তি আছে তাকে টেনে নিয়ে সেই সমগ্র শক্তিকে হাতের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। আর ধরুন আমার আশেপাশে যত লোক আছে তাদেরও সব প্রাণ শক্তিকে টেনে এনে হাতের মুঠোয় যদি নিয়ে আসি, তাহলে কি হবে কেউ বলতে পারবে না। আর যদি সমস্ত জগতের প্রাণ শক্তিকে টেনে নিয়ে আসি, তাহলে কি হবে ভগবানই জানেন। আর বাস্তবিকই এটা করা যায়। ভরত্তোলকরা যখন কোন ভারী জিনিষ তোলে তখন জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে দমটাকে আটকে ভারী জিনিষটা তুলবে। সেই মুহূর্তে ভেতরে যে প্রাণ আছে সেটাকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে টেনে নিল, কারণ প্রাণশক্তিকে টেনে নেওয়ার জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতিরেকে আমাদের অন্য কোন পদ্ধতি জানা নেই। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রাণ শক্তিকে টেনে একটা ঝাকুনি দিয়ে ওই ভারী জিনিষটা টেনে তুলে নিয়ে তারপর মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণশক্তিকে ছেড়ে দিল। তারপর প্রাণ আবার শরীরে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ঠিক একই ভাবে, খুব রহস্য মূলক কাহিনীর একটা সিনেমা দেখছে আর সিনেমার একটা উত্তেজনাপূর্ণ জায়গায় এসে গেলে দম বন্ধ হয়ে যায়, তখন অজান্তে আমাদের কুস্তক হয়ে যাচ্ছে। কুস্তক মানে নিঃশ্বাসকে স্তম্ভিত করে দেওয়া, হয় নিঃশ্বাস নিয়ে অথবা নিঃশ্বাস ছেড়ে। এই কুস্তকের সময় মন স্বাভাবিক ভাবেই একাগ্র হয়ে যায়। আর এই সময় শরীরের যেখানে খুশি প্রাণকে তখন ধরে রাখা যায়। যোগীরা যখন তাঁদের শরীরের কোন জায়গায় যদি ক্ষত থাকে বা শরীরের কোন অঙ্গে ব্যাথা অনুভব করেন তখন তাঁরা প্রাণকে টেনে একত্র করে ওই ক্ষত স্থানে ধরে রেখে আরোগ্য করে নেন। আজকাল বিভিন্ন ম্যাগাজিনে Pranik Healing নিয়ে অনেক ধরনের প্রবন্ধ পাওয়া যায়, এখানেও যিনি healing করছেন, তিনি তার হাতের মুঠোয় প্রাণ শক্তিটাকে টেনে নিয়ে শরীরের অসুস্থ অঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়ে নিরাময় করে দেন।

এগুলি কিভাবে হয় বলতে গিয়ে বলছেন – *তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োগ্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।* শ্বাস-প্রশ্বাস যা চলছে এর গতিকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া, মানে নিঃশ্বাস থেমে যায়, অর্থাৎ কুস্তক হয়ে যায়। তখনই প্রাণ তার কাজ করতে শুরু করে। এতে যে তার শারীরিক ক্লান্তি আসবে তা নয় বরং মানসিক ভাবেও সে বেশ সতেজ থাকবে। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন যোগাভ্যাস করবে তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধই হয়ে যাবে, আর বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, খুব সামান্য নিঃশ্বাস হয়তো যাবে, কিন্তু তাতেই প্রাণ আপনা থেকেই প্রবাহিত হয়ে যাবে। কোন বাইরের বস্তুতে বা দেহের অভ্যন্তরে কোন স্থানে মনকে একাগ্র করলেও স্বাভাবিক ভাবেই কুস্তক হয়ে যায়। হৃদয়ে গভীর ভাবে কেউ ঠাকুরের ধ্যান করছেন ওই ধ্যানের মধ্যে যদি সে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। এখানে আর নিজেকে চেষ্টা করে কুস্তক করতে হচ্ছে না।

কিন্তু প্রথম অবস্থায় কারুর আগে থাকতেই মন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত থাকে আবার কারুর মন প্রস্তুতই নয়। যাদের মন একাগ্র নয়, প্রাণ সংযত নয় তাদের মিলিটারি কায়দাতে লেফট-রাইট করে ড্রিল করাতে হয়। আধ্যাত্মিক সাধনাতে কুম্ভকের প্রয়োজনীয়তা আছে, যদি স্বাভাবিক কুম্ভক না হয়, তখন নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করাবে – নিঃশ্বাস টানো, এবার নিঃশ্বাস ছাড়ো, এবার কিছুক্ষণ দম বন্ধ কর। এই ভাবে কুম্ভক অভ্যাস যখন আয়ত্ত করে নিল তখন বলা হবে এখন এই কুম্ভক অবস্থায় তোমার প্রাণশক্তিকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চার করতে থাক। কিন্তু যারা প্রচণ্ড গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে আধ্যাত্মিক সাধনা করেন তাদের এইভাবে কুম্ভক শিখতে হয় না।

প্রাণশক্তিকে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়ে গেল বা কোন একটা বিষয়কে ধ্যান করতে করতে যাদের বায়ু স্থির হয়ে গেছে তখন কি হবে? **ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।।৫২।।** এই প্রাণশক্তির উপর কর্তৃত্ব এসে গেলে প্রজ্জ্বালকের আবরণটা নিরাভরণ করতে পারা যাবে। যে কোন নান্দনিক সৃজনমূলক সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুম্ভকের বিশাল ভূমিকা। কুম্ভক অবস্থাতেই আমাদের অন্তরে যিনি আছেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পারা যায় আর তিনি কি বলতে চাইছেন তার অর্থকেও অনুধাবন করা যায়। আমাদের যে চিন্ত আছে, সেই চিন্তে আমাদের আত্মার আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে। চিন্ত যদি পুরোপুরি শুদ্ধ হয় তাহলে আত্মার পুরো আলোটাই তাতে প্রতিবিম্বিত হবে। আমাদের চিন্ত স্বভাবতই সত্ত্বগুণে নির্মিত, কিন্তু রজো আর তমো চিন্তকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এখন প্রাণায়ামাদি করার ফলে বা কোন একটা বিষয়ের উপর গভীর ধ্যান করার ফলে রজোগুণ আর তমোগুণের আবরণটা ক্ষীণ হয়ে খসে পড়ে যায়। রজোগুণ আর তমোগুণের আবরণ খসে গেলে সত্ত্বগুণটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সত্ত্বগুণ জেগে গেলে বুদ্ধিটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই কারণেই বলা হয় যোগী মানেই তুখোড় বুদ্ধি সম্পন্ন, মুর্থ যোগী কখনই হয় না। ঠিক ঠিক ভক্তই হোন আর যোগীই হোন বা বড় কর্মযোগীই হোন, তাঁর প্রথম লক্ষণ হল বুদ্ধিটা তাঁর তুখোড় হয়ে যাবে। তার কারণ এই সূত্র, **ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।** বুদ্ধির প্রকাশের উপর যে রজোগুণ আর তমোগুণের আবরণ পড়ে আছে সেটা ক্ষীয়তে, খসে পড়ে যাবে। যার ফলে বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, আত্মার সেই আলোটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। যে নরেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সব কিছুতে কাবু করে দিতেন, সেই নরেনকে ঠাকুর এমন এমন কথা বলতেন, নরেনের কথার জবাবে ঠাকুর এমন এমন উত্তর দিতেন, নরেনের কিছু করার থাকতো না। তাহলে বুঝে দেখুন কি তুখোড় বুদ্ধি ছিল ঠাকুরের। লাটু মহারাজ, যাকে ঠাকুর অক্ষর জ্ঞান শেখাতে পারলেন না, পরবর্তী কালে সেই লাটুর তুখোড় বুদ্ধি দেখে সবাই দেখে চমকে যেত। যদি দেখেন কোন ভক্তের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয় তাহলে বুঝতে হবে তার জপ-ধ্যান তপস্যা নেই। সাধনা, তপস্যা ঠিক ঠিক ভাবে করা থাকলে, যোগ পথে এগোলে বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।

স্বামীজী যে এনসাইক্লোপেডিয়ার এক একটা খণ্ড নিচ্ছেন আর পাতার পর পাতা উল্টে রেখে দিচ্ছেন, এতটা হয়তো আমাদের হবে না ঠিকই, কিন্তু ঠিকমত জপ ধ্যান নিয়মিত করা থাকলে যে কোন বই কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি শেষ করে দিতে পারবেন, বইয়ে লেখকের কি বক্তব্য একটু পড়লেই বোঝা যায়। অনেকে মজা করে বলেন সন্ন্যাসীরা বেশী বই-টাই পড়েন না। এর দুটো অর্থ হয়, আসলে পড়াশোনার অভ্যাস বাচ্চা বয়স থেকেই তৈরী হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের যদি সেই অভ্যাস নাও থাকে তাতেও যে কোন বই তাঁকে ধরিয়ে দিন, কয়েকটা পাতা উল্টেই বলে দেবেন বইতে কি বলতে চাইছে, লাইন বাই লাইন, পাতার পর পাতা পড়ার দরকার হয় না। আপনি যদি লেখকের বক্তব্য না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়। বুদ্ধি যদি তীক্ষ্ণ না হয় তাহলে আপনার প্রকাশের উপর এখনও আবরণ রয়েছে। প্রকাশের উপর আবরণ থাকা মানে জপ, ধ্যান, তপস্যা নেই। জপ, ধ্যান, তপস্যা যদি করা থাকে, প্রাণায়ামাদি যদি করা হয়, ধ্যানের গভীরতা যদি থাকে তাহলে যে কোন বিষয় তাঁকে ধরিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টা বুঝে নেবেন। তথ্য হয়তো অনেক জানা নাও থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে কোন অসুবিধাই হবে না।

বিটোফেন মিউজিক কম্পোজ করতেন, আঠারো উনিশ বছর বয়সে তিনি পুরোপুরি বধির হয়ে যান। কানে কিছুই শুনতে পেতেন না, একটা বাজনা বাজালে যে তার সুরটা বিটোফেনের কানে যাবে তার কোন উপায় ছিল না। অবিবাহিত ছিলেন। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে একটা কাগজ আর কলম নিয়ে নিজের ডেস্কে বসতেন, সেই থেকে দুপুর দুটো আড়াইটে পর্যন্ত বসে থাকতেন। আর তাঁর মনের ভেতরে সুর বাজতে থাকত। তাঁর অন্তরের মধ্যে যে নৈঃশব্দ বিরাজ করত সেই সময় তার মধ্যে প্রাণশক্তি তার মনের মধ্যে ক্রিয়া করত, তার মনের ভেতরেই সুরের তরঙ্গ উঠতে থাকত। কানে কিছু যাচ্ছে না, মনের মধ্যেই সুর বাজছে, আর সেখান থেকে তিনি সেটাকে ধরে এনে এক টুকরো কাগজের মধ্যে সুরের তরঙ্গ গুলোকে স্বরলিপির মাধ্যমে ধরে রাখতেন। যখন ওই কাগজটা বাদ্যকাররা বাজাতেন তখন বোঝা যেত ওটা কি ধরনের সঙ্গীত, তার আগে কেউ জানতেই পারতেন না। বিটোফেন হয়তো দেখছেন কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে, যে বাজাচ্ছে পিয়ানোর রীডের তার আঙুলের উপর ওঠানামা দেখে তিনি বলে দিতেন কোন সুর বাজাচ্ছে।

এই যে বলছে ততঃ ক্ষীয়তে প্রাকাশাবরণম্ - আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে অনন্ত জ্ঞান রয়েছে কিন্তু সেই জ্ঞানের উপর আবরণ পড়ে রয়েছে। সেইজন্য আমরা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি, আমাদের ওই আবরণটাকে দূর করতে হবে। এই আবরণটা সরে গেলেই অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। এই আবরণটা কীভাবে নিরাভরণ করতে হবে? নিয়মিত প্রাণায়ামের অনুশীলনের দ্বারাই এই আবরণ দূরীভূত হয়।

প্রত্যাহার ও ধারণার প্রস্তুতি

অষ্টাঙ্গযোগের যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম নিয়ে বলা হল। এখন বাকী রইল প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

ধারণার সম্বন্ধে বলছেন – **ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।।৫৩।।** কুম্ভক আয়ত্ত এসে গেলে মনও তখন ধারণার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। যম, নিয়ম, আসনাদি সব এক সাথেও অভ্যাস করা যায়, একটাকে শেষ করে আরেকটা করতে হবে এর কোন মানে নেই। কিন্তু ধারণার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না। বলছেন প্রাণায়ামের দ্বারা যতক্ষণ প্রাণকে বশে না আনতে পারা যাবে ততক্ষণ ধারণা করার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে না। বেশির ভাগ ভক্তরাই বলে – ধ্যান করতে বসলে কিছুই হয় না। কিছু হয় না কারণ কুম্ভক এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি। কুম্ভক না হলে মন স্থির হবে না। প্রাণায়াম না করলে মনের উপর যে রজোগুণ আর তমোগুণের আবরণ রয়েছে সেটা যাবে না। কুম্ভক হয়ে গেলে মন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মন যতক্ষণ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ কিন্তু ধারণা হবে না। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনই যোগের পথে এগোন যাবে না। তমোগুণকে ছাড়তে হয় রজোগুণের সাহায্যে, রজোগুণকে ছাড়তে হয় সত্ত্বগুণের সাহায্যে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবার ঠিক ঠিক জপ ধ্যান শুরু হবে। যে কোন সাধকের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয় সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। তার মানে সে ধারণার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ধারণা মানে, যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গযোগের এই চারটাকে ঠিক ঠিক অনুশীলন করা হয়ে গেছে, এবার সে ধারণার জন্য প্রস্তুত।

আমরা এখনও রাজযোগের বাইরেই ঘুর ঘুর করছি, এখনও অন্দরমহলে ঢুকিনি। এই ধারণাতে এসে এখন ভেতরে ঢোকান দরজার কাছে দাঁড়িয়েছি, এইবারে আমাদের গভীর থেকে গভীরে এগিয়ে যেতে হবে। এরপর আসছে প্রত্যাহার। **স্ববিশয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকায় ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।।৫৪।।** এখানে যে ভাবে প্রত্যাহারকে বলা হবে তার সাথে বেদান্ত প্রত্যাহারকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তার সাথে অনেক পার্থক্য আছে। বেদান্তে এই প্রত্যাহারকে বলবে শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা। শম ও দম মানে অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যোগে প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা অন্য ভাবে করা হয়। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বস্তু একই জিনিষ। যেমন জল জলের সঙ্গে মিলে যায়, তেল তেলের সঙ্গে মিলে যায়, ঠিক তেমনি আমাদের যে চক্ষু ইন্দ্রিয় আছে, এর প্রবণতাই হল সুন্দর দৃশ্যের

সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। কিন্তু ইন্দ্রিয় যদি বিষয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায় তাহলে তো আর জ্ঞান হবে না। বুদ্ধিতে যে বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তিকেও বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে যেতে হয়। আমি একজনকে ভালোবাসি, আমি তাকে দেখতে চাইছি। তাকে দেখার জন্য আমি অনেক দূর গেলাম। আমি তাকে দেখতে পেলাম। তাকে দেখতে পেয়ে আমার যে চক্ষু ইন্দ্রিয় সে তার চেহারার সঙ্গে এক হয়ে গেল। কিন্তু এদের এক হওয়াতে আমি কি করে জানবো যে আমি আর সে এক? তখন আমার মনকে সেই বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে যেতে হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় সব সময় বস্তুর আকার নিয়ে নেয়, সেইজন্য মনও সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর আকার নিয়ে নেয়। মনের এই আকার নেওয়াকে আটকে দেওয়াটাই রাজযোগের প্রত্যাহার। তোমার কাজ হল তপস্যা করা, তোমার কাজ হল জপ, ধ্যান করা। বস্তুর আকার নেওয়াটা তোমার কাজ নয়।

একটা হাতি অপরের বাগানে গিয়ে কলাগাছ খাচ্ছিল। হাতিটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কি নিশ্চয়তা আছে যে হাতিটা আবার গিয়ে কলাগাছে মুখ দেবে না? এটাই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার দৈনন্দিন সমস্যা। কারণ হয়তো বিশেষ কোন একটা খাবারের প্রতি দুর্বলতা আছে। এখন যখনই খবর পাবে যে ওই খাবারটা ওখানে পাওয়া যাচ্ছে সে সেইখানে পৌঁছে যাবে। তাকে কেউ একজন নিষেধ করে বলল এমনটা করবেন না। সে মনকে ওই খাবার থেকে তুলে নিল। এখন তো তুলে নিল কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে? আমাদের মনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি আছে সেগুলোই এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে, যার ফলে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি, হাত, পা এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। মন আর এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোন তফাৎ নেই, এরা সব কটাই একই উপাদান দিয়ে তৈরী। ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। এরা করে কি – মন বলল ওখানে ভালো গান হবে, চলো যাওয়া যাক। মন এখন এই গানের আকার ধারণ করে নিল। মনের ইচ্ছে হলেই তো আর হবে না, সূক্ষ্ম ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে হবে। মন তার পা কে বলল – কি যাওয়া যাবে তো? পা বলল – খুব ভালো কথা, আমার বহিরেন্দ্রিয়ের যে দুটো পা আছে ওরা দুজনেই তৈরী আছে। তারপর সে হাঁটা আরম্ভ করল। কিন্তু যে সাধক, এ ধরনের গানের আসরে যাওয়া মানে তার সাধনায় বিঘ্ন উৎপন্ন করা। তাই প্রথম কাজ হবে পায়ের নড়াচড়াকে বন্ধ করা। দ্বিতীয় ধাপ – পাদেন্দ্রিয় যে গানের রূপ নিচ্ছে এই রূপ নেওয়াটা বন্ধ করতে হবে। পাদেন্দ্রিয়কে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। মন যখন খবর পেল যে আজ সন্ধ্যায় গানের আসর হবে তখন মন যে রূপ নিচ্ছে সেই সঙ্গে পাদেন্দ্রিয় যেন সেই রূপটা না নেয়, সে যদি transform হয়ে যায় তাহলে যে করেই হোক সে তার পা দুটোকে চলতে বলবে আর সেও ওখানে পৌঁছে যাবেই।

যিনি যোগী হতে চাইছেন তিনি যদি দেখেন কোন খাবারের প্রতি তাঁর এখনও আকর্ষণ আছে বা কোন চেহারার প্রতি আসক্তি আছে তাহলে তাঁকে তার স্থূল ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় থেকে তুলে নিতে হবে। এখন এই যে তুলে নেওয়া হল এরপর দেখতে হবে সে যেন আর কোন ভাবেই ছাড়া না পেয়ে যায়। এর জন্য বিশেষ শক্তির দরকার। হাতিটাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যাবে না, হাতিকে এবার শিকল দিয়ে বাঁধতে হবে। হাতিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা যতটা সহজ সাধ্য শেকলে বাঁধাটা তার থেকে অনেক কঠিন। বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে, ঘন্টা বাঁধাটাই যত ঝামেলার ব্যাপার। এটাই প্রত্যাহার – দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রথমে শক্তি অর্জন করতে হবে বিষয় থেকে মনকে তুলে আনার জন্য, আর দ্বিতীয় শক্তি অর্জন করতে হবে মন যাতে আর এই বিষয়ের প্রতি কখনই ধাবিত না হয়। যে জিনিষ থেকে যখন মনকে তুলে নেওয়া হবে, চিরদিনের মত তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, আর কখনই সেই বিষয়ে মন যাবে না। এটাই ঠিক ঠিক প্রত্যাহার। প্রত্যাহার মানে, মনকে এমন ট্রেনিং দিতে হবে যে, কোন কারণে ইন্দ্রিয় আর তার বস্তুর যোগ হয়ে যায় তাহলেও যেন ইন্দ্রিয় কোন রকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি না হয়।

স্বামীজী তাঁর জীবনের একটি ঘটনা নিজে বলছেন – একবার প্যারিসের কোন এক জায়গায় তিনি এক অত্যন্ত রূপসী মহিলাকে দেখেন। ওই রকম রূপসী তিনি কখন নাকি দেখেননি। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর মনে হয়েছে কী সুন্দর মুখ মহিলার, ততক্ষণে ঘুরে দেখেন মহিলার মুখের আকৃতিটা পাল্টে একটা

বানরের মুখে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার মানে, স্বামীজীর মন এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে দৃক্ ইন্দ্রিয় যতক্ষণে ওই রূপসী চেহারার সঙ্গে এক হতে যাচ্ছে তখন সে মনকেও ওখানে টেনে নিয়ে যাবে, মনকে টেনে নিয়ে গেলে এবার শরীরের বাকি অঙ্গগুলোও আস্তে আস্তে নড়েচড়ে উঠবে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তার আগেই মন খ্যাঁচ করে ইন্দ্রিয়ের সংযোগটা কেটে দিয়েছে। কি করে কেটে দিয়েছে? ওই মুখটাই পাল্টে দিয়ে বানরের মুখ করে দিয়েছে। কোন মানুষ বানরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। সেখানেই প্রত্যাহার হয়ে গেল। কান যেমন ভালো ভালো গান শুনতে চায়, আপনি যাকে ভালোবাসেন তার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে চান, যাকে ভালোবাসেন তাকে দেখতে চান, যে খাবারটা খেতে ভালো লাগে সেই খাবারটা আশ্বাদ করতে চান। যে সুগন্ধ ভালো লাগে সেটা নাক দিয়ে আশ্রাণ করতে চান। ইন্দ্রিয় আর মনের এই যে প্রবণতা, এটাকে আটকে দেওয়া। ইন্দ্রিয়কে আটকে দেওয়া মানেই মনে যে বৃত্তি উঠবে আর মন সেই বৃত্তির যে আকৃতি নেবে, মনে যে তার সাথে একাত্ম বোধ করবে, এগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া। কোন কারণে মনের মধ্যে যদি বাইরে থেকে কোন কিছু তরঙ্গ এসেও যায় তাতে মনে কোন বিক্ষিপ্ত উৎপন্ন হবে না। আমাদের মন হল ছুটন্ত ঘোড়া, টগবগ করে ছুটছে। দূরন্ত ঘোড়ার কত শক্তি! কিন্তু কুশল দক্ষ সহিস সেই দূরন্ত ঘোড়াকেও নিজের বশে এনে ঘোড়াকে নিজের খুশি মত চালনা করে। এখানেও উদ্দেশ্য হল শক্তিশালী মনকে নিজের বশে নিয়ে আসা। একদিকে মনের এত শক্তি কিন্তু বুদ্ধি সেই মনকে নিজের বশে রেখে ইন্দ্রিয়ের কথা মত চলা থেকে তাকে আটকে দিচ্ছে।

প্রত্যাহারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কি হবে? বলছেন – **ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।।৫৫।।** তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়গুলো বশীভূত হয়ে গেলে সমস্ত শরীরটাই নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। স্বামীজী বলছেন – ‘যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্যকে জয় করিতে পারিবেন; সমগ্র শরীরটাই তাঁহার বশীভূত হইবে। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলেই মানুষ দেহধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিক ঠিক বলিতে পারে ‘জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমি সুখী’। যিনি যোগী তিনি কখনই বলবেন না যে শরীরটা একটা জঞ্জাল। বরং তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন এই রকম একটা সুন্দর শরীর পাওয়ার জন্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়ার মত শরীরকে একটু ইশারা করলেই বুঝে নেয় তাকে কি করতে হবে – কখনই সে ভুল জায়গায় চলে যায় না, কখনই তার মধ্যে কোন ধরণের উত্তেজনা আসে না, কখনই সে অবসন্ন হয় না, কখনই তাকে কোন ধরণের রোগ ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে না, তার কোন ধরণের চাহিদাও নেই। তখন যোগী নিজেকে ধন্য মনে করেন।

এই সূত্রে এসেই সাধন-পাদ শেষ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় বিভূতি-পাদ। সমাধি-পাদে অত্যন্ত উচ্চ ধরণের সমাধির কথা বলা হয়েছিল, যেগুলো আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা খুব কঠিন মনে হতে পারে। সাধন-পাদে তাই খুব সহজ ভাবে রাজযোগের সাধনার কথাই বেশি বলা হয়েছে। তার সাথে যোগ সাধনায় কত রকমের বিঘ্ন আসতে পারে, সেই বিঘ্নগুলিকে কীভাবে দূর করতে হবে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যোগ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতি ও পুরুষকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধন-পাদের শেষাংশে অষ্টাঙ্গযোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভূতি-পাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উপর আলোচনা করা হবে।

বিভূতি-পাদ

এই অধ্যায়ের নাম সিদ্ধিপাদ বা বিভূতি-পাদ। সাধনা করতে করতে কি কি ধরনের সিদ্ধি আসতে পারে, সেই সম্বন্ধে এখন বলা হচ্ছে। সিদ্ধির ব্যাপারে আগে থেকে জানা থাকলে দুটো জিনিষ হয় – সাধনা করে করে কোন স্তরে পৌঁছাচ্ছে বোঝা যায়, মানে নিজেকে একটা তুলনামূলক বিচার করা যায়। দ্বিতীয়, সিদ্ধি আসতে থাকলে সাধকের যোগের উপর বিশ্বাসটা দৃঢ় হয় আর তার নিজের মনোবলও বৃদ্ধি পায়। তবে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা হল, সব কটি অধ্যায়েই সব কিছু মিলেমিশে রয়েছে। সমাধি-পাদে সমাধির কথা বলা হলেও যোগের অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আবার সাধন-পাদে সাধনার কথা বলা হলেও সেখানেও কিছু কিছু সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, এই অধ্যায়েও যে শুধু সিদ্ধির কথাই বলা হবে তা নয়, সিদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেও বিভূতি-পাদে বর্ণনা করা হবে।

স্বামীজী বলছেন সব শক্তি তোমার ভেতরেই, বাইরে থেকে কোন শক্তি আসে না। আমরা ভাবি আমাদের নিজের কাছেই লোক থেকেই আমরা আনন্দ পাই, সুখ পাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মানুষ যা কিছু পায় সব নিজের ভেতর থেকেই পায়, বাইরে থেকে কিছু আসে না। ধ্যানের গভীরে যত প্রবেশ করতে থাকবে আত্মার শক্তির প্রকাশ তত বাড়তে থাকবে। মনের যে শক্তি তা আত্মারই শক্তি। ধ্যান করা মানে মনের বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। বৃত্তি সমূহকে যখন নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয় তখন ভেতরে নানা রকম শক্তি আসতে শুরু করে। এই শক্তিগুলিকেই বিভূতি বলা হয়। বলা হয় আধ্যাত্মিক পথে এই বিভূতিগুলিই আবার বিরাট বিঘ্ন রূপে দাঁড়িয়ে যায়। যোগের দৃষ্টিতে বিঘ্ন হলেও সাংসারিক দৃষ্টিতে এই বিভূতিই বিরাট ঐশ্বর্য। বিভূতি মানে যোগ সিদ্ধাই, সিদ্ধাই মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র আধারের মানুষ মনে করে আমাদের যদি কোন বিশেষ ক্ষমতা হত তাহলে খুব ভালো হত। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, যাঁরা ঈশ্বরের পথে ঠিক ঠিক এগোচ্ছেন তাঁরা বুঝতে পারেন এই বিভূতিই ঈশ্বরের পথে বিরাট জ্বালা-যন্ত্রণা স্বরূপ। কিন্তু মজার ব্যাপার হল সিদ্ধাই বা বিভূতি পাওয়া অত্যন্ত সহজ, কিছু দিন খুব গভীর ভাবে জপ ধ্যান করলেই সিদ্ধাই আসতে শুরু করে দেবে। কিন্তু সিদ্ধাই আসার পর এর আনুষ্ঠানিক কত যে উপদ্রব আর জ্বালা তৈরী হবে কল্পনাই করা যাবে না। সাধুদের যে পতন হয়, দুর্নাম হয় সব এই বিভূতির জন্যই বেশি হয়। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বিভূতিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভূতিকে বড় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসলে বেশীর ভাগ লোকই শক্তি, ক্ষমতা, ঐশ্বর্যের কাঙাল। যে সাধুর যত সিদ্ধাই তার কাছে মন্ত্রী থেকে শুরু করে নীচের দিকে যত চুনোপুটি আছে সবাই তত ভিড় করবে। যেখানেই শক্তির প্রকাশ বেশী সেখানেই আকর্ষণ। আমাদের কাছে মুক্তির কথা তো এখন তেলেভাজা চপ-কাটলেটের মত সহজলভ্য হয়ে গেছে। কিন্তু আসল মুক্তি আর কজন চাইছে, বন্ধনে আছি কিনা তাই আমরা জানি না, বন্ধনে আছি বুঝলে তবেই তো সে মুক্তির জন্য চেষ্টা করবো। তাই মুক্তির কথাতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। তাহলে কিসে আগ্রহ আছে? ধর্ম করতে আমরা সবাই রাজী আছি, যোগ করতেও রাজী আছি। আর এনারাও জানেন যোগের অত গুহ্য কঠিন কঠিন কথা আমাদের মাথাতেও ঢুকবে না। তাই এদের কিছু চমৎকারিত্ব না দেখলে হবে না। আমাদের সবার আগ্রহ চমৎকারিত্বে। আপনি সাধু? খুব ভালো কথা কিন্তু তার আগে বলুন আপনার সিদ্ধাই ফিদ্ধাই আছে কিনা। যোগ আমাদের জন্য বলছেন যোগাভ্যাস করলে সিদ্ধাই কীভাবে আসে আর কী ধরনের সিদ্ধাই আসে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

এর আগে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিভূতির সম্বন্ধে বলার আগে ধারণাকে বিশ্লেষণ করছেন। প্রথম পাঁচটিকে যোগের বহিরঙ্গ সাধনা বলা হয় আর পরের তিনটি ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে অন্তরঙ্গ সাধনা বলা হয়। ধারণাতে বলছেন – **দেশবন্ধুশিভস্য ধারণা** ॥১॥ যে কোন একটা বিষয়ের উপর যখন মনকে অনেকক্ষণ ধরে রাখা হয় তখন তাকে বলা

হয় ধারণা। আমরা কথায় কথায় বলি – এই বিষয়ে তোমার কোন ধারণা নেই, এখানে এই ধারণার কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু এটা ঠিকই যে, যখন কেউ বলে আপনি কি বলছেন আমি ধারণা করতে পারছি না, তার মানে সে তাঁর কথাতে মন বসাতে পারছে না। এখানে বলতে চাইছে একটা জিনিষের উপরে বেশ কিছুক্ষণ মনকে একাগ্র করে রাখা। যদি বলা হয় ঠাকুরের বিগ্রহের উপর মনকে দু মিনিটের জন্য একাগ্র করতে, তখন হয়তো একাগ্র করতে পারব। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মন ওখান থেকে ছিটকে যাবে, হাজারটা চিন্তার স্রোত এসে ঠাকুরের থেকে মনকে সরিয়ে অন্য দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যখন বেশ কিছু সময় ধরে ঠাকুরের ওপরে মনকে একাগ্র করে ধরে রাখতে সক্ষম হবে তখন তাকে বলবে ধারণা। কিন্তু মন যে ছিটকে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন একটা দেশে গিয়ে যখন আপনি আপনার মনকে আটকে দিচ্ছেন, তখন তাকে বলছেন *চিত্তস্য ধারণা*। ধারণা মানে একটা জিনিষকে ধারণ করে ধরে রাখা বা রেখে দেওয়া। এখানে চিত্তকে একটা জায়গায় রেখে দেওয়া হল। বলছেন – এই ধারণা শরীরের ভেতরে হতে পারে আবার শরীরের বাইরে অন্য কোন পবিত্র বস্তুর উপরেও হতে পারে। যেমন কেউ হয়ত নিজের নাসাগ্রে মনকে একাগ্র করছে কিংবা দুই ভ্রুর সংযোগ স্থলে বা হৃদয়ে, যে কোন জায়গাতে করতে পারে, একেও তখন ধারণা বলা হয়। যখন একটি জায়গায় মনকে কেন্দ্রিত করা হয় তখন মন তার স্বভাব অনুযায়ী আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যায়। এতে যে যোগ সাধনায় খুব অগ্রগতি হবে তা নয়, কিন্তু মন শান্ত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। মন শান্ত হলে মানসিক উদ্বেগ এবং উদ্বেগ জনিত শারীরিক ব্যাধি গুলোও কমে যাবে। মনকে যদি একই জায়গায় বারো সেকেণ্ড রাখা যায় তখন সেটাকে বলছেন ধারণা।

এবারে ধ্যানের কথা বলা হচ্ছে – *তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্।।২।।*। একতানতা মানে এক ভাবে প্রবাহিত হওয়া। এই ধারণা যখন অনেকক্ষণ ধরে টানা চলতে থাকে তখন তাকে ধ্যান বলা হয়। স্বামীজী এখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, একটি বস্তু বা শরীরের কোন স্থানে মনকে ধরে রাখার পর শরীর ও মনের সর্ব প্রকারের অনুভূতি ওই অংশ দিয়েই আসতে থাকবে আর এর বাইরে যা কিছু আছে তাদের আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। ধারণা আর ধ্যানের মধ্যে পার্থক্য হল একাগ্রতার গভীরতা ও স্থায়িত্বের মধ্যে। কোন কোন যোগীর মতে বারো সেকেণ্ড কোন জিনিষের উপর মনকে ধরে রাখলে একটি ধারণা হবে, আর এই রকম বারোটা ধারণা হলে হবে ধ্যান এবং বারোটা ধ্যান হলে হবে সমাধি। সমাধিতে আরো গভীরতা হয়।

পদ্মফুলের খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে বোঝান যেতে পারে। পদ্মফুল হল তন্ত্রের খুব প্রচলিত ধ্যানের বিষয়। আপনি ঠিক করলেন হৃদয়ে একটা প্রস্ফুটিতে পদ্মফুলের উপর মনকে একাগ্র করবেন। ঠাকুর বলছেন হৃদয় হল ডঙ্কামারা জায়গা। এখন সেই পদ্মফুল সহস্রদল হতে পারে, দ্বাদশ দল বা অষ্টদল হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না, আপনি সেই পদ্মফুলের উপর ধ্যান করছেন। এখন আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে শুধু পদ্মফুলেরই অনুভূতি আসছে। এইভাবে বারো সেকেণ্ড টানা মনকে যদি ওই পদ্মফুলের উপর ধরে রাখতে পারেন তখন এটাই আপনার একটি ধারণা হয়ে যাবে। বারো সেকেণ্ড ধারণা মানে আপনার একটি ধারণা হয়ে গেল, এইভাবে চব্বিশ সেকেণ্ড ধারণা হয়ে গেলে দুটি ধারণা হয়ে যাবে, তেমনি ছত্রিশ সেকেণ্ড ধরে রাখা মানে তিনটে ধারণা হয়ে গেল। আপনার হৃদয়ে একটি প্রস্ফুটিতে পদ্মফুল আছে আর সেখানে আপনি টানা তিন চারটে ধারণা করে নিতে পারছেন, তার মানে এবার আপনি ধ্যানের দিকে অনেক এগিয়ে গেলেন। এরপর আপনার বাকি সব কিছু বৃত্তি চলে গেল। এখন আপনার হৃদয়ে যে পদ্মফুল আছে সেই পদ্মফুলের বোধটুকু শুধু থেকে গেল। আপনার হৃদয়ে পদ্মফুল আছে এই বোধটাও আর থাকছে না। তার মানে, আপনার যে শরীর বোধ, আপনার হৃদয়ে আপনি যে পদ্মফুলের ধ্যান করছেন এই দেহবোধটাও উড়ে গিয়ে শুধু প্রত্যয়, ওই পদ্মফুলটাই আছে এই জ্ঞানটাই থেকে যাচ্ছে। তৃতীয় স্তরে গিয়ে পদ্মফুলের বাইরের আকারটাও চলে যায়। আকারটা চলে গিয়ে শুধুমাত্র তার জ্ঞানটুকু ভাসতে থাকে, অর্থাৎ শুধু অর্থটুকু থেকে যায়, এটাই সমাধি।

সমাধির ব্যাপারে বলছেন – *তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।।৩।।* যখন বস্তুর যত রকমের আকার হতে পারে, সমস্ত আকার পরিত্যক্ত হয়ে যায় আর একমাত্র বস্তুর অর্থের উপর মনকে টানা অনেকক্ষণ ধরে রাখছে তখন তাকে বলছেন সমাধি। সমাধির দুটো দিক – কত গভীর আর টানা কতক্ষণ থাকা হচ্ছে। কিন্তু এর থেকেও যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সমাধিতে সমস্ত রকমের বাহ্যিক রূপ বা আকারের লোপ হয়ে যায়। *স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ*, সমাধিতে স্বরূপটাও চলে যায়। এখানে এসে এতক্ষণ যে পদ্মফুলের ভাবনাটা ছিল সেই ভাবনাটাও সমাধিতে চলে গেল। ভাবনাটা চলে গিয়ে পদ্মফুলের অর্থটুকু শুধু থেকে গেছে। এই জায়গাতে এসে একজন আচার্যের পক্ষে তার ছাত্র বা শিষ্যদের ধ্যান আর সমাধির ব্যাপারটা ঠিক মত বোঝান অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এই জায়গাটা বুঝতে হলে যাঁরা এখানে পৌঁছে অভিজ্ঞতা লাভ করেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারেন, নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া এই জায়গা কাউকে বোঝান আর শুনে বুঝে নেওয়া দুটোই অসম্ভব।

যখন আমরা প্রথম ধ্যান করতে বসি তখন আমাদের সবারই শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের বোধ হতে থাকবে। এরপর কিছু উপাচার করার পর মনকে হৃদয়ে অবস্থিত একটি পদ্মফুলের উপর নিয়ে এলাম। এটাই ধারণা, ধ্যান ও সমাধির প্রথম ধাপ। এরপর শরীরের উপর থেকে পুরোপুরি মনকে সরিয়ে আনলাম, এবার হৃদয়ের বোধটাও চলে গিয়ে শুধু পদ্মফুল বোধটা থেকে যাবে। এই অবস্থায় আমার পায়ে বা হাতে যদি মশা কামড়ায় সেই বোধটাও হবে না। মশা কামড়ানোর বোধ যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে মন এখনও শরীর বোধে পড়ে আছে। দ্বিতীয় ধাপের লক্ষণই হল দেহবোধটা চলে যায়। শেষ ধাপ হল, ওই যে পদ্মফুল, যাকে আশ্রয় করে আপনার দেহবোধকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই পদ্মফুলটাও উড়ে গেছে। পদ্মফুল উড়ে গিয়ে তার অর্থটুকু থেকে গেছে। আপনার মন আরও গভীরে চলে গেছে। একটা জিনিষের উপর এই ভাবে বারো সেকেণ্ড মনকে যদি স্থির করে রাখা যায় তখন সেটাই হয়ে যাবে একটা ধারণা। এইভাবে বারোটি ধারণা যদি হয়ে যায় তখন সেটাকে বলছেন ধ্যান। বারোটি ধারণা মানে একশ চুয়াল্লিশ সেকেণ্ড। বারোটা ধ্যান যদি হয়ে যায় তখন সেটাই হয়ে যাবে সমাধি। সমাধিতে দেহবোধ, জগৎ বোধ সব চলে যাবে।

আপনার ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ। গুরুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করা মানে শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন রক্তমাংসের মানুষ বা ব্যক্তি রূপেই ধ্যান করা। প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন জীবন্ত ব্যক্তি রূপেই ধ্যান করা শুরু করতে হয়। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ফটো রূপেই ধ্যান করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই ছবি নন। এরপর ঠাকুরের ছবিকে সরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে একটা মূর্তি রূপে ধ্যান করতে শুরু করছেন। এটাও কোন ধ্যান নয়, এগুলো নিছক কল্পনা মাত্র। কিন্তু প্রথমেই হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন জীবন্ত ব্যক্তি রূপে ধ্যান করতে শুরু করলে তখন আর সেখানে কোন কল্পনা নেই, সত্যি সত্যিই জীবন্ত অনুভব করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণই আছেন। এবারে আপনি এসে ধারণার স্তরে পৌঁছালেন। এখন এই ধারণা ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরে যেতে শুরু হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধারণার মধ্যে আর কোন ধরণের অন্য কোন চিন্তা প্রবেশ করছে না, শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধারণার মধ্যে এখন কোন বিচ্ছেদ নেই। এর পরের ধাপেই শুরু হয় ধ্যানের প্রক্রিয়া। ধ্যানে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছাড়া শরীর, মন থেকে শুরু করে জগতের সমস্ত কিছুর অনুভূতি চলে যাবে। আর শেষ ধাপে অর্থাৎ যখন সমাধিতে চলে যাবেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের যে রূপ এতক্ষণ ধ্যানে ছিল, সেই রূপটাও উড়ে যাবে। তাহলে কি পড়ে থাকবে? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থটাই তখন শুধু থাকবে। তখনও এটা কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি নয়। মন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে স্থিত হয়ে গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবের মূর্ত রূপ সেই মূর্ত রূপটাই থেকে যায়। এখন প্রশ্ন হল, শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থ কি? শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থও অন্যদের বোঝান খুব কঠিন, যারা বোঝেন তাঁরাই বোঝেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সেই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই মূর্ত দেহধারী মানব রূপ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের মূর্ত রূপ। এই অবস্থায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বা জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের ভাবটাই শুধু ভাসমান হয়ে থাকবে। আধ ঘন্টার মত যদি আপনার কোন শরীর বোধ না থাকে, ওই একটি ভাবেই আপনি হারিয়ে আছেন, সেটাই তখন সমাধি।

এই সমাধি মনেরই একটা অবস্থা। এর আগে আমরা যে সবিচার, সবিতর্ক, সানন্দা, সাস্মিতা সমাধির আলোচনা করেছি এই সমাধিও ওই শ্রেণীর। স্বামীজী এখানে তাই উপমা হিসাবে একটা পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন। যে কোন বইয়ে লেখকের নিজস্ব বক্তব্যের কিছু কথা লেখা থাকে। বইটি পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকা যখন ওই বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যাবে তখন বইয়ের যে বক্তব্য আর তার যে সত্তা, এই দুটো এক হয়ে মিশে যায়। যখন হলে কোন সিনেমা দেখতে থাকি তখন ওই সিনেমার কোন চরিত্রের সাথে আমরা একীভূত হয়ে যাই, সিনেমায় কতটা নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে গেছি বোঝা যাবে যখন আমরা এর কোন চরিত্রের সাথে কতটা একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। সিনেমা শেষ হয়ে গেলে আমাদের যেই সঙ্ঘ ফিরে আসে তখন সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। বই পড়ার ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়। যখন নিবিষ্ট হয়ে কোন বইয়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি, তখন ওই বই যে ভাবটা দিতে চাইছে, সেই ভাবের সঙ্গে আমার সত্তা মিশে যায়। এই একাত্ম হওয়াটা যত গভীর হবে সেটাই তখন ধ্যানের সংজ্ঞা লাভ করবে। একই ভাবে যখন কোন বিগ্রহের বা দেবতার ধ্যান করছে তখন সে আলাদা আর বিগ্রহ বা দেবতাকে আলাদা মনে হবে। এখন সে তাঁর কাছে এসে গেছে, এখন থেকে আস্তে আস্তে একাত্ম হতে থাকবে। এই একাত্ম হয়ে যাওয়ার পর তখন আর দুই থাকে না, তার যে সত্তা আর সেই বিগ্রহের সত্তা দুটো একাত্ম হয়ে যায়। তখন বিগ্রহের বা দেবতার অর্থটা শুধু থাকে।

সমাধিতে দুটো সত্তা একই ভাবের মধ্যে এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ভাব আর আমিও একটা ভাব, সমাধিতে এই দুটো ভাব অবিচ্ছিন্ন ধারায় এসে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। কিন্তু রাজযোগের আদর্শে এই সমাধি কিছুই নয়, খুবই সাধারণ মানের সমাধি।

ধারণা মানে মনকে বস্তুর বাহ্যিক আকারের উপরে ধরে রাখা, ধ্যান হল একমাত্র অনুভূতির উপরে মনকে ধরে রাখা আর সমাধি হল শুধু অর্থের উপর মন একাত্ম হয়ে যাওয়া। যখন কোন শব্দের উপরেই মনকে ধরে রাখছেন তখন এটাও এক ধরনের একাগ্রতা। এরপর শব্দকে ছেড়ে দিয়ে স্নায়ুর মধ্যে যে শব্দের কম্পন অনুভূত হচ্ছে সেটার উপর যদি মনকে ধরে রাখেন, তখন এটা দ্বিতীয় ধরনের একাগ্রতা হল। এরপর শব্দ আর তার অনুভূতি দুটোকেই ত্যাগ করে কেবল মাত্র শব্দের অর্থের উপরেই মনকে একাগ্র করছেন, তখন আবার তৃতীয় ধরনের একাগ্রতা এসে গেলে, এই তৃতীয় ধরনের একাগ্রতাই সাধককে আরও ধ্যানের গভীরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ধারণা + ধ্যান + সমাধি = সংযম

এরপর বলছেন, ধারণা, ধ্যান আর সমাধি, এই তিনটে মিলিয়ে যখন একটানা আধ ঘন্টা একটা জিনিষের উপর মন কেন্দ্রিত হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় সংযম – **ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।।৪।।** আমরা যখন বলি তোমার বাক্ সংযম কর, তোমার ইন্দ্রিয়কে সংযম কর, এই সংযমের সাথে এখানে যে সংযমের কথা বলা হচ্ছে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই সংযম হল রাজযোগের একটি বিশেষ পরিভাষা, যখন ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এক সঙ্গে হবে তখন তাকে সংযম বলা হয়। যোগে সংযম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

এখন বলছেন যদি আপনি এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারেন যেখানে আপনি আধ ঘন্টা ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করে যাচ্ছেন আর আপনার কোন দেহবোধ নেই, সংসারবোধ নেই। অন্য কোন কিছু আছে কি নেই এই ব্যাপারেও কোন হুঁশ নেই, শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থটুকুই আছে, তখন এটাই আপনার সংযম হয়ে যাবে। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের জপ করে যাচ্ছেন তাতে কিন্তু ধ্যান হয় না। কারণ জপে শ্রীরামকৃষ্ণ শব্দটাই ঘুরতে থাকে, যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থ আর অর্থের সাথে যে জ্ঞান জড়িয়ে রয়েছে, সেই জ্ঞানটা আসে না। কারণ আপনার মন অনবরত বিড় বিড় করে যাচ্ছে, মন বিড় বিড় করলে সেখানে আর জ্ঞান আসতে পারবে না। সেইজন্য জপকে বলা হয় প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্বের সোপান। দিনে দশ পনের হাজার এক নাগাড়ে জপ করলে মনটা সংযমিত হওয়ার শিক্ষা পায়। তারপর শিক্ষণ প্রাপ্ত ওই মনকে তখন কোন একটা বিষয়ে একাগ্র করা যায়। একাগ্র করার পর আপনি যখন আস্তে আস্তে আরও গভীরের দিকে মনকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন একটা অবস্থায় এসে দেখবেন ধ্যানে

বসলে একটু পরেই দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ এই নামের আর কোন গুরুত্ব থাকে না, শ্রীরামকৃষ্ণের যে রূপ তারও গুরুত্ব হারিয়ে যায়, নাম ও রূপ হারিয়ে গিয়ে তখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নামের যে অর্থ আর সেই অর্থের জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত প্রবাহিত হতে থাকে। এখানে না থাকবে আপনার দেহবোধ, না থাকে সংসারবোধ, কোন কিছুই বোধ থাকবে না। ওই সময় আপনার গলা যদি কেটেও দেয় তাতেও কোন বোধ আসবে না। ধ্যানের এটাই পুরোপুরি বাস্তব চিত্র। যোগীরা, শুধু যোগীরাই কেন, সাধারণ মানুষও যদি এইভাবে ধ্যান করে তাদেরও কোন কিছুই বোধ থাকবে না। এই তিনটেকে মিলিয়ে সংযম। এর অর্থ হল, আপনার ধ্যান যদি খুব গভীরে চলে যায়, খুব একাগ্র হয়ে যায় তখন এটাকেই বলছেন সংযম। কারণ মনের একাগ্রতা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটেকে মিলিয়েই চলে, শুধু মনের গভীরতার তারতম্যের তফাৎ থাকে।

সংযমেই আসে প্রকৃত বস্তু জ্ঞান

সংযমকে আয়ত্ত করলে কি কি হয় সেটাই এবার পর পর বলবেন। সংযম মানে, এখন ধ্যেয় বস্তুর শব্দও থাকছে না, রূপও থাকছে না একমাত্র তার অর্থটাই থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনার বস্তুর জ্ঞানটুকু থেকে যাচ্ছে, এতে আপনার কি হবে? বলছেন – **তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।।৫।।** যদি সমাধি লাভ হয় তখন তাঁর **প্রজ্ঞালোকঃ** হয়ে যায়, প্রজ্ঞার আলোককে তিনি জয় করে নেন। জগতের কোন জ্ঞান তাঁর কাছে অজ্ঞাত থাকবে না। যে কোন জ্ঞানের তিনটে দিক থাকে, প্রথম হল একজন কিছু বলছে, তার মুখের শব্দগুলো আমার কানে এসে অনুরণিত হচ্ছে, দ্বিতীয় তার কথার একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং তৃতীয় আমি ওই শব্দের অর্থটা বুঝে নিচ্ছি, জ্ঞান এই ভাবে তিনটে পর্যায়ে হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় আমাদের কাছে এই তিনটে এক সঙ্গে মিশে একাকার হয় থাকে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস করার ফলে মনের ক্ষমতা যখন অনেক বেড়ে যায় তখন এই তিনটিকে – শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানকে স্পষ্ট ভাবে আলাদা করা যায়। আর এই তিনটেকে এই ভাবে যদি আলাদা করে দেওয়া যায় তখন যে কোন বস্তুর রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। যাঁরাই প্রচুর জপ ধ্যান করেন, এবং একটা অবস্থা অতিক্রম করে যাওয়ার পর তাঁদের যে কোন বিষয়ের উপর কোন বই দিলে উনি চট করে বুঝে নিতে পারবেন বইটিতে লেখক কি বলতে চাইছেন। সব কিছু খুঁটিয়ে নাও হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু স্বামীজী সবটাই বলে দিতে পারতেন। কিন্তু মূল বক্তব্যটা আপনি চট করে বুঝে নিতে পারবেন।

অজ্ঞানতা ও স্থূল শরীরের সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা জগতের অনেক কিছুই রহস্যকে ধরতে পারিনা। ধারণা, ধ্যান আর সমাধির দ্বারা যখন একাগ্রতার শক্তি বৃদ্ধি হয় তখন এই একাগ্রতা শক্তির মাধ্যমে জগতের যে কোন বস্তুর রহস্যকে ধরে ফেলা যায় তখন আর কোন কিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। এই কারণে স্বামীজী মনের একাগ্রতার ওপরে খুব জোর দিয়েছেন, একাগ্রতাই জগতের যে কোন বিষয় বা বস্তুর জ্ঞান লাভের চাবিকাঠি। সমাধিবান পুরুষকে আপনি যে কোন বিষয় ধরিয়ে দিন উনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবেন বিষয়ের সারবস্তুটা কি। কী করে বুঝে নেন? সেটাই এই সূত্রের রহস্য – **তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।** প্রজ্ঞা মানে বুদ্ধি, প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞানের আলোককে তিনি জয় করে নিয়েছেন। যেমন যেমন আমাদের মন একাগ্র হতে থাকবে তেমন তেমন যে কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে আয়ত্ত করার শক্তিটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ধ্যান করা শুরু করলেই জ্ঞানের এলাকাটা খুলতে শুরু করে দেয়। জ্ঞানের এলাকা খুলে গেলে সেখানে যে কোন বিষয়, বিজ্ঞান বলুন, ইতিহাস, সাহিত্য, কলা যে কোন বিষয় নিয়ে আসুন সবটাই চটপট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমাদের পরম্পরাতে ‘সর্বজ্ঞ’ শব্দটি খুব প্রচলিত একটি শব্দ। সর্বজ্ঞ মানে যিনি সব কিছু জানেন। সর্বজ্ঞ কি করে হন? বুদ্ধি, যেটা এত দিন defused লাইটের মত ছিল, যেমন কিছু কিছু খাঁজ কাটা গ্লাস আছে, ওর মাঝখান দিয়ে যদি কোন আলো আসে তাহলে আলোটা পরিষ্কার ভাবে আসতে পারে না, যদি ওখানে প্লেন গ্লাস দিয়ে দেন তাহলে পরিষ্কার আলো আসতে থাকবে, যদি আরও ভালো কাঁচ দিয়ে দেন তাহলে আরও জোর আলো আসবে, আর ওই আলোকেই যদি লেসার বানিয়ে দেন, লেসার তো ধাতুকেই কেটে বেরিয়ে যাবে। একই আলো শুধু ওর processটা পাল্টে দেওয়া হচ্ছে।

সর্বজ্ঞ মানে তাই, তাঁর মস্তিষ্ক একেবারে লেসার্ শার্প হয়ে গেছে। জগতে কত রকমের বস্তু আছে, বস্তু মানে বস্তুর সঙ্গে জ্ঞান জড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রজ্ঞালোক জয় করার জন্য বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে যে, যখনই সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে জগতের যে কোন বস্তুতে লাগাবে তখন সেই বস্তুকে ফালা ফালা করে চিড়ে ফেলে বস্তুর ভেতরের জ্ঞানকে আহরণ করে নিয়ে আসবে।

সমাধিবান পুরুষ যখন তাঁর একাগ্র মনকে প্রথমে কোন বস্তুর বাইরের স্থূল রূপে লাগাবেন তখন সেই স্থূল রূপটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই স্থূল থেকে ছাড়িয়ে গিয়ে বস্তুর যে আরও সূক্ষ্ম রূপ আছে তাতে একাগ্র মনকে লাগাতেই বস্তুর সূক্ষ্ম রূপটাও স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। যেখানেই লাগাবেন সেখান থেকেই বস্তুর জ্ঞানটা বেরিয়ে আসবে। যার ফলে বিশ্বরক্ষাণ্ডে এমন কোন বস্তু নেই যে বস্তুর জ্ঞান সমাধিবান পুরুষরা খুব সহজেই লাভ করতে পারবেন না। শুধু মাত্র বস্তুর উপর ধ্যান করলেই বস্তুর সমস্ত জ্ঞান বলুন রহস্য বলুন সবটাই বেরিয়ে আসবে। লাটু মহারাজ জীবনে অক্ষর জ্ঞানই লাভ করতে পারলেন না, কিন্তু সমাধিবান পুরুষ ছিলেন বলেই পরের দিকে তিনি যে কথাগুলো বলতেন সেগুলোই আজ কত দামী কথা হয়ে গেছে।

তারপর বলছেন – **তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।।৬।।** এই যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলা হল, এগুলোকে ধাপে ধাপে প্রয়োগ করতে হয়, কখনই তাড়াছড়ো করতে নেই। উঠে পড়ে খুব জোর দিয়ে মনে করছি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সব কিছু আয়ত্ত্ব করে ফেলবো, এতে তো কিছুই হবে না বরং ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, এটাই এই সূত্রের মাধ্যমে যোগের প্রাথমিক ছাত্রদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিনেই অনেকক্ষণ ধরে প্রচুর ব্যায়াম করলে যেমন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, জপধ্যানও শুরুতেই অনেকক্ষণ ধরে করলে হিতে বিপরীতে হয়ে যায়। যৌগিক স্বাস্থ্যের সুখম বিকাশ বলতে বোঝায়, এতক্ষণ যোগের অনুশীলনের যা যা বলা হয়েছে এগুলোকে ধাপে ধাপে প্রয়োগ করে এগোতে হবে। একটা ধাপ যখন আয়ত্ত্ব এসে যাবে, তখন তার পরের ধাপের অভ্যাস করতে হয়, এই ভাবে এগোলে পতনের আর কোন ভয় থাকে না। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যোগের প্রক্রিয়াগুলো নিরন্তর নিষ্ঠা সহকারে অভ্যাস করার ফলে যা যা ফল আসবে সবই যোগসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি যোগের মূল্য লক্ষ্য কৈবল্যের পথে কোন কাজের নয়। আমার আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে কিন্তু যোগীদের কোন কাজেই লাগে না।

এখন বলছেন আগের পাঁচটির তুলনায় এই তিনটি আরো অন্তরঙ্গ সাধন – **ত্রয়মন্তরঙ্গ পূর্বেভ্যঃ।।৭।।** যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এগুলো মোটামুটি বহিরঙ্গের সাধন, আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আরও অন্তরঙ্গ সাধন।

যদিও এই তিনটি অন্তরঙ্গের সাধন কিন্তু এরা সাধককে নির্বিকল্প সমাধিতে নিয়ে যেতে পারে না – **তদপি বহিরঙ্গ নিবীজস্য।।৮।।** এখনও আমরা প্রকৃতির এলাকায় পড়ে আছি। এই যে এত জ্ঞান লাভের কথা বলা হল, সমাধির কথা বলা হল এগুলো প্রকৃত যে আত্মোপলব্ধির জ্ঞান তার তুলনায় নিকৃষ্ট। কিন্তু এগুলোর মধ্যে দিয়ে না গেলে আত্মোপলব্ধির অবস্থায় পৌঁছান যাবে না। এই তিনটে অন্তরঙ্গ সাধন দিয়ে আপনি সর্বজ্ঞতা পেয়ে যেতে পারেন, কারণ আপনার এখন সেই ক্ষমতা এসে গেছে। এবার ঠাকুরের দিকে তাকান, ঠাকুর তিনিও সমাধিবান, কিন্তু কোন দিন তিনি জাগতিক কোন কিছুতেই মন লাগালেন না। অথচ স্বামীজী তাঁর যোগশক্তিকে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে গেছেন, তিনি শাস্ত্রও পড়ছেন, বাইবেলও পড়ছেন, ইতিহাসও পড়ছেন, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি সবই পড়ছেন। কারণ ঠাকুরই বলছেন নিজেকে মারতে হলে একটা নুড়ুনই যথেষ্ট কিন্তু অপরকে মারতে হলে ঢাল তরোয়াল চাই। স্বামীজীর ঢাল তরোয়াল দরকার। একটা মানুষ অত কম বয়সে কত পড়াশোনা করতে পারবে! যে বয়সে স্বামীজী চিকাগো গেছেন, যেখানে বিশ্বের সমস্ত ধর্মের তাবড় তাবড় পণ্ডিত নেতারা সব বসে আছেন, আর তখনকার দিনে অত বইও ছিলো না বলে স্বামীজীর পক্ষে সব কিছু দেখে ওঠাও সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর এই যোগশক্তি যদি না থাকতো কখনই তিনি এই অমানুষিক কাজ করতে

পারতেন না। স্বামীজী জ্ঞানের গভীরতার যে স্তরে ছিলেন, ওই স্তরে যাওয়া কখনই সম্ভব হত না যদি তিনি যোগের এই শটকাট মেথডে না যেতেন।

আমাদের মন চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এই ছড়ানো মন দিয়ে কোন কাজই হয় না, জ্ঞান লাভ করাতো অনেক দূরের ব্যাপার। ছড়ানো মন দিয়ে ভোগও ঠিক মত করা যাবে না। একটা গাধা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাধার দু পাশে দুটো সমান খড়ের গাদা আছে। গাধাটার খিঁদে পাওয়াতে একটা খড়ের গাদার দিকে খেতে গেছে। খেতে গিয়ে তার চোখের নজরের মধ্যে যতটুকু আসছে সে অতটুকুই খড়ের গাদা দেখছে আর অন্য দিকের খড়ের গাদাটা দেখছে বিরাট উঁচু। গাধাটার মনে হল এই কম গাদার খড় খেয়ে লাভটা কি বরঞ্চ বড় গাদাটার কাছে যাই। তখন হাঁটতে হাঁটতে অন্য দিকে খড়ের গাদার কাছে চলে গেছে। ওখানে গিয়েও সে অতটুকুই দেখছে যতটুকু তার চোখের মধ্যে পড়ছে আর ওই দিকের গাদাটাকে বিরাট উঁচু দেখছে। ওখান থেকে হেটে হেটে আবার আগের খড়ের গাদার কাছে চলে এল। এখানে যখন এল তখন দেখছে ওদিককার গাদাটাতো অনেক বেশী উঁচু। বেশী উঁচু খড়ের গাদাটা খাবে বলে আবার ঐদিকে গেল। এইভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা গাধাটা খালি হেটেই যাচ্ছে, একবার ওই খড়ের গাদার দিকে যায় আরেক বার এই খড়ের গাদার দিকে যায়। মুর্খ গাধা মুর্খ কেন হয়েছে? ছড়ানো মন বলে, একবার ওদিকে যাচ্ছে আরেকবার এদিকে যাচ্ছে। কোনটাতেই খেতে পারছে না। টেলিভিশন যখন দেখছি তখনও আমরা এই গাধার মত আচরণ করে যাচ্ছি। রিমোট হাতে নিয়ে টক টক করে খালি চ্যানেল ঘুরিয়েই যাচ্ছে, মাঝখান থেকে কোন প্রোগ্রামই পুরোটা ঠিক মত দেখতে পারছে না। আপনি বলবেন এই চ্যানেলে এখন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, বিজ্ঞাপন দেখে কেন আমি বোর হতে যাব। কিন্তু আপনি বুঝছেন না এই বোর হওয়াটাও a part of enjoyment, কিন্তু আপনার ধৈর্য নেই বলে এটাকেও ঠিক মত enjoy করতে পারছেন না। তাই ছড়ানো মন নিয়ে মানুষ ভোগও ঠিক মত করতে পারে না। একটা গাধা খড়ের গাদা থেকে খড় খেতে পারছে না, আপনি টিভির একটা প্রোগ্রামও সুষ্ঠু ভাবে উপভোগ করতে পারছেন না, সেখানে আপনি কি করে আশা করছেন যে আপনি বড় কাজ করবেন!

আজকালকার ছেলেমেয়েদের এত ছড়ানো মন যে, কথা বলার সময় চোখের চাহনি, ঘাড়, হাত, পা এমন কায়দা করে নাচাতে থাকবে যে এটাই এদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যাদের শরীরটাই নিয়ন্ত্রণে নেই তাদের লেখাপড়াতে মন কী করে আসবে! আপনার মন যদি একাগ্র হয় তাও আপনার দ্বারা বিষয় জ্ঞান লাভ হবে না। একটা বিষয়কে জানতে হলে চাই সংযম, সংযম মানে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সমাধি মানে একটি বিষয়ে শুধু মাত্র জ্ঞান। এই যে বোতল আছে, এই বোতলের দিকে যদি আমি আধ ঘন্টা তাকিয়ে থাকি তাহলে কি আমার সমাধি হবে? কখনই হবে না। প্রথমে বলছেন, আপনি তাকিয়ে থাকুন, এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এরপর বোতলের আশেপাশে যা কিছু আছে সেগুলোর থেকে দৃষ্টি যেন সম্পূর্ণ চলে যায়। অর্জুন যে কথা দ্রোণাচার্যকে বলছেন ‘আমি পাখির চোখটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি’। পাখির শরীরকেও অর্জুন দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি এখন শুধু মাত্র বোতলকে দেখতে পাচ্ছেন। যখন আপনার শুধু মাত্র বোতলের বোধ আছে এখনও আপনি ধ্যানের অবস্থাতেই আছেন, সমাধির অবস্থা এখনও আসেনি। সমাধি অবস্থায় বোতলটাও থাকবে না, বোতলের জ্ঞানটা শুধু তখন ভাসতে থাকবে। বোতল যে আছে এটাও উড়ে গেল। বোতল একটা অবলম্বন রূপে ছিল সেটাও উড়ে গেছে। এই অবস্থায় কম করে আধ ঘন্টা থাকতে হবে তবে গিয়ে সমাধির অবস্থায় যাওয়া যাবে। এই পর্যায়ের একাগ্র মনকে যখন যে কোন বিষয়ে লাগাবে সেই বিষয়ের জ্ঞান তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। এই ধরনের ক্ষমতা এসে গেলে তার মধ্যে সর্বজ্ঞতা এসে যাবে। তবে এখানে এই ভুল করলে চলবে না যে, ঠাকুরের যে সমাধি হত সেই সমাধি আর এই সমাধি এক নয়, এটা একটা যোগের পরিভাষা মাত্র। একটা বিষয়ে মনকে আধ ঘন্টা ধরে একাগ্র করার পর সেই বিষয়ের যে জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে এটাকে সমাধি বলছে। ঠাকুরের সমাধি আরও অনেক উচ্চস্তরের। এই সমাধি যার হয়ে গেছে সে যদি কারুর শরীরের কোন অঙ্গে বা শুধু শরীরের গঠনের উপর তার মনকে সংযম করে তাহলে সে তার

মনের গঠনটা জেনে যাবে। আর তার মনের উপর যদি সংযম করে তাহলে তার মনের ভেতরে কি হচ্ছে সব জেনে যাবে।

এই সমাধিতে আপনি সর্বজ্ঞতা পেতে পারেন কিন্তু আপনাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কারণ যে বীজ দিয়ে নতুন শরীর তৈরী হবে সেই বীজ এই ধরনের সমাধির পরেও থেকে যায়। সেইজন্য এই ধরনের যত সমাধি হয় সেগুলোকে বলা হয় সবীজ সমাধি। নির্বিকল্প সমাধিই ঠিক ঠিক নির্বীজ সমাধি। সেইজন্য বলছেন *তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য*। এইভাবে যোগে আমরা তিনটে ধাপ পাচ্ছি, প্রথমে আসছে নির্বীজ, নির্বীজ সমাধিতে আমাদের যে সংস্কারগুলো আছে সেগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। তার নীচের ধাপে সবীজ সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সবীজ সমাধি আবার ছয় রকমের – সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার, সানন্দা ও সাস্মিতা। আমাদের একাগ্রতার মাত্রা অনুযায়ী এগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটেতেও আমাদের মনের একাগ্রতা কি রকম তার উপর নির্ভর করে আমরা এখন কোন অবস্থায় আছি আর কি ধরনের সমাধি হচ্ছে। এগুলো সবই বহিরঙ্গ সাধনা। এরও বহিরঙ্গ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, যেগুলো আমাদের অনুশীলনের বিষয়। তারও বাইরে সাধারণ স্তরের জীবন। প্রাথমিক স্তর হল সাধারণ জীবন, সেখান থেকে শুরু হয় যোগাভ্যাস। যোগাভ্যাসে প্রথমে আসে বহিরঙ্গ সাধনা, বহিরঙ্গ সাধনা হল যম, নিয়ম, আসনাদি। তার অন্তরঙ্গ সাধনা হল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যে পরিণাম তা হল ছয় রকমের সমাধি, যে সমাধিগুলোকে বলছেন সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধিরও অন্তরঙ্গ হল অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি, বেদান্তের ভাষায় যাকে বলা হয় নির্বিকল্প সমাধি। কিন্তু যোগের ভাষায় বলছেন সবীজ আর নির্বীজ সমাধি। একদিক থেকে দেখতে গেলে সবটাই সবীজ। যখন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার করছি সেটাও সবীজ, আমাদের যে জীবন চলছে সেও সবীজ। কিন্তু মনের অবস্থাটা পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় মন একেবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যোগাভ্যাস করে করে একটু কুড়িয়ে এল, সেখান থেকে আরও একটু কুড়িয়ে নিয়ে আসা হল, এইভাবে কুড়িয়ে আসতে আসতে শেষে সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধির অবস্থাতে মন একেবারে লেসার্ শার্প হয়ে যাচ্ছে। লেসার্ শার্প হয়ে গেলে সেই মনকে জগতের যে কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর লাগিয়ে দিলেই তার ভেতরের গঠনটা পরিষ্কার ভেসে উঠবে।

সমাধির বিভিন্ন স্তর

এরপর নয় থেকে এগারো এই তিনটে সূত্রে সমাধির তিনটে অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে। দশ নম্বর সূত্র অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধনার তিনটে স্তরভেদ আছে – প্রথম আসছে বহিরঙ্গ সাধনা, যার মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারকে ধরা হয়। দ্বিতীয় আসছে মধ্যভাব, এর মধ্যে আছে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। আর শেষে অন্তরঙ্গ, এখানেই আসে নির্বীজ সমাধি। প্রকৃত জ্ঞান বলতে যেট বোঝায়, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, এই জ্ঞান আসবে একমাত্র নির্বীজ সমাধিতে। যোগীর লক্ষ্য এই নির্বীজ সমাধিকে প্রাপ্ত করা। অষ্টাঙ্গ যোগের কথা যা বলা হয়েছে এর সব কিছুই সেই লক্ষ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য সব রকমের প্রস্তুতি করিয়ে দেবে। কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগের সমাধির অবস্থাতে চলে গেলেও সেখান থেকেও বিশাল পতন হওয়ার সম্ভবনা থাকবে। তিনটে সূত্রের প্রথম সূত্রে বলছেন –

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ।

নিরোধক্ষণচিত্তাধরো নিরোধপরিণামঃ।।৯।।

লম্বা সূত্র হলেও এর অর্থ খুব সহজ। মনে নানান ধরনের বৃত্তি উঠছে, যার মন যত বেশি অস্থির তার মনে তত বেশি বৃত্তি উঠছে। মনকে শান্ত করতে গেলে আগে এই নানান ধরনের চিন্তা ওঠাকে বন্ধ করতে হবে। আমার চোখ খোলা আছে, চোখের দৃষ্টি বোতলের দিকে গেলে মনে বোতলের ভাব উঠছে। চোখ আমি বন্ধ করে নিতে পারি, চোখ বন্ধ করে দিলে বাইরের কোন দৃশ্য ভেতরে যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু বাইরে থেকে অসংখ্য শব্দ কানে আসছে। শব্দকে আটকাবার জন্য আমি সাউণ্ড প্রুফ ঘরে চোখ বন্ধ

করে ধ্যান করতে বসে গেলাম। কিন্তু আমার ভেতরে অসংখ্য স্মৃতি জমা আছে, সেই সঞ্চিত স্মৃতি থেকে এক একটা স্মৃতি এসে রোমন্থন হতে শুরু হয়ে যাবে, সেখান থেকে এসে যাবে নানা রকমের কল্পনা। আমরা আগেই দেখেছি বৃত্তি পাঁচ প্রকার – প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। চোখ বন্ধ আর সাউণ্ড প্রুফ ঘর তাই প্রমাণ বৃত্তি, যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আসার, সেগুলো আসছে না। কিন্তু আমার কল্পনা, আমার স্মৃতি, নিদ্রা বৃত্তি এগুলো তো কাজ করতে থাকবে, এই বৃত্তিগুলো তো সহজে যাবে না। এই অসংখ্য বৃত্তিকে বন্ধ করাটা খুব সহজ সাধ্য নয়। এই যে নানা ধরনের বৃত্তি গুলো উঠছে এগুলোকে আটকানোর একটা উপায় হল, অন্য একটি বড় ধরনের শক্তিশালী বৃত্তিকে দিয়ে ছোট ছোট সব বৃত্তিগুলোকে বন্ধ করতে হবে। এই বৃহৎ শক্তিশালী বৃত্তিটাই সবীজ সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যত রকম সমাধি আছে, সব সমাধিই আসলে এক একটা বৃত্তি। কিন্তু সবীজ সমাধি হল প্রধান মন্ত্র। পাড়ায় যদি একজন বড় মস্তান থাকে তখন সেই পাড়াতে ছিঁচকে চোর, পকেট মার, ছিনতাইবাজদের দৌরাত্ম কম থাকে। বড় মস্তান ছোট ছোট গুপ্তা মস্তানগুলোকে দাবিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখে। এইবার এই যে বড় মস্তান থেকে গেল, একে আপনি কীভাবে ঠিক করবেন তার পথ আপনাকেই বার করে নিতে হবে। সবীজ সমাধিও এই ধরনের একটা বড় মস্তান। মনের মধ্যে যে ছোট ছোট বানর গুলো রয়েছে, সমাধির দ্বারা সব কটাকে দাবড়ে দেওয়া হল।

যেমন আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা করতে থাকলে আস্তে আস্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি মনের মধ্যে একটা খুব শক্তিশালী বৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি মনের মধ্যে যত রকমের বৃত্তি উঠছিল, সব বৃত্তি ওঠাকে বন্ধ করে দেবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তিটাও তো একটা বৃত্তি, সেইজন্য বলছেন *ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভব*, আমাদের মনের অন্দরমহলে অনবরত যে সংস্কারগুলো উঠছে, সেই সংস্কারগুলিকে নিরোধ করার জন্য আরেকটি সংস্কার বা বৃত্তিকে দাঁড় করাতে হচ্ছে। যে সংস্কারকে আমি দাঁড় করলাম এই সংস্কারটা আসলে কি? আমরা এখানে শাস্ত্র শুনছি, গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছি, গুরুর কাছে ধ্যানের বিধি নিয়মের শিক্ষা পেয়েছি, এগুলোর সব কটাকে মিলিয়ে একটা একক বড় সংস্কার তৈরী হচ্ছে। সেই সংস্কার থেকে একটা একক বৃত্তিই অন্য হাজার রকম বৃত্তিকে দমিয়ে দেবে। যেমন যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি বলছেন কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নেই। এবার শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রই সে দিন রাত জপ করে যাচ্ছে, এইভাবে করতে করতে এক সময় এই কৃষ্ণমন্ত্র আর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন, মনের মধ্যে এর আগে যত ভাব বা বৃত্তি উঠছিল, সব কটাকে চাপা দিয়ে দেবে। আমাদের মধ্যে সব রকম বৃত্তিই আছে, অসৎ বৃত্তিও আছে আবার সৎ বৃত্তিও আছে, সৎ বৃত্তিকে অবলম্বন করে অসৎ বৃত্তিকে বার করে দিতে হয়।

কিন্তু এই যে শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তি বা সৎ বৃত্তি নিয়ে আসা হয়েছে এটাও বৃত্তি, এই বৃত্তিকে আমিই দাঁড় করিয়েছি, আমার মনই এই বৃত্তিকে তৈরী করেছে। সমাধি এখানেও হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এই সমাধি সমাধির মধ্যে সব থেকে সাধারণতম সমাধি। মন তো কখন শান্ত থাকবে না, মনের স্বভাবই হল সব সময় সচল থাকা। একটা বৃত্তি দিয়ে তো কিছুক্ষণের জন্য সব বৃত্তিকে দাবিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু এই একমাত্র বৃত্তিটা স্তিমিত হয়ে আসতেই মনের সব বৃত্তি আবার ছড়মুড় করে সামনে এসে আগের মত নৃত্য করতে শুরু করে দেবে। কিন্তু আমার লক্ষ্য হচ্ছে এই মনেরও নাশ করা, কারণ মনও প্রকৃতির এলাকার বাসিন্দা। আমাদের সবারই মূল লক্ষ্য প্রকৃতিকে জয় করে প্রকৃতির পারে চলে যাওয়া। তাই এই শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি বা শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তিকেও নির্বাপিত করতে হবে। সেইজন্য এখানে যে সমাধির কথা বলা হয়েছে, এই সমাধি কখনই শ্রেষ্ঠ অবস্থা নয়। শ্রেষ্ঠ অবস্থা আসে একমাত্র আত্মজ্ঞানে। শঙ্করাচার্যও একই কথা প্রথম থেকে বলে গেছেন, আত্মজ্ঞান ছাড়া মুক্তি হবে না। শুধু যে রাজযোগ বলছে বলে নয়, জ্ঞানযোগও একই কথা বলছে। তবে সাহস দেওয়ার জন্য, উৎসাহ দেওয়ার জন্য কর্মযোগে, ভক্তিরোগে হাজারটা অন্য রকম কথা বলা হয়। অনেকে অনেক রকম কথা বলবে কিন্তু আমরা কেউই জানি না মুক্তি কিসে হয়, তাই আমাদের শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করতে হয়।

শাস্ত্র এই ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার, যতক্ষণ না নিজের স্বরূপকে জানতে পারছে ততক্ষণ কারুরই মুক্তি নেই। নিজের স্বরূপকে জানবো কোন উপায়ে? তখন বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথের কথা বলে দেবে। কর্মযোগ বলবে – তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাও, আর কাজের কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখবে না, এই ভাবে কাজ করতে করতে তোমার মনের বাসনা যেগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তোমার চিন্তা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, শুদ্ধ চিন্তে তখন জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে যাবে। রাজযোগ কি বলছে? এই একই কথা বলছে, তবে কর্মযোগ বাহ্যজগতকে নিয়ে বলছে আর রাজযোগ অন্তর্জগতের কথা বলছে। আসলে বাহ্যজগৎ আর অন্তর্জগতের মধ্যে কোথাও কোন পার্থক্য নেই। যে কোন কারণেই হোক, এখন তোমার মধ্যে যে বৃত্তিগুলি আসছে, এগুলো তোমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলে আসছে, আর তুমি এই বৃত্তি থেকে কখনই বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাই তুমি এর থেকেও আরেকটা বড় শক্তিশালী বৃত্তিকে মনের মধ্যে এনে সব কটা বৃত্তির উপরে চাপিয়ে দাও। কি সেই শক্তিশালী বৃত্তি? রাজযোগ বলবে ওটা আমার ব্যাপার নয়, তুমি ঠিক করে নাও তোমার পক্ষে কোনটা ঠিক ঠিক শক্তিশালী বৃত্তি হবে, হতে পারে এটা একটা উদীয়মান সূর্য, অথবা কোন নৈসর্গিক সুন্দর দৃশ্য, বা ভগবান, কোন দেবতা, যেটা খুশি হতে পারে।

এই মুহূর্তে আমরা জানি না শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ কি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে যেদিন থেকে সাধনা শুরু করা হল, তারপর থেকে এই শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তিটাই শক্তিশালী হতে হতে একদিন এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে সত্যি সত্যিই এক চরম অনুভূতি হবে, যে অনুভূতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আসল স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণই যে সেই সৎ চিৎ আনন্দ সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি একজন ব্যক্তি মাত্র রূপে ভাবা হয় তখন কিন্তু আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। কারণ যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন সাধু বা মহাত্মা বা সাধারণ একজন ব্যক্তি রূপে কল্পনা করছি সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি সেই রকম শক্তিশালী হবে না, যার দ্বারা কোটি কোটি বৃত্তির সব কটা বৃত্তিকে আটকাতে পারব, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত বৃত্তির নাশ।

কেউ যদি মনে মনে এই ভাবকে দৃঢ় করে নিয়ে বলে – আমার নাতি এ হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা আমার নাতি কামারপুকুরের গদাই। এই ভাব নিয়েও যদি সত্যিই কেউ সাধনা করে তাতেও সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করতে এই একটি ভাবই তার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে যাবে, চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করতে তাকে অন্য আর কিছু করতে হবে না। এরপর সাধনা করে করে একটা সময় যেভাবেই হোক যদি সে এই একটি মাত্র বৃত্তিকেও পার করে দিতে পারে তাহলে তারও নির্বীজ সমাধি হয়ে যাবে। সেইজন্য, জাগতিক সম্পর্ক থেকে সরে এসে যাঁদের মধ্যে মহৎ গুণ আছে – শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, বুদ্ধ, যীশু বা অন্যান্য যাঁরা মহাপুরুষরা আছেন তাঁদের চরিত্রের মহৎ গুণগুলির উপরে মনকে একাগ্র করলেও বৃত্তির নাশ করা খুব সহজ হয়ে যাবে।

আজকে আমি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তি দিয়ে অন্য সব বৃত্তিকে আটকে দিয়েছি, কিন্তু কত দিন আটকে রাখতে পারবো? বড় বৃত্তিটা চলে গেলেই আবার সব বৃত্তি আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু ওই একটা বৃত্তিকেই যদি অভ্যেস করে করে দিন রাত একই জিনিষ করে যাই তখন কী হবে? বলছেন, এইভাবে মনকে একাগ্র করার অভ্যাস করলে কি হয় – **তস্য প্রশান্তবাহিত্য সংস্কারাৎ ॥১০১॥** অনেক দিন ধরে যখন এই একটা বৃত্তিকেই অভ্যাস করে যাচ্ছেন তখন এই নিরন্তর চেষ্টির অভ্যাসটাই স্থির হয়ে যাবে, অর্থাৎ এটাই আমার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এর অর্থ হল – আমাদের সবাইকে সারাদিন কাজকর্ম তো করতে হবে, সংসারও চালাতে হবে, সমাজে এর ওর সাথে কথা বলতে হবে, মিশতে হবে, আর এর সাথে সাথে এগুলি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করতে হবে। এখন অভ্যাস করে করে এমন একটা অবস্থায় চলে যেতে হবে, যেই মুহূর্তে ধ্যানে বসার একটু সুযোগ পেয়ে যাব তখনই মনকে একাগ্র করতে পারব। মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দজী) একবার একটা কথোপকথনে বলছেন ‘সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দু ঘন্টা ধ্যান করি, আর তাতেই মন এমন ডুবে যায়, সেখান থেকে যা পাই তাতেই আমার সারাটা দিন একটা ঘোরে কেটে যায়’।

ছোটবেলায় কত কষ্ট করে আমাদের অ, আ, ক, খ লিখতে হত, কত বার ভুল হয়ে যেত, কিন্তু এখন যদি কেউ লিখতে বললে চটপট লিখে দেব। এটাকে অভ্যাস করে করে এত দৃঢ় হয়ে গেছে যে আর কখনই ভুল হয় না। সমাধির ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়। গভীর ভাবে অনেক দিন ধরে অভ্যাস করে করে এমন হয়ে গেছে যে যখনই একটু সুযোগ পেয়ে যাব তখনই মনকে একাগ্র করে ধ্যানে বসে যেতে পারব। এই অভ্যাস করাকে বলছেন *প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ*, প্রশান্ত ভাবে ওই একটা বৃত্তিই থাকছে। যদিও এটি কোন উচ্চ অবস্থার সমাধি নয়, যা আমরা আগেও বলেছি, কিন্তু যত রকমের হিজিবিজি, আজগুবি বৃত্তিগুলি ছিল সব চলে গিয়ে একটা বৃত্তিই থাকছে। ছেলে বিদেশে থাকে, বাড়িতে কাজে কর্মে ব্যস্ততার মধ্যে সব সময় ছেলের কথা মার মনে পড়ে না, কিন্তু যখনই একটু অবসর পেয়ে যাবে তখনই তার সন্তানের কথা ভাবতে শুরু করে দেবে, আর কিছু সময়ের মধ্যেই সন্তানের মধ্যে মা নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয় – যেমনি একটু ফাঁকা পেল, অমনি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ভালোবাসার বিষয়ের চিন্তায় – এই ভালোবাসার বিষয়টি কি? সেই একটি মাত্র বৃত্তি, single বৃত্তি, তা যাই হোক না কেন, তার জন্য কিছু যায় আসে না। মানুষ মাত্রেরই স্বভাব হল, যেখানেই তার ভালো লাগার ব্যাপার আছে, ফাঁকা পেলেই সে সেই ভালোলাগার বস্তুকে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দেবে। এই single বৃত্তিটা যখন পাকা পোক্ত হয়ে যাবে, তখন আবার নতুন ধরণের সংগ্রাম শুরু হবে, সেই সংগ্রাম হল এই single বৃত্তিটাকেও নাশ করা। এই সংগ্রাম সহজ হবে কি কঠিন হবে সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু তার থেকে বড় কথা হল এই একটি বৃহৎ বৃত্তিই আমার মধ্যে জগতের যত আবর্জনা জমে ছিল সেগুলিকে পরিষ্কার করে দেবে।

নিউটন, আইনস্টাইনের মত বড় বড় বিজ্ঞানীরা নিজেদের দৈনন্দীন জীবনে সব রকম কাজই করছেন আবার যখন কোন বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করছেন তখন তাতেই একেবারে ডুবে যাচ্ছেন, তখন খাওয়া-পড়ার কোন হুঁশই নেই। আইনস্টাইন যখন Special Theory of Relativity নিয়ে গভীর ভাবে ডুবে আছেন, সেই সময় তাঁর কয়েক মাস বয়সের একটি ছোট ছেলে ছিল। একদিন তিনি ছোট ছেলেকে এক হাতে চাপড় দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, আর অন্য হাতে দিয়ে Theory of Relativityর উপর লিখে যাচ্ছেন, আর তাঁর পাঁচ বছরের বড় ছেলে বাবাকে সমানে কিছু একটা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, আর উনি শুধু ‘হ্যাঁ বাবা এই হয়ে এল, এই হয়ে গেল, এম্মুণি বলছি’ এই বলে বলে বড় ছেলেকে সামলাচ্ছেন আর বাঁ হাত দিয়ে ছোট ছেলেকে খাবড়ে যাচ্ছেন। ভাবুন এই অবস্থাতে আইনস্টাইন যে থিয়োরি জগৎবাসীকে দিয়ে গেছেন, এখনও এর পুরো প্রয়োগের ব্যাপারটা কেউ বার করতেই পারল না, মন বিজ্ঞানের মধ্যে কতটা একাত্ম হয়ে গেলে ওই অবস্থার মধ্যেও বিজ্ঞানের এত উচ্চ তত্ত্ব বেরিয়ে আসতে পারে ভাবাই যায় না। এই হচ্ছে মনের একাগ্রতা শক্তি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে আছে, তিনি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করতেন, তখন পাখিগুলো তাঁর মাথায় এসে বসে থাকত। পাখিরা ঠাকুরের শরীরকে মনে করত এটা বুঝি কোন নিজীব পদার্থ, আর ঠাকুরের চুলের মধ্যে খাবার খুঁজত। সাপ আসত, ঠাকুরের শরীরের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেত, সাপও বুঝতে পারতো না এটা যে কোন জীবন্ত মানুষের শরীর। এই হচ্ছে একাগ্রতার বাস্তব চিত্র।

সমাধিতে যাওয়ার আগে প্রথমে আমি ছোট ছোট যত বৃত্তি আছে সব কটা বৃত্তিকে ধাক্কা মেরে মেরে সরিচ্ছি। ঠেলাঠেলিতে নোংরা বৃত্তিগুলো চাপা পড়ে গেছে। যে বৃত্তিগুলি চাপা পড়ে গেল সেগুলো আস্তে আস্তে খসে পড়ে যাবে আর ওই একটা বৃত্তিই মনের মধ্যে মাথা তুলে থাকবে। এর আগে আমরা একটা সূত্র পেয়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল বিতর্ক ভাবনে প্রতিপক্ষ ভাবনা। মনের মধ্যে ক্রোধ বৃত্তি এসেছে সেটাকে ভালোবাসার বৃত্তি দিয়ে চাপা দিতে হবে। মনের মধ্যে লোভ বৃত্তি এসে পড়েছে তখন ত্যাগ বৃত্তি দিয়ে লোভ বৃত্তিকে চাপা দিতে হবে। এবার কিন্তু আপনার মন অনেক বেশী একাগ্র হয়ে গেছে, এখন আপনি আপনার ইষ্ট চিন্তন বা কোন একটি শুভ বৃত্তি দিয়েই সব বৃত্তিকে চাপা দিতে সক্ষম হয়ে গেছেন। এটা হল এই পর্যায়ের প্রথম ধাপ। এর দ্বিতীয় ধাপ হল, যে বৃত্তিগুলো চাপা পড়ে বেরিয়ে গেছে সেগুলো বেশ ভালো মতই বাইরে আছে, এই মুহূর্তে ফিরে আসার কোন সম্ভবনা নেই। অর্থাৎ সব বৃত্তি বেরিয়ে গিয়ে ওই একটা শুভ বৃত্তিই আছে। তৃতীয় ধাপ হল, এবার ওই একটি বৃত্তিই টানা

অনেকক্ষণ ধরে চলছে। এখন আপনার মন পুরোপুরি ইষ্ট চিন্তনেই ডুবে আছে। আপনার মনে এখন এই ভয় নেই যে এক্ষুণি আরেকটা বৃত্তি এসে আপনার মনকে উদ্বেলিত করে দিতে পারবে। এই অবস্থায় কি হয়? সেটাই পরের সূত্রে বলছেন – **সর্বার্থ তৈকাগ্রত্যয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্য সমাধিपरिणामः।।**
১১।। প্রথম অবস্থায় মনে অনেক রকম বৃত্তি ছিল সেটাকে একটা বড় বৃত্তি দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় অবস্থায় সব বৃত্তিগুলো এবার দুর্বল হয়ে খসে পড়ে গেছে। তৃতীয় অবস্থায় ওই একটা বৃত্তি এবার টানা বহুক্ষণ চলতে থাকবে, অন্য আর কোন কিছুই মনের মধ্যে উঠছে না।

কি করে বুঝবে যে আমার ধ্যান হচ্ছে? পরের সূত্রেই বলা হচ্ছে কি করে বোঝা যাবে – **শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ো চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ।।১২।।** প্রথমে দিকে আমরা মনের পাঁচ রকম অবস্থার বর্ণনা করেছিলাম – ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মুঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনের একাগ্র অবস্থা কখন হয়? **শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ো**, প্রত্যয় মানে জ্ঞান, এই জ্ঞান মানে বৃত্তি জ্ঞান, যখন এই বৃত্তি জ্ঞান এক সমান ভাবে চলে তখনই প্রত্যয় হয়। মনে একটা প্রত্যয় বা যে ভাব উঠেছে, এই প্রত্যয়টা যদি অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, আগেও টানা একই ভাবে চলছে আর পরেও একই ভাবে টানা চলছে, তখন এটাকেই ঠিক ঠিক একাগ্রতা বলা হয়। আগেকার বৃত্তি আর পরের বৃত্তি এই দুটো বৃত্তি যখন একই রকম হয়ে যায় তখনই চিত্তের একাগ্রতা হয়। অর্থাৎ যখন অতীত ও বর্তমানকে এক মনে হবে। আসল কথা হল মন যখন ঠিক ঠিক একাগ্র হয় তখন সময়ের কোন জ্ঞান থাকে না, সময়ের বোধটাই হারিয়ে যায়। ধ্যানে বসার পর বোধ থাকে না আমি আধ ঘন্টা ধ্যান করছি নাকি এক ঘন্টা ধ্যান করছি। সময়ের এই ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে বোঝা যাবে যখন আমরা কোন কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যাই, একটা বই পড়ছি, কিংবা একটা সিনেমা বা টিভিতে কোন খেলা দেখছি – যখন শেষ হয়ে গেল তখন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে বলি – আরে কোথা দিয়ে এত সময় চলে গেলে বুঝতেই পারলাম না! এতে বোঝাচ্ছে মন কতটা একাগ্র হয়েছিল।

Theory of Relativityর দৃষ্টিতে সময়কে সম্বন্ধযুক্ত করে সময়কে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যোগে অন্য দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় – বলছেন অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, দুটোই মিশে একাকার হয়ে আছে। ধ্যানের গভীরে অতীত আর বর্তমান দুটো মিশে এক হয়ে যায়। অতীত আর বর্তমানের ব্যবধান যদি মুছে যায় তখন বোঝা যাবে যে মন গভীর ধ্যানে চলে গিয়েছিল। মানুষ যাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, সে যখন তার সঙ্গ করছে, তার সঙ্গে যখন কথা বলছে বা তার সান্নিধ্যে আছে তখন তার সময়ের বোধ থাকে না। যখন তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেল তখন মনে হয় ‘আরে তাই তো! এতক্ষণ সময় আমরা কোথা দিয়ে কাটিয়ে দিলাম’। যারা সিনেমা দেখতে ভালোবাসে, ভালো সিনেমা দেখার সময় যখন শেষ হয়ে আসে তখন মনটা খারাপ হতে থাকে, এইবার বুঝি ‘দি এণ্ড’ চলে আসবে। চিত্ত যেখানে একেবারে লেগে যায় সেখানে বুঝতেই পারা যায় না কত সময় চলে গেল। ভালো একটা ভাষণ শুনছি, সেখানেও বোঝাই যায় না, কতক্ষণ সময় চলে গেল। শেষ হয়ে গেলে মনে হয় আরও একটু বললে ভালো হত। অথচ একেই বক্তৃতা হতে থাকলে লোকেরা কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখতে থাকে। যখন তুল্যপ্রত্যয় হয়ে যায়, অর্থাৎ পর পর একই বৃত্তি আসছে, তখন point of reference সব মিটে যায়। এমনি সময় আমাদের point of referenceএর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হচ্ছে। ট্রেনেও যখন আমরা যাতায়াত করছি তখনও একই জিনিষ দেখা যায়, যদি ভালো সহযাত্রী থাকে তখন গল্প করতে করতে হঠাৎ মনে হয়, আমরা এত দূর চলে এসেছি! ট্রেনে যখন যাচ্ছি তখন point of reference থাকে, এই এই স্টেশন পেরিয়ে গেল। Point of reference যখন আসতে থাকে তখন মন এক রকম চলে, কোন point of reference না থাকলে মন অন্য রকম হয়। এখানে একই চিন্তা, একই ভাব অনেকক্ষণ চলছে বলে, আর এই ভাব আমার ভালো লাগার ভাব বলে সময় বোধটা পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। আমাদের ধ্যান ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না পরিষ্কার বুঝতে পারবো আমাদের সময় বোধ দিয়ে।

এক মায়ের তিনটে সন্তান, আর সন্তানগুলো এক নাগাড়ে ছটোপাটি করে যাচ্ছে। মা রেগে গিয়ে বলছে ‘তোরা সবাই চুপ করে এক জায়গায় বোস, ছুঁচ পড়ার শব্দও যেন আমি শুনতে পাই’। বাচ্চাগুলো মায়ের ভয়ে সব চুপ করে গেছে। দু-তিন মিনিট বাচ্চাগুলো চুপ করে আছে, তারপরেই ছোট বাচ্চাটা বলছে ‘মা! আর কতক্ষণ চুপ করে থাকবো, ছুঁচটা মাটিতে ফেলো না’! বাচ্চাটি ভাবছে মা ছুঁচ ফেলবে আর ছুঁচ ফেলার আওয়াজটা মা শুনতে চাইছে। আমাদের সবারই মন এই বাচ্চাদের মতই অধৈর্য আর চঞ্চল। ক্লাশ সিন্ধের একটি ছেলে খুব চঞ্চল। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। ছুটিতে বাড়ি আসছে। বাড়িতে আসার সময় স্কুলের শিক্ষক ছেলেটির মাকে বলে দিয়েছেন ‘আপনি ছেলেকে রোজ পাঁচ মিনিট করে চুপ করে বসতে বলবেন’। বাড়ি আসার পর মা ছেলেকে পাঁচ মিনিট চুপ করে বসিয়েছেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর পর ছেলেটি মাকে ক্রমাগত বলে চলেছে – মা তুমি কিন্তু ঘড়ি দেখতে ভুলে যেওনা, মা! ঘড়ি দেখতে ভুলে যাবে নাতো!, মা! দেখো ঘড়ির কাঁটা যেন পাঁচ মিনিটের পর পেরিয়ে না যায়, মা! আর কত বাকি!, মা! তুমি ঘড়ি দেখতে ভুলে যাওনি তো। কয়েক সেকেন্ড বাদে বাদে ছেলেটি প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। এটাই আমাদের সবারই প্রতিদিনের সাধারণ অবস্থা। আমাদের যদি রোজ আধ ঘন্টা চুপচাপ বসতে বলা হয়, আমরাও ছেলেটির মত ভাবতে থাকবো আধ ঘন্টা হতে কত বাকি, কিছুক্ষণ বাদে বাদে ঘড়ি দেখতে থাকবো। চুপচাপ বসাটা আমাদের কাছে এক গভীর সমস্যা। কিন্তু যাঁরা ধ্যান করেন, ধ্যান ভাঙার পর তিনি ভাববেন ‘আরে তাই তো! এত সময় কোথা দিয়ে চলে গেল’! তাঁর মন ধ্যানে পুরোপুরি absorb হয়ে গিয়েছিল। মন কখন absorb হয়?

সাধারণ অবস্থায় আমাদের মনের বৃত্তিগুলো যে ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের একটা সময়ের বোধ থাকে। ধ্যানের গভীরে এই বৃত্তি পাল্টানোটা বন্ধ হয়ে গেছে, সেইজন্য সময়ের বোধটাও চলে গেছে। সময়ের বোধ চলে যাওয়াটা যে শুধু বৃত্তির ক্ষেত্রেই হয় তা নয়, সাধারণ জীবন যাপনে অনেক ক্ষেত্রেই সময়ের বোধ থাকে না। যে বস্তু বা ব্যক্তিকে আমি যখন ভালোবাসছি, সেই ভালোবাসার বস্তু বা ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমাদের সময়ের বোধ হারিয়ে যায়। কিন্তু ভালো লাগা বস্তুর সান্নিধ্যে মনের যে সময় বোধ চলে যাচ্ছে একে সমাধি বলা হয় না। সমাধি তাকেই বলা হবে, যেখানে আপনি সচেতন ভাবে কোন কিছুর প্রতি একাগ্রতা নিয়ে এসেছেন এবং সেই একাগ্রতার জন্য আপনার সময় বোধ চলে গেছে। সচেতন ভাবে আনার ফলে, আপনি যখনই চাইবেন মনকে একাগ্র করতে তখনই আপনি কোন কিছুর প্রতি মনকে একাগ্র করে দিতে পারবেন। রিলিজ পাওয়ার পর একটা নতুন সিনেমা আপনি খুব একাগ্র হয়ে হাঁ করে দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার ওই একই সিনেমা দেখার সময় মন আগের বারের মত একাগ্র হবে না। কিন্তু যোগের নিয়মে যখন ধ্যান করা হয় তখন এই একাগ্রতা কম বেশী হবে না। যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরা সেই একই ইন্টের ধ্যান দিনের পর দিন করে যাচ্ছেন, একই মন্ত্র বছরের পর বছর জপ করে যাচ্ছেন, কোথাও তাঁর মনে এক বিন্দু একঘেঁয়েমি বা বিরক্তির ভাব আসছে না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় একই লোকের মুখ দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আমরা দিনের পর দিন ঠাকুরের ধ্যান করে যাচ্ছি। কোথাও একটা তফাৎ নিশ্চয়ই আছে।

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা

নয়, এগারো আর বারো নম্বর সূত্রে তিন রকম সমাধির অবস্থার ব্যাখ্যা করা হল। এরপর এর ফলে মনের যে পরিবর্তন হয় সেটাকে ব্যাখ্যা করে তেরো নম্বর সূত্রে বলছেন – **এতেন ভূতেদ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।।১৩।।** সমাধির অবস্থায় চলে যাওয়ার পর যখন এক রকম প্রত্যয় হয়ে যাওয়াতে সময় বোধ চলে যাচ্ছে, তখন এই অবস্থাকে তিনটে পরিবর্তন দিয়ে বোঝা যায় – ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। যে কোন জিনিষের যখন পরিবর্তন হয় তখন তার মধ্যে এই তিন ধরণের পরিবর্তন হয় – ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুই তিনটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বকে অভিব্যক্ত করছে। ধর্ম হল তার আকার, লক্ষণ হল সময় বা কাল আর অবস্থা মানে তার এই অবস্থারূপ পরিণাম। স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোনার উপমা দিয়ে বলছেন – ধরুন সোনার একটা টুকরো রয়েছে, এই সোনা থেকে একটা নেকলেস বানালা, এই সোনা থেকেই একটা কানের দুল

বা অন্য অনেক রকম অলঙ্কার বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সোনা ধাতু এখানে সোনাই রয়েছে কিন্তু যখন তাকে নেকলেস বা কানের দুলা বানিয়ে দেওয়া হল তখন সোনার ধর্ম বা আকারটা পাল্টে গেল। একতাল যে সোনা ছিল তার ধর্মটা পরিবর্তন হয়ে গেল। মাটি দিয়ে একটা ঘট তৈরী করা হল। অর্থাৎ মাটিটা ঘটে পরিবর্তন হয়ে গেল। ঘটে পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার জন্য মাটির পুরো ধর্মটাই পাল্টে গেল, ঘটকে দেখে বোঝাই যাবে না যে, এটা সেই মাটি। এটাকেই বলছেন ধর্ম পরিবর্তন।

এরপর আসছে সময়ের ব্যাপার। যতবার এর আকার পাল্টাচ্ছে তার যে একটা আকার থেকে আরেকটা আকারে পরিবর্তন হচ্ছে এটাকেই বলছে লক্ষণ বা সময়। আজকে মাটি আছে, কাল এই মাটি ঘটে পরিবর্তিত হয়ে গেল, কিছু দিন পর ঘটটা ভেঙে যাবে, তারপর আবার সেটা মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, এটাই তখন হয়ে যাবে লক্ষণ। স্বামীজী ধর্ম, লক্ষণ আর অবস্থার ইংরাজী অনুবাদ করছেন যথাক্রমে Form, Time and State। একটা সোনার টুকরো ছিল, সেখান থেকে হয়ে গেলে সোনার বালা, সোনার এটা একটা পরিবর্তন। ওই সোনার বালা কাল এক রকম ছিল আজ এক রকম আছে, এটা হয়ে গেল সোনার বালার সময়ের পরিবর্তন। আর ওই সোনাই এক সময় ঝকঝকে দেখাচ্ছিল পরে আবার অন্য রকম দেখাচ্ছে।

পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে সময়ই সব থেকে বেশী সমস্যা তৈরী করে। আবার হিন্দু দার্শনিকদের কাছেও সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অন্যান্য ধর্মে কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না যে সময় পরিবর্তনশীল। আমরা এ ব্যাপারে সবাই খুব সচেতন যে, সময় তার নিজের গতিতে বয়ে চলে। কিন্তু আইনস্টাইন বলছেন সময়ের এই ভাবে কখনই পরিবর্তন হয় না। সময়ের যে পরিবর্তনের মাত্রা, এই মাত্রা সব সময় ওঠানামা করে। আসলে ঠিকই বলছেন, এটা এই রকমই হয়ে থাকে। দশ বছরের দুই যমজ ভাই, এদের একজনকে একটা মহাকাশ যানে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হল, আর ধরা যাক ওই মহাকাশ যানটি আলোর গতির প্রায় নব্বুই শতাংশ গতিতে ছুটে চলেছে। এখন এই গতিতে আশি বছর ধরে মহাকাশ পরিক্রমা করার পর সেই ভাই ফিরে এল। তখন দেখা যাবে মহাকাশ যানে যে ভাই গিয়েছিল তার বয়স পনের বছর হয়েছে আর অন্য ভাইয়ের বয়স আশি বছর হয়ে গেছে। এটা সত্যিই এই রকমই হয়, সময় ওই ভাইয়ের ক্ষেত্রে থেমে গিয়েছিল, বা সময়ের গতি অতি মস্তুরতা প্রাপ্ত হয়েছিল। পরীক্ষাগারে গবেষণা করে এই ঘটনা প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। যখন গতি বৃদ্ধি পেতে পেতে যত আলোর গতির কাছাকাছি আসতে থাকবে, সময় তার অর্ধেকে পাল্টাতে শুরু করবে।

ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেকেন্ডের কাঁটাটা ঘুরছে এবং এর যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে, সেকেন্ডের কাঁটার পরিবর্তনের মাত্রা যেটা হচ্ছে এটাই সময়। এখন যদি সেকেন্ডের কাঁটা আলোর গতির কাছাকাছি ঘুরপাক খেতে থাকে তখন আমার কাছে ওটা একই গতিতে যাবে, কিন্তু ওর কাছে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার কাছে সময়ের আর কোন অর্থ থাকবে না। যদি আলোর গতিতে ঘুরতে থাকে তখন সময় থেমে যাবে তখন Time=0 হয়ে যাবে। যোগীরা এখানে লক্ষণ সম্বন্ধে আসলে এই ব্যাপারটাই বোঝাতে চাইছেন। যখন একটা জিনিষের একটা আকার থেকে আরেকটা আকারে পরিবর্তিত হচ্ছে তার এই পরিবর্তনের মাত্রাকে যখন পরিমাপ করা হবে তখন সেটাই সময়ের হিসেব দিয়ে দেবে। শেষে হচ্ছে অবস্থা – সোনা ছিল, সোনা এখন পরিবর্তনের মাধ্যমে কানের দুলা হয়ে গেল তখন তার ধর্ম পরিবর্তন হয়ে গেল। আর এই পরিবর্তনটা সময়ের মধ্যেই হয়েছে। এতে সময় ও অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। এর অর্থ গিয়ে দাঁড়াল এক তাল সোনা একটা সময়ের পরিমাপের সাথে বিভিন্ন আকারে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আর এর প্রত্যেকটি আকারকে আলাদা করে পার্থক্য করা যাবে। পরবর্তী সূত্রগুলিতে এই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা একটা বড় ভূমিকা নেবে।

রাজযোগের সমস্ত তত্ত্ব, দর্শনের আলোচনার মূল কেন্দ্র হল মন, বহির্জগতকে নিয়ে যোগ বেশি কিছু বলবে না। এখানে আমরা ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে বোঝাবার জন্য মাটি ও সোনার উপমা নিয়ে এসেছি। কিন্তু যোগ হল মনের ব্যাপার, তাই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থায় মনের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্যতা পরিলক্ষিত হয় সেটাকেই এখানে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বলা হচ্ছে। মন তিনটে অবস্থার মধ্যে দিয়ে

পরিবর্তিত হয়। মন পাল্টে যায় বৃত্তিতে, এটা প্রথম পরিবর্তন। এখানে আমরা জলের উপমা নিতে পারি, পুকুরে জল আছে, সেই জলে ছোট ছোট টেট উঠতেই জলটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। মনের মধ্যে বৃত্তিগুলো অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। মন আজ এক রকম আছে, কাল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। মন পাল্টে যাচ্ছে বৃত্তিগুলো পাল্টে যাচ্ছে বলে। এই বৃত্তিই কখন খুব তীব্র আবার কখন মৃদু হচ্ছে। যে সিনেমাটা প্রথম দেখছি তখন সেই সিনেমার বৃত্তিটা খুব তীব্র থাকে, দ্বিতীয়বার দেখার সময় আগের তীব্রতা কমে গিয়ে মৃদু হয়ে গেল। ধ্যানের গভীরতা ও পরিপক্বতার প্রেক্ষিতে যখন মন আর তার বৃত্তিগুলিকে দেখা হবে তখন এই তিনটে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে।

মনই আছে, শুদ্ধ মন ছাড়া কিছু নেই কিন্তু বৃত্তির জন্য এই মনেরই কত রকম পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই বৃত্তিগুলো কালও ছিল আজও আছে। যেমন আপনার সন্তান আছে, আপনি কাল আপনার সন্তানের কথা ভেবেছেন আজও সন্তানের কথা ভাবছেন। আবার ওই একই বৃত্তি কাল যখন ছিল তখন তার গভীরতা এক রকম ছিল আজ তার গভীরতা পাল্টে গেছে। এইভাবে মনের তিন রকম অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথম হল মন বৃত্তিতে পাল্টে যাচ্ছে। এই বৃত্তিগুলো কালও ছিল আজও আবার মনের মধ্যে উঠছে। এই যে বৃত্তি আজকে উঠছে, এই বৃত্তিকে আটকানো দরকার কিন্তু আটকাতে পারছি না। অনেক সময় বলি, আমি চাই না তার কথা ভাবতে কিন্তু তাও ভাবতে হচ্ছে। একটা জিনিষ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু আফশোস করে বলি, ওই জিনিষটা যদি আমার জীবনে থাকতো তাহলে আজ আমার জীবন অন্য রকম হতো। কিংবা আমার প্রিয়জন মারা গেছে, মৃত্যুকে কেউ আটকাতে পারবে না কিন্তু তাও ভাবছি, ইস্! ওকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতাম তাহলে হয়তো মারা যেত না। তারপর চোখের জল ফেলছে, হয়তো তত ভালোবাসাও নেই, তবুও চোখের জল ফেলে। এই বৃত্তিগুলো আগেও ছিল এখনও হচ্ছে। আর তৃতীয় হল, বৃত্তির গভীরতা পাল্টাচ্ছে। আপনার কোন বন্ধু প্রতি আপনার সামান্য অসন্তোষের ভাব আছে। একদিন দেখলেন সেই বন্ধুটি বড়লোক হতে শুরু করল, এবার কিন্তু সেই অসন্তোষটা আরও দৃঢ় হতে শুরু করবে, অসন্তোষ বৃত্তিটা বড় হয়ে যাচ্ছে। যত বৃত্তি আছে, সব বৃত্তিকে আমরা কিন্তু চেষ্টা করলে পরিষ্কার দেখতে পারি। মনে মনে একবার ভেবে দেখুন, গত তিন চার দিনের মধ্যে আপনাদের মনে কোন নেতিমূলক বৃত্তি এসেছিল কিনা, কোন ধরণের লোভ, কারুর প্রতি ক্রোধ বা কোন দুঃখের বৃত্তি। দেখবেন কিছু একটা বৃত্তি নিশ্চয়ই এসেছিল।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বৃত্তি আর ব্যক্তি এক হয়ে থাকে, কারণ প্রথমে দিকে আমরা একটি সূত্র পেরিয়ে এসেছি যেখানে বলা হয়েছিল *বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র*, আমি আর আমার বৃত্তি এক। আমি যখন ভাবছি ইস্! আমার যদি প্রমোশন হত তাহলে আমার মাইনে বেড়ে যেত। তখন কিন্তু আমার এই বোধ নেই যে আমার মধ্যে এই ভাব আসছে। আমি যখন কারুর উপর রেগে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমার কোন বোধ থাকে না আমি এর উপর রেগে যাচ্ছি। যোগী ছাড়া কেউ নিজেকে নিজের রাগ, দুঃখ, ক্রোধ, লোভ থেকে আলাদা দেখতে পারে না। আমরা হলাম আমাদের মন যে রকম সেই রকম, আর মন মানেই বৃত্তি। তার মানে এই বৃত্তি আবার তিন রকম, মন যখন চঞ্চল হয় তখন তাকে বলছেন বৃত্তি। মন থাকা মানেই চঞ্চল, সমাধির অবস্থাতেও সে শান্ত থাকে না। তবে সমাধির অবস্থায় কি হয়, স্বাভাবিক প্রত্যয় প্রবাহ, তখন একই ধরণের চিন্তন চলতে থাকে। তাই মন কখন শান্ত হতেই পারে না। মনকে সব সময় চলতেই হবে। শুধু নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়ে মনের পেছনে যে চৈতন্য আছে সেই চৈতন্য মন থেকে আলাদা হয়ে যায়, আসলে তখন মনের লয় হয়ে যায়, মন বলে কোন কিছু থাকে না। কিন্তু সবিকল্প সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মন সব সময় সচল থাকছে। তাই না, মন কখন থামে না, মনকে নিয়ন্ত্রিত করেও মনকে স্তম্ভিত করা যায় না, এমন কি সমাধিতেও মন থেমে যায় না। ইলেক্ট্রিসিটি যেমন টানা প্রবাহিত হয় ঠিক তেমনি মনও টানা চলতে থাকে, সমাধির অবস্থাতেও মন টানা চলতে থাকে। কিন্তু সমাধিতে মনে হয় মন যেন থেমে গেছে। কারণ একটি চিন্তা বা একটি বৃত্তিই সমান ভাবে চলতে থাকে। অ্যারোপ্লেনে যাওয়ার সময় প্লেনটা সমান গতিতে যায় বলে মনে হয় প্লেনটা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন জিনিষের যখন কোন acceleration থাকে না তখন মনে হয় জিনিষটা

থেমে আছে। মনেরও তখন কোন acceleration হয় না, কোন পরিবর্তন হচ্ছে না বলে মনে হয় মন যেন থেমে গেছে। কিন্তু মন কখন থামে না।

মনে যত বৃত্তি আছে সেই বৃত্তি আর আমি এক, কারণ আমি আর আমার মন এক। মনের বৃত্তিগুলো সব সময় তিন রকম অবস্থায় থাকে, কখন বৃত্তির গভীরতা খুব বেশী থাকে, কখন কম গভীরতা থাকে আর কখন পুরনো বৃত্তিগুলো আছে আবার আজকের বৃত্তিগুলোও আছে, মন এইভাবে বৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। বৃত্তিতে ধর্ম, লক্ষণ আর অবস্থা এই তিনটে পরিবর্তন সব সময় হবে। এই তিনটির বাইরে বৃত্তির কোন পরিবর্তন হয় না। হিন্দীতে একটা খুব সুন্দর দোঁহা আছে, বলছে কভি জানকি কসম্ খাতে থে। অব্ জনাজে মে জানে কি কসম্ খাতে হ্যায়। এক সময় ভালোবাসায় তুমি দিব্যি দিতে যে আমার প্রাণ তোমার পায়ে আর এখন দিব্যি খেয়ে বলছ তুমি মরলে তোমার শবযাত্রায় সামিল হব। এই যে এখানে একজনের বৃত্তিটা পাল্টে গেল, সে কি আগে থেকে ঠিক করে বৃত্তিটা পাল্টেছে? আগে থেকে ঠিক করে ইচ্ছে করে বৃত্তি যদি পাল্টায় তাহলে সে তো বড় যোগী। ইচ্ছে করে সে পাল্টাচ্ছে না, বৃত্তিগুলো নিজে থেকেই নিজের মতো পাল্টায়। একটা কার্টুনে ডেনিস বলে একটা বিচ্ছু ছেলে আছে। তার একটা চাউস কুকুর আছে যার নাম রাফ্। বন্ধুদের ডেনিস বলছে আমার কুকুরকে এমন ট্রেনিং দিয়েছি যে আমি যা বলব সেটাই সে করতে থাকে। রাফ্ বসে আছে ডেনিস বলছে ‘সিট ডাউন’। কিছুক্ষণ পরে কুকুরটা উঠে দাঁড়াল ডেনিস বলল স্ট্যাণ্ড আপ। কুকুরটা যেমনি হাঁটতে শুরু করেছে সঙ্গে সঙ্গে ডেনিস বলছে ‘রাফ্! ওয়াক্’। যেমনি ঘেউ করল তেমনি ডেনিস বলল ‘রাফ্! বার্ক’। বন্ধুরা তখন বলছে ‘ও যেটা করছে সেটাতো তুমিই বলছ, তোমার বলাতে খোরাই করছে’। ডেনিস বলছে ‘তা না, রাফ্ এত বুদ্ধিমান যে, আমি যতক্ষণে ভাবছি ততক্ষণে সেটা বুঝে নিয়ে করে দিচ্ছে’। আপনি ভাবছেন আপনার মত মন চলছে, কিন্তু মন কারুর মত চলে না, সে নিজের মত পাল্টি খাচ্ছে। রাফ্ নিজের মতই সব কিছু করছে, ডেনিস মনে করছে আমি ভাবছি বলে করছে। আপনি বলছেন আমি আর ওকে ভালোবাসি না। আরে আপনি কে ওকে ভালোবাসার আর ভালো না বাসার! আপনার মনের বৃত্তিটা পাল্টে গেছে।

এই যে সমাধির কথা বলা হল, সমাধিতে যোগীরা সমস্ত বৃত্তিকে আটকে দেন। আটকে দিয়ে যোগী মনকে বলে দেন আমি যেমনটি চাইব তোমাকে তেমনটি চলতে হবে। এটা খুব মজার ধ্যান। এর জন্য কম করে এক ঘণ্টা সময় বার করে নিতে হবে। ধ্যানে বসে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, আমি সাক্ষী রূপে আমার মনের বৃত্তিগুলোকে শুধু লক্ষ্য করতে থাকবো। গঙ্গায় আমরা যেমন ঢেউ দেখি ঠিক তেমনি আমি আমার মনের বৃত্তিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবো। মনে অনেক রকম বৃত্তি উঠছে, প্রত্যেকটা বৃত্তিকেই আমি লক্ষ্য করছি, যেমন এই মুহুর্তে কি কি বৃত্তি উঠছে, এর ঠিক আগে কি কি বৃত্তি উঠেছিল। এবার আপনাকে পেছনের দিকে যেতে হবে, এই মুহুর্তে যে বৃত্তি উঠেছে সেটাকে দেখছেন, এরপর এই বৃত্তি ওঠার আগে যে বৃত্তিটা উঠেছিল সেটাকে নিয়ে আসুন, এইভাবে ক্রমশ পেছনের দিকে চলে যান, পেছনের দিকে চলে গিয়ে দেখুন আপনি প্রথমে কি ভাবছিলেন, সেই ভাবনা থেকে সরতে সরতে এখন যেখানে আমার ভাবনাটা এসে দাঁড়িয়েছে সেই ভাবনাটাকে দেখতে হবে। যেমন মনে করুন আমি একটা গোলাপ ফুলকে নিয়ে ভাবছি, গোলাপ ফুলের রঙ, ফুলের গন্ধ, ফুলের আকার, গোলাপ গাছের কথা যা খুশী চিন্তা করে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর দেখবো গোলাপ ফুল থেকে মন ছিটকে কোথায় চলে গেছে। আবার আমি মনকে টেনে গোলাপ ফুলে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তার আগে আমাকে দেখতে হবে কোন কোন জিনিষ চিন্তা করতে করতে গোলাপ ফুল থেকে সরে অন্য চিন্তায় চলে গিয়েছি, তারপর আবার মনকে গোলাপ ফুলে নিয়ে যাচ্ছি। আবার গোলাপ ফুলের কথা ভাবতে ভাবতে কখন গোলাপ ফুল থেকে মন হারিয়ে গেছে বুঝতেই পারবো না। যখন বুঝতে পারলাম গোলাপ ফুল থেকে মনে সরে গেছে তখন আবার গোলাপ ফুলে ফিরে যাচ্ছি। এইভাবে যেমন যেমন সময় যেতে থাকবে একটা সময়ের পর দেখছি যে যে বৃত্তিগুলো গোলাপ ফুল থেকে টেনে সরিয়ে দিচ্ছে, আমি ওই সব কটা বৃত্তিগুলোকে মনে রাখতে পারছি। কিছুক্ষণ পরে দেখব বৃত্তির ব্যাপারে আমি আগের থেকে অনেক বেশী সজাগ হয়ে গেছি। এটা খুবই মজার ধ্যান। এই ধ্যান এক ঘণ্টার কমে হয় না, কেননা

প্রথম কুড়ি পঁচিশ মিনিট নিজে সজাগ করতে এমনিই বেরিয়ে যাবে, মনের চাঞ্চল্যতার জন্য কিছু ধরতেও পারবে না। কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে আপনাকে সজাগ হতে হবে, এবার আমি ধ্যান শুরু করছি। গোলাপ ফুলকে নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছি, মন কিছুক্ষণ পরে গোলাপ ফুল থেকে সরে অন্য অনেক কিছুতে চলে যাবে। যখন বুঝতে পারলাম মন গোলাপ ফুল থেকে সরে গেছে তখন মনকে বলছি, গোলাপ ফুলে ফেরত চলো। এই যে আমি গোলাপ ফুলে ফেরত যাচ্ছি, তার মানে মনের উপর আমার অনেক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে গেল। এখান থেকেই ধীরে ধীরে আমাদের মনের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আসতে শুরু হয়ে যাবে। কিছু দিন এভাবে ধ্যান করলে কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের স্মৃতি শক্তিও বাড়তে শুরু করবে, আমাদের সচেতনতাও অনেক বেড়ে যাবে। এই নিয়ন্ত্রিত ও সজাগ মনকেই পরে আপনি খুব সহজে ঠাকুরের ধ্যানে লাগিয়ে দিতে পারবেন। ঠাকুরের ধ্যান করছেন, সেখান থেকে মনটা অন্য দিকে সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে গিয়ে ভাবছেন তাইতো কী করে ঠাকুরের কাছ থেকে মন সরে এলো! সজাগ হতেই আবার আপনি ঠাকুরের উপর মনকে নিয়ে গেলেন। এইভাবে তিন চারবার পর্যবেক্ষণ করে করে মনকে বার বার ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এর ফলে মনের যে পরিবর্তন হচ্ছিল, এই পরিবর্তন হওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। ধ্যানের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। আপনি একটা জিনিষের ধ্যান করছেন বা চিন্তা করছেন, সেখান থেকে মন চঞ্চল হয়ে অন্য একটা জিনিষে চলে গেল। এবার আপনি নিজে বিচার করে দেখুন তো, এই চাঞ্চল্যটা কোথা থেকে এল।

এক মাতাল দূর্গাপূজার প্যাণ্ডেলে গিয়ে দূর্গা ঠাকুরকে প্রণাম করেছে। প্রণাম করে দূর্গা প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করেছে – দূর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক আর গণেশ আছে। কার্তিক গণেশ দূর্গার ছেলে। এরা সব ছেলেপিলে। পিলে থেকে চলে গেল পেটের পিলে রোগে। প্রণাম করেছে আর ভাবছে, পিলে রোগী মানে জন্ডিস। জন্ডিস মানে হাসপাতাল, হাসপাতাল মানে নীলরতন সরকার হাসপাতাল, নীলরতন শ্যামবাজারে। শ্যামবাজার থেকে লালবাজার। লালবাজার মানে পুলিশ। ততক্ষণে মাতালটি পুলিশ! পুলিশ! করে চিৎকার করে দৌড়ে পালাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাতালটির মন এই প্রক্রিয়ায় পুরো ঘুরে গেল। মাতালের মন আর আমাদের মনের সাথে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, আমাদেরও দূর্গা থেকে পুলিশে যেতে বেশী সময় লাগে না।

এই সূত্রে ঠিক এই কথাই বলছেন। মনের এই যে ধর্ম, লক্ষণ আর অবস্থাতে রূপান্তর হচ্ছে, কখন মনের গভীরতা পাল্টাচ্ছে, কখন পেছন থেকে সামনে আসছে, কখন সময়ের বোধ থাকছে আর কখন মনটাই এই বৃত্তি থেকে সেই বৃত্তিতে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। এই তিন ধরণের রূপান্তরের উপর যোগীর যখন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসে তখনই সে ঠিক ঠিক সংযম করার অধিকারী হয়। প্রথমে আমাদের সমাধির দিক থেকে বলা হয়েছিল, এখানে এবার বৃত্তির দিক থেকে বললেন।

প্রথমে মনকে জোর করে আটকে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, দ্বিতীয় আসছে মনকে একটি বড় ক্ষমতাসালী চিন্তা বা ভাবনা দিয়ে একটি বৃত্তিতে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছে আর সব শেষে এর দুটোর কোনটাই এখন আর নেই, আর সমান ভাবে একটা তৃতীয় জিনিষ যেটা এক ভাবে নিরন্তর মনের মধ্যে বয়ে চলেছে। প্রথমে ধারণাতে বিষয়ের উপরে মনকে একাগ্র করা হচ্ছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ, আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের উপর মনকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। দ্বিতীয় যখন ধ্যানের মধ্যে আসছি তখন শ্রীকৃষ্ণের কথা আর জোর করে ভাবতে হচ্ছে না, তাঁর অনুভূতিটা পাচ্ছি বলে এখন আর জোর করতে হচ্ছে না। শেষে সমাধিতে কি হচ্ছে – শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিও চলে গেছে আর তাঁর অনুভূতিটাও চলে গেছে একমাত্র জ্ঞানটাই পড়ে রয়েছে। ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, এর যে পরিণাম তা সমস্ত জগতের যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে তার এক মাত্র কারণ। একটা বীজ আছে, সেই বীজটা বপন করলেন, সেখান থেকে একটা গাছ হল। এখন সেই গাছের মধ্যে অনেক রকমের রূপান্তর হতে থাকবে, আর এর সবই একটা সময় থেকে আরেকটা সময়ের মধ্যে হতে থাকবে। একটা গাছ আরেকটা গাছ থেকে পৃথক। এইভাবে এলো বিভিন্নতা। শেষ পর্যন্ত যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সবই কিন্তু সময়ের মধ্যেই হচ্ছে।

এই তিনটে রূপান্তরের কথা বলার পরেই বলছেন **শান্তোদিভ্যাপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।।১৪।।** যে জিনিষটাই একট জিনিষের উপর কাজ করে তাকে বলছেন ধর্মী। তার মানে যার উপর সময় বা অন্যান্য সংস্কারগুলো কার্য করছে, আর এই কার্য করে তাকে পাল্টে দিচ্ছে তাকে তখন বলছেন ধর্মী। এটাকে বলছেন qualified substance। আমাদের মনে যত বৃত্তি রয়েছে, যত সংস্কার বীজ রূপে সঞ্চিত হয়ে আছে এগুলো সবই ধর্মী। সাধারণতঃ বৃত্তির উপরেই আমাদের সংস্কারগুলো কাজ করে, তার মানে আপনি যদি ভালো লোক হয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে শুভ সংস্কার আছে। এই শুভ সংস্কারগুলো আপনার বৃত্তির উপরে কাজ করে। যখন বাইরের কিছু দেখে আপনার মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠছে তখন আপনার শুভ সংস্কারগুলো ওই বৃত্তির উপর কাজ করে আপনাকে ওদিকে যাওয়া থেকে আটকে দেয়।

এবারে বলছেন **ক্রমান্যদ্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।।১৫।।** যখন পর পর ধর্মীর মানে এই বৃত্তিগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে তখন ক্রমে এই বৃত্তিগুলো পাল্টাতে থাকে। ক্রমাগত এই ভাবে পাল্টানোর জন্য নানা রকমের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রজাতির নানা রকমের ক্রমবিকাশ হতে থাকে। তাহলে ক্রমবিকাশ কেন হয়? একটা জিনিষ ধর্মী রয়েছে, ধর্মী মানে যে জিনিষের ধর্মটা পাল্টায়। ধর্ম কীভাবে পাল্টায়? সময়ের জন্য পাল্টাচ্ছে, ওর উপর অনেক কিছুর আঘাত আসার জন্য পাল্টাচ্ছে। সব থেকে বড় আঘাত আসে সংস্কার থেকে। যেমন আমরা এখানে রাজযোগের কথা শুনছি। শুভ সংস্কার আগে থেকে আছে বলে আজ আমরা রাজযোগের কথা শুনতে এসেছি। রাজযোগের কথা শুনে শুনে আমাদের শুভ সংস্কারগুলো আরও বলশালী হচ্ছে। এই বলশালী শুভ সংস্কার এরপর আমাদের বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাই বৃত্তিগুলো ধর্মী। এই যে বৃত্তিগুলো ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে, কখন শুভ সংস্কারে পাল্টাচ্ছে আবার কখন অশুভ সংস্কারে পাল্টাচ্ছে, এই পাল্টানোর জন্যই বাকি সব কিছু পর পর হতে থাকে।

বিভিন্ন ধরণের বিভূতির বর্ণনা

বৃত্তিগুলো ধর্মী বলে তার ধর্ম, লক্ষণ আর অবস্থা এই তিন রকম পরিবর্তন হচ্ছে। এই যে ধর্ম, লক্ষণ আর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এর উপর যদি আমরা সংযম করি তাহলে কি হবে? **পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।।১৬।।** বৃত্তির যে এই ক্রমাগত তিন ধরণের পরিবর্তন হচ্ছে, একটা বৃত্তি আরেকটা বৃত্তিতে পাল্টাচ্ছে, মন বৃত্তিতে পাল্টাচ্ছে, বৃত্তি কাল এক রকম ছিল আজ অন্য রকম, বৃত্তি কালকেও ছিল আবার আজও আছে, এই যে পুরো জিনিষটা ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে এর উপর কেউ যদি মনকে সংযম করে তাহলে তার অতীতের সব জ্ঞান এসে যাবে আর ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে সেটারও জ্ঞান এসে যাবে। কারণ এর আগের সূত্রে বলেছিলেন **ক্রমান্যদ্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ**, তার মানে এই জগতে যা কিছু বিকাশ হচ্ছে, যা কিছু বিবর্তন ঘটছে সবই এই ধর্ম, লক্ষণ আর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই হচ্ছে। তাই এই পরিবর্তনের উপরেই যদি কেউ মনকে সংযম করে দেয় তাহলে বাকি সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার মানে, আপনি এর আগের জন্ম কি ছিলেন, এর আগে আগে কি কি করেছেন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুধু তাই না, ভবিষ্যতে আপনার কি হতে যাচ্ছে সেটাও আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে আলাদা, কিন্তু সবার পশ্চাতে একটা অভিন্ন সত্তা রয়েছে। যিনি ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে সিদ্ধ হয়ে গেছেন, আর তিনি যদি কারুর উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তিনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন তার শরীর সেই একই জিনিষ থেকে তৈরী হয়েছে – মানে শরীরটা প্রকৃতি থেকে এসেছে, আর যেহেতু ধর্ম পরিবর্তন, লক্ষণ পরিবর্তন ও অবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকে তার শরীর এই জায়গাতে এসেছে, তাই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা তাকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে দিচ্ছে। এই তিনটির যদি পরিবর্তন না হত তাহলে আমাদের মধ্যে সবাইকেই একই রকম মনে হত। বলা হচ্ছে এই অভিন্ন সত্তার উপরে যোগী যখন সংযম প্রয়োগ করবেন তখন তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতা হয়ে যাবেন।

অনেক দিন অনুশীলন করে করে আপনার মন খুব একাগ্র হয়ে গেছে। এই একাগ্র মনকে এবার যখন আপনি কোন বস্তুর উপর সংযম করবেন তখন সেই বস্তুর সব রহস্য আপনার কাছে উন্মোচিত হয়ে যাবে। যে পাঁচটি তত্ত্ব আছে, অগ্নি, তেজ, জল, বায়ু ও পৃথিবী, এই পাঁচটি তত্ত্বের উপর যদি সংযম করা হয় তাহলে এদের ধর্ম আপনার কাছে খুলে যাবে। মনের অবস্থার যে পরিবর্তন হচ্ছে তার উপর যদি সংযম করা হয় তাহলে এক ধরনের জ্ঞান আসবে। এই যে মনের তিন রকম পরিবর্তন হচ্ছে, ধর্ম পরিবর্তন, লক্ষণ পরিবর্তন আর অবস্থা পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের উপর সংযম করতে পারলে ভূত আর ভবিষ্যতের জ্ঞান এসে যাবে। আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এগুলো সব যোগ সিদ্ধাই, যোগ সাধনার মূল লক্ষ্য এগুলোর কোন ভূমিকা নেই।

এবারে বলছেন যোগী যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের উপরে সংযম করেন তখন তিনি পশু, পাখি থেকে শুরু করে যে কোন প্রাণীর ভাষা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। পরের সূত্রে এই কথাই বলছেন – **শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্।।১৭।।** Assisi র সেন্ট ফ্রান্সিস একবার চার্চে সারমন প্রীচ করছিলেন আর সেই সময় চডুই পাখিগুলি ভীষন রকমের কিচিরমিচির করছিল, তখন সেন্ট ফ্রান্সিস চডুই পাখিগুলির দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে বলছেন Sister sparrows, I am talking about God let me have my say and then you can talk, নিমেষের মধ্যে সব পাখিগুলি চুপ করে গেল। তারপর তিনি বক্তৃতা দিয়ে চললেন, এক ঘণ্টা পর বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি বলছেন ‘Sister sparrows! Now my words are over, now you can talk, বলতেই চডুই পাখিগুলি সঙ্গে সঙ্গে আবার কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে। এটা কোন ভারতীয় কাহিনী নয়, এই কাহিনী হল সেন্ট ফ্রান্সিসের জীবনের একটি ঘটনা যা কিনা অনেকের চোখের সামনে ঘটেছিল। সেন্ট ফ্রান্সিস পতঞ্জলি যোগসূত্র কখনই পড়েননি, কিন্তু তাঁর কি করে এই ক্ষমতা হল? না জেনে বুঝে শুধু সাধনা করে তাঁরও এই জিনিষ হয়েছিল। আগে আগে আমরা অনেক গল্প ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে এক চাষী ছিল সে তার বলদের ভাষা বুঝতে পারত, এগুলো আমাদের কাছে আজগুবি কাহিনী মনে হতে পারে, কিন্তু রাজযোগে বিশেষ সংযম প্রয়োগ করলে এগুলো সত্যি সত্যিই হয়।

আমরা ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পেয়েছি শব্দ হলে কম্পন হয়, কম্পন কানে গেলে শব্দ শোনা যায়, আর শোনার পর আমাদের মনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়। যদি বলি চক – চক শব্দটা কানে যেতেই বুঝে নিলাম চকের কথা বলছে, যা দিয়ে বোর্ডে লেখা হয়। এর আগে একটা সূত্রে আমরা শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সামনের লোকটিকে আমি কিছু কথা বলছি, সেই কথাগুলো বাতাসে একটা কম্পন তৈরী করছে, এই কম্পনগুলো সামনের শ্রোতার কানে গিয়ে আঘাত করছে, আঘাত হওয়াতে এই কম্পনগুলো কানে একটা অনুভূতি তৈরী করছে, এই অনুভূতি শ্রোতার মস্তিষ্কে গিয়ে এই শব্দগুলোর একটা অর্থ সৃষ্টি করছে। অর্থ সৃষ্টি করলেই সব কিছু হয়ে যায় না, এই অর্থগুলো যাওয়ার পর মস্তিষ্ক একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেয়। এই যে প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দিচ্ছে এটাই আমাদের ব্যষ্টি জগৎ, এটাকেই বলছেন জ্ঞান। আমরা যা কিছু দেখছি, পড়ছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, আশ্বাদ করছি সব কিছু শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটে স্তরে সম্পূর্ণ হয়। শব্দ হল যেটা বাইরে থেকে উত্তেজনা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসছে, আমি আপনাকে দেখছি, আপনার ছবি আলোর মাধ্যমে আমার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে, দৃশ্যটাও শব্দ, এই শব্দ আমার মস্তিষ্কে গিয়ে যে একটা অনুভূতি তৈরী করছে, তাকেই বলছেন অর্থ। ওই অনুভূতির পর আমার মস্তিষ্ক এবার একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ছে, এই প্রতিক্রিয়া ছোড়াকেই বলছেন জ্ঞান। আমাদের মত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এই তিনটে মিশে এক হয়ে থাকে। আমরা শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান পরিষ্কার করে আলাদা করে ধরতে পারবো না যে, এই শব্দ এলো, এই শব্দ আমার কানে বা চোখে আঘাত করল, মস্তিষ্ক একটা সূচনা পাঠাচ্ছে, এর একটা অর্থ সৃষ্টি করছে, আমার এই শব্দটা ভালো লাগছে, এই ভাবে আমরা ধরতে পারি না। কিন্তু যিনি যোগী তিনি ধ্যানের গভীরে এই তিনটেকে পরিষ্কার আলাদা আলাদা দেখতে পান। শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান যেন ছোট্ট একটা রাবার ব্যাণ্ড এবং এই ব্যাণ্ডটাকে কাটা যাচ্ছে না। কিন্তু এবার রাবারের ব্যাণ্ডটাকে লম্বা টেনে দিলেন।

লম্বা হয়ে যেতেই আপনি এবার খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে তিনটে টুকরো করে দিতে পারবেন। এই সূত্রে বলছেন শব্দ, অর্থ আর জ্ঞানকে যদি পরিষ্কার আলাদা করে দিতে পারেন তখন কিন্তু আপনি যে কোন পশু-পাখির গলার আওয়াজে সে কি বলতে চাইছে বুঝতে পারবেন।

নিউটন বললেন যে শক্তি আপেলকে গাছ থেকে নামাল সেই একই শক্তি পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করাচ্ছে, তার মানে নিউটন এখানে পুরো জিনিষটাই ভেতরে নিয়ে নিলেন। তারপরে ম্যাক্সওয়েল বললেন, ইলেক্ট্রিসিটি, ম্যাগনেটিসিজিম, আলো ইত্যাদি সব একই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। মানে পুরো ব্যাপারটাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করছেন, এই জিনিষগুলিকে এনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেননা আমাদের মস্তিষ্ক সেভাবে চিন্তা করার প্রশিক্ষণ পায়নি।

পনের দিনের বয়সের একটা বাচ্চা যদি কাঁদতে শুরু করে তখন আমাদের কাছে সব বাচ্চার কান্নাই এক মনে হবে, কিন্তু ওর মা বলে দেবে ওর এখন খিদে পেয়েছে, ওর এখন ঘুম পেয়েছে, ওর এখন জলতেষ্ঠা পেয়েছে। অন্যের বাচ্চার কান্নাতে সেটা নাও বলতে পারে, কিন্তু নিজের বাচ্চার কান্না শুনলেই বলে দেবে বাচ্চা এখন কি চাইছে। কারণ কি? কারণ আর কিছুই না – শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান। বাচ্চার কান্নার যে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান আমাদের কানে বালাপালা লাগছে, কিন্তু বাচ্চার মার কাছে ওই বাচ্চার কান্নার যে শব্দ, তার যে অর্থ, আর সেই অর্থের যে জ্ঞান এই তিনটেই পরিষ্কার আলাদা আলাদা করে ধরা দিচ্ছে। বাচ্চা যে আওয়াজ করছে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই করছে, কিন্তু আমার কাছে এটা শব্দ মাত্র আর অর্থ যদিও ধরা যেতে পারে কিন্তু এর জ্ঞানকে ধরতে পারবো না। যখন জ্ঞানের উপর মনকে একাগ্র করব তখন শব্দের জ্ঞানটাও আমার কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রে তাই শব্দ আর জ্ঞান এই দুটোর যোগ আছে। আমি যদি অন্য দিকে তাকিয়ে কারুর নাম ধরে ডাকি, তখন সে বুঝতে পারবে যে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শব্দ আর জ্ঞান দুটো সংযুক্ত। কিন্তু কুকুর যখন ঘেউ ঘেউ করছে তখন তার অর্থটা আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ এখনো কুকুরের আওয়াজকে বুঝতে গেলে যে ধরনের প্রশিক্ষণের আবশ্যিকতা সেই ধরনের প্রশিক্ষণ আমরা পাইনি। যিনি যোগী তাঁর মনও এই ধরনের প্রশিক্ষণ পায়নি, কিন্তু তিনি এখানে সংযমকে আয়ত্ত করে প্রয়োগ করার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছেন, তাই তিনি সংযমকে যখন প্রয়োগ করবেন তখন শব্দ তার অর্থকে যোগীর কাছে প্রকাশ করে দেবে। যে কেউই যে ভাষাতেই কথা বলুক, এমন কি যোগীকে যদি আফ্রিকান ট্রাইবালদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় সেখানে আফ্রিকান ট্রাইবালরা তাদের ভাষায় কথা বলবে, যোগী তার সংযমকে প্রয়োগ করে তাদের সেই অজানা ভাষার অর্থকেও উদ্ধার করে নেবেন।

দুই সাহেবের মধ্যে একবার কথা কাটাকাটি থেকে খুব মারামারি হয়েছে। একজন আরেকজনের নামে মামলা রুজু করেছে। মামলাতে একজন সাক্ষী দরকার। তখন যে মামলা করেছিল সে বলল তাকে যখন মারা হচ্ছিল তখন ঘটনাস্থলে একজন পণ্ডিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এখন সেই পণ্ডিতকে খুঁজে এনে আদালতে হাজির করান হল। পণ্ডিত ইংরাজী একেবারেই জানেন না, অথচ দেখা গেল, এদের দুজনের মধ্যে যা নিয়ে যেভাবে কথা কাটাকাটি হয়েছে ইংরাজীতে হুবহু সব বলে দিলেন। কি করে সম্ভব? মনের একাগ্রতার শক্তি এত প্রচণ্ড যে, যা যা ওরা বলাবলি করেছে সব তার মনের মধ্যে টেপ রেকর্ডারের মত রেকর্ড হয়ে গেছে। মন এত একাগ্র যে সে মতলবটাও বুঝে নেবে। মানে জ্ঞানটা তার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে ধারণা, ধ্যান আর সমাধির অনুশীলনের দ্বারা মনকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যে জায়গায় গিয়ে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান তিনটেকে পরিষ্কার আলাদা আলাদা দেখা যাবে।

যখন আমরা কোন কাজ করতে যাচ্ছি, তার আগে তিনটে ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়। প্রথমে আসে জিনিষের জ্ঞান, সেই জ্ঞান থেকে দ্বিতীয় ধাপে আসে মনের বিচার, যেটা একটা শব্দের আকার গ্রহণ করে। মনে করুন আমার খিদে পেয়েছে। খিদে পেয়েছেটা হল জিনিষটার জ্ঞান, আমার ক্ষুধার ভাব এসেছে। সেখান থেকে মনে সেটাই শব্দ রূপে বিচারে পরিণত হয়। মনে মনে ভাবছি আমার খিদে পেয়েছে আমাকে অমুক জিনিষ খেতে হবে। তৃতীয় শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ হয়, আমি মাকে বললাম

আমার খিদে পেয়েছে আমাকে অমুক জিনিষ খেতে দাও। সাধারণ জগতে এর একটা চতুর্থ ধাপ থাকে, যখন আমি সেটা কার্যে পরিণত করছি। যোগশাস্ত্রে এই খাওয়া বা আসল ক্রিয়ার কোন দাম নেই। যোগশাস্ত্রের সম্পর্ক শুধু মনের সাথে। মনে যা কিছুই হবে সেটা তিনটে ধাপে হয়, প্রথমে আসছে বোধ, ওই ক্ষুধার জ্ঞান, ক্ষুধার জ্ঞান আসার পর আসে বিচার, শেষে এই বিচার শব্দ হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখন একজন বলল ‘আমার খিদে পেয়েছে’। এটা আমাদের কাছে একটা শব্দ মাত্র, বাতাসে কম্পন হয়ে শব্দটা আমার কানে এসে আঘাত করছে। কানে আঘাত হওয়ার পর তার একটা কম্পন গিয়ে আমার মনে একটা অর্থ তৈরী করছে লোকটি কি বলতে চাইছে। সেখান থেকে আমার মন একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ছে, এই প্রতিক্রিয়া ছোড়াটাই জ্ঞান। তার মানে, যে বলছে আমার খিদে পেয়েছে, তার যে খিদের বোধ সেটা আমিও বুঝতে পারছি। একটা জায়গায় গিয়ে দুটো একই রকম হয়ে যায়। একজনের মনের ভাব যে আমার কাছে আসছে এই আসার পেছনে একটা বিরাট লম্বা প্রক্রিয়া আছে। প্রথমে তার মনে একটি ভাব বা বিচার এসেছে, দ্বিতীয় মনের ভাব সেটা অর্থে পরিবর্তিত হয়, তৃতীয় সেই অর্থ সে শব্দে পরিবর্তিত করছে। এবার সেই শব্দটা একটা দূরত্ব অতিক্রম করে আমার কাছে শব্দ হয়ে এসে অর্থে পরিবর্তিত হচ্ছে, তারপর সেই অর্থ জ্ঞানে পরিবর্তিত হচ্ছে।

এখন একটা কুকুর তার নিজের মত গলা দিয়ে আওয়াজ বার করছে, তার হয়তো শীত করছে বা হয়তো তার ভয় করছে কিংবা রেগে যেতে পারে, যাই হয়ে থাকুক সেটা কুকুরের মনে একটা বৃত্তি সৃষ্টি করছে, সেই বৃত্তিটা পরিবর্তিত হয়ে কুকুরের ডাকে রূপান্তরিত হচ্ছে। কুকুর কুকুরের ভাষা সম্বন্ধে সচেতন, তার নিজস্ব একটা অভিজ্ঞতা আছে, অন্য কুকুর তাই ওর আওয়াজটা বুঝে নেয় ও কি বলতে চাইছে। আমরা যেমন বাংলা ভাষা জানি, বাংলায় যে যা বলছে আমরা বুঝে নিতে পারি। কিন্তু আফ্রিকার কোন উপজাতিদের ভাষায় যদি কথা বলা হয় তখন আমরা বুঝতে পারবো না। কিন্তু ওর মনের ভাবটা আমি বুঝতে পারছি। সাধারণ অবস্থায় আমাদের যখন কেউ কিছু বলে তখন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু যোগীদের মন এত পরিষ্কার থাকে যে তাঁরা শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান তিনটেকে পরিষ্কার আলাদা করে দেখতে পান। যোগীরা যে আলাদা করে তিনটেকে ধরে নিতে পারছেন, যার ফলে ওনারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানকে মিলিয়ে নিতে পারেন। তাঁর কাছে শব্দ আর অর্থ গুরুত্ব নয়, জ্ঞানটাই তাঁর কাছে গুরুত্ব। ফলে যোগীর মন এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, তাঁর সংযমকে যখন প্রয়োগ করছেন তখন একটা পাখী যখন ডাক দিচ্ছে, সেই পাখীর যে জ্ঞান, যে জ্ঞান অর্থ হয়ে শব্দে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই জ্ঞানকে ওনারা সরাসরি বুঝে নিতে পারেন। কেউ যখন আমাদের কিছু বলতে আসে তখন বলে ‘আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন’, আমরাও মন দিয়ে শুনতে থাকি। কিন্তু এই মন দিয়ে শোনা আর যোগীদের মন দিয়ে শোনার মধ্যে অনেক তফাৎ। তাঁদের মনের একাগ্রতা অন্য উচ্চ মাপের। যে জ্ঞানকে আধার করে পাখী আওয়াজ করছে যোগী সেই জ্ঞানকে সরাসরি ধরে নিচ্ছেন।

তাই বলে পাখী চিঁ চিঁ বা চ্যাঁ চ্যাঁ বা ক্যাঁ ক্যাঁ যে শব্দ করছে আর যোগীকে যদি বলা হয় পাখীর প্রত্যেকটি শব্দকে কোডিফাই করে দিতে, যোগী তা কখনই পারবেন না। কোন যোগীই পারবেন না, তবে ওতেই যদি মন লাগিয়ে বসে থাকে তখন হয়তো একটা লম্বা প্রক্রিয়ায় তাও বলে দিতে পারবেন। কিন্তু জ্ঞানটুকু উনি ধরে নিতে পারবেন। শুধু তাই না, যোগী ইচ্ছে করলে পশু-পাখীকে নিজের ভাষায় বা চিন্তা করে কোন কিছু নির্দেশ দিলে তাতেই তারা সেই ভাবে যোগীর নির্দেশ পালন করতে শুরু করে দেবে। এমনকি যোগী ইচ্ছামাত্রেই যে কোন মানুষের মধ্যে যে কোন জ্ঞান সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, তিনি যদি মনে মনে ইচ্ছা করেন যে তোমার মধ্যে এই জ্ঞান হয়ে যাক, তার মধ্যে সেই জ্ঞানটা এসে যাবে। ইচ্ছা করলে যে কাউকে যে কোন জ্ঞান তিনি দিয়ে দিতে পারেন, তার জন্য ওনার আর কোন শব্দের মাধ্যম দরকার হবে না। যেমন ঠাকুর কাউকে একটু স্পর্শ করেই তার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চার করে দিচ্ছেন, কিংবা ইচ্ছামাত্রেই অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান জাগরিত করে দিচ্ছেন। উদাহরণ হিসাবে সূত্রের শুরুতেই আমরা সেন্ট ফ্রান্সিসের ঘটনা উল্লেখ করেছি।

এবার বলছেন – **সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥১৮॥** আমরা সারাদিন যত রকম কাজ করছি, আমি বই পড়ছি, জপ-ধ্যান করছি, কথা বলছি এগুলো সবই কর্ম। সমস্ত কর্ম আমাদের

মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে দেয়। এই ছাপটাকে বলে সংস্কার। আমাদের মধ্যে যে সংস্কারগুলো রয়েছে, যোগী যখন নিজের এই সংস্কারগুলির উপর সংযম করেন, সংযম মানে এর আগে আমরা বলেছি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটে মিলে সংযম, তখন *পূর্বজাতিজ্ঞানম্* হয়ে যায়, তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান চলে আসবে। পূর্ব পূর্ব জন্মে আমি কি কি করেছি, আমি কোন যোনিতে ছিলাম সব কিছুই যোগীরা জানতে পারেন। এখানে যোগীর নিজের জীবনের সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, যোগী আগের আগের জন্ম কি ছিলেন সব জানতে পারেন। যদিও এখানে বলা নেই, কিন্তু অন্যের আচার ব্যবহার, কথাবার্তা দেখে ওর সংস্কারের উপর যদি যোগী সংযম করেন তাহলে তিনি অপরের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথাও বলে দিতে পারবেন।

তারপরে বলছেন – *প্রত্যয়স্য পরচিত্ত-জ্ঞানম্।।১৯।।* অপরের শরীরের বিশেষ কোন লক্ষণের উপরে যদি দৃষ্টি দেওয়া হয় তখন সেই ব্যক্তির মানসিক গঠন জানা যাবে। আমাদের প্রত্যেকের শরীরের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, এই লক্ষণগুলি প্রত্যেকেরই আলাদা। শরীরের এই চিহ্নগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই *পরচিত্ত-জ্ঞানম্* হয়ে যাবে, তার মনের গঠনকে জানা যাবে। ঠাকুরও বলছেন – কারুর শরীরের চিহ্ন দেখেই আমি বুঝতে পারি লোকটি কি রকম। ঠাকুর কাউকে দেখে বলছেন ‘এ ভক্তের থাক’ আবার কাউকে বলছেন ‘এর জ্ঞানের থাক’। ঠাকুরের প্রথম অবস্থায় একজন ঠাকুরের কাছে এসে খুব ভক্তির কথা বলছে আর ভক্তির তোড়ে কাঁদছে আর বলছে ‘ওরে আমাকে একবার হরিনাম শোনানো’। ঠাকুর তাকে ভাবের অবস্থায় বলছেন ‘এ আবার আমড়া খাবে’। ‘আবার আমড়া খাবে’ মানে লোকটি আবার সংসারে ফাঁসবে। পরবর্তি কালে ঠিক তাই হল, কদিন পর তার ভক্তি-ফক্তি সব উড়ে গেছে আর বিয়ে করে সংসার সাজিয়ে বসে গেছে। শরীরের লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। দেখতে খুব সুন্দর, চোখ মুখের মধ্যে এমন সৌন্দর্য যে দেখে মনে হয় যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, আসলে এগুলো কিছু নয়, যদিও এটা ঠিক যে, দেখতে সুন্দর, সুরূপ, তার মানে আগে তার কোন সুকৃতি ছিল, এতে কোন সন্দেহই নেই। দেখা যায় বাবা-মা কাউকে দেখতে ভালো নয় কিন্তু তাদের সন্তান খুব রূপবান। এগুলো বংশ বা জেনেটিক দিক দিয়েও বোঝানো যায় না। ওর নিজস্ব কোন সুকৃতি বা ভালো কর্মের জন্য এই ধরনের সুন্দর শরীর পেয়েছে। তবে সুন্দর রূপবান চেহারা পুরোপুরি নির্ভর করে আগে আগে সে কেমন কর্ম করেছে। এমন কি এই জন্মেও যদি কেউ খুব জপ-ধ্যান তপস্যা করে তাতেও তার চেহারা অন্য ধরনের পরিবর্তন আসবে। যোগীরা তাঁর সামনের লোকটির শারীরিক গঠন বা শরীরের কোন অঙ্গের উপর সংযম করলে সেই লোকটির মনের গঠন কি রকম জেনে যান।

কিন্তু পরের সূত্রে বলছেন তবে যোগীরা মনের গঠন বলে দিতে পারলেও তার মনে কি হচ্ছে সেটা বলতে পারেন না – *ন চ তৎ সালক্ষনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।।২০।।* আলক্ষন মানে, লোকটির মনের ভেতরে কি চলছে সেটা জানতে পারবেন না। স্বামীজী এই সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন মনের ভেতরের খবর জানতে গেলে যোগীকে ওই মনের গঠনের উপরে সংযম করতে হয়। তার মানে, দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের আলাদা সংযম প্রয়োগ করতে হয়। একজন খুব নামকরা সন্ন্যাসীর জীবনের একটি ঘটনা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। সন্ন্যাসী মহারাজ আমেরিকায় একটি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি নিজের অফিস ঘরে বসে আছেন। আমেরিকার এক ধনী ভদ্রলোক সেই সময় অফিসে ঢুকে মহারাজের সঙ্গে কিছু কথা বলতে শুরু করেছেন। কিছুক্ষণ পরেই ভদ্রলোক মহারাজকে নিন্দা করে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করেছেন। মহারাজ অনেকক্ষণ লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওই লোকটি সারা জীবনে যত রকমের বে-আইনী কাজ করেছে সব একের পর এক বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এমন এমন নোংরা কাজের কথা যা কিনা ওই লোকটি ছাড়া আর কেউ জানতো না, সেগুলো সব মহারাজের মুখ থেকে শুনতেই আর থাকতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে পড়ল। রক ফেলারের নামেও একটি ঘটনা আছে। রক ফেলারও নাকি তখনকার দিনে অনেক বে-আইনী কাজ করে প্রচুর টাকা আয় করেছিল। স্বামীজীর সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল। রক ফেলার ধর্ম-টর্ম কিছুই মানতো না। রক ফেলার যখন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে

এসেছে সেই সময় স্বামীজী কিছু লিখছিলেন। এসেছে দেখে স্বামীজী কিছুক্ষণ তার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর স্বামীজী তাকে অনেক কিছু বলতে শুরু করলেন। স্বামীজী এমন এমন কিছু ঘটনার কথা বলতে লাগলেন যেগুলো রক ফেলার ছাড়া আর কেউ জানতো না। রক ফেলার খুবই ঘাবড়ে গেছে। কিছু দিন পর সে আবার এক লক্ষ ডলার চ্যারিটিতে দিয়ে তার রসিদ এনে স্বামীজীকে দেখিয়ে বলছে ‘এই দেখুন আমি চ্যারিটিতে এত ডলার দিয়েছি, এবার আপনি খুশি তো, এবার আপনি আমাকে একটা ধন্যবাদ দিন’! স্বামীজী তাকে বলছেন ‘আমি কেন তোমাকে ধন্যবাদ দেব, আমি তোমাকে সৎ পথে নিয়ে এলাম এর জন্য তোমারই উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া’। এই অধ্যায়ের নাম বিভূতি-পাদ, এই ধরণের সিদ্ধি সত্যিই হয়, আর এগুলো আমরা ঠাকুর ও স্বামীজী, এমনকি ঠাকুরের পার্শ্বদের জীবনেও অহরহ দেখতে পাই।

এর পরের সূত্রে আরো বড় সিদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, যোগী কীভাবে সবার সামনে থেকে অন্তর্ধান হন বলা হচ্ছে – **কায়রূপসংযমাতুদগ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগহন্তর্ধানম্।।২১।।** স্বামীজীও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন – মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন। এখানে যোগী কি করছেন? শুধু নিজের স্থূল শরীরের উপর সংযম প্রয়োগ করে নিজেকে অন্তর্ধান করে দিচ্ছেন। যখন নিজের শরীরের উপরে সংযম করছেন, তখন এই স্থূল দেহের যত অণু আছে সব অণুগুলো as if scattered হয়ে যাচ্ছে। কোন বস্তুর অণুগুলো যদি ছড়িয়ে যায় তখন সেখানে বস্তুর আর কিছুই দেখা যাবে না। যোগীর শরীরের অণু যদি ছড়িয়ে যায় যোগী তাহলে কোথায় যাবেন? কোথাও যাবেন না, এখানেই তিনি বসে থাকবেন, তিনি সব কিছু দেখতে পারবেন, সব কিছু শুনতে পারবেন, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। এখানে বলছেন যোগীর শরীর আর আপনার দৃষ্টির মধ্যে যোগীর শরীরের যে আকারটা রয়েছে সেটাকে আলাদা করে দেওয়ার ফলে একটা আবরণ এসে যাবে, এই আবরণের জন্য আমি আপনি যোগীকে দেখতে পাবো না, তাই মনে হবে যোগী যেন অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। যেমন ধরুন সমুদ্রের তীরে বালি দিয়ে একটা আকৃতি দাঁড় করালেন। তারপর হাত দিয়ে একটু নাড়া দিতেই বুর বুর করে বালিগুলো ছড়িয়ে গিয়ে আকৃতিটা হারিয়ে যাবে। বালি বালির মতই আছে কিন্তু তার আকারটা চলে গেল। এই শরীরটাও তাই, কিছু অনু পরমাণু একটা বিশেষ আকার নিয়ে আছে। এই প্লাস্টিক বোতলের একটা আকার আছে, এই দেহটারও একটা আকার আছে। এবার কোন যোগী যদি কায়রূপ, মানে তাঁর দেহ আর দেহের আকারের উপর সংযম লাগিয়ে দেন, তখন দেহ আর দেহের যে আকার এক অপরকে ধরে রেখেছে সেটা ছড়িয়ে যায়। ছড়িয়ে গেল মানে, দেহের সব অণুগুলো ছড়িয়ে গেল, তখন যোগী অন্তর্হিত হয়ে যাবেন, যোগীকে আর দেখা যাবে না। আসলে যোগী কোথাও উধাও হয়ে যাচ্ছেন না, ওখানেই বসে আছেন। কিন্তু বলছেন চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগে, যোগীর সামনের লোকের যে চোখ আর যোগীর দেহের যে প্রকাশের সংযোগে যা কিছু দৃশ্যমান হচ্ছিল, সেই সংযোগটা কেটে যাচ্ছে বলে সামনের লোক আর যোগীকে দেখতে পায় না। যোগী সবার সামনেই আছেন, তিনি কোথাও যাচ্ছেন না, কিন্তু সংযোগটা কেটে যাচ্ছে বলে যোগীকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

ইদানিং বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছেন এমন কিছু বস্তু যদি তৈরী করা যায় যাতে আলো এমন ভাবে প্রতিফলিত হবে যে সেই বস্তুতে আলো ধাক্কা লাগতেই আলোর পার্টিকেলস্ গুলো ছিটকে বেরিয়ে চলে আসতে পারে, আলো বস্তুর গায়ে এসে লাগলো আর আলোটা স্প্লি করে যাতে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে তখন আর সেই বস্তুকে দেখা যাবে না, ওই আলোটা ফেরতও আসবে না। শুধু তাই না, সামনে থেকে যে আলোটা আসছে সেটাও যেন পরিষ্কার আসে। রাডারে আসলে কি হয়, রাডার থেকে যে শর্ট ওয়েভ ছাড়ছে সেটা এ্যারোপ্লেনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে রাডারে ফেরত আসছে। ওই ফেরত আসা ওয়েভ দিয়ে রাডার ধরে নেয় প্লেনের সাইজ কি রকম, কত উচ্চতা আর কত স্পীডে যাচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু এখন এমন ধরণের কোটিং প্লেনের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া লাগানো হচ্ছে যে, রাডারের ওয়েভ গুলোকেই বডি শুষে নেয়। শুষে নেওয়ার ফলে ওয়েভগুলো আর ফিরে আসতে পারে না, ফেরত না আসার জন্য

রাডারও ওয়েভ ধরতে পারবে না, প্লেনের গতিবিধি ও অন্যান্য তথ্যও কিছু জানতে পারছে না। এবার অন্য দিক দিয়ে ভাবুন, মনে করুন অনেক উঁচু দিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছে, আর এই প্লেনের গায়ে আলোকে শুষে নেওয়ার সেই ধরণের রাসায়নিক কোটিং লাগানো আছে। যদি কোন পাওয়ারফুল টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা হয়, দিনের আলোতে সূর্যের আলো ওতে প্রতিফলিত হচ্ছে কিংবা রাতে চাঁদের আলোও প্রতিফলিত হচ্ছে কিন্তু ওই কোটিং থাকার জন্য আলোটা ওখানেই আটকে থাকছে, প্রতিফলিত হতে পারছে না। যার ফলে টেলিস্কোপে দেখা যাবে একটা অন্ধকারের ছায়া সরে যাচ্ছে, তাই দিয়ে বোঝা যাবে যে কিছু একটা ওখান দিয়ে যাচ্ছে। সমস্যা হল আমাদের টেলিস্কোপ গুলো একটা সরল রেখা ধরে যায় বলে যতক্ষণ সরল রেখাতে ক্রস করছে ততক্ষণই দেখা যাবে। দুটো পথ আছে, একটাতে উপর থেকে আলো আসছে তার ছায়া আমার উপর পড়ছে, আরেকটাতে আমার আলো যাচ্ছে তার প্রতিবিম্ব আবার আমার কাছে ফেরত আসছে। এই দুটোকেই বন্ধ করে দেওয়া যায়, যদি এমন একটা কোটিং লাগিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে আমার থেকে যে আলোটা যাচ্ছে সেই আলোটা তার গায়ে লাগলে স্লিপ করে বেরিয়ে যাবে, আর সামনের আলোটাও ধাক্কা লেগে স্লিপ করে এই দিকে চলে আসবে। তখন প্লেনটা আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেও আমি দেখতে পাবো না। দুটো ক্ষেত্রে একই জিনিষ হচ্ছে, তা হল, চক্ষু আর প্রকাশের যে মিলন সেটাকেই মিটিয়ে দিচ্ছে। যোগীরা ঠিক তাই করেন শরীর আর তার রূপকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এই রকমেরই আরেকটা সিদ্ধির কথাতে বলছেন – *এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্॥২২॥* অনেক লোকের মাঝখানে যোগী বিশেষ একজনকেই কিছু বলতে চাইছেন, তখন যোগী এমন ভাবে বলবেন যে, ওই বিশেষ একজনই বুঝবে যোগী কী বলতে চাইছেন, বাকীরা কেউ বুঝতে পারবে না। কীভাবে? যোগী সংযমের দ্বারা শব্দের অর্থটাকে এমন ভাবে ঢেকে দেন যে, যার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে কেবল সেই বুঝতে পারবে, বাকীরা শুনতে পারবে না। এই সিদ্ধিকেও আগের মতই ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন কায় আর তার রূপ, তেমনি শব্দ আছে আর তার একটি রূপও আছে। শব্দ আর রূপের উপর মনকে যখন যোগী সংযম করছেন তখন যার উদ্দেশ্যে বলছেন সে শুনতে পারবে কিন্তু পাশের লোক কিছুই শুনতে পারবে না। এর আরেকটি সম্ভবনা আছে, পতঞ্জলি তো লেখক ছিলেন না, সেই সময় যা কিছু ছিল সেগুলোকে তিনি একত্র করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তখনকার দিনে অনেকে হয়তো বলতো যোগীদের এই ধরণের অনেক কিছু ক্ষমতা আছে, তাঁরা এই এই জিনিষ করতে পারেন ইত্যাদি। এর কতটা সত্যি মিথ্যে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু পতঞ্জলি সব কিছুর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়ে দিচ্ছেন। তোমার মন একাগ্রতার একটা উচ্চস্তরে যদি চলে যায় তাহলে সেই একাগ্র মন দিয়ে তুমি যে কোন বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে বিচার করতে পারছো, ওই একাগ্র মন দিয়েই আবার তুমি যে কোন জিনিষকে ছিঁড়ে আলাদা করে দিতে পারবে। যোগী এই একাগ্র মন দিয়েই নিজের শরীর আর তার যে আকৃতি এই দুটোর যে যোগ সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন। অন্যের শরীর আর তার আকারকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে কিনা জানা নেই। যাদুকররা যাদু শক্তি দিয়ে স্টেজে একজনকে উধাও করে দিচ্ছেন। ম্যাজিক দিয়ে যাদুকররা যে জিনিষ করছেন সেটাই এনারা যোগ দিয়ে করছেন। পিসি সরকার রাজধানী এ্যক্সপ্রেসকে উধাও করে দিচ্ছেন। একটা ট্রেনকে কী করে উধাও করবেন! আসলে ট্রেনটা আসছে দেখা যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ একটা পর্দা এসে যাচ্ছে বলে বাকীরা কেউ ট্রেন দেখতে পাচ্ছে না। এটা পুরোপুরি ম্যাজিক। যোগী যেটা করছেন সেটা তিনি যোগশক্তিতে দেখাচ্ছেন, জিনিষটা একই। চোখের সঙ্গে যে বস্তুর সম্পর্ক, আসলে বস্তুর তো কোন সম্পর্ক হয় না, বস্তুর যে প্রতিবিম্বিত আলো তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে, প্রতিবিম্বিত আলো আর চক্ষুর মধ্যকার সংযোগটা কেটে দিলেই আর বস্তুকে দেখা যাবে না। রাজধানী আসছে, সামনে দিয়ে আপনি এমন কায়দা করে একটা পর্দা লাগিয়ে দিয়েছেন যে পর্দাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, ট্রেন থেকে যে প্রতিবিম্বিত আলো আসছে সেটাকে প্রতিহত করে দেওয়া হয়েছে।

এখানে বলছেন কায়রূপ, কায় মানে শরীর। শরীর একটা আকার ধারণ করে আছে, এই বিশেষ একটি আকারের মধ্যে ওই শরীরের যত অনু আছে সব অনুকে আবদ্ধ করে রাখা আছে। ওই যে আবদ্ধ

করে রাখা হয়েছে, এখন এই আবদ্ধের উপর যদি মনকে সংযম করেন, সংযম মানে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটেকে একসাথে করছেন তখন কায় আর রূপ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে মনের দিক থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। চিরদিনের জন্য যে আপনার কায় আর রূপকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে তা নয়। আসলে আপনার শরীরের অনুগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে কিন্তু ওই আকারের মধ্যে আর আবদ্ধ নেই। তেমনি শব্দের উপর সংযম করলে যার উদ্দেশ্যে শব্দটা প্রেরণ করা হয়েছে সেই একমাত্র শুনতে পাবে, বাকীরা কেউ শুনতে পারবে না। শব্দ কানে ধাক্কা মারলে কানে একটা কম্পন হয়, ওই কম্পনটা গিয়ে মনে একটা অর্থ সৃষ্টি করেছে। যোগী শব্দের উপর সংযম করে শব্দ আর কানের সংযোগটাই কেটে দিয়েছেন, যার ফলে শব্দটা থাকবে কিন্তু বাকীদের কানের সঙ্গে যোগ হবে না। যার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে সেই শুধু শুনতে পারবে।

তারপরে কর্ম নিয়ে বলছেন। আমাদের কর্মগুলি দুই ধরনের – একটা হল এই শরীরে কিছু কর্ম এখন হচ্ছে আর কিছু কর্ম ভবিষ্যতে হবে, যেটা কর্মশয়ের আলোচনায় বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। এখানে এখন বলছেন – **সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ-পরাস্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা।।২৩।।** আমাদের যত সংস্কার আছে তার মধ্যে কিছু সংস্কার আছে যেগুলো কিছুক্ষণ পরেই কার্যকরী হতে যাচ্ছে, যেমন এখন যে আবহাওয়া চলছে তাতে বুঝতে পারছি সন্ধ্যাবেলা আজকে খুব ঠাণ্ডা পড়বে, এই ঠাণ্ডায় যদি আমি সাবধান না থাকি তাহলে আমার সর্দি-কাশি লেগে যেতে পারে। কিন্তু চার মাস পরে কি রকম আবহাওয়া হবে, সেই আবহাওয়াতে আমার শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারবো না। কিন্তু আবহাওয়ার গতি প্রকৃতিও ঠিক হয়ে আছে আর আমার সংস্কারের ধরণটাও ঠিক হয়ে আছে। যোগী যদি এই দুটোর উপরে সংযম প্রয়োগ করতে পারেন, দুটো মানে যেটা এক্ষুণি হতে যাচ্ছে আর কিছু জিনিষ যেটা পরে হতে যাচ্ছে, তাহলে তিনি নিজের বা অপরের মৃত্যুর কথা জানতে পারবেন। কোন্ দিন, কটার সময়, এমন কি কত মিনিটের সময় তাঁর বা অপরের মৃত্যু হবে বলে দিতে পারেন। এটা খুবই স্বাভাবিক, যখন কর্মের সব খবর জেনে যাবে তখন সব কিছুই জানা হয়ে যাবে। যে কর্ম তাঁর দেহের অনু-পরমাণুকে আলাদা করে দেবে সেই কর্মকে তিনি জেনে নেন, তাতেই তিনি জেনে জান অমুক দিন অমুক সময় আমার শরীর চলে যাবে। ঠাকুরের ও স্বামীজীর দুজনের ক্ষেত্রেই আমরা এই জিনিষ দেখেছি। অনেকে এটাকে ইচ্ছামৃত্যু বলেন, কিন্তু যেভাবেই বলি না কেন, যোগীর জানা আছে অমুক দিন এই সময় এভাবে আমার শরীর যাবে। সেটা যোগী নিজে ঠিক করে রেখেছেন, নাকি শরীরটা এভাবে যাওয়ার জন্য ঠিক হয়ে আছে, এসব ব্যাপারে আমরা যাচ্ছি না। মূল কথা হল তিনি জানেন অমুক দিন এই সময় আমার শরীর যাচ্ছে।

রামকৃষ্ণ মিশনে অনেক সাধুর জীবনেই এই ধরনের প্রচুর ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে। বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী নির্বেদানন্দজী খুব উচ্চকোটির সাধু ছিলেন। তিনি যেদিন মারা যাবেন সেদিন তাঁর কাছে অনেকে বসে আছে, তাঁর এক ডাক্তার ছাত্রও বসে আছে, তিনি বলতে লাগলেন ‘শোন, এবার কিন্তু আমি আমার শরীর ত্যাগ করব’। সবাই ভাবছে যে মহারাজ এসব কি আবোল-তাবোল কথা বলছেন! কিন্তু তিনি এই কথা বলেই বসে পড়লেন আর সবাইকে বলছেন ‘এবার আমার প্রাণবায়ু আমার পা ছেড়ে দিয়েছে’। সবাই পা ছুঁয়ে দেখে সত্যিই পা ঠাণ্ডা। তারপরেই বলছেন ‘এবার আমার প্রাণশক্তি আস্তে আস্তে টেনে নিচ্ছি’। পুরো বর্ণনা করে যাচ্ছেন, যেন নিজের মৃত্যুর ধারাবিবরণী দিচ্ছেন। ‘এবার আমার কোমরে হাত দিয়ে দেখো আমার কোমরটা ঠাণ্ডা। এবার আমার বুকে হাত দিয়ে দেখো আমার বুকটাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে’। সবাই হাত দিয়ে দেখে মরা মানুষের মত সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটু পরেই বলছেন ‘এই এখন আমি সব ছেড়ে দিলাম’। বলেই তিনি মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন। ডাক্তার তার নিজের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে ‘এই ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে, আমি আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না’।

কাশী অদ্বৈত আশ্রমে অন্য এক মহারাজের একটি ঘটনা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। দেখা যেত রোজ ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা বাটিতে উনি কিছু না কিছু একটা রান্না করছেন আর

খাচ্ছেন। উনি যে কি করতেন কেউ বুঝতে পারতো না। হঠাৎ একদিন সব মহারাজদের ডেকে বলছেন ‘মহারাজরা সবাই শুনুন, আপনারা সবাই সন্ধ্যা আরতির পরে আমার ঘরে একটু আসবেন’। সাধুরা একটু মনে মনে বিরক্ত হল, সন্ধ্যা বেলা জপধ্যান না করে ওনার ঘরে যেতে হবে, নিজেও জপধ্যান করবে না আমাদেরও করতে দেবে না। তখন মহারাজরা বললেন ‘আজ তো একাদশী, আরতির পর রামনাম আছে’। ‘ও আচ্ছা, আচ্ছা, তবে রামনামের পরেই আসবেন, আপনারা আসবেন কিন্তু সবাই’। সবাই রামনামের পর গেছেন ওনার ঘরে। উনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, শুয়ে পড়ার পর সবাইকে বললেন ‘এবার আমি আমার শরীরটা ত্যাগ করব, আপনারা সবাই একটু ঠাকুরের নাম করুন’। উনিও শুয়ে পড়লেন, আর মহারাজরা সবাই ‘হরি ওঁ রামকৃষ্ণ’ করতে আরম্ভ করলেন। ‘হরি ওঁ রামকৃষ্ণ’ করতে করতেই হঠাৎ একটা সময় তাঁর শরীরটা নিখর হয়ে গেল। সবাই বুঝে নিলেন যে তিনি শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা যাঁদের চোখের সামনে ঘটেছে তাঁদের মুখেই শোনা।

রাজযোগে যত সিদ্ধির কথা বলা আছে এর একটিও কোন কাল্পনিক নয়, যে ভাবে সমস্ত সিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক এই রকমই বাস্তবে হয়ে থাকে। তারপরে বলছেন – **মৈত্র্যাতিষু বলানি।।২৪।।** এর আগে আমাদের মানবিক মূল্যবোধের যে গুণগুলির কথা বলা হয়েছিল, যেমন মৈত্রী, করুণা, মুদিত, উপেক্ষা ইত্যাদি, এগুলোর যে কোন একটির উপর কেউ যদি সংযম করে তাহলে তার মধ্যে সেই গুণের উৎকর্ষতা প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে যাবে। আমাদের দেশের গ্রামে গঞ্জে সাধারণ গৃহবধুদের বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তাদের মধ্যে তেমন কিছু নেই, কিন্তু একটা জিনিষ মারাত্মক ভাবে সবার আছে, সেটা হল তাদের মাতৃত্ব ভাব। কিন্তু বর্তমান যুগে বেশীর ভাগ গৃহবধুরা নিজের সন্তানদের উপরেই শুধু মাতৃত্ব ভাবকে ধরে রেখেছে। এই মাতৃত্ব ভাবের উপর কেউ যদি মনকে সংযম করে তাহলে তার মধ্যে মাতৃত্ব ভাব প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে যাবে। চেনা অচেনা যে কেউ তার কাছে দাঁড়ালেই মনে করবে আমি আমার মায়ের কাছেই এসেছি।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসার আগে যা যা করেছেন, যেভাবে জীবন যাপন করেছিলেন তার অনেক কিছুই আমরা মায়ের জীবনীতে পাই। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে শ্রীমা যখন বসবাস করছেন তখন ঠাকুর চাইছেন শ্রীমা যেন ভোর তিনটের আগেই উঠে পড়েন, যার তার সঙ্গে যেন মেলামেশা না করেন। ঠাকুর সেই সময় শ্রীমাকে রীতিমত একটার পর একটা ট্রেনিং দিয়ে গেছেন। শ্রীমাকে যদি আমরা একজন পবিত্রা সাধিকা রূপেও দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, শ্রীশ্রীমায়েরও যে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছিল সেটাও একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে অন্য খাতে চলে গেছে। মায়ের জীবনী পড়তে গিয়ে কিছু খাপছাড়া ঘটনা পড়ে বা শুনে আমরা শ্রীমায়ের সাধনার এই পক্ষটাকে হারিয়ে ফেলি বা বুঝতে পারি না। ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তখনকার দিনের সাধারণ নারীদের মধ্যে যে জিনিষগুলো ছিল, সেই সাধারণ নারীসুলভ কিছু কিছু জিনিষ মায়ের মধ্যেও পরিলক্ষিত করা গেছে। যেমন, ঠাকুরের উপর অধিকার বোধ তাঁর চিরদিনই ছিল। কিন্তু শ্রীমায়ের মধ্যে যেটা প্রথম দিন থেকেই ছিল, যেটা দক্ষিণেশ্বরে আরও পরিপক্বতা পেয়েছে, তা হল মায়ের মাতৃত্ব ভাব। মাতৃত্ব ভাব মায়ের ছোটবেলা থেকেই ছিল, আর আজীবন এই মাতৃত্ব ভাব তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে সদা বিরাজমান থেকে গিয়েছিল। শ্রীমা যে জপ-ধ্যান তপস্যাদি করছেন, এই তপস্যার শক্তিকেও তিনি মাতৃত্ব ভাবের উপর লাগিয়ে দিচ্ছেন, যার ফলে সাধারণ অবস্থায় মায়েরা যখন তার একটি কি দুটি সন্তানের জননী হন, সেখানে শ্রীমা জগজ্জননী হয়ে সবার মা হয়ে গেলেন। ভক্তির দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি তিনি তো সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তিনি তো প্রথম থেকেই জগজ্জননী হয়ে আছেন। সেখানেও কেউ ভুল কিছু বলছে না, ঠিকই বলছে। কিন্তু আমরা এখানে যোগের দৃষ্টিতে দেখছি, যোগ তো ভগবানই মানছে না, তাঁর আবার লক্ষ্মী, তাঁর প্রতি আবার ভক্তি কোথা থেকে আসবে! কিন্তু কোন যোগীকে যদি প্রশ্ন করা হয় শ্রীমা কেন বলছেন তিনি আমজাদেরও মা আবার ব্রহ্মজ্ঞানী শরৎ মহারাজেরও মা, তখন যোগী তাকে এই সূত্রটা ধরিয়ে দেবেন, **মৈত্র্যাতিষু বলানি**। যোগের চব্বিশ নম্বর সূত্র ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে মা জগজ্জননী কেন।

শ্রীমায়ের মধ্যে যে মাতৃত্ব ভাব, যে সেবা ভাব ছিল এই ভাবের ব্যাপারে তিনি কখনই কারুর সঙ্গে কোন আপোষ করছেন না, এমন কি ঠাকুরকেও দীপ্ত কণ্ঠে কিছু বলতে দ্বিধা করেছেন না। নরেন, বাবুরাম মহারাজদের খাওয়ার ব্যাপারে ঠাকুর শ্রীমাকে বলছেন অত বেশী বেশী খাওয়ালে ওদের জপ-ধ্যান হবে কি করে! মা বলছেন ‘সে আমি দেখবো’। যে কোন নারী বা পুরুষ যদি তাঁর নিজের সাধনার শক্তিকে যখন মাতৃত্ব ভাবের উপর লাগিয়ে দিচ্ছেন তিনি কিন্তু এখন জগজ্জননী হয়ে যাবেন, আর তাঁকে আটকানো যাবে না। অনেক মহাত্মা ও সাধীদের আমরা জানি যাঁদের মধ্যে এই মাতৃত্ব ভাব ছিল।

অন্য আরেকটিতে বলছেন – **বলেষু হস্তিবলাদীনি।।২৫।।** হাতির উপর সংযম করলে হাতির মত বল শরীরে এসে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমি সিংহের উপর ধ্যান করি। স্বামীজী এই কথা মজা করে বলেছেন নাকি সত্যি সত্যিই তিনি সিংহের হৃদয়ের উপর ধ্যান করার কথা বলছেন আমাদের জানা নেই। কিন্তু স্বামী-শিষ্য সংবাদে স্বামীজী এই কথা বলছেন। আর সত্যিই তো স্বামীজীর বেদান্তবাণীর উপর যে গর্জন তাতো সিংহেরই গর্জন। আসলে আমরা যার কথা সব সময় চিন্তা করব, যার সঙ্গ করব তার ভাব আমাদের মধ্যে চলে আসবে। আপনি যদি নিজেকে দুর্বল মনে করেন তাহলে ঘরে কয়েকটা সিংহের ছবি লাগিয়ে দিন, দেখবেন কিছু দিনের মধ্যে আপনার দুর্বলতা দূর হয়ে ভেতরে একটা শক্তি এসে গেছে। সেইজন্য বাড়িতে ঠাকুর দেবতার ছবি লাগাতে বলা হয়।

তবে যোগীরা যখন যে জিনিষের উপর তাঁর সংযম লাগিয়ে দেবেন সেই জিনিষের শক্তি তাঁর মধ্যে চলে আসবে। প্রহ্লাদকে যখন পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তখন প্রহ্লাদ আসলে তার মনকে বায়ুর উপরে সংযম করে দিচ্ছেন তার ফলে তাঁর শরীরটা বায়ুর মত হালকা হয়ে যাচ্ছে। বায়ুকে পাথরের উপরে ফেলে দিলে কিছুই হবে না। তারপর প্রহ্লাদের উপরে একটা পাথর ভাঙতে শুরু করেছে, প্রহ্লাদ তখন তাঁর শরীরকে ইস্পাতের মত করে নিলেন। ইস্পাতের ধর্ম তাঁর শরীরে এসে পড়ায় পাথর তাঁর উপরে ভাঙতে গেলে পাথরই গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। যখন তাঁকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল তখন প্রহ্লাদ লঘুতার উপরে সংযম করে নেওয়ায় তাঁর শরীর হালকা হয়ে যাওয়াতে সমুদ্রের জলে ডুবে না গিয়ে ভেসে রইলেন। মীরাবাইয়ের জীবনেও এই ধরণের ঘটনা দেখা যায়। মীরাবাইয়ের জীবননাশের জন্য রাণাজী বিষ পাঠিয়েছে। মীরাবাই সেই বিষ পান করে নিলেন, অথচ তাঁর কিছুই হল না। কেন? তখন তিনি সর্বব্যাপী যে জীবনীশক্তি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতোপ্রতো হয়ে রয়েছে সেই জীবনীশক্তির উপরে সংযম করেছিলেন বলে তাঁর মৃত্যু হল না।

তারপরে বলছেন – **প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।।২৬।।** প্রত্যেক জিনিষের একটা নিজস্ব আলো থাকে। ওই আলোর উপর যোগীরা যখন সংযম করেন তখন সেই জিনিষের গঠনটা তিনি জেনে যান। আমাদের সবারই হৃদয়ের ভেতরে একটি জ্যোতি আছে। অনেক দিন সাধনা করলে হৃদয়ের এই জ্যোতিকে দেখা যায়। অনেকে এসে বলেন ধ্যানে আমার জ্যোতির্দর্শন হয়, তখন তিনি এই জ্যোতির কথাই বলছেন। হৃদয়ের মধ্যে যে জ্যোতি আছে, তার উপর যদি কেউ সংযম করেন তখন দৃষ্টি পথের সমস্ত আবরণ অপসারিত হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে আমার দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালে আটকে যাচ্ছে। এই দেওয়াল আসলে কতকগুলি অণু ছাড়া আর কিছুই নয়, আর আলো তাও কতকগুলি অণুর সংমিশ্রণ। এখন আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি মানে আমার চোখের অণুগুলি সেই বস্তুর অণুগুলিকে গ্রহণ করছে – এই দুই অণুর মধ্যবর্তী জায়গাতে আরো কিছু অণু আসছে যাচ্ছে, যেগুলো এই দেওয়াল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির মাধ্যমে দৃষ্টির মাঝখানে বাধা তৈরী করছে। কিন্তু অন্তরে যে জ্যোতি রয়েছে তার উপরে মনকে সংযম করলে এই বাধাগুলি অপসারিত হয়ে যায়, তখন স্থূল চোখের দৃষ্টি সমস্ত বাধাগুলিকে ভেদ করে চলে যাবে।

তারপর বলছেন – **ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।।২৭।।** যদি কেউ সূর্যের উপর মনকে সংযম করতে পারে তাহলে সে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান লাভ করে নেবে, এই জগৎটা কি, এই জগৎ কি ভাবে কাজ করে, এই জ্ঞানগুলি তখন তার মধ্যে এসে যাবে। এই সূত্রটা একটি খুব মজার সূত্র। গ্রীক

দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা গণিতজ্ঞ ছিলেন তাঁরা গ্রহ নক্ষত্রের ব্যাপারে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, যেমন পৃথিবীর ব্যাস কত, তার পরিধি কত, গণিতের অনেক জটিল নিয়মের সাহায্যে এনারা এগুলোকে আবিষ্কার করেছিলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই তথ্যগুলি এনারা আবিষ্কার করে দিয়েছিলেন। এখন বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখছেন তখনকার দিনের অতি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে যে হিসাব গ্রীক দেশের গণিতজ্ঞরা দিয়ে গেছেন সেই হিসাব তাঁরা একেবারে ঠিক ঠিক মেপেছিলেন। এর মধ্যে আশ্চর্য যেটা হল, এই তথ্য আবিষ্কারে যে ধরনের গণিতের ফর্মুলা ওনারা ব্যবহার করেছিলেন, সেই গণিতের ফর্মুলা আজও সবাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন, গণিতের ধরণ আজও পাল্টায়নি। এখান থেকে বসে বসে তাঁরা চন্দ্রমার কি ব্যাস, কি পরিধি, চন্দ্রমা পৃথিবী থেকে কত দূরে অবস্থিত সেগুলোও সঠিক ভাবে বলে দিয়েছিলেন। এখান থেকে সূর্য কত দূর, তার সাথে সূর্যের আয়তন তার পরিধি কত সেটাও বলে দিয়েছিলেন। এগুলো সব গ্রীক গণিতজ্ঞরা খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশ বছর আগে বার করেছিলেন। ইদানিং বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে যে তথ্য দিচ্ছেন তার সাথে গ্রীক গণিতজ্ঞদের দেওয়া তথ্যের খুব একটা ফারাক নেই। অথচ তাঁরা এগুলো অতি সাধারণ পদ্ধতির জ্যামিতিক হিসাবের দ্বারা বার করেছেন। আকাশে চাঁদের দিকে নিজের আঙুলকে এগিয়ে দিচ্ছেন। তারপর দেখছেন তার আঙুলের যে নখ তাই দিয়ে পুরো চাঁদকে ঢেকে দেওয়া যাচ্ছে। এরপর চোখ থেকে নখ পর্যন্ত একটা জ্যামিতিক লাইন টেনে দিলেন। চোখ থেকে আঙুল কতটা দূরত্বের সেটা মেপে নিলেন। এই জ্যামিতিকে আধার করে সোজা একটা জ্যামিতিক ডায়াগ্রাম বানিয়ে দিয়ে হিসেব করছেন, এভাবে যদি একটা লাইন নীচ দিয়ে টানা হয় তার সাথে উপর দিয়ে একটা লাইন টানা হয়, এবার পেছনে চাঁদ আছে, এতটা আকারের একটা জিনিষ রাখলে চাঁদ পুরো ঢাকা হয়ে গেল। এরপর এই লাইন কতটা লম্বা, এখান থেকে যে জিনিষের দ্বারা চাঁদ পুরো ঢাকা পড়ে গেছে সেই জিনিষটা কত দূরত্বে আছে, এই কটি হিসাবের উপরে সাধারণ জ্যামিতিক ফর্মুলা লাগিয়ে দিয়ে বার করে দিচ্ছেন চাঁদের আয়তন কত, এখান থেকে কত দূরে আছে। ভাবলেও আশ্চর্য লাগে, মস্তিষ্কের কী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁদের।

তখনকার দিনে দুটো মত ছিল। একটা মতে পৃথিবীই ছিল সব কিছুর কেন্দ্র। তাঁদের এই মতকে বিশ্বাস করার অনেক কারণও ছিল। কিছু গণিতজ্ঞদের মত ছিল সূর্যই সব কিছুর কেন্দ্র। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে সেই সময় এমন কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, যার উত্তর ওনারা দিতে পারেননি। অবশ্য ইদানিং কালে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সেই উত্তর এসে গেছে। কিন্তু সূর্য যে সব কিছুর পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটা ওনারাও জানতেন। মজার ব্যাপার হল, গ্রীক গণিতজ্ঞরা, যাঁরা পুরো পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতকে প্রভাবিত করে ফেলেছিলেন, তাঁদের কাছে একটাই ব্যাপার ছিল তা হল বাইরের জগতের সব কিছুকে তুমি হিসাব করতে থাকো, এর জন্য তুমি জিওমেট্রির ফর্মুলা লাগাও, ট্রিগোনোমেট্রির ফর্মুলা লাগাও, ফিজিক্সকে লাগাও আর জগতের সব তথ্যকে জানতে থাকো। অন্য দিকে ভারতের ঋষিরা এটাকে ভেতরের দিকে নিয়ে চলে গেলেন। ভেতরের দিকে নিয়ে কি বললেন? *ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ*, এই যে পুরো ভুবন, যে সৌরমণ্ডল এর সম্পূর্ণ জ্ঞান যদি তুমি পেতে চাও তাহলে সূর্যের উপর সংযম লাগাও, সূর্যের উপর চিন্তা করতে থাকো তাতেই তুমি সৌরমণ্ডলের সব রহস্য জেনে যাবে। এনারা জানেন জানার জন্য সূর্যের উপরেই সংযম লাগাতে হবে। সংযম লাগানো মানেই আপনাকে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করতে হবে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি মানেই আপনাকে যম, নিয়ম, আসনাদি করে করে এদিকে অগ্রসর হতে হবে। তার মানে, আপনি যদি জ্যোতির্বিদ্যাও পড়তে চান, ফিজিক্সও যদি জানতে চান তাতেও আপনাকে তপস্যা করতে হবে, জপ-ধ্যান করতে হবে। কিন্তু *Greek method of science* আর *Indian method of science* এখানে এসে দুটো আলাদা হয়ে যায়। যার জন্য আমাদের যত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন, আর্কভট্ট, ভাস্কর এনারা সবাই উঁচু দরের সাধক ছিলেন। তাঁরাও গণিতের চর্চা করেছেন কিন্তু ওনারা যোগের মৌলিক নীতিকে অবলম্বন করে চলেছিলেন। ওনাদের বক্তব্য হল, একটা একটা করে তুমি কত উত্তর বার করবে, তার থেকে একবারেই সব বার করে নাও। একবারে কীভাবে বার করবে? *ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ*।

সেই রকম **চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্**।।২৮।। চন্দ্রের উপরে সংযম করলে সমস্ত তার মণ্ডলের জ্ঞান এসে যাবে।

তারপর বলছেন – **ধ্রুবে তদগতিজ্ঞানম্**।।২৯।। ধ্রুব তারাতে মনকে সংযম করলে নক্ষত্রের গতি পথের জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। অনেক ধর্মে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে আকাশ একটি স্থির বস্তু আর তাতে নক্ষত্র তারাগুলি টুনি বাল্বের মত একই জায়গাতে স্থির ভাবে ঝুলছে, এদের মতে সব নক্ষত্রই স্থির, fixed। কিন্তু বিজ্ঞান সব সময় এর বিপরীত কথা বলছে। বিজ্ঞান বলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থির নেই, সব কিছুই একটা নিজস্ব গতি রয়েছে। আর এটাই আশ্চর্যের বিষয় যে পতঞ্জলিও ঠিক এই একই কথা বলছেন **ধ্রুবে তদগতিজ্ঞানম্**। তারা গুলি যে সরে সরে যাচ্ছে, তাদের যে একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে, ধ্রুবতারাতে মন সংযম করতে পারলে সেই গতিপথের জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। ভারতে যাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন, আর্ঘভট্ট, ভাস্করাদিদের গাণিতিক জ্ঞানও ছিল আবার এই যৌগিক শক্তিও তাঁদের মধ্যে ছিল। আগেকার দিনের গণিতজ্ঞদের কাছে একটা সমস্যা ছিল। ওনারা দেখছেন প্রতিদিন সূর্য উদয় হচ্ছে আর অস্ত যাচ্ছে। তার ঠিক পেছনে আবার তারাগুলোও উদয় হয়ে অস্ত যাচ্ছে। ওনাদের ধারণা ছিল আমরা হল্যাম কেন্দ্র আর বাকি সব প্রদক্ষিণ করছে, সূর্যও ঘুরছে, তারাও ঘুরছে। এই ধারণাটাকে পাল্টাতে, বিশেষ করে গ্যালিলিও যখন তাঁর আবিষ্কারের কথা বললেন তখন তাঁদেরকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ফিজিক্সেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানেও বলা যায় না পৃথিবী ঘুরছে নাকি সূর্য ঘুরছে। এগুলো এক একটা মডেল। কারণ নিউটনের যে ফিজিক্স সেটাকে মেনে চললে বলতে হয় সূর্য স্থির আর পৃথিবী ঘুরছে, এই মত মেনে নিলে সব কিছু ব্যাখ্যা সহজে দিয়ে দেওয়া যায়। আর যদি মনে করি পৃথিবী স্থির বাকি সব কিছু ঘুরছে তখন গাণিতিক ফরমুলার অনেক হিসাবই মিলবে না, যার সমাধান কোন দিনই করা যায় না। সেইজন্য এগুলো এক একটা মডেল বলা হয়। আপনি যদি মনে করেন পৃথিবী স্থির আর বাকি সব কিছু ঘুরছে, তাতে কোন দোষ নেই কিন্তু তাতে জ্যামিতি, ফিজিক্স ও গণিতের দিকে থেকে অনেক কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়ে যাবে। সেইজন্য এই মডেলকে বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করতে চান না।

তারপর বলছেন **নাভিচক্রে কায়ব্যুহ-জ্ঞানম্**।।৩০।। নাভিচক্রে যদি মনকে সংযম করা হয় তাহলে তার শরীরের গঠন আর তার কার্যাবলীর জ্ঞান এসে যাবে।

কর্ধকূপে ক্ষুধপিপাসানিবৃত্তিঃ।।৩১।। কর্ধে মনকে সংযম করলে ক্ষুধা, পিপাসার উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ শক্তি এসে যাবে। ক্ষুধা, পিপাসার উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তি এসে গেলে তখন আর শরীর রক্ষার জন্য খাওয়া, পানাদি করার দরকার হবে না।

তারপর বলছেন – **কূর্মনাড্যাং শ্চৈর্যম্**।।৩২।। কূর্ম নামে আমাদের শরীরে একটা বিশেষ নাড়ি আছে, বলছেন – যদি কূর্ম নাড়ির উপর মনকে সংযম করা হয় শরীরটা স্থির হয়ে যাবে, শরীরকে অকারণে নড়াচড়ার কোন প্রয়োজনই আর হবে না। ধ্যান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধি আমাদের খুব সাহায্য করে।

আর **মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্**।।৩৩।। মস্তিষ্কের জ্যোতির উপরে যদি কেউ সংযম করেন তখন তিনি, যাঁরা সিদ্ধপুরুষ অথচ সূক্ষ্ম শরীরে আছেন, তাঁদের দর্শন করতে পারবেন।

তারপরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্রে বলছেন – **প্রাতিভা স্বা স্বামী**।।৩৪।। স্বামীজীর ভাষায় **প্রাতিভা** হল spontaneous enlightenment, এই ধরনের উচ্চ প্রাতিভা-শক্তি একমাত্র পবিত্রতা থেকেই আসতে পারে। শরীর, মন একেবারে পবিত্র হয়ে গেছে – এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে **প্রাতিভা**। যে মানুষ খুব পবিত্র জীবন-যাপন করছেন, আর ওই পবিত্রতার দরুণ তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে বা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে, এটাকেই বলছেন প্রাতিভা। আমরা যখন বলি লেখার প্রাতিভা বা কাব্যের প্রাতিভা, একই জিনিষ। অর্থাৎ যাঁর সাহিত্য রচনার প্রাতিভা আছে, তার মানে তাঁর ওই জিনিষের জ্ঞান

এসে গেছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে তাকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেয়। প্রতিভা হল জ্ঞান, জ্ঞানের আলো। এই প্রাতিভার জন্য কি হয়, এই যে এতক্ষণ যত রকমের সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, পবিত্রতার জন্য এর সব কটি সিদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসে। স্বামীজী পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের কথা বলছেন, তার মানে চরিত্রে একটা সাংঘাতিক পবিত্রতা এসে গেছে, এই পবিত্রতা থেকেই জ্ঞান লাভ হয়ে যাচ্ছে। এখানে এই জ্ঞান কিন্তু আত্মজ্ঞানের কথাই বলা হচ্ছে। কারণ যদি প্রাতিভা লাভ হয় অর্থাৎ শরীর মনের পবিত্রতা এমন পর্যায়ে চলে যাবে যে তখন আর এই ধরনের যত রকম অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে তার কিছুই করার প্রয়োজন হবে না, যত রকম সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে সব সিদ্ধি এই আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে এসে যাবে। ঠাকুরের এই ধরনের সব সিদ্ধি ছিল, কিন্তু তিনি কোন দিনই এটা-ওটার ওপরে কোন ধরনের সংযমাদির প্রয়োগ করেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা ছিলেন সেইহেতু সব কটা সিদ্ধিই তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান ছিল।

এরপরে বলছেন – **হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ।।৩৫।।** যদি কেউ হৃদয়ে সংযম করেন তাহলে কার মনে কি হচ্ছে সব জানতে পারবেন। এর আগের একটা সূত্রে বলেছিলেন কারণ শরীরের গঠনের উপর সংযম করলে তার মনের গঠনটা জানা যায়। আর এই সূত্রে বলছেন যদি হৃদয়ে সংযম করা হয়, এখানে যদিও পরিষ্কার করে বলা নেই যে নিজের হৃদয়ে না অপরের হৃদয়ে সংযম করতে হবে, কিন্তু নিজের হৃদয়ের উপরেই সংযম করতে হবে। নিজের হৃদয়ে যদি সংযম করা হয় তাহলে অপরের মনে কি হচ্ছে সেগুলো পড়ে নেওয়া যায়। ঠাকুর বলছেন ‘কোন লোককে দেখলে, কাঁচের আলমারির ভেতরে সব জিনিষ যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, সেই রকম তার মনের ভেতরের সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই’।

সত্ত্বপুরুষায়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়বিশেষাদ্।

ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।।৩৬।।

সূত্রটি যদিও অনেক বড় কিন্তু এর অর্থ অত্যন্ত সাধারণ। এই সূত্রের শেষ অংশে বলছেন স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্, এত বড় সূত্রের মধ্যে এর একটাই কাজের শব্দ হল ‘স্বার্থ’। বলছেন যখন স্বার্থ-বুদ্ধিতে প্রতিবিস্মিত পুরুষের উপর সংযম করবে তখন পুরুষের জ্ঞান হয়। প্রথম অবস্থায় আমাদের বুদ্ধি, চিত্ত, মন, অহঙ্কার সব মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে। তারপর সাধনা করে করে আপনার বুদ্ধিকে একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, মন আপনার বকবাকে হয়ে গেছে। এটাকে বলছেন স্বার্থ, এই স্বার্থ মানে আত্মকেন্দ্রিত। আপনার মন আর অন্য কোন দিকে যাচ্ছে না, এখন মন মানে মন। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখছেন রাস্তায় বাঁশের উপর একটা লাল কাপড় ঝুলছে। লাল কাপড় মানে ইঙ্গিত দিচ্ছে সামনে কোন বিপদ আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে কারণ লাল জামা ছিড়ে ওখানে লেগে আছে। আবার হনুমানজীর মন্দিরে লাল পতাকা টাঙানো থাকে। লাল দেখে আপনি কেন বিপদ দেখছেন? কারণ সব সময় লাল মানেই বিপজ্জনক কিছু ভেবে ভেবে মনে একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে লাল মানেই বিপদ। লাল আমাদের কাছে বিপজ্জনক কিন্তু হনুমানজীর ভক্তের কাছে লাল শুভ। এই ভাবে জগতে আমরা যা কিছু দেখছি সবই একটা রঙিন মন নিয়েই দেখি, রঙিন মন মানে সেখানে স্বার্থ নেই, মন পরার্থ অর্থাৎ অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। এবার সাধনা করে করে মনের রঙগুলোকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন লাল রঙ মানে লাল রঙ, লাল না ভক্তির চিহ্ন, না কোন বিপদের চিহ্ন। তার মানে মন আপনার এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর আপনার মন যদি কোন কিছুর সঙ্গে না জড়ায়, তখন আপনি নিজে ছাড়া মনের কাছে আর কিছু নেই, শুধু নিজে মানে স্বার্থ। এবার নিজের এই শুদ্ধ মনের উপর যদি সংযম করা হয় তাহলে আপনার পুরুষের জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে। তাহলে আত্মজ্ঞান কখন হবে? প্রথম নিজের মনকে একেবারে শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ পবিত্র করে করে মনকে পরার্থ থেকে একেবারে স্বার্থ অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। স্বার্থ মানে যেখানে মনে অন্য কোন ধরনের রঙ নেই, শুদ্ধ মনই তখন একমাত্র আছে। মন পুরুষ বা আত্মার আলোতেই আলোকিত হয়। মনের নিজস্ব কোন আলো নেই। কিন্তু মন সব সময় নিজের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মনের এই পরার্থ অবস্থা থেকে মনকে সরিয়ে পুরো স্বার্থ অবস্থায় দাঁড় করাতে হবে। মন

এবার নিজে ছাড়া আর কিছু নেই। তখন সে কাকে আর দেখবে? তখন সে নিজেকে অর্থাৎ পুরুষ ছাড়া আর কাউকে দেখবে না।

বুদ্ধির আরেকটি নাম সত্ত্ব, যার মধ্যে আমাদের শুভ অশুভ সব কর্ম মিলে মিশে আছে। সত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতির এলাকার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। পুরুষ ছাড়া আর কারুর মধ্যে চৈতন্য নেই, তাই চিন্তা একমাত্র পুরুষই করতে পারেন। সাধনা করে করে মনকে যখন একেবারে পবিত্র করে নিয়েছে, তখন এই পবিত্র মন স্বার্থ অবস্থায় চলে যায়। সত্ত্ব থেকে স্বার্থে চলে এল। সত্ত্ব শুভ অশুভ সব মিলে মিশে আছে কিন্তু স্বার্থে শুধু শুভই আছে, তখন তার পুরুষের জ্ঞান হয়। তখন আর কিছু নেই শুদ্ধ আলোই তখন দেখছে। এর আগে পর্যন্ত যত সিদ্ধির কথা বলা হল, সব সিদ্ধিই এই স্বার্থ হয়ে গেলে চলে আসে।

তারপরেই বলছেন **ততঃ প্রাতিভ্রাষণবেদনাদর্শান্বাদবর্তী জায়ন্তে।।৩৭।।** পুরুষের জ্ঞান হয়ে গেলে প্রাতিভা হয়ে যায়, এর আগে যে প্রতিভার কথা বলা হয়েছে। এই প্রাতিভা থেকেই ইন্দ্রিয়ের যত রকমের কাজ হয় শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও স্রাবণ সবার জ্ঞান হয়ে যায়।

এতক্ষণ অনেক রকমের সিদ্ধির কথা বলার পর বলছেন এই জিনিষগুলিকে জাগতিক অর্থে সিদ্ধি বলা হয় কিন্তু নির্বীজ সমাধির জন্য এগুলোই আবার প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেইজন্য এই সূত্রে যোগীকে সতর্ক করা হচ্ছে – **তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।।৩৮।।** যখন সাধনা করতে করতে এই সিদ্ধি গুলো আসতে থাকে তখন বুঝতে হবে যোগীকে মহামায়া মানে প্রকৃতি ফাঁদে ফেলতে চাইছেন। মনের মধ্যে যদি মান-যশের বাসনা থাকে, জাগতিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তখন এই ধরনের সিদ্ধির আবর্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। সিদ্ধির মোহের মধ্যে একবার পড়ে গেলে বেরিয়ে আসা খুব দুঃসাধ্য হয়, যার ফলে যোগের লক্ষ্যটাও হারিয়ে যায়, নির্বীজ সমাধির দিকে আর এগোতে পারবে না। তাহলে এত সিদ্ধির কথা বলার কী দরকার ছিল? না দরকার অবশ্যই আছে, এখানে আমাদের বোঝানোর জন্য বলা হল, সাধনা করতে করতে যোগীর কি কি ধরনের ক্ষমতা আসে। ক্ষমতা যদি এসেও যায় তাহলেও যোগীকে আন্তে করে সেই ক্ষমতা থেকে সরে এসে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামীজী বলছেন, যখন এই বিচারটা এসে যায় আমার মন আর বাকি সব কিছু আলাদা এরপর আপনি মনের উপর যখন সংযম করছেন তখন আসবে প্রাতিভা। যদি সাধকের মধ্যে প্রাতিভার প্রকাশ হয়, সেই চরম জ্ঞান যা কিনা পবিত্রতা থেকেই আসে, যে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষ আর প্রকৃতিকে আলাদা দেখতে পারছে, তখন সেই অবস্থাই সব থেকে উচ্চ অবস্থা, এই অবস্থাই সাধককে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে, এতক্ষণ যত কিছু সিদ্ধির কথা বলা হল এগুলো সবই যোগবিঘ্ন। অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে এই সিদ্ধিগুলোই বিরাট লোভনীয় শক্তি।

কোন বাচ্চা ছেলের হাতে যদি একটা খেলনা বন্দুক ধরিয়ে দেওয়া হয়, সে তখন চারিদিকে সবাইকে গুলি ছুড়ে বেড়াবে। একজন সন্ত্রাসবাদীর হাতে একটা সত্যিকারের একে-৪৭ দিয়ে দিন, তখন সুযোগ পেলেই সে ওই বন্দুক দিয়ে নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারতে থাকবে। আবার মিলিটারি সৈনিক বা কমান্ডোর হাতে কত রকম আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকে কিন্তু অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা এগুলোর কোনটাই করবে না। যারা জুডো, ক্যারাটে শিখছে, বলা হয় প্রশিক্ষণের দ্বারা ওদের যেমন যেমন জুডো ক্যারাটের ক্ষমতা আসে তেমন তেমন তাদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও এসে যায়। ক্ষমতার সাথে সাথে যদি ডিসিপ্লিন না আসে তা হলে বিপর্যয় যে কোন মুহূর্তে নেমে আসবে। আজ দেশের এই দুরবস্থার মূলে এটি একটি অন্যতম কারণ, রাজনীতিই বলুন আর প্রশাসনের ক্ষেত্রেই বলুন সবার হাতে প্রচুর ক্ষমতা এসে গেছে কিন্তু কারুর মধ্যেই কোন ইন্দ্রিয়ের সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই, যার ফলে চারিদিকে ঘুষ আর দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। যোগী অনেক দিন কঠোর ভাবে যোগ সাধনা করে করে তাঁর মধ্যে যে যোগ সিদ্ধি আসে সেগুলোকে তিনি ব্যবহার তো দূরের কথা ওদিকে তাকাতেও যাবেন না। কিন্তু সাধনা না করে আচমকা যদি কিছু ক্ষমতা এসে যায়? বাচ্চা ছেলে খেলনা বন্দুক পেয়ে গেলে যেমন নেচে বেড়ায় সেই রকম নেচে বেড়াবে।

পতঞ্জলি এবার একটা অদ্ভুত সিদ্ধির কথা বলছেন – **বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।।৩৯।।** এই যে পুরুষ, পুরুষ মানে আত্মা, চিত্তের সঙ্গে যে একজোট হয়ে বন্ধনে পড়েছিল, এই বন্ধনটা এখন শিথিল হয়ে গেছে। বন্ধনটা শিথিল হওয়াতে পুরুষ এখন চিত্তের সঙ্গে একজোট হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। একটা পাখি এত দিন একটা খাঁচাতে আবদ্ধ ছিল, তাকে এখন ছেড়ে দেওয়াতে পাখিটা এখন মুক্ত হয়ে যেখানে খুশি উড়ে বেড়াবে। এমনিতে স্থূল শরীরের সঙ্গে যে বন্ধন সেই বন্ধন মৃত্যুর সময় আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু জীবিত অবস্থায় পুরুষের শরীরের সঙ্গে বন্ধন রয়েছে ঠিকই কিন্তু সে চিত্তের সঙ্গে তার বন্ধনটা খুলে দিয়ে চিত্ত থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এই যে চিত্ত থেকে পুরুষ আলাদা হয়ে গেল, এবার এবার এই আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষ ইচ্ছে করলে *পরশরীরাবেশঃ*, অপরের শরীরে প্রবেশ করে যেতে পারে। সাধারণতঃ জীবিত শরীরে ঢুকবে না, কিন্তু কোন মৃত শরীরে ঢুকে যেতে পারে। কাহিনী রূপে আমরা শঙ্করাচার্যের জীবনেই এই ক্ষমতার প্রয়োগ দেখতে পাই। মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য শঙ্করাচার্য রাজার মৃত শরীরের প্রবেশ করে এই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে আবার নিজ শরীরে প্রবেশ করে উত্তর দিতে চলে গেলেন। এগুলোকে যদিও কাহিনী রূপে দেখা হয়, কিন্তু তন্ত্রাদির কাহিনীতে এই ধরনের ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। মড়া শরীরে ঢুকে গিয়ে অনেক কিছু করেছে ইত্যাদি নানা রকমের কাহিনী পাওয়া যায়।

এখানে বলছেন পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা হয়ে যাওয়ার পর পুরুষ এখন যে শরীরে আছে সেই শরীরে যত নাড়ি আছে তার জ্ঞান পুরুষের হয়ে গেছে, এখন সে যে কোন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যেতে পারবে। শুধু যে মানুষের শরীরেই ঢুকে যাবেন তা নয়, তিনি চাইলে পাখি বা যে কোন পশুর শরীরেরও প্রবেশ করে যেতে পারবেন। পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা এই বোধটা তাঁর হয়ে যাওয়ার ফলে শক্তি অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু এখনও সিদ্ধি লাভ হয়নি। কারণ যতক্ষণ সিদ্ধাইয়ের কথা আসবে ততক্ষণ তিনি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির এলাকাতেই পড়ে আছেন। তাই অনেক সময় নির্বিঘ্নে আর নির্বাধুট ভাবে সাধনা করার জন্য হয়তো কোন সিংহের শরীরে ঢুকে গিয়ে একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় করে চরম সিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা চালিয়ে যেতে থাকবেন। সিংহের ভয়ে তাঁর কাছে আর কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, শান্তিতে নিজের ধ্যানে ডুবে থাকবেন। হয়তো বা কোন পাথরের মধ্যে ঢুকে গেলেন, এরপর রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, খাওয়া-দাওয়া এগুলো নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না। ধ্যান করার জন্য যোগী অনেক সময় এই ধরনের অনেক কিছুর আশ্রয় নিয়ে নেন। চিত্ত কিন্তু তাঁর থাকছে, কারণ চিত্ত না থাকলে তপস্যাই করতে পারবেন না। ভাগবতে যমলার্জুনের কাহিনীতে নল ও কুবর দুজন যুবক যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে দুটো অর্জুন বৃক্ষকে আশ্রয় করে তপস্যা করে গেছেন। সেইজন্য হিন্দুরা চট করে কোন গাছ কাটতে, অকারণে কোন পশুর হানি করতে চায় না। কারণ আমরা জানিনা কোন গাছে বা কোন পশুর শরীরে কোন যোগী আশ্রয় করে তপস্যা করছেন। খুব দরকার না থাকলে অযথা কোন গাছ কাটা, অহেতুক পশুকে আঘাত করা বা বধ করা হিন্দু ধর্মে নিষেধ। এখন দেশে রেল চালাতে হবে, রেলে চালাতে রেললাইনে স্লীপার চাই, স্লীপারের জন্য গাছ কাটতে হবে। স্লীপারকে পাথরের উপর বসাতে হবে, অত পাথরের জন্য পাহাড় ধ্বংস করতে হবে। আধুনিক যুগের উন্নতির সাথে সাথে এগুলো করতে হবে, তাই হিন্দুদের এই ধারণাকে এখন আর ঠিক ঠিক পালন করা যায় না। সে যাই হোক, যোগশাস্ত্রে বলছে, পুরুষ যদি চিত্ত থেকে নিজেকে বন্ধন মুক্ত করতে পারে তাহলে অপর যে কোন শরীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা তার চলে আসে। ঠাকুর নরেনকে বলছেন – আমার শক্তি তোমার শরীর দিয়ে কাজ করবে। তাঁর শক্তিটা কাজ করবে মানে, ঠাকুরের শক্তিটা নরেনের শরীরে প্রবেশ করবে। শুদ্ধ চৈতন্য কোন কর্ম করতে পারে না, শুদ্ধ চৈতন্যকে যদি কোন কাজ করতে হয় তাকে কিছুর মাধ্যমে কাজ করতে হয়। শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ মনকে কাজ করতে হলে একটা মাধ্যম দরকার, তাই সে যে কোন একটা শরীরকে আশ্রয় করে নিয়ে কাজ করে।

তারপরে বলছেন **উদানজয়াঙ্কল-পঙ্ক-কষ্টকাদিদ্বিসঙ্গ উৎক্রান্তিষ্টি।।১০।।** এবার আমাদের পাঁচটি প্রাণকে নিয়ে বলছেন। প্রথমে বলছেন, উদান বায়ুকে যদি সংযমের দ্বারা জয় করে নেওয়া যায় তাহলে সে এমন হালকা হয়ে যাবে যে অতি সহজে জলের উপর দিয়ে বা কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। এক একটা জিনিষকে জয় করে নিলে এক একটা জিনিষের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসবে। আমাদের শরীরের পাঁচ রকম বায়ু কাজ করে – প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। এখানে প্রাণের দুটো বায়ু উদান আর সমান বায়ুকে নিয়ে বলছেন। বলা হয় এই উদান বায়ু মানুষের গলার মধ্যে থাকে। মানুষের প্রাণ যখন বেরিয়ে যায় তখন এই উদান বায়ুকে আশ্রয় করেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এরপর বলছেন – **সমানজয়াৎ প্রজ্জলনম্।।১১।।** আমরা যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করছি, পান করছি এগুলোকে শরীর শুষে নেয়। পাঁচ রকম প্রাণের মধ্যে সমানের কাজ হল আমাদের ভুক্ত খাদ্য ও পানীয়কে শুষে নেওয়া। বায়োলজির নিয়মে আমরা জানি, আমাদের ভুক্ত খাদ্যগুলিকে শরীরের পাকস্থলি শুষে নেয়। আমাদের ঋষিরা যখন এত কিছুই জানতেন তখন তাঁরা কি এটা জানতেন না যে আমাদের পাকস্থলিতে সব ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হজম হয়! তার সাথে তাঁরা এটাও জানতেন সবার হজমের ক্ষমতা সমান নয়। একজনের হজম শক্তি অন্য জনের হজম শক্তির মধ্যে তারতম্য হবেই। তাঁরা এও দেখলেন প্রাণ বায়ুতে যাদের ক্রটি থাকে তাদের হজমের শক্তি কম হবে। প্রাণ দিয়েই আমাদের শরীরের সব কাজ চলে। বিজ্ঞানে আজ কত রকম কথা বলা হয়ে থাকে, এ্যসিড হচ্ছে, পেটে গ্যাস হচ্ছে আর তার জন্য হজম প্রক্রিয়া বিঘ্ন হচ্ছে। কিন্তু ঋষিরা একটা কথাই বলে দিলেন সমান নামে যে প্রাণবায়ু আছে, এই প্রাণবায়ু আমরা যা খাওয়া-দাওয়া করছি সব কিছুকে শুষে শরীরের কাজে লাগিয়ে দেয়। সমান বায়ু যদি গোলমাল থাকে তাহলে হজমেও গোলমাল হবে, অবশ্য যে কোন বায়ু গোলমাল হলে শরীর ঠিক থাকবে না। আপনি বলতে পারেন একটু এ্যনজাইম্ খেয়ে নিলেই তো সব হজম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এ্যনজাইম খেলে সমান বায়ুকে ঠিক করে দেবে বলে হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকবে। যেমন প্রাণ বায়ু, আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে প্রাণ শক্তি নিচ্ছি সেটা বাতাসের মাধ্যমেই নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের ফুসফুস যদি দুর্বল থাকে তাহলে প্রাণশক্তি কাজ করবে না, ফুসফুসের দুর্বলতা ঠিক করার জন্য ওষুধ খেতে হবে। যোগ এসব কিছু বলবে না, তাঁরা বলবেন এগুলো আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের কাজ, আমরা শুধু বলছি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা বাতাস থেকে যে প্রাণ শক্তি ভেতরে যাচ্ছে এই কাজটার দেখাশোনা করে প্রাণ আর হজমের ব্যাপারে দেখাশোনার দায়িত্ব সমান বায়ুর। এই সূত্রে বলছেন যদি সমান বায়ুকে সংযমের দ্বারা জয় করে নেওয়া যায় তখন যোগীর শরীর থেকে জ্যোতি বেরোতে থাকে। একটা সময় ছিল যখন ঠাকুরের শরীরের থেকে আলো বেরোত, এত আলো বেরোত যে ঠাকুরকে আপাদমস্তক চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতে হতো। এগুলো যা যা বলা হচ্ছে, যদি কেউ পবিত্রতা লাভ করে, তাহলে তার এই সমস্ত সিদ্ধি আপনা থেকেই এসে যাবে।

এই রকম বলছেন – **শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদিব্যং শ্রোত্রম্।।১২।।** আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আর আকাশ একই তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত। আকাশের উপাদান হল শব্দ, আর আকাশ তন্মাত্রা দিয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় তৈরী হয়েছে। সেইজন্য আমাদের কান সব রকম শব্দকে গ্রহণ করতে পারে। কর্ণ ও আকাশের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধের উপর সংযম করলে দিব্য ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে এবং অনেক দূরের কথাবার্তা যদি শোনার ইচ্ছে হয় তাও সে শুনে নিতে পারবে।

পরের সূত্রে বলছেন, **কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপ্তেচ্চাকাশগমনম্।।১৩।।** আকাশ আর আমাদের শরীরের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, আকাশই এই শরীরের উপাদান আর সব কিছু আকাশের মধ্যেই অবস্থিত। আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম পদার্থ, সেই সূক্ষ্ম পদার্থই স্থূল হতে হতে এই শরীরের আকার নিয়েছে। আকাশই শরীরের উপাদান, আকাশ আর শরীরের সংযোগের উপর যদি যোগী সংযম করেন তাহলে তাঁর শরীর তুলোর মত হালকা হয়ে যাবে। তখন যোগী ইচ্ছে করলে আকাশমার্গ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন।

এরপরে যে সূত্রটা বলছেন এটি খুবই অনুধাবনীয় সূত্র – **বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা**
ততঃ প্রকাশবরণক্ষয়ঃ।।৪৪।। আমাদের দেহের বাইরে যথার্থ বৃত্তিগুলোর উপর যখন সংযম করা হয় তখন জ্ঞানের উপর যত আবরণ আছে সব আবরণ খুলে যায়। আমাদের সবারই ‘আমি’ বোধ আছে, আমাদের মন সব সময় আমার সাথে, আমার অহঙ্কার, বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে সব সময় ‘আমি’ ‘আমি’ বোধ হচ্ছে। এই ‘আমি বোধ’ মানেই বৃত্তি জ্ঞান, এবং এই বৃত্তি জ্ঞান আমাদের এই শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ। এর আগে আমরা দেখেছি প্রথমে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ আসে। মহৎ মানে সমষ্টি মন। তাহলে আমরা হলাম ঐ মহতেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি, সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রের উপর ছয় ইঞ্চি পুরু বরফের চাদর জমে গেছে। সেই বরফের চাদরের উপর আবার ছোট ছোট গর্ত আছে, সেই গর্তের সব কটির মধ্যে আবার জল জমে আছে। আর প্রত্যেকটি জলকে আলাদা ভাবে দেখা যাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকে হলাম এক একটি গর্ত। আমি আমার গর্তের জলটুকুই দেখতে পাচ্ছি। আপনি আপনার গর্তের জলটুকুই দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি যদি আপনার মনকে জানতে চাই তাহলে আমাকে আমার গর্ত দিয়ে সমুদ্রে ডুব দিয়ে আপনার গর্ত দিয়ে উঠে গেলেই আপনার মনকে জেনে যাওয়া যাবে। এর থেকে আরও ভালো ভাবে জানা যাবে, আমি আপনার গর্তের মধ্যে না ঢুকে যদি সমুদ্রের মধ্যেই থেকে যাই, তাহলে যত গুলো গর্ত আছে তাদের সবারই মন জানা হয়ে যাবে।

আমার মোবাইল ফোন একটা বিশেষ নম্বরে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে এসে ভাইব্রেশান গুলোকে ধরছে। কিন্তু মোবাইল ফোনের যে টাওয়ার সে সব কটি ফ্রিকোয়েন্সিকেই ধরছে। ফোনের টাওয়ারের থেকে আবার রেডিও টাওয়ারের ক্ষমতা অনেক বেশী, যেখান থেকে সব ফ্রিকোয়েন্সি ছাড়ছে, সব ফ্রিকোয়েন্সিই সেই রেডিও টাওয়ারের কন্ট্রোলে আছে। সমুদ্রে বরফের যে ছোট বড় অনেক গর্ত হয়ে আছে, সেখানে আইনস্টাইন হলেন একটা বড় গর্ত, আমি আপনি হলাম ছোট গর্ত। আইনস্টাইন তাঁর বড় ফুটো দিয়ে সমুদ্রকে দেখছেন বলে সমুদ্রের অনেক কিছু দেখতে সক্ষম হচ্ছেন। আমরা ছোট ফুটো দিয়ে অল্প দেখছি তাই আইনস্টাইন থেকে আমরা সমুদ্রকে কম জানি। কিন্তু আমি যদি সব কটি ফুটো দিয়ে যে জ্ঞান আসছে সেটাকে জানতে চাই তাহলে আমার ফুটোর দিকে না তাকিয়ে সমুদ্রের ভেতরে চলে গেলেই আমি সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যাব। এরপর যে যেখানে যা দেখছে সবটাই আমার জানা হয়ে যাবে, তখনই আমি সর্বজ্ঞ হয়ে গেলাম। এই সূত্রে ঠিক এই কথাই বলা হচ্ছে, এখন আমার যে জ্ঞান, তা আমার ওই একটা ছোট ফুটো দিয়ে পাচ্ছি, আমার বুদ্ধির সাথে মন যতটুকু জড়িয়ে আছে শুধু ততটুকুই দেখছি।

মনে করুন আমার ক্ষুধা বৃত্তি এসেছে, আমি নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে করছি। এই ক্ষুধা বৃত্তি যখন উঠছে তখন আমি ক্ষুধা জিনিষটা কি বুঝতে পারছি। এবার এই ক্ষুধা বৃত্তিকে নিজের মন বা বুদ্ধিতে কেন্দ্রিত না করে, আমার শরীর, মন ও বুদ্ধির বাইরে চলে এসেছি। এখানে বুদ্ধি মানে মস্তিষ্কের বুদ্ধিকেই বলা হচ্ছে। শরীর, মন ও বুদ্ধির বাইরে চলে এসে এবার শুধু ক্ষুধা জিনিষটাকে নিয়ে ভাবছি। এটা আমার আপনার দ্বারা সাধারণ অবস্থায় কখনই হবে না। যোগীদের মধ্যে যাঁরা একটু উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, একমাত্র তাঁরাই এই পদ্ধতিতে শরীর ও বুদ্ধির বাইরে গিয়ে ক্ষুধা বৃত্তির উপর সংযম করতে পারবেন। স্বামীজী সূত্রের অনুবাদ করে বলছেন *দেহের বাহিরে মনের যে ‘যথার্থ বৃত্তি’ অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার নাম ‘মহাবিদেহ’*। মহাবিদেহ বলছেন কারণ যোগী আর নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ নেই। আর যথার্থ বৃত্তি কেন বলছেন? কারণ এখানে একটা ক্ষুদ্র শরীরের ক্ষুধাকে নিয়ে বলছেন না, মহৎ মানে সমষ্টি মনে ক্ষুধা বলতে যা বোঝায় সেই ক্ষুধার কথা বলছেন, এটাকে তাই বলছেন ‘যথার্থ বৃত্তি’। আপনি বুঝছেন যে আপনার এখন খিদে পেয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে খিদে পাওয়া যা, আমার কাছে তা নাও হতে পারে। কারণ খিদে পাওয়ার যে মাত্রা, খিদের পাওয়ার যে তীব্রতা, খিদের যে অর্থ এগুলো সব আলাদা আলাদা। যেমন বাঙালীদের কাছে শরৎ মানে দুর্গাপূজা, কাশ ফুল, হিমেল হাওয়া, বিহারীদের কাছে শরৎ মানে অন্য রকম আবার আমেরিকা ইংল্যান্ডের লোকদের কাছে শরতের

অন্য অর্থ। এবার শরৎ বলতে ঠিক সেটাই বোঝাবে যেটা সমষ্টি মনে আছে। ওখান থেকে আমার মনে এসে শরতের ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা জগৎ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। শরৎ ঋতুর কথা ভাবলেই বাঙালীদের মনে ঢাকের বাজনা, নতুন জামা-কাপড় কেনা-কাটা, দুর্গাপূজার কথা এসে যাবে। অন্যদের কাছে শরৎ মানে অন্য কিছু। কিন্তু শরৎ আসলে একটা ঋতু মাত্র, ঋতু ছাড়া অন্য কিছু নয়। যোগী যখন নিজের শরীর ও মনের বাইরে গিয়ে চিন্তা করেন, তখন যে কোন জিনিষের উপর বুদ্ধিটাকে লাগাবেন সেই জিনিষটা যোগীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আর বলছেন ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ, যে কোন বস্তুর জ্ঞানের আলোর উপর একটা আবরণ পড়ে আছে। শরৎ বলতে কি বোঝায়, এই জ্ঞান আবরণ দিয়ে ঢাকা আছে। পদার্থ আর শক্তির মধ্যে যে সম্পর্কের জ্ঞান সেটা আবরণ দিয়ে ঢাকা। আইনস্টাইন শুধু চিন্তা করে করে ওই আবরণটা সরিয়ে দিলেন। আবরণটা সরে যেতেই আইনস্টাইন দেখতে পেলেন পদার্থ যা শক্তিও তাই। যোগীদের মন এত শক্তিশালী হয়ে গেছে যে, তিনি যে কোন জিনিষের উপর যখন সেই মহা শক্তিশালী মনকে লাগিয়ে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে আবরণটা সরে গিয়ে বস্তুর জ্ঞানটা প্রকাশ হয়ে যাবে। কারণ যোগীর মন এখন সমষ্টি মনের সাথে এক হয়ে গেছে। আপনার ক্ষুধা হলে আপনার নিজস্ব একটা ক্ষুধা বোধ হবে, কিন্তু অন্য লোকের যে ক্ষুধা বোধ হচ্ছে সেই ক্ষুধা বোধের জ্ঞানটা আপনার হবে না। এখন নিজেকে যদি এই ‘আমি’ বোধ থেকে সরিয়ে নিতে পারা যায় তাহলে সে দেখতে পাবে যে এই সমগ্র জগৎ জ্ঞান ও চৈতন্যে পরিপূর্ণ। সবার মধ্যে যে সেই একই চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান। এটাই মহাবিদেহ, নিজের ব্যষ্টি শরীর আর মনের মধ্যে যোগী আবদ্ধ নেই।

এবারে আরেকটি সিদ্ধির কথা আসছে, বলছেন – **স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মস্বরূপ-সংযমাদ্ভুতজয়ঃ**
।।৪৫।। এই জগতে প্রত্যেক বস্তুরই স্থূল, সূক্ষ্ম, তন্মাত্রার অবস্থা আছে। যেমন জল, জলের একটা সূক্ষ্ম রূপ আছে তেমনি এর একটা স্থূল রূপও আছে। স্থূল রূপ হল যেটা আমরা জল রূপে দেখছি। আর সূক্ষ্ম রূপ হল H²O। এই H²O ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যায়, বেশী গরম হলে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। জলের তন্মাত্রা গুলোও সব আলাদা আলাদা। যে কোন বস্তুকে নিয়ে যখন বিচার করে দেখছি বস্তু আর তার অর্থ আলাদা, এবার এর উপর সংযম করতে করতে যোগী বস্তু জ্ঞান থেকে বস্তুর অর্থ জ্ঞানে চলে যান। স্বামীজী বলছেন বৌদ্ধদের একটা সম্প্রদায় এই সংযমটা বিশেষ ভাবে অনুশীলন করেন। এই সূত্রে বলছেন যদি দেখে নেয় যে বিশ্বরক্ষাণ্ডে যত বস্তু আছে সব তন্মাত্রা, আর সেই তন্মাত্রাতেই যদি সে সত্যিই সংযম করতে সক্ষম হয়, তখন তার মধ্যে একটা অন্য ধরণের শক্তি চলে আসবে। কি সেই শক্তি? এই জগতে যত ভূত আছে সমস্ত ভূতকেই জয় করে নেওয়ার ক্ষমতা। তখন সমস্ত ভূতের সম্রাটের শিরোপা পেয়ে যাবে। ইচ্ছে করলেই সে সামান্য জলকে সুস্বাদু ঠাণ্ডা পানীয় বানিয়ে দিতে পারবে। বাড়িতে মা রুটি বানাচ্ছে, বাচ্চা বলছে – আমি রোজ রোজ গোল গোল রুটি খাবো না, আমার তিন কোণা রুটি চাই। মা বলবে – নে খ্যাপা, এই নে তোর তিন কোণা রুটি। মা বানিয়ে দিলো তিন কোণা সাইজের পরোটা। ছেলে আবার একদিন বলছে – আমি তিন কোণা রুটি খাবো না, আমার চার কোণা রুটি চাই। মা এবার চার কোণা রুটি বানিয়ে বলছেন – নে খ্যাপা, এই তোর চার কোণা রুটি। কি করে বানাচ্ছে মা? আর কেনই বা বানাতে পারবে না। মার কাছে আটা আছে, বেলনা আছে, জল আছে আর উনি এসবের ওস্তাদের শিরোমণি, যেমন আকার চাইবে তেমন আকার বানিয়ে দেবে। বাচ্চার কাছে এটা ম্যাজিক, এটাই আবার মার কাছে জলভাত। যোগীও সব বস্তুর উপর সংযম করে করে বস্তুর জ্ঞান পেয়ে গেছেন, তাঁর কাছেও এগুলো কিছুই নয়। আর সমস্ত বস্তু যে যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী সেই তন্মাত্রাকেও তিনি জয় করে নিয়েছেন।

এগুলো করলে কি হয়? তখন যোগের খুব নামকরা অষ্টসিদ্ধির কথা বলছেন – **ততোহণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎতদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ।।৪৬।।** এগুলো থেকেই যোগী অষ্টসিদ্ধি আর কায়সম্পৎ পান। অষ্টসিদ্ধির প্রথম হল অণিমা, যোগী নিজেকে অনুর মত ক্ষুদ্র করে নিতে পারেন। দ্বিতীয় মহিমা, বিরাট হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন তখন দুর্য়োধন

ভাবলো শ্রীকৃষ্ণই যদি পাণ্ডবদের সব ক্ষমতার উৎস তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করে নিলেই পাণ্ডবদের খেলা শেষ। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের কুমতলব আগে থেকেই জানতেন। তিনি নিজের শরীরটাকে বিশাল করে দিয়ে সবাইকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন। যোগীরা এগুলো করতে পারেন। তৃতীয় লঘিমা, নিজেকে খুব হালকা করে নেন। ৪৩ নম্বর সূত্রে যেমন বলা হয়েছিল যোগী নিজেকে তুলোর মত হালকা করে নিতে পারেন বলে আকাশমার্গ দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। চতুর্থ গরিমা, খুব ভারী হয়ে যাওয়া, যোগী চাইলে পুরো পৃথিবীর ওজন নিজের মধ্যে ধারণ করে নিতে পারবেন। প্রহ্লাদকে যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া হল তখন প্রহ্লাদের শরীরের চাপে পাথর গুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রহ্লাদের মধ্যে তখন গরিমার শক্তিটা এসে গিয়েছিল। পঞ্চম সিদ্ধি হল প্রাপ্তি, যোগী যতটা যেতে চান ইচ্ছে করলে এমনতেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। যদি যোগী চান চাঁদকে স্পর্শ করবেন, তিনি আঙুলটা এগিয়ে দিলে দেখবেন চন্দ্রমাকে স্পর্শ করে দিচ্ছেন। ষষ্ঠ প্রাকাম্য, মনে যত ধরণের কামনার উদয় হবে, ইচ্ছামাত্রেই সব কামনা পূরণ হয়ে যাবে। সপ্তম ঈশিত্ব, যে কোন জিনিষের উপর তাঁর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা চলে আসবে। যাকে যা আদেশ করবেন সে সেটা পালন করতে বাধ্য হবে। শেষে অষ্টম সিদ্ধি হল বশীত্ব, যোগী যাকে ইচ্ছে করবেন তাকেই তিনি তাঁর হাতের মুঠোয় করে নিতে পারবেন। এরপর বলছেন কায়সম্পৎ কি।

তন্মাত্রাকে জয় করে নিলে আরো কি হয় সে ব্যাপারে বলছেন – **রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥৪৭॥** এই তন্মাত্রাকে জয় করে যোগী এখন নিজের শরীরের ওপরেও এর প্রয়োগ করতে পারেন। শরীরের তন্মাত্রার উপরে সংযম করলে শরীরের রূপ-লাবণ্য, বল, শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর যদি শরীরের উপর বজ্রপাৎও হয় তাতেও যোগীর কিছু হবে না। এই ক্ষমতাকে বলছেন কায়সম্পৎ। ৪৫ নম্বর যোগসূত্রে যেটা বলা হল সেটা দিয়ে যোগীরা ইচ্ছে করলে নিজেদের খুব সুন্দর দেহ বানিয়ে নিতে পারেন, শুধু সুন্দর শরীরই নয়, দেহকে এমন বলশালী করে নিতে পারেন যাতে বজ্র চালিয়ে দিলেও সেই দেহের কিছু হবে না। এধরণের যোগীরা এখনও আছেন, তবে তাঁরা সাধারণ লোকদের সাথে বেশী সম্পর্ক রাখেন না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই তাঁরা ভালোবাসেন।

এতক্ষণ আমরা জড় বস্তু, শরীরের উপর সংযম করলে কি কি হয় দেখলাম। এবার আসছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের উপরে সংযম করলে কি কি হতে পারে তাই নিয়ে বলছেন। এর পরের সূত্রে বলছেন – **গ্রহণস্বরূপাস্মিতা স্বয়ীর্থবত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥৪৮॥** যখন কোন বাহ্য বস্তুর অনুভূতির উপর সংযম করছে, যেমন একটা চক আছে, এটা একটা বাহ্য বস্তু, আমার চক্ষু ইন্দ্রিয় চককে অবলোকন করে মনকে একটা চকের ভাব দিচ্ছে, মনের সঙ্গে আমাদের অহঙ্কার লেগে আছে। এই দেখার পদ্ধতিটা কীভাবে হচ্ছে? বস্তু, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে জ্ঞান, এই সব কিছুর উপর যখন সংযম করা হবে তখন যোগীর ইন্দ্রিয় জয় হয়ে যায়। যত ইন্দ্রিয় আছে সব ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে যায়। ইন্দ্রিয়কে যেমনটি বলবেন ইন্দ্রিয় সেই রকমটি করবে। এখন এই চকের অনুভূতির উপর একাগ্র করতে করতে আস্তে আস্তে গভীর থেকে গভীরে যেতে থাকল, প্রথমে আসবে মন, মনের পরে আছে অহঙ্কার। এই যে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারই অস্মিতার উৎস, প্রকৃতির সাথে এর কোন লেনাদেনা নেই। এইবারে যখন এই অস্মিতার উপরে সংযম করবে তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করে নেবে। স্বামীজী এখানে উপমা দিচ্ছেন – *যে কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ – যথা একখানি পুস্তক – তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। তারপর পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে। এই বইকে কে দেখছে? বইয়ের জ্ঞান কে পাচ্ছে? আমি দেখছি, আমি জ্ঞান পাচ্ছি। বলছেন এই আমিটার উপরে সংযম কর। এই ভাবে যদি এই আমিটার উপরে সংযম করতে করতে এগোতে থাকে, তখন যোগী অনেক সূক্ষ্ম স্তরে চলে গেলেন, একটা জায়গায় এসে দেখবেন যে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়ে গিয়েছে।*

ইন্দ্রিয়কে জয় করার ফলে তার কি হবে? বলছেন – **ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥** ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিলে সমস্ত স্থূল শরীর, মন যে গতিতে চলে সেই গতি পেয়ে

যায়। ইন্দ্রিয় শরীরের তুলনায় অত্যন্ত হালকা ও সূক্ষ্ম। মন আর ইন্দ্রিয়ের একটা জায়গায় শুধু তফাৎ। ইন্দ্রিয়ের পরে সব কিছুর ওজন অনেক বেশী বেড়ে যায়, তার ফলে মন এখন থেকে এক্ষুণি আমার বাড়ি চলে যাবে কিন্তু শরীরের ওজন বেশী হওয়ার জন্য শরীর যেতে পারবে না। কিন্তু এখন যোগী তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছেন, সেইজন্য যেই ইন্দ্রিয়কে তিনি আদেশ করবেন ইন্দ্রিয় গোটা জ্বল শরীরকে নিয়ে চলে যাবে। এখানে অবশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় যে ইন্দ্রিয় এই শরীরকে বহন করে নিয়ে যায় না ওখানে গিয়ে আরেকটা শরীর তৈরী করে নেয়। নিউ ডিসকভারিতে বিবৃত স্বামীজীর একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজী একদিন ঘরের মধ্যে ধ্যান করছিলেন। স্বামীজীর এক অনুরাগীর ইচ্ছে হল স্বামীজীকে পরীক্ষা করবেন ‘দেখিতো স্বামীজী কত বড় যোগী’! এই ভেবে সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে। সেদিন আবার স্বামীজীর ক্লাশ ছিল। এদিকে ক্লাশের সময় হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তিটি তারপর তার নিজের বাড়ি থেকে সোজা ক্লাশে গিয়ে দেখছে স্বামীজী ওখানে যথারীতি ক্লাশ নিচ্ছেন। সে তো ঘাবড়ে গিয়ে ভাবছে স্বামীজী দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন কি করে! তক্ষুণি স্বামীজীর লেকচার না শুনে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীজীর ঘরের কাছে এসে দেখছে দরজা যথারীতি বাইরে থেকে বন্ধ। আন্তে করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখে স্বামীজী ওখানে বসে ধ্যান করছেন। আবার ওখান থেকে দৌড়ে এসে দেখছে স্বামীজী এখানে ক্লাশ নিচ্ছেন। দেখছে দুটো জায়গাতেই স্বামীজী একই সাথে অবস্থান করে আছেন – এক জায়গায় ধ্যান করছেন, আরেক জায়গায় তিনি লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুরের জীবনেও আছে – ঠাকুর বাংলাদেশে যেখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন, সেখানে চলে গেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলছেন – আমি গা টিপে টিপে দেখছি। এগুলো যোগীদের পক্ষেই সম্ভব, তাঁরা ইচ্ছে করলে একই সাথে এক বা একাধিক জায়গায় অবস্থান করতে পারেন।

পরের সূত্রে বলছেন – *সত্ত্বপুরুষান্যাতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।।*

৫০।। বলছেন পুরুষ আর সত্ত্ব অর্থাৎ আমাদের মন এই দুটো পৃথক, এই পৃথকত্বের উপরে যদি ক্রমাগত সংযম করা যায় তাহলে যোগী সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্বতা লাভ করবেন আর সব কিছুর ক্ষমতা চলে আসবে। যোগীর কাছে এমন কোন জিনিষ থাকবে না যেটার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকবে না, আর কোন এমন জিনিষ থাকবে না যেটার উপর তাঁর প্রভুত্ব থাকবে না।

এরপরেই আসল কথাটা বলছেন – *তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।।৫১।।* যত সিদ্ধি বা ক্ষমতার কথা বলা হল, সব সিদ্ধি থেকে, এমন কি সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা – এই শক্তি দুটোর উপরেও যখন বৈরাগ্য চলে আসবে তখনই যোগী কৈবল্যের দিকে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। কৈবল্য মানে কেবলম, একমাত্র বা বেদান্তের ভাষায় মুক্তি। তাহলে ভেবে দেখুন আমরা কত সহজে বলে দিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ঈশ্বর দর্শন মানেই মুক্তি। কিন্তু এই ঈশ্বর দর্শন হওয়ার আগে কি কি হবে? বিশ্বরক্ষাণ্ডে যত বস্তু আছে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়ে যেতে হবে আর সব কিছুর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে যাবে। এই ক্ষমতা এসে যাওয়ার পর, এই ক্ষমতাকেও যখন ত্যাগ করে দিচ্ছেন তারপরেই তাঁর মুক্তি কথা আসবে, তখনই ঈশ্বর দর্শনের কথা হবে আর ঈশ্বর দর্শন হওয়ার পরেই তিনি বলতে পারবেন সব তাঁরই ইচ্ছা। ঈশ্বর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত সব তাঁর ইচ্ছা বলা শুধু মুখের কথা মাত্র।

পুরুষ আর প্রকৃতির প্রভেদটা যখন বুঝে নিল তখন যদি এই প্রভেদের উপর মনকে সংযম করা হয় তখনই এই সংযোগটা কেটে পুরুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যোগীর মন এখন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রিলিং মেশিনের মত। যত বড় মোটা ভারী পাথরই হোক না কেন ড্রিলিং মেশিন তাকেও নিমেষে ছিদ্র করে দেবে। আসল বক্তব্য হল পুরুষ হলেন স্বয়ংজ্যোতি, শুদ্ধতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। মনও এখন পবিত্র হয়ে গেছে, ফলে এখন সে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য তৈরী হয়ে গেল। মন প্রকৃতিরই একটা অংশ, মনেরও তখন নাশ হয়ে যায়, একমাত্র পুরুষই থাকেন। যোগী যখন কৈবল্যের দিকে এগোতে থাকেন তখন তিনি যেন নিজের সব কিছুকে বিস্তার করতে থাকেন, নিজেকেও মনে করেন

তিনি যেন এখন অনেক বিশাল হয় যাচ্ছেন, আর অন্য দিকে প্রকৃতি তাঁর তুলনায় ছোট হতে শুরু করে। শেষে যোগী এত বিশাল হয়ে যান যে তখন প্রকৃতিকে একটা বিন্দুর মত মনে হয়। যখন এই সিদ্ধিগুলি আসতে থাকে তখনই যোগী বুঝতে পারেন আমার কত শক্তি ও ক্ষমতা এসে গেছে, ইচ্ছামাত্র আমি সব কিছু করতে পারছি, মানে আমার আকার ও ক্ষমতার বিস্তার হচ্ছে। হতে হতে প্রকৃতিকে এক সময় অতি নগণ্য মনে হবে। স্বামীজী বলছেন যখন যোগী এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে বড় নয়। তার মানে সর্বশক্তিমত্তা আর সর্বজ্ঞতাও স্বপ্নতুল্য, যোগের মূল লক্ষ্যে এগুলোরও কোন দাম নেই। অথচ একটু জ্ঞান পেয়ে গেলে আমরা কত লাফালাফি শুরু করি।

আবার সর্বজ্ঞত্ব আর সর্বশক্তিমত্তা না হওয়া পর্যন্ত সব বেকার। তাইতো ঠাকুর বলছেন, সবাই এত জপ করে কিন্তু কারুরই কিছু হয় না কেন! হবে কি করে! মন তো এগোচ্ছে না। স্বামীজী তাঁর ভাববার কথায় বলছেন, মন্দিরে গিয়ে একজন বিকট সুরে গান শুরু করেছে, তার না আছে সুর না আছে তাল। তখন মন্দিরের চৌবেজী একটু ভাঙ খেয়ে সবে মৌত এসেছে আর ওই চিৎকার শুনে রেগে গিয়ে লোকটিকে বলছে ‘তুমি একি শুরু করেছ’! সে বলছে ‘ভগবানের মন ভজাচ্ছি’। লোকটির কথা শুনে চৌবেজী রেগেমেগে বলছে ‘তুই আমারই মন ভজাতে পারছিস না, ঈশ্বরের মন কি করে ভজাবি! ঈশ্বর কি এতই আহম্মক’! বাড়িতে স্ত্রী স্বামীকে ভালো রাখতে পারে না, স্বামী স্ত্রীকে ভালো রাখতে পারে না, পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই, বাড়ি, প্রতিবেশীর সবাইকে অতিষ্ঠ করে তোলে, সংসারে সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে রেখেছে, লোকেরা তিত্তিবিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, এরা আবার ভগবানের মন ভেজাবে! অথচ ঠাকুরকে দেখুন, সেই ছোটবেলা থেকে পুরো কামারপুকুর ঠাকুরের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। যার আছে হেথা তার আছে সেথা। এই জগতে আপনার কোন বুদ্ধি নেই, একটা জিনিষ বোঝাতে গেলে দশ বার বললেও বুঝতে পারেন না, এক মিনিট শান্ত হয়ে কোথাও বসতে পারেন না। বিরাট কাজ অনেকেই করতে পারে কিন্তু শান্ত হয়ে বসতে পারছে কি? তার উত্তরে আবার বলবেন শান্ত হয়ে একটা পাথরও তো বসে থাকে। ঠিকই, আপনার দুটোরই ক্ষমতা আছে কিনা!

এরপরে বলছেন **স্থান্যপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।।৫২।।** এখানে স্থান্য মানে দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে। কিছু কিছু পাঠান্তরে ‘স্থান্য’র জায়গায় ‘স্বামী’ শব্দটি নেওয়া হয়েছে, স্বামী মানেও দেবতা। এই শক্তি ও ক্ষমতা যখন যোগীর মধ্যে আসতে থাকে তখন দেবতারাও বিদ্ব উৎপাদন করার জন্য এসে বলে ‘এসো এসো! আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা তোমাকে অনেক আনন্দ দেব’। আসলে যোগীর মধ্যে এমন এমন ক্ষমতা এসে যায়, যে ক্ষমতাকে দেবতারাও ঈর্ষা করে ও ভয় পায়। ভয় পেয়ে দেবতারা যোগীকে প্রলুব্ধ করে অন্য দিকে নিয়ে যায়। দেবতারা মহা ঈর্ষাপরায়ণ, এনারা চান না যে, কেউ মুক্তি পেয়ে যাক। তাই যখন দেখে কেউ কৈবল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন দেবতারা নানা রকমের প্রলোভন দেখান। সেই সময় যদি যোগী প্রলোভনের ফাঁদে পা দেন তখন তাঁদের পতন হয়ে গিয়ে যোগভ্রষ্ট হয়ে যান, এনারাই মৃত্যুর পর দেবতাদি হয়ে পরে আবার মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

আবার সিদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বলছেন **ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।।৫৩।।** যেমন সময় বা কালের সূক্ষ্মতম অংশের উপর সংযম করলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার মানে যোগীর সামনে ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তিনটে কালই প্রকাশ হয়ে যায়। আগে কি ছিল, পরে কি হবে সবটাই যোগীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এরপর বলছেন **জাতিলক্ষণদৈশরন্যতানবচ্ছেদাতুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।।৫৪।।** যে কোন জিনিষকে অন্য জিনিষের থেকে তিন ভাবে আলাদা করা হয় – জাতি, লক্ষণ ও দেশ। যেমন একটা ঘোড়া আর গরুকে তাদের জাতি দিয়ে আলাদা করা যায়। আবার একটা সাদা গরু আর কালো গরু, এটা হল লক্ষণের তফাৎ। আর দুটোই যদি সাদা গরু থাকে তখন স্থান অর্থাৎ দেশে তফাৎ হয়ে

যাবে, এই সাদা গরুটা মাঠের দক্ষিণ দিকে আছে আর ওই সাদা গরুটা মাঠের পশ্চিম দিকে আছে, এইভাবে স্থানে বা দেশে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। এই প্রকারে যে কোন দুটো বস্তুকে জাতি, দেশ ও লক্ষণ দিয়ে আলাদা করা হয়। কিন্তু অনেক সময় জাতি, দেশ ও লক্ষণ মিলে মিশে এক হয়ে থাকার জন্য আলাদা করে বোঝা যায় না। কিন্তু এর আগে যেমন সময়ের উপর সংযম করার কথা বলা হয়েছে, এই সময়ের উপর সংযম করলে যতই মিলে মিশে এক হয় থাকুক যোগী সব কটা ছিঁড়ে আলাদা করে নেন। জাতি, লক্ষণ আর দেশ দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষরাও যে কোন জিনিষকে আলাদা ধরতে পারি। আমরা যখন বলি এটা আমার জামা, তখন আমি জানি এটা আমার জামা। কি করে জানছি? জাতি, লক্ষণ ও দেশ দিয়ে। কিন্তু সমান আকার ও একই রঙের একাধিক গুলি বা বল একই জায়গায় পড়ে আছে তখন এই তিনটেকে দিয়ে ধরা যায় না। কিন্তু যোগী পরিষ্কার সব বুঝতে পারেন, জগতে যা কিছু আছে সবটাই মিশ্র পদার্থ একমাত্র পুরুষই অমিশ্র বস্তু।

তারপর বলছেন **তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমধেষতি বিবেকজং জ্ঞানম্।।৫৫।।** যোগী যখন এই অবস্থায় পৌঁছে যান তখন তিনি দেখেন জগতের সব কিছুই মিশ্র। এই জ্ঞানই যোগীকে জন্ম-মৃত্যুর সাগরের পারে নিয়ে যায়। শব্দটা হল তারকম, মানে তারণ করা, তাঁকে সংসার থেকে তারণ করেন। যোগী দেখেন পুরুষই একমাত্র শুদ্ধ স্বভাব, সদা পূর্ণস্বরূপ বাকি সব কিছু অশুদ্ধ আর অপূর্ণ। অশুদ্ধ কেন? কারণ আমাদের বুদ্ধি যা কিছু দেখছে সব ভালো, মন্দ, জাতি, লক্ষণ ও দেশ সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে ল্যাভেগোবর হয়ে বুদ্ধির সামনে আসছে। কিন্তু এবার যোগী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন জগতে যা কিছু আছে সব ল্যাভেগোবর হয়ে বসে আছে, একমাত্র পুরুষই শুদ্ধ স্বভাব।

শেষে বলছেন **সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।।৫৬।।** এই সত্ত্ব এতদিন ভালো মন্দে মিশে ছিল, এই মিলে মিশে থাকা থেকে বুদ্ধিটা বেরিয়ে এসে একেবারে শুদ্ধ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শুদ্ধ বুদ্ধি যেটা, এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে ‘স্বার্থ’ শব্দটা এসেছিল। পুরুষ যেমন বিশুদ্ধ, ঠিক তেমনি মনও বিশুদ্ধ, এই দুটোতে এবার মিলন হয়ে গেল। তার মানে, অশুদ্ধ মনের মিল রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে আর শুদ্ধ মনের মিল রয়েছে পুরুষের সঙ্গে। উপমান প্রমাণে একটা জিনিষকে আরেকটা জিনিষের সঙ্গে যা যা মিল আছে তার তুলনা করে করে প্রমাণ করা হয়, ঠিক তেমনি শুদ্ধ পুরুষের যে কাঠামো তার সাথে শুদ্ধ মনের কাঠামো খাপে খাপে মিল খেয়ে জ্ঞান হয়ে যায়, এই জ্ঞান থেকেই আসে কৈবল্য। কৈবল্য অবস্থাতে তখনও সে প্রকৃতিকে দেখতে পারবে, সেখান থেকে দেখবে প্রকৃতি হলো ভালো-মন্দের মিশ্রণ আর আমি বিশুদ্ধ, পুরুষও বিশুদ্ধ।

এই হল বিভূতি-পাদ। বিভূতি-পাদে দেখানো হল, মন যখন সাধনা করে করে পুরো শক্তিমান হতে শুরু হয় তখন এক একটা ধাপ কিভাবে কিভাবে পার হয়ে যাচ্ছে। শেষ অবস্থায় এমন জায়গায় আসে যখন সে পরিষ্কার দেখতে পায় জগতে যা কিছু আছে সবটাই ভালো মন্দ মিশিয়ে, ভালো-মন্দ মিশ্রিত সব দেখার পর মন জগতের সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ভালোতে একাগ্র করে। ভালো মানেই শুদ্ধ, শুদ্ধ মানেই পুরুষ। এই অবস্থায় চলে যাওয়ার পর মন আর পুরুষ দুটো এক হয়ে যায়। সমান আধারের জন্যই এক হয়ে যায়, দুটোই শুদ্ধ। দুটো এক হয়ে যাওয়া মানেই মুক্তি। এখান থেকেই মুক্তি, মুক্তি মানে কৈবল্য। এর পরের অধ্যায়কে তাই বলছেন কৈবল্য-পাদ।

কৈবল্য-পাদ

কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবলম্, একমাত্র, alone, পুরুষকে আর প্রকৃতির লেজ ধরে থাকতে হচ্ছে না। যোগে মুক্তি শব্দটা ব্যবহার করা হয় না, মুক্তির বদলে কৈবল্য শব্দটা ব্যবহার করা হয়। কৈবল্য মানে যিনি আছেন তিনিই আছেন, তিনি কোন কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেখান থেকে আবার তিনি আলাদা হয়ে একা হয়ে গেছেন। সেইজন্য স্বামীজী কৈবল্য অবস্থার অনুবাদ করছেন Isolated। Isolated মানে পুরো আলাদা হয়ে যাওয়া। প্রথমে সমাধির কথা বলা হয়েছে, তারপরে সাধন প্রসঙ্গে বলা হল, সাধনের পর বিভূতি, বিভূতি মানে যোগ সাধনা করলে কি কি শক্তি আসে। ঠিক ঠিক পর্যায়ক্রমে সাজাতে হলে প্রথমে আসার কথা সাধনার কথা, সাধনার পর বিভূতি আর শেষে মুক্তি। কিন্তু প্রথমেই দেওয়া হয়েছে সমাধি-পাদ। কারণ যোগদর্শনে সমাধির উপর সব থেকে বেশী জোর দেওয়া হয়। সমাধি বলতে এখানে মনের একাগ্রতাকে বুঝতে হবে। যোগের মূল বাচ খেলা একাগ্র আর নিরুদ্ধের মধ্যে। কথাতে ঠাকুরের যে সমাধির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কোন গান কিংবা কোন কথা শুনে ঠাকুর সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, এখানেও সেই একই ব্যাপার, মন কোন একটি ভাবের বিষয়ের গভীরে চলে গিয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে। তবে যোগের সমাধি থেকে ঠাকুরের সমাধি অনেক উচ্চাবস্থার সমাধি। কিন্তু যোগে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র যে লক্ষ্য বা পথের কথা বলা হয়েছে তা হল সমাধি। যোগের বক্তব্য হল, মন যদি একাগ্র হয় তবেই জানা যাবে মনের ভেতর কি হচ্ছে। বহির্জগতকেও জয় করার জন্য চাই মনের একাগ্রতা। আর এই সংসার চক্রের ত্রাস থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসতে চায় তাহলে তার মনকে নিরুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। এরপর বাকি যা কিছু পড়ে থাকবে সেগুলোর কোন দাম নেই। স্বামীজী কিন্তু বার বার বলছেন একাগ্রতাই সাফল্যতার একমাত্র চাবিকাঠি। যোগও তার সাধকদের আশ্বাস দিয়ে বলছে, ঠিক ঠিক যোগ সাধনা করলে প্রকৃতি তার রাজ্যের সব গুহ্য রহস্য সাধকের কাছে উন্মোচন করে দেবে। তার জন্য প্রকৃতির দরজায় সঠিক পদ্ধতিতে শুধু টোকা মেরে যেতে হবে। দরজায় টোকা মারা মানে মনের একাগ্রতাকে বাড়িয়ে যাওয়া। মন যদি একাগ্র থাকে তাহলে জগতের সব কিছুর জ্ঞান এসে যাবে। মন একাগ্র না থাকলে কোনটাই জানা যাবে না। মানুষের স্বভাব হল, যেটা তার কাজে লাগবে সেটাকেই মনে রাখে, যেটা কাজে লাগবে না সেটাকে সে মনে রাখতে পারে না। দরকারী জিনিষও যদি মনে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় গোলমাল আছে। আবার অনেকে দরকারী জিনিষের বাইরে অনেক অদরকারী জিনিষও মনের মধ্যে জমিয়ে রাখে। যোগের জীবন হল balance life, যোগী নিজের পথকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে বলে দেয় আমার এই পথ, এই পথে আমার এই এই জিনিষ জানতে হবে, তার বাইরে অন্য কিছুকে মনের মধ্যে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। যেটা জানার শুধু সেটুকু জেনে নিয়ে বাকি দশটা জিনিষ জানার জন্য আর মন দেবে না। আর যেটা জেনে নিয়েছে, ওটাকেই সব সময় ধরে রাখবে, আর ওর উপরেই দাগা বুলিয়ে যাবে। যোগের কাছে সব থেকে গুরুত্ব হল একাগ্র আর নিরুদ্ধ। যোগে যা কিছু বলা হয় সব এর মধ্যেই ঘুরঘুর করবে। এর আগে যখন সংযম নিয়ে বলা হয়েছিল, এই সংযমও একাগ্রতরই অঙ্গ।

প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের অঙ্গ মৌলিক নিয়মের রহস্যের উদ্ঘাটন

রাজযোগের শেষ অধ্যায় আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটা জিনিষের বোধগম্য হওয়া খুব আবশ্যিক। সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের জিনিষ রয়েছে, জড় রয়েছে, মানুষ রয়েছে, মানুষের মন রয়েছে, একটার সাথে আরেকটার বিভিন্ন সখমিশ্রণ হয়ে আরো হাজারটা জিনিষ তৈরী হচ্ছে। প্রত্যেকটি জিনিষেরই কিছু ধর্ম আছে, নিয়ম আছে, প্রত্যেকেই কিছু নিয়মের দ্বারা চালিত হচ্ছে। ধ্যানের গভীরে গিয়ে বা চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে যখন ধরে ফেলা যায় যে এই জিনিষটার এই জায়গাটাতে একটা নিয়ম বা ধর্ম আছে, এই ধর্মটাই এই জিনিষটাকে চালাচ্ছে। যেমন কোন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী একটা আম নিয়ে গবেষণা করে আমের জেনেটিকসটাকে বার করে বললেন, আমটা এই জেনেটিকস দিয়ে তৈরী। একবার আমের জেনেটিকস গঠনটা জেনে নিলে এবার এটাকেই যদি অন্য কোন জিনিষে প্রয়োগ

করা হয় তাহলে সেই জিনিষের মধ্যে আমের এই ধর্মটাও পাওয়া যাবে। একবার যখন কোন জিনিষের জেনেটিক গঠন বা তার নিয়মটাকে টেনে বার করে নিতে সক্ষম হবে, আর তারপর ওটাকেই একেবারে অন্য একটা বিধর্মী বস্তুর মধ্যে প্রয়োগ করা হবে, তখন সম্পূর্ণ একটা নতুন প্রজাতি বেরিয়ে আসবে। একটা সহজ উদাহরণ, যদি আগুন জ্বালান হয় তাহলে সেখানে তাপ সৃষ্টি হবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখলেন আগুন জ্বালালে কিছু জিনিষ পুড়ে যায়। এখন এই ধর্মটাই কত ব্যাপক ভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করছি, রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করা এরই প্রয়োগের ফলে সম্ভব হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে, প্রথমে কতকগুলি নিয়মকে ধরতে হবে, তারপর সেটাকে প্রয়োগ করতে হবে। যত ভালো এই নিয়ম ও ধর্মকে ধরা যাবে, প্রয়োগ তত ভালো হবে।

আইনস্টাইন বার করলেন $E = MC^2$, এই ফর্মুলাকেই পরে বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করলেন আণবিক বোমা তৈরীতে। বর্তমান যুগে পৃথিবীতে এটমিক এনার্জি থেকে যা কিছু হচ্ছে তা একটা খুব সহজ জিনিষ থেকে হচ্ছে, তা হল $E = MC^2$ । বিজ্ঞানীরা যখন এই নিয়মকে অন্য জিনিষে প্রয়োগ করছেন তখন এই বিজ্ঞানই হয়ে যাচ্ছে Technology। বিজ্ঞানের একটা দিক হল তাত্ত্বিক, তাত্ত্বিক দিক মানে, বিজ্ঞানের যে মৌলিক নিয়মগুলি শুধুমাত্র গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মগুলির যখন জাগতিক অভ্যুদয়ে ব্যবহারিক প্রয়োগ হবে তখন এই বিজ্ঞানই হয়ে যাবে কারিগরি বিজ্ঞান বা Technology। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। মানুষের মনে বিভিন্ন আবেগ আর আবেগজনিত কার্যকলাপের যে খেলা চলে, তার কোন একটা বিশেষ জায়গাকে নিয়ে গবেষণা করে, তার মূল যে কাঠামো, বৈশিষ্ট্যের যে মূল গঠন অর্থাৎ blue printটাকে প্রথমে ধরতে হবে, ধরার পর সেই কাঠামোটা আঁস্তে করে বার করে নিয়ে আসতে হবে। তখন এই কাঠামোকে অবলম্বন করে নতুন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এই কাঠামোর উপর এবার যে নতুন চরিত্র সৃষ্টি হবে, কারিগরি বিজ্ঞানের মত যে যত একে ভালো প্রয়োগ করতে পারবে তার সাহিত্য তত কালজয়ী হবে। যদি সে খুব ভালো কিছু নাও দিতে পারে তাও এটা নিজের থেকেই সুন্দর হবে যেহেতু সে মূল কাঠামোটা ধরতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে এই ধরণের হাজার হাজার নিয়ম ও ধর্ম রয়েছে যা আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি।

ব্যাসদেবও ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। মানুষ নামে যে জাতি আছে সেই জাতির পরিচয়ের জন্য কিছু মূল লক্ষণ আছে। তার যে নানান রকমের আবেগ – ভদ্র ভাব, হিংসা ভাব, নিষ্ঠুরতার ভাব, প্রেম ভাব, লোভ, ভয়-ভীতি, সাহস, ভীরুতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা মানুষের এই ভালো-মন্দ গুণগুলিকে ব্যাসদেব ধরে নিয়েছিলেন। এই লক্ষণগুলিকে ধরে নিয়ে ব্যাসদেব মহাভারতে যত চরিত্র আছে – পাণ্ডব, কৌরব, ঋষিমুনিরা যত আছেন তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এগুলোকে বসিয়ে নতুন কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করলেন, আর তার ফলশ্রুতি হল মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র আজও অমর হয়ে আছে। যে কোন কালজয়ী অমর সৃষ্টির এটাই একমাত্র পথ। যে কোন একটা blue printকে তুলে এনে তার ওপর নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করার পর যে সৃষ্টিটা বেরিয়ে আসবে সেটাই অমর সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে যাবে।

যেমন দূর্গা প্রতিমা বানান হয়ে গেছে এবং প্রতিমার সব সাজগোজ যা হবার সব হয়ে গেছে, এখন এর উপর আমরা বিশেষ নতুন কিছু আর সংযোজন করতে পারব না, খুব জোর একটা শাড়ি খুলে অন্য একটা শাড়ি পড়ান যাবে, একটা অলঙ্কারের উপর আরেকটা অলঙ্কার চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এর থেকে বেশি কিছু করা যাবে না। কিন্তু যদি মাটির কাঠামোটাকে ধরে নেওয়া যায় তখন প্রতিমার নানা রকমের আকৃতি দিতে পারব, রোগা, মোটা, পাতলা, মাঝারি যে রকম ইচ্ছা আকৃতি দেওয়া যাবে। আর যদি ওই মাটির কাঠামোটাকেও সরিয়ে দিয়ে ওর ভেতরের খড়ের কাঠামোটাকে ধরে নিই, তখন দূর্গার বদলে আরো দশটা ঠাকুরের প্রতিমা বানাতে পারব সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী যা ইচ্ছে মূর্তি করা যাবে। আর যদি একবার খড়ের কাঠামোটাকেও বাদ দিয়ে বাঁশের কাঠামোটাকেই ধরে নিতে পারি তখন যে কোন আকৃতির যে কোন মূর্তি বানিয়ে নিতে পারব। এই কাঠামোটাই সব কিছুর মূল। যে কোন বস্তুর

যত ভেতরে গিয়ে তার মূল কাঠামোটাকে ধরা যাবে তত তার থেকে বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যময় জিনিষ বানিয়ে নিতে পারা যাবে।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম চলে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেরও কতকগুলি মৌলিক নিয়ম ও ধর্ম আছে। যখন এর কোন একটা নিয়মকে কেউ ধরে নিয়ে সেটাকে সামাজিক ক্ষেত্রে বা আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রয়োগ করেন তখন তিনিই একজন মহাত্মা হয়ে যাবেন। স্বামীজীও আসলে এই জিনিষটাই করেছেন। ইদানিং যে এত Practical Vedanta এর কথা বলা হয়, স্বামীজী বেদান্তের কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বকে ধরে নিয়েছিলেন, সেটাকেই তিনি বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিলেন, আর সেটাই আজ হয়ে গেল Practical Vedanta, স্বামীজীও জগৎ বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

ঠাকুর সমাধির গভীরে গিয়ে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আরও যে অনেক মৌলিক তত্ত্ব ও নিয়ম রয়েছে, সেগুলিকে ধরতে পেরেছিলেন যা কথামূতের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। আমরাও তো কথামূত পড়ছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাজ করছে না, কারণ আমরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সেই মৌলিক নিয়মগুলিকে ধরতে পারছি না। চেষ্টা করলে আমরা $E = MC^2$ কে হয়তো জেনে নিতে পারব, কিন্তু আণবিক বোমা বানাতে সক্ষম হব না। তার জন্য সাধনার অনেক গভীরে যেতে হবে। আর যতটুকুই করা হোক না কেন তা কখনই আমাদের মহান করবে না, কেননা এর আগেই কেউ না কেউ সেটাকে আবিষ্কার করে রেখেছেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেটা আরো বেশি হয়, আমরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনেক কিছুই হয়তো জানি, কিন্তু নিজেকে সেটা আগে উপলব্ধি করে নিতে হবে, তা নাহলে তত্ত্ব জেনে নিলেও কিছুই করতে পারব না। এতক্ষণ যে আমরা এতগুলো কথা বললাম শুধু এটুকু বলার জন্য যে, রাজযোগ পুরোটাই মনের laws and principles কে নিয়ে। মন কিভাবে কাজ করে, এর স্বভাব, গতিপ্রকৃতি, মন কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে, কেন আসছে এর পুরো নিয়মগুলিকে পতঞ্জলি ধরতে পেরেছিলেন। ধরে তিনি এর প্রয়োগের কৌশলটাও দেখিয়ে দিলেন।

পূর্বে যে বিভিন্ন সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, এর সবটাই মনের laws and principles এর প্রয়োগ। যাঁরা যোগী তারা মনের এই laws and principles কে আবিষ্কার করে যখন প্রয়োগ করেন তখন এই সিদ্ধি গুলি তাঁদের আয়ত্তে চলে আসে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগীরা মনের ধর্ম ও নিয়মগুলিকে যখন প্রয়োগ করেন তখন বলা হয় Spirituality and its practical application. সিদ্ধিগুলি যোগের practical application। কিন্তু এর উদ্দেশ্য আবার পুরো আলাদা। যেমন স্বামীজী বলছেন বিজ্ঞানের লক্ষ্য জগতের ঐক্যকে আবিষ্কার করা। ঠিক সেই রকম আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য হল জগতের ঐক্যতে পৌঁছান।

জ্ঞান মানে এই পুরুষ ও প্রকৃতির মৌলিক ধর্ম ও নিয়মগুলিকে জানা। এর যে কোন একটি মৌলিক নিয়মকে, সে যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, যদি কেউ আবিষ্কার করতে পারেন তাহলেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে যাবেন। যদি আবিষ্কারও না করে শুধু যে নিয়মগুলি ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, তার যে কোন একটার নতুন প্রয়োগ কৌশল দেখাতে পারেন তাতেও তিনি বিখ্যাত হয়ে যাবেন। আর যদি দুটোই এক সঙ্গে করতে পারেন তাহলে তো তিনি চিরদিন জগদ্বিখ্যাত হয়ে থাকবেন। ফেরাডে যখন ইলেক্ট্রিসিটি আবিষ্কার করলেন তখন ইংল্যান্ডের রানী ইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপারটা বুঝতে এসেছিলেন। দেখার পর রানী জিজ্ঞেস করছেন – Mr. Ferrade, what uses of this thing is, the new thing that you have invented? তখন ফেরাডে বলছেন – Her highness, what use of a new born child? ফেরাডে বললেন একটা শিশু জন্মেছে, এতে আমাদের কি হবে, আমাদের এই বাচ্চা কিভাবে সাহায্য করবে, এখন তো ওর কোন প্রয়োজনই নেই আমাদের কাছে, কিন্তু পঁচিশ বছর পর জানা যাবে সে আমাদের জন্য, সমাজের জন্য কিভাবে কাজে আসছে। আজ ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়া মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। ফেরাডে প্রকৃতির একটা মৌলিক তত্ত্বকে শুধু ধরে ফেললেন। অথচ দেখুন এই তত্ত্ব, মানে ইলেক্ট্রিসিটি এই জগতের সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে। প্রকৃতি আমাদের কবে থেকে বজ্রপাতের মাধ্যমে কত ইলেক্ট্রিসিটি ছুঁড়ে যাচ্ছে, আমরা জানতাম না যে এটাই ইলেক্ট্রিসিটি। প্রকৃতি এই ধরণের

হাজার হাজার তত্ত্ব, নিয়ম আমাদের দিয়ে যাচ্ছে, আর এর সবটাই আমাদের আশে পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা ধরা তো দূরে থাক জানতেই পারছি না, কারণ আমাদের মন ওগুলোকে জানার মত একাগ্র নয়।

আমাদের ভেতরে পশুসুলভ আর দেবসুলভ সংস্কার দুটোই আছে। পশুসুলভ সংস্কারকে দমন করার জন্যই আগেকার দিনে আমাদের বাবা মা, শিক্ষকরা অনুশাসনের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতেন। এখন আর সেই ধরণের শাসন নেই। সবাই বলছে ডিসিপ্লিন না হলে চলবে না, কিন্তু এরা জানে না যে ডিসিপ্লিন পরে, আগে শাসনের মাধ্যমে চরিত্র তৈরী করতে হবে। সারা বিশ্বে যে এত গণ্ডগোল, নানান সমস্যা চলছে এর একমাত্র কারণ জগতে চরিত্রের অভাব। কিন্তু সারা দুনিয়া চিৎকার করছে Discipline has to come from freedom, কিন্তু গোড়াতেই ভুল করে বসে আছে, এদের জানা নেই যে discipline never comes from freedom, discipline always comes from taking away the freedom.

বাচ্চাকে তার অভিবাবক বলে দিয়েছে তুমি এভাবে বড়দের মুখের উপর কখন কথা বলবে না। বলার পরও বাচ্চা আবার বড়দের মুখের উপর কথা বলেছে, অভিবাবক তখন ঠাস করে তার গালে একটা চড় মারল। এখন ওর মধ্যে দুটো জিনিষই থেকে যাবে, প্রথমে সে যে অন্যায়টা করেছে, সেই সংস্কারটাও ভেতরে থেকে যাবে, মার খাওয়ার পর ভালোভাবে চলে তার মধ্যে যে নতুন সংস্কার তৈরী হচ্ছে সেটাও মনের গভীরে গিয়ে ছাপ ফেলবে। দুই ধরণের সংস্কারই ভেতরে সূক্ষ্ম শরীরে একটা আকার নিয়ে নিচ্ছে। সিডিতে গান আছে, কিন্তু বাইরে থেকে সিডিতে গান আছে কিনা কখনই বোঝা যাবে না, অথচ রয়েছে। এখানে কিন্তু তাও হয় না, শুধু mould টা পাল্টে যায়। এখন এমন কোন পরিস্থিতি এলো, যেখানে সে নিজের ইচ্ছে মত যা খুশি করতে পারে, সেখানে কিন্তু কখনই সঠিক করে বলা যাবে না সে কি ধরণের আচরণ করবে। কারণ দু ধরণের সংস্কারই ওর মধ্যে রয়েছে, যে অন্যায় কাজ করেছিল সেটাও রয়েছে আবার শাসনের মধ্য দিয়ে তাকে যে ঠিক পথে আনা হয়েছিল সেটাও রয়েছে। সেইজন্য এই ধরণের পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ লোকেরাই দেখে এখানে আমার কি ধরণের পরিবেশ আছে, যদি দেখে এখানে আমাকে শাস্তি দেবার কেউ নেই, আমার জন্য কোন পুরস্কারও রাখা নেই, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সে নেতিবাচক ভূমিকাতে কাজ করাকে অগ্রাধিকার দেবে।

জন্মাজন্মান্তরের যে অসংখ্য সংস্কার আমাদের মধ্যে জমে আছে, বিভিন্ন পরিবেশে পরিস্থিতিতে সেগুলো আমাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে ঠেলে দেয়। দুটোই তখন আমাকে ঠেলে দেবে, কিন্তু অবস্থা অনুযায়ী একটা বেশি শক্তিশালী থাকে আরেকটা কম শক্তিশালী থাকে, কিন্তু দুটোই আমাকে ঠেলে দেবে। আমাদের লক্ষ্য হল এই দুটো থেকেই বেরিয়ে আসা। শুধু যে খারাপগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তা নয়, ভালো খারাপ দুটো থেকেই বেরিয়ে আসতে হবে। কি করে বেরোন সম্ভব? এর আগে সাধন-পাদে দশ নম্বর সূত্রে বলা হয়েছিল *তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সৃক্ষ্মাঃ* প্রতিপ্রসবের অর্থ হল, যে জিনিষটা যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে, মানে প্রসব করেছে, সেটাকে সেইখানে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া।

প্রথম কাজ হল বীজকে প্রকৃতির মধ্যে ঠেলে দিয়ে এবার পুরুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেওয়া। কিন্তু এরা তো আবার জুড়ে যেতে পারে। কিন্তু না, আর জুড়বে না, কারণ সে যখন বুঝে নেবে যে আমি অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেকে প্রকৃতির সাথে এক করে রেখেছিলাম, আমি এখন বুঝে গেছি আমি হলাম স্বতন্ত্র, প্রকৃতির সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই। সবিকল্প সমাধি বা সবীজ সমাধি হল প্রতিপ্রসব। প্রতিপ্রসব মানে counter creation, কিন্তু প্রতিপ্রসব করতে করতে যখন প্রকৃতিতে চলে যাবে তখন সে প্রকৃতিকেও জয় করে নেবে, মানে তখন ব্রহ্মা হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি হবে? ওখান থেকে তাকে আবার এই জগতের মধ্যে নেমে আসতে হবে। কারণ বীজটা তো রয়ে গেছে। প্রতিপ্রসব করলে কি হবে বীজটা তো শেষ পর্যন্ত থেকেই যাচ্ছে। বীজকে নিবীজ করতে হবে। পুরুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দিলে নিবীজ হয়ে যাবে। নিবীজ আর সবীজের এটাই ব্যাখ্যা। সব কিছই সবীজ, একমাত্র যখন যোগী আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, রাজযোগের কথাতে পুরুষ যখন কৈবল্য লাভ করেন তখনই নিবীজ

হয়ে যাবে। তার আগে পর্যন্ত সব কিছুই সর্বিজ অবস্থায় থাকবে। যত উচ্চস্তরেই তিনি থাকুন না কেন সর্ব স্তরেই সর্বিজ থেকে যাবেন, যতক্ষণ না তাঁর আত্মজ্ঞান হচ্ছে।

জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও একাগ্রতা থেকে যে যে সিদ্ধি আসে

এর আগে যে সব সিদ্ধির কথা বলা হয়েছিল, এই সব সিদ্ধি ছাড়াও দেখা যায় কিছু কিছু লোকের মধ্যে অনেক রকম ক্ষমতা থাকে, সাধারণ কিছু লোকের মধ্যেও অনেক অসাধারণত্ব দেখা যায়। এই ক্ষমতা ও অসাধারণত্ব কিভাবে হয়? এটাকে বোঝাতে গিয়ে পতঞ্জলি একটা খুব মজার সূত্র বলছেন, যদিও যোগের মূল তত্ত্ব জানার জন্য এই সূত্রের খুব একটা গুরুত্ব নেই। এখানে আমাদের দুটো জিনিষকে নিয়ে চলতে হবে – একটা মজার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ। মজার সূত্র হল যে সূত্রগুলি আমাদের কিছু তথ্য সরবরাহ করে যোগের অনেক অজানা জিনিষের ধারণা করতে সাহায্য করবে কিন্তু এগুলি যদি নাও জানা থাকে তাতে কিছু যায় আসে না, দর্শনের মূল তত্ত্ব জানার ব্যাপারে এগুলো আমাদের সাহায্য করবে না।

ঠিক এই ধরনের একটা মজার সূত্রে বলছেন – **জনমৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।।১।।** এই সিদ্ধি আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞান লাভের পর যে সিদ্ধি হয় সেই সিদ্ধির কথা বলা হচ্ছে না, বা আমরা যেমন বলি উনি সিদ্ধ পুরুষ, এখানে তা বলা হচ্ছে না, সিদ্ধি মানে সিদ্ধাইকেই বোঝান হচ্ছে। এজখানে সিদ্ধির অর্থ কোন ধরনের বিশেষ অতিন্দ্রীয় ক্ষমতা। সিদ্ধি নানান ধরনের হয়। সমস্ত সিদ্ধি কিভাবে মানুষের মধ্যে আসে? এর আগে বিস্তারিত ভাবে দেখানো হয়েছে কোন কোন জিনিষের উপরে সংযম করলে কী কী ধরনের সিদ্ধি আসবে। কিন্তু কারুর মধ্যে যদি একবার পবিত্রতা এসে যায় তখন যত সিদ্ধির কথা এযাবৎ বলা হয়েছে, সব সিদ্ধি তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে, তার মানে তখন আর তাকে নানান জিনিষের উপরে সংযম প্রয়োগ করতে হবে না। এখন পবিত্রতা আর সংযম ছাড়া এই সিদ্ধি আর কি কি ভাবে আসতে পারে? তখন বলছেন পাঁচ ভাবে এই সিদ্ধি গুলি আসতে পারে – জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি এই পাঁচটির মাধ্যমে সিদ্ধি পাওয়া যায়।

জন্ম মানে – কিছু কিছু লোকের জন্ম থেকেই সিদ্ধাই থাকে। আমরা সব সময় মনে করি আধ্যাত্মিক জীবনেই শুধু সিদ্ধাই হয়। না তা নয়, সিদ্ধি যে কোন ক্ষেত্রেই আসতে পারে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, খেলাধুলা অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধাই গুলি আসতে পারে। আমরা অনেক সময়ই দেখি যে একটা বাচ্চা ছোটবেলাতেই কোন কোন ক্ষেত্রে বিরট কিছু হয়ে যায়। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁদের বাচ্চা বয়সে থেকেই বুদ্ধি খুব প্রখর। অন্য রকমও আছে, কেউ হয়তো নিজের প্রতিভাকে লাগাবার সুযোগ পাচ্ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সুযোগ পেতেই সেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়ে গেল। তবে সাধারণতঃ যেটা দেখা যায় তা হল, জীবনে যত রকম সিদ্ধি আসে, এই সিদ্ধি আগে থেকেই প্রকাশ হতে শুরু হয়ে যায়। তবে শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে যত প্রতিভাবান ব্যক্তি আর যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন এনারা সবাই যে এই এক জন্মই প্রতিভাবান হয়ে জন্মেছিলেন তা নয়। বেটোফেন সম্পূর্ণ বধির হয়েও বিশ্বের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিউজিক কম্পোজার রূপে স্বীকৃতি পেলেন। কি করে সম্ভব হয়েছে? এই জন্মের আগের আগের জন্মে এনাদের সাধনা করা আছে। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধি এনাদের কত দিন থাকবে? ভগবান জানেন, যেমন যেমন তপস্যা করেছিলেন সেই রকম চলবে। কপিল মুনিকে বলা হয় যে তিনি জন্ম থেকেই সিদ্ধ ছিলেন – গীতায় আছে – *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ* - সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে আমি (ভগবান) কপিল মুনি। তেমনি অভিমন্যু জন্ম থেকেই অস্ত্রবিদ্যা জানতো, অষ্টাবক্র জন্ম থেকেই বেদজ্ঞ ছিলেন, যদিও এগুলোকে কাহিনীতে রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল কথা হল অনেকে জন্ম থেকেই কোন একটা বিদ্যাতে সিদ্ধ হয়ে আসেন।

দ্বিতীয় ঔষধি। এখানে ঔষধি মানে রাসায়নিক। রাসায়নিক কিছু জিনিষের ব্যবহার করে সিদ্ধি পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীনকালে লোকদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের মাধ্যমে সিদ্ধি হতে পারে, গ্রীক দেশেও আগেকের দিনে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল। প্রাচীন কালে রাসায়ন

শাস্ত্রে বলা হত কেউ যদি এই এই জিনিষ সেবন করে নেয় তাহলে তার মধ্যে এই এই গুণ বা ক্ষমতা চলে আসবে, এর মধ্যে বড় ক্ষমতা লাভ হল অমরত্ব লাভ করা। কিছু রাসায়ন দ্রব্য ছিল যেগুলি সেবন করলে মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করত। পতঞ্জলি এগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে বলছেন, এমন কিছু রাসায়ন দ্রব্য আছে যেগুলির সঠিক প্রয়োগের দ্বারা মানুষের অতি মানবিক কিছু ক্ষমতা এসে যায়। অমরনাথে ওই ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সবাই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, আরেক জন বাবাজী গাঁজা টেনে শরীর গরম করে খালি গায়ে বেগাম্ বেগাম্ করতে করতে চলে যাচ্ছে, এটাও সিদ্ধি। কিন্তু আসল সিদ্ধি হল সেই রসায়নকে পাওয়া যে রসায়নের সাহায্যে মানুষ অমর হয়ে যেতে পারে। স্বামীজীও এখানে বলছেন – কিছু কিছু যোগীরা আছেন যারা রসায়নের মাধ্যমে এখনও তাঁদের পুরাতন শরীরকে ধারণ করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পতঞ্জলিও এই কথা অস্বীকার করছেন না।

একটা বয়সের পর এমনিতেই কোন কিছুতে মনকে বসানো যায় না, যে কোন কাজ করতে গেলে কাজে মন লাগে না। আজ হাঁটুতে ব্যাথা তো কাল কোমরে ব্যাথা, কখন মাথা যন্ত্রণা, গা ম্যাজ ম্যাজ, খেলে হজম হয় না, রাতে ঘুম না আসা এগুলো লেগেই থাকে। এসব দেখে-শুনে ঋষিরা বুঝলেন শরীর আর মনের মধ্যে একটা সাংঘাতিক সংযোগ আছে। তাই মন যদি ভালো রাখতে হয় শরীরকেও তাহলে ভালো রাখতে হবে। তখন তাঁরা শরীরকে ভালো রাখার জন্য রসায়ন শাস্ত্র তৈরী করলেন। ভারতে এক সময় রসায়ন শাস্ত্র খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রে সেই ধরণের কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে যাতে মানুষকে দীর্ঘজীবী করা যেতে পারে। যাঁরা যোগ সাধনা করছেন তাঁরা ভাবছেন বুড়ো হয়ে গেলে আমাকে মরে যেতে হবে। তার সাথে এও ভাবছেন মরে যাওয়ার পর আবার আমাকে নতুন করে শুরু করতে হবে। নতুন জন্ম নেওয়ার পর প্রথম দশ বারো বছর এমনি এমনিই চলে যাবে। গত জন্মে যেসব আচার্যের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম তারাও মরে গেছেন, সেই বিদ্যাটাও হয়তো হারিয়ে গিয়ে থাকবে। আবার নতুন করে সব কিছু খুঁজে পেতে নিতে হবে। তার থেকে বরং একটা দীর্ঘ জীবন যদি পাওয়া যায় তাহলে সব ঝামেলা চুকে যাবে। তাহলে এমন একটা উপায় বার করতে হবে যে বিদ্যা দিয়ে আমার এই শরীরটা দীর্ঘদিন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সেই থেকে ভারতে তৈরী হল রসায়ন শাস্ত্র। রসায়ন একদিকে যেমন মানুষকে দীর্ঘায়ু শরীর দিয়েছিল, তেমনি রসায়নের অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল সীসা বা লোহাকে কি করে সোনাতে রূপান্তরিত করে দেওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রসায়নের মূল কাজ ছিল মানুষের ভোগকে কিভাবে চরিতার্থ করা যায়। কিছু দিন আগেও গ্রামে গঞ্জে সাধুবাবারা এই কাজগুলো করে বেড়াতেন, কি করে লোকেদের অসুখ সারিয়ে দেবে, কি করলে সম্পত্তি পাওয়া যাবে ইত্যাদি। যোগীদের দৃষ্টি কিন্তু অন্য দিকে ছিল, তাঁরা চাইতেন যদি শরীরটাকে ভালো রাখা যায় আর দীর্ঘজীবী হওয়া যায় তাহলে বার বার জন্ম না নিয়ে এই জন্মেই সহজে সিদ্ধি লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যাওয়া যায়। কারণ একই শরীরকে সুস্থ ভাবে যদি ধরে রাখা যায় তাহলে সিদ্ধি অবশ্যই পাওয়া যাবে। যাঁরা পিএইচডি করেন তাঁদের টানা অনেক দিন কাজ করতে হয়, ঠিক তেমনি ধর্ম সাধনাও টানা অনেক দিন করতে হয়। তারপরে দেখছেন ঔষধ দিলে শরীরের নানা রকম ব্যাধির নিরাময় হয়ে যাচ্ছে, ঔষধ সেবন করলে খিদে বেড়ে যাচ্ছে, ঘুম ভালো হচ্ছে, হাটাচলা, ওঠাবসা সবই স্বাভাবিক থাকছে। তখন তাঁদের মনে এল, এমন কিছু করা যাক যাতে এই শরীরকেও লম্বা ধরে রেখে তপস্যা চালিয়ে যাওয়া যায়।

অন্য দিকে এর আরেকটি মজার ব্যাপার আছে। আমরা বিশ্বাস করে চলছি যে, সব কিছুর পেছনে সেই শুদ্ধাত্মা পুরুষ আছেন। যে ভাবেই হোক পুরুষ প্রকৃতির এলাকায় চলে আসার পর একটা সূক্ষ্ম শরীর হয়েছে। সূক্ষ্ম শরীর একটা স্থূল শরীরকে অবলম্বন করে। মা-বাবার সম্পর্ক থেকে স্থূল শরীরটা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। কিন্তু এই স্থূল শরীর প্রতি নিয়ত পাল্টাতে থাকে। আমরা খাওয়া-দাওয়া করছি, অন্য দিকে আমাদের কোশিকাগুলো অনবরত মরে যাচ্ছে তার জায়গায় আবার নতুন কোশিকা তৈরী হয়ে চলেছে। আমরা বলছি বটে আমি তো সেই লোক, কিন্তু সেই লোক কোথায়! গতকাল আমি যা ছিলাম আজকে আমি আর সেই আমি নেই। আমি স্নান করেছি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছি, কত কিছু খাওয়া-দাওয়া করেছি, আমার শরীরের যে ছোট ছোট কোশিকা গুলো ছিল সব শেষ

হয়ে গিয়ে তার জায়গায় আবার নতুন নতুন কোশিকা জন্ম নিয়েছে। আমাদের রক্ত কয়েক দিনের মধ্যে পাল্টে নতুন রক্ত তৈরী হয়ে যাচ্ছে। অথচ বলছি আমি সেই লোক। আমাদের আসল আমি হলেন সেই শুদ্ধ আত্মা। কিন্তু তার ঠিক পরেই সূক্ষ্ম শরীরটাই ঠিক ঠিক আমি। স্থূল শরীরের পতন হয়ে গেলে এই সূক্ষ্ম শরীর আরেকটা নতুন স্থূল শরীরকে ধরে নিচ্ছে। সেখান থেকে আমরা আবার একটা শরীর বানিয়ে নিচ্ছি। আপনি আগে ছিলেন মিস্টার এক্স, পরে হবেন মিস্টার ওয়াই। এক্সের পর আপনাকে মরে যেতে হল, মরে গিয়ে আপনাকে ওয়াই হতে হবে। তাহলে এমন কিছু করা যাক না কেন, যাতে এই শরীর থাকতে থাকতেই এমন একটা মেকানিজম তৈরী করব, আমার যে সূক্ষ্ম শরীর যেটা দিয়ে নতুন শরীর বানায়, সেই মেকানিজমকে এখনই আমি চালু করে দেব। এই ব্যাপারটা তো সাধারণ ভাবে হবে না। তখন ঔষধি ব্যবহারের কথা এলো। সেইজন্য আগেকার দিনের যোগীরা ঔষধির দিকে খুব মন দিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমাদের রসায়ন বিদ্যা বা আলকেমি বিদ্যার প্রসার শুরু হয়ে গেল। আলকেমি থেকেই কেমেস্ট্রি এসেছে। আমাদের পরম্পরাতে একটা প্রচলিত বিশ্বাস চলে আসছে যে, আগেকার অনেক বড় বড় ঋষিরা, যোগীরা এখনও বেঁচে আছেন। এইভাবেই বলা হয় হনুমান নাকি এখনো বেঁচে আছেন। হনুমান বেঁচে আছেন তার মানে, হনুমানের শরীরের যে কোশিকাগুলো খসে যাচ্ছিল সেখানে নতুন কোশিকা তৈরী হয়ে যাচ্ছে, হনুমান একই থেকে যাচ্ছেন। সেই রকম ব্যাসদেব, বিভীষণ যোগ শক্তির জোরে নাকি এখনও বেঁচে আছেন। এগুলো কাহিনী, সাধারণ মানুষ কাহিনীকেই সত্যি বলে মেনে নেয়।

মূল কথা হল ঔষধির প্রভাবেও সিদ্ধি লাভ করা যায়। সিদ্ধির মধ্যে শরীরের সিদ্ধির ব্যাপার আছে, ঠিক তেমনি একাগ্রতার ব্যাপারটাও আছে। অনেক সময় কিছু ধরণের ওষুধ সেবনে মনের একাগ্র শক্তি বৃদ্ধি পায়। আগেকার দিনে দুটো জিনিষই ছিল, গাঁজা আর ভাং। সাধু বাবাজীরাও এই দুটো জিনিষ সেবন করতেন। যে মন শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, গাঁজা আর ভাং সেবন করলে মন শরীরের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখন যেটা করে সেটাই করতে থাকে। গাঁজা ভাং সরে গিয়ে এখন অনেক কিছুই এসে গেছে, এলএসডি, হেরোইনের মত উন্নত মানের সব ড্রাগ এসে গেছে। অনেক সময় নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা প্রশ্ন করে, এলএসডি, হেরোইন খেলেও তো আনন্দে বঁদ হয়ে থাকা যায়, মন একটা জায়গায় একাগ্র হয়ে থাকে, তাহলে এগুলো খেতে আপত্তির কী আছে? ঠিকই বলছে, যোগেও এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এই ধরণের অনেক কিছু ঠিকই হয়। কিন্তু এগুলো খুব নিকৃষ্ট পদ্ধতি আর এর জন্য আমাদের বাইরের সাহায্যের দরকার হচ্ছে, যার জন্য নিয়মিত আমাদের ঔষধ খেতে হবে। আর যতক্ষণ চোখের সামনে না দেখছি একজন লোক অনেক বছর বেঁচে আছে ততক্ষণ বিশ্বাস হবে না, কাহিনীতে তো অনেক কিছুই বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা গেল ঔষধির ব্যাপার।

তৃতীয় হল মন্ত্র। কোন কোন বিশেষ মন্ত্রের যদি অনুশীলন করা হয় তাহলে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি লাভ হতে পারে। যেমন সূর্য প্রণাম অভ্যাস করলে নাকি মানুষকে সম্মোহিত করার শক্তি এসে যায়। রোজ চণ্ডী পাঠ করলে বা অনেক দিন ধরে চণ্ডীর পারায়ণ করা হলে বাড়ির অনেকে বিঘ্ন নাশ হয়ে যায়, এছাড়াও চণ্ডী পাঠে একটা বিশেষ শক্তি আসে। বাড়িতে অথবা কারুর জীবনে অনেক ঝামেলা চলছে তখন রোজ যদি শ্রদ্ধা সহকারে এক অধ্যায় চণ্ডী পাঠ করা হয় তখন কিছু দিনের মধ্যে সব ঝামেলা চলে যাবে, যেতে বাধ্য। এইভাবে মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধি লাভকে পতঞ্জলিও স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আমরা যে নিত্য জপ করছি, এই জপেরও সাংঘাতিক শক্তি। শ্রীমাও বলছেন জপাৎ সিদ্ধি। মন্ত্র বলতে দীক্ষামন্ত্রের জপকেই বেশী বোঝায়। বলা হয় জপ করলেও সিদ্ধি হবে, সিদ্ধি মানে অষ্টসিদ্ধিতে যেসব সিদ্ধির কথা বলা হয়, সেই অষ্টসিদ্ধিও পাওয়া যেতে পারে। যোগ একটা দর্শন, যোগ তার নিজস্ব একটা পথের কথা বলে দিচ্ছে, কিন্তু তাই বলে যোগ কখনই বলবে না অন্য পথে তোমার সিদ্ধি হবে না। যোগ বলে, মনের একাগ্রতার অনুশীলন করলে এই ধরণের সিদ্ধির অভিজ্ঞতা এমনতেই পেয়ে যাবে। অন্য পথে হবে কি হবে না সেটা যোগের ব্যাপার নয়। কিন্তু তাও কিছু কিছু জিনিষের কথা যোগ বলে দিচ্ছে, যেমন রসায়ন দিয়েও তুমি কিছু কিছু জিনিষ পেতে পারো। জন্ম থেকেও তোমার মধ্যে কিছু কিছু সিদ্ধিই এসে যেতে পারে। আর মন্ত্র, মানে জপ করলেও সিদ্ধি হবে। যে কোন মন্ত্র জপ করলেই হবে,

তার মধ্যে ‘ওঁ’কে বলা হয় শ্রেষ্ঠ। তন্ত্রেও নানা রকম বীজমন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে এক একটি বীজমন্ত্রে এক এক রকম সিদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। স্বামীজী বলছেন মানুষের ক্ষমতার ইতি করা যায় না, তার অসীম ক্ষমতা। মানুষের ক্ষমতা বলতে মানুষের মনের কথাই বলা হচ্ছে। স্বামীজী তো কুশল বক্তা, তিনি বলছেন *There is no limit to man's power, the power of words and power of mind*। এটাই বলছেন মনের যে শক্তি তার ইতি করা যায় না। আর মন্ত্রেরও যে শক্তি তারও ইতি করা যায় না। আসলে মানুষ আর মানুষের মন একই। তবে তার যে শারীরিক প্রচেষ্টা, তারও কোন সীমানা নেই। শারীরিক চেষ্টাও কোথাও না কোথাও গিয়ে মনের মাধ্যমে দিয়ে বেরিয়ে আসে। আসলে শরীর মনের থেকে অনেক নীচে।

মনের অদম্য শক্তি মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার নিদর্শন হিসাবে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। গয়া জেলাতে একজন দিনমজুর ছিল। দিনমজুরের মাইনে খুবই সামান্য। সকাল থেকে কাজ করত আর দুপুরবেলা তার স্ত্রী তার জন্য খাবার নিয়ে আসত। খাবার দিতে স্ত্রীকে রোজ বিরাট একটা লম্বা পথ প্রায় বারো চৌদ্দ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে আসতে হত। এটা হল পায়ের রাস্তা, কিন্তু মোটরের রাস্তা আরও দীর্ঘ। দিনমজুর লোকটি ভাবলো এখান থেকে যদি একটা সুরঙ্গ করে দেওয়া হয় তাহলে দশ বারো কিলোমিটারের রাস্তা হাটার বদলে পাঁচশো মিটার হাটলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। মাথার মধ্যে ভাবনা আসার পর থেকে লোকটি যখন দুপুরে বিশ্রামের সময় পেত তখন সে ছেনি দিয়ে পাহাড়ের গায়ে সুরঙ্গ করতে থাকত। যদি সুরঙ্গ হয়ে যায় তাহলে ওর স্ত্রীর অনেক সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী মারা গেল। যার জন্য সুরঙ্গ করা সে বেচারীই মরে গেল। লোকটি ভাবল, সুরঙ্গের কাজটা যখন একবার করতে শুরু করে দিয়েছি, কাজটা করেই যাই। এরপর একদিন লোকটিকে সরকারি কাজ থেকে অবসর নিতে হল। অবসরের পর ভাবলো, এতটা যখন করে দিয়েছি তাহলে বাকিটুকুও করে দিই। লোকটি সুরঙ্গ করতেই থাকল। শেষে লোকটির যখন সত্তর পঁচাত্তর বয়স হয়ে গেছে তখন ওই সুরঙ্গটা সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেল। তখন সারা দেশের খবর কাগজে লোকটির কীর্তির কথা বেরোল। খুব কম লোকেরই এই কীর্তিমূলক কাজের খবরটা নজরে এসেছে। আসলে আমরা তো খবরের কাগজের যত রকম আবার্জনার খবরগুলোই পড়ি, যেখানে মানুষের শক্তি প্রকাশের খবর বেরায় সেই খবরে আমাদের আগ্রহ থাকে না। পরে লোকটিকে সম্বর্ধনা দেওয়া, সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়া সবই হল, কিন্তু লোকটি তো সম্মান আর পুরস্কারের জন্য এই কাজ করেনি, সে নিজের মত করে গেছে। ওর মনে হল এটা করা উচিত তাই করেছে।

চীন দেশের জেন্ মাস্টারদের টেক্সট বইতেও একই ধরনের একটা ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাকে নিয়ে কাহিনী সেই লোকটি চীনের খুব প্রত্যন্ত এক গ্রামে থাকত। একবার প্রতিবেশীর সাথে কথা কাটাকাটি হতে হতে লোকটি খুব উত্তেজিত হয়ে তার প্রতিবেশীকে খুন করে দেয়। লোকটি দেখল ধরা পড়লে আমার তো এবার ফাঁসি হয়ে যাবে। লোকটি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে সেখানেও সে কিছু কাজটাজ করতে থাকল। এখানেও লোকটি সবার সুবিধার জন্য একটা সুরঙ্গ তৈরী করতে শুরু করেছে। একটা লোক একা একটা সুরঙ্গ তৈরী করে যাচ্ছে, এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই এখন লোকটিকে দেখতে আসছে – যাকে কোন কাজ দেওয়া হয়নি কিন্তু নিজে থেকে সে একটা সুরঙ্গ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যাকে সে খুন করেছিল তার ছেলেও সেখানে পৌঁছে গেছে। লোকটিকে দেখেই সে তাকে চিনে ফেলেছে। ছেলেটি বলছে ‘তুমি আমার বাবার খুনী, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি’। তখন লোকটি বলছে ‘তুমি অবশ্যই আমাকে খুন করবে, আমি অস্বীকার করছি না যে আমি তোমার বাবাকে খুন করিনি, আমি নিশ্চয়ই দোষ করেছি। তবে এই সুরঙ্গটা শেষ হয়ে যাক, সুরঙ্গটা হয়ে গেলে লোকেদের অনেক সুবিধা হবে। খুব বেশী দিন লাগবে না, এই কটা দিন তুমি এখানেই থেকে যাও। শেষ হয়ে গেলে তুমি আমাকে খুন করে দিও’। ছেলেটি রাজি হয়ে গেছে। এত বছর অপেক্ষা করা গেছে, আর না হয় কটা দিন অপেক্ষা করি। ছেলেটি এবার লোকটির কাজ দেখতে থাকলো, সারাদিন কিভাবে সুরঙ্গ বানিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। লোকটির কাজ দেখতে দেখতে ছেলেটির মন পরিবর্তন হতে

শুরু হয়ে গেছে। একদিন সুরঙ্গটা তৈরী হয়ে গেল। সুরঙ্গ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর লোকটি গিয়ে ছেলেটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি লোকটির পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছে ‘আপনি একজন সত্যিকারের জেন্ মাস্টার, আপনাকে খুন করার চিন্তা করাও আমার পাপ’। লোকটির কাজ দেখতে দেখতে এই কদিনে ছেলেটিরও সিদ্ধি হয়ে গেল। এই হল মানুষের অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। যেখানে সরকার কিছু করতে পারছে না, সমাজ কিছু করছে না, সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে উঠে বলে দিল ‘আমি এই কাজ করবো’। এই বলে সে কাজে নেমে পড়ল। সবাই তাকে দেখে হাসছে, বিদ্রূপ করছে। কিছু দিন পর সবাই বলতে শুরু করবে, লোকটি পারবে। তারপর যখন করা হয়ে গেল তখন এসে বলবে ‘আমি তো প্রথম থেকেই জানতাম ও পারবে’। এটাই সমাজের ভাষা। মানুষের ক্ষমতা অসীম, কিন্তু এই অসীম ক্ষমতা নিয়ে আমরা সামান্যতম কাজটুকুও করতে চাইছি না। একবারও তো আমরা ভাবি না যে, একটা কিছু করলে হয় যাতে সবারই মঙ্গল হবে। আসলে আমাদের ক্ষমতা যেমন অসীম অজ্ঞানটাও তেমনি অসীম, এই অজ্ঞানতা আমাদের সমস্ত ক্ষমতাকে ঢেকে রেখেছে।

চতুর্থ তপস্যা। দীর্ঘ দিন ধরে যদি কোন কিছুর অভ্যাস করা হয় তখন কিছু শক্তি চলে আসবে। মুসলমানরা এক মাস ধরে রোজা করে আর দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়ছে, এটুকুতেই এদের এতো শক্তি। এদের পুরো শক্তিটাই রোজা থেকে আসছে। আর এদিকে নমাজ পড়ছে তাতে মন্ত্রশক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আর রোজাতে তপস্যার শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। উপাসাদি করলেও শরীরে একটা সিদ্ধাই আসে। সবাই মনে করে এগুলো খুব সহজ পথ। কেউ একটা হাত উঁচু করে বা এক পায়ে বারো বছর দাঁড়িয়ে আছে, কেউ গাছের উপর বসে আছে, বিচিত্র বিচিত্র জিনিষ করে যাচ্ছে। এরা তপস্যার আসল জায়গাতে কিছুই করছে না। একটা বিদ্যাকে নিয়ে, একটা দর্শনকে নিয়ে কেউ তপস্যা করতে চায় না। এগুলো হল চমক দেখানো, আমার নাম হবে, লোকে দেখতে আসবে আমি বারো বছর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছি। এগুলোকে রাজযোগ তপস্যা বলছে না। তবে যে কোন তপস্যা করতে গিয়ে প্রথমেই দিকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তারপর আস্তে আস্তে কষ্টটা চলে যায়।

এক ব্যক্তি গঙ্গার ধারে রোজ শুধুমাত্র পয়সা কামাবার জন্য একটা আসনে যোগীবাবা সেজে বসে থাকত। আসনটা কখনই পাল্টাত না। গঙ্গা থেকে স্নান করে যখন কেউ উঠে আসত তখন সে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে রাম রাম করে জপ করত, কখন বা ভজন আরম্ভ করে দিত। লোকেরা ভক্তি করে কেউ আট আনা চার আনা করে কিছু প্রণামি দিয়ে দিত। এই ভাবে সে আট দশ বছর ধরে বস্তার ওপরে আসন করে একাসনে বসে কাটিয়েছে। আর যা টাকা পয়সা পড়ত তাতেই ওর খাওয়া-দাওয়া, নেশা করা সব হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে স্থানীয় কিছু চ্যাংড়া ছেলে একটু চা খাওয়া গল্প গুজব করার উদ্দেশ্যে এর কাছে আসা যাওয়া শুরু করেছে। একদিন উনি একটা ছেলেকে দুটো টাকার একটা নোট দিয়ে লাড্ডু নিয়ে আসতে বললেন। সে ছেলে তো লাড্ডু নিয়ে এসেছে। এই বাবাজী সব সময় হিসেব রাখত কটা চার আনা, কটা আট আনা পড়ছে। আবার কিছুক্ষণ পরে বলছে – আচ্ছা চা নিয়ে এসো। বলে বস্তার তলায় হাত ঢুকিয়েছে, দেখছে আরেকটা দু টাকার নোট। কিন্তু তাঁর পরিষ্কার মনে আছে যে আজকে একটাই দু টাকার নোট পড়েছিল। কিন্তু এখন এই দু টাকার নোটটা কখন পড়ল খেয়াল পড়ছে না। সেই যাই হোক, তখন সে এটাকে তত গুরুত্ব দিল না। পরের দিন ছেলেরা এসে তার কাছে আবার কিছু খেতে চাইছে, সে বস্তার নীচে হাত দিয়েছে, দিয়েই দেখে আবার একটা দু টাকার নোট। এবারে কিন্তু ও আশ্চর্য হয়ে গেছে। এবার সে প্রত্যেক নোটের মধ্যে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখতে শুরু করল। পরের দিন এই রকম একটা চিহ্ন দেওয়া দু টাকার নোট দিয়ে পাঠিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে যখন বস্তার নীচে হাত দিয়েছে দেখছে ওই চিহ্ন দেওয়া নোটটাই ফেরত চলে এসেছে। এটা যে একটা অলৌকিক কাণ্ড বুঝতেই বাবাজীর মধ্যে আতঙ্ক ঢুকে গেল – আমি সিদ্ধাই এর কথা শুনেছিলাম, এতো দেখছি আমার সিদ্ধাই এসে গেছে। যে টাকাটাই আমি খরচা করছি, সেই টাকাটাই ফেরত চলে আসছে। কোথা থেকে চলে আসছে, কিভাবে চলে আসছে সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু এসে যে যাচ্ছে এটা পরিষ্কার। এখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে কি থেকে কি হয়ে যাবে বলা যায় না। সেই রাতেই বস্তাফস্তা গুটিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে চিরদিনের মত ওই জায়গা ছেড়ে উত্তরকান্ধীতে চলে এল। সেখানে গিয়ে পরে তিনি

আবার বড় সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। এটাই তপস্যার ফল। স্কুলে ছাত্রদের এত কড়া ডিসিপ্লিনে রাখা হয়, চুপ করে বসে থাকবে, মন দিয়ে কথা শুনবে, কথা বলবে না, এগুলিই আসল তপস্যা। বাচ্চাদের যত ডিসিপ্লিনে রাখা হবে তত এদের তপস্যা হয়ে যাবে। যত তপস্যা সে করবে ততই তার জ্ঞান অর্জন আর শক্তি বৃদ্ধি হবে।

শেষে বলছেন সমাধির দ্বারাও সিদ্ধি পাওয়া যায়। এই সমাধির অর্থ মনের একাগ্রতা। পতঞ্জলি এখানে যেটাতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তা হল – যে জিনিষগুলো এতক্ষণ বলা হল এগুলো অতি সাধারণ। এগুলোর তত গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল সমাধি। সমাধি থেকে যে শক্তি আসে সেটাই সত্যিকারের শক্তি। জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, যেটাই চাওয়া হোক না কেন, সমাধিতে এই জিনিষগুলির সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা অর্জিত হয়। জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ এগুলিতে যত সিদ্ধিই আসুক না কেন, যে কোন মুহুর্তে আবার পতন হতে পারে। যোগের লক্ষ্য মনের মধ্যে যত রকমের বাসনা আছে, তার থেকে নিবৃত্ত হওয়া। অনেক এসে বলেন ‘আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে’ আর এটাকেই তারা সব কিছু মনে করেন। আমাদের মস্তিষ্কে একটা বিশেষ নার্ভ সেন্টার আছে, সেখানে যদি ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট লাগিয়ে সুইচ অন করে দেওয়া হয় তাহলেও অনেক কিছুর দর্শন হয়ে যাবে, হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণকেই সামনা সামনি দেখতে পারব। জ্যোতি দর্শন করতে চান? এই সুইচটা অন করে দিন, জ্যোতি দর্শন হয়ে যাবে। আবার অনেকে বলছে সুখ-দুঃখের পারে যেতে হবে, তা আফিং খেলে বা গাঁজা খেলে যতক্ষণ নেশা থাকবে ততক্ষণ তো সে সুখ-দুঃখের পারেই চলে যাচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে বাসনার নিবৃত্তিতে। নেশা করে যতক্ষণ বৃন্দ হয়ে থাকে ততক্ষণ সে সুখ-দুঃখের পারে চলে যায়, কিন্তু তার নেশার ঘোরটা কেটে যেতেই আবার তার সুখ-দুঃখ গুলি আরো বেশি মাত্রায় ফিরে আসে। কিন্তু যার একবার সমাধি হয়ে গেছে সেই সত্যিকারের সুখ-দুঃখের পারে চলে যাবে। এতক্ষণ সিদ্ধি পাওয়ার যত উপায়ের কথা বলা হল, এগুলোও এক একটা উপায় কিন্তু মূল পথ হল সমাধি, সমাধি মানে মনের একাগ্রতা।

যোগদর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র হল মনের একাগ্রতা। বাকিগুলোও যোগ অস্বীকার করছে না, ওই উপায়েও সিদ্ধি হবে কিন্তু ওগুলো মন্দের ভালো। কিন্তু সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ হল সমাধি, অর্থাৎ মনের একাগ্রতা। স্বামীজীর মধ্যে যত সিদ্ধি ছিল সবটাই তাঁর সমাধি থেকে, পবিত্রতা থেকেই এসেছিল, সত্যের মুখোমুখি তিনি হয়েছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে যে শক্তি এসেছিলে সেই শক্তিকে তিনি মানব কল্যাণে আর মানুষের আত্মিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারলেন। যদি সত্যিই কেউ এই ধরণের শক্তি লাভ করতে চান তাহলে তাঁকে সমাধির জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের পথে যেতে হবে। সমাধির শক্তি দিয়ে আপনি যা কিছু পেতে চান, সবটাই পেতে পারেন। ঠাকুর কেশব সেনের নামে বলছেন ‘কেশবের ধ্যানটুকু ছিল বলে তাঁর এত নাম-যশ’। স্বামী ভূতেশানন্দজীও সাধুদের বার বার বলতেন ‘ধ্যান কর, ধ্যান করে যাও’। যারা ধ্যান করতে পারবে না তারা জপ করবে, শ্রীমা তো বলেই দিয়েছেন জপাৎ সিদ্ধি। দীক্ষামন্ত্রের উদ্দেশ্যও হল যাতে মনকে একাগ্র করা যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত একাগ্রতা ছাড়া কিছুই হয় না। জন্মগত যাদের সিদ্ধি তাদেরও মন খুব একাগ্র, ঔষধ দিয়েও যখন সিদ্ধি আসছে তখনও মনকে একাগ্র করতে হচ্ছে, মন্ত্র দিয়েও একই জিনিষ করা হচ্ছে আর তপস্যা দিয়েও মনকে একাগ্র করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সব কিছুই গৌণ হয়ে যায় একমাত্র একাগ্র বা সমাধিই হল মুখ্য।

যোগের মতে ক্রমবিবর্তন যেভাবে হয়

এত কথা বলার পর পতঞ্জলি এখন সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে এসে যোগের মতে ক্রমবিবর্তন কিভাবে হয় বলছেন – **জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥২॥** এখানে জাতি মানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নয়। জাতি মানে জীব জগতে যত রকম প্রাণী আছে তাদের যোনির কথা বলা হচ্ছে। এর আগে বলা হল জন্ম, মন্ত্র, তপস্যা ইত্যাদির দ্বারা সব রকমের সিদ্ধি বা শক্তি আসতে পারে। এবার এই জন্ম জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের জাতি, প্রজাতির সমাবেশ। কিন্তু একটা জাতি

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি জাতিতে কিভাবে জন্মান্তরের মাধ্যমে পরিণাম প্রাপ্ত হয়? সব প্রাণীরই শরীর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আরেকটা শরীরে জন্ম নিচ্ছে, শুধু তাই নয়, যোনি থেকে যোনিতে পাল্টে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনটা কি করে হয় আর কেন হয়? তখন যোগ বলছে প্রকৃত্যাপূরাৎ। হিন্দুদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম থেকে সব থেকে বড় আর অতি সাধারণ যে অভিযোগ করা হয় তা হল, মানুষ আবার কেন আর কিভাবে বাঘ, ঘোড়া, গরু, বেড়াল হয়ে জন্মাবে। এই সূত্রে পতঞ্জলি তারই জবাব দিচ্ছেন। একটা জাতি থেকে আরেকটা জাতিতে যে বিবর্তন হয়, সেখানে মানুষ থেকে আবার কেন সে পশু হয় তাতে তিনি বলছেন – প্রকৃত্যাপূরাৎ, তার প্রকৃতির আপূরণের দ্বারাই। ভাষ্যকাররা এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেন। এখানে আমরা দু ধরণের ব্যাখ্যা পাই। প্রকৃতি যখনই কোথাও খালি স্থান পাবে সেখানে প্রকৃতি তার তন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূত দিয়ে সে সেই খালি জায়গাটা ভরাট করে দেবে, প্রকৃতি কখনই তার এলাকায় খালি কিছু থাকতে দেবে না। এটা গেল বহিঃপ্রকৃতির ক্ষেত্রে। কিন্তু পতঞ্জলি আসলে বলতে চাইছেন অন্তঃপ্রকৃতির কথা। পরের সূত্রে, যেটা আমাদের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এই জিনিষটাকে আরো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বলছেন – **নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃतीনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।।৩।।** স্বামীজী এই সূত্রের অনুবাদে বলছেন – সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়। এখানে প্রকৃতি মানে অন্তঃপ্রকৃতি, বহিঃপ্রকৃতির কথা বলা হচ্ছে না। যদি ভালো কিছু করা হয় তাতে যে প্রকৃতি ভালো হয়ে যাবে তার কোন মানে নেই, আবার বাজে কাজ যদি করা হয় তাতেও প্রকৃতি খারাপ হয়ে যাবে তারও কোন মানে নেই। কিন্তু এই ধরণের কর্ম অন্তঃ ও বহিঃপ্রকৃতির বিবর্তনের পথে যে বাধাগুলো রয়েছে সেগুলোকে অপসারিত করে। প্রকৃতি যখন বিবর্তিত হতে থাকে, প্রকৃতির সামনে তখন কতকগুলি বিঘ্ন থাকে, সৎ ও অসৎ কর্ম এই বাধাগুলোকে সরিয়ে দেয়। এই একটি সূত্র যোগদর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। এখানে পতঞ্জলি মূলতঃ বলতে চাইছেন – আপনি যদি ভালো কিছু করেন তাই বলে যে আপনি ভালো হয়ে যাবেন তা নয়, আর বাজে কিছু কাজ করছেন বলে যে আপনি খারাপ হয়ে যাবেন তাও নয়। যখন বৃষ্টি হয় তখন গ্রাম দেশে চাষীরা কোন উঁচু জমিতে চারিদিকে আলের বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জলকে ধরে রাখে। যখন তার চাষের জন্য ক্ষেতে জলের দরকার হয় বা যখন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে অনেক জল এসে জমা হয় তখন ওই জমির আলটাকে একটু কেটে দেয়, আলটা কেটে দিলে জলটা তখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে বেরিয়ে ক্ষেতে চলে আসে – এটাকেই পতঞ্জলি এখানে বলছেন ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। ডিভিসির জলাধারে বর্ষাকালে যখন প্রচুর জল এসে জমা হয় তখন বাঁধকে বাঁচাবার জন্য বাঁধের লকগেটগুলো খুলে দিয়ে কিছু জল বার করে দেওয়া হয়। প্রকৃতিও ঠিক তাই করে। যখনই প্রকৃতির কোথাও over crowding হয়ে যাবে তখনই তার প্রজাতিগুলো পাল্টে যাবে। এখন যে এত জনসংখ্যা বাড়ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রজাতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে, এখানে কিছু করার নেই। যেমন একটা সময় পৃথিবীতে ডাইনোসার প্রজাতি এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে তাতে তাদের খাদ্য সংকট দেখা দিল। এরা তখন এক অপরকে খেতে শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃতি তখন ডাইনোসারের প্রজাতিটাই পাল্টে দিল।

প্রজাতি কুলের এই পাল্টে যাওয়া নিয়ে দুটো মত আছে। প্রথমে আমাদের ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ক্ষেত্রিক মানে চাষী। ক্ষেতে জল বেশী জমে গেলে চাষী ক্ষেত্রের আলটা একটু কেটে দেয়, আর ওখান দিয়ে জলটা অন্য ক্ষেতে পাঠিয়ে দিল, তাতে ক্ষেতের জল সমান সমান হয়ে গেল। আরও জল আসছে, তখন আরেকটা দিক কেটে দিয়ে আরেকটা ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিল। আমরা যে এই প্রজাতির পরিবর্তনের কথা বলছি, এই পরিবর্তনের দুটো মত পাওয়া যায়, ঠিক ঠিক বলতে তিন রকমের মত এসে যাবে। একটা হল খ্রিষ্টানদের মত, খ্রিষ্টানদের মতে ভগবান যাকে যেভাবে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন তাকে সেইভাবেই থাকতে হবে। ভগবান মানুষকে মানুষ করে পাঠিয়েছেন সে মানুষই থাকবে, মশা মশাই থাকবে। দ্বিতীয় মত ডারউইনের মত। ডারউইনের অনেক রকম থিয়োরি আছে, যেমন survival of fittest, যৌন নির্বাচন ইত্যাদি নানা রকমের থিয়োরি আছে। পাশ্চাত্যের অনেক

বিজ্ঞানীই ইদানিং ডারউইনের মতকে মানছেন না, আমেরিকাতে অনেক স্টেট ইউনিভারসিটি আছে যেখানে ডারউইনের থিয়োরি পড়ানই হয় না। ইদানিং যাঁরা মলিক্যুলার বায়োলজি নিয়ে প্রচুর কাজ করছেন তাঁরা ডারউইন যেভাবে থিয়োরী দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে না মানলেও Genetic Evolutionকে মানছেন। আসলে Genetic Evolution এটাও একটা শব্দ মাত্র। সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানেও দুটো থিয়োরী চলে, একটা হল বিগ ব্যাঙ, আরেকটি Steady State থিয়োরী। ফ্রেড হল (Fred Hoyle) যিনি Steady State দিয়েছেন, তিনি ডারউইনকে একেবারেই মানতেন না। উনি বলছেন ‘ডারউইনের থিয়োরী যদি সাধারণ ভাষায় বুঝতে চাও তাহলে ব্যাপারটা এই রকম হবে – ধর একটা ছোট বাগান আছে, আর বিরাট বড় একটা ঝড় উঠেছে, প্রচণ্ড জোরে ঝড় হচ্ছে। এবার ঝড় থেমে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ওই ছোট বাগানে একটা বিশাল জেট প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। এই প্লেনটা কোথা থেকে এসে গেল? এই যে ঝড় হচ্ছিল যার ফলে নানা রকমের পার্টিকেলস্ গুলো নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ হতে হতে organized হয়ে গেল, যেমন কিছু জিনিষ স্টীল হয়ে গেল, কিছু স্টিয়ারিং হুইল হয়ে গেল এইভাবে একটা পুরো জেট প্লেন হয়ে গেল’। হলের মত ডারউইনের Evolution Theory পুরোপুরি এই রকমই।

বিজ্ঞানীদের নিয়ে এই এক সমস্যা, ওনারা কিছু দিন পরে পরেই একটা করে নতুন থিয়োরী বাজারে ছেড়ে দিচ্ছেন। কিছু দিন পর যেমনি দেখা যাবে এটা খাপ খাচ্ছে না, তখনই তাঁরা ডান দিক বাম দিক করতে শুরু করে দেন। ডান দিক বাম দিক করতে করতে এমন একটা থিয়োরী নিয়ে আসবেন যেটা কেউই বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, evolution তো হবেই, আমিও evolutionকে মানছি, মানুষের যদি evolution নাই হয় তাহলে মানুষ মুক্তির দিকে যাবে কি করে! স্বামীজী শূদ্র জাগরণের কথা বললেন, আজকে আমরা দেখছি পঞ্চাশ বছর আগে যারা সমাজের একেবারে নীচে পড়েছিল আজকে তারা রাজা হয়ে বসে যাচ্ছে। বিকাশ যদি না হত তাহলে কি করে এটা সম্ভব হত! ক্রমবিবর্তন, ক্রমবিকাশ এগুলো আছেই, সবাই মানছেও।

আমাদের কাছে, বিশেষ করে সাংখ্যের কাছে ব্যাপারটা অতি সাধারণ, ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। যেমন একটা প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে গেছে, এবার সেটাকে পাল্টে অন্য প্রজাতি আসবে। এটাকেই ডারউইন অনেকগুলো থিয়োরী দিয়ে, যে যে কারণে প্রজাতি পাল্টাচ্ছে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু যোগদর্শনের মতে বলছে, প্রকৃতি নিজে থেকেই এই রকম করে। জনসংখ্যা বাড়লে কিছুই হবে না, একটা প্রজাতি পাল্টে অন্য প্রজাতি চলে আসবে।

যোগদর্শন ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ শুধু প্রজাতি গুলোকে নিয়েই বলছেন না। আমাদের ভেতরের যে প্রকৃতি, যাকে আমরা অন্তঃপ্রকৃতি বলছে, তার সাথেও এর পুরো যোগ রয়েছে। স্বামীজী বলছেন, আপনার মনের ভেতরে, আপনার সূক্ষ্ম শরীরের ভেতর ভালো মন্দ সব কিছু দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে, কিন্তু সবটাই দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে। ভালোটাও আটকে আছে, মন্দটাও আটকে আছে। যেমন আস্তাবলে ঘোড়াগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে। আস্তাবলের দরজা খুলে দিলে ঘোড়াগুলো দৌড়াতে শুরু করে দেবে। গোশালার দরজা খুলে দিলে গরুগুলো দৌড়াতে শুরু করবে। জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, আর তার গায়ে দশটা কল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন যেমন যেমন কলগুলি খুলে দেবে তেমন তেমন সেখান দিয়ে জল বেরোতে থাকবে। আমাদের ভেতরে ভালো মন্দ যা কিছু আছে সবটাই দরজা বন্ধ করে আটকে রাখা হয়েছে। যেমন যেমন যে যে দরজা খুলে দেওয়া হবে সেই সেই দ্বার দিয়ে সেই সেই জিনিষগুলো বেরোতে শুরু করে দেবে।

আমাদের জীবনে যত রকম সাধনা, লড়াই, পরিশ্রম যা কিছু আছে সবটাই নেগেটিভ। নেগেটিভ এই অর্থে, এতে নতুন কিছু ভেতর জমা হয় না। তাহলে এত লড়াই, সাধনা করে কি হয়? যেগুলো আগে থেকেই ভেতরে আছে সেগুলোকে বেরোবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সাধনা মানেই কপাটের অর্গল খুলে দেওয়া। খ্রিস্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে সাধনা মানে ভেতরে একটা কিছু ভরে দেওয়া। যখন মন্ত্র জপ করছে তখন ভাবছে ভেতরে মন্ত্র দিয়ে ভর্তি করে দিচ্ছি। কিন্তু মন্ত্র জপ করে আমি

ভেতরে কি ভর্তি করবো, আমি তো আগে থেকেই পূর্ণ হয়ে আছি, পূর্ণতাই তো আমার অন্তর্নিহিত ভাব, আমি তো সেই পূর্ণরক্ষ, আমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার মধ্যে নতুন করে ভরে দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমার শুদ্ধ সত্তার উপর একটা আবরণ পড়ে আছে। সাধনা মানে এই আবরণকে টেনে ছিঁড়ে সরিয়ে দেওয়া। সরিয়ে দিলে আসল জিনিষটা বেরিয়ে আসবে। আমাদের ভেতরে যা কিছু ভালো রয়েছে সবটাই মন্দ দিয়ে আটকানো আছে। মন্দটা কোন রকমে টেনে সরিয়ে দিলে ভালোটা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে। ঠিক তেমনি আমাদের ভেতরে মন্দ যা কিছু আছে সেটা ভালো দিয়ে আটকানো আছে। আমরা সবাই কোন না কোন সময়ে কাউকে না কাউকে বাজে কথা বলেছি, গালাগাল দিয়েছি কিন্তু এখন এখানে বসে শাস্ত্র কথা শুনছি, কাউকে গালাগাল বা মন্দ কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কেন ইচ্ছে করছে না? কারণ আমাদের ভেতরের নোংরামো গুলো এখন ভালো দিয়ে আটকানো আছে। শাস্ত্র কথা শোনার পর এখন থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে গিয়ে সামান্য কোন কারণে একজনকে দুটো খারাপ কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ব না। ভালোটা সরে যেতেই এখন মন্দটা বেরিয়ে এসেছে। যোগদর্শনের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত – তোমার ভালো-মন্দ কোনটাই বাইরে থেকে আসে না, সব কিছু তোমার ভেতরেই বসে আছে। যে অর্গলটা খুলে দেবে তার বিপরীত জিনিষটা বেরিয়ে আসবে, তার মানে বাজেটা যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে ভালো জিনিষগুলো হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসবে আর ভালোটা খুলে দিলে বাজে জিনিষ সব হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে। সাধনা করা মানে, বাজেটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া। তাতে কি হবে? ভালো যেটা আটকে আছে সেটা বেরোতে শুরু করবে। আমাদের ভালোর চরম সীমা হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান আটকে আছে অবিদ্যা দিয়ে, জগতের নানা জিনিষের প্রতি আকর্ষণ দিয়ে। সাধনা করে এই অবিদ্যা, জগতের প্রতি আকর্ষণটা সরিয়ে দিলে ভেতরে যে পূর্ণ সত্তা রয়েছে, ভেতরে যে পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, সব কিছু হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে।

এখানেও সেই কর্মশায়ের কথাই বলা হচ্ছে। যখন কোন সৎ কাজ করল তখন একটা বিশেষ বাধা অপসারিত হয়ে গেল, কর্মশায় থেকে ওই সৎ কার্যের মাধ্যমে হুড়মুড় করে কিছু কর্মফল বেরিয়ে গেল। আবার যখন বাজে কাজ করছে তখনও আবার হুড়মুড় করে কিছু কর্ম বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যা কিছু আছে, আগে থেকেই সব কর্মশায়ে জমা আছে। যখন ভালো কাজ করছেন তখন ভালো যেগুলো জমা আছে সেগুলো বেরিয়ে আসবে, যখন বাজে কাজ করছেন তখন বাজে যেগুলো জমা আছে সেগুলো বেরোবে। এটা কখনই ঠিক নয় যে বাজে কাজ করেছে বলে বাজে ফল পাচ্ছে, যত ধরণের বাজে জিনিষ ভেতরে জমা আছে সেগুলোই বেরিয়ে আসে। একজন সাধু যদি একটা ভুল কিছু করেন, তাতে কি তাঁর খারাপ কিছু হবে? কিছুই হবে না, কেননা তার বাজে জিনিষ ভেতরে কিছুই নেই, কিছুই বেরোবে না। আবার অনেকে বলে যা ভালো কাজ করি কিছুই হয় না, উল্টে বদনাম হয়ে যায়। ভেতরে তার এত গোলমাল জমে আছে, কর্মশায়ের সব গোট গুলো খুলে দিলেও ভালো কিছুই বেরোবে না। তা কত দিন এই রকম চলবে? যত দিন কর্মশায়ে নতুন কর্ম না জমবে। আগে আগে যত সৎ কাজ বা অসৎ কাজ করেছে, সব এই কর্মশায়ে সংস্কার রূপে জমা আছে। যে মুহুর্তে ভালো কোন কাজ করতে যাবে তখন আগের সব ভালো কর্মগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসবে। আবার যখন খারাপ কিছু করতে যাবে তখন সব বাজে জিনিষ গুলো ঠেলে বেরিয়ে আসবে।

হিন্দু ধর্মের ভাবধারা অনুযায়ী বহিঃ প্রকৃতির কোন মূল্য নেই, অন্তঃ প্রকৃতিই আমাদের আসল জায়গা। সব থেকে মজার ব্যাপার হল বিজ্ঞান আর হিন্দু ধর্মে প্রকৃতি শব্দের অর্থ এই দু ভাবেই করা হয় – প্রকৃতির ইংরাজী শব্দ nature যার অর্থ একজনের স্বভাবও হতে পারে আবার প্রকৃতি এই অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেই আমরা পাই – Education is the manifestation of the perfection already in man, এখানে স্বামীজী বলতে চাইছেন সবার মধ্যে আগে থেকেই সর্বপ্রকার উন্নতি, জ্ঞান ও শক্তি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে না কেন? এটাই এখানে পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে। হিন্দুধর্মের চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি ঠিক ঠিক বুঝতে হলে এই জায়গাটাকে খুব মন দিয়ে বুঝতে হবে। স্বামীজীর কাছে manifestation of the perfection খুব important term ছিল। Perfection মানে পূর্ণতা। পূর্ণতা মানে? যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি পূর্ণ, তিনিই

সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনিই সৎ, তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ। আমাদের ভেতরেই সব জ্ঞান, আমাদের ভেতরেই সব আনন্দ। কিন্তু আমাদের আনন্দের উপরে একটা স্টপার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিসের স্টপার? ছেলের মেয়ের অবাধ্যতার জন্য অশান্তি, তাতে কপাট বন্ধ। এখন দুটো উপায় আছে ছেলেমেয়ে যদি ভালো হয় তাহলে কপাট আবার খুলে যাবে, আর যদি ছেলেমেয়েকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেন তাহলে হয়তো কপাট খুলে যেতে পারে, আর ছেলেমেয়েকে যদি মন থেকেই সরিয়ে দেন তখন আপনার কপাট খুলে গেল। তখন সবাই আপনাকে দেখে বলবে ‘আরে! তোমার ছেলেমেয়ে এত অবাধ্য তাও তুমি এতো নিশ্চিন্তে আনন্দে থাকো কি করে!’

পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ চিন্তাবিদরা আমাদের মস্তিষ্ককে একটা পরিষ্কার ব্ল্যাক বোর্ডের সঙ্গে তুলনা করেন। শিশু যখন জন্ম নেয় তখন পরিষ্কার একটা ব্ল্যাক বোর্ড নিয়ে সে জন্ম নিচ্ছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যত বাইরের কর্ম জগতে জড়িয়ে পড়তে থাকবে, যত বাইরের জিনিষ ভেতরে প্রবেশ হতে থাকবে ততই তার মস্তিষ্ক সক্রিয় হতে থাকে। বিদেশে স্বামীজী যখনই সুযোগ পেতেন তখনই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের এই উদ্ভট ধারণার তীব্র সমালোচনা করতেন। হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য অনুযায়ী সমস্ত জ্ঞান, এমন কি আত্মজ্ঞানও আমাদের মধ্যে আগে থাকতেই বিদ্যমান। হিন্দুরা বলবে ভগবান তোমার মধ্যেই অনন্তকাল ধরে রয়েছেন। যদি কেউ ক্ষমতা, শক্তি, বল পেতে চায়, তখনও হিন্দুধর্ম বলবে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত পূর্ণতা তোমার মধ্যে আগে থাকতেই রয়েছে।

কাউকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির কথা যখন হয় তখন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা বলবেন – তাকে বিভিন্ন তথ্য দাও, সেই তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণ কিভাবে করবে বলে দাও, কিভাবে এগুলো কাজ করে সেটা অবগত করাও। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ঋষি এবং মণীষিরা বলবেন – গুরু সেবা কর আর গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর। এই করতে করতে গুরু তাকে হয়তো দু চারটে মূল বাক্য বলে দিলেন, ওতেই শিষ্যের সমস্ত জ্ঞান হয়ে যেত। এটাই ছিল আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদানের পদ্ধতি। কারণ যে জ্ঞান আমরা লাভ করব, সেই জ্ঞান আমাদের মধ্যে আগে থাকতেই রয়েছে, কিন্তু তার উপর একটা আবরণ পড়ে আছে। একটা হাজার ওয়াট বাতের বাইরে দিয়ে একটা পাতলা কাঁচ লাগিয়ে দেওয়া হল, ওই কাঁচের ওপরে আরেকটা কালো কাঁচ লাগিয়ে দেওয়া হল এবারে ওই কালো কাঁচের ওপর দিয়ে একটা জাল দিয়ে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেওয়া হল, এই ভাবে একটার পর একটা অনেক গুলি আবরণ দিয়ে ঢাকা দেওয়ার পরও হয়তো একটু একটু ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। এবার ওই হাজার ওয়াট বাতের আলোকে বাইরে কী করে প্রকাশিত করা যেতে পারে? পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে ওখানে আরেকটা আলো জ্বালিয়ে ওই আলোটাকে আলোকিত করতে হবে। পতঞ্জলির মতে ভারতীয় দার্শনিকরা বলবে – না না, ওখানে আর আলো জ্বালাবার প্রয়োজন নেই, ওর মধ্যেই আলো রয়েছে, শুধু যে আবরণ গুলি ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো সরিয়ে দাও তাহলেই প্রকৃত আলোটা পেয়ে যাবে। এখানে আবরণগুলিই সংস্কার, ভালো-খারাপ সংস্কার সবই কর্ম রূপে আমাদের পূর্ণতা, আমাদের পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, সব কিছুকে ঢেকে রেখেছে। ভালো সংস্কারগুলি যেন স্বচ্ছ কাঁচের বা সাদা কাপড়ের আবরণ, খারাপগুলো কালো পর্দার আবরণ। খারাপ সংস্কারগুলো আলোকে বাইরে আসতে দিচ্ছে না। ভালো সংস্কার যা আছে সেটাও আলোকে বাইরে আসতে বাধা দিচ্ছে কিন্তু যেহেতু এর ধর্ম স্বচ্ছতা তাই কিছু আলো আবরণ ভেদ করে বাইরে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

স্বামীজী উপমা দিয়ে বলছেন – চাষী তার জমি তৈরী করে রেখেছে, জলও জমানো আছে, এখন অন্য ক্ষেতে জল নিয়ে যেতে হবে, কি করবে সে? যে আল দিয়ে জলকে আটকে রাখা হয়েছে সেগুলোকে ভেঙ্গে দিতে হবে। এখন এই বাধা গুলো অপসারিত করলে জল তার নিজের গতিতেই বেরিয়ে যাবে, চাষীকে আর কিছু করতে হবে না। ঠিক সেই রকম আমাদের ভেতরে আগে থাকতেই পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, সেটাকে বাইরে আসার রাস্তা করে দিতে হবে, তাই জ্ঞান কখনই বাইরে থেকে আসে না।

সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হল ঠাকুরের জীবন। ঠাকুর প্রচণ্ড সাধনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার কিছুই জানতে না, আধ্যাত্মিকতার চরম সত্যকে জানতেন না, শুধু চোখের জল ফেলতে ফেলতে

মার কাছে প্রার্থনা করতেন, আর তাতেই আধ্যাত্মিকতার যা কিছু আছে সবই তিনি উপলব্ধি করে নিয়েছিলেন। পরে তিনি জানলেন যে এই এই ভাবে সাধনা করলে এই এই জিনিষ পাওয়া যায়। নিউটন, আইনস্টাইন বিজ্ঞানের যত নতুন নতুন তথ্য নিয়ে এলেন, এগুলো আগে থেকে তাঁদের ভেতরেই ছিল। জগতের যত ধরণের জ্ঞান আছে তা আমাদের ভেতরেই আছে। নিজের প্রকৃত স্বরূপের যখন সন্ধান করতে পথে নামবে তখনই এই ভেতরের জিনিষগুলি বেরোতে শুরু করবে। এই রুদ্ধ কপাট গুলোকে খুলতে হবে। পূর্ণতা আমাদের অন্তর্নিহিত ভাব, কিন্তু অর্গল দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। অর্গলটাকে ভাঙতে হবে।

আমরা যাকে খারাপ লোক মনে করছি, তার যে ভালো গুণগুলো এই ভাবে আটকানো আছে, এখন যদি কোন রকমে এই বাধাটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে সব ভালো গুণগুলো বেরিয়ে আসবে, খ্রীশ্চানিটিতে একে বলা হয় sudden conversion, হঠাৎ সিদ্ধ। লালা বাবুর যেটা হয়েছিল, একটা কথা শুনতেই তাঁর সেই অর্গলটা ভেঙ্গে গেল, তক্ষুণি সব জমিদারি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। তাঁর মধ্যে এই ভাবটা আগে থাকতেই চাপা ছিল। আমার আপনার ভেতরে সুপ্ত সিংহ বসে আছে, খাঁচাটা খোলা পেলেই সে বেরিয়ে পড়বে। এই কারণেই বলা হয় দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের জীবনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আমরা কার সঙ্গে মিশছি, কার সঙ্গে বেশি কথা বলছি, কি ধরণের বই পড়ছি, কি ধরণের মুভি দেখছি এগুলোর উপর নির্ভর করছে আমাদের কোন ধরণের বাধাটা খুলবে।

আমাদের মনে হতে পারে তাহলে কর্মের প্রবাহ এভাবে তো চলতেই থাকবে, কোন দিনই এর থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না – ভালো কাজ করলে ভালো সংস্কারগুলি বেরোবে আর খারাপ কাজ করলে খারাপ সংস্কার গুলো বেরোবে আর এই সংস্কারের ফলে যে কর্ম করা হবে সেটাও আবার বীজাকারে ভেতরে পরবর্তী কালে বেরোবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। যোগ বলবে – হ্যাঁ এই রকমই চলতে থাকবে। কিন্তু ভালো কাজে, সৎ কাজে হয় কি, মানুষ নিজেকে আরো উন্নত করার সুযোগ পেয়ে যায়। এইভাবে উন্নত হতে হতে কোন রকমে যদি একবার নির্বীজ সমাধিটা পেয়ে যায় তাহলে যত সংস্কার বীজাকারে জমে আছে সবই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। তখন আর তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। এই কারণে অসৎ সঙ্গ থেকে সব সময় অনেক দূরে থাকতে বলা হয়। স্বামীজী এখানে বলছেন – *ধার্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্যমাত্র – কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দেওয়া, জন্মগত অধিকারস্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া – পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব।* আমরা যখন ভক্তির অনুশীলন করছি, জপ করছি, শাস্ত্র পাঠ করছি, এগুলো আর কিছুই করবে না, শুধু আমাদের ভেতরে যে পূর্ণতা আগে থাকতে রয়েছে সেটাকে যে অর্গলের দ্বারা আটকানো রয়েছে সেই অর্গলটাকে ভাঙতে থাকে।

স্বামীজী এই সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইনের ক্রমবিকাশের থিয়োরি নিয়েও আলোচনা করছেন। স্বামীজীর সময়ের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা ডারউইনের Theory of Evolution, যৌন নির্বাচন ও যোগ্যতমের উজ্জীবন, এগুলিকে খুব বেশি প্রাধান্য দিত। কিন্তু স্বামীজী এই মতবাদকে একেবারে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে বললেন ডারউইনের তত্ত্ব একটি অসম্পূর্ণ তত্ত্ব। স্বামীজী সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে এর অযৌক্তিকতাকে প্রমাণ করে বললেন – মনে করা যাক মানুষের জ্ঞান এতদূর উন্নত হল যে তার ফলে এমন একটা সমাজ সৃষ্টি হল সেখানে আর কোন শরীর ধারণ আর সঙ্গী নির্বাচনের প্রতিযোগিতাই থাকল না, তাহলে সেই সমাজ বা জাতির কি পরিণতি হবে? ডারউইনের মত অনুযায়ী এই জাতির আর কোন উন্নতি হবে না। কিন্তু স্বামীজী বলছেন মানুষের জীবন থেকে সমস্ত রকম প্রতিযোগিতাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাও মানুষ জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কারণ শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসাটাই মানব জাতির একমাত্র লক্ষ্য নয়। যেমন ধরুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি কি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এত কবিতা, গান রচনা করেছিলেন? কখনই নয়। কিন্তু বাচ্চা বয়সে পরীক্ষায় কোন প্রবন্ধ লিখতে দিলে আমরা সব সময় ভাবতাম বন্ধুদের থেকে যেন

আমি বেশী নম্বর পাই। এগুলোকে আধার করেই ডারউইন নিজের সিদ্ধান্ত তৈরী করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ এনারা কখনই প্রতিযোগিতার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতেন না। তাহলে ওনারা এত শ্রেষ্ঠ রচনা লিখছেন কি করে? কারণ মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতার স্বভাব, সেই পূর্ণতাকে যে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে, সেই অজ্ঞান সরে যাওয়াতে এখন সব কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সব সময় যে মানুষ সব কিছু প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে করে তা নয়, তার মনে হয় আমি এর থেকেও ভালো পারবো। তবে সিনেমার হিরো হিরোইনরা যে বলে I am my biggest competitor, এগুলো এরা না বুকেই বলে থাকে। কিন্তু কথাটা বলছে ঠিকই, আমরা সবাই সবার নিজেরই প্রতিযোগী। তবে প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিযোগী হয় না। তার মনে হয়, আমি আরও সুন্দর ভাবে করতে পারবো। সে কখন ভাবে না যে এই রচনা আমার আগের রচনা থেকে ভালো হবে কি মন্দ হবে। তার শক্তির প্রকাশ, মনের উৎকর্ষতার প্রকাশ এগুলো প্রতিযোগিতার অংশ নেওয়ার জন্য আসে না, এগুলো তার ভেতর থেকেই আসে। স্বামীজী এটাই বলছেন, মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্ব অনবরত সংগ্রাম করছে এই বাধাকে অপসারণ করে বেরিয়ে আসার জন্য, এই জাগতিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যাথা নেই।

লগুনে একবার একটা খুব মজার পরীক্ষা হয়েছিল। একটা গোলকধাঁধা বানিয়ে তার মধ্যে এক প্রান্তে কিছু চীজ রেখে দেওয়া হয়েছিল। এবারে অন্য প্রান্ত থেকে কিছু ইঁদুরকে ছেড়ে দেওয়া হল দেখার জন্য যে তারা কোন সহজ রাস্তা বার করে ওই চীজের কাছে পৌঁছাতে পারে কিনা। তারপরে দেখা গেল তিন চার বার চেষ্টা করে তারা খুব কম সময়ে এবং সব থেকে কম দূরত্ব অতিক্রম করে চীজের কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হল। কিছু সময়ের পরে চীজ দেওয়াটা বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর দেখা গেল ইঁদুর গুলো এরপর আরো কয়েকবার গেল, তারপর আন্তে আন্তে তারা যাওয়া বন্ধ করে দিল। চীজ যখন আর পাওয়া যাচ্ছেনা তাদের আগ্রহও চলে গেল। পরীক্ষাটাকে সমাপ্ত করবার জন্য হেজ্ দিয়ে বড় আকারে একটা গোলকধাঁধা বানানো হল। এরপর ঘোষণা করা হল যে ব্যক্তি যত কম দূরত্ব অতিক্রম করে ওই প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে তাকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। দেখা গেল সকাল থেকেই লোকজন জড়ো হয়ে চেষ্টা করতে আরম্ভ করল – কে ওই প্রান্তে কম সময়ে সব থেকে কম দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছাতে পারে। যেভাবে ইঁদুরের উপরে পরীক্ষা করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে এবার মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগল। পাঁচ দিন পর ওই পাঁচ পাউণ্ডের পুরস্কারটা তুলে নেওয়া হল। যার ইচ্ছে হবে সে নিজে থেকে চেষ্টা করতে পারে। দেখা গেলে আগেও যত লোক আসছিল এখনও ঠিক সেই তত লোক এসে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইঁদুরের ক্ষেত্রে যখন প্রাইজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ইঁদুরদের উৎসাহ হারিয়ে গিয়েছিল। আর মানুষের ক্ষেত্রে উৎসাহ বজায় রইল।

এই পরীক্ষার ফলটা গিয়ে ডারউইনের থিয়োরীকে বিরাট ধাক্কা মারল। ডারউইন বা কার্ল মার্ক্সদের বক্তব্য হল মানব জাতির লক্ষ্য জাগতিক উন্নতি, আর এরই জন্য মানুষ লড়াই করছে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। কিসের জন্য লড়াই? কিসের জন্য প্রতিযোগিতা? কারণ মানুষ কিছু পেতে চাইছে। কি পেতে চাইছে? শারীরিক, মানসিক সুখ, যে সুখ জাগতিক বস্তুকে কেন্দ্র করে আসবে। কিন্তু ভারতের মুনি-ঋষিদের মতে ক্রমবিকাশ বা পরিণামবাদের মূল রহস্য হল প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে পূর্ণতা অন্তর্নিহিত আছে, তারই বিকাশ মাত্র। কিভাবে বিকাশ হবে? বিভিন্ন ভাবে হবে, দুই প্রকৃতি, অন্তর আর বাইরের প্রকৃতিকে জয় করে বিশ্বরক্ষাণের নিয়ন্তা হয়ে যাবে। ঠাকুরের জীবনে আলোকপাত করলে দেখা যাবে ঠাকুরের জীবনে কোন ধরণের প্রতিযোগিতাই ছিল না। কিছুই নেই, তবুও তিনি একটার পর একটা সংগ্রাম করে গেছেন। ডারউইন, হেগেল, মার্ক্স এরা ভারতের সমাজকে কোন দিন দেখেইনি, আমাদের মুনি ঋষিদের কথা এনারা কোন দিন শোনেইনি, ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই।

অহংভাব থেকে নির্মাণচিত্ত ও ব্যুৎকায় সৃজন

পরের সূত্রে যোগের অন্য একটা তত্ত্বকে পতঞ্জলি নিয়ে এসেছেন – *নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ* 11811 এতক্ষণ বাধাগুলি সরে যাওয়ার পর কীভাবে কর্মশায় থেকে সংস্কারগুলি বেরিয়ে আসে বলা হয়েছে। এখান থেকে সরে এসে পতঞ্জলি এখন আবার মনকে নিয়ে বলছেন – এই মন কোথা থেকে জন্ম নেয়? মন জন্ম নেয় অহঙ্কার থেকে। অহঙ্কার মানে অস্মিতা, যে জায়গাতে পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগ হয় অর্থাৎ পুরুষ যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম বোধ করে, অস্মিতা মানে identification। আমি এদের এরা আমার এটাই অস্মিতা। অবিদ্যা মানে পুরুষের সামনে একটা পর্দার আবরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন পর্দার আবরণের জন্য পুরুষ তাঁর নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গেল। এখান থেকে তার মধ্যে এসে গেল অস্মিতা। এই অস্মিতা থেকেই জন্ম নিচ্ছে মন। যোগীরা যখন এই অস্মিতাকে ধরে ফেলেন তখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে একটা নতুন মন সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম হয়ে যান। যখন নতুন মন তৈরী করে নেওয়ার ক্ষমতা এসে যায় তখন সেই মন দিয়ে তাঁরা নতুন একটা শরীরও বানিয়ে নিতে পারেন। এরপর সেখান থেকে যোগী আরও একটা তৃতীয় মন তৈরী করে নিল, এইভাবে তিনি যত খুশি মন বানিয়ে নিতে পারেন, আর সেই মন দিয়ে তিনি একাধিক শরীর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, আপনার আমার জন্য নয়, সব নিজের জন্য। যোগী কিন্তু অপরের জন্য মন বা শরীর দাঁড় করাতে পারবেন না, সবই নিজের জন্য করতে পারবেন। এই ভাবে শরীর ও মন তৈরী করাকে বলা হয় কায়ব্যুহ – কায় মানে শরীর, আর ব্যুহ একাধিক শরীরের সমাবেশ।

আমরা ধরে নিচ্ছি কর্ম নিয়ে, পুনর্জন্ম নিয়ে যোগশাস্ত্র যা বলছে সব ঠিক বলছে। প্রতি নিয়ত আমরা যা কিছু কাজ করছি, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই কর্ম সূক্ষ্ম বীজরূপে আমাদের ভেতরে একটা সংস্কার ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এই সংস্কার আমার কর্মশায় ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে চলেছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সঞ্চিত এই সংস্কারগুলোকে দেখার ক্ষমতা যদি হয়ে যায়, তখন এই দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাবো কীভাবে আমাদের ভেতরে এত সংস্কারের বীজ স্তপীকৃত হয়ে জমে আছে! আর যতক্ষণ সমস্ত সংস্কারের বীজ পুড়ে শেষ না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমাদের জীবনে প্রকৃত শান্তি আসবে না। কারণ যেমনি একটা পরিস্থিতি এসে যাবে সঙ্গে সঙ্গে মন সেই রকমটি হয়ে যাবে। যোগের উদ্দেশ্য হল মনকে কোন দিকে যেতে না দেওয়া, কিন্তু ভেতর থেকে সংস্কারগুলো ঠেলে আমাদের মনকে অনবরত বিক্ষুব্ধ করে দিচ্ছে। মনকে শান্ত করতে হলে, জীবনে চিরস্থায়ী শান্তি পেতে হলে সবার আগে সংস্কারগুলোকে শেষ করতে হবে। সংস্কারগুলোকে শেষ করার খুব সহজ একটি পন্থার কথা গীতায় খুব সুন্দর ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে *জ্ঞানান্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা*, জ্ঞানান্নি সব বীজকে নাশ করে দেয়। এই কথা গীতা যেমন বলছে, উপনিষদেও একই কথা বলছে, আর প্রত্যেকই এই কথা মানছেন – আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কর্মের নাশ হয়ে যায়। একমাত্র যোগ এভাবে মানবে না, যোগ অবশ্য বলবে যতক্ষণ পুরুষের সাক্ষাৎকার না হবে ততক্ষণ কৈবল্য বা মুক্তি হবে না। কিন্তু যোগ আবার এও বলছে – এর উপায় হল সংস্কারগুলোকে নাশ করে দেওয়া। তাহলে কিভাবে নাশ করতে হবে? আমাদের যত কাজ এই শরীরের দিয়েই করতে হয়। একটা শরীর দিয়ে স্তপীকৃত সংস্কারগুলোকে নাশ করা অসম্ভব। তাহলে কি উপায়? অনেকগুলো শরীর দাঁড় করিয়ে নাও। শরীর হলেই মন হবে। এটাকেই যোগশাস্ত্রের ভাষায় বলছে ব্যুৎকায় বা কায়ব্যুহ। ব্যুহ মানে অনেকগুলো।

যোগীরা হিসেব করে দেখতেন কর্মশায় এখনও আমার প্রচুর কর্ম জমে আছে। হিসেব করে যদি বলে দেওয়া যেত তাহলে হয়তো দেখা যাবে আরও দশ জন্ম লাগবে কর্মের এই পুটলিকে শেষ করতে। কিন্তু যোগীর আরও দশ জন্ম অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই – বাবাঃ! আরও দশ জন্ম! তত দিনে যদি আবার নতুন কোন গোলমাল দেখা দেয়, মন যদি অন্য দিকে ছিটকে যায়, তখন তো আরও দশ জন্ম কেন হাজার জন্মও লেগে যেতে পারে। ঠিক আছে, দশ জন্ম বলছে তো, এই আমি দশটা শরীর বানিয়ে নিলাম। যোগী দশটা শরীর দাঁড় করিয়ে দিল। এটাই ব্যুৎকায়, একসাথে দশটা শরীর দাঁড়

করিয়ে দিয়ে এরপর যোগী তার ওই দশ জন্মের যত কর্ম জমা আছে, যোগীর ভেতরে যে হিংসা প্রবৃত্তি আছে, শুভ প্রবৃত্তি আছে, আরও যত রকমের প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ওই দশটা শরীর দিয়ে ক্ষয় করিয়ে দিতে লাগলেন। এই যে এত শরীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন প্রত্যেক শরীরের জন্য একটা মন থাকতে হবে, এতগুলো মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগীর একটাই মন থাকবে যে মন দিয়ে বাকি মনগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যেমন ধরুন, অতি সাধারণ যারা, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা এরা খাচ্ছে-দাচ্ছে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করে যাচ্ছে আর অন্য দিকে যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, উচ্চ চিন্তন-মনন করছেন, এনারা রিক্সাওয়ালাদের থেকে অনেক উচ্চস্তরের হবেন জানাই কথা। ওই রিক্সাওয়ালা যেমন জন্মেছে রিক্সাওয়ালা হয়ে, মরবে রিক্সাওয়ালা হয়ে আবার জন্মাবে রিক্সাওয়ালা হয়ে, আর কাজও করবে রিক্সাওয়ালার। ঠিক তেমনি যোগী ওই যে শরীর দাঁড় করিয়েছেন সেটাও ওই ভাবেই দাঁড় করিয়ে ঐ শরীর দিয়ে একই সংস্কারগুলো ক্ষয় করতে থাকবে। ওই কাজের বাইরে ওই শরীর আর কোন কাজ করতে পারবে না। যাঁরা উচ্চ চিন্তন করছেন তাঁদের থেকে রিক্সাওয়ালা যেমন আলাদা, তেমনি যিনি মূল সাধক তাঁর থেকে ওই শরীরগুলো আলাদা। আলাদা হলেও সব কটা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার লাগাম যোগীর হাতেই আছে। যোগীর নিজের অস্মিতা একটাই আছে, একটাই, মন, একটাই শরীর, একটাই কর্মশায় কিন্তু এখন যোগী দশটা শরীর দাঁড় করিয়ে এক জন্মেই তাঁর দশ জন্মের সব কর্মগুলিকে ক্ষয় করিয়ে দিলেন।

সবারই মূল নিয়ন্ত্রণ কর্তা আসলে ভগবান। অনেক অফিসে যেমন একটা মাস্টার কম্পিউটার থাকে আর তার সাথে অনেক ছোট ছোট কম্পিউটারে আলাদা আলাদা কাজ হতে থাকে। সব কম্পিউটার আলাদা আলাদা কাজ করছে কিন্তু সবারই একটা মাস্টার কম্পিউটারের সাথে যোগ থাকছে, যাকে সার্ভার বলে। সেইজন্য আমাদের কাছে এই শরীরের কোন দাম নেই। আজকাল ক্লোনিং নিয়ে কত কিছু হচ্ছে। ক্লোনিং তো পরে করতে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যোগীরা ইচ্ছামাত্রই একটা শরীর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। তাই বলে সেই শরীর কি যোগীর মতই দেখতে হবে? কখনই নয়। যোগী হয়তো দেখছেন তাঁর ভেতরে অনেক হিংসা বৃত্তি রয়ে গেছে। এই হিংসা বৃত্তি বেরোতে চাইছে না। এবার যোগী একটা সিংহের শরীর দাঁড় করিয়ে দিলেন, সিংহ হয়ে সেই শরীর দিয়ে সব হিংসা বৃত্তিকে বার করে দিলেন। আমাদের চণ্ডীতেই আছে, যেখানে মা শুভ্রকে বলছেন *একৈবাহং জগতত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*, এই জগতে আমিই একা আছি, আমি ছাড়া অন্য আর কে আছে! মায়ের শরীর থেকেই বাকি সবাই বেরিয়েছে। ঠিক তেমনি যোগীর শরীর থেকেও অনেক শরীর বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে যোগীর হয়তো একটা কাকের শরীরও আছে, যোগীর হয়তো প্রচুর কথা বলার সংস্কার ছিল, এখন কাকের শরীর দিয়ে শুধু কা কা করে যাচ্ছেন। যোগী জানে ওটা আমারই শরীর। এইভাবে সব ধরনের সংস্কারগুলো বিভিন্ন শরীর দিয়ে বার করে দেওয়া হল, এবার যোগী শুদ্ধচিত্ত সহায়ে যোগ সাধনায় কৈবল্যপদ প্রাপ্তির দিকে এগোতে থাকলেন। এই যে শরীরগুলো তৈরী হল, আমরা যে অর্থে শরীর বলি সেই অর্থে এই শরীর হয় না, মনও সেই অর্থে হয় না। সেইজন্য এর নাম হল নির্মাণচিত্ত আর নির্মাণকায়। এটা যোগী নিজে তৈরী করে নিয়েছেন, আমরা দেখে কিছুই বুঝতে পারব না।

আমি যদি আপনাকে দেখিয়ে বলি ‘ওই যে ওনাকে দেখছেন ওটা কিন্তু আমারই শরীর, আমি নির্মাণকায়’। আপনার এখানে ধরার কোন উপায় নেই যে ওই শরীরটা আমারই শরীর কিনা। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো তাই। ভগবান যদি চান আপনার মত একজন ভালো লোক হবেন তখন তাঁরই রূপ আপনার রূপ নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ভগবান চাইলেন একজন জ্ঞানীশুণী লোক দরকার তখন তিনি আইনস্টাইনের রূপ নিয়ে নিলেন। আমার আপনার জ্ঞানীশুণীর যা রূপ সেটাই আইনস্টাইন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমাদের ধরার কোন উপায় নেই। আপনার ঘরে মনে করুন একটা বেড়াল ঘুরছে, আপনার জানার কোন পথ নিয়ে ওই বেড়ালটা কোন যোগীর নির্মাণকায় কিনা। এমনও তো হতে পারে কোন যোগী বেড়ালের শরীর তৈরী করে আপনার ঘরে ঘুর ঘুর করছেন। যোগীর হয়তো চুরি করে খাওয়ার প্রবল সংস্কার থেকে গেছে, সেটাকে এই বেড়ালের শরীর দিয়ে মিটিয়ে নিচ্ছেন। কারণ যোগী মানুষ হয়ে তো চুরি করে খেতে পারবেন না। বেড়াল তাই যোগীর নির্মাণকায় হয়ে গেল, বেড়ালের মন

নির্মাণচিত্ত হয়ে গেল। এইসব কারণেই ভারতে কোন প্রাণীকে অকারণে হিংসা করতে নিষেধ করা হয়। একই কারণে অনেকে অকারণে কোন পাথর-টাথরও ভাঙতে চায় না। কোন শরীরে, কোন বস্তুতে কোন যোগী বসে আছেন কেউ জানে না! ভাগবতে যমলার্জুনের কাহিনীতে দুজন যক্ষ দুটো অর্জুন গাছে প্রবেশ করে নিজেদের পাপ ক্ষয় করে যাচ্ছেন। তাই অকারণে আমাদের পরম্পরতে কোন গাছ কাটতেও নিষেধ করা হয়। এই গাছ কোন সাধারণ কোন গাছ নাকি কোন ঋষি এই গাছের ভেতরে ঢুকে সাধনা করে যাচ্ছেন, বোঝার কোন উপায় নেই। ঋষি চাইছেন আমাকে বাপু কেউ যেন বিরক্ত না করে, তাই তিনি একটা গাছের ভেতরে ঢুকে নিশ্চিন্তে নিজের সাধনা করে যাচ্ছেন। গাছের মধ্যে যোগী যে নিজে পুরোপুরি ঢুকে গেছেন তা নয়, যোগীরই ওটা আরেকটা সম্প্রসারিত শরীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

এই নির্মাণচিত্ত কীভাবে হয়? মৃত্যুর পরে আমি যে আবার জন্ম নিচ্ছি, জন্ম মানে একটা শরীর যে তৈরী হচ্ছে এই শরীরটাও অস্মিতার জন্যই নির্মিত হচ্ছে। পুরুষের যে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হয়ে আছে, এই সংযোগ থেকেই জন্মে জন্মে আমাদের শরীর তৈরী হয়ে চলেছে। তাহলে এই শরীর তৈরী করার শক্তি তো আমাদের ভেতরেই আছে, সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা শরীর তৈরী করে নিলেই পারি। এর আগের সূত্রে ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে, আমাদের যত রকমের অশুভ সংস্কার রয়েছে সেগুলো শুভ সংস্কার দিয়ে চাপা আছে, সেই রকম শুভ সংস্কারগুলো অশুভ সংস্কার দিয়ে চাপা আছে।

গ্রামে সন্ধ্যাবেলা বরযাত্রী আসবে। গ্রামের সবাই যাবে বর দেখতে বরযাত্রী দেখতে। নিশ্চিন্তে বর দেখার জন্য সারা দিন ধরে সব কাজ সেরে নিচ্ছে যাতে সন্ধ্যাবেলা কোন কাজ বাকী পড়ে না থাকে। ঠিক তেমনি যোগীর ইচ্ছে হয়েছে আমি প্রকৃতির সংযোগ থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির আনন্দ করতে চাই, কিন্তু এই কর্মগুলো আমাকে ছাড়ছে না। যোগীর আসল সাধনা যখন শুরু হয় তখন প্রকৃতি যোগীকে তুলে এই আকাশে নিয়ে যাবে আবার এই আকাশ থেকে আছাড় মেরে ফেলবে। কারণ জীবনে যদি এই রকম কিছু শুরু হয় তাহলে বুঝবেন এবার তার সাধনা কিছুটা শুরু হয়েছে। আতঙ্ক এসে যাবে – মা গো! আমার জীবনে এরকমটি হতে যাচ্ছে! দেখছেন, প্রকৃতি আপনাকে আছাড়ের পর আছাড় মেরে যাচ্ছে। যোগী দেখছেন এর তো ইতি নেই, চলতেই থাকবে। তাহলে আলাদা একটা শরীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোক, যে শরীরটা শুধু আছাড়ই খেতে থাকবে। তখন যোগী একটা গাধা বা বলদের শরীর ধারণ করে নিল। গাধা হয়ে এবার ধোপার কাছে খালি পিটুনি খেয়ে যাচ্ছে। শুধু মার খাওয়ার জন্যই এই শরীর দাঁড় করান হয়েছে। এর বিপরীতে যদি দেখেন যোগী প্রচুর নাম-যশ ও সম্মান পাচ্ছেন তখন তিনি একটা দেবতার মূর্তির ভেতরে ঢুকে গেলেন, যত সম্মান এবার সব দেবতার মূর্তির উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারণ যোগী দেখছেন প্রকৃতি তাঁকে সহজে ছাড়ছে না।

ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে একবার নাম লেখালে রোগ না সারা পর্যন্ত ছাড়া পাবে না। প্রকৃতি আপনাকে কিছুতেই ছাড়বে না। রাজযোগকে বলা হয় Royal road to realisation। যাঁরা রাজযোগ পথের পথিক তাঁরা কি জানতেন না যে জ্ঞানান্ধি সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে দেয়? আমরা জ্ঞান জ্ঞান যতই মুখে বলি না কেন, জ্ঞান পথে একবার নামলে বোঝা যায় কী ভয়ঙ্কর কঠিন পথ, মুখের কথা আর কাজের কথাতে কতটা ফারাক তখন বোঝা যায় যখন জ্ঞান পথে একবার নামবে। রাজযোগ বুঝিয়ে দিচ্ছে বাস্তবে কি হয়। ঠাকুর নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যখন তিনি ধ্যানে বসছেন তখন কে যেন চাবি দিয়ে ওনার হাঁটু, কোমড়, ঘাড়, কাঁধ, হাত সব তালা মেরে দিচ্ছে। ঠাকুর আর হাত পা কোমড়, ঘাড় কিছুই নাড়তে পারবেন না। ধ্যানকে ওই অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যে কোন কিছুই আর নড়বে না। আরেক দিনের বর্ণনাতে বলছেন – ঠাকুর ধ্যানে বসে দেখছেন কে যেন ত্রিশূল নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে মন যদি একটু চঞ্চল হয়েছে তাহলে এই ত্রিশূল দিয়ে বিঁধে দেবো। আবার একদিন দেখছেন ঠাকুরের ভেতর থেকে এক পাপ পুরুষ বেরিয়ে এল আর তখন আরেকজন ভৈরব বেরিয়ে এসে তাকে মেরে ফেললে। আমাদের ক্ষেত্রে এই শরীর নিয়ে সাধনা করছি আর একজন ভৈরব বেরিয়ে এসে তাকে মেরে ফেললে। আমাদের ক্ষেত্রে এই শরীর নিয়ে সাধনা করছি আর একজন এসে আমাদের শরীরের সব জয়েন্টগুলো আটকে দিচ্ছেন, যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি, দিব্য

পুরুষ একজন ত্রিশূল নিয়ে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন মন যদি চঞ্চল হয়েছে তো এই ত্রিশূল দিয়ে তোমার শরীরকে এফোড়-ওফোড় করে দেব বা আমার ভেতর থেকে পাপ পুরুষ বেরিয়ে আসছে, এগুলো কি এই শরীর, এই মন দিয়ে কখন হবে? কখনই হবে না। আমরা যে ঠাকুরের এই তিনটে বর্ণনা এখানে দিলাম এগুলো ঠাকুরের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় হচ্ছে। তাহলে আমাদেরও সাধনার প্রাথমিক স্তরে এই একই জিনিষ হতে হবে। সেইজন্য যোগী যখন দেখছেন তাঁর কর্মগুলো ক্ষয় হতে পারছে না, তখন তিনি অনেকগুলো শরীর দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটা দিয়ে ধ্যান করে যাচ্ছেন, আরেকটা দিয়ে গীতা পাঠ করে যাচ্ছেন, এই ভাবে করে করে একটা অবস্থায় যখন বুঝে গেলেন সব কর্ম ক্ষয় হয়ে গেছে তখন আবার ওই শরীরগুলো গুটিয়ে ফেলেন। ঠাকুর বারো বছর ধরে সাধনা করেছেন। ঠাকুর পরে বলছেন আমি ষোল আনা করেছি তোদের এর এক আনা করলেই হবে। এক আনা করা মানে ওতেই তাঁর কাজ চলে যাবে। কিন্তু এই বারো বছর ঠাকুরের সাধনার যে তীব্রতা ও গভীরতা ছিল, ওই তীব্রতা ও গভীরতা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুরের বারো বছরকে যদি আমাদের স্তরে নিয়ে আসা হয় তখন সেটাই বারশো বছর হয়ে যাবে। বারশো বছরের সাধনা যদি নাও হয় কিন্তু একশ বছরের সাধনাও একই জন্মে আমাদের পক্ষে করা কখনই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় উপায় যদি আমারই দশ বা পঁচিশ খানা শরীর তৈরী করে নিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই তো আমরা শরীর তৈরী করতে পারবো না। সেইজন্য রাজযোগেই ধরা পড়ে যাবে আপনি সাধনার স্তরে ঠিক ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর নির্মাণচিত্ত! কেউ একটু উল্টোপাল্টা কিছু কথা বললেই আমাদের মন টং হয়ে রেগে ভূত হয়ে যাচ্ছি সেখানে আবার নির্মাণচিত্ত! তবে এখানে বলেই দিচ্ছেন যোগীর আসল মন বা আসল চিত্ত আর যোগী যে মন নিজে থেকে তৈরী করেছেন সংস্কারগুলোকে ক্ষয় করার জন্য, এই দুটোকে আলাদা বোঝাবার জন্য এর নাম নির্মাণচিত্ত। নির্মাণচিত্তের সঙ্গে যে শরীরগুলো থাকে তাকে বলছেন কায়ব্যুহ।

এখানে সব থেকে মজার ব্যাপার হল যোগীর যেটা আসল মন, সে কিন্তু বাকি সব মনগুলির মালিক। পরের সূত্রে এটাই বলছেন – *প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্।।৫।।* যেমন একজন যোগী হয়ত একটা কুকুর রূপে, একটা বেড়াল রূপে, একটা হাতি রূপে, এই রকম দশটা শরীর নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, এগুলোকে শুধু যোগী নিজে জানতে পারছেন, যোগী যেমন আছেন সেই রকমই সবাই তাকে দেখবেন কিন্তু তাঁর বাকি শরীরগুলিকে কেউ ধরতে বা বুঝতে পারবে না। যোগী যদি দেখেন তার মধ্যে অনেক হিংসা মারামারির সংস্কার রয়েছে, এই সংস্কারকে ক্ষয় করবার জন্য তিনি একটা কুকুরের শরীর নিয়ে নিলেন, যোগী এখন কিন্তু সেই কুকুরকে সব সময় লক্ষ্য করতে থাকবেন, যাতে কুকুরটা নতুন আবার কোন কর্ম যেন না তৈরী করে বসে, তাহলে তো যোগীর কর্ম কোন দিনই শেষ হবে না। সীমা পরিসীমাকে যেন না অতিক্রম না করে যায়, একটা অবস্থা পর্যন্ত ওই শরীর দিয়ে সংস্কারগুলোকে বার করে নেওয়ার পর আস্তে আস্তে ওই শরীরটাকেও গুটিয়ে ফেলবেন। এখানে যে যোগী বিভিন্ন শরীর নিচ্ছেন মনে রাখতে হবে এটা করা হচ্ছে শুধু তাঁর কর্মগুলিকে ক্ষয় করবার জন্য, আর অন্য কোন উদ্দেশ্য এখানে নেই। অস্মিতা, যেখানে পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগ হয়েছে, যেখানে পুরুষের আমিত্ব বোধ আসছে, সেই অস্মিতা থেকেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই যে নতুন শরীর যোগী তৈরী করছেন এও সেই অস্মিতার জন্যই হচ্ছে, কিন্তু এটা আসল সৃষ্টি নয়।

যোগী যে এতগুলো নির্মাণকায় দাঁড় করাচ্ছেন, এই নির্মাণকায়ের উপাদান গুলি যোগী কোথা থেকে পান? স্বামীজী বলছেন, ভূত (সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত) ও মন যেন দুটি অফুরন্ত ভাণ্ডার। এখন যোগী চাইছেন একটা শরীর তৈরী করতে, শরীর তৈরীতে প্রথমে সব থেকে প্রয়োজন হয় পুরুষের, পুরুষ এখানে আছেই, অস্মিতাও আছে। এখন রইল মন, মনের পক্ষে শরীর তৈরী করা কোন সমস্যাই নয়, কারণ বাতাস আছে, ওখানে পঞ্চমহাভূত পেয়ে যাবে। যদি এখান থেকে না হয় তাহলে সূর্য আছে, চন্দ্র, তারা আছে ওখান থেকে পঞ্চমহাভূত এসে যাবে। আর ইদানিং কালে বিজ্ঞান বলছে এই ব্রহ্মাণ্ডে যে

কত ভূত আছে কল্পনাই করা যাবে না। তাই বলছেন শরীর তৈরী করতে যে পঞ্চমহাভূতের দরকার ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে এই পঞ্চমহাভূতের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

সমাধি দ্বারা লব্ধ চিত্তই বাসনাশূন্য

এরপর পতঞ্জলি অন্য একটি মন্তব্য করছেন, যদিও পতঞ্জলি এই সমস্ত সূত্রগুলিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছেন, এরপরেও তিনি নিজস্ব কিছু কিছু মন্তব্য করছেন। এখানে যেমন বলছেন – **তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥৬॥** ধ্যানের মধ্যে দিয়ে যে মন সমাধি লাভ করে সেই মনই সকল বাসনা থেকে মুক্ত। এই যে নানান ধরণের মনের কথা বলা হয়েছে, যোগী যে বিভিন্ন মন তৈরী করছেন, আবার যে মন জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র ইত্যাদির দ্বারা সিদ্ধাই লাভ করছে, কিন্তু মন যতই শক্তি বা সিদ্ধি লাভ করুক না কেন, এই মন বাসনাশূন্য কখনই নয়। কিন্তু ধ্যান অভ্যাস করে সমাধি লাভের পর যে শুদ্ধ মন থাকে একমাত্র সেই মনই সম্পূর্ণ ভাবে বাসনা মুক্ত। স্বামীজীও এই কথাই বলছেন – পূর্ণ একাগ্রতা বা সমাধি-অবস্থাই সর্বোচ্চ অবস্থা, কেননা এই অবস্থাতে যোগী সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হন। যে মন বাসনা-শূন্য সেই মনকে আর কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না। ধ্যান ও সমাধি দিয়ে যে সিদ্ধি হয়েছে এটাই ঠিক ঠিক অনাশয়, এখানে কোথাও কোন ধরণের ইচ্ছা থাকে না, কোথাও কোন ধরণের দুর্বলতা থাকে না। তার মানে জন্ম থেকে আপনার কিছু সিদ্ধি এসে থাকবে, মন্ত্র দিয়েও হয়তো কিছু পেয়েছেন বা ঔষধি বা তপস্যা দিয়েও কিছু পেয়ে থাকতে পারেন কিন্তু সমাধি দিয়ে বা একাগ্র মন দিয়ে যে মন পাওয়া যাচ্ছে এই মনের সাথে অন্য কোন মনের কোন তুলনা হয় না। জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র বা বিশেষ তপস্যা দিয়ে যদি কিছু সিদ্ধি বা ক্ষমতা পেয়ে থাকেন এই পাওয়াটা চিরস্থায়ী নাও হতে পারে, কিছু দিন পর চলেও যেতে পারে কিন্তু সমাধি দিয়ে যেটা এসেছে এই সিদ্ধি বা ক্ষমতা আর কোন দিন চলে যাবে না। মাঝে মাঝে দেখা যায়, ক্লাশ ফাইভের ছেলে কিন্তু ক্লাশ টেনের অঙ্ক, এমনকি গ্রাজুয়েশানের অঙ্কও করে দিচ্ছে। পরে সেই ছেলে যখন গ্রাজুয়েশান করে বড় হয়ে যাচ্ছে তখন আর তার কোন নাম শোনা যায় না। ক্রিকেটেও দেখা যায় আণ্ডার নাইনটিনে খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে গিয়ে সেই নাম করতে পারছে না। কারণ, এগুলো জন্ম সিদ্ধি, কিন্তু ধরে রাখতে পারছে না। অথচ শচীন তেণ্ডুলকার একাগ্রতার জোরে এতদিন ধরে ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে। অথচ মজার ব্যাপার শচীন আগে ক্রিকেট খেলতো না, আগে টেনিস প্লেয়ার ছিল। টেনিস ছেড়ে ক্রিকেটে এসে বোলিং দিয়ে শুরু করল, বোলিং দিয়ে হলো না। তারপরে ব্যাটিং নামলেন। একাগ্রতা দিয়ে ব্যাটিংটাকে ধরে এগিয়ে গেল, আর সেটাই শচীনকে ক্রিকেটের রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিল। একাগ্রতা দিয়ে যেটা আসবে সেটাই চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যাবে। একাগ্রতা আপনার সঙ্গে কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, বাকি সবটাই আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এখানে মন্ত্র বলতে আমরা যে দীক্ষামন্ত্র জপ করি সেই মন্ত্রের কথা বলছেন না, তান্ত্রিক ক্রিয়াদির দ্বারা অনেক সময় কিছু যে ধরণের সিদ্ধাই অর্জন করে নেওয়া হয়, সেই মন্ত্রের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

যোগীর কর্মের কোন রঙ হয় না

বাসনাশূন্য মনের কথা বলেই পতঞ্জলি বলছেন যাঁরা যোগী তাঁদের জন্য কর্মের কোন রঙ হয় না, বাকীদের জন্য কাজের তিনটে রঙ হয়, ভালো, মন্দ ও ভালো-মন্দ মিশ্র অথবা বলা যায় গুরু, কৃষ্ণ ও মিশ্র – **কর্মাণ্ডুরাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥৭॥** যোগীর কাজের কোন রঙ হয় না কেন? বলছেন – যোগী কর্মে আসক্ত নয়, অনাসক্ত হয়ে, কর্মফলের কোন আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করা হয় বলে তাঁদের কাজের কোন রঙ হয় না – গীতাতে যেমন ভগবান বলছেন – **কর্মণ্যেবাধাকিরন্তে মা ফলেষু কদাচন** – কাজের যদি কোন রঙ না হয় তাহলে কি হয় – **ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে**। যোগী যদি কারুর গলা কেটে দেন তাতে যেমন যোগীর কোন পাপ লাগবে না আবার তাঁরও যদি কেউ গলা কাটতে আসে তাতে যোগীরও কিছু যায় আসে না। ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য যোগীর কাছে এগুলো অনর্থক। আমাদের কাছে যেগুলো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, যোগীর ক্ষেত্রে এগুলো কিছুই নয়। সেইজন্য যিনি ঠিক ঠিক যোগী তাঁকে ভালো কর্ম কি মন্দ কর্ম বা ভালো-মন্দ মিশ্র কর্ম, কোন কর্মই স্পর্শ করবে না।

স্পর্শ করবে কখন? একটা বিদ্যুতের তারের মধ্যে তখনই তড়িৎ প্রবাহ থাকবে যখন বিদ্যুতের মেইন বক্সের সাথে সংযোগ থাকবে। বাসনার সাথে যদি কর্মের সংযোগ থাকে তাহলেই তাকে স্পর্শ করবে। যদি এই সংযোগকে কেটে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে আর বিদ্যুত স্পর্শ করবে না। পুরুষ আর প্রকৃতির বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ভালো, মন্দ ও মিশ্র সব প্রকৃতির অন্তর্গত, যোগী প্রকৃতির সঙ্গে যে সংযোগ ছিল সেটাকে কেটে দিয়েছেন। তাই এখন যোগীকে কর্মের কোন ফল স্পর্শ করতে পারবে না। কর্ম স্পর্শ না করার ব্যাপারটা একমাত্র প্রযোজ্য হবে সমাধিবান পুরুষের ক্ষেত্রে। বাকী সবার ক্ষেত্রে ভালো, মন্দ ও মিশ্র এই তিন ভাবে কর্মের ফল হয়। গীতাতেও ভগবান বলছেন *অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্*, কর্ম তিন রকমের, তার মধ্যে বেশীর ভাগ কর্ম মিশ্রই হয়। ইষ্ট কর্ম অর্থাৎ শুভ কর্ম করলে দেবতাদের শরীর পায়, অশুভ কর্ম করলে অসুর যোনি বা তির্যকাদি গতি প্রাপ্ত হয় আর মিশ্র অর্থাৎ শুভ অশুভ মিশ্র কর্ম করলে মানুষ হয়ে জন্মায়। কিন্তু যোগীদের ক্ষেত্রে কোন কর্মই, শুভ, অশুভ আর মিশ্রই হোক যোগীকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ যোগীর কোন স্বার্থ নেই, নিঃস্বার্থ ভাবে সব কর্ম করে যাচ্ছেন। যোগী কে? যাঁর মন একাগ্র হয়ে গেছে, যিনি সমাধিতে চলে গেছেন। যেখানে কোন স্বার্থ থাকে না সেখানে কোন কর্মই শুভও হয় না, অশুভও হয় না আর মিশ্রও হয় না। এখনও কিন্তু নিরুদ্ধ মনকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না, এখানে একাগ্র মনকে নিয়েই আলোচনা চলছে।

ত্রিবিধ কর্ম থেকেই যোনি থেকে যোনিতে বাসনা প্রকাশিত হয়

পরের সূত্র আগের সূত্রেরই সম্প্রসারণ। জন্ম, কর্ম সব মিলিয়ে আট নম্বর সূত্রে বলছেন – **ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিবাসনানাম্।।৮।।** এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এই যে তিন ধরণের কর্মের কথা বলা হল, শুভ, অশুভ আর শুভ-অশুভ মিশ্র কর্ম, এই তিন ধরণের কর্মই নিজের ফল দেবে। যে যা কাজ করছে তার ফল তাকে পেতে হবে। কি রকম ফলে দেয়? ঠিক সেই রকম ফলই দেবে যে রকম পরিস্থিতিতে সে এখন আছে। এর সহজ ব্যাখ্যা হল – আমরা মেনেই চলছি যে সৃষ্টি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, সৃষ্টিতে আমার নানা রকমের শরীর হয়েছিল। এবার মনে করুন আপনি কোন জন্মে সিংহ ছিলেন, তাই সিংহের যে হিংস্র ভাব সেটা আপনার ভেতরে থেকে গেছে। সিংহের হিংস্র ভাব থেকে গেছে বলে কি আপনি আপনার স্ত্রী, পুত্র, বাবা-মার উপর বাঁপিয়ে পড়ে তাদের বুক চিড়ে রক্ত পান করতে যাবেন? আপনি কখনই তা করবেন না। তাহলে কি যোগশাস্ত্র ভুল? একেবারেই ভুল নয়। আপনি কোন জন্মে অনেক শুভ কাজও তো করেছিলেন কিন্তু এই জন্মে সেই রকম শুভ কাজও তো এখন করছেন না। কোন জন্মে আপনি গাধাও ছিলেন, গাধা হয়ে অপরের বোঝা বয়ে বেরিয়েছেন। এখন তো সেই রকম কিছু করছেন না। আবার কোন জন্মে মানুষ যোনিতে আপনি হয়তো রাজকুমারী ছিলেন, কিন্তু আপনার চেহারাতে তার কোন প্রভাব পাওয়া যাচ্ছে না, আবার কোন জন্মে আপনার মধ্যে অনেক আসুরিক বৃত্তি ছিল, সেটাও এই জন্মের চেহায়ায় ছাপ পড়ছে না। যোগশাস্ত্রে এনারা এই কথাই বলছেন, এই জন্মে এগুলো আপনার মধ্যে দেখা যাবে না। তার কারণ, আপনার ভেতরে আপনার কর্মের বিরাট পোটলা আছে। আগেকার দিনে পোটলা শব্দটাই ব্যবহার হত। এখন এটিএম কার্ড, সিম কার্ড এসে যাওয়াতে কর্মশয়ের ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের আরও অনেক সহজ হয়ে গেছে। এটিএম কার্ডের মধ্যেই টাকা-পয়সার সব রকম হিসাব জমা আছে। কর্মের বিরাট পোটলাটা ঠিক এই এটিএম কার্ডের মত, আপনার ব্যাক্সের সেভিংস এ্যাকাউন্টে কত টাকা ঢুকছে বেরোচ্ছে সব এটিএম কার্ডে ধরা আছে।

যেমন যেমন যোনিতে গিয়ে শরীর ধারণ করছে তেমন তেমন ওই শরীরের পক্ষে উপযুক্ত যে কর্মগুলো কর্মশয়ে জমে আছে সেগুলোই কর্মের পোটলা থেকে বেরোতে শুরু করবে। পরিস্থিতি আর শরীর অনুযায়ী কর্মের পোটলা থেকে সব কর্মগুলো এক এক করে বেরোতে থাকবে। এবার আপনি চিন্তা করুন, কোন জন্মে আপনি গাধা ছিলেন, আরেক জন্মে আপনি সিংহ ছিলেন, তারও আগের জন্মে আপনি মানুষ ছিলেন। মনে করুন প্রথমে আপনি মানুষ ছিলেন, মানুষ থেকে সিংহ হলেন তারপর সিংহ থেকে গাধা হলেন আবার গাধা থেকে মানুষ যোনিতে জন্ম নিলেন। এখন প্রথমে মানুষ হয়ে যে

কর্মগুলো আপনি করেছিলেন, আর মানব শরীরের উপযুক্ত যে কর্মগুলো কর্মশয়ে সঞ্চিত আছে, এই মানুষ জন্মে ঠিক ওই জায়গা থেকে চালু হয়ে যাবে। মানুষ থেকে মানুষই চলবে, সিংহ গাধাটা এবার চাপা থেকে গেল। এবার মৃত্যুর কিছু দিন আগে আপনি একটা গাধা কিনেছিলেন, আর মৃত্যুর সময় গাধার চিন্তা করতে করতে দেহ ছাড়লেন, তাই জড় ভরতের মত আপনি গাধা হয়ে জন্মালেন। এবারে আগের গাধা আর এবার যে গাধা হয়ে জন্মালেন এই গাধার সঙ্গে আগের গাধার ধারাবাহিকতা চালু হয়ে যাবে। তার মানে আপনার এই শরীরের সাথে হাজার রকমের শরীর পাশাপাশি চলছে।

ধারাবাহিকতা কিভাবে চলে, এর একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে, আপনি সারাদিন অনেক কাজ করার পর পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন। পরিশ্রান্ত হয়ে ভাবলেন আজকে আর বাসনগুলো পরিষ্কার করবো না, কাল সকালেই করবো। এই ভেবে আপনি শুয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমে আপনার মাথায় আসবে আমাকে বাসন মাজতে হবে। বাসন আপনাকেই মাজতে হবে। কিন্তু তার মাঝখানে একটা ব্রেক এসে গেল, ঘুম, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। শরীরের সাথে শরীরের কিন্তু ধারাবাহিকতা থাকবে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন স্বপ্ন স্বপ্নের সাথে কি পৌর্বাপর্য থাকবে? না, তা কখনই থাকবে না। কিন্তু স্বপ্নে আপনার কখন বোধ হবে না যে আপনার কোন ধারাবাহিকতা নেই। এখানে আমরা স্বপ্ন আর জাগ্রত নিয়ে আলোচনা করছি না। এখানে আলোচনা হচ্ছে, যেমন ঘুম একটা মাঝখানে ব্রেক দিচ্ছে, সকালে ঘুম ভাঙলে রাতের শরীরের সাথে ভোরের শরীরের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। ঠিক তেমনি গাধার শরীরের মাঝখানে আরও চার ধরনের অন্য শরীর এসে গিয়েছিল। এরপরে কোন কারণে আবার আপনি যদি গাধার শরীর পান, তাহলে এই গাধার সাথে আগের গাধার শরীরে ধারাবাহিকতা যোগ হয়ে গাধার শরীরের কর্মগুলো ফল দিতে শুরু করবে। গাধা হয়ে দেখবে, ওই গাধাটাই তো গাধা হয়েছে। তাহলে মাঝখানে কি ছিল? মাঝখানে কিছু দিন ছিল না। কোথায় গিয়েছিল, তাহলে কি মরে গিয়েছিল? হ্যাঁ মরেই গিয়েছিল। মরে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার মাঝখানে আরও চারটে শরীরও হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুরা তাই বলেই দিচ্ছে তোমার মৃত্যু হলে তুমি হয় স্বর্গে যাবে আর নয়তো নরকে যাবে, শুধু তাই নয়, বিভিন্ন যোনিতেও যাবে।

বিভিন্ন যোনিতে জন্ম মানে বিভিন্ন রকমের শরীর পাবে। এখন সেই বাসনা গুলিই কাজ করবে যে বাসনাগুলো সেই শরীরের পক্ষে উপযুক্ত হবে। একজন মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে জিজ্ঞেস করছিলেন ‘মহারাজ, আমার মাংস খাবার খুব ইচ্ছেটা এখনও যায়নি, আমার কি হবে?’ তখন স্বামী ভূতেশানন্দজী বললেন ‘কি আর হবে, মরে শকুন হবে তখন খুব করে মাংস খাবে’। শোনার পর মহারাজ খুব ঘাবড়ে গেছেন দেখে উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ‘না, না, আমি তোমাকে মজা করার জন্য বলছিলাম’। কিন্তু যতই মজা করে বলুন না কেন এটা ঠিকই যে, মনে যদি খুব মাংস খাবার ইচ্ছে থেকে থাকে, এখন যেটুকু মাংস খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তাতেও যদি মন না ভরে, তখন কি হবে? এই মানব শরীর দিয়ে তো এর বেশি মাংস খাওয়া যাবে না, তখন তাকে খুঁজতে হবে এমন একটা শরীর যে শরীর দিয়ে মন-প্রাণ ভরে শুধু মাংসই খাওয়া যেতে পারে। তার মানে, হয় তাকে শকুন হয়ে নয়তো বাঘ সিংহ শেয়াল হয়ে জন্মাতে হবে। তখন ভাতও খেতে হবে না, শুধু মাংসই খেতে থাকবে। তাই এখানে বলা হচ্ছে – এখন সে যে শরীরে আছে সেই শরীরের সামর্থ্য ও উপযুক্ততা অনুযায়ীই যা ভালো, মন্দ ও মিশ্র কর্ম জমে আছে, সেগুলো কাজ করবে। তাহলে কর্মশয়ের বাকি সংস্কারগুলোর কি হবে? ওগুলো ঐভাবেই পড়ে থাকবে, আর অপেক্ষা করবে সেই শরীরের জন্য যেটা তাদের পক্ষে উপযুক্ত হবে। শুধু উপযুক্ত শরীরই নয় সেই কর্মের অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিও পেতে হবে।

আনাতোলে ফ্রাঙ্ক বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ছিলেন। ওনার একটা বই ‘Thais’ ফরাসী সাহিত্যের একটি খুব নামকরা উপন্যাস। এর কাহিনী হল, একজন লোক থাইস নামে এক নর্তকীকে ভালোবাসতো। লোকটি বুঝে গিয়েছিল যে সে মেয়েটিকে যতই ভালোবাসুক ওকে পাবে না, সেই দুঃখে একদিন সে সব ছেড়েছুড়ে সাধু হয়ে গেছে। সাধু হয়ে প্রচণ্ড তপস্যা, সাধনা করে খুব ক্ষমতা ও নাম-যশ হয়ে গেছে। এবার সে ফিরে আসছে থাইসকে নর্তকীর নোংরা জীবন থেকে বার করে নিয়ে আসবে

বলে। নিজের আস্তানা থেকে শহরে ফিরে আসার পথে লোকটির সাথে একজন ভারতীয় সাধুর দেখা হয়েছে। ভারতীয় সাধু তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলছেন ‘হুঁ, জগৎ উদ্ধারের চললেতো! ফাঁসবে ফাঁসবে’। শহরে এসেছে, শহরে এসে সে তার এক বন্ধুর মাধ্যমে ভালো জামা কাপড় পড়ে থাইসের কাছে গেছে। ওখানে সবাইকে লোকটি নিজেকে একজন বড় যোগীবাবা বলে বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছে। লোকটির কথাবার্তাতে, ব্যবহারে থাইস এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে ওর অনুগামিনী না হয়ে আর থাকতে পারল না। থাইসকে লোকটি ধর্মের ভালো ভালো আদর্শের কথা এমন বোঝাতে লাগল যে শেষে দেখা গেল থাইস সম্মোহিত হয়ে ওর পায়ে পড়ে বলছে – আপনি যা বলবেন আমি তাই তাই করব। তখন লোকটি থাইসকে বলছে তোমার যা কিছু আছে সব পুড়িয়ে দাও।

পরের দিন থাইস তার সব চাকর বাকরদের ছাড়িয়ে দিল। আর সব দামী দামী বিলাস সামগ্রী, পোষাক, গয়না সব পুড়িয়ে দিতে শুরু করল। বিরাট লম্বা কাহিনী। সব ছেড়েছুড়ে থাইস একটা Nunnery Convent এ সন্ন্যাসীনি হয়ে যোগ দিয়েছে। সেখানে গিয়ে থাইস কঠোর সাধনা করতে শুরু করে দিয়েছে, কোন দিকেই তার আর মন নেই। কোন বিলাসিতায় মন নেই, শরীরের প্রতি মমত্ব নেই। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এমন কঠোর সাধনাতে ডুবে গেল যে একটা অবস্থায় গিয়ে তার শরীর আর টানতে পারছিল না। চরম কঠোরতা করে করে শেষে থাইস মৃত্যুশয্যায় চলে গেল। এই লোকটি থাইসের মত বহু পুরুষের কাঙ্ক্ষিত এক নর্তকীকে এক নোংরা জীবন থেকে তুলে নতুন জীবনে নিয়ে গেলেন বলে চারিদিকে তার বিরাট নাম-যশ হয়ে গেছে। তাকে সবাই বিরাট যোগীবাবা বলে খুব সম্মান করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে হঠাৎ ভদ্রলোকের কাছে একদিন খবর এল যে থাইস কঠোর তপস্যা করে মৃত্যু শয্যায় চলে গেছে। কাহিনীর শেষ দৃশ্যে দেখাচ্ছে লোকটি ওই কনভেন্টে যতক্ষণে পৌঁছেছে ততক্ষণে মৃত্যু এসে থাইসের শরীরকে নিখর করে দিয়েছে। থাইসের বিছানার কাছে পৌঁছেই লোকটি বুকের মধ্যে থাইসের মৃত শরীরটাকে জড়িয়ে বলতে শুরু করেছে ‘থাইস! তুমি কেন চলে গেলে! তোমাকে ভালোবেসেই আমি এত কিছু করলাম, আমার যত তপস্যা তোমাকে পাবার জন্যই’। এই রকম অনেক কথা বলতে বলতে প্রলাপ করে চলেছে। লোকটির এই কাণ্ড দেখে কনভেন্টের যে সিস্টাররা ছিল তারা এসে বলতে শুরু করেছে – where from this devil has come, throw him out, throw him out শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে টেনে হিঁচড়ে ওখান থেকে বের করে দেওয়া হল। এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত যে গভীর তাৎপর্য খ্রিস্টানদের পক্ষে বোঝা সম্ভবই নয়। এই যে সূত্রটা এখানে বলা হয়েছে, এই সূত্রে বুঝতে পারলে এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরা যাবে। থাইসের একটা বিশেষ সংস্কার ছিল যে সংস্কার তাকে নর্তকী বানিয়েছিল। অন্য দিকে থাইসের আধ্যাত্মিকতার সংস্কারটা ছিল প্রবল, কিন্তু চাপা ছিল। যখন ওই লোকটির কথাতে সে কনভেন্টে চলে এলো ঠিক তখনই সুযোগ পেতেই থাইসের আধ্যাত্মিকতার সংস্কারটা তীব্র ভাবে বেরিয়ে এলো, কেননা নর্তকী হলেও সে সত্যিই ধার্মিক ছিল। আর ওই লোকটি যে এত দিন ধরে তপস্যা করছিল তার ভেতরে উদ্দেশ্য একটাই ছিল, কিভাবে সে থাইসকে পাবে। তপস্যা করে সে কতকগুলি সিদ্ধাই পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার স্বভাবের কোন পরিবর্তন আসেনি। ফলে থাইসের প্রতি যে ভালোবাসা, আসক্তি ছিল সেটা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই থাইসের মৃত শরীরকে সে জড়িয়ে ধরে বলছে – আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আমি বুক জড়িয়ে রাখব, তুমি আমার সাথে চল, ইত্যাদি।

আমাদের মধ্যে যে সংস্কার, যে কর্মগুলি রয়েছে সেগুলি তখনই ফল দেবে যখন ওই কর্মের উপযুক্ত শরীর আর উপযুক্ত পরিবেশ সে পাবে। যতই চাপা দিয়ে রাখা হোক না কেন, ওরা ওদের মত সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। এই রকম কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংস্কার, কামনা, বাসনা, হিংসা ভাব, লোভ আমাদের মধ্যে জমে আছে আমরা জানিই না, উপযুক্ত সময় যখন আসবে তখনই এরা ফেটে বেরিয়ে পড়বে। সেইজন্য স্বামীজীও পরিবেশকে ভালো করার উপরে খুব জোর দিতে বলছেন। পরিবেশ যদি সুন্দর থাকে, যদি সব সময় ভালো মানুষের সঙ্গ করা হয় তখন অশুভ সংস্কারগুলো বেশি মাথা তুলতে পারবে না। আমাদের আগামী জন্মটা কি রকম হবে, এই জন্মে এখনই

সেটার দিকে নজর দেওয়া বেশি দরকার, কারণ আমি যেমন যেমন কর্ম করব তেমন তেমন সংস্কার তৈরী হবে, আর ওই সংস্কার যেমন শরীর হবে সেই ভাবে বেরোতে থাকবে। সেইজন্য অসৎসঙ্গকে পরিহার করতে হয়, বাজে ধরণের সিনেমা, টিভি সিরিয়াল দেখা থেকে দূরে থাকতে হয়। ফলে ভালো ভালো সংস্কার গুলো যখন বেরিয়ে আসতে থাকে, তখন মনের মধ্যে সাধনা করার ইচ্ছে যাবে, এই ইচ্ছেটাকে কাজে লাগিয়ে খুব সাধনা, তপস্যা করে চেষ্টা করতে হবে নির্বীজ সমাধির লাভের জন্য। নির্বীজ সমাধি হয়ে গেলে কর্মশায়ের সমস্ত স্তূপীকৃত সংস্কার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর এই জন্ম-মৃত্যু চক্রের নাটকের পরিসমাপ্তিও হয়ে যাবে।

আগের সংস্কার থেকেই আমাদের এই শরীর নির্মাণ হয়েছে, আর সেই সংস্কারই এখন ফল দিতে থাকবে। কিছু কিছু ভক্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সারাদিন ধরে তাঁরা ঠাকুর দেবতার পূজা করেই যাচ্ছেন কিন্তু অন্য দিকে আর্থিক, সাংসারিক, সামাজিক নানান ঝামেলা তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে আছে, ঝামেলা যেন তাঁদের পিছু কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবরা মজা করেই হোক কিংবা ভালোবেসেই হোক বলতে থাকে – তুমি এই ঠাকুর দেবতার পূজা বন্ধ করে দাও তাহলে তোমার দুঃখ-কষ্টের সব ঝামেলা ঘুচে যাবে। এই যে ভক্তদের ঝামেলাগুলো আসছে এগুলো তাদের আগের আগের জন্মের কর্মের ফল থেকে আসছে। আমাদের যা কিছু, ব্যাধি, অভাব, মামলা-মকদ্দমা, দুর্ঘটনা, সব আগের আগের জন্ম থেকেই আসে। যেমন যেমন সে বীজ বপন করবে তেমন তেমন সে ফসল পাবে। আজ যদি ভালো কোন কাজ করে থাকে, দেখা যাবে হয়তো দশ জন্ম পরে গিয়ে তার ফল পাচ্ছে। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই, প্রত্যেককে এই নিয়মের মধ্যে দিয়েই চলতে হবে। তাই মহাপুরুষরা বলেন – যা কিছু হয়ে গেছে বা যা কিছু হচ্ছে এগুলো তুমি কোন ভাবেই খণ্ডাতে পারবে না, কিন্তু তুমি তোমার ভাবী কালের সুখ-সমৃদ্ধি এখন থেকেই তৈরী করতে পার। কিভাবে করবে? যদি তুমি কোন রকমে তোমার মনের বৃত্তিগুলিকে ঠিক করতে পার। এর জন্য পতঞ্জলি বলছেন – *অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ* – অভ্যাস আর বৈরাগ্যরত দ্বারা যদি তুমি নিজেকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার থেকে আলাদা করে নিতে পারো, অষ্টাঙ্গযোগের সাধন করে করে যদি তুমি নির্বীজ সমাধি লাভ করে কর্মবীজের যে বিরাট পুঁটলিটা রয়েছে যেগুলো বেরোবার জন্য অপেক্ষা করে আছে, ওটাকে পুড়িয়ে দিতে পারো, তাহলেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। এরপরও যদি এই শরীরে বেঁচে থাকে তখনও কষ্ট কিন্তু ঘুচে না। কোন সন্ন্যাসীর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে যাওয়ার পর কি তাঁর ভালো ভালো খাবার দাবার জুটতে থাকবে? ভালো কিছুই জুটবে না, যে কর্মের জন্য এই শরীর নিয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল সে কর্মটাই যত দিন শরীর থাকবে তত দিন চলতে থাকবে। তিনি যেমন ঝোল-ভাত খাচ্ছিলেন সেই ঝোল-ভাতই খেতে থাকবেন। কিন্তু এরপর তিনি নতুন যা কিছু কর্ম করবেন, ওই কর্ম তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি প্রকৃতিকে জয় করে নিয়েছেন, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর পুরনো প্রারন্ধ কর্মের প্রবাহকেও বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তা কখন করতে যাবেন না, কেননা সমাধিবান যোগীরা প্রকৃতির নিয়মকে কখন উল্লঙ্ঘন করতে যান না, প্রকৃতিকে নিজের মত চলতে দেন। শরীর যখন নিজের থেকে পড়ে যাওয়ার পড়ে যাবে, শরীর পড়ে গেলে তাঁর মুক্তি হয়ে যাবে।

আগের দুটো সূত্রকে মিলিয়ে নয় নম্বর সূত্রে বলছেন **জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যান্তর্ঘৎ স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরপত্বাৎ।।৯।।** এই সূত্রটি ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু ধর্মের সাধক ও চিন্তাবিদ উভয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে যেসব অযৌক্তিক যুক্তিতর্ক আনা হয়, পতঞ্জলি তার সব কিছুর উত্তর এই সূত্রের মাধ্যমে দিয়ে রেখেছেন। রাজযোগে মন নামক বস্তুটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবার মন আলাদা আলাদা কিন্তু সব মনের সাথে একটা যোগ আছে। এই সূত্রে যেটা বলতে চাইছে তা হলো – ধরুন দশ জন্ম আগে আমি মানুষ ছিলাম। ওই মনুষ্য জন্মে আমি যত ধরণের কাজ করার করেছি, তারপরে আমার জীবনযাত্রার মান এমন খারাপ হয়ে গেল যে সেই কর্মফলানুসারে আমি পরের জন্মে পশুর শরীর পেলাম। দশ জন্ম পশু যোনিতে থাকার পর আমি আবার মানুষ শরীরে জন্ম নিলাম। এখন আমার মনুষ্য জীবন ঠিক কোথা থেকে শুরু হবে? এই মনুষ্য

জীবনটা কি ঠিক আগের পশু জন্ম থেকে শুরু হবে, না কি এই মনুষ্য জীবন শুরু হবে ঠিক দশ জন্ম আগে আমি যখন মানুষ শরীর পেয়েছিলাম সেখান থেকে? এই সূত্রানুযায়ী আমার মনুষ্য জীবন শুরু হবে দশ জন্ম আগে ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখানে আমার মনুষ্য জীবন শেষ হয়েছিল।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্বামীজী কয়েকটি মূল্যবান কথা বলছেন, যেগুলো যোগদর্শনের স্তম্ভ। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম জাতি, আয়ু আর ভোগ এই তিন রূপে কর্ম ফল দেয়। জাতি মানে আপনি বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিচ্ছেন, এই জন্ম নেওয়া নির্ধারিত হয় আপনি যেমন যেমন কর্ম করেছেন তার দ্বারা, সেইভাবে আপনার আয়ু নির্ধারিত হবে আর সুখ-দুঃখ রূপে ভোগ আসবে। শরীর যখন জাতি থেকে জাতিতে পাল্টায় আমরা মনে করি সোজা একটা লাইন চলছে, ওই শরীর এখন মানুষ রূপে কর্ম ক্ষয় করছে, আর মানব শরীর পাল্টে যখন দেবতার শরীরে যাচ্ছে তখনও ওই একই জিনিষ চলছে; কিন্তু আসলে সেভাবে হয় না। পুরো জিনিষটাই পাল্টে যায়। পাল্টে যাওয়া মানে তার ব্যবহার যে পুরোপুরি পাল্টে যাচ্ছে তা নয়। ধরুন একজন মানব দেহে ছিলেন, শুভ কর্মের জোরে তিনি দেবতা হয়ে জন্ম নিলেন। আমরা জানি দেবতারা বই-টাই পড়েন না, আর দেবতাদের ভোগ অন্য ধরণের। মনে করুন একজনের বই পড়ার খুব শখ। তার শুভ কর্মের জোরে মৃত্যুর পর সে দেবতা হয়ে জন্মাল। এখন সেখানে সে কোথায় বই পড়ার সুযোগ পাবে! বই পড়া তার হবে না। তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না, এর আগেও সে কখন দেবতা ছিল। ওই দেবতার শরীরে সে যা যা যেমন যেমন করছিল, এখন দেবতার হওয়ার পর আগের দেবতার সঙ্গে যোগ হয়ে আগে যা যা করছিল এখনও তাই তাই করতে থাকবে। একটা খুব সাধারণ উপমার জন্য যদি বলা হয়, মনে করুন একজন লোক এগিয়ে আসছে তাকে দেখে মনে হবে যেন চারট লাইন এগিয়ে আসছে। এই চারটে লাইন হল একটা পশু জীবন, একটা মানবজীবন, একটা দেব জীবন আরেকটি অসুর জীবন। কাছ দিয়ে যখন যাবে তখন দেখবেন প্রত্যেকটি জীবনের রেক আছে। মানবজীবনের গ্রাফকে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন কখন উপরে চলে এল, কখন নীচে চলে এল, আবার উপরে চলে গেল, নীচে চলে গেল, এর একটা ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু তার ভোগের, ব্যবহারের যে ধারাবাহিকতা সেটা আগে তার যে শরীর ছিল সেই শরীরের সঙ্গে যোগ থাকবে। তার মানে, আপনার ভেতরে যে কর্মশয় রয়েছে, সেই কর্মশয় থেকে সেই কর্মগুলোই বেরোবে যেটা এই শরীরের জন্য উপযুক্ত। এই শরীরের জন্য যেটা উপযুক্ত নয় সেই কর্ম কখনই বেরোবে না। যার ফলে আপনার আগের শরীরের সঙ্গে আপনার কর্মের ধারাবাহিকতা থেকে যাবে। এগুলোর উপর আমাদের পরস্পরাতে অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। কাহিনীগুলোকে আক্ষরিক ভাবে না নিলেও ব্যাপারটা বোঝা যায়।

রাজা ভরত সব কিছু ছেড়ে তপস্যা করতে জঙ্গলে চলে গেলেন। তপস্যা করতে গিয়ে একটি হরিণ শাবককে বাঁচালেন। হরিণ শাবক বেঁচে যাওয়ার পর রাজা ভরতের পুরো আসক্তি হরিণ শিশুর উপর জমে গেল। আসক্তি জমে যাওয়াতে মৃত্যুর সময় তাঁর হরিণের কথা মনে হল। মৃত্যুর পর তিনি হরিণ হয়ে জন্মালেন। হরিণ শরীরে তিনি আর তপস্যা করতে পারবেন না। হরিণের শরীর দিয়ে সাধনা হয় না, কিন্তু তাঁর পূর্ব জন্মের স্মৃতিটা থেকে গিয়েছিল। সেটাই বলছেন *স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরুপত্বাৎ*, স্মৃতি, সংস্কার এগুলো একভাবে থাকবে। কিন্তু কর্মগুলো সেই রকমই হবে যেটা তার এই জন্মের প্রাপ্ত শরীরের পক্ষে উপযুক্ত। তার মানে হরিণের শরীর তপস্যা বা সাধনার জন্য উপযুক্ত নয়। সেইজন্য বলা হয় মানব শরীর অত্যন্ত দুর্লভ শরীর। মানব শরীর দুর্লভ মানে, মানব শরীর দিয়ে আপনি যা করতে পারবেন অন্য কোন শরীর দিয়ে তা করা যাবে না। এবার আপনি মানব শরীর নিয়ে অনেক সাধনা করলেন, যার ফলে আপনি দেবতা হয়ে জন্মালেন। দেবতার শরীরে আপনি আর সাধনা করতে পারবেন না। অত দিন আপনার মানব শরীরের উপযুক্ত কর্মগুলো কার্যকর হওয়া বন্ধ থাকবে। এরপর আবার ফিরে মানব শরীর যখন হবে, তখন যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আবার শুরু হবে। রাজা ভরতেরও ঠিক তাই হল। যখন হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন তখন তাঁর শুধু মনে পড়ছে কোথা থেকে কি হয়ে গেল! হরিণ থেকে আবার তিনি মানব শরীরে জন্ম নিলেন। এবার কিন্তু তিনি অনেক সচেতন বলে

তাঁর সিদ্ধিও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সিদ্ধি হয়ে গেলেও শরীর তো যাবে না, শরীর নিজের মত যাবে। এবার তিনি জীবনমুক্ত হয়ে যেভাবে থাকার সেইভাবে থাকলেন আর রাজা রহুগণকে উপদেশাদি দিলেন।

গীতাতে আছে – মৃত্যুর সময় মানুষের মনে যে চিন্তাটা থাকে সেই চিন্তানুযায়ীই তার আবার জন্ম হয়। মরার সময় জড়ভরতের হরিণের কথা মনে পড়ল, তাই তাঁকে হরিণ হয়ে জন্ম নিতে হল। মনে হতে পারে জড়ভরত যে এত তপস্যা করলেন, সে তপস্যার ফল কোথায় গেল? হরিণ শরীর নিয়ে এখন জড়ভরত কী কাজই বা করবেন, যিনি কিনা সারাটা জীবন ব্রহ্ম চিন্তনে কাটিয়ে ছিলেন, আর শুধু মৃত্যুর সময়ে হরিণের কথা ভাবলেন বলে হরিণ শরীর পেতে হল! এখন ভরত কি করবেন এই হরিণ শরীর নিয়ে? এটাই মূল জিজ্ঞাস্য। এই সূত্রের মাধ্যমেই এর সমাধান দেওয়া হচ্ছে। মনে করুন রাজা ভরত এর একশ কি দুশো জন্ম আগে পশু যোনিতে বা হরিণ যোনিতে জন্ম নিয়েছিলেন। এখন যেই তিনি হরিণ যোনিতে জন্ম নিলেন সেই দুশো জন্ম আগে যে হরিণ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন সেখান থেকে লাফ দিয়ে এই হরিণ জন্মকে ধরে নিয়েছেন। এখন আমরা যদি ধরে নিই এই মনই ধারাবাহিক ভাবে চলছে, তাহলে যে মানুষ জন্ম নিয়ে দু পায়ে ভর দিয়ে মাটির উপর চলতে অভ্যস্ত, আর পরের জন্মে দুম্ করে টিকটিকি হয়ে জন্মে দেওয়ালের উপর দিয়ে সে চলবে কি করে? যদি মাছ হয়ে জন্মায় তখন জলের মধ্যে অক্সিজেন নেবে কি করে, মানুষকে জলের মধ্যে এক মিনিটেরও কম সময় ডুবিয়ে রাখলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। এই সূত্রে এটাই বলছে – কোন জন্মে যখন টিকটিকি বা মাছ হয়ে জন্মে ছিল সেই জন্মের সাথে এই টিকটিকি বা মাছ জন্মের যোগ হয়ে যাবে, এই যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ওই জন্মে যা যা করত, যে ভাবে চলে ফিরে বেড়াত, সেই স্বভাবটাই এসে যাবে। এই দুটো জন্মের মধ্যে ধারাবাহিকতার কোন অভাব তার নজরে পড়বে না। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবটা কোথায় দেখা যাবে? মাঝখানে যে আরও এক লক্ষ জন্ম হয়ে গেছে, সেটাকে ধরা যাবে না। পাশ্চাত্যে জেনেটিক বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানীরা যা বলছেন আমাদের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আমরা বিশ্বাস করি এই জন্মটাই সব নয়, সৃষ্টি থেকে মুক্তি পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ জীবন-যাত্রার পরিক্রমা চলছে এর পুরোটাই আমরা সব কিছুর মধ্যে বিবেচ্য হিসাবে মাথায় রাখি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন বাবা-মা থেকে সন্তান, আমরা বলি বাবা-মা থেকে সন্তান নয়, আমি থেকেই আমি। কিন্তু আমরা পরিবেশের গুরুত্বকে অস্বীকার করিনা, কেননা কর্মশায়ের কর্মগুলিকে ভালো করার জন্য পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

এই সূত্রের মূল বক্তব্য হল, স্মৃতি আর সংস্কার এই দুটোর একটা ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। কিসে কিসে এই দুটোর ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে? যদি কোন কারণে আপনার যোনি পাল্টে যায়, যদিও আপনি যোনি থেকে যোনি আলাদা হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জাতি, স্মৃতি ও দেশ আপনাকে এই আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে আটকে দেবে। ভেতরে যেমন যেমন কামনা-বাসনা আছে, এই কামনা-বাসনাগুলোও থেকে যাবে, এগুলো কোন ভাবেই যাবে না। আমরা যা কাজ করছি সেই কাজের একটা ছাপ আমাদের ভেতরে সংস্কার রূপে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কাজ সংস্কারে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আর সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে স্মৃতিতে চলে গিয়ে আরও গভীরে চলে যায়। গভীরে চলে গেলেও আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার ও বৃত্তিগুলো কখনই পাল্টে যাবে না। আমরা যেমন বললাম সিংহ থেকে মানুষ হল, কিন্তু সিংহ থেকে মানুষ কখনই এভাবে হবে না। তখনই হবে যখন একজন মানুষের মধ্যে প্রচুর হিংসা বৃত্তি এসে যাবে। সিংহ হয়ে গেলে তো তার হিংসা বৃত্তি শেষ হয়ে যাবে না, বরং আরও তার মধ্যে হিংসা বৃত্তি এসে যাবে। এবার যদি কোন শুভ সংস্কার বশতঃ মানুষের শরীরে জন্ম নেয়, এবারও কিন্তু তার মধ্যে হিংসা বৃত্তিটা থাকবে। কিন্তু মানুষ থেকে মানুষ আর সিংহ থেকে সিংহের ধারাবাহিকতাটা এখন আর নেই। অন্য দিকে স্মৃতি অর্থাৎ মূল বৃত্তি যেগুলো আছে, এগুলো কখন পাল্টায় না। আমরা কখনই এই আশা করতে পারি না যে আপনি গত জন্মে সিংহ ছিলেন আর এই জন্মে ভালো সাধু হয়েছেন, এভাবে কখন হবে না। স্বামীজী এখানে বলছেন যখন অন্য রকমের শরীর এসে যায়, তখন সেই শরীরের পক্ষে অনুপযুক্ত স্মৃতিগুলো বন্ধ থাকবে। কিন্তু আপনার স্মৃতি কখন হারিয়ে যাবে না। যেমন ধরুন আপনার এটিএম কার্ডে আপনি টাকা তুলছেন, আপনার প্লী টাকা তুলে আনছে, কখন আপনার ছেলে তুলছে। কিন্তু যতই এটিএমের হাত পাল্টাপাল্টি হোক না কেন, কার্ডের হিসাব একই থাকবে।

যখন পর পর একই যোনিতে অনেকবার জন্ম নিতে থাকে তখন তার কর্ম ওই আগের শরীরে কৃত কর্মের অনুসারেই চলতে থাকবে। এখানে যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, যতটুকুই পড়ে থাকুন না কেন, এর পরের জন্মে তাঁরা যদি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন তখন আবার ওখান থেকেই শুরু করবেন। তখন হয়ত মনে হবে হঠাৎ এই শাস্ত্র পাঠের ইচ্ছে কোথা থেকে এসে গেছে। আগের আগের জন্মগুলি যদি দেখা যায় তখন মনে হবে খাপছাড়া চলছে। কিন্তু কোন খাপছাড়া চলে না, একই যোনিতে যোনিতে, একই জাতি জাতিতে যোগ থাকবে। যদিও বা এরা সময় ও স্থানের ব্যবধানে জন্ম নেয়, কেউ হয়তো আজকে ভারতে জন্ম নিয়েছে, এর দশ জন্ম পরে সে যদি আমেরিকায় গিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তখন ভারতে থাকাকালীন তার স্বভাবটাই আমেরিকাতেও চলতে থাকবে, সেখানে কোন পরিবর্তন হবে না। তাই বলছেন স্থান, কাল ও জাতি এই তিনটেকে আলাদা করতে পারা যায় না। মানুষ জন্মের পর কোন কারণে অনেক নিম্ন যোনিতে চলে গেল, তা এই মানুষ শরীরে যা যা ভালো কাজ করেছে ওগুলো অপেক্ষা করে থাকবে, আবার যখন মানুষ যোনিতে আসবে তখন আবার এগুলো বেরিয়ে আসবে। যদি কারুর ওপরে আমার প্রচণ্ড রাগ থাকে, সে হয়তো মরে আবার দশ জন্ম পরে মানুষ হয়েছে বা মুক্তি পেয়ে গেছে, তখন এই রাগটা কোথায় যাবে? যোগদর্শনে কোথাও বলছে না যে কর্মের ফল কর্ম রূপেই প্রসব করবে, কর্মের ফল সংস্কার রূপেই জন্ম নেবে। আমরা কি ধরণের কাজ করছি, কাকে মারছি, কাকে গালাগাল দিচ্ছি যোগদর্শনে এ সবার কোন গুরুত্ব নেই। যেটা সব থেকে গুরুত্ব তা হল – যাই করা হোক না কেন ওই কর্মের পেছনে একটা সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে, এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিই বড় আকার পেতে পেতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যে ধরণের সংস্কারের চর্চা করতে থাকবে সেই সংস্কারগুলির ক্ষমতাই বেড়ে যায় এবং উপযুক্ত সময়ে ওই সংস্কার কর্ম রূপে বেরিয়ে আসে। আর এই সংস্কারগুলিই জন্মে জন্মে একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। কেউ আছেন খুব হিংস্র আর ক্রোধী, তিনি কোন কারণে, কিছু একটা ব্যাপারে মরে ছাগল হয়ে গেলেন। এখন ছাগলের শরীরে তার হিংস্র স্বভাবযুক্ত কর্ম প্রসব করতে পারবে না, কেননা ছাগল অতি নিরীহ প্রাণী। তাহলে কি হবে? এখন ছাগলের শরীরের পক্ষে যেটা উপযুক্ত সেই কর্মসংস্কার গুলিই বেরোতে থাকবে, আর এই হিংস্র সংস্কারগুলো জমা থাকবে। এর যেন কোন শেষ নেই। তাহলে কত জন্ম লাগবে? ভগবান জানেন কত জন্ম লাগবে, কোটি কোটি। কিন্তু সবারই একদিন মুক্তি হবে। তবে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ার কৌশলটা একমাত্র রাজযোগই শিক্ষা দেয়।

সেইজন্যই রাজযোগ বলছে তোমার মনই আসল, মনেই সব কিছু হচ্ছে। রাজযোগ শুরুতেই তাই বলে দিয়েছে এই জগতে যত জীব আছে, সবারই একটা মন আছে, আর এই মন সর্বক্ষণ পাঁচ ধরণের রূপ নিচ্ছে – *প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃত্যঃ*। মনের এই বিভিন্ন রূপ হচ্ছে বলে আসল বস্তুকে আমরা বুঝতে পারছি না। যেমন এই সমুদ্র আছে, আর সমুদ্রে অনবরত ঢেউ উঠেই চলেছে, ঢেউয়ের জন্য সমুদ্রের নীচে কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যোগদর্শন আমাদের শিক্ষা দেয় এই ঢেউ ওঠাটাকে কিভাবে বন্ধ করতে হবে আর তুমি তোমার বাস্তবিক স্বরূপকে কিভাবে জানবে। বলছেন যে যে বৃত্তি তোমার স্বরূপকে আটকাচ্ছে সেই সেই বৃত্তিকে তুমি নিরোধ করে দাও।

একটা প্রজেক্টর দিয়ে দেওয়ালে ক্রমাগত নানান রকমের ছবি ফেলা হচ্ছে। এখন একজনের খুব ইচ্ছে হল ‘দেওয়ালে কি আছে আমি দেখতে চাই’। দেওয়ালকে দেখতে হলে তাকে আগে প্রজেক্টরটা বন্ধ করতে হবে। প্রজেক্টর তখনই বন্ধ হবে যখন ওর মধ্যে যে রীলটা ঘুরছে, সেটা ঘুরে ঘুরে যখন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতির প্রজেক্টরের রীল অফুরন্ত, এ চলতেই থাকবে। সে বলছে আমার অত ধৈর্য নেই। অত ধৈর্যই যখন নেই তাহলে ওই রীলটাকে কেটে উড়িয়ে দাও। যোগ আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে এই রীলটাকে কাটতে হবে। রীল যেই কেটে উড়িয়ে দিল তখন কি হবে? তখন দেওয়ালে আর ছবি পড়বে না। যখন দেওয়ালে আর কোন ছবি পড়বে না তখন বুঝে গেল দেওয়ালে কি আছে। দেওয়ালটা কি রকম? বলছেন *তদা দ্রষ্ট্বঃ স্বরূপেহবস্থানম্*। তখন যিনি দেখছেন তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপে অবস্থান করেন।

যোগের এই কথাগুলো কতটা সত্য, আর কতটাই বা কার্যকর আমরা এখনও জানিনা। আমাদের যে বুদ্ধির দৌড় সেই দিয়ে যোগীদের অনেক কিছুই ধরতে পারব না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, আমরা ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনে এমন অনেক কিছু দেখতে পাই এবং অন্যান্য অনেক যোগীদের জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা যুক্তি তর্কের বাইরে, যেগুলি কোন দিন যুক্তি দিয়ে ধরা যাবে না। যোগীরা কখনই নিজেদের প্রচার করেন না, কাউকে কিছু বলতে যান না, নিজের খুব কাছের মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিষ্যদের কাছে উপদেশ দেওয়ার ছলে কিছু কিছু কথা বলে গেছেন – এই রকম করলে এই রকম হয়, ওই রকম করলে সেই রকম হয়। তাঁদেরই কিছু কিছু কথা সংগ্রহ করে পতঞ্জলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পতঞ্জলি বলছেন – আজ তুমি যা হয়েছ সেটা গতকাল যা করেছিলে তার জন্য। আজকে তুমি যা করছ, এটা এখন কিছুই হবে না। তাই যোগ বলছে আমরা অতীত আর বর্তমানকে পাল্টাতে পারব না, কিন্তু ভবিষ্যতকে এখন থেকেই পরিবর্তন করা শুরু করে দিতে পারি।

পাশ্চাত্যে ইদানিং একটি স্লোগানকে খুব আকর্ষণীয় করে সবাইকে উপদেশ ছলে বলছে – live in the present, take care of the present, কিন্তু প্রাচ্যের পণ্ডিতরা বলছেন বর্তমান আপনার হাতের বাইরে, আপনি বর্তমানকে কখনই পাল্টাতে পারেন না। যোগও তাই বলছে – take care of the future. স্বামীজীর লেখা, বক্তৃতার মধ্যে এই ধরণের বাণী ভুরিভুরি ছড়ানো রয়েছে – আজকে তোমার যা ভালো মন্দ আছে এর সবই তোমার অতীতের জন্য, এখন তুমি যা করছ সেটা ভবিষ্যত বলবে তুমি কি করেছ। মহাভারত এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে বহুবার এই বিষয়টি আলোচনাতে আসে, কোনটা প্রধান – পুরুষার্থ না দৈব। কোনটাই প্রধান নয়। যখন কর্ম হচ্ছে, যে কর্ম এখন করা হচ্ছে এই কর্ম সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাঞ্জে সেভিংস এ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার মত কর্মশয়ে ভবিষ্যতের জন্য জমা পড়ে গেল। সেইজন্য আমাদের মহাপুরুষরা বলেন – তুমি আগে যা করেছ করেছ, হয়তো তখন তোমার সেই বিবেক বিচার ছিল না, এখন তোমার বিবেক একটু জাগ্রত হয়েছে, জাগ্রত হয়েছে মানে, এখন তুমি শাস্ত্র পড়ছ, তোমার সংস্কৃতি হচ্ছে, তাই এখন তোমার জীবনকে এমন ভাবে তৈরী করে নাও, যাতে অন্তত ভালো কিছু সংস্কার যেন জমিয়ে নিতে পার। আর যদি তা না করতে পার, তাহলে এ জন্মে যেমন কাঁদছ সামনে তোমার যত জন্ম পড়ে আছে সব জন্মে কেবল কাঁদতেই থাকবে।

এরপর পতঞ্জলি মনের গতিপ্রকৃতির আরো সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন। যোগের মতে এই জিনিষগুলোকে প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যোগদর্শন অধ্যয়ন করতে গেলে এগুলোকেও আমাদের বোঝা দরকার। যোগের মতে পুরুষই সচ্চিদানন্দ। তাঁর স্বভাবই চৈতন্য, চৈতন্য একমাত্র পুরুষেরই থাকে। প্রকৃতির কোন চৈতন্য নেই। প্রকৃতিকে আমরা দুটো আকারে পাই – একটা জড় আকারে আরেক মন রূপে। মন খুব সূক্ষ্ম আর জড় অনেক স্থূল। পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন পুরুষ প্রকৃতিকে তাঁর আলো দেয়। প্রকৃতি যখন পুরুষের থেকে আলো পেয়ে গেল তখন মন আলোকিত হয়ে চনমনে হয়ে উঠল। মন চৈতন্যের আলোতে এমন জ্বলে উঠল তখন মনে হয় মনই যেন স্বয়ংচৈতন্য। যেমন আমরা মনে করছি টিউবের সাদা কাঁচটাই জ্বলছে। কিন্তু কাঁচের ভেতরে যে গ্যাস আছে তাতে তড়িৎ প্রবাহ হলেই গ্যাসে স্পার্ক হতে থাকে তাতে গ্যাস থেকে আলোর বিকিরণ হয়, আর আমরা মনে করছি কাঁচটাই আলো দিচ্ছে। অথচ কাঁচের নিজস্ব কোন আলো নেই। ঠিক একই জিনিষ মনের ক্ষেত্রে হয়। মনের নিজস্ব কোন চৈতন্যই নেই, তথাপি মনকেই চৈতন্যময় বলে মনে করি।

সুখী হওয়ার বাসনা অনাদি, তাই বাসনাও অনাদি

পরের সূত্রে বলছেন – **তাসামনাদিতুধগাশিষো নিত্যত্যাৎ।।১০।।** সুখের বাসনা সবাই করে, মানুষের কাছে সুখই নিত্য আর তাই বাসনারও তার শেষ নেই। মানুষের যে এই চাহিদা – আমি সুখী হব, এই সুখী হওয়ার ইচ্ছাটা যেমন অনন্ত, তার কামনাও অনন্ত। সবাই সুখ চায়, মানুষ অন্য যা কিছুই করুক, দুঃখকে কেউই চায় না, গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসী সবাই সুখী হতে চায়। সৃষ্টি যবে থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই সুখী হওয়ার ইচ্ছাটাও এসেছে, সেইজন্য বলছেন **তাসামনাদিতুধগাশিষো**, সুখী থাকার ইচ্ছাটা অনাদি। জগতের আমরা সব কিছুই ছেড়ে দিতে রাজী হব কিন্তু সুখকে, যেটাতে শান্তি পাওয়া

যায় সেটাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইব না। সবাই এসে বলে, শান্তি কোথায় পাব? মানুষ মনে করে – সুখ স্বপনে শান্তি শশ্মানে। শশ্মানেই বা কোথায় শান্তি, সেখানেও অশান্তি। শশ্মানে অশান্তি কেন? মানুষ মরে যাওয়ার পর তার শরীরটাকে যখন চুল্লীর ভেতরে ঢোকাচ্ছে তখন সূক্ষ্ম শরীরটাতো তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সূক্ষ্ম শরীরটা এখন যাবে কোথায়, সেতো বুদ্ধিকে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। তখন তো তার আরো দুশ্চিন্তা, এখন কি শরীর পাবে কোথায় কিভাবে থাকবে কিছুই জানা নেই। শশ্মানে প্রেতাত্তাদের যে কি ভয়ঙ্কর অশান্তি আমরা কল্পনাই করতে পারবো না। যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে আছে ততক্ষণ নিশ্চিত যে আমি যেখানেই থাকি না কেন, বাড়িতে গেলে খাবার পাব, বাড়িতে গেলে নিশ্চিন্তে একটা ঘুমোবার জায়গা পাবো। কিন্তু যখন প্রেতাত্তা হয়ে গেল তখন তো তার দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। যমরাজ যখন এক শরীর থেকে অন্য শরীরে নিয়ে যান তখন প্রেতাত্তার স্মৃতিটাকে ঢেকে দেন। কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চ যোগী তাঁরা স্মৃতিটা ধরে রাখতে পারেন। যেমন জড়ভরত যখন হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন তখন তাঁর স্মৃতি পুরো জাগ্রত ছিল – আরে আমি ছিলাম রাজা, এখন হরিণ হয়ে এসেছি। বলছেন – আমরা সব সময় বলছি সুখ চাই সুখ চাই, এই যে বোধ এটাই অন্তহীন কামনা। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কামনা কবে থেকে শুরু হল – বলছেন কামনা অনাদি, কবে থেকে শুরু হয়েছে কেউ বলতে পারবে না। সৃষ্টি যখন থেকে হয়েছে তখন থেকেই চলে আসছে। যদি কেউ প্রথমেই কামনামূল্য হয়ে থাকত তাহলে তার শরীর ধারণই হত না। যেহেতু আমার আপনার কামনা আছে তাই আমরা কর্ম করছি। মানুষ যত কাজ কর্ম করে সবই কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়েই করে। যোগের এই অন্যতম তত্ত্বটিই যোগের দার্শনিক দিক, যোগের এটি একটি স্তম্ভ।

আমাদের ভেতরে সব সময় অপূর্ণতা, এই অপূর্ণতা আমাদের সুখের পেছনে দৌড় করাচ্ছে। এই সুখ চাওয়া কোন দিন নিবৃত্ত হবে না। পরে বলবেন যত সুখ যত শান্তি সব আমারই ভেতরে। সুখ আর শান্তি বাইরে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা? আমার পরিবার, আমার প্রিয়জন, আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমি যে সুখ শান্তি খুঁজছি, সেই সুখ শান্তি বাইরে থেকে কোন দিন পাওয়া যাবে না। সুখী হওয়ার ইচ্ছাটা অনাদি, সেইজন্য বলা যাবে না এগুলো কোথা থেকে শুরু হয়েছে। আবার এই সুখ যেহেতু অনাদি সেই হেতু কামনা-বাসনাও অনাদি। এটাকেই বেদান্ত বলছে অবিদ্যা-কাম-কর্ম। অবিদ্যার জন্য তুমি নিজেেকে ভুলে গেছ তাই তোমার কামনার শেষ নেই। কামনা আছে বলে কর্ম করে যেতে হচ্ছে।

কামনা-বাসনার হেতু অবিদ্যা এবং আশ্রয় চারটি

কামনা কিভাবে কাজ করে? বলছেন – *হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেবামভাবে তদভাবঃ* ১১১। এর আগে আগে ক্লেশের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল, অবিদ্যা, রাগ, দ্বेष, অস্মিতা, অভিনেবেশ এই পাঁচটি থেকে ক্লেশ হয়। অস্মিতা মানে পুরুষ আর প্রকৃতির যেখানে সংযোগ হচ্ছে, আমি তোমার তুমি আমার এটাই অস্মিতা। অবিদ্যা মানে যেখানে ভুল দেখছে, ভুল দেখা মানে যেখানে শুচি সেখানে অশুচি দেখছে, অশুচিতে শুচি দেখছে, যেটা নিত্য সেটাকে দেখছে অনিত্য – এটাই অবিদ্যা। সবার মা হল অবিদ্যা। কিন্তু অবিদ্যা আর প্রকৃতি আলাদা, প্রকৃতির একটা ফল হল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা আবার বেদান্তের অবিদ্যাও নয়। তারপর জাতি, আয়ু, ফল ও ভোগ এগুলোও আগে আলোচনা করা হয়ে গেছে, এর সাথে মনের বিভিন্ন আবেগকে কীভাবে জয় করতে হবে বলা হয়েছে। এই ধরনের নানান রকম আলোচনা করার পর এবার বলছেন মানুষের মনের মধ্যে ইচ্ছা জিনিষটা রয়েছে, তার মধ্যে নানা রকম ভোগের ইচ্ছা রয়েছে, এই ইচ্ছা কাজ করে চারটে জিনিষের উপর। এই চারটে হল হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন। মূলতঃ এই চারটির জন্যই কামনা কাজ করছে – হেতু, ফল, আশ্রয় আর আলম্বন, তার মানে এই চারটে পুরো জগৎকে চালাচ্ছে। এই যে সংসার, এই সংসার চলছে পুরোপুরি কামনা বাসনার জন্যই। কিন্তু যদি কামনা বাসনা না থাকে, যদি নির্বাসনা হয়ে যায় তখন তার শরীর ধারণের আর কোন প্রয়োজনই হবে না, তার মানে তাকে আর জন্মই নিতে হবে না। যে কোন কাজের পেছনে যে শক্তি আমাদের প্রেরিত করে তা হল এই কামনার শক্তি। এই কামনা শক্তি চারভাবে কাজ করে – হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন। আরো সহজ করে এই চারটেকে বলা হয় কার্য, কারণ,

আধার ও বিষয়। হেতু মানে কারণ, যেখানেই কারণ থাকবে তার একটা ফল হবে। খাওয়া-দাওয়া করলে পেট ভরবে, এখানে হেতু হল খাওয়া আর ফল হল পেট ভরা। আশ্রয় কোন জিনিষকে আশ্রয় করে থাকে, আর আলম্বন মানে যার সাহায্যে দাঁড়িয়ে আছে।

যে কোন বাসনার মূল কারণ রাগ ও দ্বেষ, এগুলোই দুঃখদায়ক বিঘ্ন। রাগ আর দ্বেষ এই দুটোই কামনা তৈরী করে – সেইজন্যে কর্মযোগে স্বামীজী বলছেন – avoid not, seek not. আমাদের মনে যত রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা কার্য কারণের জন্য ধরা আছে। আমাদের মনে যদি কোন ইচ্ছা জাগে সেই ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ইচ্ছা আমাদের ছাড়বে না। কারণ মনই হল রাজা, রাজার কোন ইচ্ছা জাগা মানে সেই ইচ্ছা ফল না দেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না। হেতু হল কারণ আর ফল হল তার কার্য। হেতু মানেই ক্লেশ, এর আগে বলা হয়েছিল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটিই ক্লেশযুক্ত। মানুষের জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট তার একমাত্র হেতু হল এই পাঁচটি। মানুষ যা কিছু কর্ম করছে এই পাঁচটির জন্যই করে, এই পাঁচটিই হেতু। এর আগে আলোচনা করা হয়ে গেছে কীভাবে অবিদ্যা, অস্মিতাদি এই পাঁচটাকে নাশ করতে হবে, সেইজন্যে এখানে আর এই নিয়ে আলোচনা করছেন না। শুধু বলছেন তুমি হেতুটাকে উড়িয়ে দাও।

অবিদ্যা, অস্মিতা আর রাগ ও দ্বেষ, অর্থাৎ আমার মধ্যে যখনই দ্বেষ আসছে তখন আমি কোন কিছুর থেকে পালাতে চাইছি, আবার যখন কোন জিনিষের প্রতি ভালোবাসা বা আকর্ষণ হচ্ছে সেই বস্তুর দিকে ছুটে যাচ্ছি। এইভাবে কখনো আমি কোন কিছুর দিকে ছুটে যাচ্ছি আবার কখন কোন কিছুর থেকে পালাতে চাইছি – রাগ আমাকে সেই বিষয়ের দিকে দৌড় করাচ্ছে আর দ্বেষ সেই বিষয় থেকে পালাতে বলছে। এই পাঁচটার একটাই পরিণাম, তা হল কামনা। আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে আর আমাকে এই জিনিষটা পেতে হবে। এই পাঁচটার হেতুতে যখন কামনার উৎপন্ন হয়ে মানুষ কাজ করতে শুরু করে তখন সব সময় তার এই জিনিষগুলি ফল হয়ে বেরোবে জাতি, ভিন্ন পরমায়ু ও সুখদুঃখাদি ভোগ। আগে এই ব্যাপারটা পেয়েছিলাম সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ এই সূত্রে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের হেতু বশাৎ যখনই কাজ করছি সেই কাজের ফল আমাকে বিভিন্ন যোনিতে নিয়ে গিয়ে জন্ম দেওয়াবে, কাজের ফল অনুযায়ী তার আয়ুকাল নির্ধারিত হবে এবং কাজের ফলানুসারে সুখ-দুঃখাদি রূপে বিভিন্ন রকমের ভোগ দেবে। হয়তো কারুর প্রচুর টাকা পয়সা আসছে, তার মানে ক্লেশমূল বশাৎ তার যেমন যেমন কর্ম হয়েছে সেই অনুসারে এখন তার টাকা আসছে। অবশ্য শেষে সবটাই ক্লেশ, টাকাও ক্লেশ আবার টাকা না থাকটাও ক্লেশ। বেশী দিন বেঁচে থাকাও ক্লেশ আবার কম বয়সে মরে যাওয়াটাও ক্লেশ। জগতে ক্লেশ ছাড়া কিছু নেই। আমরা যেটাকে আপাতঃ সুখ বলে মনে করছি, সেই সুখের মূলেও দুঃখই রয়েছে। একটা জিনিষ কাছে আছে বলে আমাকে সুখ দিচ্ছে, সেই জিনিষটা চলে গেলে আমাকে দুঃখ দেবে, তার মানে সুখটাও ক্লেশমূল। সুতরাং ক্লেশ ছাড়া জগতে কিছু নেই। অবিদ্যাদি এই পাঁচটিই ক্লেশ, আর এই পাঁচটা জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিন ভাবে ফল দেয়। আমরা যে রাজা ভারতের কাহিনী বললাম, সেখানে রাজা ভারতের একদিকে যেমন অবিদ্যা এসেছিল অন্য দিকে তার সঙ্গে অস্মিতাও এসে গিয়েছিল। একটা হরিণ শাবককে দেখে তাঁর করুণার উদয় হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় ভাবছে, আমি মরে গেলে এই হরিণ শাবকের কি দুর্গতিই না হবে! রাজা ভারতের মনে অবিদ্যা অস্মিতা এসে গেল। অবিদ্যা অস্মিতাই সমস্ত ক্লেশের মূল, তাই ফল রূপে ধাক্কা দিল জাতিতে, জন্ম হল হরিণ হয়ে।

আবার কামনার একটা আশ্রয় চাই, মন নিজেই সমস্ত কামনার আশ্রয়। মন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কামনা-বাসনা এরা সবাই সেখানে আশ্রয় পেয়ে যাবে। সেইজন্যে বলা হয়েছিল সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেহেতু মনের নাশ হয় না, তাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে গেলেও আজ কিংবা কাল আবার তার পতন হয়ে যাওয়ার পুরো সম্ভবনা থেকে যাবে। যতক্ষণ মনকে উড়িয়ে মনোনাশ না করে দেওয়া যায় ততক্ষণ মনের বেঁধে ফেলার ক্ষমতাও থেকে যাবে। একটা বিরাট গুদাম ঘরের মত মনের মধ্যে সব জমছে আবার ওখান থেকেই সব বেরোচ্ছে। বিষয় হল যে জিনিষটার জন্য সব কিছু হচ্ছে। যেমন

একজন কিছু খেতে ভালোবাসে। কেন সে বিশেষ খাদ্যকে খেতে চাইছে? কারণ তার একটা কামনা রয়েছে। কেন কামনা হচ্ছে? কারণ তার ওই খাবারের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে, এটাই রাগ। রাগ থাকে কোথায়? তার মনে। এখন এই রাগকে কিভাবে কার্যকর করা হবে? বিরিয়ানী খেতে ভালো লাগে, বিরিয়ানীটা হয়ে গেল এর বিষয়। এখন বিরিয়ানী জোগাড় করতে থাকল। বিরিয়ানী জোগাড় হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া রূপে রাগ কার্যকর হয়ে গেল। এই কার্যের পরিণাম কি হবে? পেটে ব্যাথা হতে পারে, কোলস্টোরাল বেড়ে যেতে পারে। এই হল চারটে – হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন। মনই হল সব কিছুর আশ্রয়, মানে চিন্তের মধ্যে সব সংস্কার জমে আছে। আমরা তো শুধু এই জন্মের সংস্কারগুলো সামনে দেখছি, কিন্তু চিন্তের গভীরে কত কত জন্মের কত কত কর্ম সংস্কার বীজ হয়ে জমে আছে আমরা ধারণাই করতে পারবো না।

মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে বলে – আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই, তার মানে তারতো অভিনিবেশ কেটে উড়ে গেছে। বুড়ো হয়ে গেলে বলে – আমার আর কোন ভোগের ইচ্ছা নেই। যার জীবনের প্রতি আসক্তি চলে গেছে, ভোগের ইচ্ছা যার আর নেই, সে তো সমাধিবান পুরুষ, তার তো মুক্তি হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মুক্তি তো হচ্ছে না, কারণ এই জন্মের মত যা কিছু ভোগ করার ছিল সব ভোগ মিটে গেছে আর ইন্দ্রিয়গুলোও শিথিল হয়ে গেছে বলে ভোগের ইচ্ছা থাকলেও ভোগ করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ভেতরে আশ্রয়টা তো থেকে গেছে। সেই আশ্রয় মানে চিন্তের মধ্যে তার আগের আগের জন্মের সব রেকর্ডিং হয়ে আছে, সেগুলো যাবে কোথায়! আগামী জন্মে আবার নতুন করে সব শুরু হবে। মনের নাশ না হওয়ার পর্যন্ত কিছুই হবে না, তোমাকে বার বার এখানে ফিরে আসতে হবে। মনের নাশ হওয়াটাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কৈবল্য মানেই মনের নাশ হয়ে যাওয়া।

তাই বলছেন মনের মধ্যে যত রকমের সংস্কার পড়ে আছে সব সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনের নাশ কিছুতেই হবে না। এর আগে আমরা নির্মাণচিত্ত বা ব্যুহকায় নিয়ে আলোচনা করেছি। চিন্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত সংস্কার গুলোকে নাশ করার জন্য যোগী নিজেরই অনেকগুলো শরীর ও মন নির্মাণ করে নিয়ে সেই শরীরের মাধ্যমে যে সংস্কারগুলো খুব শক্তিশালী সেগুলোকে ক্ষয় করতে থাকেন। আচার্য শঙ্কর সেই সময়কার কর্মকাণ্ডীদের নেতা মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে তর্ক করতে গেলেন। তর্কে মণ্ডন মিশ্র আচার্যের কাছে হেরে গেলেন। স্বামী হেরে গেলে কী হবে! মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী আচার্যকে ছাড়বেন না, বললেন ‘আপনাকে আমার সঙ্গে তর্ক করতে হবে’। মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী শঙ্করাচার্যকে নারী-পুরুষের সম্পর্কে নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। আচার্য সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর জানার কথা নয়। আচার্য শঙ্কর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীর কাছে কিছু দিনের সময় চেয়ে নিলেন। আচার্য সেখান থেকে এসে সদ্যমৃত এক রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করে গেলেন। মৃত রাজা ধড়মড় করে জেগে উঠেছে। রাজা জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন। এই রাজা এখন প্রতিদিন রানীকে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। রানী ভাবছে এতদিন পরে রাজা এসব প্রশ্ন কেন করছে! রানীর সন্দেহ হয়েছে, নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে। রানী বুদ্ধিমতি ছিলেন, বুঝেছেন রাজার শরীরে অন্য কোন জীবাত্মা প্রবেশ করেছে। রানী মন্ত্রীকে খোঁজ করতে বললেন কোথাও কোন মৃতদেহ পড়ে আছে কিনা। রানীর লোকেরা প্রায় ধরে ফেলেছিল। এরা এসে খবর দিয়েছে একজন সন্ন্যাসীর মৃতদেহ অমুক জায়গায় রাখা আছে। রাজার শরীরে আচার্যও বুঝেছেন কি হতে যাচ্ছে। সময় মত নিজের শরীরে প্রবেশ না করে নিলে আমার আসল শরীরটাকেই এরা পুড়িয়ে দেবে। তিনিও তাড়াতাড়ি করে রাজার শরীরকে ছেড়ে নিজের আসল শরীরে ঢুকে গেলেন। এগুলো কাহিনী, পুরোপুরি আক্ষরিক ভাবে না নিলেও কোন ক্ষতি নেই। আমরা যদি কাহিনীটাকে সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে আচার্য শঙ্করকে এক নারী এই ধরণের কিছু প্রশ্ন করছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর জানার কথা নয়। এখন তাঁকে তাই একটা আলাদা শরীর দাঁড় করাতে হবে, যে শরীর দিয়ে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা জানবেন, জেনে মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তিনি তাই আরেকটি শরীরে প্রবেশ করে সব কিছু জেনে নিয়ে মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চলে গেলেন। এখানে কায় প্রবেশ না বলে বলছেন ব্যুহকায়। যোগী নিজেরই ক্লোনিং করে দিচ্ছেন, মনেরও

ক্লোনিং করে দিচ্ছেন তার সাথে শরীরেরও ক্লোনিং করে দিচ্ছেন। অনেকগুলো শরীর ও মন হয়ে গেলেও এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে যোগীর আসল যে মন তার হাতে। ক্লোনিং আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আসল যার ক্লোনিং করা হবে আর যেটাকে ক্লোনিং করা হয়েছে, এই দুটোর মন কখনই এক হবে না। এখানে কিন্তু বলেই দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন কাজের জন্য ক্লোনিং করে দেওয়া হয়েছে। যোগে ক্লোনিং না বলে বলা হয় ব্যুহকায়।

শেষে বলছেন আশ্রয়ালম্বন। এই আশ্রয়ালম্বনটাই খুব মারাত্মক। হেতুটাও খুব মারাত্মক ব্যাপার, যেটাকে বলা হয়েছে ক্লেশমূল, ক্লেশমূল হল অবিদ্যা, অস্মিতা ইত্যাদি। সাধনা করে, প্রচুর জপ-ধ্যান, তপস্যা করে আপনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটাকেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। এর ফলে জাতি, আয়ু আর ভোগ এই তিনটেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এল। আপনি ক্লেশমূলকে নাশ করে দিলেন, তাহলে তো আপনার আর জাতি, আয়ু ও ভোগ থাকবে না। কিন্তু ওর আসল যে আশ্রয় মন বা চিত্ত তো থেকে গেছে, তার সাথে আরও বাজে এর যে আলম্বন এই জগতও থেকে গেছে, আশ্রয় আর আলম্বন এই দুটো থেকেই গেছে। ঠাকুর কথামতে বলছেন – বিকারের রোগীর ঘরে এক জালা জল আর তেঁতুলের আচার রাখা আছে, রোগীর বিকার কি আর সারবে কখন!

এখন বলছেন, যদি কোন ভাবে এই চারটে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসে তাহলে তখনই কেবল কামনা নিষ্কর্মা হয়ে যাবে, তখন বাসনা, কামনা যা আছে এরা আর কোন কাজই করতে পারবে না। কামনা-বাসনাই সব কিছুর মূল। এই কামনাই আমাদের সবাইকে নাচাচ্ছে, যদি এর হাত থেকে বাঁচতে চান তাহলে চারটে জিনিষকে আগে আয়ত্ত নিয়ে আসতে হবে – প্রথম হেতু – কামনার কারণ, দ্বিতীয় ফল – its effect, তৃতীয় আশ্রয়, যেখানে ওটা দাঁড়িয়ে আছে, চতুর্থ বিষয় মানে আলম্বন। এই চারটির সব কটাকে মেরে শেষ না করা পর্যন্ত কিছু হবে না। চারটেকে নাশ করা খুব কঠিন। আপনি নিজেকে জয় করে নিতে পারেন বুঝলাম, কিন্তু আপনাকে যে ভালোবাসতে চাইছে তাকে কি করে কেটে উড়িয়ে দেবেন! সে বলছে, আপনি মুক্ত হও আর নাই হও আমি কিন্তু তোমাকে ভালোবাসব। সেইজন্য বলছেন আলম্বন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে তোমাকে ছাড়বে না। সেইজন্য আলম্বনটাকেও নাশ করতে হবে। আর আশ্রয় মানে চিত্তকেও নাশ করতে হবে। আর বাকি রইল ক্লেশমূল এবং জাতি, আয়ু ও ভোগ। এর পুরোটাই যতক্ষণ নাশ না করা হয়, এর যে কোন একটা ঠিক আপনাকে বেঁধে জগতের মাঝখানে ফেলে আবার আছাড় মারতে থাকবে। এর একমাত্র পথ হল প্রকৃতির এলাকা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়া। প্রকৃতির এলাকা থেকে একবার বেরিয়ে যেতে পারলে তখন সবটাই উধাও হয়ে যাবে। কারণ ক্লেশমূল প্রকৃতির এলাকার, আলম্বন প্রকৃতির এলাকার, আশ্রয়ও প্রকৃতির এলাকায় আর ফল সেটাও প্রকৃতির এলাকার। তাহলে একমাত্র পথ হল প্রকৃতির খপ্পর থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া। এর আগে দশ নম্বর সূত্রে বলা হয়েছিল, সুখের ইচ্ছা অনাদি। সুখটাও অনাদি আর কামনা-বাসনাও অনাদি। কোন ভাবেই এগুলোকে শেষ করা যাবে না। এই চারটেকে নাশ করার একটাই পথ, বেদান্ত মতে বলবে জ্ঞান লাভ, জ্ঞান লাভ না হলে চারটে একসঙ্গে কখনই নাশ হবে না।

এবার যোগ পথে কি হয় দেখা যাক। আপনি খুব জপ করছেন, জপ করে আপনি আপনার মনকে জয় করে নিলেন। মনকে জয় করে খুব উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে গেলেন। উচ্চ অবস্থায় গেলেও কিছুই হবে না। কারণ আপনার এখনো মুক্তি হয়নি। মুক্তি না হওয়ার জন্য আবার আপনি সব কিছুতে জড়িয়ে যাবেন। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, হাতিকে স্নান করিয়ে দেওয়া হল, রাখায় এসে আবার ধুলো মেখে নিল। স্নান করেই হাতিশালে ঢুকিয়ে দিলে আর ধুলো মাখতে পারবে না। হাতিশালে ঢোকান মানে মুক্তি। মন যদি খুব পবিত্র হয়ে যায়, নির্বীজ যদি হয়ে যায়, তাহলে কামনা কাজ করবে না আর যদি বিষয়ই যদি না থাকে তাহলেও কামনা কোন কাজ করতে পারবে না। সেইজন্য সাধকদের বলা হয় – ভাই! তোমার রাগ দ্বেষ এখনও তোমাকে ছাড়েনি, মনকে তো ছাড়তেই পারোনি, তাই তোমার সাধনার সময় তুমি বিষয় থেকে যতটা পার দূরে থাক। বিষয় যদি সামনে না থাকে, বিষয়কে যদি সামনে না নিয়ে আসা হয় তখন কামনাও আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে সরে যাবে। সন্ন্যাসীদের এটাই বিশেষত্ব, তাঁরা বিষয়কে

তাঁদের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ভোগ করার জন্য বস্তু বা বিষয়ের দরকার, বিষয় যদি না থাকে তাহলে ভোগ হবে কী করে! যখনই গেরুয়া দিয়ে দেওয়া হল তখনই কুকুরের গলায় বকলেস্ লাগানো হয়ে গেল। গেরুয়া পেয়ে গেল মানে সে এখন ভগবানের পোষা কুকুর। সন্ন্যাসীদের ভেতরেও রাগ ও দ্বেষ রয়ে গেছে, এখনও কামনা বাসনার আশ্রয়স্থল মন বাবাজী বহাল তবিয়েতে রয়েছে। রাগ দ্বেষ তাহলে সন্ন্যাসীকে কিছু করতে পারছে না কেন? কারণ সন্ন্যাসী বিষয় থেকে সরে আছে। বিষয়ের সামনে গেলে বোঝা যাবে কে কতটা রাগ ও দ্বেষ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এইভাবে বিষয় থেকে দূরে থাকতে থাকতে যদি রাগ ও দ্বেষ থেকে কোন রকমে বেরিয়ে আসতে পারে তখন যত বিষয়ই এসে যাক না কেন, কিছুই হবে না, রাস্তায় যদি লক্ষ টাকার বাণ্ডিলও পড়ে থাকে সন্ন্যাসী তাকিয়েও দেখতে যাবে না, ওগুলোকে রাস্তার আবর্জনার মত মনে হবে।

সূত্রের এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংগৃহীতত্বাদেশ্যমভাবে তদভাবঃ, এই চারটেকে যখন শেষ করে দেওয়া হয় তখন এই চারটে থেকে আর কিছু সংগ্রহ হয় না বলে এই চারটিরই অভাব হয়ে যায়। চারটির অভাব হয়ে যাওয়ার জন্য আর কোন ধরণের বন্ধন হওয়ার কোন প্রশ্নই থাকছে না। যেটা দিয়ে বন্ধন হয় সেটারই অভাব হয়ে গেছে।

এই হল কামনা বাসনার কাটাছেঁড়া। কামনার ব্যবচ্ছেদ যখন করা হয় তখন এই চারটে জিনিষ বেরিয়ে আসে – হেতু (রাগ ও দ্বেষ), ফল (জাতি, আয়ু ও ভোগ), আশ্রয় (মন) আর বিষয় (যার উপর ভোগ হবে)। ফলের ক্ষেত্রে সব কিছুতেই যে একই জাতি হবে, সব কিছুতেই জীবনের আয়ুকে কমিয়ে দেবে বা বাড়িয়ে দেবে তা নয়, এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকমের হতে পারে। গাড়িকে যেমন ইঞ্জিনের শক্তি টেনে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি কামনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রাগ ও দ্বেষ।

বস্তু মাত্রই অতীত ও ভবিষ্যতে নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকে

এই বিষয়টা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার জন্য যোগ আবার দেখাচ্ছে তার দর্শন অর্থাৎ রাজযোগ পুরো ব্যাপারটা কিভাবে দেখে। সেটাকে দেখানোর জন্য এবার সময় অর্থাৎ কাল ও সৃষ্টিকে নিয়ে বলছেন। রাজযোগের চতুর্থ অধ্যায় কৈবল্য-পাদে রাজযোগের মূল দর্শনকে বেশি করে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আর বৌদ্ধ দর্শন এবং বেদান্তের সাথে যোগের পার্থক্যগুলিকে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরের সূত্রেই এই পার্থক্য গুলো ধরা পড়ছে— **অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥১২॥** রাজযোগ পর পর কয়েকটি সূত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেরই বর্ণনা করতে যাচ্ছে। জগতের বর্ণনা করতে গিয়ে সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে কালের তত্ত্ব যোগ মতে নিরূপণ করে দিচ্ছে। আমরা গতকাল অনেক কিছু করেছি, অনেক কিছু এসেছিল, আগামীকালও অনেক কিছু আসবে, সেগুলো কোথা থেকে আসবে, এই জিনিষগুলোকেই এখানে আলোচনা করছেন। অতীতানাগতং, অতীত মানে যেটা চলে গেছে আর অনাগত মানে যেটা এখনও আসেনি ভবিষ্যতে আসার প্রতীক্ষায় আছে। স্বরূপতোহস্ত্যধভেদাদ্ধর্মাণাম্, যোগ বলছে তোমার বর্তমানটাই আছে, আমি আপনি সামনা সামনি যা দেখছি এটাই আছে।

কোন দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আপনাকে যে কথাগুলো বলতে হবে, তখন আপনাকে ধরেই নিতে হবে সেই কথাগুলোকে অন্য দর্শন থেকে আক্রমণ করা হবে। তাই অন্য দর্শনের বিরুদ্ধ মতকেও আপনার খণ্ডন করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। আপনি নিজের মত স্থাপনা করছেন, তার সাথে আপনার একটা ধারণা আছে যে আপনার মতকে এই জায়গায় আক্রমণ করা হতে পারে, তাই আগে থেকে সেই জায়গাতে অপরের মতকে কেটে উড়িয়ে রাখতে হবে। আবার আপনার মতের বিরুদ্ধে অন্যান্য দর্শনে আগে থেকেই কিছু অন্য ধরণের কথা বলা আছে, আপনাকে সেটাকেও আপনার দর্শনে কেটে উড়িয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে আপনার দর্শনটাই সঠিক। পতঞ্জলি যোগদর্শনকে যখন লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই সময় আগে থেকেই বৌদ্ধদের শূন্যবাদের মত কিছু মতবাদ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সৃষ্টিতত্ত্বের উপর একটা খুব নামকরা মত হল শূন্য থেকে সৃষ্টি। বৌদ্ধরা বলেন নির্বাণ মানে শূন্য, কিছুই নেই। এর উপমা দিচ্ছেন – একটা প্রদীপ জ্বলছিল, ফুঁ দিয়ে প্রদীপের আলো নিবিয়ে

দেওয়া হল। প্রদীপের শিখা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, নিবে গেল। এই উপমা দিয়ে তো সেই উপমা হয় না, কিন্তু তিনি এটা বোঝানোর জন্য বলছেন। পদার্থ বিজ্ঞানেও এই নিয়ে বিরাট সমস্যা। সৃষ্টির উপর বিজ্ঞানের খুব নামকরা থিয়োরী হল বিগ ব্যাঙ। কিন্তু বিগ ব্যাঙ কোথা থেকে এলো? বিজ্ঞানীরা বলেন একটা সময়ের মধ্যে পুরো সৃষ্টিটা যেটা একটা পয়েন্ট সাইজের মধ্যে ছিল, সেটা বুম করে ফেটে গিয়ে সেখান থেকে ক্রমাগত সৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু ওই জিনিষটা কোথা থেকে এল? এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। ওনারা বলেন আমাদের ফিজিক্সের ইক্যুয়েশান ওই জায়গাতে কাজ করে না। এর থেকেও মজার ব্যাপার হল, ভ্যাটিকানের পোপ দেখলেন বিজ্ঞানীদের এই থিয়োরী খ্রিস্টান ধর্মের মতের সঙ্গে পুরো মিলে যাচ্ছে, কারণ God বললেন Let there be light and there was light। সৃষ্টি তাহলে কোথা থেকে এলো? শূন্য থেকে এসে গেল। বিগ ব্যাঙ খ্রিস্টান ধর্মের মতের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেল। পোপ বলে দিলেন বিগ ব্যাঙ হল ঠিক ঠিক scientific theory। যিনি বিগ ব্যাঙের একজন বড় founder তিনি নিজেই ছিলেন একজন খ্রিস্টান ফাদার। তিনি নিজেও বলতেন বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ধর্মের কোন সংঘাত হয় না। কিন্তু তিনি আবার পোপের পরামর্শদাতাকে গিয়ে বলছেন ‘পোপকে এই ধরণের কথা বলতে নিষেধ করুন, বিগ ব্যাঙ তা নয়’। বাইবেলের মতে সৃষ্টি শূন্য থেকে হয়েছে আর বিগ ব্যাঙও শূন্য থেকে হচ্ছে, বৌদ্ধদের সৃষ্টিও শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। রাজযোগ সবার মতবাদকে এই সূত্রে উল্টে দিচ্ছে। শুধু রাজযোগই নয়, হিন্দুদের কোন দর্শনই শূন্য থেকে সৃষ্টি, অসৎ থেকে সৎএর সৃষ্টি মানবে না। অসৎ থেকে কখনই সৎএর সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের সমস্যা হল, সাধারণ জগতে যা কিছু দেখছি সেই একই জিনিষ আধ্যাত্মিক জগতেও টেনে নিয়ে আসি, জাগতিক নিয়ম যে আধ্যাত্মিক জগতেও চলবে তা তো নয়। আবার হতেও পারে নাও হতে পারে।

কিন্তু এখানে বলছেন অতীত/নাগতং, আমি এখানে আমার ঘর থেকে এসেছি। এখানে আসার আগে আমি ঘরে কম্পিউটারে কাজ করছিলাম। কম্পিউটারটা এখনও ওখানেই রাখা আছে। তার মানে আমি যে জিনিষটা যে রকম ছেড়ে এসেছি সেই জিনিষটা সেই রকম এখনও ওখানে আছে। তাহলে আমার ভূত, অর্থাৎ আমার যেটা হয়ে গেছে সেটাও তো কোথাও থাকবে। আর ভবিষ্যত, যেমন ট্রেন যে স্টেশন থেকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সেই স্টেশনটা পেছনে পড়ে আছে আর যে স্টেশনটা আসছে সেই স্টেশনও সামনে কোথাও না কোথাও আছে। তাহলে ভূত আর ভবিষ্যত দুটো আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তাহলে আমার জীবনের যে ভূত আর ভবিষ্যত, যেমন গতকাল আমি রাজযোগের কথা শোনার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে করে এখানে এসেছিলাম, সেটা এখন কোথায় আছে? এই ব্যাপারটা একটি বিরাট বড় সমস্যা। এই ব্যাপারটাকেই অবলম্বন করে ফিজিক্স বলছে টাইম ট্রাভেলিং। টাইম মেশিনে যদি বসে যান তাহলে আপনি গতকালকে দেখতে পাবেন, টাইম মেশিনে বসলে বিগ ব্যাঙকে দেখতে পারবেন। ফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা বলছেন যদি টাইম মেশিনে ট্রাভেল করা যায় তাহলে জিনিষগুলো এই রকম দেখাবে। যোগ এই জিনিষটাই এখানে আলোচনা করছে। টাইম মেশিন যদি বাস্তবে থেকে থাকে, তাহলে সেই টাইম মেশিনে স্পেসে ট্রাভেল না করে টাইমে ট্রাভেল করবে। যেমন আমি এখান থেকে হাওড়া স্টেশন যাবো, আমাকে এখন স্পেসে ট্রাভেল করে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। টাইম মেশিনে স্পেসে না গিয়ে টাইমে যাবে। যেমন এখন দু হাজার চোদ্দ সাল, এখানে বসে আছি দুম্ করে আমাকে দু হাজার সালে নিয়ে চলে গেল। সেই সময় এই তারিখে তখন যা যা হয়েছিল সেগুলোই পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে থাকবে। এগুলোকে নিয়ে পরে বিজ্ঞানের অনেক কল্পমূলক কাহিনী তৈরী হয়েছে। তার মানে ভূত ও কাল সব নির্দিষ্ট হয়ে কোথাও না কোথাও রাখা আছে। ভবিষ্যতও কোথাও রাখা আছে। নাটক বা সিনেমার ডায়লগে এই ধরণের অনেকে নাটকীয় সংলাপে শোনা যায় ‘তোমার ভবিষ্যত তোমার দিকে ছুটে আসছে’।

এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, পাঁচ মিনিট পর আমার যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহলে এই আমিটা কোথা থেকে এসেছে? কোথাও তো এর একটা ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। হয় আপনাকে বলতে হবে আপনি ভবিষ্যতে গিয়ে দেখতে পারবেন, আর তা নাহলে বলতে হবে ভবিষ্যত বলে কিছু

নেই। ভবিষ্যত বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধরা তো এই কথাই বলতে চাইছে। ভবিষ্যত যদি নির্দিষ্ট থাকে তাহলে বিজ্ঞানের মত আপনি টাইম মেশিনে গিয়ে ভবিষ্যতকে দেখে আসতে পারবেন। যাদের কাছে ভবিষ্যত বলে কিছু নেই, তাদের কাছে শূন্যবাদ। অনেকে আবার বিশ্বাস করে ভূতকাল বলে কিছু আছে। আর যদি বলে ভূতকাল বলে কিছু নেই, যেমন লোকেরা প্রায়ই বলে there is nothing called past যা হওয়ার হয়ে গেছে সব ওখানেই শেষ। অতীতও মরে ভূত হয়ে গেছে। তাহলে অতীতও নেই ভবিষ্যতও নেই, বর্তমানটুকু থেকে গেছে। তাহলে টাইম মেশিন কোন কাজ করবে না। টাইম মেশিন যদি কোন কাজ না করে তাহলে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এসে যাবে।

বিজ্ঞান ও বৌদ্ধ ধর্মের এই ধরণের কিছু অদ্ভুত জটিল চিন্তা-ভাবনাকে আধার করে যোগ খুব সহজ ভাবে বলে দিচ্ছে *অতীতানাগতং স্বরূপতোস্ত্যধভেদাদ্ধর্মাণাম্*, অতীত ও ভবিষ্যত বস্তুর প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এই রূপে নেই যে রূপে তুমি এখন দেখছ বা ভাবছ বা বলছ। তাহলে কি রূপে আছে? গুণ রূপে আছে। প্রকৃতির যে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো এই গুণ সূক্ষ্ম স্তরে চলে গেছে। যোগদর্শনের এই তত্ত্বের দ্বারা একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায় – যারাই ‘আমি ভবিষ্যত বক্তা’ বলে নিজেকে জাহির করে সবার ভবিষ্যত বলে দিচ্ছে বুঝে নিন আপনি তাদের দ্বারা পুরোপুরি প্রতারিত হচ্ছেন। ঠাকুরের একটি কথা ‘নরেন শিক্ষে দেবে’ এই একটি কথা ছাড়া ঠাকুর কোথাও কোন ভবিষ্যত বাণী করছেন না। এটা ঠিকই যে ঠাকুরের প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তিনি তাঁর সামনের যে কোন লোকের মনের গঠনটা পড়তে পারতেন, মনের গঠন জানা থাকলে বোঝাই যাবে লোকটি কত দূর যাবে।

এক মূর্খ ছিল। সে সারাদিন কিছুই করত না। তার একটা গাধা ছিল, গাধার পিঠে চড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। একদিন মূর্খটি গাছে উঠে কালিদাসের মত কুড়ুল দিয়ে গাছের ডাল কাটছে। একজন লোক গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটির কাণ্ড দেখে বলছে ‘তুমি যেভাবে ডালটা কাটছো এতে তো তুমি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে’। মূর্খ লোকটি তার কথা কোন গ্রাহ্যই করল না। ডাল কাটা হয়ে গেলে লোকটি যথারীতি গাছ থেকে পড়ে গেছে। পড়ে যেতেই মূর্খটি দেখছে লোকটি তো ভবিষ্যত বক্তা! মূর্খটি এখন ওই লোকটি ধরার জন্য দৌড়েছে। কিছু দূর গিয়ে লোকটিকে ধরে জিজ্ঞেস করছে ‘আপনি বলুন আমার মৃত্যু কবে হবে?’ লোকটি ভাবছে ‘এতো মহা মুশকিল! কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছি’! লোকটিকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য বললেন ‘তোমার গাধা যখন তিন বার হাঁচি দেবে, তখন বুঝবে তোমার মৃত্যু এসে গেছে’। গাধাতো কখন হাঁচে না। তার তো মাথায় এখন চিন্তা ঢুকে গেছে গাধা যদি হাঁচি দিয়ে দেয়। তখন সে দেখলো গাধার একটা নাকে যদি পাথর গুঁজে দিই তাহলে ওর এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া কোন গতি থাকবে না, আর তাতে হাঁচিও হবে না। এবার গাধার একটা নাকে একটা পাথর ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটা নাকে নিঃশ্বাসের বাধা হতেই গাধাটা একটা হাঁচি মেরেছে। হাঁচি মারতেই পাথরটা বেরিয়ে এসেছে। মূর্খটা ভাবলো এই নাকে যখন হাঁচি হয়ে গেছে তাহলে অন্য নাকে হাঁচি হওয়ার সম্ভবনা আছে, তাই অন্য নাকে একটা ঠুলি লাগিয়ে দিল। ঠুলি লাগাতেই গাধাটা আবার হাঁচি দিয়েছে। দুটো হাঁচি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সে নিজের গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছে। ভাবছে দুটো হাঁচি তো হয়ে গেল তৃতীয় হাঁচিও তো দিতে পারে। তখন সে গাধার দুটো নাকেই দুটো পাথর গুঁজে দিয়েছে। নেঃ ব্যাটা আর হাঁচি দিতে পারবি না। এবার যেমনি হাঁচি মেরেছে, হাঁচি মারতেই দুটো পাথরই বেরিয়ে গেছে আর সে বেচারা সঙ্গে সঙ্গে গাধার পিঠ থেকে উল্টে মাটিতে পড়েছে। মাটিতে পড়েই সে চোঁচাচ্ছে ‘তোমরা বলো! আমি স্বর্গে এলাম নাকি নরকে এলাম’!

ঠাকুরের জীবনেও ঠিক এই ধরণের একটি ঘটনা আছে। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে আছেন। একবার কোন গরমের সময় কয়েকজন যুবক দক্ষিণেশ্বরে পিকনিক করতে এসেছে। একটি যুবক ঠাকুরের কাছে এসে বলছে ‘মশাই! সজি কাটার জন্য একটা ছুরি দেবেন?’ ঠাকুর ছুরি দিতে নারাজ। ছেলেটিকে ঠাকুর বলছেন ‘তুমি ছুরি ফেরত দেবে না’। যুবকটি অনেক পীড়াপীড়ি করাতো ঠাকুর তাকে দিয়ে তিন সত্য করিয়ে নিয়ে ছুরিটা দিয়ে বলছেন ‘তোমাকে ছুরি ফেরত দিয়ে যেতে হবে’। যুবকটি তিন সত্য করে ছুরিটা নিয়ে এসেছে। সেখানে রামলাল দাদা দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। শেষ পর্যন্ত সত্যিই

ছুরিটা আর ফেরত দিয়ে যায়নি। ঠাকুর রামলাল দাদাকে বলছেন ‘দেখলি তো ছুরিটা ফেরত দিয়ে গেল না’। রামলাল দাদা তো অবাক – ঠাকুর আগে থেকে কি করে জানলেন যে ছুরি ফেরত দিয়ে যাবে না, তাই তাকে দিয়ে আবার তিন সত্য করে ছুরি দিয়েছিলেন। ঠাকুর আবার রামলাল দাদাকে বলে দিলেন ‘দ্যাখ! গঙ্গার ধারে একটা গাছ আছে, সেই গাছের তলায় কিছু সজীর খোসা পড়ে আছে। ওর মধ্যে ছুরিটা আছে। যা, ওখান থেকে ছুরিটা নিয়ে আয়’। রামলাল দাদা সেই বড় গাছের তলায় গিয়ে দেখছেন সত্যিই খোসা পড়ে আছে। খোসা নাড়তেই দেখেন ছুরিটা সেখানে পড়ে আছে। ছুরিটা নিয়ে এলেন। ঠাকুর বললেন ‘ভালো করে ধুয়ে রেখে দে’। তখন রামলাল দাদা ভাবছেন ঠাকুরের কি অন্তর্দৃষ্টি! প্রথমে তিন সত্য করিয়েছিলেন। আর বলেও দিলেন গঙ্গার ধারে বড় গাছের তলায় সজীর খোসার মধ্যে ছুরি রাখা আছে। তখন রামলাল দাদা ভয়ে ভয়ে বলছেন ‘আপনি তো মশাই ভবিষ্যত বক্তা’। ঠাকুর বলছেন ‘এর মধ্যে আবার তুই ভবিষ্যত বক্তার কি দেখলি! সেরকম তো কিছু নয়’। ‘তাহলে আপনি কি করে বললেন ছেলেটি ছুরি ফেরত দিয়ে যাবে না’। ‘আরে এতো কিছুই না, তার জামার বোতাম লাগানো নেই, চুল উশকো-খুশকো। বুঝলাম ছোকড়ার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ছোকড়ার মনটা বিক্ষিপ্ত, কোন কাজের লোক নয়, সেইজন্য বললাম মনে করে ছুরিটা ফেরত দিয়ে যেও’। ‘তাহলে ওই গাছের ব্যাপারটা কি করে বললেন?’ ‘আরে এও তো কিছু নয়, গরমের সময় সে কি আর রোদে বসে সজীর খোসা ছাড়াবে, ছায়াতে বসেই তো ছাড়াবে। আর গঙ্গা দেখতে দেখতেই কাটবে, সেইজন্য বললাম গঙ্গার ধারে গাছের তলায় দেখতে। যুবকটি ছুরি ফেরত দিয়ে যাবে বলে তিন সত্য করে গেছে। সজী কাটতে গিয়ে কখন ছুরি খোসার নীচে চাপা পড়ে গেছে, ছুরিটাও তার চোখে পড়েনি, সেইজন্যই ছুরি ফেরত দেয়নি। এছাড়া আর কিছু নেই’। খুবই সহজ যুক্তি, শোনার পর কত সাধারণ ব্যাপার মনে হবে।

স্বামীজীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, স্বামীজীও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেননি, আমরা যেটা প্রফেসি প্রফেসি বলছি, এগুলো কিছুই নয়। ওনাদের একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে, সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারেন এই এই জিনিষ হতে যাচ্ছে। এনাদের অন্তর্দৃষ্টি এত প্রখর যে বেশ কিছু জিনিষ এনারা দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দেখতে পান, আবার বেশ কিছু জিনিষ তাঁরা খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারছেন এই রকম কিছু হতে যাচ্ছে। তার উপর একদিকে ইতিহাসের উপর যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য আছে অন্য দিকে তার সাথে আধ্যাত্মিক অনুভূতিও আছে, ফলে তাঁরা একটা জিনিষকে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলে দিতে পারেন, এই রকম হতে যাচ্ছে। স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন চীন নয়তো রাশিয়াতে কমুনিষ্টরা আসছে। স্বামীজী চীনের পাশ দিয়ে গেছেন, চীনের কি প্রচণ্ড দুরবস্থা নিজের চোখে দেখেছেন। তার উপর রয়েছে জনসংখ্যার প্রবল চাপ। রাশিয়াতেও সেই সময় জনসংখ্যার হার মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের রাজা বললেন ‘আমার জন্ম দিনে সবাই একটা করে বিয়ার দেবে’। রাজাকে সেই বিয়ার দেওয়ার জন্য এত লোক জড়ো হয়েছিল যে দাঙ্গা লেগে গিয়েছিল। একশর উপর লোক পায়ের চাপেই মারা গিয়েছিল। স্বামীজী দুঃখ করে বলছেন – যে দেশের এই অবস্থা সেই দেশে এই জিনিষ বেশি দিন আর চলবে না। মানুষ একটা সীমা পর্যন্ত সহ্য করে নেয়, সেই সীমা পেরিয়ে গেলে বিদ্রোহ করে বসবে। স্বামীজী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন – এই শাসন ব্যবস্থা বেশি দিন চলবে না। কার্ল মার্ক্স একই জিনিষ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত হবে ইংল্যান্ডে বা জার্মানিতে। কারণ ইংল্যান্ড আর জার্মানিতে কারখানার মজুর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তাহলে বলতে পারেন স্বামীজীর কথা কি করে ঠিক হয়ে গেল? মার্ক্স এ্যঞ্জেলসের কথা কি করে ভুল হল? মার্ক্স এ্যঞ্জেলসরা যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন তাতে কোন ভুল ছিল না, প্রথম শিল্প ধর্মঘট ইংল্যান্ডেই হয়েছিল। এগুলো সব অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত। স্বামীজী যখন বলছেন আমি আমার মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তার মানে স্বামীজীর মধ্যে একটা সাংঘাতিক অনুভূতি আসছে, আর ওই অনুভূতির পেছনে পুরো reasoning রয়েছে। স্বামীজীর ওই reasoningকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই, মূর্খ ডালে বসে গাছ কাটছে সে যেমন লোকটির কথাতে পৌঁছতে পারে না, আমরাও ঠিক সেই ভাবে সেই reasoningএ যাই না, যেতে পারবোও না।

সেইজন্য হাত দেখা, কোষ্ঠি বিচার এগুলো কোন দিন মিলবে না। কারণ অতীত/নাগতং, ভবিষ্যত কখন এই রূপে নেই। ভবিষ্যত তাহলে কীভাবে আছে? গুণ রূপে, সত্ত্ব, রজো আর তমো গুণ রূপে রয়েছে, আর বর্তমানে যখন আসছে তখন এই রূপটা ধারণ করে নিচ্ছে। কিছু দিন এই রূপে থাকছে তারপর আবার আবার গুণ রূপে চলে যাচ্ছে। তবে যদি কারুর ক্ষমতা থাকে ওই গুণকে রূপান্তর করে আবার আগের মত সাজিয়ে দিতে পারেন তিনি হয়তো তখন অনেক কিছুই দেখতে পারবেন। যোগীরা ইচ্ছে করলে এইভাবে ভবিষ্যতে কি হবে বলে দিতে পারবেন, কিন্তু সাধারণ অর্থে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী বলতে যেভাবে বুঝি, ওই জিনিষ কখনই হবে না।

স্বামীজী এখানে দুটো জিনিষ বলছেন – এটা মাথায় রেখো বৌদ্ধদের যে শূন্যবাদ, এই শূন্যবাদকে যোগ মানে না। দ্বিতীয়, টাইম মেশিনের যে ধারণা, আপনি ভবিষ্যতে বা ভূতে চলে যাবেন, যোগ এটাকেও মানে না। ভূতও আছে ভবিষ্যতও আছে, কিন্তু তাদের রূপটা অন্য রকম। ওই রূপকে কোন ভাবে ধরা যাবে না। আজ এক্ষুণি আমি যে রূপে আছে, আমার ভূত বা ভবিষ্যত সেই রূপে নেই। যদি আপনি ভূতের ফটোগ্রাফি করতে চান, আমরা এখানে তিনটির সময় ক্লাশ শুরু করেছিলাম, তারপর এক ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এই এক ঘন্টা আগে কি রকম পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতির ফটোগ্রাফি কখনই আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং টাইম ট্রাভেলের ধারণা যোগের দৃষ্টিতে একেবারেই অযৌক্তিক, যেহেতু বস্তুর ধর্ম বা গুণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করছে বলে। বেদান্ত বলছে কোন অতীত নেই ভবিষ্যত নেই এগুলো সব মনেরই কল্পনা, কিন্তু যোগ এই কথা বলছে না, যোগ বলছে যেটার অস্তিত্ব আছে, যা কিনা সৎ তা কখনই অনস্তিত্ব বা অসৎ থেকে আসছে না। এখানে দর্শনের একটা সূক্ষ্ম তাৎপর্য আছে। বিজ্ঞানীকে এই সৃষ্টি কোথা থেকে এসেছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তখন বিজ্ঞানী বলবে বস্তু থেকে এসেছে, বস্তু কোথা থেকে এসেছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তারা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে যায়। কোন কোন ধর্মাবলম্বীদের মতে বলছে creation comes out of nothing, অসৎ থেকে সৃষ্টি এসেছে, ভগবানের ইচ্ছে হল তিনি দুম্ করে জগৎকে সামনে নিয়ে এলেন। হিন্দুরা তা বলবে না, তারা বলবে সৎ থেকেই সব কিছু এসেছে, আর সব কিছুরই সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে। আর অতীত ও ভবিষ্যত কালের নিয়মে দুটো পরিষ্কার আলাদা। এটাকে নিয়ে পরে আরো বলবেন।

বস্তুর গুণই বস্তুর আত্মা

এরপর বলছেন – **তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মনাঃ।।১৩।।** এই যে ভূত আর ভবিষ্যতকে নিয়ে বলা হল, মাঝে মাঝে সব কিছু ব্যক্ত বা স্থূল রূপে অভিব্যক্ত হয় আবার কখন কখন অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম রূপে থাকে। এই মুহূর্তে যা কিছু আছে সেটা ব্যক্ত, আর যেটা আসছে এবং যেটা চলে গেছে সেটা সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম মানে গুণ রূপে অব্যক্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে অতীতকে বোঝা যায় আবার কখনো কখনো অতীতকে বোঝা যায় না। ভবিষ্যতকেও ঠিক কখনো বোঝা যায় আবার কখনো বোঝা যায় না। এই তত্ত্বের পরিষ্কার অর্থটা কি বোঝার জন্য এই সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

আমাদের সামনে যা কিছু আছে সবই এই তিনটে গুণের বিভিন্ন রকমের প্রকাশ মাত্র। এরই যে নানান রকমের অভিব্যক্তি সেটাই সময়ের পরিমাপ দিচ্ছে। অভিব্যক্তি যদি না থাকে তাহলে সময়ের পরিমাপও করা যাবে না। কারণ এখানে বলছেন, জিনিষটা আছে কিন্তু অভিব্যক্তি নেই। আর যদি বলে দেওয়া হয় গুণও নেই, তাহলে সময়ই থাকবে না। যখন আপনাকে মূর্ত রূপে দেখছি তখন এটা আপনার গুণ রূপ। আমি আপনার ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি না, তার মানে ভবিষ্যতটা আপনার অব্যক্ত রূপ। অব্যক্ত রূপ মানে গুণ রূপে রয়েছে। তার মানে যেটা ঠিক ঠিক মূর্ত রূপে ব্যক্ত সেটাই বর্তমান কাল। অব্যক্ত রূপেও যদি না থাকে তাহলে সময়ই থাকবে না। তন্ত্রশাস্ত্র এই কথাই বলছে, কালী কালকেও গ্রাস করে নেন। জিনিষ যদি নাই থাকে, অবজেক্ট যদি না থাকে তাহলে কোন কিছুর পরিবর্তন হবে না। সময় মানে ঘটনার পরিমাপ। বিগ ব্যাঙ থিয়োরীও ঠিক তাই বলে – Time has a beginning। এত দিন পরে এসে বিজ্ঞান বলছে, time has a beginning, কিন্তু আমরা চিরদিনই জানি time has a beginning। যখন অব্যক্ত রূপে এসে গেল তখন time has a beginning। যখন

ব্যক্ত রূপে এসে গেল তখন present tense। যখন কোন ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনার দ্বারাই আমরা সময়কে পরিমাপ করি। ঘড়ির কাঁটা নড়ছে বলে আমরা সময় জানতে পারছি। এখন এই ঘড়ি যদি না থাকে, আমরা ঘরের মধ্যে বসে আছে, ঘরে কোথাও ঘড়ি নেই, আমরা সময়কে জানতে পারব না। কিন্তু ঘড়ি যদি নাও থাকে তবুও আমরা কিছু কিছু ঘটনার মাধ্যমে সময়কে বুঝতে পারি। যদি জানলা খোলা থাকে, সেখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সূর্য উঠছে, কিংবা সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এর থেকে সময়ের একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। কিছু কিছু ধরণের ঘটনার প্রকাশের মাধ্যমে আমরা সময়কে বুঝতে পারছি। এখন কোন ঘটনারই যদি প্রকাশ না থাকে তাহলে আমাদের সময়ের ব্যাপারে কোন ধারণাই আসবে না। এক একটি ঘটনার সাথে আরো কিছু ঘটনার কালের ব্যবধানের পরিমাপটাই সময়। বলা হয় সময় হল ঘটনার পরিমাপ। নিউটন আর আইনস্টাইন সময় সম্বন্ধে যে তত্ত্ব দিয়ে গেছেন, এই সূত্রেই সেটা পাল্টে যায়। সব থেকে যেটা আশ্চর্য, যোগদর্শন সময়ের তত্ত্বকে একেবারে অন্য আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করছে, এবং ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার সাথে কিছু দিন আগে আইনস্টাইন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এই দুটো সিদ্ধান্তে হুবহু এক। আইনস্টাইনও সময়কে ঘটনার পরিমাপ বলছেন। এখন যোগের যে চরম উপলব্ধির কথা বলা হচ্ছে, সেই চরম উপলব্ধিতে সময় চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যায়।

আইনস্টাইনের Theory of Relativityতে যে আলোর কণিকা গুলো আলোর গতিতে ছুটে যাচ্ছে, সেখানে মনে করা যাক এই আলোর কণিকা গুলির চেতনা আছে ও আমি বোধ আছে, আর তারা সময়ের পরিমাপ করতে পারে। সূর্য থেকে আলোর রশ্মি পৃথিবীতে আসতে লাগছে আট মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড। কিন্তু সূর্যের আলোর কোন কণিকাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় – কতক্ষণ লাগল হে তোমার পৃথিবীতে আসতে? সে উত্তর দেবে – শূন্য সেকেন্ড। তার কাছে সূর্য থেকে পৃথিবীর যাত্রা পথকে অতিক্রান্ত করতে চোখের পাতার পলক পড়তে যত সময় লাগে তার থেকেও অনেক কম সময় লাগবে। এতো গেল সূর্যের আলোর কথা। কোন কোন নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে আসতে চার বছর লাগছে, মনে করুন দুই বন্ধুর একজন ওই নক্ষত্রে আছে অন্যজন পৃথিবীতে আছে, নক্ষত্র থেকে ফোনে পৃথিবীর বন্ধুকে বলল ‘কিরে কেমন আছিস’? পৃথিবীর বন্ধু কথা চার বছর পর শুনতে পাবে, আবার সে জিজ্ঞেস করবে – ‘তুই ওখানে কেমন আছিস’। এই কথাও চার বছর পর নক্ষত্রের বন্ধুর ফোনে বেজে উঠবে। দুটো কথা আদান-প্রদানেই আট বছর চলে গেল। এবার যদি নক্ষত্রের আলোর কণিকাকে জিজ্ঞেস করা হয় – কতক্ষণ লাগলো ভাই তোমার এই পৃথিবীতে আসতে? সে বলবে – শূন্য সেকেন্ড। কেন? আলোর গতিতে সময় পুরোপুরি থেমে যায়। যে কোন জিনিস যখন সে আলোর গতিতে চলবে তার কাছে সময় থেমে যাবে চিরদিনের মত। এটা কেন হয় এর উত্তর বিজ্ঞান এখনও দিতে পারেনি। আইনস্টাইন এটাকেই গণিতের সাহায্যে হিসেব করেছেন মাত্র, হিসেব করে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন – As your speed increases the time stretches. Time loses its meaning in the speed of light and there is no change. ঠিক সেই রকম এই যে বিভিন্ন জিনিস ব্যক্ত হচ্ছে, এদের ব্যক্ত হওয়াতেই আমাদের সময়ের জ্ঞান হচ্ছে। এখন যদি কোন কিছুই ব্যক্ত না হয় তাহলে কি হবে? তখন সময়ের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাহলে কি হবে? তখন না আছে সময় না আছে কোন কিছুর পরিবর্তন। এই ব্যাপারটাই আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করছি – এটাকেই বলা হচ্ছে কৈবল্যম্। কৈবল্যম্ মানে এক, কেবল একই আছে। যখন পুরুষ সেই অবস্থায় চলে যায়, তখন কি হয়? প্রকৃতি তাঁর কাছে ছোট হয়ে যায়। প্রকৃতি ছোট হয়ে গেলে কি হবে? তখন আর কোন কিছুরই প্রকাশ থাকবে না, প্রকৃতির কোন কিছুরই ব্যক্ত রূপ নেই। প্রকৃতির আর কোন খেলাই নেই, তাহলে সময়ের কি হবে? বলছেন সময় তখন থেমে যাবে।

সময় কে নিয়েই যত সমস্যা। এখন শরীর আছে, আগামীকাল এই শরীর থাকবে না, আবার অতীতেও এই শরীরটা ছিল না। এগুলোই ব্যক্ত আর প্রকাশের খেলা। এইভাবে অনন্তকাল ধরে আমরা সময়ের পরিমাপ করে যাচ্ছি। কৈবল্যে প্রকৃতি সরে গেছে, সাথে সাথে সময়ও তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। মা কালীর রূপ এই তত্ত্ব থেকেই এসেছে। শিবকে বলা হয় মহাকাল, তিনিই সমস্ত ঘটনার

বিন্যাশকারী। ঘটনা না থাকলে সময় নেই, এখন প্রকৃতির খেলা শেষ, প্রকৃতি আর বাঁধতে পারছে না, তাই সময়ও তার অর্থকে হারিয়ে ফেলেছে।

পরিণাম ও পরিবর্তন সম্বন্ধযুক্ত হেতু সব বস্তুতেই একত্ব বর্তমান

অথচ মজার ব্যাপার হল ভূত বলুন, বর্তমান বলুন আর ভবিষ্যতই বলুন, সব কটির মধ্যে একটা ঐক্য সূত্র আছে, যদিও একটি অব্যক্ত আরেকটি ব্যক্ত কিন্তু এদের মধ্যে একটা ঐক্যের সামঞ্জস্য আছে, সামঞ্জস্য থাকা মানে এগুলোর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। এটাই পরের সূত্রে গিয়ে বলছেন। এই সূত্রের মধ্যে গভীর একটা তাৎপর্য লুকিয়ে আছে, যদিও বোধগম্য করে নেওয়া কঠিন মনে হতে পারে, বলছেন – **পরিণামৈকাত্বাদন্ততত্ত্বম্ ॥১৪॥** বৌদ্ধদের একটা শাখা আছে যাকে বলা হয় ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ। এরা বলে – One moment of consciousness that gives birth another moment of consciousness and it produces a sense of continuity. যেমন একটা পাখা ঘুরছে, পাখাতে তিনটে ব্লড আছে, কিন্তু এতো দ্রুত ঘুরছে মনে হচ্ছে যেন একটা চাকতি ঘুরছে, তিনটে ব্লডকে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। পাখার ঘোরা থেমে গেলে তিনটে ব্লডকে আলাদা আলাদা দেখা যাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, যখনই কোন জিনিষের অবস্থান খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে তখন পরিবর্তনটা বোঝা যায় না, মনে হবে যেন একই ভাবে রয়েছে। ঠিক তেমনি আমাদের শরীরের অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তন প্রতি নিয়ত, মানে প্রতি সেকেন্ডে হচ্ছে। ঠিক সেই রকম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে, তথাপি আমরা দেখছি সেই একই ব্রহ্মাণ্ড, একই সূর্য যেটা গতকাল দেখেছিলাম। গঙ্গার জল প্রতি নিয়ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার জায়গায় আবার অন্য জল আসছে, অথচ দেখছি সেই একই গঙ্গা যে গঙ্গা কালও দেখেছিলাম। এই যে একটার পর একটা আসছে আর চলে যাচ্ছে, অনবরত এই যে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সবটাই সত্ত্ব, রজো আর তমের খেলা। সত্ত্ব, রজো আর তমের মধ্যে যত রকম পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনের পারস্পর্যতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তার ফলে গোটা ব্যাপারটাকে একটা বস্তু বলেই মনে হয়। একটার পর একটা পর্যায় ক্রমে যেটা আসছে, এগুলো যদিও প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে তবুও একই বস্তু বলে মনে হচ্ছে। আমাদের শরীর ও মনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ হচ্ছে। এই সূত্রে এই কথাই বলতে চাইছে তোমার শরীর, তোমার মনের অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে। একাকী বসে থাকলে মনের মধ্যে হাজার রকমের চিন্তা আসছে যাচ্ছে। কিন্তু তথাপি এই পরিবর্তন একটা একত্বের অনুভূতি দিচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে? কারণ প্রত্যেকটি চিন্তা মনের মধ্যে আসছে, প্রত্যেকটি অণু শরীরে তৈরী হচ্ছে আবার ভাঙছে, এরা সবাই নিবিড় ভাবে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। এর একটা অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে, এই অবিচ্ছিন্নতার জন্য একত্ব অনুভব হচ্ছে। মূল কথা যেটা বলতে চাইছেন তা হল প্রকৃতিতে যা কিছু আছে - জড়, শরীর, মন এদের সব সময় পরিবর্তন হয়ে চলেছে কিন্তু তথাপি এই পরিবর্তনের পেছনে একটা অপরিবর্তনীয় বস্তু রয়েছে, সেই অপরিবর্তনীয় বস্তুটিই হলেন পুরুষ। সেইজন্য বৌদ্ধদের মত বলা যাবে না যে, কিছুই ছিল না আর দুম্ করে সব কিছু চলে এসেছে। আবার খ্রিস্টানদের মত এও বলা যাবে না যে, গড বললেন Let there be light and there was light। কারণ তাঁর ইচ্ছা মাত্রই সব সৃষ্টি হয়ে গেল বললে শূন্যবাদকে মেনে নিতে হবে, সব কিছু শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যোগ এখানে পরিষ্কার করে দিচ্ছে শূন্য থেকে কিছু হয় না।

যিনি বলছেন তাঁর ইচ্ছা মাত্রই সৃষ্টি হয়ে গেল, তিনি তাঁর ভেতরের নিজস্ব একটা চেতনা বোধ থেকেই এই কথা বলছেন। ‘হে ঠাকুর পরীক্ষায় যেন ভালো ফল হয়’ ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করে যদি আমি সাদা পাতা পরীক্ষায় জমা দিই তাহলে কি আমার নম্বর এসে যাবে? কখনই আসবে না। পরীক্ষায় আমাকে লিখতে হচ্ছে, লেখার জন্য আগে আমাকে পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরী করতে হয়েছে। তাহলে পরীক্ষায় ভালো মন্দ যে নম্বরই আসুক না কেন তা আমার চেষ্টার জন্যই আসছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনার জন্য নিশ্চয়ই আসছে না। এবার আমরা একটু অন্য ভাবে চিন্তা করতে পারি। একজন বক্ষ্যা নারীর সন্তান হচ্ছে না। সেই মহিলা এখন ভারতে যত মন্দির আছে সব মন্দিরে মাথা

ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা করার পর এবার তার একটি সন্তান হয়েছে। আমরা এখানে মেনে চলছি যে তার সন্তান হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাও তার সন্তান হয়ে গেল। তাহলে এটা কি ধরণের সৃষ্টি হবে? এটাই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়ে গেল। যা কখনই হবার কথা নয়, কিন্তু তাও সৃষ্টি হয়ে গেল – এটাই তো শূন্য থেকে সৃষ্টি হওয়া। তার মানে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার মানে দাঁড়ায় যে ভগবান তুমি শূন্য থেকে সৃষ্টি করে দাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে সেই প্রার্থনা যদি পূর্ণ হয় তাহলে সেটাই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়ে গেল। আর ওই জিনিষ যদি আমার পাওয়ার কথা তাহলে তার জন্য প্রার্থনা করার কোন অর্থই হয় না। খুব সহজ যুক্তি, হয় আপনি deserve করছেন, নয়তো আপনি deserve করছেন না। কর্ম করে যদি ফল পাই তাহলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না। আর কর্ম না করেই যদি ফল পেয়ে যাই, তাহলে সেটাই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাহলে হিন্দুরাও তাদের ব্যবহারিক জীবনে শূন্য থেকে সৃষ্টিকে মানছে। আমরাও সবাই কোথাও না কোথাও মানছি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়। আমরা যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি হে ঠাকুর আমাকে ভক্তি দাও। এই যে ভক্তি চাইছি, এখন ভক্তি পাওয়ার মত যদি কিছু না করা হয় তাহলে ভগবান আমাকে কোথা থেকে এনে ভক্তি দেবেন না, আর যদি দিয়ে দেন তাহলে বলতে হবে শূন্য থেকে সৃষ্টি হল। যদি দিয়েও দেন তাহলে ভক্তি পাওয়াটা আপনার deserving ছিলই, তাহলে চাওয়ার কি প্রয়োজন!

যোগ এখানেই আপত্তি করছে, তুমি সেটাই পাবে যেটা তোমার পাওয়ার কথা, শূন্য থেকে কখনই সৃষ্টি হবে না। যেটা আছে ওর রূপটা শুধু পাল্টাবে, অব্যক্ত থেকে ব্যক্তে আসবে আবার ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে চলে যাবে। গীতায় ভগবান বলছেন *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।।* আমরা সবাই অব্যক্তে ছিলাম, মাঝখানে কিছু দিনের জন্য ব্যক্ত হয়েছি, আবার অব্যক্তে চলে যাব। কিছু দিনের জন্য মানে কতক্ষণ? বৌদ্ধদের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে বলছে মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য এটা ব্যক্ত আছে, কিন্তু একটা অবিচ্ছিন্নতা পারস্পর্যের বোধ দিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে চলছে। ওই অব্যক্ত প্রতিনিয়ত ব্যক্তে পরিণত হচ্ছে, আর ওই ব্যক্তই প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অব্যক্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে শূন্য থেকে কখনই সৃষ্টি হচ্ছে না। শুধু পরিণামটা পাল্টাচ্ছে।

মন ও বিষয় ভিন্ন স্বভাব

এর পরের সূত্রে আবার বলছেন *বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োৰ্বিভক্তঃ পস্থাঃ।।১৫।।* বস্তুর অবিচ্ছিন্নতা, সময় ও মনের অবিচ্ছিন্নতা বলে দেওয়া হল। চিত্তবৃত্তির ব্যাপারে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল এই যে এখানে বোতল আছে, এই বোতল এখানে আদৌ আছে কিনা এটা পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তার আগে কি হচ্ছে, বোতলের ছবি চোখের মাধ্যমে আমার মস্তিষ্কে আসছে, মস্তিষ্কে এসে বোতলের একটা আকার নিচ্ছে, এই যে আকার নিল এটাই আমার জ্ঞান। এটাকে নিয়েই আবার দুটো মত তৈরী হয়েছে – subjectivity আর objectivity। Obejectivity মানে বোতল এখানে বাস্তবিক আছে, আর Subjectivity মানে বোতল এখানে নেই, যা আছে সব আমার মস্তিষ্কে আছে। Objectivity মতের পণ্ডিতরা তখন Subjectivityর পণ্ডিতদের বলবে ‘বোতলটা এখানে নেই বলছেন তো! ঠিক আছে দেয়ালে আপনি মাথাটা একটু ঠুকে দেখুনতো দেওয়ালটা আছে কি নেই’। দেওয়ালে মাথা ঠুকলে মাথায় না হয় একটু ব্যাথা হবে কিন্তু সেটাও তো মনের ভেতরেই হচ্ছে। জেন্ মাস্টারদের এই নিয়ে মজার গল্প আছে। ওরাও মনে করে যা কিছু আছে সব মনের ভেতরেই আছে, মনের বাইরে কিছু নেই। তখন একজন জেন্ মাস্টার তাকে বলছে ‘ওই যে বড় পাথরটা দেখছ ওটা তোমার মনের বাইরে আছে, নাকি তোমার মনের ভেতরে আছে?’ তখন বলছে ‘মনের ভেতরেই আছে’। ‘ও! তাই! তাহলে তো তোমার মন একটা বড় পাথর’। এই সূত্রে এই জিনিষটাকে অস্বীকার করে বলছে যা কিছু আছে তা আমাদের মনের ভেতরেই আছে।

বস্তু আর মন এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন, একই বস্তু দেখলে বিভিন্ন মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হবে। যেমন একটা রসগোল্লা দেখলেই বাচ্চা লাফিয়ে উঠবে

কিন্তু ডায়বেটিক রুগী রসগোল্লা দেখলে বিষ মনে করবে। ভোজবৃত্তিতে, যার উপর ভিত্তি করে স্বামীজী রাজযোগ লিখেছেন, সেখানে খুব সুন্দর একটা উপমা দেওয়া হয়েছে। এক স্ত্রীকে দেখতে খুব সুন্দর, সাজগোজ করলে তার স্বামী তাকে খুব মিষ্টি বলে সম্বোধন করে। কিন্তু সেই স্ত্রীর যে সতীন তাকে দেখলেই তার শরীরে জ্বালা ধরে যায়। বস্তু একই কিন্তু দুজনের মনে দু রকম মনের ভাব উৎপন্ন হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে এক মহিলা বলছে ‘যাই নাতির চাঁদ মুখটা একটু দেখে আসি’। ঠাকুর বলছেন ‘চাঁদ মুখ না পোড়ার মুখ’! দিদিমা দেখছে চাঁদ মুখ আর ঠাকুর দেখছেন পোড়া মুখ। বস্তু একই কিন্তু দুজন দু রকমের কেন দেখছেন? এই জন্মই দেখছেন, কারণ দুটো মন আলাদা। এটিও যোগশাস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তাহলে বস্তুর একটা independent identity আছে, independent identity না থাকলে তাহলে দুজন একই জিনিষ দেখবে। এর সাথে আরও একটা ব্যাপার হয়, ঠাকুর যেমন নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, নির্বিকল্প সমাধি চলে যাওয়া মানে সব কিছু শূন্য হয়ে গেছে। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে নির্বিকল্প সমাধিতে আছেন তখন তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সেই সময় ঠাকুরের আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের জন্মও তো দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের অস্তিত্ব চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু অস্তিত্ব তো যাচ্ছে না। তার মানে বস্তুর অস্তিত্ব আছে। আমরা তো এখানে তাও সামান্য কয়েকটি কথা বললাম কিন্তু পাশ্চাত্য দুনিয়ায় subjectivity আর objectivityর মধ্যে তুমুল বিতর্ক এখনও চলছে। যোগদর্শন যে যুক্তিগুলো এখানে দিচ্ছে subjectivityকে যারা মানে তারা এই যুক্তিকে কুচি কুচি করে কেটে রেখে দেবে। আপনি হয়তো বলবেন এগুলো বুঝে আমাদের কি লাভ? কিন্তু এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, যোগদর্শনের পথে যখন নামবে তখন এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো না বুঝলে আধ্যাত্মিকতার এমন অনেক গভীর তত্ত্ব আছে যেগুলো কিছুই বোঝা যাবে না। কারণ যদি objectivity না থেকে শুধু subjectivity থাকে তাহলে পুরো দর্শনটা অন্য দিকে চলে যাবে, তার সাধনা, সিদ্ধি সব কিছু অন্য রকম হয়ে যাবে, তার ফলও অন্য রকম হয়ে যাবে। Objectivity হলে তার সব কিছু আবার আলাদা ভাবে যাবে। যোগ objective realityকেও মানছে কিন্তু মানার পর বলছে যা কিছু হচ্ছে সব তোমার মনের ভেতরেই হচ্ছে। সেইজন্য objective worldকে মানলেও যোগের কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই, যোগ গুরুত্ব দেয় একমাত্র মনকে। যোগ বস্তুর সত্তাকে ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করছে যেভাবে objectivity মতের লোকেরা নেয়। কিন্তু subjectivityকেও তাঁরা সেই গুরুত্ব দেন না যে গুরুত্ব subjectivityর পণ্ডিতরা দেন। যোগ হল subjective objective philosophy, ফলে এনাদের দর্শন, সাধনা এক রকম নিয়মে চলে। কিন্তু অন্যান্যদের কাছে সব কিছু অন্য রকম নিয়মে চলে।

বস্তু কখন জ্ঞাত ও কখন অজ্ঞাত, শূন্য থেকে কখনই সৃষ্টি নয়

মনের উপরই আলোচনা করতে করতে বলছেন *তদুপরাগাপেক্ষিত্বচ্ছিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্* ॥১৬॥ বস্তুর ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন বস্তু কখনই শূন্য থেকে উৎপন্ন হয় না। সব সময় বস্তু আছে, কখন ব্যক্ত রূপে আছে, আবার কখন ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে চলে যাচ্ছে। মন আর বস্তু সব সময় দুটো আলাদা সত্তা, যদিও তাদের নির্মাণ একই বস্তু থেকে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকেই হয়েছে। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, সেই সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ দিয়েই সব কিছু নির্মিত কিন্তু বস্তু ও মন দুটো আলাদা। মন আর বস্তু আলাদা হওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলছেন reality পুরোপুরি subjective নয়। যদি পুরো জিনিষটা subjectivities না হয় তাহলে আমরা জিনিষটা জানছি কি করে? তখন এই সূত্রে তার উত্তর দিচ্ছেন *তদুপরাগাপেক্ষিত্বচ্ছিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্*, বস্তুর জ্ঞানও হয় আবার বস্তু অজ্ঞাতও থাকে, নির্ভর করে মন কি রঙে রেঙেছে। বস্তু যদি আপনার মনে বৃত্তি সৃষ্টি করে, তাহলে কিন্তু ওই বস্তু জ্ঞাত হবে। বৃত্তি যদি সৃষ্টি না করে তাহলে বস্তু অজ্ঞাত থাকবে। আমাদের সামনে অনেক কিছু সূক্ষ্ম রূপে আছে আবার অনেক কিছু স্থূল রূপেও রয়েছে। যদি আপনার মন ওই রঙে রাঙিয়ে যায়, অর্থাৎ যদি বস্তুর বৃত্তি হয় তাহলে ওই বস্তুর জ্ঞান আপনার হবে, তা নাহলে বস্তু অজ্ঞাত হয়ে পড়ে থাকবে। স্মৃতি ও নিদ্রাও বৃত্তি। স্মৃতিতে অনেক কিছুই হয়, যেমন

ধরুন আপনার বন্ধু আপনাকে বলছে ‘আচ্ছা তোমার মনে আছে আমাদের সঙ্গে একবার এই রকম ঘটনা হয়েছিল’? আপনি বললেন ‘আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না’। কিন্তু আপনার বন্ধুর ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। তার মানে এটাই দাঁড়ায়, বন্ধুর মনে ওই স্মৃতি বৃত্তিটা উঠছে, কিন্তু আপনার মনে উঠছে না। আপনার মন ওই colouringটা নিচ্ছে না, কিন্তু বন্ধুর মন colouringটা নিচ্ছে। ফলে এটাই সিদ্ধান্ত যে, কোন বস্তু একজনের কাছে জ্ঞাত থাকছে আবার অনেকের কাছে অজ্ঞাত থাকছে। এটা গেল স্মৃতি বৃত্তির ক্ষেত্রে। এই জিনিষটাই আবার বাস্তবিক জগতেও ছড়িয়ে যাবে।

স্বামীজী এক জায়গায় প্রতিভাকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, যে জিনিষটা করতে সাধারণ মানুষের অনেক বছর লাগছে, একজন প্রতিভাবান খুব কম সময়ে সেই জিনিষটা সম্পূর্ণ করে দেবে। আপনি আপনার তিরিশ বছর বয়সে মনে করছেন আপনি দশ বছর দেরীতে চলছেন। তার মানে এখন তিরিশ বছরে যেটা জানছেন সেটা যদি আপনি আপনার কুড়ি বছর বয়সে জানতেন তখন সেই বয়সটাই আপনার ঠিক ঠিক চলছে বলতে পারতেন। চল্লিশ বছরে গিয়েও বলছেন আপনি দশ বছর পিছিয়ে চলছেন। চল্লিশ বছর বয়সে যা জানেন সেটাই যদি আপনি তিরিশ বছর বয়সে জানতেন তাহলে বলতেন সব কিছু স্বাভাবিক চলছে। এবার আপনার পঞ্চাশ বছরে আসতে আসতে এই গ্যাপটা পনেরো বছরে চলে গেছে। এখন মনে করেছেন, এখন যা জানি এটা পঁয়ত্রিশ বয়সে জানলে ঠিক হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীকে আমরা কেন জিনিয়াস বলছি? স্বামীজী তাঁর ঊনত্রিশ বছর কয়েক মাস বয়স হওয়ার পর যখন তিনি চিকাগোর পার্লামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ানের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁর সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেছে। অথচ তখনকার দিনে এত ছাপা বই ছিল না, তবুও তিনি জগতের সব কিছুর জ্ঞানকে নিজের মুঠির মধ্যে করে নিয়েছিলেন। আমাদের ছাপা বই আছে, ভালো ভালো শিক্ষক আছেন, শিক্ষার প্রচার প্রসার হয়ে গেছে, তবুও দেখুন শিক্ষা থেকে আমাদের ভেতরে যে জ্ঞানের প্রকাশ হবে সেই প্রকাশটাই নেই। জ্ঞানের প্রকাশ নেই মানে, আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। যার ফলে যত বয়স বাড়ছে তত আমাদের পিছিয়ে যাওয়া বয়সের গ্যাপটাও বাড়তে থাকছে। প্রতিভাবান মানে, যিনি অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু চটপট বুঝে নেন। এটা গেল প্রতিভার ব্যাপারে, ঠিক তেমনি যার যত বুদ্ধি আছে সে তত তাড়াতাড়ি যে কোন পরিবেশে যে কোন পরিস্থিতিতে হৃদয়ঙ্গম করে নেয়।

যদি আপনার বুদ্ধিযুক্ত মন কোন জিনিষকে ধরতে পারে তাহলে বলবে ওই জিনিষটা আপনার কাছে ব্যক্ত হয়ে গেছে, যদি না ধরতে পারেন তখন বলবে ওটা অব্যক্ত থেকে গেল। সবটাই নির্ভর করছে আপনার মনের colouringর উপরে। তার মানে বস্তু থাকলেও মনের যদি colouring না হয় ওই বস্তুকে আপনি জানতে পারবেন না। বাসে বা ট্রেনে জানলার ধারে বসে যাচ্ছেন, যেতে যেতে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হল ‘আপনি ওই জিনিষটা দেখতে পেলেন’? আপনি বললেন ‘না, আমার মনটা অন্য দিকে ছিল’। জিনিষটার উপর চোখ ছিল কিন্তু মন অন্য দিকে ছিল। Objective Reality আর Subjective Realityর আলোচনার এটাই conclusion। Conclusion কি? যদিও subject মানে আপনার মন আর object মানে বস্তু দুটো আলাদা কিন্তু subject নির্ভর করছে পুরোপুরি objectএর উপরে। কিভাবে নির্ভর করছে? যখন আপনার মন বস্তুর রঙে রাঙিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বস্তুর বৃত্তি যখন তৈরী হয় তখনই আপনার বস্তুর বোধ হবে তা নাহলে কখনই বোধ হবে না।

চিত্তবৃত্তিকে জানা যাওয়ার কারণ

এতক্ষণ বস্তু মন এগুলো আলোচনা করার পর এবার ঠিক ঠিক জায়গায় আলোচনাটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে – **সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ন্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাহপরিণামিতাৎ।।১৭।।** যোগদর্শনের এটি একটি খুব জোরালো যুক্তি, আর এই যুক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য দর্শন থেকে যোগদর্শনকে প্রচুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে করা হয়। তবে এখানে খুবই আশ্চর্যের যে স্বামীজী নিজের মত করে Theory of Relativityকে এত সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করেছেন যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। যদিও তখনও Theory of Relativity আসেনি কিন্তু relative ব্যাপারটা আসতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া স্বামীজী এখানে এমন অনেক কিছু বলছেন যেগুলোর উপর পরবর্তিকালে ফিজিক্সের অনেক সিদ্ধান্ত

দাঁড়িয়ে গেছে। একটা গতিশীল বস্তুকে জানতে হলে একটা স্থির বস্তু দিয়ে জানতে হয়। যেমন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি সেই সময় একটা ট্রেন চলে গেল। প্ল্যাটফর্মটা স্থির তাই বলছি ট্রেনটা চলছে। কিন্তু দুটো জিনিষই যদি চলতে থাকে তখন কি করে বস্তুকে বুঝবো? আমার ট্রেন চলছে আর তার পাশাপাশি আরেকটি ট্রেনও যাচ্ছে। তখন কি করে বুঝবো? তখন বলছেন relative velocity দিয়ে জানা যায়। দুটো লোকাল ট্রেন পাশাপাশি যাচ্ছে, তার একটা ট্রেনে আপনি বসে আছেন। দুটো ট্রেন যখন একই গতিতে যাচ্ছে তখন মনে হবে ট্রেনটা স্থির হয়ে আছে, একটা ট্রেনের গতি বেড়ে গেলে বোঝা যাচ্ছে ট্রেনটা এগিয়ে যাচ্ছে। আপনি বসে বসে সব বুঝছেন, এর মধ্যে আপনিও গতিমান। এই জায়গাটায় স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন।

এটাই স্বামীজীর রাজযোগের বৈশিষ্ট্য, যেখানে স্বামীজীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীকে রাজযোগের সিদ্ধান্ত আর বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে একটা যুক্তিযুক্ত দর্শনে দাঁড় করিয়েছেন। এই জগৎ গতিশীল, প্রকৃতি গতিশীল, প্রকৃতির যে গুণ, যে গুণ থেকে ব্যক্ত অব্যক্ত আসছে, সেই গুণও গতিশীল। তার মানে প্রকৃতিতে কোন কিছুই স্থিতিশীল নয়। কোন কিছুরই যদি স্থিতি না থাকে তাহলে আমাদের মনও স্থিতিশীল নয়। আমরাও জানি আমাদের মন ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। তার থেকে আরও বাজে হল, আমাদের এই দেহটাও ক্রমাগত পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। আমরা রোজ খাওয়া-দাওয়া করছি, তাতে প্রতিদিন আমাদের দেহের কোশিকা গুলো মরছে আবার নতুন কোশিকা তৈরী হচ্ছে। মোদা কথা আমাদের শরীর মন সব কিছুই গতিশীল। আমরা শরীরকে যদি steady মনেও করি কিন্তু কালের দিক থেকে তো সে গতিমান। তিনটের সময় আপনি এখানে রাজযোগের ক্লাশে এসেছিলেন তখন শরীরটা ছিল, সেখান থেকে শরীরটা এখন বর্তমানে এসেছে, বর্তমান থেকে আবার ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছে। কি কি জিনিষ যাচ্ছে? শরীর যাচ্ছে, মনও যাচ্ছে। শরীরের গতি আলাদা, মনের গতি আলাদা। শরীর নিজের মত নিজে পাল্টাচ্ছে, মন নিজের মত পাল্টাচ্ছে। পরিবর্তন কিন্তু দুটোরই হচ্ছে। অথচ মন ধরছে শরীরকে, মন বলছে আমার শরীরে এই এই পরিবর্তন হচ্ছে। মন আবার নিজের মনকেই ধরে, আমার মনে এই এই চিন্তা ভাবনা উঠছে। কিন্তু এর মধ্যে মজার হল, একটি চিন্তাই যখন চলে তখন ওই একটি চিন্তা চলতে চলতে একটা সময় আপনি হারিয়ে যাচ্ছেন। হারিয়ে গিয়ে যখনই চিন্তাটা শেষ হয় তখনই আমাদের বাস্তবিক অর্থে দেখার ব্যাপারটা হয়। তাই বলে এই রকম হবে না যে, একটা চিন্তা করতে করতে মনে হল ‘আমি চিন্তা করছি’ তারপর ‘আমি চিন্তা করছি’ এই চিন্তাটা ছেড়ে দিয়ে আগের চিন্তাটাকে ধরলাম, এভাবে বাস্তবিক দেখা হয় না। যাঁরা বলেন আমি আমার মনকে অবজার্ভ করছি, ঠিকই ওইভাবেই মনের অবজার্ভ হয়। একটা চিন্তা বা ভাবনা চলতে থাকে, চলতে চলতে ওই চিন্তাটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন তিনি দেখেন আমি এই চিন্তা করছিলাম। এরপর আবার আরেকটি চিন্তা এসে যায়। সেটাই হয়তো ‘আমি চিন্তা করছিলাম’ এই চিন্তাটা আসবে। এক সঙ্গে দুটো জিনিষ কখন চলবে না, আমি চিন্তাও করছি আর আমি আমার মনকেও অবজার্ভ করছি, এই জিনিষ এক সঙ্গে কখন হবে না। অনেকে বলবেন, কিন্তু জপ-ধ্যান করার সময়তো এই রকম হয়, আমি নিজের মনকেও দেখছি আর মন নিজের কার্যও করছে। কিন্তু না, এভাবে কখনই হয় না। আসলে মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য আপনার মন একটা চিন্তা করছে আর তারপরেই মাইক্রো সেকেন্ডে মন ওই চিন্তাটাকে দেখে। তার ফলে মনে হয় আমি চিন্তা করছি আর আমি আমার চিন্তাকেও দেখছি। আসলে জিনিষটা কখন এই রকম হয় না। একটা চিন্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখে, ও তাইতো আমি এই চিন্তা করছিলাম। সাধারণতঃ আমরা নিজেদের মনকে অবজার্ভ করি না, যোগীরাই ঠিক ঠিক মনের অবজার্ভার।

এই যে শরীরে, মনে ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনগুলো একটা ছন্দে বাঁধা। শরীরের পরিবর্তন যদি ছন্দে বাঁধা না থাকে তাহলে আপনি রাতে ঘুমোলে আর সকালে উঠে দেখছেন শরীরের এমন পরিবর্তন হল যে আপনার কান আপনার হাতে এসে গেছে, চোখ পায়ে চলে গেছে। ছন্দে যদি না থাকে, যে টিসুগুলো কানে হওয়ার কথা সেগুলো হাতে এসে গেছে। এই ধরণের নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু হয়ে যাবে। মনও ছন্দে বাঁধা, ছন্দের বাঁধা বলে আমাদের এই বোধ থাকছে যে আমিই

সেই অমুক ব্যক্তি। মন যদি ছন্দে বাঁধা না থাকত মানুষকে পাগলা গারদে রাখতে হত। পাগল মানে, ওর মন ছন্দে বাঁধা নেই। গীতাতেও অর্জুনকে ভগবান বলছেন তোমার কথাগুলো উন্মত্ত প্রমত্তবৎ। উন্মত্ত প্রমত্তবৎ যখন বলছেন তখন ঠিক এই ব্যাপারটার প্রতিই আমাদের দৃষ্টিটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্জুনকে ভগবান বলছেন *অশোচ্যানশ্চোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।(২/১১)*। তুমি বলছ যুদ্ধ করলে ধর্ম বিনাশের দিকে চলে যাবে অথচ তুমি যে কথাগুলো বলছ সব অধর্মীয় কথাই বলছ। কথাগুলো পণ্ডিতদের মত অথচ নিজেকেই contradict করছ। এটাই এখানে বলছেন, তোমার শরীর মন যদি ছন্দে না থাকে তাহলে এই এই হবে। শরীর যদি ছন্দের বাইরে চলে যায় তাহলে আপনি নিজেই ভুগবেন, আপনার ক্যান্সার হবে, পেট খারাপ হবে, গায়ে ব্যাথা হবে। আর মন যদি ছন্দের বাইরে চলে যায় তাহলে আপনাকে নিয়ে আপনার আশেপাশের লোকগুলো মরবে। যোগদর্শন বলছেন সব কিছু একটা ছন্দে বাঁধা, ছন্দে বাঁধা বলে সব কিছুকেই অবিচ্ছিন্ন ধারার মত দেখাচ্ছে। এর মধ্যে শরীরের পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়, মনের পরিবর্তন তার থেকে ধীরে হয়। মন শরীর থেকে ধীরে পরিবর্তিত হয় বলে মন শরীরকে অবজার্ড করতে পারে। শরীর কিন্তু মনের পরিবর্তনকে কোন দিন ধরতে পারবে না।

মনের পরিবর্তনের আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, যদি তিন চারটে জিনিষ একই সাথে বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে তখন প্রথমে বেশী গতিশীল, পরে তার থেকে কম গতিশীল বস্তুর অনুভব করতে পারি। কিন্তু একটা জিনিষ চলছে, এর কত গতিবেগ ইত্যাদিকে জানার জন্য একটা স্থির বস্তুর দরকার। স্থির বস্তু যদি না থাকে তাহলে আরেকটা জিনিষ যেটা চলছে তার গতির সঙ্গে তুলনা করে গতিবেগ জানা যায়। সেখানে কিন্তু relative speed বেরিয়ে গেল। আপনি একটা চলন্ত ট্রেনে বসে আছেন, আপনার ট্রেনের পাশাপাশি আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে, এই ট্রেন কত স্পীডে যাচ্ছে বলা যাবে না, কিন্তু আপনার থেকে এর relative speed এই রকম, আপনার ট্রেনের তুলনায় এই ট্রেনটা এত স্পীডে বেরিয়ে যাচ্ছে বলা যেতে পারে। কিন্তু এতে আপনার ট্রেনের গতি কত জানার উপায় নেই। ঠিক সেই রকম আপনার নিজস্ব গতি জানার জন্য আরেকটা কোন বস্তু নিয়ে আসতে হবে। এবার এই বস্তুর গতিকে কি ভাবে জানা যাবে? তখন আরেকটা বস্তু নিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থাকে বলে ইনফাইনাইট রিগ্রেস, মানে ক্রমশ পিছিয়েই যাচ্ছি, বস্তুর ফাইনাল স্পীড কী, এর উত্তর কোন দিন জানা যাবে না। সেইজন্য একটা কোনও স্থির বস্তুতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন সব কটির স্পীড বেরিয়ে আসবে। প্রথমে একটা ট্রেন যাচ্ছে, আরেকটা ট্রেনের তুলনায় এই ট্রেনটা পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিবেগে যাচ্ছে, এবার যার তুলনায় পঞ্চাশ কিলোমিটার যাচ্ছিল সেই ট্রেনকে মেপে বললেন পঁচিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে, মানে আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে পঁচিশ কিলোমিটার বেগে। এরপর ওই ট্রেনকে যখন স্টেশনের তুলনায় মাপছেন তখন বলছে এটা পঁচিশ। তারপরে সব কটাকে যোগ করে বুঝলেন রাজধানী যেটা বেরিয়ে গেল সেটা একশ কিলোমিটার বেগে বেরিয়ে গেছে। স্থির একটা বস্তু যদি না থাকে তাহলে এর কোন কিছুই জানা যাবে না, ওই স্থির বস্তুটিকেই যোগ বলছে পুরুষ আর বেদান্ত বলছে আত্মা। পুরুষের তুলনায় মন দ্রুত হারে পরিবর্তিত হচ্ছে, মনের তুলনায় শরীরের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক সময় শরীরের তুলনায় বস্তুগুলির আরও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সেইজন্য এই জিনিষগুলোকে আমরা অবজার্ড করতে পারি।

আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি এই তত্ত্বকে উড়িয়ে দিচ্ছে। আইনস্টাইনের থিয়োরি বলছে জগতে স্থির বলে কিছু নেই। সেইজন্য কখনই কোন বস্তুরই ঠিক ঠিক গতিবেগ জানা যাবে না। কারণ সবটাই ঘুরছে, চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য আবার নক্ষত্রমণ্ডলের একটা তারা, নক্ষত্রমণ্ডল নিজের মত ঘুরছে, নক্ষত্রমণ্ডল আবার অন্য নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে এক হয়ে ঘুরছে। সবাই ঘুরছে, তাহলে আমরা জানবো কি করে কার কত স্পীড? এই কথাই তো আইনস্টাইন বলছেন, স্থির বলে কিছু নেই। তাহলে স্বামীজী আর আইনস্টাইন দুজন পরস্পর বিরোধী হয়ে গেলেন। স্বামীজী বলছেন সব কিছু যদি চলতে থাকে তাহলে কোনটারই absolute speed জানা যাবে না। Absolute speed জানার জন্য একটা স্থির বস্তুর দরকার। আইনস্টাইন বলে দিলেন স্থির

বস্তু বলে কিছু নেই। স্বামীজী বলছেন পুরুষ হলেন সেই স্থির বস্তু। আসলে স্বামীজী আইনস্টাইনেরই কথা বলছেন, এটাই বেশীর ভাগ লোক বুঝতে পারে না। সত্যিই তো এই জগতে স্থির বলে কিছু নেই, প্রকৃতিতে স্থিত বলে কিছু হয় না। সমস্যা হল খ্রিস্টানদের, যারা বলছে পৃথিবীটা স্থির বাকি সব কিছু তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। স্বামীজী বলছেন প্রকৃতির রাজ্যে কোন কিছুই স্থির নয়, কিন্তু পুরুষ হলেন স্থির। পুরুষের এলাকা তো আইনস্টাইনের এলাকা নয়। পুরুষের এলাকা মানে চৈতন্যের এলাকা, প্রকৃতির এলাকা তো নয়। প্রকৃতিতে যা কিছুই আমরা দেখছি সবই ভৌতিক ও মনোময়। একটা ঘড়ি আমি দেখছি এই ঘড়িটা জড় আর আমি যে একে জানছি এটাই মনোময়। জড় ও মন এই দুটোরও অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে তা সত্ত্বেও ঘড়ির যে জ্ঞান আমার মধ্যে আসছে সেটা সমান ভাবে আসছে। কেন দুটো পরিবর্তনশীল বস্তুর অনবরত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান সমান ভাবে আসতে থাকে? কারণ এদের পেছনে সেই চৈতন্য তত্ত্ব আছে বলে।

যা কিছু হওয়ার সব প্রকৃতির মধ্যেই হচ্ছে, এর সাথে পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতি সব সময় ক্রিয়মাণ। আইনস্টাইন যে বলছেন স্থির বলে কোন কিছু হয় না, এই স্থির বস্তুটিকে যদি কোন দিন বিজ্ঞান পেয়ে গিয়ে বলে একে কেন্দ্র করে বাকি সব ঘুরছে, তাহলে বুঝবেন বেদান্ত খসে পড়ে যাবে। কারণ বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে সাংখ্যের উপর। সাংখ্যের মূল তত্ত্ব হল জগতে স্থির বলে কিছু নেই। জগতে স্থির বলে যদি কোন কিছু থাকে তাহলে বেদান্তও আর থাকবে না। সেইজন্য যে অনেকে বলেন আইনস্টাইন বলছেন জগতে স্থির বস্তু বলে কিছু নেই, আবার স্বামীজী বলছেন পুরুষ হলেন সেই স্থির বস্তু যাঁকে কেন্দ্র করে সব কিছু গতিশীল, দুটো তো পরস্পর বিরোধী কথা। এখানে কোন পরস্পর বিরোধী কথাই হচ্ছে না। স্বামীজী ঠিক সেটাই বলছেন যেটা আইনস্টাইন বলতে চাইছেন। স্বামীজী শুধু এক ধাপ এগিয়ে বলছেন।

এই জায়গাতে এসে একটা বিরাট বিতর্কিত দর্শনের জন্ম নিচ্ছে। এই যে দুটো জিনিষের সদা পরিবর্তন হয়ে চলেছে, এটা কি মিথ্যা না সত্য? বেদান্ত এই পরিবর্তনটাকে মিথ্যা বলছে। আবার এটাই বৌদ্ধদের কাছে একটা অদ্ভুত তত্ত্ব। রাজযোগের দর্শন যখন প্রণালীবদ্ধ ভাবে লেখা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেই সময় বৌদ্ধ দর্শনও একটা ভালো জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধরা এটাকেই বলছেন, একটা দীপ থেকে যেমন আরেকটা দীপ জ্বালানো হয়, যেটাকে আলাদা বলা হয়, আলাদা হল একটা জ্বলন্ত মশাল, আর সেটাকে যদি খুব দ্রুত চক্রাকারে ঘোরাতে থাকে তখন একটা আলোর বলয় তৈরী হয়, মনে হবে যেন একটা গোলাকার আলো। আসলে আলোটা তো গোলাকার নয়, কিন্তু এত দ্রুত স্থান পরিবর্তন হচ্ছে যে মনে হবে একটাই গোলাকার আলো রয়েছে। ঠিক সেই রকম মনের মধ্যে যে চিন্তা বা বৃত্তি তৈরী হচ্ছে এরও এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে মনে হবে একটাই বস্তু।

হিন্দু দার্শনিকরা, বিশেষ করে বেদান্ত ও যোগের উভয় দার্শনিকরা বৌদ্ধদের বলেন – হ্যাঁ, তোমরা পরিবর্তনের কথা যা বলছ সত্য, কিন্তু এই যে পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তন হওয়ার জন্য একটা আধার দরকার। এই তত্ত্বও আবার অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করে। আইনস্টাইনের Theory of Relativity তে বলছে space itself is not fixed. কিন্তু আমরা দেখছি সব কিছুই space এর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। যা কিছু আছে সব space এর মধ্যেই রাখা আছে। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরিতে বলছেন space itself is not something permanent, space is not absolute and space is curved. Curved মানে সূর্য যেখানে আছে সেখানে space টা যেন ওখানে একটু বেঁকে গেছে। আর যেখানে ভারী কিছু নেই সেখানে space সমান আছে। এটা কি সত্যি এই রকম হয়? এই কথাতে কি বোঝাতে চাইছে আমরা বলতে পারব না। এটা কি Mathematical reality? Mathematical realityতে যে ভাবে প্রমাণ করছে এখানে এই রকম হচ্ছে না। সূর্যগ্রহণের সময়ে নক্ষত্রের আলোকে ফটোগ্রাফি করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছে এসে সত্যিই বেঁকে যাচ্ছে। কেন বেঁকে যাচ্ছে? তখন এই থিয়োরিত বলছে space itself is curved, প্যাণ্ডেলের চালের উপরে যদি ভারি কিছু ফেলে দেওয়া হয় তখন প্যাণ্ডেলের চালের ত্রিপল বা কাপড় নীচের দিকে ঝুলে যাবে, যার যেমন ওজন

সেখানে তেমন ঝুলবে। এবারে প্যাণ্ডেলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত বরাবর একটা রেখা টানলে যেখানে ঝুলে গেছে সেখানে এসে বেঁকে যাবে। এগুলি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে অনেক সংশয় তৈরী করে দেয়। তবে আমাদের মূল বিষয়টা জানা নিয়ে কথা।

এখানে এতক্ষণ যা যা বলা হয়েছে বৌদ্ধরা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে তাই বলছে – তারা বলছে there is nothing called absolute, neither time is absolute, nor mind is absolute, nor space is absolute, its all are relative. কিন্তু বেদান্তীরা এই ধরনের কথা কখনই বলবে না। বেদান্তীরা এদেরকে বলব, ভাই তুমি যাই প্রমাণ করে দাও না কেন, আমি মানতে পারছি না। যা কিছু দিয়েই প্রমাণ করা হোক না কেন, গণিত, পদার্থ, রসায়ণ যাই দিয়ে প্রমাণিত করে দাও না কেন আমি বিশ্বাস করি না। আমরা এইটাই বিশ্বাস করি – নিত্য বলে একটি আছে, সেই নিত্যের উপরেই এই অনিত্যতাকে প্রতীয়মান হচ্ছে। তুমি যে বলছ space is not absolute, আমিও তা মানছি। তুমি যখন বলছ – time is not absolute, then we not only agree but we propose it. Neither time is absolute nor space is absolute, nothing is absolute. কিন্তু আমরা জানি ও বিশ্বাস করি এই অনিত্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা নিত্য। সেই নিত্য বস্তুটি কি – শুদ্ধ চৈতন্য। এই শুদ্ধ চৈতন্যকেই যোগ বলছে পুরুষ, বেদান্ত বলছে আত্মা। আরও সব থেকে যেটা মজার ব্যাপার তা হল, তুমি তোমার এই যুক্তি, বুদ্ধি, বিজ্ঞান দিয়ে কোনদিন এই চৈতন্যে পৌঁছাতে পারবে না। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ আর বেদান্তের মধ্যে এই জায়গায় এসে সামন্য একটু পার্থক্য এসে যায়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বলবে – এই যে চৈতন্যের কথা বলা হচ্ছে এটাও একটা প্রবাহের মত, নিরন্তর এর পরিবর্তন হচ্ছে। বেদান্ত বলছে হ্যাঁ ঠিকই বলছ পরিবর্তন অনবরত হচ্ছে কিন্তু তুমি যে পরিবর্তনটা দেখছে সেটা তোমার মনে দেখছ, আসলে চৈতন্যের কোন পরিবর্তন হয় না।

স্বামীজী খুব সুন্দর সহজ একটি উপমা দিয়ে বেদান্তের এই তত্ত্বটিকে একদিকে যৌক্তিকতার দিক থেকে যেমন আরও দৃঢ় ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আবার অন্য দিকে আমাদের বোঝার জন্যও সহজ করে দিয়েছেন, স্বামীজী বলছেন – *যেমন ম্যাজিক লর্থন হইতে আলোক আসিয়া স্থির বস্তুর উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাতে নানা বর্ণের চিত্র উৎপন্ন করে, অথচ কোন রূপে উহাকে মলিন বা রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এই সব সংস্কার স্থির পুরুষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র।* সিনেমা হলে পর্দার উপরে একটার পর একটা চিত্র পড়ছে তো পড়ছেই। সিনেমাতে দেখছি একটা গাড়ী ছুটে আরেকটা গাড়ীকে তাড়া করেছে, আসলে এই ছবিগুলো প্রত্যেকটিই স্থির চিত্র। এই স্থির চিত্রগুলিকে পর পর সাজিয়ে একটা রিলের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে, সেই রিলকে যখন প্রজেক্টরের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরান হচ্ছে আর রিলের মধ্যে একটা আলো ফেলা হচ্ছে তখন সেই আলোটা রিলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পর্দার উপরে পড়ছে আর আমরা দেখছি গাড়ী ছুটে যাচ্ছে। এই মনটাও একটা সিনেমার পর্দার মত। ধরুন এই দেওয়ালটা একটা পর্দা, একটা প্রজেক্টর দিয়ে সিনেমা চালান হচ্ছে, আমরা সিনেমা দেখছি। সিনেমা দেখতে দেখতে একটা সময় আমি বললাম – অনেক হয়েছে, আর নয়, আমি আর সিনেমা দেখতে চাই না। সিনেমার প্রজেক্টরটা বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন কি দেখব? দেওয়ালে একটা স্থির ছবি দেখা যাচ্ছে। তারপর আপনি বললেন ওটাও বন্ধ করে দাও, রিলটাকে খুলে দাও। তখন দেওয়ালে শুধু আলো থাকবে, এটাই হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্যের আলো।

সাধনাতেও ঠিক একই জিনিষই হয়। আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতি অনবরত নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে। সাধক সাধনা আরম্ভ করল, সাধনা করতে করতে একটা সময় বলছে এই নাচ বন্ধ কর। যখন বলল এই জগৎ সংসারের নাটক বন্ধ করে দাও, তখন একটা স্থির ফটোগ্রাফ থেকে যায়। এই স্থির ফটোগ্রাফটা কিসের? যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা করছেন তাঁদের কাছে এটাই হয়ে যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থির চিত্র, যারা শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করছেন তাদের কাছে ওটাই শ্রীকৃষ্ণের স্থির চিত্র। এই একটাই স্থির চিত্রে সাধক এখন আটকে আছে। সব শেষে বলছে – এটাকেও বন্ধ করে দাও। ব্যস্, এই ছবিটাও সরিয়ে নেওয়া হল। এখন কি থাকবে? কেবল মাত্র দেওয়ালটা, সাধকের শুদ্ধচিত্তটাই পড়ে রয়েছে। আর

ওই প্রজেক্টরটা কোথায় আছে? এখন সে অন্য দেওয়ালে ছবি ফেলতে শুরু করে দেবে, এই দেওয়ালে আর ছবি মারবে না। সেইজন্য যোগদর্শনে অনন্ত পুরুষের কথা বলা হয়। কত আত্মা আছে? অসংখ্য আত্মা আছে। বেদান্তের সাথে যোগের এই জায়গায় এসে পার্থক্য হয়ে যায়। বেদান্ত বলছে – এক অখণ্ড চৈতন্যই আছেন। যোগ বলছে – যত শরীর তত আত্মা, আর এই আত্মাগুলি হচ্ছে যেন ছোট ছোট পর্দা, যাতে প্রকৃতি তার খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে, পুরুষ সেই খেলা দেখতে থাকে আর এই খেলার সাথে নিজেকে একাত্ম করে নেয়। এই সূত্রে এইটাই বলছে, পুরুষ পেছনে আছেন বলেই মনের বা চিত্তের বৃত্তি গুলিকে সব সময় বোঝা যাচ্ছে।

বৌদ্ধরা এখানে বলবে – যে ছবিগুলো একটার পর একটা যাচ্ছে এটাই সত্য, এটাকে বন্ধ করে দিলেই সব শেষ, আর কিছু থাকবে না, সব শূন্য। কিন্তু হিন্দু দর্শনে, বিশেষ করে বেদান্ত বলবে – না, এই ছবিগুলো যার ওপরে হচ্ছে সেই হলেন আত্মা বা পুরুষ, যার পরিবর্তন হচ্ছে তার পেছনে একটা অপরিবর্তনীয় বস্তু আছে, শূন্য বলে কিছু নেই। বৌদ্ধরা এই মত মানবে না, অবশ্য ভগবান বুদ্ধ নিজে এই তত্ত্বকে নিয়ে কিছু বলেননি, এই মতটা বৌদ্ধদের মধ্যে পরবর্তিকালে এসেছে।

মন দৃশ্য তাই মন স্বয়ংপ্রকাশ নয়

এত কিছু বলার পর এবার পরিবর্তনশীল মন সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে তাতে বিজ্ঞানের মতকে খণ্ডন করে এই তত্ত্বকেই আরও দৃঢ় ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলছেন – **ন তৎ স্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ**।।১৮।। চার্বাকরা অর্থাৎ ভৌতিকবাদী বা বিজ্ঞানীরা বলে মনই চৈতন্য। কিন্তু মনও একটা object। মনকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারছি, এক অপরের মনকে জানতে পারছে। সেইজন্য মন কখন স্বভাস হতে পারে না, মনের কখন নিজস্ব জ্যোতি থাকতে পারে না, মন অন্যের জ্যোতিতে সব সময় আলোকময় হয়ে আছে। হিন্দুদের এই ধারণাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন যে আত্মা বা চৈতন্য নয় এটা কি করে বুঝবো? বলছেন – anything which is an object that can never be self-luminous. Self-luminous মানে স্বয়ংপ্রকাশ। আমার ডান হাত দিয়ে সব কাজ করে দিতে পারব, দুনিয়ার সব কিছুকে ডান হাত দিয়ে ধরে নেব কিন্তু শুধু ডান হাতকেই ধরতে পারব না। ঠিক তেমনি এই চোখ দিয়ে সবাইকে দেখা যাবে কিন্তু নিজের চোখকে কোন দিন দেখা যাবে না। সেইজন্য বলা হয় কর্তা কখনই কর্ম হয় না। *বিজ্ঞাতারমরেকনম্ বিজানীয়াৎ*, যে বিজ্ঞাতা তাঁকে কে জানবে? যখন বলছি আমার মন আজ ভালো নেই, আমার মন আজকে ভালো, তার মানে এখানে মন হয়ে গেল object, যেই object হয়ে গেল তখন মন আর স্বয়ংপ্রকাশ হতে পারছে না। যে স্বয়ংপ্রকাশ হবে সে কখনই object হবে না। মন আপনার জ্ঞানের বিষয়, মন যেহেতু জ্ঞানের বিষয় তখন মন কখনই কর্তা হবে না। সমাধিবান পুরুষ তাঁর মনকে অবজার্ভ করতে পারেন। যে জিনিষকে আপনি অবজার্ভ করছেন সেই জিনিষ কখন স্বয়ংপ্রকাশ হবে না। যখন মন স্বয়ংপ্রকাশ নয় তখন সে চৈতন্যও নয়। কর্তা ও বিষয় এই দুয়ের দ্বন্দ্ব সমস্ত ধর্মেই আছে। সেইজন্য বলা হয় আত্মজ্ঞান কখনই হয় না। আত্মজ্ঞান মানে আত্মাকে জানা, তাহলে আত্মাও বিষয় হয়ে গেল। আত্মা সব সময় কর্তা, কর্তাকে কক্ষণ জনা যাবে না। সব কিছুর জ্ঞান লাভ করতে পারব কিন্তু আত্মার জ্ঞান কখনই হবে না। মন যে আত্মা নয় এর পক্ষে এটাই সব থেকে জোড়ালো যুক্তি।

বিজ্ঞানীরা এখন চৈতন্যকে নিয়ে নানান ধরণের গবেষণা করে চলেছে, কিন্তু তারা যতই গবেষণা করুক না কেন, যেহেতু মনকেই চৈতন্য ধরে নিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য তারা চৈতন্যকে কোন দিনই ধরতে পারবে না। যখনই তারা বুদ্ধির কথা বলবে তখন বুদ্ধিকে চৈতন্য রূপেই বর্ণনা করবে। ভারতীয় দর্শনে মনের সাথে আত্মার কোন সম্পর্কই নেই। মন হল চাঁদের মত – চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসছে। কিন্তু আমরা মনে করছি চাঁদ তার নিজের আলো দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করছে। অন্যান্য যত গ্রহের আলো সব সূর্যের আলো সেখানে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। মনের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়। আত্মা বা পুরুষের চৈতন্যের আলোতে মনকেও মনে হচ্ছে চৈতন্যময়।

প্রথমে আলাদা করতে হবে জড়, মন ও চৈতন্যকে। জড় পদার্থ আছে, সেই জড় থেকে সরে এলেন মনেতে। তখন মনকে মনে হবে জীবন্ত। যে জিনিষকে সজীব বলে মনে হবে তখনই বুঝতে হবে সেই জিনিষের মনও আছে। জড় জড়ের উপরই কাজ করবে। তেমনি মন মনের উপরে আর চৈতন্য চৈতন্যের উপরেই কাজ করবে। এরা কিন্তু একে অপরের সাথে মিশে যাবে না। একটা বস্তু সেটা জীবন্ত না মৃত, যদি জীবন্ত হয় মন কিন্তু তাৎক্ষণিক জেনে যায় যে এরও একটা মন আছে। একটা মানুষ যখন পড়ে থাকে আপনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে দিতে পারবেন যে এই লোকটা এখনো মারা যায়নি কিংবা লোকটা মারা গেছে। দম দেওয়া পুতুল নাচছে আর তার পাশ দিয়ে একটা পোকা হেঁটে যাচ্ছে – এক নজর দেখেই বলে দেওয়া যাবে যে পোকাটা জীবন্ত আর পুতুলটা একটা নির্জীব খেলনা মাত্র। কারণ মন মনকে জানে। ঠিক সেই রকম চৈতন্য চৈতন্যকে জানে। মন কখনই চৈতন্যকে জানতে পারবে না।

মন একই সাথে দুটি বস্তুকে বুঝতে পারে না

মন যে স্বয়ংপ্রকাশ নয় এটাকেই আরও দৃঢ় করার জন্য বলছেন **একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।।১৯।।** মন যদি স্বয়ংপ্রকাশ হত তাহলে মন একই সঙ্গে নিজেকেও দেখতে পারত আর বস্তুকেও দেখতে পারত। কিন্তু মন তা পারে না, মন নিজেকেও দেখবে আর বস্তুকেও দেখবে এভাবে মন কখনই দেখতে পারবে না। এর আগে আমরা ব্যাখ্যা করেছি, একটা চিন্তা যখন শেষ হয়ে যায় তখন মন ওই চিন্তাটাকে দেখতে পায়। সমাধিবান পুরুষ যখন চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তখন তাঁর নিজেরও বোধ থাকে তার সাথে জগতেরও বোধ থাকে। ঠাকুরের ভাবমুখে থাকাকাটা ঠিক তাই। ভাবমুখে ঠাকুর চৈতন্যের অবস্থাকেও দেখছেন আর জগতকেও দেখছেন। শুধু তাই না, তিনি আবার সব কিছুকে চৈতন্য দেখছেন। মন্দিরে মা কালীর পূজা করার সময় কোশাকুশি, চৌকাঠ সবই দেখছেন চৈতন্যময়। তিনি কোশাকুশিকে চৈতন্য রূপেও দেখছেন আবার কোশাকুশি রূপেও দেখছেন। ঠাকুরের বস্তু জ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান দুটো একই সঙ্গে হচ্ছে। এতে এটাই সিদ্ধ হচ্ছে যে চৈতন্যই একমাত্র আত্মজ্যোতি সম্পন্ন। মন যদি আত্মজ্যোতি সম্পন্ন হত তাহলে আমরাও এই দুটো জিনিষ একই সঙ্গে দেখতাম, নিজের মনকেও পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম সাথে সাথে বস্তুকেও পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম। যদি বলেন মন বস্তুকে দেখছে আর এই মনের পেছনে আরেকটা মন আছে সে এই দেখাটা অবজার্ড করছে, এই ব্যাপারটাও কখন হবে না। নিউওরোলজিতে এর উপর খুব মজার বর্ণনা আছে। আমরা একটা জিনিষকে কিভাবে জানছি? এরা বলছে, একটা মন আছে যে এই মনকেও দেখছে আর objectকেও দেখছে। এভাবে কখন হতে পারে না, এরকম হলে তো সেই মনকে অবজার্ড করার জন্য আরেকটা মন চলে আসবে, মানে মনের পেছনে মন, সেই মনের পেছনে আরেকটা মন, এভাবে অনন্ত মন চলতেই থাকবে। ব্যাপারটা অত জটিল নয়, মন আছে আর বস্তু আছে, মন বস্তুকে দেখছে, ওখানেই সব ঝামেলা চুকে গেল। মন আর বস্তুর পেছনে কে আছেন? সচ্চিদানন্দ, তিনি পুরুষ।

দুটো মন থাকলে স্মৃতি সঙ্কট হত

কোন কারণে যদি বলেন দুটো মন আছে, একটা মন এই জগতকে দেখছে আর আরেকটা মন এই মনকেও দেখছে আর বস্তুকেও দেখছে। তখন বলছেন **চিভান্তরদৃশ্যতে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।।২০।।** এই রকম হলে তো স্মৃতিসঙ্কর হয়ে যাবে। স্মৃতিসঙ্কর মানে স্মৃতিগুলো মিলে যাবে। মন থাকা মানে তাতে স্মৃতিও আছে। আপনি যদি বিজ্ঞান মতে বলেন মন হল স্বয়ংপ্রকাশ, মনই চৈতন্য, তখন বিরাট বড় সমস্যা হয়ে যাবে। যদি মন চৈতন্য হয় তাহলে মন নিজেকেও জানবে আর objectকে অর্থাৎ বস্তুকেও জানবে। তখন আপনি বলবেন আরেকটি মন আছে যে নিজেকেও দেখতে পায় আর বস্তুকেও দেখতে পায়। ধরলাম দুটো মন হয়ে গেল। এবার মনের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হল মনে স্মৃতি থাকতে হবে। তাহলে পেছনে যে মন আছে তার কিছু ধরণের স্মৃতি থাকবে আর সামনে যে মন তারও আবার অন্য ধরণের স্মৃতি থাকবে। এবার এর স্মৃতির সঙ্গে ওর স্মৃতির সংঘাত লেগে যাবে। স্মৃতিতে স্মৃতিতে যদি সংঘাত লেগে যায় তাহলে তো বিরাট ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে।

কিছু দিন আগে একজন নামকরা বড় পণ্ডিতের মাথায় কি করে ঢুকে গিয়েছিল যে ইলেক্ট্রন হল চেতন। কিন্তু কারুর ধারণাতেই আসছে না, ইলেক্ট্রন কি করে চেতন হতে পারে! শাস্ত্রের কোথাও এর সমর্থনে কোন কথার উল্লেখ নেই। ইলেক্ট্রন যদি চেতন হয় তাহলে সব কিছুই চেতন, তার মানে আমার হাতটাও চেতন। আমার হাত যদি চেতন হয় তাহলে এই জলের গ্লাসটাও চেতন, গ্লাশের জলটাও চেতন পদার্থ। আমার জলতেষ্টা পেয়েছে, আমি এখন জল খাবার জন্য গ্লাসটাকে ধরতে যাচ্ছি, জল এখন নিজেকে বাঁচাতে চাইবে। জল চেতন তাই সে জানে আমার হাত এগিয়ে আসছে। সেই পণ্ডিত বলতেন ইলেক্ট্রন একটা conscious decision নিয়ে উপরে চলে যায়। বিচিত্র ধরণের চিন্তা ভাবনা। তখন এই গ্লাসটা লাফ মারে। হাতটা চেতন, ফলে হাত বুঝতে পারছে যে গ্লাস জেনে গেছে যে আমি জেনে গেছি যে গ্লাসটা লাফাবে। সেইজন্য হাতটাও লাফ মারে। গ্লাসও জেনে গেছে হাত লাফ মারবে, সেইজন্য গ্লাস নীচের দিকে নেমে আসে। গ্লাস যে নীচের দিকে নেমে আসছে সেটা আবার হাত জেনে গেছে যে আমি উপর থেকে নীচে যাবো, আবার এটাও জানে যে গ্লাস জেনে গেছে ও এবার নীচের থেকে উপরে আসবে। ফলে শেষ পর্যন্ত হাত গ্লাসকে ধরতে পারছে। সাধুরা এর নামই দিয়েছিলেন jumping plate theory। খাবার সময় প্লেট অনবরত লাফাচ্ছে আর উঠছে আর আমার হাতও তার সঙ্গে ক্রমাগত লাফাচ্ছে আর নামছে। আর তার সঙ্গে আমার শরীরও জানে আমার হাত লাফাবে, সেইজন্য আমার শরীরটাও লাফাচ্ছে। এবার আমি যে লাফিয়ে উপরে যাবো তখন আবার ছাদের সমস্যা হয়ে যাবে, তাই ছাদটাও লাফাচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণে ও ঠিক করছে গ্লাস আর প্লেট নীচে আসবে ততক্ষণে ছাদটাও নীচে চলে আসবে। আমরা এই স্থিতি কেন দেখছি? কারণ সবাই সবাইকে জানছে, আর অনবরত সব কিছু লাফিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতসঙ্করেও ঠিক এই ধরণের উদ্ভট পরিস্থিতিই সৃষ্টি হবে। সেইজন্য যোগ বলে দিচ্ছে এই সব আলতু ফালতু কথা ফেলে দাও। পরিষ্কার দুটো জিনিষ আছে - বস্তু আছে আর মন আছে, আর দুটোই পরিবর্তনশীল। কারণ দুটোই প্রকৃতির এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু সব কিছুর পেছনে শুদ্ধ চৈতন্য আছেন, তিনি একেবারে শান্তশিষ্ট। তাঁর সামনেই এই দৃশ্যগুলো পাল্টাচ্ছে। তিনি স্থির বলে তিনি সবটাই জানতে পারেন। সিনেমা হলে সিনেমার পর্দা যদি অনবরত নড়তে থাকে, আর সিনেমার প্রজেক্টরও যদি নড়তে থাকে তাহলে সিনেমার কিছুই দেখা যাবে না। এগুলো উপমা, কিন্তু যাঁরা সমাধিবান পুরুষ তাঁরা পুরো ব্যাপারটাকে এই ভাবেই দেখেন।

পুরুষই স্বয়ংজ্যোতি, প্রতিবিন্দিত জ্যোতিতেই মনকে জ্ঞানময় বোধ হয়

পরের সূত্রে বলছেন *চিতেরপ্রতিসংক্রমায়ান্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্।।২।।* বুদ্ধির পেছনে যিনি পুরুষ আছেন তিনিই ঠিক ঠিক আত্মজ্যোতিস্মান, তিনিই স্বয়ংজ্যোতি। এই পুরুষের বৈশিষ্ট্য কি? *অপ্রতিসংক্রম*, তাঁর স্বরূপ কখনই পাল্টায় না। যতক্ষণ কেউ ধ্যানের গভীরে সেই পুরুষকে প্রত্যক্ষ না করছেন ততক্ষণ সেই আত্মাকে, যাঁকে যোগশাস্ত্রে পুরুষ বলা হচ্ছে, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বিচার করা যাবে না। এই জায়গাতে এসে বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে বিরোধ লেগে যায়। বিজ্ঞান বলবে ‘আমি যতক্ষণ কোন objective reality না দেখতে পাই ততক্ষণ আমি তাকে কি করে মানবো’! আধ্যাত্মিক পুরুষরা বলবেন ‘আরে ভাই! আমি তো এটাকে সরাসরি সংবেদন করছি। পুরুষ তো কখন বুদ্ধির object হতে পারে না’। চাকর কী করে মালিক হতে যাবে! মালিক চাকরকে জানতে পারে, চাকর কখন মালিককে আদেশ করতে পারে না। এখানে পুরোপুরি মালিক আর চাকর, সেব্য সেবকের সম্পর্ক। মন যখন পুরুষের কাছে আসে তখন পুরুষের জ্যোতিতে মন জ্যোতিস্মান হয়ে যায়। জ্যোতিস্মান হয়ে যাওয়ার ফলে মন মনে করতে শুরু করে এটা আমারই জ্যোতি। মন তখন সেই আত্মা বা পুরুষের মত আচরণ করতে শুরু করে। স্বামীজী বলছেন, যতক্ষণ বুদ্ধির পেছনে পুরুষের জ্যোতি রয়েছে ততক্ষণ বুদ্ধি মনে করে আমিই সেই পুরুষ। চেতনা যার মধ্যে আসবে তারই মনে হবে আমিই সেই পুরুষ। ক্লাশরুমে যখন মাস্টার থাকে না তখন কোন ছাত্র মাস্টারের চেয়ারে বসে মনে করতে থাকে আমিই মাস্টার। এখানেও কতকটা এই ধরণেরই হয়। অথবা এই রকমও হয়, কাউকে কিছু ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার অনেক দিন সেই ক্ষমতা ব্যবহার করতে করতে এক সময় মনে করতে শুরু করে দেয় যে ক্ষমতাটা আমার নিজস্ব। বুদ্ধি আর চৈতন্যের ব্যাপারটাও এত দীর্ঘ দিন চলছে যে বুদ্ধি মনে করে

আমিই চৈতন্যের মালিক। আসলে এই জ্যোতি পুরুষের, বুদ্ধি ছাড়া পুরুষের সব থেকে কাছে আর কেউ যেতে পারে না। বুদ্ধি পুরুষের কাছে চলে যাওয়ার ফলে সে বেশী আলোকিত হয়ে যায়, আলোকিত হয়ে যাওয়ার ফলে বুদ্ধি মনে করে আমিই সব কিছু।

শুদ্ধ বুদ্ধি দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুটোকেই আলাদা বুঝতে পারে

বুদ্ধি যে চৈতন্যবান সত্তা নয়, বুদ্ধির সঙ্গে চৈতন্যের এই তফাৎটা কোথায় ধরে পড়ে? তার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হচ্ছে **দ্রষ্ট-দৃশ্যোপরজ্ঞং চিত্তং সর্বার্থম্।।২২।।** যখন বুদ্ধি একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায় তখন দুটোকেই আলাদা করে পরিষ্কার অনুভব করতে পারা যায় – এটা দৃশ্য জগৎ আর ইনি দ্রষ্টা, দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মধ্যে তফাৎ তখনই বোঝা যায়। তখন বুদ্ধির কাছে সবটাই পরিষ্কার হয়ে যায়, তার আগে পর্যন্ত কোন কিছুই পরিষ্কার হবে না। এই উপমা অনেকবার নেওয়া হয়েছে – একটা মোমবাতি জ্বলছে, তার সামনে একটা কাঁচ রেখে দেওয়া হয়েছে। মোমের আলোতে ওই কাঁচও আলোকিত হয়ে গেল। কিন্তু কাঁচের মুখটা জগতের দিকে ফেরান রয়েছে। বুদ্ধিও জড়িয়ে আছে এই জগতের সব কিছুর সাথে। এই অবস্থায় বুদ্ধির দুটো জিনিষ মনে হয়, প্রথমতঃ সে মনে করে আমি সর্বশক্তিমান, কারণ তার মধ্যে চেতনা আছে। দ্বিতীয়তঃ তার মনে হয় এই জগৎ আমার। আমি যখন কাউকে ভালোবাসছি তখন মনে হয় সে আমার। কেন মনে হয় সে আমার? বুদ্ধির জন্য মনে হয়। দুটো বস্তু কখনই এক হয় না, এক হবে একমাত্র সেই চৈতন্যতে গিয়ে। কিন্তু বুদ্ধির যে চৈতন্য সেই চৈতন্য ধার করা চৈতন্য, সেইজন্য সে মনে করছে আমি চৈতন্যবান। এর জন্য কোন প্রমাণ লাগে না। আমরা কখনই মনে করি না যে আমি চৈতন্যবান নই, সব সময় সবাই মনে করছে আমি চৈতন্যবান। আমরা যে ‘আমি’ ‘আমি’ বলছি, এই ‘আমি’ বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি? আমার আপনার শরীর মনের যে সংঘাত এটাকেই ‘আমি’ মনে করছি। খুবই সাধারণ ব্যাপার, এর জন্য যোগশাস্ত্রের কোন সূত্র জানার দরকার নেই। পশু স্তরে যখন থাকে তখন পশুও মনে করে আমার শরীর ছাড়া কিছু নেই। শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ-ধ্যান, সাধুসঙ্গ করতে করতে শরীর বোধটা আস্তে আস্তে কাটতে থাকে। তখনও কিন্তু মনে করে শরীর আর মনের যে সংঘাত এটাই আমি। দেহ আর মন এই দুটোকে মিলিয়ে একটা বুদ্ধি তৈরী হয়, এটাকেই বলছে দেহাত্মবুদ্ধি। এই দেহাত্মবুদ্ধিকেই মনে করছি ‘আমি’। তখন সে কিছু জিনিষকে বেশী কিছু জিনিষকে কম ভালোবাসে। এরপর আরও যখন সাধনা করছে, সাধনা করতে করতে নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে। সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে বুদ্ধি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। বুদ্ধিতে আর কোন রঙ নেই, অর্থাৎ বুদ্ধিতে জগতের আর কোন ছাপ পড়ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সাধনা করছিলেন তখন তিনি জগতকে ছায়ার মত দেখতেন। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা আছে, ঠাকুর বলছেন ‘সেই সময় দক্ষিণেশ্বরের লোকজনকে আমার ছায়ার মত মনে হত’। উপনিষদেও এর সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলছেন আত্মজ্ঞান আলোর মত আর জগতকে ছায়ার মত দেখায়। আসলে যখন আত্মজ্ঞানের আলো প্রস্ফুটিত হয় তখন সেই আলোতে জগতকে ছায়ার মতই মনে হয়। এখন আমাদের সবারই উল্টো বোধ হচ্ছে, জগতকে আলোকিত আর পরমাত্ম বস্তুকে ছায়ার মত মনে হচ্ছে। এইভাবে জ্ঞানের একটা অবস্থায় যোগী পরিষ্কার দুটো বস্তুকেই দেখতে পান। আমরা যা কিছু জানছি, বুঝছি সবই বুদ্ধি দিয়েই জানছি, সেই বুদ্ধিতে এখন একমাত্র পরমাত্মার শুদ্ধ চৈতন্যের আলো এসে পড়ছে, অন্য দিকে জগতের কোন কিছুই আলো বুদ্ধিতে পড়ছে না। তখন বুদ্ধি দেখছে ‘আরে তাই তো! এই আলোতো সেই পরমাত্মার, সেই পুরুষের আলো’। এই অবস্থায় তখনও তাঁর জগতের বোধ থাকছে, জগত তো কোথাও চলে যায়নি। তখন তিনি একই সাথে দুটোকেই দেখতে পান। এইদিকে তিনি দেখছেন জগৎ আর অন্য দিকে দেখছেন পুরুষকে, এক সঙ্গে দুটোকেই বোধ করতে পারেন। ঠাকুরের জীবনেও ঠিক এই অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। সাধনার পরে মা বলছেন ‘তুই ভাবমুখে থাক’। ভাবমুখে থাকা মানে, একদিকে এই বোধ আছে ‘আমি সেই শুদ্ধ আত্মা’, অন্য দিকে জগতের বোধটাও আছে। কিন্তু এই জগৎ তাঁকে আর প্রলুব্ধ করতে পারবে না। সচরাচর দেখা যায়, একটা সময় হয়ত তিনি পুরোপুরি জগতের বোধে অবস্থান করছেন নয়তো পরমার্থ বোধে অবস্থান

করছেন। হয় তিনি সমাধির অবস্থায় লীন হয়ে আছেন, আর তা নাহলে জগতের বোধ নিয়ে সবার মাঝে বিচরণ করছেন। ঠাকুরের এটা এক বিশেষ অবস্থা, যেখানে তিনি দুটোকেই দেখতে পারতেন। দুটোর মধ্যে তিনি বাচ খেলতেন। এই সূত্রে পতঞ্জলি ঠিক এই কথাই বলছেন, *দৃষ্ট-দৃশ্যোপরজ্ঞং চিত্তং সর্বার্থম্*, ওই অবস্থায় গেলে মন সব কিছু বুঝতে পারে। এর আগে নানা রকমের যত সংশয় চিন্তের মধ্যে ছিল, সব সংশয়ের এখানে এসে অবসান হয়ে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভের শক্তি এসে যায়।

পুরুষের জন্যই মন কাজ করে

এরপরে বলছেন *তদসংখ্যেয়বাসনাভিচ্ছিন্নমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।।২৩।।* আমাদের মন আসলে কি, মন কিভাবে গঠিত, মনের বাস্তবিকতা কি, এগুলোকে পর পর কয়েকটি সূত্রে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। প্রথমে বৌদ্ধদের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদকে নাকচ করেছেন, তারপর বলছেন যদি কেউ মনে করে এই মনের পেছনে আরেকটি মন আছে, সেই মনের পেছনে আরেকটি মন আছে, তাহলে স্মৃতি সঙ্কট হয়ে যাবে। সেইজন্য কখনই বলা যাবে না যে, এই মনের পেছনে আরেকটি মন আছে, মন একটাই। তারপরে বলছেন মনকে শুদ্ধ করে নিলে দুটোকেই, একদিকে পুরুষ অন্য দিকে প্রকৃতি রূপ জগৎকে এক সঙ্গে দেখতে পারা যায়। এসব বলে তেইশ নম্বর সূত্রে নানা রকম যুক্তির মধ্যে একটা যুক্তি দিচ্ছেন। বড় বড় পণ্ডিতরাই এই সব যুক্তিতর্ক নিয়ে চলেন। কিন্তু জিনিষটা আমাদের সবারই জানা দরকার। বিভিন্ন রকমের বাসনা দিয়ে আমাদের এই মন তৈরী। শুধু কি বাসনা! কত রকমের আবেগ, শোক, দুঃখ, আনন্দ, মান-অভিমান কত কিছু দিয়ে মন তৈরী। বলছেন, জগতে দেখা যায় যখনই কোন বস্তু দুটো জিনিষের মিশ্রণের ফলে উদ্ভব হয় তখন ওই বস্তুর উপযোগের জন্য একটা তৃতীয় বস্তুর দরকার। দুটো জিনিষকে মেলানো হলেই তৃতীয় একটা জিনিষের দরকার হবে। তার মানে, যেখানেই দুটো জিনিষ মিশ্রণ হবে সেই জিনিষটার শুদ্ধতা আর থাকবে না, জিনিষটা এখন অশুদ্ধ হয়ে গেল। দুটো জিনিষের মেলানোর পেছনেও এর একটা উপযোগিতা থাকে। আসলে বলতে চাইছেন, যে জিনিষ যত মৌলিক হবে সেই জিনিষটাই তত শুদ্ধ হবে। কয়েকজন পাশ্চাত্য দার্শনিক দেখিয়েছেন, যে কোন জটিল জিনিষকে সরল দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। সরলটাই সব সময় আসল, জটিল মানেই নকল। যদি বলা হয় দুই কি? দুইকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা হবে এক যোগ এক। এক হয়ে গেল সরল, একের নীচে কিছু যাবে না। যোগ জিনিষটাও সরল। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যোগ কি? তখন বলবে দুটো জিনিষকে যখন মেলানো হয়। যখন যে কোন জিনিষের একেবারে নীচে পৌঁছে যাবে, এরপর আর ওই জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ যে কোন ব্যাখ্যার জন্য দরকার যে জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা হবে তার থেকে আরও সরল জিনিষের। যেমন দুই সংখ্যাটি জটিল জিনিষ, দুইকে ব্যাখ্যা করার জন্য দরকার এক যুক্ত এক। এক সংখ্যা কে আর ব্যাখ্যা করা যায় না। যেগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলোকে বলে concept. এবার এটাকেই যদি আত্মাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন বলবে আত্মার সাহায্যে বাকি সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ আত্মাই একমাত্র সব থেকে মৌলিক বস্তু। তাই আত্মাকে কোন দিন ব্যাখ্যা করা যাবে না। ঈশ্বরও একই জিনিষ। ঈশ্বরের সাহায্যে বাকি সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে। বাকি সব কিছুই জটিল, ঈশ্বর হলেন সব থেকে সহজ সরল। সেইজন্য কেউ যদি বলে ঈশ্বর কি আমাকে বুঝিয়ে দিন? এই প্রশ্নের কখন কোন অর্থই হয় না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কলকাতার উত্তরে কি আছে? তার উত্তরে বলবে উত্তরবঙ্গ আছে। উত্তরবঙ্গের উত্তরে কি আছে? হিমালয় আছে। এইভাবে আরও উত্তরে কি আছে জানতে চাওয়া হয়, উত্তর দিতে দিতে একটা সময় নর্থ পোলে চলে যাবে। নর্থ পোলের উত্তরে কি আছে, এই প্রশ্ন আর করা যায় না। জগতের কোন জিনিষকে বর্ণনা করার সময় সেই জিনিষের থেকে সরল জিনিষকে reference point করে সেই জিনিষের সব কিছু বর্ণনা করা হয়। এবার reference pointকেই যদি কেউ ব্যাখ্যা করতে বলে, তখন সেটার আর ব্যাখ্যা করা যাবে না। সেইজন্য প্রশ্ন করার জন্যও একটা প্রস্তুতি দরকার, প্রস্তুতি ছাড়া প্রশ্ন হয় না।

এই যে মন, এই মন নানা রকম জিনিষ দিয়ে তৈরী, তার মানে অন্য কোন জিনিষের জন্যই এই মন তৈরী হয়েছে। অন্য জিনিষটা কী? কার জন্য মন তৈরী হয়েছে? সেই জিনিষটাই পুরুষ,

পুরুষের জন্যই মন তৈরী হয়েছে। তার মানে মন পুরুষের নিজের সত্তা নয়। মন যদি পুরুষের নিজের সত্তা হত তাহলে মনকে আর ব্যাখ্যা করার কিছু থাকবে না। মন পুরুষের সত্তা হলে, মন তখন তত্ত্ব হয়ে যাবে। কিন্তু মনের কোন তত্ত্ব নেই। কিন্তু মন কখন এক রকম থাকে না, এখন মন এক রকম, পরেই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। মনের যে অনবরত পরিবর্তন হয়, মনের পরিবর্তনশীলতাই বলে দিচ্ছে যে মন কোন বাস্তবিক সত্তা নয়। এই কয়েকটি সূত্রে মন বা বুদ্ধিকে নিয়ে আলোচনা করা হল। মূল বক্তব্য হল বুদ্ধি শেষ কথা নয়। এই বক্তব্যকে দাঁড় করাবার জন্য যোগশাস্ত্র অনেক রকম যুক্তিতর্ক দিচ্ছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল, যখন কেউ ধ্যানের গভীরে সমাধির অবস্থায় চলে যান তখন তিনি পরিষ্কার দেখতে পান একদিকে রয়েছে পুরুষ আর অন্য দিকে রয়েছে প্রকৃতি। তিনি নিজেও প্রকৃতির অঙ্গ, তাঁর বুদ্ধিও প্রকৃতির অঙ্গ কিন্তু তিনি দুটোকেই দেখতে পান। কারণ সমাধির অবস্থায় জগৎকে যে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইজন্য সমাধি থেকে বৃথিত হওয়ার পরেও তাঁর মধ্যে পুরুষের সত্তা ভাসমান হয়ে থাকছে। তখন তিনি দেখতে পান আমি প্রকৃতির থেকে আলাদা হয়ে গেছি। এটা অনেকটা এই রকম – আপনি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে করে যাচ্ছেন। প্লেন আকাশে ওঠার পর আপনি দেখছেন নীচে কলকাতা শহর, তখন আপনার মনে হবে আমি আলাদা কলকাতা শহরটা আলাদা। এখানে খুব উচ্চদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সাধারণ মনের পক্ষে এগুলো ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। আমরা মূলতঃ এখানে ষড়দর্শনের দুটো দর্শন, সাংখ্য আর যোগদর্শন একই সঙ্গে দুটোর মধ্য দিয়ে চলেছি। যোগদর্শনের মধ্যে কিছু ছোট ছোট জিনিষ বাদ দিলে সাংখ্যদর্শনের মোটামুটি পুরোটাই এখানে এসে যায়।

যোগী যখন জানতে পারেন পুরুষ মন নন

মন বা বুদ্ধিকে যোগ কীভাবে দেখে এবং একটা পর একটা যুক্তি দিয়ে আগের কয়েকটি সূত্রে পতঞ্জলি বোঝাতে চেয়েছেন মনকে কেন নিকৃষ্টতম বলা হচ্ছে। এখন বলছেন – **বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ।।২৪।।** এই সূত্রটি হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে সামনে নিয়ে আসছে। এত আলোচনা করে মূল কথাতে এসে বলছেন – যখন বিচার করতে শুরু করবে তখন পুরুষ যে মন নন সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকবে। সব পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তখন সে পুরুষের সাক্ষাৎ করে। এঁরাই হলেন **বিশেষদর্শিন**, বিশেষদর্শি। তাঁরা দেখেন **আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ**। তার মানে, বুদ্ধির মধ্যে যে আত্ম ভাবনা, অর্থাৎ ওই অবস্থায় গিয়ে আমার মনটাই আত্ম এই বোধটার নিবৃত্তি হয়ে যায়। তখন সে পরিষ্কার দেখতে পায় পুরুষের আলোতেই সব কিছু আলোকিত। তখন সে বুঝতে পারে – ওরে বাবা! আমি এতক্ষণ যেটাকে আমি মনে করছিলাম, সেটা আসল আমি নয়, সেই আমার পেছনে একটা আলাদা শক্তি আছে। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – উনুনের উপর হাড়িতে জল ফুটছে, তাতে আলু, পটল লাফাচ্ছে, আলু-পটল মনে করছে আমি লাফাচ্ছি। আলু-পটলের বুদ্ধি যদি কোন রকমে জাগ্রত হয়ে যায় তখন মনে করবে জল গরম হয়েছে বলে আমরা লাফাচ্ছি। এবার আলু-পটলকে যদি হাড়ির বাইরে নিয়ে আসা হয় তখন দেখছে – আরে! আরে! নীচে তো আগুন রয়েছে, আগুনের জন্যই এতক্ষণ লাফালাফি হচ্ছিল। হাড়িটা হল মন (cosmic mind), সেখানে ইন্দ্রিয়, বস্তু সব টগবগ করে লাফাচ্ছে। এই লাফালাফিটা মন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এবার কোন রকমে যদি মনের বাইরে চলে আসতে পারে তখন দেখবে নীচের আগুনই মনকে শক্তি দিয়ে যাচ্ছে।

এখন সব কিছু জেনে নিলে কি আর হবে! তাতে কিছুই হবে না। আমরা সবাই এই জগতে যা কিছু করে বেড়াচ্ছি, আমরা ভাবছি আমি করছি। আমরা কিছুই করছি না, আমাদের বুদ্ধি আমাদের দিয়ে সব করাচ্ছে। আর যদি কেউ নিজেকে বুদ্ধির পারে নিয়ে যেতে পারেন, তখন তিনি বলবেন চৈতন্য সত্তাই আমাকে দিয়ে সব করাচ্ছে। চৈতন্য সত্তা মানেই ভগবান, তাই যা কিছু করার ভগবানই করাচ্ছেন, ভগবান ছাড়া কিছু হয় না। যতক্ষণ চৈতন্য সত্তার সঙ্গে এক না হচ্ছে ততক্ষণ মনে করবে সব বুদ্ধি করছে। আমার সব সময় আত্মভাব রয়েছে, বুদ্ধিকেই আমার ‘আমি’ বলে মনে করছি, সেইজন্য বলি ‘আমি করছি’। কিন্তু যারা বিশেষদর্শি তাঁরা সব কিছু বুঝতে পারেন বলে বুদ্ধির মধ্যে যে

আত্মভাব আছে, এই আত্মভাব থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। সন্ন্যাসীরা বলছেন ‘আমিই সে পূর্ণব্রহ্ম’। আমি সেই আত্মা, আমি পূর্ণব্রহ্ম এটাই সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে সাধনা। সন্ন্যাসীদের মস্তেই এই ভাবে সাধনার কথা বলা আছে। গৃহস্থদের সাধনা আলাদা। সন্ন্যাসীদের একটাই মৌলিক সাধনা ‘আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম’। সন্ন্যাসী যদি মনে করেন ‘আমি পূর্ণব্রহ্ম’, তাহলে এটাও তাঁকে মেনে চলতে হবে যে পুরো সৃষ্টি তাঁর থেকেই বেরিয়েছে – মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। তাহলে জগতে যা কিছু গোলমাল হচ্ছে তার জন্য সন্ন্যাসীও দায়ী। আফ্রিকাতে দুজন লোক মারামারি করে একজন আরেকজনকে খুন করেছে। এরাও তো সন্ন্যাসীর থেকেই জন্ম নিয়েছে। একজন আরেকজনকে খুন করছে এর জন্য কে দায়ী? সন্ন্যাসীই দায়ী। সন্ন্যাসীর জীবনের উদ্দেশ্য এটাই, সব কিছুর দায় সে নিজের কাঁধে নিয়ে নেবে, কারণ তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেন এটা তত্ত্বের দিক থেকে মেনে চলতে হয়, আচরণের সময় সব সময় পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীজীতো নিজের জীবনে এটাই বাস্তবে করে দেখালেন। গান্ধীজী বলে দিলেন অস্পৃশ্যতার জন্য আমিই দায়ী, এরজন্য আমি তপস্যা করব। যার জন্য তিনি আমার অনশনে বসে গেলেন। অহং ব্রহ্মাস্মি এই ভাব আমাদের সব সময় থাকে না, কারুরই থাকে না, ঠাকুরেরও থাকতো না। কিন্তু এটাই বর্ডার লাইন, একটু এদিক ওদিক হয় গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থায় চলে যেতেন। যে এই ভাব ধরে রাখতে পারছে না, সে বলুক ‘আমি পারছি না, এই জায়গাতে আমি আপোশ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি’, কিন্তু তাই বলে আদর্শকে কখনই নীচে করা যাবে না। সাধনার জগতে সবাই এগোতে পারে না, তার প্রধান কারণ এটাই। আমরা এখন এক রকম বলছি অন্য সময় অন্য রকম বলছি, ভাবছে এক রকম, কাজে করছে অন্য রকম। এভাবে কখন আধ্যাত্মিক জীবন চলে না। এগুলো কোন পুঁথিগত তত্ত্বকথা নয়, এটাই বাস্তব। সেই চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই সব কিছু চলছে, তিনি না থাকলে কিছুই কিছু নয়। বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের আত্মভাব হয়ে আছে, সেইজন্য আমরা যা করছি মনে করছি আমি করছি, বুদ্ধিতে আমাদের আত্মভাব থাকার জন্যই আমরা একে শত্রু, একে মিত্র বলে মনে করছি। বুদ্ধি থেকে সরে গিয়ে এই আত্মভাবই যখন আত্মার সঙ্গে হয়ে যাবে তখন পুরোটাই আবার পাল্টে যাবে। আত্মার সাথে আত্মভাব এমনি এমনি হয়ে যাবে না, এর জন্য প্রচণ্ড সাধনা করতে হবে, দিনরাত মনন, চিন্তন করে যেতে হবে।

আধ্যাত্মিক জীবন বোকা মুর্খদের জন্য নয়। যাঁরা খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন পুরুষ, তাঁদের বুদ্ধি খুব প্রখর হয়, কোন জিনিষ একবার দেখেই বা শুনেই চট করে ধারণা করে নেন। কথামতে, ঠাকুরের কথাবার্তা গুলিতে কি প্রখর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ, অথচ এই মানুষটির পৃথিবীর কোন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই। স্বামীজীরও আহামরি কিছু ডিগ্রী ছিল না, কিন্তু সারা জগৎ তাঁর মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের সামনে স্তম্ভিত। লাটু মহারাজকে ঠাকুর ‘ক’ শেখাতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, কিন্তু মূল জিনিষ হল সাধনা, সাধনা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে লাটু মহারাজের সাধনার ইতিহাস না জানলে বোঝা যাবে না। তিনি সেই সাধনাটা দেখিয়ে দিলেন আর ওই সাধনা করে করে লাটু মহারাজের বুদ্ধি কী তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছিল! আধ্যাত্মিক জীবনের এটাই অন্যতম একটি মৌলিক শর্ত, সাধকের মন ও বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হতে হবে। এই কথাগুলো এই জন্যই বলা হল যে এখন যে তত্ত্বগুলিকে নিয়ে আসা হচ্ছে এগুলো বোঝার জন্য চাই তীক্ষ্ণ ও প্রখর বুদ্ধি আর তীব্র সাধনা।

মন হল জড়, আর এর সাথে পুরুষ মিশে এক হয়ে আছে, তাই এখন একেও কাঁটা ছেড়া করতে হবে। মনকে কাঁটা ছেড়া করতে গেলে মনের সাহায্য নিয়েই করতে হবে। মন দিয়েই মনকে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ করতে হবে, মানে বিবেক বিচারশীল মন দিয়ে। বিবেক বিচারশীল মন দিয়েই মন আর পুরুষকে আলাদা করতে সক্ষম হবে। এই সূত্রটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মন ও পুরুষকে আলাদা না করতে পারছে ততক্ষণ তার জন্য আধ্যাত্মিকতার কোন কথাই নেই। আমাদের সমস্যা হল, আমরা যতই জ্ঞান লাভ, বিদ্যা লাভ করি না কেন, বুদ্ধির এলাকা থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারি না। বুদ্ধির এলাকা থেকে বেরিয়ে আসা মানে প্রকৃতির এলাকাকে পার করে যাওয়া। যোগী ঠিক বুঝে যান – ওরে বাপু! এসবই তো মনের সাম্রাজ্য, এই সাম্রাজ্য ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, মনের রাজ্যের বাইরে পুরুষ। যোগী প্রকৃতির এলাকার সব কিছুকে

পরীক্ষার ধরে ফেলেন, আর এটাকে ধরার জন্য চাই তীক্ষ্ণ বিচারশীল মন ও প্রচণ্ড ক্ষুরধার বুদ্ধি। একটা সময় আসবে যখন জগতের সব কিছুকে কেটে বেরিয়ে আসতে হবে, তা নাহলে ওর ভেতরে যে আরও সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিষ আছে ওটাকে ধরা যাবে না।

এই যে আমাদের বলা হয় ধর্ম-অধর্মের পার, পাপ-পুণ্যের পার, পার মানে কোথায়? এটাই ঠিক ঠিক আত্মার ধর্ম। আর যখন মনের ধর্মে আসে, তখন পাপ-পুণ্য আছে, ধর্ম-অধর্ম আছে। তাই আমাদের আত্মাকে মন থেকে আলাদা করে মনের এবং ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্যের পারে যেতে হবে। অথচ মনে যে এত বিচিত্র বিচিত্র খেলা চলছে পুরুষ আছেন বলেই মনের এত খেলা, পুরুষ যদি না থাকেন তখন মনের কিছু করার ক্ষমতাই থাকে না।

তখনই যোগী কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে

এরপর যখন তাঁর বোধ হয়ে গেল যে, আমি বুদ্ধির সঙ্গে আত্মভাব করে রেখেছি, এই আমিটা আমি নই। এটাকেই পরের এই সূত্রে টেনে নিয়ে বলছেন – **তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাপ্তাবং চিত্তম্।।২৫।।** চিত্ত বা মন যখন বিবেকপ্রবণ হয়ে যায় তখনই কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ হয়। সাধক যখন তাত্ত্বিক ভাবে বুঝে গেল যে আমার মন আর পুরুষ আলাদা, এবার সে যখন অদম্য ভাবে একমাত্র এটার উপরে জোর দিয়ে সব শক্তি, একাগ্রতাকে সংহত করে এতে লাগিয়ে দিল তখন মন আর পুরুষের মধ্যে যে এতদিনের কংক্রিটের বন্ধন হয়ে আছে সেই বন্ধনে চিড় ধরে দুটো ভাগে আলাদা হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার দুটোকে আলাদা দেখতে পারবে লেজ যেটা জুড়ে ছিল সেটা কেটে গেল।

ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি মন আছে, মনের পেছনে আছে চৈতন্য সত্তা আর মনের সামনে আছে জগৎ। চৈতন্যের সত্তার আলো মনের উপর পড়ছে বলে মন আলোকিত হচ্ছে, সেই আলোর সাহায্যে মন জগৎকে দেখছে। আমরা মনে করছি মন সব কিছু দেখছে, জানছে, কিন্তু চৈতন্য ছাড়া কারুর ক্ষমতাই নেই কিছু দেখার বা বোঝার। এতক্ষণ মনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল জগতের উপর। সাধনা করে করে এবার মনের আলো জগতের দিকে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে। এবার তিনি নিজের মনকে সেই চৈতন্য সত্তার আলোতেই দেখছেন। আসলে মন তো নিজেকে দেখে না, দেখছেন সেই চৈতন্য সত্তাই। তখন তিনি দেখেন এই মনও আমি নই। এতক্ষণ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর, জগতকে মনে করছিল আমি। একটা একটা করে ছেড়ে বেরিয়ে এসে শেষে দেখছেন এই মনটাও আমি নই। শেষে দেখেন এই চৈতন্য সত্তাই আমি। এই জায়গাতে এসে এই সূত্রে বলছেন **তদা বিবেকনিম্নং**, যাঁরা বিবেকী পুরুষ তাঁরা বলছেন, আমাকে জানতে হবে আমার আসল সত্তা কোনটা। তখন জগতের দিকে চৈতন্য সত্তার আলো যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে গেল। যোগী এখন দেখছেন একমাত্র আমিই আছি। আত্মজ্ঞানকে মনের বাইরে কেন বলা হয়, এর উত্তর এখানে এসেই পাওয়া যায়। এটাই মনের নাশ। শুধু মন দিয়ে যখন চৈতন্য সত্তাকে দেখছেন তখনই তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়। মন দিয়ে যখন আত্মাকে দেখছেন তিনি তখন ঈশ্বর রূপে দেখান। তখন দেখছেন শ্রীকৃষ্ণই সত্য, শ্রীরামচন্দ্রই সত্য। শেষে যখন এই দেখাটাকেও কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন কিন্তু চৈতন্য সত্তার আলো মনের মাধ্যমে ঘুরে আসছে না, চৈতন্য সত্তার আলো যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে গেল। আলো যাওয়া বন্ধ হওয়া মানে আর কিছুই নেই, যা আছে তাই আছে। চৈতন্য সত্তার বা আত্মা বা পুরুষকে কে বোধ করছে? মন তো কখনই বোধ করতে পারবে না, বোধ একমাত্র চৈতন্যই করবেন। চৈতন্যের যদি মনের সাথে আর কোন সংযোগ না হয় তাহলে কী হবে? কিছুই আর থাকলো না। ঠাকুর এখানে বলছেন – কারুর কারুর ক্ষেত্রে ঈশ্বর আবার তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পাঠিয়ে দিলেও তাঁর এই বোধটা থাকবে – আমি আলাদা, তাই জগতের কোন কিছুর সঙ্গে তিনি নিজেকে আর জড়াবেন না।

এখন এই জায়গাতে এসেও সে কিন্তু বিবেককে ছাড়তে পারছে না, বিবেক মানে এই বিচার, কোনটা সত্য আর কোনটা অসত্য। শেষ অবস্থায় মন আর পুরুষ একেবারে এক হয়ে রয়েছে, যদিও এই মন একেবারে enlightened mind। যেমন আইনস্টাইনের মত বড় বড় বিজ্ঞানী বা কবিরা

হলেন পুরোপুরি enlightened mind, তবে এনাদের আধ্যাত্মিক পুরুষ বলা যাবে না, উন্নত মনের অধিকারী। আধ্যাত্মিকতা পুরো আলাদা। এই সূত্রে বুদ্ধিজীবী আর আধ্যাত্মিক পুরুষদের আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা কৈবল্য চাইছেন, কৈবল্য মানে একমাত্র শুদ্ধ আত্মার অবস্থা, তাঁরাই একমাত্র মন বুদ্ধির এলাকার পারে চলে যান। প্রকৃতির পারে না গেলে কি হয়? মনের এলাকাতেই পড়ে থাকবেন, কিন্তু এই মন একেবারে একাগ্র মন, enlightened mind, এই মনকে যেখানেই লাগাবেন সেখানেই তিনি কৃতকৃত্য হয়ে যাবেন, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর চক্রে প্রকৃতির মধ্যে ঘুরতে থাকবেন।

আমি কে? এই বিচার অনেক দিন ধরে করে যাচ্ছেন, সমাধি-পাদে একটা সূত্র ছিল – স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ – অনেক দিন ধরে যখন খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বিচার করে যাচ্ছেন, তখন এই বিভাজনটা স্থায়ী হয়ে যায়। এই পৃথকীকরণটা সত্যিকারের শুরু হয় যখন বুঝে নেয় যে এটা মনের এলাকা আর এটা হল পুরুষের এলাকা এবং আমি কি চাইছি। যদি আমি পুরুষকেই চাই, আত্মাকেই চাই, তখনই আমি প্রকৃতির হাত থেকে বেরিয়ে আসতে কৃতকার্য হব। এর প্রথম লক্ষণ হল, যে কোন ধরণের ভয় চলে যাবে, আর নানান ধরণের যে বস্তু আছে সেগুলি থেকে নিজেকে আলাদা করে নেবে আর আত্মার সঙ্গে, পুরুষের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করতে থাকবে। জগতের সব কিছু থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, সে জেনে গেছে যে মন আর আত্মা আলাদা। আমাদের জীবনে যত রকমের দুঃখ, যত রকমের ভয় লেগে আছে, এখানে এসে সব কিছুর নাশ হয়ে যায়।

এখন আমাদের যতই দুঃখ-কষ্ট হোক তবুও আমরা বলব, আমার একটা স্ত্রীর দরকার আছে, সন্তানের পিতা হওয়ার ইচ্ছে আছে, স্ত্রী-সন্তানের ইচ্ছে থাকলে স্বাভাবিক ভাবে টাকা-পয়সারও প্রয়োজন হবে, তার জন্য আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ রোজগার করতে হবে। এখন ভগবান এসে যদি আমাকে বলেন ‘এসো! আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি’, তখনও আমরা স্ত্রী-পুত্রের জন্য চোখের জল ফেলতে থাকব। মুক্তি দিলেও মুক্তি নিতে পারবো না। ঠাকুর যখন নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, তখন নরেনও ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল ‘একি করছেন! আমার বাবা, মা, ভাই বোন আছে’। একবার প্রকৃতির এলাকায় ঢুকে পড়লে প্রকৃতির নিয়মেই সবাইকে চলতে হবে, এই নিয়মের ছাড় কেউ পাবে না। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। ভয় দিয়ে, মোহ দিয়ে, সুখ দিয়ে প্রকৃতি সবাইকে বেঁধে রাখে। কিন্তু ওই অবস্থায় এসে সুখ, দুঃখ, ভয়, মোহ সব খসে পড়ে যাবে। একবার এগুলো সব চলে যাওয়ার পর এবার কৈবল্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এখনও কৈবল্য হয়নি, এখনও প্রস্তুতি চলছে। কারণ এই অবস্থাতে পৌঁছে যাওয়ার পর তার আবার অন্য ধরণের সমস্যা বা বিঘ্নের আবির্ভাব হয়। এখানে কিন্তু খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, এই ধরণের সমস্যা বা বিঘ্ন শুধু উচ্চ অবস্থাতেই আসে।

কৈবল্যাভের পূর্বাভাসে যে বিঘ্ন সমূহ উৎপন্ন হয়

কি সেই সমস্যা – *তচ্ছিন্দ্রেষু প্রত্যায়ান্তরাপি সংস্কারেভ্যঃ।।২৬।।* এখন আপনি সব কিছুকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন পুরুষের আলো আমার মনকে আলোকিত করছে আর সেই আলোতে মনে পুরো পুরুষ প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন, জগতের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। এরপরেও কিন্তু মন থেকে গেছে, আর মনের মধ্যে আগের আগের যে সূক্ষ্ম ও স্থূল সংস্কারগুলি এতদিন চাপা পরে জমা ছিল সেগুলো এবার ঠেলে উপরের দিকে এসে বিঘ্ন রূপে দাঁড়িয়ে যায়। এখন অন্য কোন ধরণের বিষয় বা বস্তু তার সামনে নেই, কারণ সব কিছু তাঁর থেকে আলাদা হয়ে গেছে, কিন্তু নিজের মন থেকেই এই সংস্কারগুলি এখন তার বিষয় রূপে সামনে আসতে শুরু করে। ভগবান বুদ্ধের জীবনেও এসেছিল, শেষ রাত্রে তাঁর কাছে মাড় এসে দাঁড়িয়েছে বা যিশুর আছে – Last Temptation, ঠাকুরও বলছেন গোরা এলো, কত রকমের প্রলোভন দেখাল। কোথা থেকে এলো? সংস্কার থেকে উঠে আসছে। সংস্কারগুলি যে শুধু মনের মধ্যে চিন্তা রূপেই আসবে তা নয়, এরা শরীর রূপ ধারণ করেও আসে। আসলে বাইরে কিছুই নেই, যা কিছু আসছে সবই মন থেকে বেরোচ্ছে। পুরুষ, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁকেও এই সংস্কারগুলো ঘিরে রেখেছে। মন তো থেকে গেছে, আর মনের মধ্যে সেই কবেকার পুরনো সংস্কার গুলো পড়ে আছে।

আর বলছেন – **হানমেঘাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥২৭॥** আগের অধ্যায়ে সমস্ত রকমের ক্লেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রতিপ্রসবের কথা বলা হয়েছিল, অর্থাৎ এই ক্লেশগুলো যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ঢুকিয়ে দাও। প্রতিপ্রসব মানে যেখান থেকে এর জন্ম হয়েছিল সেখানেই তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া। সুতরাং এই যে ক্লেশগুলো, কি কি ক্লেশ ছিল? অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এগুলো আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশ নম্বর সূত্রে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। সেখানেও প্রতিপ্রসবের কথা বলা হয়েছিল, যেখান থেকে এসেছিল সেখানে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দিতে হয়। আবার বিপরীত ভাব দিয়েও নাশ করতে বলা হয়েছিল, যেমন বলছেন *হিংসাদয়ঃ* – কারু মনে যদি খুব হিংসা ভাব থাকে তখন সে যদি অহিংসা ভাবের উপর মনকে সব সময় লাগিয়ে রাখে তখন তার ভেতর থেকে হিংসা ভাব আস্তে আস্তে চলে যাবে। স্থূল যে জিনিষগুলি আছে সেগুলি তন্মাত্রা থেকে এসেছে, তন্মাত্রা যেগুলো আছে সেগুলো আবার অহঙ্কার থেকে এসেছে, অহঙ্কার আবার মহৎ থেকে এসেছে, যে জিনিষ যেটা থেকে এসেছে সেই জিনিষটাকে সেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়, এইভাবে প্রতিপ্রসব চলতে থাকবে। এগুলোকে কীভাবে নাশ করতে হয়, নাশ করলে কি হয় সেটাই পরের সূত্রে গিয়ে বলছেন।

ধর্মমেঘ সমাধি

এই অবস্থাতে পৌঁছানোর পর যা কিছু এখন সৃষ্টি হয় সবটাই মনের তৈরী, এখানে শরীর থেকে কিছু আর সৃষ্টি হয় না। আগে ক্লেশের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছিল এখানেও ঠিক সেইভাবেই এটাকেও ঠেলে ঠেলে যেখান থেকে এসেছে সেখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ঠেলে দিলে কি হবে বলছেন – **প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥২৮॥** এই সূত্রটি যোগের খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, সেইজন্য এই সূত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। এখানে দুটো শব্দ এসেছে ‘বিবেকখ্যাতি’ এবং ‘ধর্মমেঘ সমাধি’। যখন ওই অবস্থায় আছে, চরম উপলব্ধির ঠিক আগের মুহূর্তে, পূর্ণ উপলব্ধি তখনও হয়নি, তখন সংস্কারগুলি সামনে আসতে শুরু করে, এই সংস্কারগুলি থেকে যখন বেরিয়ে আসার জন্য যোগী কঠোর সংগ্রাম করছেন, তখন নানান ধরণের সিদ্ধাই আসতে শুরু করে দেয়। ওই সিদ্ধাইগুলিকেও যখন প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে, তখন যোগীর মধ্যে একটা বিশেষ আশ্চর্য ধরণের জ্ঞান আসে যে জ্ঞানকে যোগশাস্ত্র বলছে *ধর্মমেঘঃ*। ধর্মের যে সৎ গুণ সেই গুণের মেঘ তাকে ঢেকে দিয়েছে, মেঘ হলে যেমন বৃষ্টি পড়ে, এই অবস্থায় আসার পর সব ভালো ভালো গুণ গুলি ধর্মমেঘ থেকে বৃষ্টির মত বর্ষিত হতে থাকে, স্বামীজী এখানে বলছেন – *ইতিহাস যে-সকল ধর্মগুরুর কথা বর্ণনা করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।* ভগবান যিশু, ভগবান বুদ্ধ এঁরা সকলেই ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ করেছিলেন। যাঁদের ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ হয়, কারুর কোন দুঃখ-কষ্ট দেখলেই তাঁদের হৃদয় করুণার্দ্ৰ হয়ে ওঠে। এঁদের মন দয়া, ভালোবাসা, প্রেমে সদা পূর্ণ থাকে। সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির অভিমান ত্যাগ করে দেওয়ার ফলে শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতার গুণগুলো তাঁদের নিজস্ব স্বভাবে পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় যেটা ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল এখন সেটাই ঝমঝম করে পড়তে থাকে। মহাপুরুষরা এই জিনিষগুলি যেখানে সেখানে দেখিয়ে বেড়ান না, এগুলো তাঁদের খুব আলগা হয়ে থাকে, যেখানেই জীবের কোন কিছু কষ্ট দৃষ্টিতে আসবে তখনই এই গুণগুলি ঝরে পড়তে থাকে।

যোগশাস্ত্রের যত কিছু আলোচনা হয়েছে, সব আলোচনাকে এক সঙ্গে নিলে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যত আলোচনা করেছি সেখানে একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে বেদান্তের অবিদ্যা আর যোগের অবিদ্যা দুটো পুরোপুরি আলাদা। বেদান্ত যাকে অবিদ্যা বলছে, যোগে সেই অবিদ্যাই প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। যোগে প্রকৃতির মধ্যে অবিদ্যা হল ছোট্ট একটি অঙ্গ। কিন্তু বেদান্তে অবিদ্যাই সব। যোগ যখন বলে অবিদ্যার নাশ, তখন এই নাশ খুবই সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু বেদান্তে যখন অবিদ্যা নাশের কথা বলা হয়, তখন সেটাই বেদান্তের শেষ কথা হয়ে যায়। যোগের সাধনা যখন শুরু হয় তখন প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে অবিদ্যা সংক্রান্ত যা কিছু আছে সেটাকে নাশ করা দিয়েই শুরু হয়। অর্থাৎ, আমাদের যে একটা ছোট্ট মন আছে, যেখানে একটা মিথ্যা একাত্ম বোধ হয়ে

গেছে, দ্রষ্টা দৃশ্যের যে একটা সংযোগ হয়ে গেছে, এই সংযোগকে জড়িয়ে আরও যে আনুষঙ্গিক জিনিষগুলো তৈরী হয়েছে, এটাই অবিদ্যা, এই অবিদ্যাকে নাশ করার কথাই বলা হচ্ছে। যোগ মতে কিন্তু অবিদ্যাকে নাশ করলে জ্ঞান হবে না। যোগে অবিদ্যা একটা পরিভাষা, যোগের এই অবিদ্যাই বেদান্তে গেলে অন্য পরিভাষা হয়ে যাবে। বেদান্তে কিন্তু অবিদ্যা নাশ মানে জ্ঞান হয়ে যাওয়া।

যোগ এখন বলছে এই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে প্রতিপ্রসব করতে হবে। প্রতিপ্রসব মানে, যেখান থেকে এগুলো এসেছে সেখানে ফেরত পাঠিয়ে এগুলোকে নাশ করে দিতে হবে। এই পাঁচটিকে তাদের জায়গায় ফেরত পাঠানো হল প্রথম প্রতিপ্রসব। দ্বিতীয় প্রতিপ্রসবে এসে অন্য ধরনের সমস্যা হয়। সাধকের মনের মধ্যে যত ধরনের সংস্কারগুলো পড়েছিল এগুলো এখন সামনে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনের ভেতরে যে শেষ সংস্কারগুলো পড়ে আছে, এগুলোই যোগের শেষ বিঘ্ন, এই শেষ সংস্কারকে যে নাশ করা হবে, এটাই শেষ নাশ করা হচ্ছে, এরপরে সাধকের নাশ করার জন্য আর কিছু বাকি পড়ে থাকে না, তখনই বলা হয় বিবেকখ্যাতি। এই অবস্থাকে আমরা খুব কাছাকাছি মেলাতে পারি, ঠাকুর যখন তোতাপুরির কাছে সাধনা করে অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন তখন শেষ অবস্থায় মা কালীর মূর্তি ঠাকুরের সামনে এসে যাচ্ছিল, এটাই শেষ বিঘ্ন। এবার ঠাকুর যখন জ্ঞানখণ্ডা দিয়ে মা কালীর মূর্তিকে কেটে দিতে যাচ্ছেন, তখন ওই অবস্থাটাকে বলছেন বিবেকখ্যাতি। এই বিবেকই শেষ বিবেক, এরপর আর কোন বিবেক নেই। বিবেকখ্যাতি পেলেই জ্ঞান হয়। বিবেকখ্যাতির আগে পর্যন্ত এতদিন ধরে যোগী যত রকম সাধনা করে গেছেন এগুলো খুবই সাধারণ স্তরের। এই বিবেকখ্যাতি আসার পর যোগীর যোগ সাধনার ফল আসতে শুরু হয়। এর আগে আগে যত রকম বিভূতির কথা বলা হয়েছিল, এখানে আসার পর তাঁর কাছে সব শক্তি একত্রে এসে যাবে। নতুন একটা বিশ্বরক্ষাও সৃষ্টি করার শক্তিও তাঁর মধ্যে চলে আসবে। এই শক্তিগুলোও যোগবিঘ্ন, ঠাকুর বলছেন – তাঁকে কত রকমের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে, কত রকমের ভয় দেখানো হচ্ছে ইত্যাদি। এগুলোকেও যখন যোগী পার করে যায় তখন তাঁর নতুন এক ধরনের সমাধি হয়। এই সমাধিকেই যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হচ্ছে – ধর্মমেঘ সমাধি। সত্ত্বগুণের একেবারে শেষ অবস্থা, এখানে অধর্মের লেশ মাত্র থাকে না। ওখান থেকেই যত ধর্ম ও অধর্ম জন্ম নিচ্ছে। তার অর্থ হল, জগতের ভালো যা কিছু আছে, যা কিছু জ্ঞান আছে, যা কিছু শুভ আছে এর সবটার সমষ্টি যেটা সেটাই যোগী হয়ে গেছেন। একটু আগেই আমরা গীতার কথা বলছিলাম – মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে, আমার থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। ধর্মমেঘ সমাধিতে যোগী নিজেকে ঠিক তাই দেখেন, তখন তিনি দেখেন আমার থেকেই জগতের সব আলো বেরোচ্ছে। যোগী এবার শুভ-অশুভের পারে চলে গেছেন। যেমন সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে গেলে তাঁর কাছে দিনও নেই রাতও নেই, যোগীরও ঠিক তেমনি কোন শুভও নেই অশুভও নেই। কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে যেখানে আসছে সেখানে তিনি যদি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকেন তখন সেখানে দিন দেখবেন, অন্য দিকে থাকলে রাত দেখবেন। অধর্ম কোন বস্তু নয়, অধর্ম মানে ধর্মের অভাব। আলোর অভাব যেমন অন্ধকার, তেমনি ধর্মের অভাব মানেই অধর্ম। অন্ধকার বলে কোন বস্তু হয় না। সেইজন্য অন্ধকারকে সৃষ্টি করা যায় না। আলোকে সৃষ্টি করা হয়, সেই আলোর অভাবকেই বলা হয় অন্ধকার। ঘরের সব জানলা বন্ধ করে দিলে ঘরের স্বাভাবিক অবস্থা হবে অন্ধকার। জানলা খুলে দিলে ঘরে আলো চলে আসবে, আলোকে এখানে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সূর্যে আলোটাই তার বাস্তবিক অবস্থা। সূর্যের আলো থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে ওটাই অশুভ আর সূর্যের আলোর দিকে মুখ থাকলে ওটাই শুভ। ধর্মমেঘেরও স্বাভাবিক অবস্থা হল শুভ, ওদিকে মুখ ঘুরে থাকলে সব অশুভ, মুখ ঘুরিয়ে নিলে অশুভ। ঠাকুরের দিকে মুখ করে আছেন তখন আপনার সব কিছু শুভ, ঠাকুরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সব অশুভ। ঠাকুরের দিকে মুখ করে থাকা মানে, ঠাকুরের গুণগুলো যখন আমি নিচ্ছি তখন শুভ, ঠাকুরের গুণগুলো না নিলে ওটাই অশুভ।

ধর্মমেঘ সমাধির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে মানুষ পুরোপুরি শান্ত হয়ে যায়। কারণ তিনি এখন বিশুদ্ধ সত্ত্বে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, তাই অন্য কিছু থেকে তাঁর কোন রকমের অশান্তি বা বিরক্তি আসার সম্ভবনা থাকে না। ধর্মমেঘ সমাধির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বলে কিছু থাকে না। এই অবস্থায় তাঁর যে জ্ঞান হয় সেটা পূর্ণ জ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞান হল, যেমন

আমরা যখন কোন বই পড়ছি তখন আমরা এক একটা শব্দকে ধরে ধরে পড়তে থাকি, খুব বেশী হলে বিষয়টা জানা থাকলে অনেকে পুরো বাক্যটা ধরে পড়ে নিতে পারেন। স্বামীজীর মত মানুষ যখন পড়েন তখন একটা পাতা শুদ্ধ পড়ে বেরিয়ে যান। কিছু লোক আছে যারা শব্দ করে পড়তে থাকে, কিছু লোক একটা বাক্যকে পড়ে যাচ্ছে আবার কিছু লোক পুরো পাতা শুদ্ধ পড়ে যায়। বাচ্চারা আবার প্রতিটি শব্দকে বানান করে পড়ে। আমি আপনি যখন জগতকে দেখছি তখন অক্ষর পড়ার মত দেখি, আইনস্টাইনের মত খুব মেধাবী হলে জগতকে লাইন বাই লাইন পড়ার মত দেখেন। কিন্তু যাঁদের ধর্মমেঘ সমাধি হয়ে গেছে তাঁরা পুরো পাতা পড়ার মত করে জগতকে দেখেন। সেইজন্য বলা হয় ধর্মমেঘ সমাধি না হওয়া পর্যন্ত কেউ আচার্য হতে পারেন না।

আমরা জানি ঠাকুরের কৃপায় স্বামীজীর সমাধি অবস্থায় সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও স্বামীজীর মধ্যে একটা ছটফটানি থেকে গিয়েছিল। তাঁর এই ছটফটানিটা বন্ধ হয়েছিল কন্যাকুমারীতে গিয়ে। কন্যাকুমারীতে যাওয়ার আগে স্বামীজী যখন সিন্দু নদীর তীরে ছিলেন সেখানে তাঁর একটা দিব্য দর্শন হয়েছিল, তিনি দেখছেন এক প্রাচীন ঋষি সুর করে বেদের মন্তোচ্চারণ করছেন। সেই সুর শুনে তিনি বুঝলেন এটাই ভারতের জাতীয় সুর। এরপর তিনি যখন দ্বারকাতে গেলেন, সেখানেও তাঁর একটা দিব্য দর্শন হল, তিনি দেখছেন এক বিরাট জ্যোতির্ময় আলো, তিনি বলছেন এটাই ভারতের অন্তর্নিহিত জ্যোতি। কন্যাকুমারীতে গিয়ে বলছেন – আমার ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কন্যাকুমারীর এই দিব্যদর্শনের পর স্বামীজীর মধ্যে আমরা আর কোন দ্বন্দ্ব দেখতে পাই না। কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর যে সমাধি হয়েছিল এটাই ধর্মমেঘ সমাধি, যেখানে তাঁর কাছে পুরো জিনিষটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর ভালো উপমা হল, প্রথম বার কোন সিনেমাকে যদি খাপছাড়া মাঝখান থেকে দু মিনিট, আগের থেকে দু মিনিট, শেষের থেকে দু মিনিট করে দেখানো হয় তাহলে আপনি সিনেমার কাহিনীর কিছুই বুঝতে পারবেন না। কোনটা আগে কোনটা পরে জানার জন্য আপনার মন চঞ্চল হতে থাকবে। কিন্তু একবার যদি পুরো সিনেমাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ে যায় তারপর যদি আপনাকে সিনেমার দৃশ্যগুলো কেটে কেটে খাপছাড়া ভাবে দেখানো হয় তখন আপনি চটপট বলে দিতে পারবেন এই দৃশ্যের আগে এই রকম হয়েছিল, পরে এই রকম হবে। অবতার পুরুষ যাঁরা, যাঁরা আচার্য, তাঁরা পুরোটা দেখে রেখেছেন। আমাদের জীবনে ছোটবড় সমস্যা সব সময় লেগে আছে, ঘুম না হওয়ার সমস্যা, ঘুম বেশী হওয়ার সমস্যা, খিদে না পাওয়ার সমস্যা আবার বেশী খিদে পাওয়ার সমস্যা, কিছু জিনিষকে বুঝতে না পারার সমস্যা, এই ধরনের সমস্যা সব সময় থাকছে। অবতার পুরুষদের এই ছোট ছোট সমস্যা কখন হয় না। কারণ, ধর্মমেঘ সমাধি হওয়ার জন্য একদিকে যেমন তিনি পুরো শান্ত হয়ে গেছেন, পবিত্রতার পরাকাষ্ঠাতে চলে গেছেন, ঠিক তেমনি অন্য দিকে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবটাই এক সঙ্গে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর আর কিছু জানার বাকী থেকে যায় না, কোথাও কোন ধরনের সংশয় থাকে না।

ধর্মমেঘ সমাধি হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তাঁর কিন্তু কৈবল্য হয়নি। বেদান্তে একটা অবস্থা আছে যে অবস্থাকে বলা হয় বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা, আরেকটি অবস্থাকে বলছে ত্রিগুণাতীত। ত্রিগুণাতীত মানে যিনি সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণকে পার করে গেছেন। সত্ত্ব, শুদ্ধ সত্ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব এগুলো একই জিনিষ, শব্দ মাত্র। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত বলা যা, শুদ্ধ সত্ত্ব বলাও তাই, বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলাও তাই। ধর্মমেঘ সমাধি কিছুটা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের মত, একদিকে ত্রিগুণাতীতের মত মনে হলেও অন্য দিকে আবার ত্রিগুণাতীত বলা যাবে না। কারণ একবার যিনি ধর্মমেঘ সমাধিতে চলে গেছেন, এরপর তিনি যদি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আবার সেখান থেকে নেমেও আসতে পারেন। কারণ সত্ত্বের সঙ্গেই রজো আর তমো মিশে আছে। যোগ মতে ধর্মমেঘ সমাধি যাঁর হয়ে গেছে তিনি কিন্তু আর নামবেন না, তবুও বেদান্ত মতে এই অবস্থাকে ত্রিগুণাতীত বলা যাবে না। কারণ যতক্ষণ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ত্রিগুণাতীত হওয়া যাবে না। সেইজন্য বেদান্ত আর যোগদর্শনকে মেলানো খুব কঠিন হয়ে যায়। যোগ এখানে সত্ত্বাদি কোন গুণের কথা না বলে শুধু ধর্মমেঘ সমাধি বলে দিচ্ছে। ধর্মমেঘ সমাধিতে তিনি দেখেন যত রকমের সত্ত্বগুণ হতে পারে আমি তার মধ্যে বসে আছি।

ওখান থেকে তিনি আর নেমে যাবেন না, তাই কখন তাঁর আর কোন অশান্তি হবে না। ধর্মমেঘ সমাধির অবস্থা শুদ্ধ সত্ত্ব থেকে ওপরে। শুদ্ধ সত্ত্বের উপরে চলে গেলে তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি আবার ত্রিগুণাতীতও নন, ত্রিগুণাতীত থেকে একটু নীচে। সেইজন্য এর আলাদা পরিভাষা দেওয়া হয়েছে, যার নাম ধর্মমেঘ। যোগ পুরো আলাদা দর্শন বলে এখানে অন্য ভাবে বলে দিচ্ছে ধর্মমেঘ। যোগশাস্ত্রে জ্ঞানের জন্য ধর্মমেঘ হল শেষ ধাপ। যাঁরই আত্মজ্ঞান হতে যাচ্ছে তার আগে তাঁর বিবেকখ্যাতি আর ধর্মমেঘ সমাধি হবেই।

মধুসূদন সরস্বতী তাঁর গীতার টীকাতে আত্মজ্ঞান কিভাবে হয় তার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা অবশ্য তাঁর নিজস্ব মত, ঠিক কি ভুল আমরা বলতে পারবো না। যোগের দৃষ্টিতে দেখলে ওনার ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার হয়। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ আর আসুরিক সম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – তুমি চিন্তা করো না, তোমার মধ্যে দৈবী সম্পদ আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে গিয়ে সমস্ত গুণকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই সূত্রটি ঠিক যেন গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের কাছাকাছি। ধর্মমেঘ সমাধিতে যেন যোগী সমস্ত দৈবী সম্পদে পূর্ণ হয়ে গেছেন, সেই দৈবী সম্পদ থেকে তাঁকে আর নামানো যাবে না। পরের কয়েকটি সূত্রে গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে যিনি ত্রিগুণাতীত হতে যাচ্ছেন তাঁর কথাই যেন বলা হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে তিনি যে সত্ত্বগুণ পাচ্ছেন সেটা তাঁকে অর্জন করতে হচ্ছে আর ষোড়শ অধ্যায়ে সেটাই তাঁর সম্পদ হয়ে গেছে, তিনি এখন কিছু করতে চাইলেও অন্যথা করতে পারবেন না, কিন্তু ত্রিগুণাতীত থেকে একটু নীচে। ত্রিগুণাতীত না হলেও এবার তিনি আত্মজ্ঞান লাভের দিকে এমন গতি নিয়ে এগিয়ে যাবেন যে তাঁকে আর কোন কিছু দিয়েই থামানো যাবে না।

যখন ধর্মমেঘ-সমাধি হয়ে যায় তখন কি হয়? বলছেন **ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥২৯॥** তখন সাধকের দুটো জিনিষ হয়, প্রথম যেটা হয় তাঁর কোন ধরণের ক্লেশ বা দুঃখ হবে না, আমার এই জিনিষ নেই, আমার এই জিনিষ চাই এই ধরণের কোন দুঃখ বা অভাব বোধ তাঁর আর হবে না। এখানে ক্লেশ মানে এর আগে যে পাঁচ রকমের ক্লেশের কথা বলা হয়েছিল। আসলে ক্লেশ হল যে কোন ধরণের সংযোগ। এই সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে আর কোন ধরণের ক্লেশ হবে না। আর দ্বিতীয়তঃ সাধকের এইখানে এসে নৈশ্কর্মসিদ্ধি লাভ হয়ে যায়, মানে তখন আর সে কোন কাজ করবে না। কর্ম মানেই কর্তব্য বোধ, কিন্তু যখন দেখছে জগতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তখন আর কিসের কর্তব্য, কার প্রতি কর্তব্য থাকবে! এটাকেই ঘুরিয়ে অন্য ভাবে বলা হয়, যতক্ষণ কর্তব্য বোধ আছে ততক্ষণ সে আধ্যাত্মিক পুরুষ কখনই হতে পারবে না। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – এক সময় ভাবতুম বিয়ে করেছি, আমার পরিবার, তাকে কে দেখবে, তার কি করে খাওয়া-দাওয়া চলবে। বলেই আবার বলছেন – পরে ভাবলুম আমি যেভাবে আছি সেও এভাবেই থাকবে। আসলে ঠাকুরের কর্তব্য বোধটাই চলে গেছে। ধর্মমেঘ সমাধি মানেই এই দুটো তার মধ্যে এসে যাবে – কোন ক্লেশ থাকবে না আর কোন রকম কর্তব্য বোধ থাকবে না।

ধর্মমেঘ সমাধিতে আর কি কি হয়? **তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জৈয়মল্পম্ ॥৩০॥** তখন কি হয়, জ্ঞানের সমস্ত রকমের আবরণ আর অশুদ্ধিতা খসে পড়ে বলে সাধকের জ্ঞান অনন্ত হয়ে যায়। জ্ঞানের যত রকমের সীমাবদ্ধতা, আবরণ সরে যেতে থাকে বলে জ্ঞানের প্রকাশটা বাড়তে থাকে। যখন ক্লাশ সেভেন থেকে ক্লাশ এইটে চলে গেল তখন কি তার মাথায় অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান প্রবেশ করেছে? ক্লাশ সিক্সের যে জ্ঞান সেটাও তার ভেতরেই ছিল আবার যখন ক্লাশ টেনে যাবে তখন সেই ক্লাশ টেনের জ্ঞানও তার ভেতরে আগে থেকেই রয়েছে। পাস্চাত্য শিক্ষাবিদরা এই ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু যোগদর্শন বলছে – বাইরে থেকে তোমার ভেতরে কোন জ্ঞানই প্রবেশ করছে না, তোমার ভেতরে পূর্ব থেকেই অনন্ত জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানের ওপরে আবরণ পড়ে রয়েছে। এখন আবরণ অনেক সরে গেছে বলে জিনিষ গুলি সহজ হয়ে গেছে। যদি বাইরে থেকে আমাদের জ্ঞান লাভ হত তাহলে ক্লাশ সেভেনে সবাই প্রথম হত। ভারতীয় দর্শন কখনই এই কথা বলবে না যে তুমি সব জ্ঞান বাইরে থেকে পাচ্ছ। মাস্টার ছাত্রকে বলে – আমি তোমাকে এতো বার বোঝাচ্ছি তাও তুমি

বুঝতে পারছ না কেন? কারণ তার ভেতরে যে জ্ঞান রয়েছে সেটা ঢাকা রয়েছে বলে যতই বোঝান হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না, তাই ছাত্রের মধ্যে জ্ঞানের যে আবরণ রয়েছে আগে সেই আবরণকে সরাতে হবে। পাত্রে যখন জল ঢালা হয় তখন সব পাত্রেরই জলে ভরে যাবে। সব ছাত্রের মধ্যে যদি কোন জ্ঞান না থাকত, খালি পাত্রের মত যদি তার ভেতরটা হত, তাহলে বাইরে থেকে শিক্ষক জ্ঞান ঢাললেই সবারই জ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের আর যোগদর্শনের মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। কাউকে যখন শিক্ষা দেওয়া হয়, জ্ঞান দেওয়া হয় তখন তার ভেতরে কোন শিক্ষা বা জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে না, তার ভেতরে আগে থেকেই সব জ্ঞান আছে কিন্তু সেই জ্ঞান আবরণের দ্বারা চাপা রয়েছে, শিক্ষা মানে জ্ঞানের আবরণকে সরানোর প্রক্রিয়া। আবার অন্য ভাবেও এটাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যে ইতিহাসের ছাত্র সে ফিজিক্সের ব্যাপারে বেশী জানবে না। কিন্তু যে ফিজিক্স জানে তারও ফিজিক্সের জ্ঞান অনন্ত নয়, ফিজিক্সের জ্ঞানটাও তার সীমিত। আবার ফিজিক্সের বাইরে ইতিহাস, ব্যাকরণের ব্যাপারে যদি কিছু জিজ্ঞেস করা হয় তখন কোন উত্তর দিতে পারবে না। আর পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের তুলনাতো তার জ্ঞান খুবই সীমিত। জ্ঞান অল্প বলে আমরা ক্ষুদ্র।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, জ্ঞানই তোমাকে মুক্তি দেবে। মুক্তির বিপরীত হল বন্ধন। বন্ধন মানে অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে সীমিত জ্ঞান, অজ্ঞান বলে তো কিছু হতে পারে না। আপনি এমন অনেক কিছু জানেন, যেগুলো আবার আমি জানিনা, আমি যেগুলো জানি আপনি তার সব কিছু জানেন না। আপনি একটা সীমিত জ্ঞানের মধ্যে ঘুরছেন, আমিও আমার সীমিত জ্ঞানের মধ্যে ঘুরছি। ফলে আমি আপনি নিজেদের সীমিত মনে করি। এখন যখন ধর্মমেঘ সমাধিতে চলে গেল তখন তার একই সঙ্গে বিবেকখ্যাতিও হয়ে যাচ্ছে।

এই যে ধর্মমেঘ-সমাধির কথা বলা হচ্ছে, এই সমাধিতে ভেতরে জ্ঞানের যত আবরণ আছে সমস্ত রকমের আবরণ এখন সরে গেছে। আবরণ সরে যাওয়াতে সব জ্ঞানের দরজা খুলে গিয়ে অনন্ত জ্ঞানের রাশি এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে। যোগদর্শনের এই তত্ত্বকে যদি না মানা হয় তাহলে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতার কোন উপলব্ধিকে কখনই ব্যাখ্যা করা যাবে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান কি? আমার স্বরূপের জ্ঞান, আমি যে সেই পুরুষ এই জ্ঞানটা ধর্মমেঘ-সমাধিতে বাড়তে আরম্ভ করে, জ্ঞান যত বাড়তে থাকে সাথে সাথে প্রকৃতিও আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে। বিশালত্ব আর অনন্ত এই দুটো সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ। পুরুষের কোন আয়তন নেই, মানে অনন্ত জ্ঞান। এখানে এসে গুণগত পার্থক্যটা বোঝা যায়, পুরুষের তুলনায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে শুধু একটা বিন্দুর মত হয়ে যায় তা নয়, পুরুষের কাছে তখন এর কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই বিরাট বিশ্বে একটা পিঁপড়েকে কেউ খুঁজে পাবে না, প্রকৃতি ঠিক এই পিঁপড়ের মত গুরুত্বহীন হয়ে যায়। যিনি গণিতে গ্রাজুয়েট করে নিয়েছেন তাঁর কাছে ক্লাশ টুয়ের অঙ্কের বই কিছুই না। কিন্তু তিনি যখন ক্লাশ টুতে পড়তেন তখন এই অঙ্কের বই দেখলে তাঁর মাথা ঘুরত। বিবেকখ্যাতিও ঠিক তাই, যখন বিবেকখ্যাতিতে পৌঁছে গেল তখন তার সব অজ্ঞান চলে গেছে। জ্ঞান আর অনন্ত দুটো একই। আমাদের সীমিত জ্ঞান তাই আমরা সীমিত, যাঁর জ্ঞান অসীম সেইজন্য তিনি অসীম। সেইজন্য যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অত্যন্ত দরকার। যত স্বাধ্যায় করবে তত বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকবে। বুদ্ধির যত বিকাশ হবে তত সে অসীম হতে থাকবে। কিন্তু যারা নিজেদের বইয়ের জ্ঞানে আবদ্ধ রেখে দেয় তাদের কোন দিন অসীম জ্ঞান হবে না। অনন্ত জ্ঞান একমাত্র হয় ঈশ্বর জ্ঞানে, ঈশ্বর জ্ঞান না হলে অনন্ত জ্ঞান হবে না।

এর ভালো উপমা হল – আপনি যদি সোনা দিয়ে কত রকম ডিজাইনের গয়না হতে পারে জানতে চান তখন আপনি যত জানবেন সোনার গয়নার ডিজাইনের জ্ঞান আপনার ততই বাড়তে থাকবে। কিন্তু যিনি ওস্তাদ তিনি সোনার কত রকমের ডিজাইন হতে পারে জানার চেষ্টা না করে সোনা বস্তুটাকে আগে জানতে চাইবেন। সোনা বস্তুকেই যদি জেনে যান তখন সেই সোনা দিয়ে কত রকমের ডিজাইন হতে পারে জানার কোন আগ্রহই থাকবে না। পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যাতেও ঠিক তাই হয়,

আপনি যদি পরা বিদ্যাকে পেয়ে যান তখন চাইলে অপরা বিদ্যাকেও আপনি আয়ত্ত করে নিতে পারবেন, কারণ তখন অন্য কোন কিছু আর কোন গুরুত্বই থাকে না। কিন্তু আপনি যদি অপরা বিদ্যাতেই থেকে যান তখন আপনি যতটুকু বিদ্যা আয়ত্ত করবেন ততটুকুই আপনার জন্য ভালো। সেইজন্য প্রথম থেকে আমাদের দুটি পরম্পরা চলে আসছে – একটি সন্ন্যাসের পরম্পরা আরেকটি ব্রাহ্মণের পরম্পরা। ব্রাহ্মণ মানেই জ্ঞানরাশি আর সন্ন্যাসী মানে পরা বিদ্যার মালিক। হয় আপনাকে পরা বিদ্যার মালিক হতে হবে আর তা নাহলে অপরা বিদ্যাতে যত বেশী বিদ্যাকে আপনার অর্জন করে যেতে হবে। অনন্ত জ্ঞান হয়ে যাওয়া মানে, সে এখন পরা বিদ্যার মালিক হয়ে গেছে। পরা বিদ্যার মালিক যদি না হয়ে থাকেন তাহলে অপরা বিদ্যাতেই আপনি যতটা পারেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে থাকুন। কিন্তু আপনি বলছেন অপরা বিদ্যার কোন দাম নেই আমি পরা বিদ্যার দিকেই যাবো। অবশ্যই যাবেন, কিন্তু পরা বিদ্যা মানে হয় পুরো জ্ঞান নয়তো কিছুই না, হয় আপনার আত্মজ্ঞান আছে নয়তো আত্মজ্ঞান নেই। আত্মজ্ঞান না থাকার থেকে সেই তুলনায় অপরা বিদ্যা যে কোন সময়ই ভালো, কারণ যতটা জ্ঞান অর্জন করছেন ততটা জ্ঞান আপনার হয়ে যাচ্ছে। যতটা অর্জন করলেন ততটাই সাধারণ স্তর থেকে আপনি উপরে চলে গেলেন।

এই কথাই এই সূত্রে বলতে চাইছেন, আমাদের সীমিত জ্ঞান, যতই আমার ফিজিক্সের জ্ঞান থাকুক আমার কাছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট বলে মনে হবে। কিন্তু যিনি অনন্তকে জেনে গেছেন তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কি রকম দেখেন? এতক্ষণ সীমিত জ্ঞানের জন্য আপনি নিজেকে একটা জলের বিন্দুর মত মনে করছিলেন আর সামনের জগৎকে বিরাট দেখছিলেন। প্রতিদিন নতুন নতুন ফিজিক্সের থিয়োরি আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে, যেখানে বলছে সূর্য একটা নক্ষত্র যে কিনা সৌরমণ্ডলে অবস্থান করছে, সেই সৌরমণ্ডলকে আবার গ্যালাক্সিতে অতি সাধারণ একটা তারার মত দেখায়, এই গ্যালাক্সির মত মহাকাশে কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে। আমাদের কাছে পুরো জিনিষটাই কী বিশাল এক আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেখানে আমরা কত ক্ষুদ্র! কিন্তু যখন কারুর অনন্ত জ্ঞান হয়ে গেল, আত্মার জ্ঞান হয়ে গেল তখন এই ব্যাপারটাই পুরো উল্টে যাবে। সূত্রে বলছেন *জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জৈয়মল্পম্*, যখন অনন্ত জ্ঞান হয়ে গেল তখন এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাই একটা ক্ষুদ্র বালির কণার মত হয়ে যায় আর নিজেকে সে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মত দেখে, কারণ সে তখন অনন্ত হয়ে গেছে কিনা। তখন দেখে জৈয় বস্ত অর্থাৎ জানার বস্ত অত্যন্ত অল্প। আপনার অনন্ত জ্ঞান হওয়া মানেই আপনি অনন্ত। যিনি অনন্ত তিনিই অনন্ত জ্ঞান। সৎ-চিৎ-আনন্দ এরও এই একই অর্থ – যিনি অনন্ত তাঁর সত্তাটাও অনন্ত, চিৎ অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানও অনন্ত এবং তাঁর আনন্দটাও অনন্ত। ফলে, অনন্ত জ্ঞান হয়ে গেলে তার আনন্দও অনন্ত হয়ে যাবে।

গুণের কার্য ও পরিণাম যেখানে শেষ হয়ে যায়

এখন বলছেন – *ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩১॥* এর ফলে কি হয়? এতক্ষণ যে একটা থেকে আরেকটাতে যে ক্রম পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল, এই ক্রম পরিবর্তনটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকৃতির যে তিনটে গুণ – সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, সব সময় এদের পরিবর্তন হচ্ছিল, এই তিনটি গুণের নাশ হয়ে গেছে। এই তিন গুণের আর কোন গুরুত্বই নেই। যদি একটা পিঁপড়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে চোখটা নেড়ে বড় করে তাকায়, তাতে পৃথিবীর কিছুই যায় আসে না। প্রকৃতির মধ্যে যখন খেলা চলে, তখন প্রকৃতির এই গুণগুলিও নেচে বেড়ায় কিন্তু যোগীর কাছে এখন এগুলোর কোন মূল্যই নেই। Transformation হলে কি হয়? Modification হয়। Modification হলে কি হয়? আজকে আমাকে ভালো দেখাচ্ছে, গতকাল ভালো দেখাচ্ছিল না, এখন আমার মুড ভালো আছে, সকালে মুড ভালো ছিল না, এই ধরনের হাজারটা রূপ ও গুণের পরিবর্তন হতে থাকে। গুণের পরিবর্তন বন্ধ হয়ে গেলে কি হয়? এক যোনি থেকে আরেক যোনিতে যে আসা-যাওয়া হচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়, তার মানে আর পুনর্জন্ম হবে না। যোনি থেকে যোনিতে যাওয়া, কর্মশায় ইত্যাদি এই যে নানা ধরনের কথা আগে বলা হয়েছিল, এগুলোর সবটা থেকে সে এবার বেরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে জ্ঞানের আয়তন এত বিরাট হয়ে গেছে যে এই তিনটে গুণ তাদের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছে। তার

পরিণাম স্বরূপ রূপ ও গুণের সমস্ত ধরণের পরিবর্তন বন্ধ হয়ে গেল। সময়ও থেমে গেছে। আর কোন দিনের জন্য, কোন কালের জন্য গুণ পরিবর্তিত হবে না। তখন মন এত স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়ে যায় যে সেই মনে একমাত্র সেই পুরুষের সত্য স্বরূপের প্রকাশ হয়ে সে চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

চরম সত্যে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তখন তিনি সর্বত্র সর্বত্রবিদ্যমানতাকে (omnipresence) উপলব্ধি করেন। সর্বত্র বিদ্যমানতা হল – তখন আর কোন ক্রম থাকে না, মানে একটার পর একটা যে রূপান্তর হতে থাকে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এটাই এই সূত্রে বলা হচ্ছে – **ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।।৩২।।** একটার পর একটা পরিবর্তন কোথায় হবে? পরিবর্তন একমাত্র প্রকৃতিতেই হবে। এখন তো প্রকৃতিই নেই। পুরুষই ছিলেন সেই পুরুষই এখন আছেন। পদার্থ বিজ্ঞানেও বলা হয় যে কোন পরিবর্তনের জন্য দুটো জিনিষের দরকার – দেশ ও কাল (space and time)। যে কোন পরিবর্তনের জন্য point of reference দরকার। যেমন, আমার হাত এখন এখানে আছে, আমার হাতটা আমি এখান থেকে সরিয়ে আনলাম। কিভাবে সরান হল? এই স্পেসে যদি coordinates draw করা হয় তাহলে আমার হাত এখানে আছে। হাত যখন এখানে চলে এল তখন coordinates পাল্টে গেল। তার মানে আপনি যখন লম্বা, চওড়া, উচ্চতায় অর্থাৎ latitude, longitude, altitude এই সব কিছুতে fix করেন তখন পরিষ্কার দেখবেন হাতটা পাল্টে গেছে। যদিও latitude, longitude অন্য degreeতে হয় বলে ধরা যাবে না, কিন্তু এই ঘরের মাপে নিলে ধরা পড়ে যাবে। তার মানে তার point of reference পাল্টে গেছে। ঠিক তেমনি কালেও পরিবর্তন হচ্ছে, সকালে আমি এক জায়গায় ছিলাম এখন অন্য জায়গায় আছি। যে কোন পরিবর্তন স্থান আর কালেই পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন সব সময় একটা জিনিষ থেকে আরেকটা জিনিষে রূপান্তর হয়ে যায়। এই যে পর পর পরিবর্তন হয়ে চলেছে এটাই ক্রম। কিন্তু যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছেন তাঁদের জন্য আর কোন পরিবর্তন হয় না। জন্ম কেন হয় না? আমরা দেখলাম যে কোন পরিবর্তনের জন্য দেশ ও কাল দরকার। দেশ ও কাল যদি coordinates না থাকে, তার মানে latitude, longitude and altitude এই তিনটে জিনিষ না থাকে তাহলে কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু যিনি অনন্ত হয়ে গেছেন, তিনি যে দিকেই যাবেন সেদিকেই অনন্ত, তাহলে তাঁর coordinates বলে আর কিছু থাকছে না, সেখানে পরিবর্তনের কোন অর্থই আর থাকে না। পরিবর্তনের কোন অর্থ যদি না হয় তাহলে তাঁর কোন ক্রমও হবে না। আর ক্রম যদি না হয় তাহলে পুনর্জন্মের কোন প্রশ্নই উঠবে না। Coordinates না থাকার জন্য তাঁর কোন জাতির পরিবর্তন হবে না, কোন যোনি পরিবর্তন হবে না। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে ‘ক্রম’ শব্দটি খুব গভীর অর্থবোধক শব্দ। ক্রম মানে যেখানে স্থান ও কালে পরিবর্তন হচ্ছে। এই ডাস্টারকে যদি সব সময় এই টেবিলেই রেখে দেওয়া হয়, তখন এর স্থানে পরিবর্তন না হলেও কালে পরিবর্তন হচ্ছে। এটাকেই আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটিতে fourth dimension বলছেন, বাকি তিনটে dimension হল লম্বা, চওড়া আর উচ্চতা, চতুর্থ dimension হল কাল। সেইজন্য যদিও একটা জিনিষ স্থানে স্থির হয়ে অনেক দিন থাকতে পারে কিন্তু সময়ের মাপে সে প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে।

পদার্থ বিজ্ঞানে আগে তিনটে জিনিষকে define করা হত – জিনিষটা এতটা লম্বা, এতটা চওড়া আর এতটা উঁচু। কিন্তু এখন এই তিনটির সাথে timeকেও উল্লেখ করতে হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মে এখন আমাকে যদি বর্ণনা করতে হয় তখন বলা হবে – বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেল পাঁচটা পচিশ মিনিটে উনি আছেন। এর কিছু পরে যখন বলবে তখন বলা হবে – বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেল পাঁচটা সাতাশ মিনিটে। তার মানে কালে আমার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এরপর আমি বেলুড় মঠের গেটের সামনে চলে গেছি। তখন বলবে – বেলুড় মঠের গেটের সামনে পাঁচটা তিরিশ মিনিটে। এবার স্থানেও পরিবর্তন হয়েছে আর টাইমেও পরিবর্তন হয়ে গেছে। একটার পর একটা যে পরিবর্তন হয় এটাকেই বলছেন ক্রম। কিন্তু যোগী এখন অনন্ত হয়ে গেছেন তাই তাঁর ক্রমটাই নাশ হয়ে গেছে।

আমাদের শরীরে এমন কোন অঙ্গ নেই যেখানে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাস করছে না। যেখানে যত বেশী ঘাম উৎপন্ন হবে সেই জায়গাতে তত বেশী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেবে। আমাদের শরীরের ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বের কোন খবরই আমরা জানি না। আমাদের শরীরের একটা ছোট্ট অঙ্গেই ব্যাকটেরিয়া গুলোর খাবার-দাবার চলতে থাকে, তাদের সন্তান উৎপত্তি চলছে, তাদের বৃদ্ধি চলছে, জন্ম-মৃত্যু চলছে। যখন আমরা স্নান করছি, সাবান মাখছি, গামছা দিয়ে শরীরের ত্বক ঘষছি তখন তাদের স্বাভাবিক সংহারও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের কোন খবরই আমাদের জানা নেই। যখন কৈবল্য হয়ে গেল তখন তিনি এত বৃহৎ হয়ে গেলেন যে, পুরো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দেশ, কাল এগুলো একটা ছোট্ট কণার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে তাঁরও দেশ, কাল, ক্রম সবই হচ্ছে কিন্তু তিনি এগুলোর কোন কিছুই জানতে পারেন না, জানতে না পারা মানে এগুলোর কোন প্রভাব তাঁর মধ্যে এসে পড়ে না। যেমন আমাদের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার জীবনযাত্রা জানতে পারি না, তিনিও এত বৃহৎ হয়ে গেছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেশ, কাল ও ক্রম কিছুই জানতে পারেন না।

যেহেতু পুরুষে কোন ধরণের আর ক্রমানুসারে পরিবর্তন হচ্ছে না, তাই অতীত ও ভবিষ্যত বলেও কিছু থাকছে না, সময় বর্তমানে হারিয়ে গেছে। যোগী এখন সময়ের মধ্যে নেই, সময় এখন তার মধ্যে। একটি নৌকা এখন এই ঘাটে বাঁধা আছে, কিছুক্ষণ আগে নদীর ওপারে ছিল, আবার একটু পরে নদীর মাঝখানে থাকবে। এইভাবে আমরা অতীত, বর্তমানকে বুঝি আর ভবিষ্যতের ধারণা করি। কিন্তু নৌকাটি যদি এখানেই বাঁধা থাকে, গতকালও এখানে বাঁধা ছিল, এখনও আছে আর আগামীকালও বাঁধা থাকবে। তার মানে নৌকাটা স্থির হয়ে আছে। কিন্তু স্থির হয়ে থাকলেও নৌকার নিজস্ব অনেক কিছুই পরিবর্তন হতেই থাকবে। কিন্তু পুরুষের কোন পরিবর্তন নেই। গুণেরই সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে। তাই প্রতিটি মুহূর্তই পুরুষের কাছে বর্তমান। পুরুষের কোন অতীতও নেই ভবিষ্যতও নেই। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন – *তাহার পক্ষে সবই বর্তমান হইয়া গিয়াছে। কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যত তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তখন সেই মন কালকে জয় করে, আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়।* তখন জ্ঞান আর একটু একটু করে হয় না, পুরো জ্ঞানটাই দপ করে জেগে ওঠে।

গুণসকলের প্রতিলোমক্রমে লয়কে কৈবল্য বলে

রাজযোগের শেষ সূত্রে পতঞ্জলি বলছেন – *পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।।৩৩।।* জ্ঞান এতক্ষণ কি করছিল? প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এখন প্রকৃতির কাজ শেষ, তার আর কোন গুরুত্ব নেই, কোন কাজ নেই – এটাই কৈবল্য, মানে কেবল পুরুষই আছেন, পুরুষ এখন নিরুদ্বেগ। প্রকৃতিতে যা কিছু ছিল, তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা সব কিছুকে প্রতিপ্রসব করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি তুমি যতই নাচ, যতই তোমার খেলা দেখাও আমার আর তোমার কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই – কেন? এই যে প্রতিপ্রসব করে দেওয়া হল, এগুলো পুরুষের কোন কাজে লাগে না। *পুরুষার্থশূন্যানাং*, পুরুষের যে কোন motive আছে তাও নয়, কোন ফলও পাবে না। কিন্তু ওরা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই কৈবল্য।

যখনই আমরা কোন কাজ করি তখন সেই কাজের একটা ফল হয়। অনেক সময় আমরা ফল চাই, অনেক সময় ফল চাই না। কিন্তু ফল হবেই। তবে এই যে শেষ প্রতিপ্রসবের কথা বলা হচ্ছে, এই প্রতিপ্রসবের কোন ফল হয় না। তাহলে কি হয়? কৈবল্য, কৈবল্য মানে কেবলম্। যা ছিল তাই আছে। এটাকে এভাবে কল্পনা করা যেতে পারে। একটা পুরনো কেলা আছে, আপনি সেই কেলাতে ঢুকে পড়ার পর পথ হারিয়ে ফেলেছেন। এরপর অনেক ঘুরপাক করতে করতে একটা সময় আপনি পথ খুঁজে পেয়ে কেলা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। বেরিয়ে আসতে আপনার খুব আনন্দ। এই যে বেরিয়ে এলেন, এটা আপনার কোন প্রাপ্তি নয়। এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল সব প্রাপ্তি হচ্ছিল। কেলায় ভেতরে ঢুকে আপনার স্বাভাবিক স্বাধীন ভাবে হারিয়ে ফেলেছিলেন। আপনি বেরিয়ে এসে আবার স্বাধীন ভাবে

ফিরে পেলেন। এতে তো কোন পুরুষার্থ সিদ্ধি হল না। পুরুষার্থ সিদ্ধি তখনই হয় যখন কোন ক্রিয়া বা কর্ম হয়েছে আর সেই কর্মের একটা ফল পাওয়া গেছে। এখানে কোন ফল নেই। প্রতিপ্রসব যখন করা হচ্ছে তখনও ক্রিয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রতিপ্রসব করা মানে আসলে মুক্ত হয়ে যাওয়া। ঠাকুরও বলছেন – ঈশ্বরের ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। বেদান্ত মতে যখন ধ্যান করা হয় তখন সেই ধ্যান ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না। কারণ ধ্যানের মাধ্যমে ওখানে কিছু অর্জন করা হচ্ছে না। যাঁরা জ্ঞানের জন্য সাধনা করেন, অর্থাৎ যাঁরা বিবেক অবলম্বন করেন তাঁরা কোন লক্ষ্যের দিকে যান না। জ্ঞানের উপর যে আবর্জনা গুলো জমে আছে জ্ঞানের সাধনার মাধ্যমে সেই আবর্জনা গুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঝেড়ে ফেলাটা কখন পুরুষার্থ সাধন নয়। সেইজন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে কখন উদ্দেশ্য বলে কিছু বলা হয় না, ভক্তির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বলে দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক ঠিক ভক্তিতেও কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কারণ পরা ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তিতে কামনা বলে কিছু থাকে না। কামনা নেই মানে পুরুষার্থও নেই। পুরুষার্থ না হওয়া মানেই কৈবল্য। ঠাকুর তাই খুব সহজ ভাষায় বলছেন ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে পড়ে না।

পুরুষ হলেন সৎ চিৎ ও আনন্দ, যেটা তাঁর আসল সত্তা সেই সত্তাতে এখন তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, তাঁর আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। স্বামীজী এখানে খুব সুন্দর বলছেন, যদিও বোঝা যায় না স্বামীজী এই কথা কোথায় পেয়েছিলেন, কারণ যে ভোজবৃত্তিকে আধার করে স্বামীজী রাজযোগের ব্যাখ্যা করেছেন সেই ভোজবৃত্তিতে এই ধরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, স্বামীজীর নিজস্ব ব্যাখ্যাও হতে পারে। স্বামীজী বলছেন প্রকৃতি যেন স্নেহময়ী কল্যাণময়ী মায়ের মত, যেখানে এসে পুরুষ প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে ঢুকে গেল, ঢুকে গিয়ে পুরুষ পথ হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতির কাজ হল নিজের দৃশ্যকে পুরুষের সামনে দেখানো। পুরুষের উদ্দেশ্য হল ওই দৃশ্য থেকে বেরিয়ে আসা। এবার পুরুষ প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এল। স্বামীজী বলছেন – *প্রকৃতির কার্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন তাহা ফুরাইল।* প্রকৃতি মায়ের মত একটা দায়িত্ব নিয়েছিল। কি দায়িত্ব নিয়েছিল? ভোগ আর অপবর্গ।

প্রকৃতি এতক্ষণ পুরুষকে নিজের নাচ দেখিয়ে যাচ্ছিল – দ্যাখো খোকা! তুমি আমার রূপ দেখতে চেয়েছিলে তো এই দেখো আমার রূপ, আমার নৃত্য দেখতে চেয়েছিলে তো, এই দেখ আমার নৃত্য। দেখিয়ে দেখিয়ে প্রকৃতি বলে – আমার যত রূপ ছিল, যত রকমের নৃত্য আমার জানা ছিল সব তোমাকে দেখালাম, তোমাকে আমার আর কিছু দেখাবার নেই। তিন ঘন্টার সিনেমা শেষ, এবার তুমি তোমার বাড়ি যাও। নিজের বাড়ি মানে - *কৈবল্যম্।* সিনেমা দেখতে গিয়েছে, তিন ঘন্টা সিনেমা দেখল, সিনেমার চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে তাদের সঙ্গে হাসল, কাঁদল, সব দেখার পর সিনেমা শেষ হয়ে গেল। এবারে তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার বাড়ি মানে তোমার নিজের স্বরূপ। তোমার স্বরূপ কি? তুমি আনন্দ স্বরূপ, তোমার অনন্ত জ্ঞান আর তুমি সর্বদা চৈতন্যস্বরূপ। আমরা এখন এই জগতে আছি এখানে আমাদের সীমিত জ্ঞান, আনন্দও ক্ষণিকের। কিন্তু এখন আমার মাঝে সীমাহীন আনন্দ বিরাজ করছে আর অনন্ত জ্ঞানরাশি আমার মধ্যে বিদ্যমান। স্বামীজী বলছেন – *তিনি (প্রকৃতি) যেন আত্মবিস্মৃত জীবাাত্রার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি – বিকার আছে, সব দেখাইলেন।* আত্মা, যিনি পুরুষ, তিনি যেন নিজেকে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন নিজের স্বরূপকে তিনি ভুলে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন তখন প্রকৃতি এসে তার হাত ধরল, হাত ধরে নিজের সব খেলাটেলা দেখিয়ে, জগৎ ঘুরিয়ে, মেলা দেখিয়ে তার নিজের জায়গায় নিয়ে এসে বলছে – এই নাও তোমার আসল স্বরূপ।

এখানে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে, পুরুষের মধ্যেই যখন অনন্ত জ্ঞান রয়েছে তখন সে কি করে তার স্বরূপকে ভুলে যেতে পারে। এই নিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক চলে, আর বেদান্ত ও যোগও পুরুষের নিজের স্বরূপ ভুলে যাওয়াকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে। স্বামীজী বলছেন – *(প্রকৃতি)- ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে*

উদিত হইল। কোন এক অজানা কারণে পুরুষের মনে বাসনার উদয় হয়েছিল। বাসনার জন্ম হতেই পুরুষ যায় ফেঁসে। তখন প্রকৃতি তাঁকে বলছে – তুমি আমার রূপ দেখতে এসেছিলে তো, এই নাও আমার রূপ দ্যাখো। এরপর প্রকৃতি পুরুষকে নিম্নোনি থেকে আস্তে আস্তে উচ্চতর যোনির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে প্রকৃতি তার খেলা দেখাতে থাকে। এক সময় পুরুষের মনে পড়ে যায় – আরে আরে আমি কি বোকামই করছি। আত্মা কোন কারণে নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়, কি কারণে ভুলে যায় বলা বা ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। কিন্তু বেদান্ত এটাকেই বলছে মায়া, বেদান্ত বলে মায়ার জন্য পুরুষ নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, তখন পুরুষকে প্রকৃতি তার নাচ দেখাতে শুরু করে – এই দ্যাখো, লাগ ভেল্কি লাগ, জাদু দেখাতে থাকে পুরুষকে। জাদু দেখাতে দেখাতে নানা শরীর মনের মধ্য দিয়ে নিয়ে নিয়ে তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।

এখানে একটা মজার ব্যাপার হয়। বেদান্ত মতে আত্মা নিষ্ক্রিয় সে কিছুই করে না, কোথাও সে যায় না। প্রকৃতিতে যা কিছু হচ্ছে সিনেমার পর্দার ছবির মত পুরুষের সামনে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে। মনে করুন এই দেওয়ালের ওপরে একটা মুভি চলছে, আর মনে করা যাক দেওয়ালের চৈতন্য আছে। তাহলে এখন কি হবে? দেওয়ালের উপরে যে নানা ধরণের ছবি পড়ছে তাতে দেওয়াল কখন মনে করছে আমি এখন কাঙাল, কখন মনে করছে আমি এখন ভিখারি, আমি এখন মন্ত্রী, আমি এখন রাজা। এবার হঠাৎ ছবি ফেলা বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন দেওয়াল অবাক হয়ে দেখবে আর বলবে – আরে আমি তো এগুলো কখনই ছিলাম না, আমি শুধু নিজের মত কল্পনাই করছিলাম। বেদান্তে ঠিক এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। আত্মা শুধু বসে বসে ভেবেই চলেছে – আমি এই, আমি ক্লাশ করছি, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, আমার এত বিদ্যে, আমার এত টাকা। এগুলো আসলে কিছুই নয়, পুরুষ বসে বসে শুধু ভাবতে থাকে, আসলে সে সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মা।

কিন্তু যোগ এভাবে ব্যাখ্যা করবে না। যোগের মতে – পুরুষ যে এত কিছু ভেবে চলেছে এগুলো নিছক কল্পনা মাত্র নয়, যোগের কাছে এগুলো বাস্তব সত্য, যা কিছু পরিবর্তন রূপান্তর হচ্ছে এগুলি সত্যি সত্যিই এই রকমটিই হয়ে থাকে। এটাই বেদান্ত আর যোগের মৌলিক পার্থক্য। যেহেতু এখন যোগের কথা আলোচনা হচ্ছে তখন এই জিনিষটাকে আমরা আরো সহজ ভাবে যাতে বুঝতে পারি তারই চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরুষ নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, প্রকৃতি তাকে খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে পুরুষের ভুলটাকে ভাঙিয়ে দেয়। স্বামীজী বলছেন - *তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদচিহ্নহীন জীবনের মরণতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।* এই জগত যেন মরুভূমির মত, এখানে কোন পথ নেই, সব আত্মাগুলি এখানে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি করে কি, একজনকে যখন মুক্তির পথে তুলে দিল তারপর আরেকজনের হাত ধরে নিল। একটা বিরাট মেলাতে স্কুলের একশটা বাচ্চা মেলা দেখতে এসেছে। মেলার নানা রকম মজা দেখতে দেখতে বাচ্চাগুলো অজান্তে এখন পথ হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে মেলাতে নানা রকমের খেলা চলছে, তারা সেই খেলা দেখতে এমন ডুবে গেছে যে, তারা যে পথ হারিয়ে ফেলেছে এই কথাটাই মনে নেই। যখন তাদের খেলা দেখতে আর ভালো লাগছে না তখন তাদের হুঁশ হয় আরে আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি। তখন একজন সহৃদয় পুলিশ এসে এদের হাত ধরে বলে দেয় – ওই যে দোকানটা দেখছ, ওই দোকানের সামনে দিয়ে একটা রাস্তা গেছে, সেই রাস্তা ধরে একটু এগোলেই মেইন গেট দেখতে পাবে, আর গেটের বাইরে তোমাদের স্কুল বাস দাঁড়িয়ে আছে।

এইভাবে ঘুরে ঘুরে, মার খেয়ে, দুঃখ পেয়ে পেয়ে, যন্ত্রণা পেতে পেতে সব শেষে তার মধ্যে জ্ঞান আসতে আরম্ভ করে, তখন সে বুঝতে থাকে যে – আমি এর থেকেও অনেক শক্তিমান। স্বামীজী বলছেন - *এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।* গঙ্গা নদীর জল যেমন বয়ে যাচ্ছে সেই রকম অনন্ত আত্মা বা পুরুষ দৌড়ে যাচ্ছে – নদী যেমন আপন বেগে সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলেছে, অনন্ত

আত্মাও সেই রকম মুক্তির দিকে ছুটে চলেছে। মুক্তি পেয়ে গেল, তাই বলে কি প্রকৃতির খেলা শেষ হয়ে যাবে? কোন দিনই শেষ হবে না। প্রকৃতির এই খেলা চক্রাকারে চলতেই থাকবে।

করণাময়ী প্রকৃতি ঠিক এই কাজটাই করেন। এই জগতে যা কিছু আছে, একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ে, পাখি, মানুষ, কত রকমের পশু যা আছে সব কিছু পুরুষের এক একটি রূপ। এই জীবনের মরুভূমিতে সবাই পথ হারিয়ে বোকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি কিন্তু তার হাত সব সময় ধরে আছে, আর হাত ধরে ধরে তাকে সব খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে – এই ভালোবাসা দেখাচ্ছে, যখন এই ভালোবাসায় মন ভরছে না তখন গালে কষিয়ে এক চড় মারছে। যখন বেশি চড় খাচ্ছে তখন সে যখন বলে আমার আর কিছুর দরকার নেই, তখন আবার তাকে একটু বেশি করে ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে রাখছে। আবার যখন একটা জায়গায় ওর বেশি ভালো লাগছে তখন তাকে সেখানে বেশিক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকে। যখন বলে না না, এই জায়গাতে আমার ঠিক জমছে না, তখন ওখান থেকে তাকে তাড়াতাড়ি করে বার করে এনে আরেক জায়গা দেখাতে শুরু করে। স্বামীজী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করছেন - এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। প্রকৃতির আদিও নেই অন্তও নেই। বলা হয় পুরুষ আর প্রকৃতি যেন দুটো নিত্য প্রবাহের ধারা, এই কারণেই যোগকে দ্বৈতবাদ বলা হয়। পুরুষ যেমন নিত্য প্রকৃতিও নিত্য, বেদান্তে জ্ঞান হলে মায়া চিরদিনের মত চলে যায়, কিন্তু যোগে প্রকৃতি অনন্তকাল ধরেই স্বমহিমায় বিরাজ করবে, আপনার জ্ঞান হয়ে গেলে তাই প্রকৃতি আরেকজনকে খেলা দেখাতে থাকবে, এইভাবে প্রকৃতির খেলা চলতেই থাকবে। সবাই যদি মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে প্রকৃতির কি হবে? কিছুই হবে না। প্রকৃতির খেলা চলতেই থাকবে। প্রকৃতির নাশ হবে না, প্রকৃতিও অনন্ত পুরুষও অনন্ত। একজনের জন্য কৈবল্য হলেও অপরের জন্য প্রকৃতি থেকে যাচ্ছে।

এখানে এসে বেদান্তের সাথে যোগের বিরাট বিরোধ লেগে যায়। যোগ বলবে একজনের মুক্তি হয়ে গেলে অন্যদের জন্য প্রকৃতি থেকেই যাচ্ছে। বেদান্ত বলবে তা হয় না, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেল তিনি দেখছেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন বলির ছাগ, বলির কাঠ, বলির খড়া, যে বলি দিচ্ছে সবই দেখছি সচ্চিদানন্দ। যোগ বলবে শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্ত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাই বলে তুমি তো মুক্ত হওনি, তাই প্রকৃতির কাজ এখনও থেকে গেছে। বাকিরা প্রকৃতির মধ্যে থেকে গেছে। এটাকে বলে common sense philosophy। বেদান্ত তাই সবার জন্য নয়, কারণ বেদান্ত অত্যন্ত কঠিন। একদিকে সমাধিবান পুরুষের জ্ঞানের উপর যেমন বেদান্ত নির্ভর করে ঠিক তেমনি বেদান্ত আবার যুক্তির উপরেও দাঁড়িয়ে আছে, সেইজন্য ওই যুক্তিগুলো বোঝা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বেদান্তের যুক্তিই সত্য। কিন্তু ভক্তরা এগুলো মানবে না। যোগীরাও common sense logicএর উপর চলে। তাঁরা বলবেন, একজনের মুক্তি হয়ে গেল তাই বলে জগৎ তো থামবে না। জগৎ যদি নাই থামে, তাহলে প্রকৃতি এখন কি করবে? তাঁরা বলবেন, প্রকৃতি একজনকে ধরে সব কিছু দেখিয়ে পার করে দিল, দিয়ে আবার আরেকজনকে ধরে তাকে পার করবে, এরপর আরেকজনকে ধরবে। এটাই যখন ভক্তিশাস্ত্রে আসবে তখন বলে – কারে করো অধোগামী, কারে দাও মা ব্রহ্মপদ। প্রকৃতি যখন আপনাকে ঘোরাচ্ছে তখন আপনাকে অধোগামী করে রেখেছে, সেই প্রকৃতিই যখন আপনার হাত ধরে প্রকৃতির বাইরে নিয়ে গেল তখন ব্রহ্মপদ লাভ হয়ে গেল। প্রকৃতি এখন কাকে ব্রহ্মপদ দেবে, কাকে অধোগামী করবে এর ব্যাখ্যা কে করতে যাবে, তাই এর কোন ব্যাখ্যাও নেই। স্বামীজীও বলছেন প্রকৃতি তাকে হাত ধরে বার করে দিচ্ছে। ওর হাত কেন ধরল, আমার হাত কেন ধরল না, এগুলোর কোন ব্যাখ্যা নেই। অথচ এতক্ষণ ধরে আমরা যে যোগশাস্ত্র পড়লাম সেখানে কোথাও এগুলোকে অযৌক্তিক মনে হচ্ছিল না। কারণ আপনার মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার। সেই সংস্কারের জন্য কোথাও আপনি ঠাকুরের নাম শুনেনি। ঠাকুরের নাম শুনে বেলুড় মঠে এলেন। বেলুড় মঠ থেকে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ডিপ্লোমা কোর্সের কথা শুনলেন। শুনে আপনি সেই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হলেন। এতদিন যাবৎ আপনার মধ্যে যত রকমের সংস্কার ছিল, হাজার রকমের যত বৃত্তি ছিল সেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এবার নতুন বৃত্তি আসতে শুরু করল। এখন আপনার মধ্যে শাস্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা জন্ম নিল, একটু দেখি আমাদের

শাস্ত্রগুলো কি বলতে চাইছে! এবার আপনি বলতে পারেন মা কালী আপনার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কিংবা ঠাকুর আপনার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে আপনি এও বলতে পারেন – আমার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার আমাকে এদিকে টেনে নিয়ে এসেছে। যোগ আবার ঈশ্বরকেই মানে না, সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা কোথা থেকে আসবে! যোগ তাই বলবে – তোমার শুভ সংস্কার ছিল বলে তোমার যোগাযোগ হয়ে গেছে, সেখান থেকে এদিকে এগোতে থাকলে। কিন্তু তোমার মুক্তি হয়ে গেলেও প্রকৃতি থেকে যাবে। পুরুষের মুক্তি হলেও প্রকৃতির নাশ হবে না, এখানেই বেদান্তের সঙ্গে যোগের তফাৎ। এই তফাতের জন্য প্রকৃতি অপরের জন্য থেকে যাবে। কিসের জন্য থেকে যাবে? ভোগার্থীহপবর্গার্থীনাং, ভোগ আর অপবর্গের জন্য প্রকৃতি থেকে যাবে। স্বামীজী যে বলছেন সবার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি চাই না, স্বামীজীর এই কথা যোগে দাঁড়াবে না। কারণ যোগ বলবে মুক্তি সব সময় individual। বাকিদের জন্য প্রকৃতি থাকবে, প্রকৃতির কোন দিন নাশ হবে না। বেদান্ত মতে সবারই মুক্তি হতে পারে কিন্তু যোগ মতে সবার মুক্তি কোন দিন হবে না। কারণ পুরুষ এক অনন্ত নদী, সেই নদীর পাশ দিয়ে প্রকৃতিও অনন্ত এক নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেইজন্য সবারই মুক্তি যোগের যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। যোগের এটাই সিদ্ধান্ত, এটাই common sense logic। কিন্তু বেদান্তের দর্শন কখনই common sense logic দিয়ে চলে না, সেখানে চলে আপনি ধ্যানের গভীরে যে জ্ঞানের উপলব্ধি করেছেন সেই জ্ঞান দিয়ে আর দ্বিতীয় যুক্তিতর্ক দিয়ে। কিন্তু যোগের সমস্যা হল পুরুষকে যদি অনন্ত না মানা হয় আর প্রকৃতিকেও যদি অনন্ত না মানা হয় তাহলে যোগ স্বতন্ত্র দর্শন না হয়ে বেদান্তের সঙ্গে মিশে যাবে। তবে practical aspect of religion বলতে একমাত্র যোগকেই বোঝায়। যোগের দর্শন যদি কেউ একটুও পালন করে তাতেই তার জীবন অর্থপূর্ণ হয়ে যাবে। দর্শনের দিক থেকেও খুব consistent, জগতও সত্য তিনিও সত্য। আপনি মুক্ত হয়ে গেলেও জগৎ জগতের মত চলবে। আর আমাদের সবারই জীবনের উদ্দেশ্য হল জো সো করে প্রকৃতির এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

স্বামীজী সব শেষে প্রার্থনা করছেন – যাঁরা নিজদের স্বরূপ জেনে মুক্ত হয়ে গেছেন তাঁদের জয় হোক আর তাঁদের আশীর্বাদ যেন সর্বদা আমাদের উপরে থাকে। আমরাও এই প্রার্থনা জানিয়ে রাজযোগের আলোচনা ‘জয় গুরুমহারাজ’ বলে এখানে সমাপ্ত করছি।

॥ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

॥ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্ণমস্তু॥

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	যোগদর্শনের উৎস	১
২	হঠযোগ	৩
৩	রাজযোগে সব পথের সাধকদের পরীক্ষা হয়ে যায়	৪
৪	যোগদর্শনকে কেন রাজযোগ বলা হয়	৪
৫	যোগ ও অন্যান্য ধর্ম	৬
৬	হিন্দু ধর্মে সাংখ্য দর্শনের গুরুত্ব	৬
৭	জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া	১৮
৮	বৃত্তি কাকে বলে	২৪
৯	মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা	২৫
১০	মনের চারটি বিভাগ	২৫
১১	বেদান্ত আর যোগের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক তফাৎ	২৯
১২	মন আর ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তিকরণের গুরুত্ব	৩০
	সমাধি-পাদ	৩২-১৬৪
১৩	চিত্তবৃত্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা	৩৩
১৪	যোগের প্রথম লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া	৩৫
১৫	চিত্তাও একটি শক্তি	৩৬
১৬	মস্তিষ্কের গঠনের উপর নির্ভর করে প্রাণির আচরণ	৪১
১৭	মনের পাঁচটি অবস্থা	৪২
১৮	বৃত্তি জ্ঞান মানেই মিথ্যা জ্ঞান	৪৫
১৯	জড় ও চেতনে তফাৎ কোথায়	৪৮
২০	বৃত্তি আর ব্যক্তি এক	৫০
২১	বৃত্তি কয় প্রকার	৫৫
২২	অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলনই আধ্যাত্মিক সাধনা	৬৭
২৩	সম্প্রজ্ঞাত সমাধি	৭৯
২৪	সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি	৮০
২৫	সবিচার ও নির্বিচার সমাধি	৮১
২৬	সানন্দা সমাধি	৮১
২৭	সাস্মিতা সমাধি	৮১
২৮	অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি	৮৫
২৯	ঈশ্বর না মানার সাংখ্য দর্শনের যুক্তি	৯৪
৩০	সাংখ্য ও বেদান্তের লড়াই	৯৬
৩১	বেদান্তের ঈশ্বর আর যোগের ঈশ্বরের পার্থক্য	৯৮
৩২	যোগের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য	১০১
৩৩	‘ওঁ’এর ব্যাখ্যা	১০৪
৩৪	‘ওঁ’ জপ ও তার অর্থচিন্তনের গুরুত্ব	১১২
৩৫	যোগ সাধনার বিঘ্ন সমূহ	১১৮
৩৬	অসমাহিত চিন্তের লক্ষণ	১২০

৩৭	বৃত্তির সংখ্যা কমানো এবং মন একাগ্র করার বিভিন্ন উপায়	১২৩
৩৮	বিভিন্ন সমাধি অবস্থার বর্ণনা	১৪৫
৩৯	সমাধি-পাদ অধ্যায়ের সারাংশ	১৫৯
	সাধন-পাদ	১৬৫-২৮১
৪০	ক্রিয়াযোগ ও তার উদ্দেশ্য	১৬৫
৪১	ক্লেশজনক বিঘ্ন	১৭১
৪২	ক্লেশের চারটি অবস্থা	১৭২
৪৩	অবিদ্যার ব্যাখ্যা	১৭৩
৪৪	অস্মিতার ব্যাখ্যা	১৭৫
৪৫	রাগ ও দ্বেষের ব্যাখ্যা	১৭৬
৪৬	অভিনিবেশের ব্যাখ্যা	১৭৭
৪৭	প্রতিপ্রসব আসলে কী	১৮১
৪৮	কর্মাশয়ের ধারণা	১৮৪
৪৯	দুঃখের মূল	২০১
৫০	প্রকৃতি যে যে রূপে ও যে যে অবস্থায় থাকে	২০৩
৫১	তন্মাত্রার উপর স্বামীজীর মৌলিক ব্যাখ্যা	২১১
৫২	সৃষ্টি কি চৈতন্য থেকে হয়, নাকি জড় থেকে	২১৬
৫৩	পুরুষ দ্রষ্টামাত্র	২১৯
৫৪	পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনে দুজনেরই লাভ	২২৭
৫৫	পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের হেতু	২২৯
৫৬	পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে যা হয়	২৩১
৫৭	নৈরাশ্য ও হতাশার ভাব দূর করার উপায়	২৩৫
৫৮	উপনিষদ, যোগ ও ভাগবতে পুরুষের ধারণার তুলনামূলক আলোচনা	২৪০
৫৯	অবিদ্যার নাশ কীভাবে হবে	২৪৪
৬০	যোগের সাতটি ভূমি	২৪৪
৬১	অষ্টাঙ্গযোগ এবং যম ও নিয়মের অনুশীলন	২৫১
৬২	যম ও নিয়মের ইতিবাচক দিক	২৬২
৬৩	আসন স্থির করা	২৭২
৬৪	প্রাণশক্তিকে যোগ যেভাবে কাজে লাগায়	২৭৩
৬৫	অসংগঠিত প্রাণ ও সংগঠিত প্রাণ	২৭৪
৬৬	প্রাণায়ামের দ্বারাই অসংগঠিত প্রাণ সংগঠিত হয়	২৭৫
৬৭	প্রত্যাহার ও ধারণার প্রস্তুতি	২৭৯
	বিভূতি-পাদ	২৮২
৬৮	ধারণা, ধ্যান ও সমাধি	২৮২
৬৯	ধারণা + ধ্যান + সমাধি = সংযম	২৮৫
৭০	সংযমেই আসে প্রকৃত বস্তু জ্ঞান	২৮৬
৭১	সমাধির বিভিন্ন স্তর	২৮৯
৭২	ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা	২৯৪
৭৩	বিভিন্ন ধরনের বিভূতির বর্ণনা	২৯৯
	কৈবল্য-পাদ	৩২১-৩৮৭
৭৩	প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের অজস্র মৌলিক নিয়মের রহস্যের উদ্ঘাটন	৩২১

৭৪	জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও একাগ্রতা থেকে যে যে সিদ্ধি আসে	৩২৫
৭৫	যোগের মতে ক্রমবিবর্তন যেভাবে হয়	৩৩০
৭৬	অহংভাব থেকে নির্মাণচিত্ত ও ব্যুৎকায় সৃজন	৩৩৭
৭৭	সমাধি দ্বারা লব্ধ চিত্তই বাসনাশূন্য	৩৪০
৭৮	যোগীর কর্মের কোন রঙ হয় না	৩৪১
৭৯	ত্রিবিধ কর্ম থেকেই যোনি থেকে যোনিতে বাসনা প্রকাশিত হয়	৩৪২
৮০	সুখী হওয়ার বাসনা অনাদি, তাই বাসনাও অনাদি	৩৪৯
৮১	কামনা-বাসনার হেতু অবিদ্যা এবং আশ্রয় চারটি	৩৫০
৮২	বস্তু মাত্রই অতীত ও ভবিষ্যতে নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকে	৩৫৪
৮৩	বস্তুর গুণই বস্তুর আত্মা	৩৫৮
৮৪	পরিণাম ও পরিবর্তন সম্বন্ধযুক্ত হেতু সব বস্তুতেই একত্ব বর্তমান	৩৫৯
৮৫	মন ও বিষয় ভিন্ন স্বভাব	৩৬১
৮৬	বস্তু কখন জ্ঞাত ও কখন অজ্ঞাত, শূন্য থেকে কখনই সৃষ্ট নয়	৩৬২
৮৭	চিত্তবৃত্তিকে জানা যাওয়ার কারণ	৩৬৩
৮৮	মন দৃশ্য তাই মন স্বয়ংপ্রকাশ নয়	৩৬৮
৮৯	মন একই সাথে দুটি বস্তুকে বুঝতে পারে না	৩৬৯
৯০	দুটো মন থাকলে স্মৃতি সঙ্কট হত	৩৬৯
৯১	পুরুষই স্বয়ংজ্যোতি, প্রতিবিস্তিত জ্যোতিতেই মনকে জ্ঞানময় বোধ হয়	৩৭০
৯২	শুদ্ধ বুদ্ধি দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুটোকেই আলাদা বুঝতে পারে	৩৭০
৯৩	পুরুষের জন্যই মন কাজ করে	৩৭১
৯৪	যোগী যখন জানতে পারেন পুরুষ মন নন	৩৭৩
৯৫	তখনই যোগী কৈবল্যের পূর্ববস্থা লাভ করে	৩৭৫
৯৬	কৈবল্যলাভের পূর্ববস্থায় যে বিঘ্ন সমূহ উৎপন্ন হয়	৩৭৬
৯৭	ধর্মমেঘ সমাধি	৩৭৭
৯৮	গুণের কার্য ও পরিণাম যেখানে শেষ হয়ে যায়	৩৮২
৯৯	গুণসকলের প্রতিলোমক্রমে লয়কে কৈবল্য বলে	৩৮৪

সূত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র	
সূত্র	পৃষ্ঠা
অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্।।৪/১২	৩৫৪
অথ যোগানুশাসনম্।।১/১	৩২
অনিত্যশুচিদুঃখনাঅসু নিত্য- শুচি- সুখাত্মখাতিরবিদ্যা।।২/৫	১৭৩
অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।।১/১১	৬৩
অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।।২/৩৯	২৬৫
অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্তনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্।।২/৪	১৭২
অবিদ্যাহস্মিতারাগদেয়াভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।।২/৩	১৭১
অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।।১/১২	৬৭
অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।।১/১০	৬৩
অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্।।২/৩৭	২৬৪
অহিংসা- সত্যাস্তেয়- ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।।২/৩০	২৫২
অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসম্বন্ধৌ বৈরত্যাগঃ।।২/৩৫	২৬২
ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।।১/২৩	১০০
উদানজয়াজ্জল- পঙ্ক- কণ্টকাদিঘসঙ্গ উৎক্রান্তিচ।।৩/৪০	৩১৩
ঋতস্তুরা তত্র প্রজ্ঞা।।১/৪৮	১৫২
একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।।৪/১৯	৩৬৯
এতে জাতি- দেশ- কাল -সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্।।২/৩১	২৫৫
এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।।৩/১৩	২৯৪
এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্।।৩/২২	৩০৫
এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।।১/৪৪	১৪৯
ক্রমান্যদ্বং পরিণামান্যতে হেতুঃ।।৩/১৫	২৯৯
ক্লেশকর্মবিপাকাশয়েরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।১/২৪	১০১
ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।।২/১২	১৮৪
ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্রহীত্ব.....১/৪১	১৪৩
ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।।৩/৫৩	৩১৯
ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।।৪/৩২	৩৮৩
কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেচাকাশগমনম্।।৩/৪৩	৩১৪
কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়ান্তপসঃ।।২/৪৩	২৭১
কায়রূপসংযমানুদগ্রাহ্যশক্তি- স্তম্ভে.....৩/২১	৩০৪
কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ।।৩/৩১	৩১০
কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।।২/২২	২২৭
কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।।৪/৭	৩৪১
কূর্মনাড্যাং স্তৈর্যম্।।৩/৩২	৩১০
গ্রহণস্বরূপাস্মিতাস্বয়ার্থবত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ।।৩/৪৮	৩১৭
চিত্তান্তরদৃশ্যতে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।।৪/২০	৩৬৯
চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্।।৪/২১	৩৭০
চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্।।৩/২৮	৩০৯
জাত্যন্তর -পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।।৪/২	৩৩০
জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্ষৎ.....৪/৯	৩৪৫
জাতিলক্ষণদৈশৈরন্যতানবচ্ছেদাতুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।।৩/৫৪	৩১৯
জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।।৪/১	৩২৫
ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।।৩/৪	২৮৫

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ।।৩/৭	২৮৭
তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।।১/৪৬	১৫১
তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা....৩/৫৫	৩২০
তাসামনাদিতুধগশিশো নিত্যত্বাৎ।।৪/১০	৩৪৯
তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।।৪/২৬	৩৭৬
তীত্রসংবেগানামাসন্নঃ।।১/২১	৯৯
তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।।২/১০	১৮১
তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ।।৪/১৩	৩৫৮
তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।।৩/৩৮	৩১২
তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পূণ্যাপূণ্যহেতুত্বাৎ।।২/১৪	১৯৫
তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।।১/৫০	১৫৫
তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।।১/২৮	১১২
তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।।৩/৫	২৮৬
তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্।।৪/৬	৩৪১
তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্।।১/২৫	১০১
তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্।।৩/২	২৮৩
তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।।১/৪২	১৪৫
তত্র স্থিতৌ যতোহভ্যাসঃ।।১/১৩	৭১
ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ।।৪/২৯	৩৮০
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।।২/৫২	২৭৮
ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।।৪/৩১	৩৮২
ততঃ প্রাতিভপ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবর্তী জায়ন্তে।।৩/৩৭	৩১২
ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াতাবশ্চ।।১/২৯	১১৭
ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।।২/৫৫	২৮১
ততো দন্দানভিঘাতঃ।।২/৪৮	২৭৩
ততো মনোজবিতুং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ।।৩/৪৯	৩১৭
ততোহণিমাদি- প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎতদ্বর্ধমানভিঘাতশ্চ।।৩/৪৬	৩১৬
তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।।১/৩২	১২৩
তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃক্ষ্যম্।।১/১৬	৭৮
ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিবাসনানাম্।।৪/৮	৩৪২
তদৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।।৩/৫১	৩১৮
তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভাবং চিত্তম্।।৪/২৫	৩৭৫
তদা সর্বাধরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জৈয়মল্পম্।।৪/৩০	৩৮০
তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্।।১/৩	৫০
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।।৩/৩	২৮৪
তদপি বহিরঙ্গং নিবীজস্য।।৩/৮	২৮৭
তদুপরাগাপেক্ষিতুচ্চিভ্যস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্।।৪/১৬	৩৬২
তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্বশেঃ কৈবল্যম্।।২/২৫	২৩১
তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।।২/২১	২২৪
তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।।৪/২৩	৩৭২
তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।।২/১	১৬৫
তস্য প্রশান্তবাহিত্য সংস্কারাৎ।।৩/১০	২৯১
তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।।১/২৭	১০৪
তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।।৩/৬	২৮৭

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।।২/২৭	২৪৪
তস্য হেতুরবিদ্যা।।২/২৪	২২৯
তস্যাপি নিরোধে সর্ব নিরোধান্নিবীজঃ সমাধিঃ।।১/৫১	১৫৬
তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।।২/৪৯	২৭৩
দ্রষ্ট- দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্।।৪/২২	৩৭১
দ্রষ্ট দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।।২/১৭	২০১
দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।।২/২০	২১৯
দৃগ্দর্শনশক্তোরেকাত্বতৈবাহসিতা।।২/৬	১৭৫
দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।।৩/১	২৮২
দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।।১/১৫	৭৫
দুঃখানুশায়ী হেষঃ।।২/৮	১৭৬
দুঃখদৌর্মনস্যঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুবঃ।।১/৩১	১২১
ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ।।২/১১	১৮৩
ধ্রুবে তদগতিজ্ঞানম্।।৩/২৯	৩০৯
ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।।২/৫৩	২৭৯
ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।।৩/২০	৩০৩
ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ।।৪/১৮	৩৬৮
নাভিচক্রে কায়বুহ- জ্ঞানম্।।৩/৩০	৩১০
নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃतीনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।।৪/৩	৩৩১
নির্বিচার-বৈশারদ্যেহধ্যাত্তপ্রসাদঃ।।১/৪৭	১৫২
নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ।।৪/৪	৩৩৭
প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।।২/১৮	২০৩
প্রাতিভাদ্বা সর্বম্।।৩/৩৪	৩১০
প্রচ্ছদন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।।১/৩৪	১২৮
প্রযত্বশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।।২/ ৪৭	২৭২
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।।১/৭	৫৫
প্রত্যয়স্য পরচিত্ত- জ্ঞানম্।।৩/১৯	৩০৩
প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।।৩/২৬	৩০৮
প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্।।৪/৫	৩৪০
প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-সুতয়ঃ।।১/৬	৫৫
প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।।৪/ ২৮	৩৭৭
পরিণামৈকাত্বাদস্ততত্ত্বম্।।৪/ ১৪	৩৬০
পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।।৩/১৬	২৯৯
পরিণামতাপ- সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্.....২/১৫	১৯৭
পরমাণু-পরমমহত্ত্বাস্তোহস্য বশীকরঃ।।১/৪০	১৪২
পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যাৎ.....৪/৩৩	৩৮৪
ব্যাপ্তিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যবিরতিভ্রান্তিদর্শনালঙ্ক১/৩০	১১৮
ব্যুত্থান- নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ.....৩/৯	২৮৯
ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।।২/৩৮	২৬৫
বাহ্যভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।।২/৫১	২৭৬
বাহ্যভ্যন্তরস্তত্ত্ববৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।।২/৫০	২৭৬
বিতর্কী হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা.....২/৩৪	২৬০
বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।।২/৩৩	২৫৮
বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।।১/১৭	৮০

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠাম্।।১/৮	৬১
বিবেখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।।২/২৬	২৪৪
বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ।।১/১৮	৮৬
বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।।২/১৯	২০৯
বিশেষদর্শিন আত্মভাব- ভাবনা- বিনিবৃত্তিঃ।।৪/২৪	৩৭২
বিশোক বা জ্যোতিষ্মতী।।১/৩৬	১৩৭
বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরূপমা মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী।।১/৩৫	১৩৫
বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।।১/৩৭	১৩৭
বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।।১/৪	৫০
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতম্যঃ ক্লিষ্টাহক্লিষ্টাঃ।।১/৫	৫৫
বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।। ৩/৩৯	৩১২
বলেষু হস্তিবলাদীনি।।৩/২৫	৩০৮
বস্ত্রসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পস্থাঃ।।৪/১৫	৩৬১
বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ।।৩/৪৪	৩১৪
ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।।৩/২৭	৩০৮
ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্।।১/১৯	৯৮
মৈত্র্যাতিষু বলানি।।৩/২৪	৩০৭
মৈত্রী-করণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপূর্ণ্যা....১/৩৩	১২৪
মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষঃ।।১/২২	১০০
মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।।৩/৩৩	৩১০
রূপ- লাভ্য- বল- বজ্রসজ্জননত্বানি কায়সম্পৎ।।৩/৪৭	৩১৭
শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদিব্যং শ্রোত্রম্।।৩/৪২	৩১৪
শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।।১/৪৯	১৫৩
শ্রদ্ধাবীর্ষস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।।১/২০	৯৯
শাস্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।।৩/১৪	২৯৮
শাস্তোদিতৌ তূল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তসৈক্যপ্রতাপরিণামঃ।।৩/১২	২৯৩
শৌচ- সন্তোষ- তপঃ- স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।।২/৩২	২৫৭
শৌচাৎ স্বাস্ত্যজুগুপ্সা পঠেরসংসর্গঃ।।২/৪০	২৬৬
শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্।।৩/১৭	৩০০
শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুরূপো বিকল্পঃ।।১/৯	৬২
স্থান্যপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।।৩/৫২	৩১৯
স্থিরসুখাসনম্।।২/৪৬	২৭২
স্থূলস্বরূপ- সূক্ষ্মস্বয়ার্থবত্ত্ব- সংযমাত্ত্বজয়ঃ।।৩/৪৫	৩১৬
স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।।২/৪৪	২৭১
স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।।১/৩৮	১৩৮
স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথারুঢ়োহভিনিবেশঃ।।২/৯	১৭৭
স্বস্বামিশক্ত্যাঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।।২/২৩	২২৭
স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত- স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।।২/৫৪	২৭৯
স্মৃতিপরিণিকৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।।১/৪৩	১৪৬
স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।।১/১৪	৭২
স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।।১/২৬	১০২
সূক্ষ্মবিষয়ত্বগলিঙ্গ-পর্যবাসনম্।।১/৪৫	১৫০
সুখানুশয়ী রাগঃ।।২/৭	১৭৬
সোপক্রমং নিরূপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ.....৩/২৩	৩০৬

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।।২/৩৬	২৬৩
সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।।৩/৫০	৩১৮
সত্ত্বপুরুষায়োরত্যস্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়বিশেষাদ্...৩/৩৬	৩১১
সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।।৩/৫৬	৩২০
সত্ত্বশুদ্ধি- সৌম্নসৈক্যাগ্রেয়ন্দ্রিয়জয়াত্বদর্শনযোগ্যাত্বানি চ।।২/৪১	২৬৭
সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ।।২/ ১৩	১৯২
সদা জ্ঞাতাশ্চিবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাহপরিণামিত্বাৎ।।৪/ ১৭	৩৬৩
সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।।২/৪২	২৭০
সমাধি-ভাবনার্থ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ।।২/২	১৭১
সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রাণিধানাৎ।।২/৪৫	২৭১
সমানজয়াৎ প্রজ্জ্বলনম্।।৩/ ৪১	৩১৪
সর্বার্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।।৩/১১	২৯৩
সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।।৩/১৮	৩০২
হানমেষাৎ ক্লেশবদুক্তম্।।৪/ ২৭	৩৭৭
হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ.....৪/১১	৩৫০
হেয়ং দুঃখমনাগতম্।।২/১৬	২০০
হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ।।৩/৩৫	৩১১
যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।।২/২৮	২৫১
যোগশ্চিবৃত্তিনিরোধঃ।।১/২	৩২
যথাভিমতধ্যানাদ্বা।।১/ ৩৯	১৩৯
যম- নিয়মাসন- প্রাণায়াম- প্রত্যাহার- ধারণা- ধ্যান- সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি।।২/২৯	২৫২